আনন্দনাথ রায়ের

# ফরিদপুরের ইতিহাস

(১ম ও ২য় খণ্ড)

ড. তপন বাগচী
সম্পাদিত




র‍্যাডিক্যাল
কলকাতা
২০০০

*প্রথম প্রকাশ* :
অক্টোবর, ২০০০

*প্রচ্ছদ* :
অমিতাভ ভট্টাচার্য

*প্রকাশক ও মুদ্রক* :
অরুণকুমার দে
র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন
৪৩ বেনিয়াটোলা লেন,
কলকাতা-৭০০ ০০৯

## উৎসর্গ

প্রথম খণ্ডে উৎসর্গপত্র ছিল না। দ্বিতীয় খণ্ড উৎসর্গ করা হয়
আনন্দনাথ রায়েরর অনুজ 'নগেন্দ্রনাথ রায়ের স্মৃতিতে'।
বর্তমান গ্রন্থও নগেন্দ্রনাথ রায়ের নামে উৎসর্গ করা হল।

-সম্পাদক

# সূচিপত্র

# সম্পাদনা প্রসঙ্গে

আনন্দনাথ রায়ের 'ফরিদপুরের ইতিহাস প্রথম খণ্ড' আমার নজরে আসে ফরিদপুর মিউজিয়ামে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের পাঠ শেষে সাময়িকপত্র গবেষণায় উৎসাহী হই। এ-সময়ে প্রাচীন ইতিহাস পাঠের প্রতিও আমার কৌতূহল বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৯ সালে বাংলা একাডেমী আমাকে গোপালগঞ্জ জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার দায়িত্ব প্রদান করে। জেলার ঐতিহাসিক বিবরণ খুঁজতে গিয়ে আনন্দনাথ রায়ের 'ফরিদপুরের ইতিহাস'র গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের অনুলিপি সংগ্রহ করি। তখনই এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণের চিন্তা আমার মাথায় আসে। কিন্তু লক্ষ করি যে, 'কয়েকটি কথা' নামে লেখকের ভূমিকা-অংশের এক পৃষ্ঠার পরের অংশ তাতে নেই। ওই কপিটি সংগ্রহ করা হয়েছে শরিয়তপুরের বিশিষ্ট কবি-গবেষক-রাজনীতিবিদ রথীন্দ্রকান্ত ঘটকচৌধুরীর সংগ্রহ থেকে। তাঁর সংগৃহীত কপিতেও সকল পৃষ্ঠা ছিল না। আমি পূর্ণাঙ্গ কপি অনুসন্ধানের চেষ্টা অব্যাহত রাখি।

২০০৫ সালে ফরিদপুরের বিশিষ্ট সাংবাদিক-গবেষক আবু সাঈদ খানের উদ্যোগে 'ফরিদপুরের ইতিহাস' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ঢাকার ম্যাগনাম ওপাস প্রকাশনা সংস্থা থেকে। এ গ্রন্থেও খণ্ডিত অংশ পাওয়া যায়নি। 'ফরিদপুরের ইতিহাস' (১৯৯৪) নামে ভিন্ন এক গ্রন্থে অধ্যাপক আ.ন.ম. আবদুস সোবহান লিখেছেন, '... ১৮৮০ সালে আনন্দনাথ রায় ফরিদপুরের ইতিহাস নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।' কিন্তু আমরা নিশ্চিত যে প্রথম খণ্ডের প্রকাশকাল ১৩১৬ বঙ্গাব্দ। মূল কপি দেখে আমরা এই বিভ্রান্তি মোচনের চেষ্টা করেছি। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডও প্রকাশিত হয়। জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর নারিয়াকি নাকাজাতো রচিত 'Agrarian System in Eastern Bengal 1870-1910' গ্রন্থে 'ফরিদপুরের ইতিহাস' গ্রন্থের ২য় খণ্ডের প্রকাশকাল ১৩২৮ বঙ্গাব্দ এবং প্রকাশস্থান জোপসা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে। দুটি খণ্ডের কপির সন্ধানে আমি ভারতের কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে যোগাযোগ করি।

আন্তর্জাতিক বাংলা কবিতা উৎসবে অংশ নিতে ২৬ জানুয়ারি ২০০৭ আমি কলকাতা যাই। ২৭ জানুয়ারি আমি বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও সাময়িকপত্র-গবেষক প্রফেসর ডক্টর স্বপন বসুর শরণাপন্ন হই। তিনি 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' গ্রন্থাগার থেকে 'ফরিদপুরের ইতিহাস' প্রথম খণ্ডের কপি দেখার ব্যবস্থা করেন। আমি অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করি যে, ওই কপিটিও খণ্ডিত এবং অনুরূপ কপিই রথীন্দ্রকান্ত ঘটকচৌধুরীর বাড়িতে এবং বাংলা একাডেমীতে রয়েছে। 'কয়েকটি কথা'র ছিন্ন পৃষ্ঠা সেখানে নেই। আমি হাল ছেড়ে দিয়ে পুরনো অন্য বই ঘাঁটতে শুরু করি। পাশে রাখা আরেকটি গ্রন্থে একটি পৃষ্ঠা আলগা দেখতে পেয়ে কৌতূহল জাগে। 'ফরিদপুরের ইতিহাস' গ্রন্থের ছেঁড়া অংশ মিলিয়ে দেখি– এই সেই হারিয়ে যাওয়া পৃষ্ঠা! বড় রকমের একটি আবিষ্কারের আনন্দ অনুভব করি। প্রফেসর ডক্টর স্বপন বসুকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার জানা

নেই। তাঁর কাছে থেকে আগেও নানান সহযোগিতা পেয়েছি। তিনি আমার পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভের বহির্দেশীয় পরীক্ষক ছিলেন। তাঁর কাছে আমি আবারো ঋণী হয়ে রইলাম। আমি স্যারের পরামর্শমতো ছিন্ন দুই পৃষ্ঠা হাতে লিখে নিয়ে আসি। এখন দাবি করতে পারি যে, এটিই 'ফরিদপুরের ইতিহাস'-এর প্রথম খণ্ডের পূর্ণপাঠ।

গ্রন্থাগারে বসেই গবেষক অশোক উপাধ্যায়ের কাছে জানতে পারি দে'জ পাবলিশিং থেকে 'ফরিদপুরের ইতিহাস' প্রকাশিত হয়েছে। আমি ২৯ জানুয়ারি দুপুরে কলেজ স্ট্রিটে দে'জ পাবলিশিং হাউসের বিক্রয়কেন্দ্রে যাই। ক্যাটালগে বইটির নাম থাকলেও তখনো প্রকাশিত হয়নি। এর আগে ২০০৩ সালে অল ইন্ডিয়া ফোকলোর কংগ্রেসে অংশ নিতে কলকাতায় গিয়ে দে'জ-এর বিক্রয়কেন্দ্রে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম যে, পর্যায়ক্রমে পুরাতন ইতিহাসগ্রন্থগুলো প্রকাশিত হবে। যাহোক বাংলাদেশেই এ গ্রন্থের দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ হওয়ায় আমি আনন্দিত।

ইতিহাসবিদ আনন্দনাথ রায় ১৬৬২ বঙ্গাব্দে (১৮৫৬) বৃহত্তর ফরিদপুর এবং পরবর্তী মাদারীপুর জেলার বর্তমান শরিয়তপুর জেলার জপসা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্থানীয় বাংলা বিদ্যালয়ে এবং বরিশাল জেলা স্কুলে অধ্যয়ন করেন। দক্ষিণ বিক্রমপুরের জমিদার গোপীরমণ সেন খাসনবিশ তাঁর পূর্বসুরী। আনন্দনাথের ছোটভাই নগেন্দ্রনাথ রায় জমিদারি পরিচালনা করতেন। আনন্দনাথ ১৯৮২ সালে রমাকান্ত সেন ছদ্মনামে 'ললিতকুসুম' নাটক রচনা করেন। 'নব্যভারত' পত্রিকার মাধ্যমে তাঁর ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত। ১৯২৬ সালে তিনি পক্ষাঘাত রোগে শয্যাশায়ী হন এবং পরে মৃত্যুবরণ করেন। উদ্ধারকৃত ছিন্নপৃষ্ঠা থেকে তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ঐতিহাসিক যতীন্দ্রমোহন সিংহের ১৯০৪ সালে লেখা এক পত্রাংশ থেকে জানা যায় যে, তিনি ফরিদপুরের ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন।

আনন্দনাথ রায় প্রণীত 'ফরিদপুরের ইতিহাস প্রথম খণ্ড' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩১৬ সালের কার্তিক মাসে। খ্রিস্টাব্দ হিসেবে ১৯০৯ সালের অক্টোবর মাস হয় এর প্রকাশকাল। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত ২৫নং গ্রন্থ হিসেবে এটি কলিকাতা থেকে প্রকাশিত। ২১০/৫ কর্ণওয়ালিস-স্ট্রিটের নব্যভারত-প্রেস থেকে এটি মুদ্রিত হয়। এ গ্রন্থের মুদ্রক ও প্রকাশক শ্রীভূতনাথ পালিত। উপশিরোনামে 'ভৌগোলিক তত্ত্ব ও প্রাচীন ইতিবৃত্ত' হিসেবে 'ফরিদপুরের ইতিহাস' গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করা হয়। গ্রন্থের মূল্য ধরা হয় ১২ আনা।

প্রথম খণ্ডের প্রকাশের একযুগ পরে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ডে লেখকের নামের আগে 'দক্ষিণ বিক্রমপুর ১ম ও ৮ম সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি, বিক্রমপুর ১৭শ' অম্বষ্ঠ সম্মিলনীসভার সভাপতি ও 'ফরিদপুরের ইতিহাস ১ম খণ্ড' ও 'বারভূঞা' প্রণেতা, শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্রের বিবিধ প্রবন্ধ লেখক' প্রভৃতি পরিচয়-জ্ঞাপক শব্দবন্ধ উল্লেখ করা হয়। এছাড়া লেখকের নামের সঙ্গে 'সাহিত্যশেখর' উপাধি দেখা যায়। এই খণ্ড প্রকাশিত হয় ফরিদপুরের (বর্তমান শরীয়তপুর) জেলার উপসী ইউনিয়নের জপসা বাবুর বাড়ী নগর থেকে, ১৩২৮ সালের চৈত্র মাসে। খ্রিস্টাব্দ হিসেবে প্রকাশকাল ১৯২২ সালের এপ্রিল-মাস। প্রকাশক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়। মূল্য আড়াই টাকা। উৎসর্গ করা হয়

লেখকের অনুজ 'নগেন্দ্রনাথ রায়ের স্মৃতিতে'। এ গ্রন্থ প্রকাশে লেখকের প্রায় দশ বছর সময় লাগে। অর্থাভাবই এই বিলম্বের কারণ। দুই খণ্ড ক্রয় বাবদ অগ্রীম অর্থ লেখক গ্রহণ করেন। লেখক যাকে 'দাদন' মনে করেছেন।

প্রথম খণ্ডের অনুলিপি কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, রথীন্দ্রকান্ত ঘটকচৌধুরীর সংগ্রহশালা এবং ফরিদপুর মিউজিয়ামে রক্ষিত রয়েছে। আমি খ্যাতিমান অনেক ইতিহাসবিদের কাছে জিজ্ঞেস করেও ২য় খণ্ডের অবস্থানের খবর জানতে পারিনি। ব্রিটিশ মিউজিয়ামেও এর কপির সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাই প্রথম খণ্ডের ছিন্ন পৃষ্ঠা উদ্ধার করে তার পুনর্মুদ্রণ এবং সংযোজন হিসেবে কয়েকটি প্রবন্ধ জুড়ে দিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশের উদ্যোগ নিই। কিন্তু সময়মতো প্রুফশোধন করে জমা দিতে না পারায় প্রকাশে বিলম্ব হয়। এরই মধ্যে শ্রীকালীনাথ চৌধুরীর 'রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' নামক শতবর্ষী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বিশিষ্ট গবেষক ও সম্পাদক ড. তসিকুল ইসলাম রাজার আমন্ত্রণে এবং বিশিষ্ট প্রকাশক ও গবেষক শিকদার আবুল বাশারের অনুরোধে ওই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে রাজশাহী যাই বিশেষ অতিথি হিসেবে। পরের দিন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যাই ইতিহাসবিদ ড. মাহবুবর রহমানের 'হেরিটেজ' দেখার জন্যে। ড. রহমানের সৌজন্যে আমি দ্বিতীয় খণ্ডের অনুলিপি পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হই। তাঁর কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

আনন্দনাথ রায়ের এই গ্রন্থ ফরিদপুরের ইতিহাসচর্চার প্রথম প্রয়াস। তবে এর পরে আ.ন.ম. আবদুস সোবহান 'ফরিদপুরের ইতিহাস' (১৯৯৪), আবদুল জব্বার খান 'মাদারীপুর পরিচিতি' (১৯৯৪), মতিয়র রহমান 'রাজবাড়ি জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য' (২০০০), সমর চক্রবর্তী 'ভূষণা রাজ্যের ইতিহাস' (২০০৫), সিরাজউদ্দীন আহমদ 'মাদারীপুরের ইতিহাস' (২০০৬), আবদুর রব শিকদার 'শরীয়তপুর জেলা পরিচিতি' (২০০১), আবুল হোসেন ভুঁইয়া 'গোপালগঞ্জ শহরের ইতিকথা' (১৯৮৯), মু. মতিয়ার রহমান অপভ্রংশ অপভ্রষ্ট শাহমান্দার' (অপ্রকাশিত), মো. সোলায়মান আলী 'মুক্তিযুদ্ধে বৃহত্তর ফরিদপুর' (১৯৯৩), আবু সাঈদ খান 'মুক্তিযুদ্ধে ফরিদপুর' (২০০৭), তপন বাগচী 'মুক্তিযুদ্ধে গোপালগঞ্জ' (২০০৭) নামে ইতিহাসচর্চা অব্যাহত রাখেন। বিচ্ছিন্নভাবে ড. ফকির আবদুর রশীদ, এম.এ. আজিজ, রবীন্দ্রনাথ অধিকারী, মো. আবুল হোসেন, মহসিন হোসাইন, সাঈদা জামান, ড. মাসুদ রেজা, পরিতোষ হালদার, বাবু মল্লিক প্রমুখ গবেষক বিভিন্ন উপলক্ষে বৃহত্তর ফরিদপুরের ইতিহাস সন্ধানে ব্রতী হয়েছেন। তাই আনন্দনাথ রায়ের পরবর্তী প্রজন্মের কিছু নিবন্ধ এতে সংযুক্ত করা হল।

বিপিনচন্দ্র বিদ্যাবিনোদের দক্ষিণ-বিক্রমপুর-ইদিলপুর সাহিত্য-সম্মিলনীর পঞ্চদশ অধিবেশনের অভিভাষণের মুদ্রিত কপির অনুলিপি সংগ্রহ করে দেন মাদারীপুর বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক ও ইতিহাস-মনস্ক ব্যক্তি ডা. আবদুল বারী। মু. মতিয়ার রহমানের প্রবন্ধটিও পেয়েছি ডা. আবদুল বারীর সংগ্রহ থেকে। ড. নারিয়া নাকাজাতোর গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. স্বরোচিষ সরকার। মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের প্রবন্ধটি পেয়েছি তাঁর জামাতা ডা. পরিমল সরকারের সৌজন্যে। মতিয়ার রহমানের গ্রন্থের অংশবিশেষ পেয়েছি সাংবাদিক-বন্ধু বাবু মল্লিকের মাধ্যমে। এঁদের

সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। দক্ষিণারঞ্জন বসুর 'ছেড়ে আসা গ্রাম' গ্রন্থ থেকে ফরিদপুরের অংশ নিয়েছি। এটি মূলত পত্রিকায় প্রকাশিত দেশত্যাগী মানুষের জবানিতে লেখা সাক্ষাতকারভিত্তিক প্রতিবেদন। ফরিদপুরের ইতিহাসের অনেক উপাদান এতে আছে। সাংবাদিক দক্ষিণারঞ্জন বসুর কাছেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। ফরিদপুর বিষয়ক আরো রচনা পরবর্তী সংস্করণে সংযোজনের ইচ্ছে রইল। আনন্দনাথ রায়ের কয়েকটি প্রবন্ধের সন্ধান পেয়েছি। সেগুলো হাতে এলে একটি পৃথক সংকলনের পরিকল্পনা রয়েছে।

সংযোজন অংশে গ্রন্থিত ১১টি প্রবন্ধের তথ্য ও মন্তব্য লেখকদের নিজস্ব। কিছু কিছু প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করেছি। তবে সম্পাদনার নীতিমালার বাইরে যাই নি। বইটি প্রকাশে এগিয়ে আসার জন্য ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান 'বইপত্র' প্রকাশনীর আহমেদ কাওসারের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদানের জন্য বিশিষ্ট প্রকাশক ও গবেষক সিকদার আবুল বাশারের প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।

বিশিষ্ট ফোকলোবিদ, ইতিহাসবিদ এবং সাহিত্য-গবেষক প্রফেসর ডক্টর আবুল আহসান চৌধুরীর অনুপ্রেরণায় আমি এই গ্রন্থ সম্পাদনায় মনোনিবেশ করতে পেরেছি। প্রফেসর ডক্টর স্বপন বসুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কৃতিত্বও তাঁর। আমার সকল গবেষণা-কাজে তাঁর উপদেশ অব্যাহত থাকবে বলে প্রত্যাশা করি।

আমাকে নানানভাবে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের মধ্যে ফরিদপুরের সাংবাদিক মফিজ ইমাম মিলন, মাদারীপুরের সাংবাদিক সুবল বিশ্বাস, সাংবাদিক ইয়াকুব খান শিশির, 'গণমুক্তি' পত্রিকার সম্পাদক উৎপল বিশ্বাস, গোপালগঞ্জের কবি রবীন্দ্রনাথ অধিকারী, ঢাকার কবি নজরুল সরকারি কলেজের প্রভাষক কেয়া বালা, রাজবাড়ির সাংবাদিক বাবু মল্লিক, ফরিদপুরের কবি সমর চক্রবর্তী, কবি সিদ্ধার্থশঙ্কর ধর প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। বইটি ইতিহাস-অনিসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে গ্রহণীয় হলে কৃতার্থ হবো।

ফরিদপুরের ইতিহাস প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল আজ থেকে একশ বছর আগে। এখন দুই খণ্ড একসঙ্গে প্রকাশিত হলো 'শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি' হিসেবে। শতবর্ষী এই গ্রন্থ দুটি একসঙ্গে উপস্থাপন করতে পেরে আমি আনন্দিত ও গর্বিত।

**ড. তপন বাগচী**
বাহাদুরপুর, দত্তকেন্দুয়া
মাদারীপুর

# ফরিদপুরের ইতিহাস।

(ভৌগোলিক তত্ত্ব ও প্রাচীন ইতিবৃত্ত)

১ম খণ্ড।

শ্রীআনন্দনাথ রায় প্রণীত।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত নং ২৫।

কলিকাতা.

২১০নং কর্ণওয়ালিস্-ষ্ট্রীট, মধ্যভারত-প্রেসে.

শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কার্ত্তিক, ১৩১৯।

 মূল্য ১৷৵০ আনা।

# কয়েকটি কথা

অবস্থার পরিবর্ত্তনে, নানাবিধ দুর্ঘটনায় পতিত হইয়া, যথাসময়ে এই ইতিহাসখানা মুদ্রিত করিয়া উঠিতে পারি নাই। যে যে মহাত্মার পুস্তক হইতে এতৎসম্বন্ধে সাহায্য পাইয়াছি, তাহাদের নাম যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পর্য্যটন দ্বারা বহু তথ্য সংগ্রহ করিতে ও প্রবাদমূলক কথা অবলম্বন করিতে ত্রুটি করি নাই। এজন্য পাথেয় খরচাদি যথেষ্ট লাগিয়াছে।

১৩০৭ সনে প্রথম "বারভুঞা" প্রবন্ধ নির্ম্মাল্য পত্রিকায় আরম্ভ করিয়া ১৩১৩ সন পর্য্যন্ত নব্যভারত পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করি। ডাক্তার ওয়াইজ এসিয়াটীক জার্ণেলে প্রথম কেদার রায়, ফজল গাজী প্রভৃতি কয়েক জনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তদবলম্বনে শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় অতি সামান্য বিষয় সংগ্রহ করিয়া উহা প্রবন্ধাকারে বাহির করেন। চাঁদ ও কেদার রায়ের রাজ্যের বিশেষ বিবরণ ও অমাত্যগণের নাম এবং মানসিংহ সহিত তাঁহার যে লিপি চলিয়াছিল, তিনি তাহা অবগত ছিলেন না। উহা আমার প্রবন্ধ বাহির হইবার পূর্ব্বে আর কেহই কখন উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সুখের বিষয় এই যে, মৎসংগৃহীত ঐ সকল উপকরণ লইয়া বঙ্গবিক্রম ও কেদার রায় প্রভৃতি কয়েকখানা নাটক ও নভেল প্রণীত হওয়ায়, আমার পরিশ্রম সার্থক বিবেচিত হইয়াছে। মুকুন্দ রায়ের বিবরণ ওয়াইজ লিপিবদ্ধ করেন নাই, কাজেই সিংহ মহাশয়ও তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ১২৯৯ সনের ফাল্গুন মাসের ভারতীতে মুকন্দরাম রায় নামে এক প্রবন্ধ বাহির হয় বটে, কিন্তু তাহাতে ইতিহাসের কোন কথাই ছিল না, কেবল তৎকালীন দেশের কথা মাত্র ছিল। মূল আকবর নামা হইতে অনুবাদ করিয়া এই প্রবন্ধটীর অবতারণা করিয়াছি। কেদার রায় ও মুকুন্দ রায় সম্বন্ধে সংক্ষেপ বিবরণ এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিলাম, বিস্তারিত বিবরণ "বারভুঞা" পুস্তকে প্রকাশিত হইতেছে।

অতি অল্প লোকেই সংগ্রাম সাহের নাম পরিজ্ঞাত ছিলেন, তৎসম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই, পাঠকগণ উহার প্রতি মনঃসংযোগ করিলেই সমুদয় জানিতে পারিবেন।

গেরদার প্রস্তর-লিপির ইতিহাস, ফরিদপুরের উকীল শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল রহমান সাহেব অনুগ্রহ করিয়া প্রদান করায় আমি তাঁহার নিকট চিরবাধিত আছি।

নানা কারণে অত্যল্প পৃষ্ঠা সম্বল লইয়া আমাকে সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত হইতে হইল, এইটুকু যদি তাঁহাদের কোন অংশেও তৃপ্তিদায়ক হয়, তবে আমার পরিশ্রম সকল জ্ঞান করিব।

পুস্তকের সৌষ্ঠব সাধনার প্রতি লক্ষ্য রাখিত পারি নাই, ভাষার অঙ্গহানিও যথেষ্ট হইয়াছে, সহৃদয় পাঠক ও সমালোচকগণ ক্ষমা করিবেন।

যাঁহাদের নিকট কোন না কোনরূপ উপকার পেয়েছি, তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু উহা সম্যকভাবে পরিয়া উঠিলাম না বলিয়া দুঃখিত রহিলাম। স্বর্গীয়

মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন কবিরাজ মহাশয়, ফরিদপুরের স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়, কলিকাতানিবাসী সুবিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহোদয়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস রায়, শ্রীযুক্ত রাজা সূর্য্যকুমার রায় ও ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সুলেখক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য, কারণ আমার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা সাহায্য না করিলে আমি কখনই ইতিহাস লেখা ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে পারিতাম না।

নব্যভারত-সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায়, সুলেখক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু ও উকীল শ্রীযুক্ত বিনোদীলাল ঘোষ প্রভৃতি মহোদয়গণকে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য।

অতঃপর আর দুই খণ্ডে এই গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হইবে, ম্যাপ ও চিত্রাদি তাহাতে অধিকতররূপে সন্নিবেশিত থাকিবে। বর্ত্তমান সংখ্যাসহ অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। অপর দুইখণ্ডে পৃষ্ঠা ও অত্যধিক থাকিবে।

৩১ নং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের স্ট্রীট, গ্রন্থকারের নিকট ও ২০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট মজুমদার লাইব্রেরীতে, ফরিদপুর পুস্তকালয়সমূহে, মাদারীপুরের উকীল শ্রীবিনোদীলাল ঘোষ মহাশয়ের ও জপসা, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায় নিকট এই পুস্তক পাওয়া যাইবে। পোঃ উপাসী।

কয়েকখানি চিঠির অংশ।

মুর্শিদাবাদ-কাহিনী ও মুর্শিদাবাদের ইতিহাস লেখক সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত বাবু নিখিলনাথ রায়, বি-এল মহাশয়ের চিঠি হইতে উদ্ধৃত।

"শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় আমার সুপরিচিত, কেবল আমার বলিয়া নহে, বাঙ্গালার সাহিত্য জগতে তিনি বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন। ইহার 'বারভুঞা" প্রভৃতি প্রবন্ধ স্বাধীন ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ বঙ্গসাহিত্যে প্রশংসা লাভ করিয়াছে।

ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ও ঐতিহাসিক শ্রীযুক্তবাব যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি-এ মহাশয়ের পত্র হইতে। বৈদ্যনাথ দেওঘর, ১৫ই নভেম্বর, ১৯০৪

"আপনি সম্প্রতি ফরিদপুরের জেলার ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা ফরিদপুরবাসী মাত্রেরই গৌরবেব বিষয়। এই গুরুতর কাব্যের ভার উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তেই পড়িয়াছে, ইহা আমাদের বিশেষ আনন্দের বিষয়।"

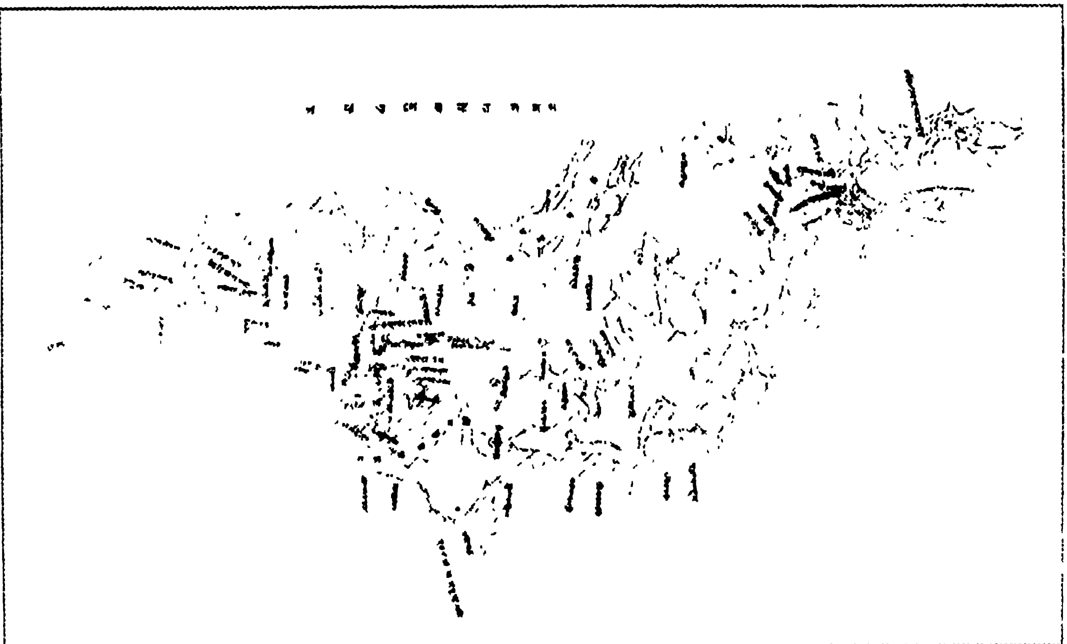
"আমি আপনার ন্যায় প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিককে যে এ বিষয়ে কোন নূতন তথ্য দিতে পারিব, এরূপ দাবি রাখি না। বরং আপনার লিখিত সেই বারভূঞার কাহিনী হইতে আমি অনেক নূতন কথা শিখিয়াছি।"

"প্রফেসর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম-এ মহাশয় লিখিত–

"সম্প্রতি আমাদের দেশে যে কয়েকজন ব্যক্তি বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টায় আছেন, আনন্দ বাবু তন্মধ্যে অন্যতম। প্রাচীন কিংবদন্তী ও স্বদেশের প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ ও প্রাচীন গ্রন্থাদি অবলম্বনে এদেশের প্রাচীন ইতিহাসের

কিংয়দংশ এখনও রক্ষিত হইতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এদিকে একসাথে ঐ উপায়গুলিও ক্রমে লপ্ত হইতে চালিয়াছে, এখনও যাহা উদ্ধারের উপায় আছে, কিছুদিন পরে তাহাও আর থাকিবে না। আনন্দ বাবু যে রূপ আন্তরিকতা সহকারে এ বিষয়ে আয়োজন করিতেছেন, তাহাতে সাধারণত উহার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। আমি তাঁহাতে এজন্য অতিশয় শ্রদ্ধা করি। আনন্দ বাবু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্মুখে কয়েকটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ছিলেন। ঐ প্রবন্ধগুলি পরিষৎ বিশেষ সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন ও সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা উহা যথাকালে বাহির হইয়াছে। লেখক যে পরিশ্রম ও অনুসন্ধান দ্বারা ঐতিহাসিক তথ্যের নির্ণয়ে প্রবৃত্ত আছেন, ঐ প্রবন্ধ হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সম্প্রতি আনন্দ বাবু বঙ্গের বিখ্যাত বারভুঞার ইতিহাস সঙ্কলনে প্রবৃত্ত আছেন ও অনেক কিংবদন্তীও বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন। সঙ্কলিত বিবরণ পুস্তকাকারে প্রকাশ করা উচিত। দেশের ধনী ও কৃতবিদ্য মহোদয়গণ লেখককে সাহায্য করিবেন। সাহিত্য পরিষদের অর্থবল থাকিলে আমি পরিষদকে প্রচারের ভার জন্য অনুরোধ করিতাম।

# প্রাচীন ম্যাপ।



PUBLISHED ACCORDING TO ACT OF PARLIAMENT BY J. RENNELD, JULY 20th 1750.

# সীমা

উত্তরে পদ্মা ও পাবনা জেলা, পশ্চিমে নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুষ্টিয়া সাবডিভিসন ও বারাসীয়া, মধুমতী ও যশোহর জেলা, দক্ষিণে খুলনা ও বাখরগঞ্জ জেলা, নয়াভাঙ্গনী নদী, পূর্ব্বে নোয়াখালী, ত্রিপুরা এবং ঢাকা জেলা; যথাক্রমে মেঘনা ও পদ্মা নদী দ্বারা বিভক্ত। ২৩-৫৪-৫৫ এবং ২২-৪৭-৫৩ উত্তর দ্রাঘিমার মধ্যে এবং ৮৯-২১-৫০ এবং ৯০-৯৬ পূর্ব্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। ১৮৭১ সনের সার্ব্বে-জেনেরেলের পরিমাপে ইহার পরিমাণ ছিল ১৫২৪.০৬ স্কোয়ার মাইল এবং লোক সংখ্যা ছিল ১৮৭২ খ্রিঃ সেনসেসে ১৫৩০২৮৮ জন। বর্ত্তমান সময়ে মাদারীপুর সাবডিভিসন ইহার অন্তর্গত হওয়ায় পরিমাণ আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। অধুনা লোকসংখ্যা ১৯৩৭৬৪৬ এবং পরিমাণফল ২২৮১ স্কোয়ার মাইল। সদর ষ্টেশন ফরিদপুর পদ্মার পশ্চিম তীরে ঢাকা হইতে ৩৮ মাইল দূরবর্ত্তী। কলিকাতা হইতে ১৫০ মাইল ঈশান কোণে অবস্থিত।

ফরিদপুর প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত, ১ সদর, ২ মাদারীপুর, ৩য় গোয়ালন্দ। পরে বিস্তারিত ভাবে এই তিন বিভাগের বিবরণ উল্লেখ করা যাইবে।

নিম্নলিখিত পরগণাগুলি ও অন্যান্য কতকগুলি তালুকের সমষ্টি লইয়া এই জেলার সংস্থিত প্রধান পরগণাগুলির নাম, পরিমাণ ও সদর রাজস্ব উল্লেখ করা হইল।

১। বিক্রমপুর ২৩ স্কোয়ার মাইল, কর ৩ পাউণ্ড ১ ষ্টেট।

২। ফতেজঙ্গপুর ৩৫.৯০ স্কোয়ার মাইল ১১০ টী ষ্টেটের কর ৩৬৩ পাউণ্ড ২ সিলিং।*

৩। হবিবপুর ১৫.৯৯ স্কোয়ার মাইল ১ ষ্টেট কর ৮৭ পাউণ্ড।

৪। ইদিলপুর ২৪২.৭৯ স্কোয়ার মাইল ৫০২ ষ্টেট কর ৭৯৭৭ পাউণ্ড ১৮ সিলিং।

৫। ইদ্রাকপুর ২৪২.৭৯ স্কোয়ার মাইল ৬৩ ষ্টেট কর ৫৬৯ পাউণ্ড ১০ সিলিং।

৬। জালালপুর ৯.৩৪ স্কোয়ার মাইল কর ৮৫ পাউণ্ড ১ ষ্টেট।

৭। কাদিরাবাদ তপ্পা ৩.৩৮ স্কোয়ার মাইল কর ১৫৬ পাউণ্ড ২ ষ্টেট।

৮। কাশীমপুর সেলা পাট্টি ৬.১৭ স্কোয়ার মাইল ৯৯ ষ্টেট কর ৮১২ পাউণ্ড।

৯। কোটালীপাড়া ৮৫.৯২ স্কোয়ার মাইল ৫০২ ষ্টেট কর ২৪৪ পাউণ্ড ১৮ সিলিং।

১০। মাদারীপুর ১২.২৪ স্কোয়ার মাইল ৫ ষ্টেট কর ৮২ পাউন্ড ১০ সিলিং।

১১। মুর্শিদ কোটাল জায়গীর ০.২১ স্কোয়ার মাইল ৪২ ষ্টেট কর ৮২ পাউণ্ড ৮ সিলিং।

১২। রামনগর ১১.৯৭ স্কোয়ার মাইল ১৮ ষ্টেট কর ৮৭ পাউণ্ড ১৬ সিলিং।

১৩। সফিপুর কালাতপ্পা ৩.২০ স্কোয়ার মাইল ৮৬ ষ্টেট কর ১১৪ পাউণ্ড।

এই সকল পরগণার কোন কোন অংশ বাখরগঞ্জের কালেকটরীর তৌজি-ভুক্ত।

* ১৮৬৭ সাল পাউণ্ড ও সিলিং এর যে দর ছিল, তদনুসারে টাকার ও আনার হিসাব করিতে হইবে।

## ফরিদপুরের খাস তৌজি

১। অমরাপুর ০.৫ স্কোয়ার মাইল ১ ষ্টেট কর ৩ পাউণ্ড ২ সিলিং।

২। আমিরাবাদ ৬.৬২ স্কোয়ার মাইল ৫ ষ্টেট কর ২৬৬ পাউণ্ড ১০ সিলিং।

৩। আমীরনগর কিম্বা আমীন্নগড় ৩.৯৩ স্কোয়ার মাইল ১ ষ্টেট কর ১৫৫ পাউণ্ড ১৪ সিলিং।

৪। বৈকুণ্ঠপুর ৬.৪১ স্কোয়ার মাইল ৯ ষ্টেট কর ২৪৬ পাউণ্ড ১৬ সিলিং।

৫। বাকীপুর ০.২১ স্কোয়ার মাইল ১ ষ্টেট কর ৯ পাউণ্ড ১৪ সিলিং।

৬। বাউলার ০.০৭ স্কোয়ার মাইল ১ ষ্টেট কর ৮ সিলিং।

৭। বন্দরখলা ০.৬৯ স্কোয়ার মাইল ২ ষ্টেট কর ১২৮ পাউণ্ড ১২ সিলিং।

৮। বেলগাছী ৩২.৬০ স্কোয়ার মাইল ২৮ ষ্টেট কর ৭৯৫ পাউণ্ড।

৯। বিনোদপুর তপ্পা এরিয়ার উল্লেখ নাই ১ ষ্টেট কর ৪ পাউণ্ড।

১০। বিরাহিমপুর ১৪.১৯ স্কোয়ার মাইল ২ ষ্টেট কর ২৭৭ পাউণ্ড ১২ সিলিং।

১১। বীরমোহন ৪৫.৬৩ স্কোয়ার মাইল ৬০২ ষ্টেট কর ৯৫৫ পাউণ্ড ১৪ সিলিং।

১২। ধূলদী ৫৭.৭৪ স্কোয়ার মাইল ৫৯ ষ্টেট কর ১০৪৪ পাউণ্ড ৪ সিলিং।

১৩। ফতেজঙ্গপুর এরিয়ার উল্লেখ নাই ১৯ ষ্টেট কর ১০৪৪ পাউণ্ড ৪ সিলিং।*

১৪। গঙ্গাপথ ০.০৫ স্কোয়ার মাইল ৬ ষ্টেট কর ২২৬ পাউণ্ড ১০ সিলিং।

১৫। হাকিমপুর ২১.৯০ স্কোয়ার মাইল ৩২ ষ্টেট কর ২৪ পাউণ্ড ৪ সিলিং।

১৬। হাবেলী ৪.৪০ স্কোয়ার মাইল ১৩১ ষ্টেট কর ১১৮ পাউণ্ড ১৬ সিলিং।

১৭। জাহাঙ্গীরনগর ০.১১ স্কোয়ার মাইল ২ ষ্টেট কর ৪ পাউণ্ড ২ সিলিং।

১৮। জালালপুর ১০৪.৭৭ স্কোয়ার মাইল ৬৮৭ ষ্টেট কর ১৩৪১ পাউণ্ড।+

১৯। কাসখা সাগর ০.৪৪ স্কোয়ার মাইল ৬৮৭ ষ্টেট কর ১৩৪১ পাউণ্ড।

২০। কাশীম নগর ৭.৫৩ স্কোয়ার মাইল ২২ ষ্টেট কর ২২২ পাউণ্ড ৮ সিলিং।

২১। কোষা ০.০১ স্কোয়ার মাইল ১ ষ্টেট কর ৮ সিলিং।

২২। মহিমসাহী ৯.১৬ স্কোয়ার মাইল ২৭ ষ্টেট কর ২১৭ পাউণ্ড ১০ সিলিং।

২৩। মহম্মদপুর ৪.৩৩ স্কোয়ার মাইল ১১৪ ষ্টেট কর ১৫৫ পাউণ্ড ১৪ সিলিং।

২৪। মুবারকপুর উজিলা ০.০৪ স্কোয়ার মাইল ১ ষ্টেট কর ৩ পাউণ্ড ১০ সিলিং।

২৫। মুকিমপুর ৭.৫৯ স্কোয়ার মাইল ৮ ষ্টেট কর ৫৪ পাউণ্ড ৮ সিলিং।

২৬। নলদী ৬৫.১৮ স্কোয়ার মাইল ১০৪ ষ্টেট কর ৭৫ পাউণ্ড ২ সিলিং।

২৭। নসবীসাহী ৪.৪৫ স্কোয়ার মাইল ৯ ষ্টেট কর ৭৫৬ পাউণ্ড ২ সিলিং।

২৮। নসরৎসাহী ০.১৮ স্কোয়ার মাইল ২ ষ্টেট কর ৫ পাউণ্ড।

২৯। নুরুল্লাপুর ২.০৯ স্কোয়ার মাইল ৬৯ পাউণ্ড ৪ সিলিং।

৩০। পাটপাসার ১.৯৭ স্কোয়ার মাইল ৪ ষ্টেট কর ৬৯ পাউণ্ড ৪ সিলিং।

* পূর্ব্বে একবার উল্লেখ হইয়াছে।
\+ পূর্ব্বে একবার উল্লেখ করা হয়েছে।

৩১। পোকতানী ১ ষ্টেট কর ২০৫ পাউণ্ড ৮ সিলিং।

৩২। রাজনগর ১.২৭ স্কোয়ার মাইল ৫ ষ্টেট কর ৩৫ পাউণ্ড ১৪ সিলিং।

৩৩। রোকনপুর ০.৩৭ স্কোয়ার মাইল ৩৫ পাউণ্ড ১৪ সিলিং।

৩৪। রূপাপাত তরফ ২৯.৫ স্কোয়ার মাইল ১ ষ্টেট কর ১০০৩ পাউণ্ড ২ সিলিং।

৩৫। সাতৈর ১২৮.৬৩ স্কোয়ার মাইল ৮৬ ষ্টেট কর ৪৫৭৬ পাউণ্ড ১৮ সিলিং।

৩৬। সাহপুর তপ্পা ৮৪৭.০৪ স্কোয়ার মাইল ৪৯ ষ্টেট কর ৩৭৬৬ পাউণ্ড।

৩৭। সেরদিয়া ১০.৮৫ স্কোয়ার মাইল ১৮ ষ্টেট কর ৫৩ পাউণ্ড।

৩৮। সিন্দুরিয়া ২.০৯ স্কোয়ার মাইল ৮ ষ্টেট কর ২৩ পাউণ্ড ৬ সিলিং।

৩৯। সুলতানপুর খড়রিয়া ১০.০৭ স্কোয়ার মাইল ১৪ ষ্টেট কর ২১ পাউণ্ড।

৪০। তেলীহাটী ১৬৫.৬৪ স্কোয়ার মাইল ২৪ ষ্টেট কর ১৫৭০ পাউণ্ড ৪ সিলিং।

৪১। তেলীহাটী আমিরাবাদ ১১.১৫ স্কোয়ার মাইল ৭৭ ষ্টেট কর ২১৩ পাউণ্ড ১৮ সিলিং।

৪২। তেলীহাটী মহব্বৎপুর ১১.১৬ স্কোয়ার মাইল ৭৭ ষ্টেট কর ৪০৮ পাউণ্ড ১০ সিলিং।

৪৩। কার্ত্তিকপুর, সেলিমপ্রতাপ, খুটনেকপুর, চাউলার, বেগী, দুর্গাপুর প্রভৃতি পরগণা আছে।

## প্রধান চর

(১) উজানচর প্রায় ৯১৭৯ একর (২) চরটীপ্রাকান্দী ৫১২৭ একর (৩) চর নাজীরপুর ১১৭৩৫ একর (৪) চর ভদ্রাসন ৭৩৪০ একর (৫) চর জজিরা ষ্টেসন শিবচর ও পালং মধ্যে (৬) চর নৌকাডুবি ঐ ষ্টেসন মধ্যে (৭) চর কালকিনী আরিয়লখাঁ ও ফাইসাবতলা নদীর মধ্যে (৮) চর পঞ্চহাজারি ২৮২৬ একর (৯) চর খালপুরা ১৮৩৮ একর (১০) রাজার চর ১৮৫৮ একর (১১) চর দত্তপাড়া অরিয়ালখাঁ নদীতীরে (১২) চর ছোলাছির বন্দরখলা বরমগঞ্জের নিকট (১৩) চর জমালপুর আজাপুরের নিকট (৪) লাউজানা আশাপুর মথুরাপুরের নিকট (১৫) চর মুকুন্দিয়া (১৬) তরফ বাইলাড় (১৭) বেটকা (১৮) তরফ কৃষ্ণনগর (১৯) মাধবদী (২০) পদ্মার মধ্যবর্ত্তী হাকিমপুর শ্যামনগর, কালীনগর ইত্যাদি।

## বিল

১। ঢোলসমুদ্র ফরিদপুরের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে সংলগ্ন। এক সময়ে ইহার আয়তন ৮ মাইল ছিল, পরে বর্ষার সময়ে প্রায় দুই মাইল জলপূর্ণ থাকিত। অধুনা গ্রীষ্মকালে প্রায় শুষ্ক হইয়া যায়।

২। বিলপাটীয়া বেলগাছীর নিকট। বর্ষার সময়ে প্রায় ২ মাইল হইতে ৩ মাইল প্রশস্ত হইত।

৩। বিল হাতিমোহনা। ২৷৷. মাইল দীর্ঘ ২ মাইল প্রশস্ত ছিল।

৪। রামকেলী সাতৈরের নিকট। প্রায় ১৫ মাইল দীর্ঘ ৬ মাইল প্রশস্ত।

৫। নসীবসাহী বিল। ১৬ মাইল দীর্ঘ ৬ মাইল প্রশস্ত; ইহা মুকসুদপুর থানা বিলমটর. চাঁদার বিল, বকসীর বিল পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

৬। কাজলার বিল।

৭। বাঘিয়া কোটালিপাড়ার উত্তর।

৮। রামশীলা দীঘি।

৯। ধড়য়া। —এই সকল বিলের অধিকাংশ জমি উত্থিত হইয়াছে।

## নদী

এই জেলার সীমান্তে দুইটী বড় নদী বিদ্যমান; উহার একটী পদ্মা অপরটী মেঘনা।

পদ্মা জেলার উত্তর পূর্ব্বাংশে পাবনা ও ঢাকা হইতে জেলাকে বিভক্ত করিতেছে। ইহা প্রথমতঃ মুগিডাঙ্গার নিকট "ভেলবারিয়া" ফ্যাক্‌টারির উত্তর পশ্চিমাংশ স্পর্শ করিয়া গোয়ালন্দের নিকট যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছে। সাধারণতঃ এই সংযোগ বাইশ-

কোদালীয়া নামে পরিচিত।* বর্ষার সময়ে উহার জলস্রোত এত প্রবলভাবে দক্ষিণ দিকে ধাবিত হয় যে, অতি বেগগামী আসামের ষ্টীমার পর্য্যন্ত উহা ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতে পারে না। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের এক রিপোর্টে কালেক্টর সাহেব লিখিয়া যান্ যে, এই বৎসর ৬ খানা ফ্লাটসহ ষ্টীমার পদ্মা যমুনা সংযোগ ভেদ করিয়া উঠিতে না পারায়, কতক দিন গোয়ালন্দ নঙ্গর করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। এই সময়ে গড়াই নদী দ্বারা পদ্মার গতি পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠে। কর্ণেল গেষ্টল কর্ত্তৃক পরিমাপে তৎসময়ে গোয়ালন্দের নিকট পদ্মার প্রশস্ততা গ্রীষ্ম সময়ে ১৬০০ গজ বলিয়া অবধারিত হয়।

পদ্মার একটী শাখার নাম আরিয়াল খাঁ, ইহার উপরের দিকের নাম ছিল, ভুবনেশ্বর। ১৮০১ সালে ঠগি দমন জন্য আরিয়াল খাঁ নামীয় এক জমাদার গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয়। ভুবনেশ্বর হইতে এক খাল খনন করাইয়া উহা প্রাচীন পদ্মার দক্ষিণাংশের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়ায়, উহাই কালক্রমে প্রবল রূপ পরিগ্রহ করিয়া প্রাচীন পদ্মা ও ভুবনেশ্বরের কতকাংশ গ্রাস করিয়া ফেলে ও সাধারণের নিকট আরিয়াল খাঁ নামে পরিচিত হয়। এই নদী ফরিদপুর হইতে কতক মাইল দূরে চর মুকুন্দিয়া নামে দ্বীপ গঠিত করিয়া, প্রথমতঃ দক্ষিণ পূর্ব্বদিক, পরে দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়া মাদারীপুরের নিম্ন দিয়া কালকিনী চরের পূর্ব্বাংশ দিয়া ফুলতলা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। বর্ষার সময়ে ইহার প্রশস্ততা ১৬০০ গজ হয়। নীলখীর খাল ইহার ২/৩ মাইল অতিক্রম করিয়া আরিয়াল খাঁ হইতে কুমার পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইতেছে। গ্রীষ্ম সময়ে ২৫ গজ ও বর্ষার সময়ে ৫০ গজ প্রশস্ত হয়।

নয়াভাঙ্গনী কালীনগরের নিকট আরিয়াল খাঁ নদী হইতে বাহির হইয়া ইদিলপুর ও শ্রীরামপুর ভেদ করিয়া মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছে। উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিমে বক্রগতিতে দীর্ঘ প্রায় ২২ মাইল। গ্রীষ্ম কালে ৮০০ গজ এবং বর্ষাকালে ১২০০ গজ প্রশস্ত হয়।

ফাইসাতলার দোন আরিয়াল খাঁ হইতে বাহির হইয়া পাঙ্গাসিয়া পর্য্যন্ত দীর্ঘে প্রায় ৪১/২ মাইল। গ্রীষ্ম সময়ে ৬০ ও বর্ষার সময়ে ৮০ গজ প্রশস্ত হয়।

পদ্মার যে অংশ বিক্রমপুর ভেদ করিয়া মেঘনার সহিত মিলিয়াছে, উহার নাম কীর্ত্তিনাশা, প্রকৃত প্রস্তাবে পদ্মার গতি বিক্রমপুরের পশ্চিমদিক পরিত্যাগ করিয়া মরাপদ্মা নামে এবং প্রবলাংশ যাহা ১০০ বৎসরের মধ্যে উদ্ভব হইয়া প্রাচীন কালীগঙ্গা বিলুপ্ত করিয়াছে, উহা কীর্ত্তিনাশা নামে পরিচিত।

মিঃ রেনেলের কৃত ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের মানচিত্রে কীর্ত্তিনাশার নাম উল্লেখ নাই। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ টেইলার, তদীয় টপগ্রাফী অব্ ঢাকা পুস্তকে কাথারিয়া বা কীর্ত্তিনাশা নদীর বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, চাঁদ ও কেদার রায় এবং নওপাড়ার বৈদ্য চৌধুরীদের কীর্ত্তি ভগ্ন করায় উহার নাম কীর্ত্তিনাশা। প্রথম রথখলা পরে ব্রহ্মবধিয়া পরে

* একবার অতি বৃষ্টিতে মাঠে অত্যন্ত জল জমিয়া যায়, এমতাবস্থায় বপন কার্য্যের বিশেষ অসুবিধা নিবন্ধন ঐ জল নিঃসরণের জন্য এক পরিবারের বাইশটী লোক এক একখানা কোদালী লইয়া যমুনা ও পদ্মারদিগের উচ্চ ভূমিখণ্ড খনন করিয়া জল বাহির করিয়া দেয়। বর্ষার পূর্ণতাসহ যমুনার জলস্রোত ব্রহ্মপুত্রের দিকে মন্দগতিতে চলিয়া এই পয়ঃপ্রণালীর যোগে দ্রুতভাবে পদ্মায় পতিত হইতে থাকে ; ২-৩ বৎসরের মধ্যে এইরূপে যমুনা-পদ্মার সংযোগে বহুগ্রামে প্রান্তর ভগ্ন হইয়া এই নূতন সংযুক্ত স্থান বর্ষার সময়ে দুরতিক্রমণীয় হইয়া দাঁড়ায়। বাইশকোদালে প্রথম উহার উদ্ভব বলিয়া উহার নাম হয় "বাইশ কোদালিয়া"।

কাথারিয়া সর্ব্বশেষে কীর্ত্তিনাশা নামে পরিচিত হয়। এই নদী বিক্রমপুরের বহু কীর্ত্তি উদরস্মাৎ করিয়াছে, তন্মধ্যে রাজনগর, জপসা ও কালীপাড়ার নাম উল্লেখযোগ্য। এই নদী দ্বারা বিক্রমপুর দ্বি ভাগে বিভক্ত হইয়া উত্তর ভাগ ঢাকা জেলায় এবং দক্ষিণ ভাগ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত হইয়াছে। বর্ষার সময়ে উহার বেগ বড়ই প্রবলরূপ ধারণ করে এবং ভগ্নস্থানের গর্জ্জন বহুদূর পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়। পরিসর উত্তর দক্ষিণ পারের মধ্যে চারি হাজার গজ হইবে, কিন্তু বহু চর থাকায় ততটা অনুমান হয় না। বর্ষার সময়ের গভীরতা স্থান বিশেষে ৫০.৬০ গজ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

চন্দনা নদী ফরিদপুরের পশ্চিম সীমান্তে, মুগীডাঙ্গা গ্রামের নিকট জেলার একেবারে উত্তর পূর্ব্বাংশে গঙ্গা বা পদ্মা হইতে শাখারূপে বহির্গত হইয়াছে। তৎপর ইহা বক্র গতি হইয়া পশ্চিম সীমা দিয়া কিন্তু সাধারণত পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণ দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া, সৌদপুর বন্দরের নিকট মসলন্দপুরস্থ গড়াইতে পতিত হইয়াছে। ইহা গ্রীষ্মের সময় ৫০ গজ প্রশস্ত এবং বর্ষার সময় ৮০ গজ হইয়া থাকে। বৎসরের মধ্যে মাত্র ৫ মাস এই নদী দিয়া গমনাগমন করা যায়। নদীটা ক্রমেই ভরিয়া আসিতেছে। গ্রীষ্মের সময় ইহার গতির অনেকাংশ প্রায় শুষ্ক হইয়া যায়। চন্দনা এবং গড়াই একত্র সংযুক্ত হইয়া মধুমতী নামে ফরিদপুরের পশ্চিম সীমা দিয়া সমুদ্রাভিমুখে দক্ষিণ দিয়া প্রবাহিত হয়।

মধুমতী বড় নদী মাঝারি নৌকা দ্বারা পার হওয়া যায়। গ্রীষ্মের সময় ইহার প্রশস্ত ১৫০ গজ ও বর্ষার সময় ২০০ গজ হইয়া থাকে। মধুমতী এবং গড়াই নদী দিয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বাংশে ব্যবসায় বাণিজ্য চলিতেছে। বৎসরের প্রত্যেক সময় বড় বড় নৌকা যাতায়াত করিতে দেখা যায়। সুন্দরবনে প্রবেশের ইহা একটা পথ। ইহার পার দিয়া গুণ টানিয়া যাইতে বিশেষ সুবিধা। মধুমতীর একটী শাখা বারাশিয়া নদী গোয়ালবাড়ী নিকট মধুমতী হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রায় ২০ মাইল প্রবাহিত হইয়া জেলার ভাটিয়াপাড়া গ্রামের নিকট মধুমতীর সহিত পুনরায় মিলিয়াছে। এই নদীতে বড় বড় নৌকা যোগে সমুদয় বৎসর পার হওয়া যায়। মধুমতীর উপশাখার নাম বানকাণা, কেহ কেহ নবগঙ্গা কহিয়া থাকে, কিন্তু এই সকল নদী যশোহর জেলা দিয়া প্রবাহিত, ফরিদপুরের মধ্যে নহে।

কুমার নদী। সিবিল ষ্টেশন হইতে বত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত কানাইপুর গ্রামের নিকট চন্দনা নদী হইতে কুমারনদী শাখারূপে বহির্গত হইয়াছে। পরে বক্রগতিতে বহির্গত হইয়া সাধারণতঃ উত্তর হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব দিক দিয়া প্রবাহিত হওয়ার পর মাদারীপুরের নিকট ফরিদপুরের নিকট ফরিদপুর পরিত্যাগ করিয়া বাখরগঞ্জের অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্ষার সময় বাণিজ্য নৌকা দ্বারা ইহার উৎপত্তি স্থান হইতে কানাইপুর পর্যন্ত যাতায়াত করা যায়। তৎপর সমস্ত বৎসর অবধি মাদারীপুর পর্যন্ত যাওয়া যায়। দেশের আয় বৃদ্ধির জন্য কুমার নদীর দুইটী শাখা ব্যবহার করা যায়।

প্রধান শাখা শীতলক্ষ্যা, তালমা পুলিশ ষ্টেশন হইতে আরম্ভ করিয়া ভাঙ্গার নিকট কুমারের সহিত মিলিত হইয়াছে। বর্ষার সময় এই নদীতে নৌকা যোগে যাতায়াত করা যায়, কিন্তু গ্রীষ্মের সময় নয়। তালমা ও আজিয়া গয়েসপুর ভরিয়া যাওয়ায় গমনাগমন করা যায় না, যে সমস্ত স্থান ভরে নাই, তাহাতে গভীর জল থাকে। এই নদীতে সকল বৎসর গমনাগমন করা যাইতে পারে, যদি ইহার সমস্ত অংশ খনন করা হয়, তাহা হইলে

ভাঙ্গা পর্যন্ত নৌকাযোগে যাতায়াত করা যায়। ভাঙ্গা এবং তালমার মধ্যে নৌকার সুবিধা হইলে বাণিজ্য বিস্তার ঘটিতে পারে। কারণ তালমা হইতে ফরিদপুর পর্যন্ত রাস্তার বন্দোবস্ত আছে।

২য় শাখা বালুগাঁর নিকট চরটুকু, উপরে কুমার ছাড়িয়া জেলার দক্ষিণ অংশে বিলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হইয়া সর্ব্ব শেষে মধুমতীর সহিত মিলিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত নদীর মত এই নদীও স্থানে স্থানে খনন করা আবশ্যক। যদি এইরূপে নৌকাযোগে যাতায়াতের সুবিধা হয়, তবে ফরিদপুর ও গোপালগঞ্জের মধ্যে বাণিজ্যের সুবিধা হইতে পারে। কুমার দুই শত গজ পর্যন্ত প্রশস্ত।

## খাল

কাওনীয়া, রত্নদিয়া, মাতলাখালী, এই সকল খাল নসীবসাহী ও মহিমসাহীর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হইয়া কুমার ও হাজীখালীর সহিত মিলিয়াছে। এতদ্ভিন্ন মাদারীপুরের, ধোপাডাঙ্গার, নওয়াপাড়ার, বোয়ালমারীর, গোয়ালার, পিঞ্জিরির, ফতেপুরের, গোয়াখালীর, ঘাগরের, বিনোদপুর বা চিকন্দীর, রাজগঞ্জ বা পালঙ্গের, ঘড়িশারের খাল ও বিল-রুট প্রশস্ত।

## পথ

প্রাচীন রাস্তা সম্বন্ধে রেনেলের মানচিত্রে দেখা যায়, ফরিদপুর হইতে এক প্রশস্ত পথ বরাবর উত্তরাভিমুখ হইয়া পাঠপাসার হাজীগঞ্জ অতিক্রম করতঃ বরাবর পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া পদ্মার অপর তীরস্থ নবাবগঞ্জ হইয়া ঢাকা পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। অপর পথটী হাবাসপুর হইতে আরম্ভ হইয়া গোয়াল গাঁ, কুমারখালী, কুষ্টিয়া হইয়া এক শাখা জলঙ্গী নদীর তীরবর্ত্তী জয়রামপুর পর্য্যন্ত, অপর শাখা পদ্মার তীরস্থ সারদা পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে।

মূলফৎগঞ্জ হইতে অপর রাস্তা আরম্ভ হইয়া জপসা, লরিকুল হইয়া রাজনগর পর্য্যন্ত তথা হইতে কালীগঙ্গা অতিক্রম করিয়া উত্তরাভিমুখে ধানকুনিয়া, রাজবাড়ী, সেরাজদী হইয়া ঢাকার দিকে চলিয়া গিয়াছে। রেনেলের ম্যাপে এই দুই রাস্তার চিত্রই দৃষ্ট হয়।

অপর আর একটী রাস্তার নাম "কাচকিগুড়ার দরজা" এটি ইদিলপুরের প্রান্তবর্ত্তী দেওভোগ হইতে আরম্ভ হইয়া মূলফৎগঞ্জের রাস্তা সহ মিলিয়াছিল। নানাবক্র গতিতে উহা বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া ধলেশ্বরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

নূতনরথ্যার মধ্যে ইষ্টারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের লৌহবর্ত্ম গোয়ালনন্দ হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত বিস্তৃত কিন্তু পদব্রজে গমনাগমনের সুবিধা নাই। অপর রাস্তা গোয়ালন্দ হইতে ফরিদপুর, ফরিদপুর হইতে তালমা। এতদ্ভিন্ন ফরিদপুর হইতে অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাস্তা ও পালং হইতে নগর ফতেজঙ্গপুরের রাস্তা ও মাদারীপুর হইতে বরিশালের অন্তর্গত গৌরনদীর এলাকার নিকটবর্ত্তী রাস্তা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাস্তা দৃষ্ট হয়। নড়িয়া ও লোনসিংহের পথ অল্পদূর মাত্র বিস্তৃত। মোটের উপর পথকরের টাকা দ্বারা উচিতমত রাস্তা, খাল না হওয়ায় দেশীয় লোকের ক্লেশ মোচন হইতেছে না। বাদসাহী গবর্ণমেন্টের ও হিন্দু রাজাদের সময়ে এদেশে রাস্তার বন্দোবস্ত বরং ভাল ছিল।

## পশু, পক্ষী ও মৎস্য ইত্যাদি

বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানের ন্যায় হিংস্র ও গ্রাম্য পশু, পক্ষী, সরিসৃপ, মৎস্য ইত্যাদি এই স্থানেও দৃষ্ট হয়। নদীতে কুম্ভীর ও শু শু এবং স্থলে ব্যাঘ্র, শূকর, বানর তত প্রচুর দেখা যায় না।

## মঠ, মন্দির ইত্যাদি

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে রেনেলের মানচিত্রে যে যে প্রাচীন মন্দিরাদির পরিচয় আছে, এস্থলে তাহা উল্লেখ করা হইল।

১। খাগটীয়া একটী মঠের চিত্র।

২। রাজনগর দুইটী মঠের ও একটি জলাশয়ের চিত্র। সম্ভবতঃ সতর-রত্ন ও একুশরত্ন এবং রাজসাগরের চিত্র দেখান হইয়াছে।

৩। জপসা একটী মঠের চিত্র, কেবলমাত্র এই মঠের পার্শ্বে লেখা রহিয়াছে* এই মন্দির পদ্মা ও মেঘনা হইতে দেখা যায়। যাবতীয় মন্দির মধ্যে এইটী উচ্চঃ ছিল, অনুমান হয়।

৪। বেলাসান একটী মঠ (ইদিলপুরের দিকে)

৫। বাদরাসন একটী মঠ (ঐ)

৬। টেঙ্গারামারীর নিকটবর্ত্তী মস্‌জীদ।

দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এক সময়ে যেটুকু রেনেলের ম্যাপ হইতে প্রয়োজন বোধে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহাই এস্থানে উল্লেখ করা হইল, ফরিদপুরের অন্তর্গত অপর স্থানে যে দুই চারিটী প্রাচীন কীর্ত্তি ছিল, তাহা আর উহা হইতে লিখিয়া রাখা হয় নাই। রেনেলের সময়ে দক্ষিণবিক্রমপুর মধ্যে, সোমকোট, গোবিন্দমঙ্গল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রামের অস্তিত্ব থাকা অবগত হওয়া যায়, কিন্তু কোন মন্দিরের চিহ্ন দেখা যায় না। ঢোলসমুদ্র নামে একটি জলাশয়ের চিত্র দেখা যায়, যাহা রাজসাগর অপেক্ষাও বড় ছিল। উহা ফুলবাড়ীয়া গ্রামের নিকটবর্ত্তী বিধায়, চাঁদ ও কেদার রায়ের কীর্ত্তি বলিয়াই অনুমিত হয়। উল্লিখিত কীর্ত্তিগুলি এক্ষণে নদী কর্তৃক বিলুপ্ত হইয়াছে।

## জাতি ও ধর্ম্ম

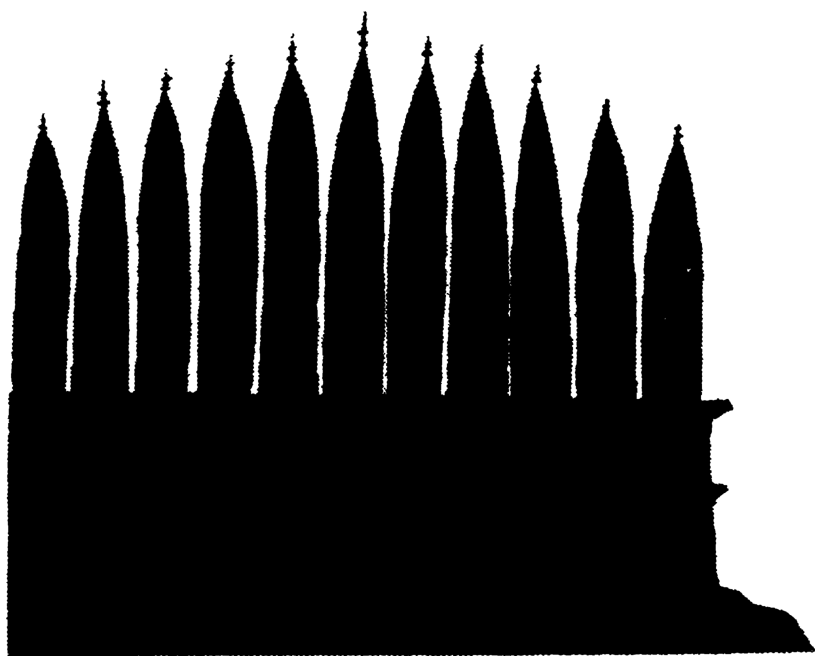
এই জেলা হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান, এই চারি জাতির বাসস্থান। হিন্দুর সংখ্যা ৭৩৩৫৫৫। তন্মধ্যে পুরুষ ৩৬০০১২; স্ত্রী ৩৭৩৫৪৩। ব্রাহ্ম মোট ৮৩; তন্মধ্যে পুরুষ ৪০ ও স্ত্রী ৪৩। জৈন পুরুষ ৫ জন মাত্র। বৌদ্ধ ১০ জন মাত্র। মুসলমান মোট সংখ্যা ১১৯৯৩৫১ জন, তন্মধ্যে পুরুষ ৬০৭৬৮৮ ও স্ত্রী ৫৯১৬৬৩। খ্রীষ্টান ৩৬৫৭ জন। হিন্দু-শ্রেণী নানা ভাগে বিভক্ত—ফরিদপুর জেলায় ঠাকুর উপাধি ব্রাহ্মণও বাস করিতেছেন। ১৮৫৭ সনে প্রথমতঃ এই স্থানে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয়। হিন্দুদের নানারূপ দেবদেবী বিভিন্ন স্থানে সংস্থাপিত আছেন। এতদ্ভিন্ন বহু বৃক্ষ দেবাধিষ্ঠান বলিয়া পূজিত হয়।

"Japsa the Pagoda seen in both rivers."

মুসলমান-সম্প্রদায় মধ্যে ফরাজি বলিয়া এক সম্প্রদায় নূতন গঠিত হইয়াছে, স্থানান্তরে তাহাদের বৃত্তান্ত বিবৃত হইবে। অধিকাংশ নিম্নশ্রেণী হিন্দু বিশেষ নমঃশূদ্র-সম্প্রদায় হইতেই দেশীয় খ্রীষ্টানদলের উৎপত্তি। হিন্দুসমাজে নিতান্ত হেয়ভাবে আছে বলিয়া তাহারা স্বীয় পদমর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য এইরূপ জাত্যন্তর পরিগ্রহ করিয়াছে। ব্রাহ্ম হিন্দুর এক বিশেষ উন্নত শাখা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কালে উভয় আবার এক হইয়া যাইবে।

এই জেলায় হিন্দুদের মধ্যে নিম্নলিখিত শ্রেণী বিভাগ দৃষ্ট হয়।

১। ব্রাহ্মণ
২। ক্ষত্রিয়
৩। বৈদ্য
৪। কায়স্থ
৫। ছত্রী
৬। গন্ধ বণিক
৭। কামার
৮। কুমার
৯। আগরওয়ালা
১০। আগুরি
১১। তাম্বুলী
১২। সদগোপ
১৩। শূদ্র
১৪। কুরমী
১৫। তিলি
১৬। মালী
১৭। কাঁসারি
১৮। শাঁখারী
১৯। নাপীত
২০। বৈষ্ণব
২১। বারই
২২। কৈবর্ত্ত
২৩। গাররী
২৪। মদক
২৫। গোপ বা গয়লা
২৬। সুবর্ণ বণিক
২৭। সেকরা
২৮। সূত্রধর
২৯। সাহা
৩০। পাইটাটী
৩১। কলু
৩২। তাঁতি
৩৩। জুগী
৩৪। চুনারী
৩৫। পাইটাল
৩৬। জেলে
৩৭। কাড়াল
৩৮। কারলী
৩৯। মাল
৪০। মাঝী
৪১। পোদ
৪২। টীয়র
৪৩। পুবর
৪৪। বাইয়তী
৪৫। বেহারা
৪৬। ধানুক
৪৭। বাগদী
৪৮। পাটনী
৪৯। কোয়রী
৫০। চাষা
৫১। ধোপা
৫২। কাচুরী
৫৩। নমঃশূদ্র
৫৪। কাপালী
৫৫। বাউতী
৫৬। কাহার
৫৭। মুচি
৫৮। পালী
৫৯। বিন্দ
৬০। চেল
৬১। ডোম
৬২। দোসাদ
৬৩। কারাঙ্গী
৬৪। রাজবংশী
৬৫। মালো
৬৬। হাড়ী
৬৭। কাওলি
৬৮। ভূঁইয়ালী
৬৯। মিহাটার
৭০। বুনা
৭১। নর বা নট্ট



রাজনগরের একুশ রত্ন

নলীয়ার হরি, মুকডোবার বাসুদেব, তালমার অন্তর্গত দুলারভাঙ্গার কুশলনাথ শিবনাথ একটী বৃক্ষ; বেলগাছি ষ্টেশনের অন্তর্গত সাওতাপুরের বৃক্ষপুষ্করিণীসমন্বিত শিব (রাজ রাজেশ্বর), মাদারীপুরের বলরাম, রাজনগর (অধুনা পালঙ্গের) রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ, জপসা (অধুনা নগরের) অভয়া, ধানুকার শ্যামা ও খান্দারপারের কালী বুড়োঠাকুর শিব, ঘাগরের (হিরণ ও পশ্চিমপাড়ার) শিব জাগ্রত বলিয়া প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন সর্ব্বাপেক্ষা জাগ্রত ও পিঠস্থান তুল্য মাঐসারের দিগম্বরীতলা অর্থাৎ অশ্বত্থ তল। স্থানান্তরের ইহার বিবরণ বিবৃত হইবে। জপসার প্রস্তর-নির্ম্মিত শিব সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সুদর্শনীয় দেব প্রতিমূর্ত্তি। এতদ্ভিন্ন বেলগাছি ষ্টেশনের নিকট হারোয়া গ্রামের মদনমোহনের মন্দির। বেলগাছীয়া পরগণা পূর্ব্বে নাটোর রাজ ষ্টেটের অন্তর্গত ছিল। ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন, উক্ত মন্দির এবং বিগ্রহ নাটোর রাজবংশেরই একটী কীর্ত্তি। এই মন্দিরাধিষ্টিত "মদনমোহন" অতি সুন্দর দ্বিভূজ মূর্ত্তি, প্রস্তর নির্ম্মিত ১৷. হাত উচ্চ। মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রচুর দেবোত্তর ভূমি প্রদত্ত হইয়াছে।

বেলগাছিতে প্রতিষ্ঠিত চৈতন্য দেবের মন্দির অতি প্রাচীন। কেহ কেহ বলেন, ইহা শ্রীচৈতন্য দেবের সমসাময়িক। মহাপ্রভুর মূর্ত্তি নিম্বকাষ্ঠের নির্ম্মিত। মন্দিরের গায়ে নানাবিধ প্রতিমূর্ত্তি খোদিত আছে।

নগর পাংশা ষ্টেশনের অধীন মাদাপুর গ্রাম অতি প্রাচীন; এই গ্রামে দুইটী বট বৃক্ষের নীচে লোকেরা বহুকাল যাবৎ পূজা দিয়া আসিতেছে; বৃক্ষের তলদেশে একটী ইষ্টক-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

পাংশা মাধবপুরে সাজি নামে একদরবেশ ফকিরের কবর আছে। এখানে বহুকাল যাবৎ হিন্দু ও মুসলমানগণ সিন্নি দিয়া থাকে।

যে ত্রিনাথের মেলা পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় সমুদয় স্থানে ব্যাপ্ত হইয়াছে, উহার প্রথম ফরিদপুরের অন্তর্গত পালঙ্গ ষ্টেশনের অধীন নবীপুর গ্রামে উদ্ভব হয়। অধুনা এই স্থান কীর্ত্তিনাশার গর্ভস্থ হইয়াছে।

সাতৈর, খাবাসপুর, কার্ত্তিকপুরে, প্রাচীন মুকসুদপুরের অন্তর্গত দিগনগরে প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে দেওয়ান সাহাওয়াজ দ্বারা নির্ম্মিত এবং শাতরাইলে ও গেরদায় প্রাচীন মসজিদ আছে। এতদ্ভিন্ন মাদারীপুর ও ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানে নূতন মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছে।

ফরিদপুর নগরীতে ব্রাহ্মদের একটা মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

ফরিদপুর, কোটালীপাড়া ও গোপালগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে খ্রীষ্টিয়ানদের ধর্ম্মালোচনার ঘর নির্ম্মিত আছে।

ভাঙ্গা কুমারনদীতটে, চাউল, ধান্য, লবণ, খেসারী, সরিসার বাণিজ্যস্থান। বরমগঞ্জ আরিয়লখাঁ তীরে, গোপালগঞ্জ মধুমতী তীরে, চাউল, পাট, লবণ, ঘৃত, মাদুর; বোয়ালমারী ও সৈদপুর বারাসীয়া তীরে, দেশীতামাকে, কাপড়, তুলা, লৌহ ও পিত্তল, কাঁসার জিনিষ; মধুখালী চন্দনা তীরে তামাক, লবণ; কামারখালী চন্দনা তীরে, চাউল, সরিসা, খেসারী; জামালপুর চন্দনাতীরে, তামাক; সেলিমাপুর, ধুলটী, আমবাড়ীয়া, পাঁচরিয়া; কানাইপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বহু পরিমাণে বাণিজ্য দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় হয়। ফরিদপুর গুড়ের ও দেশী কাপড়ের জন্য; পাংশা ও বেলগাছী দেশী কাপড়, গামছা, ছিট প্রভৃতির জন্য প্রসিদ্ধ। গোয়ালন্দ পূর্ব্ববঙ্গের বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থান, নানা স্থান হইতেই ষ্টীমার ও নৌকাযোগে নানাবিধ জিনিস এখানে উপস্থিত হইয়া বহুদূরদূরান্তরে প্রেরিত হইয়া থাকে।

মাদারীপুর, কুমারতীরে, পাট, গুড়, তৈল প্রচুর প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশেষ এই স্থানে এবং আঙ্গারিয়া, টেকেরহাট, পালং ও মসুরা প্রভৃতি স্থানে বিস্তর পাটের আমদানী হইয়া কলিকাতায় প্রেরিত হয়। আঙ্গারিয়ার, টেকেরহাট ও বুড়ীর হাটে ইক্ষুগুড় প্রচুর বিক্রয় হয়, পালঙ্গে পিতলকাঁসার বাসনের বিস্তর কারবার। এতদ্ভিন্ন, গোয়ালা, ফতেপুর, ফাঁসিয়াতলা, মুকসূদপুর, খাজুরতলা, জলিরহাট, গাবতলী, খান্দারপাড়, শ্রীপুর, টেকেরহাট, বাতেবাইল. ভেড়ারহাট, বাতাডাঙ্গা, গোবিন্দপুর, জয়নগর, টেঙ্গরাখোলা, ফতেপুর, ব্রাহ্মণদি, আমডউম্বা, তাড়াইল, চাঁদেরহাট, বাউসখালী, দামোদরদি, আলগি, কাশীয়ানী, উজানী, পুরাপাড়া, কৃষ্ণাইদিয়া, রূপাপাত, ফুলবাড়িয়া, আমগাঁ, বাইটকামারি মহারাজপুর, নগরকান্দা, ফরসী, তালমা, কবিরাজপুর, মহেন্দ্রদি, কালামৃধা, কুলপদী, হবিগঞ্জ, রাজৌর, ভাটীয়াপাড়া, পুকুরিয়া, পোড়াদহ, ডাইলবাজার, টেকেরহাট, আঙ্গারিয়া (রাজগঞ্জ) মনোহর রায়ের বাজার, চিকন্দী, মামুদপুর, গঙ্গানগর, কোঁয়পুর, নৈরা, মূলফৎগঞ্জ, ঘড়িসার, কার্ত্তিকপুর, সেনেরহাট (বোকাইনগর), কাঞ্চনপাড়া, ডামড্ডা, বিঝারী, কালুরগাঁ, গোঁসাইরহাট, হাটরিয়া, টেঙ্গরা, ভেদেরগঞ্জ, ঘাগর, বালীয়াকান্দী, রাজবাড়ী, বাণীবহ, বহরমপুর দক্ষিণবাড়ী, গইয়াতলা, পারকলা, বালিয়াভাঙ্গা, বড়ডুমুরিয়া ও সুয়াগ্রাম প্রভৃতি স্থানে হাট ও বাজার আছে। মসুরা বা ভোজেশ্বর বন্দর ক্রমে বিশেষ উন্নতিলাভ করিতেছে। এতদ্ভিন্ন চৈত্র সংক্রান্তি ও বৈশাখ মাসের প্রথম দিবস নানাস্থানে ১ দিবস ব্যাপী মেলা বা গলৈয়া বসিয়া থাকে। বৃহৎ মেলা যে সকল স্থানে হয়, তাহা পরে উল্লেখ করা যাইবে।

পালং ষ্টেশনের অন্তর্গত নিম্ন শ্রেণীর কায়স্থ, পরিচিত শূদ্রগণ, কাঁসারীদের এবং কুম্ভকারগণের হাঁড়ি পাতিলের পাইকারী দ্বারা বিশেষ অবস্থার উন্নতি করিয়াছে। উহারা মাল বোঝাই করিয়া বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ জেলার নানা স্থানে উপস্থিত হইয়া পিত্তল ও কাঁসার জিনিস বিক্রয় করিয়া থাকে এবং হাঁড়ি, পাতিলের বিনিময়ে ধান্য গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহারা স্বহস্তে দাঁড় ও লগি ধরিয়া এবং মাথায় বোঝা

লইয়া যেরূপ অধ্যবসায় সহকারে কারবার চালাইয়া থাকে, তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের বিষয়। এই সকল পাইকারগণের মধ্যে আজকাল অনেকে বিশ ত্রিশ সহস্র টাকা সঞ্চয় করিয়াছে। এদিকে কাঁসারী ও কুম্ভকারগণও বিস্তর অর্থলভ্য করিয়া কেহ কেহ লক্ষপতি পর্য্যন্ত হইয়াছে। এই শূদ্র-সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্তে অধুনা প্রায় সকল নিম্নশ্রেণীর হিন্দুই এই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে, বহু মুসলমান হাঁড়িপাতিলের ব্যবসায় ধরিয়া তদবিনিময়ে ধান্য সংগ্রহ করিতেছে। এই শূদ্রজাতির বহু লোক পাঠা ক্রয়-বিক্রয় ও মদের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অর্থশালী হইয়া, উৎকৃষ্ট কায়স্থদের সহিত আদান প্রদান করিতে পর্য্যন্ত সমর্থ হইয়াছে। বাস্তবিক "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" এই কথার স্বার্থকতা কতকটা ইহারা যথার্থরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছে।

তিলি ও সাহাগণ ও জেলার প্রধান ব্যবসায়ী ও ধনী, তাঁহাদের তেঁজারতি বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত; ব্যবসায়ে অর্থশালী হইয়া অনেকেই লক্ষপতি হইয়াছেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ রায়বাহাদুর উপাধি পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছেন। তৎপর কাঁসারী, সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক মধ্যেও ব্যবসায়ে অনেকে বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন নবশাক মাত্রেই স্বস্ব ব্যবসায় দ্বারা সুখস্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ভদ্রকায়স্থগণ মধ্যে অনেকেই নিঃস্ব। তাহাদের অধিকাংশের চাকুরির উপর নির্ভর। সেই নির্দ্দিষ্ট বেতনে অনেক পরিবারের চলিয়া উঠা দুঃসাধ্য। যাহারা সামান্য বিষয় সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন, তাঁহারা অধিকাংশে ঋণ দায়ে আবদ্ধ। দুর্ভিক্ষ সময়ে এই তিন শ্রেণীর মধ্যে অনেককে যেরূপ কষ্ট পাইতে হয়, এমত আর কোন শ্রেণীতে নয়, কারণ ইঁহারা প্রাণান্তে অন্যের নিকট প্রার্থী হইতে চান না।

## শস্য

বিলপ্রধান স্থানে ধানের চাষ অধিক হয়, অপেক্ষাকৃত উচ্চস্থানে, পাট জন্মিয়া থাকে। তিল, সরিসা, মটর, খেসারী, কলাই, মুসূরী, ইক্ষু, তরমুজ, ফুটী, খিরই, শশা, নারিকেল, গুবাক, খেজুর, তাল, আম, কাঁটাল এই জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জন্মিয়া থাকে।

যেক্ষেত্রে যত জল অধিক হয়, ধান্যের ডাট তত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ২৮ ফিট গভীর জলে পর্য্যন্ত ধান্য জন্মে। নিম্নে কয়েক প্রকার ধান্যের নাম প্রদত্ত হইল।

১. বাঘা, ২. লেপা, ৩. মহিষকান্দী, ৪. বালিয়াবেত, ৫. বানসামর্থ, ৬. লক্ষীদীঘা, ৭. দাদকালায়, ৮. লক্ষ্মীকাজা, ৯. ললজ, ১০. রাঙ্গীললজ, ১১. ঝুল, ১২. ধুলাই, ১৩. বাগবাই, ১৪. দল কচু, ১৫. গিলা সইতা, ১৬. গেবরুয়া, ১৭. ভোজন কর্পূর, ১৮. বয়রা, ১৯. কালাপুরা, ২০. গন্ধকস্তুরি, ২১. পিটীরাজ (পাতিবাজ), ২২. মাইচাল, ২৩. কাঁচাকলঙ্গা, ২৪. বড় দিঘা, ২৫. বোর, ২৬. ষাইঠা শ্রীবইলাম, ২৭ বাগুনবিচি, ২৮. রাজা, ২৯. মোড়ল, ৩০. হইলনে, ৩১. কালামাণিক, ৩২. গরেশ্বর, ৩৩. খইয়া মটর, ৩৪. গৃইরাকাজলা। মাদারীপুরের নিকটবর্ত্তী বিশেষ পালং ষ্টেশনের স্থানসমূহে দেশী চাউলের আমদানী অত্যন্ত কম। বাখরগঞ্জের বালামই প্রধান অবলম্বন, তবে অধুনা

ব্রহ্মদেশের আতপ চাউলের আমদানী এখানেও প্রচুর হইতেছে। এই আতপ চাউলের আমদানী নিবন্ধন এদেশবাসী এই প্রবল দুর্ম্মূল্যের সময়ে, প্রাণ বাঁচাইতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু অচিরাৎ যদ্যপি চাউলের মূল্য কোন ক্রমে হ্রাস না পায়, তবে নিশ্চয় অনশনে বহু লোক প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে।

পাটের চাষ বৃদ্ধির সহিত ধান্যের চাষ ক্রমশঃই লয় পাইতেছে। পাটে প্রচুর লাভ পাইয়া মুসলমান ও নমঃশূদ্র সম্প্রদায় বিশেষ উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশের অবস্থা ভাল। প্রত্যেকেই টিনের ঘরের ব্যবস্থা করিয়া ও গয়না তৈয়ার করিয়া আপনার উন্নত অবস্থার পরিচয় প্রদান করিতেছে। যাহার জমিজমা নাই কেবল তাহারাই মোট বহিয়া ও কৃষাণেব কার্য্য করিয়া দিনপাত করে। চাউলের মূল্য বৃদ্ধিসহ তাহাদের মজুরিও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে পাটের দর ন্যূন হওয়ায় অনেক মহাজনের ক্ষতি হইয়াছে বটে, কিন্তু চাষীরা তাহা অদ্যাপি অনুভব করিতে সমর্থ হয় নাই। কারণ অধিকাংশ চাষী তাহাদের পাট পূর্ব্বেই মহাজনগণের নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে, যাহারা অধিক লাভের আশায় সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে, তাহারাই বিপন্ন।

বাস্তবিক পাটের বাজার যদি ক্রমশঃ এইরূপ দুই তিন বৎসর দাঁড়ায়, তবে আর পাট বুনিতে কেহ সাহস পাইবে না। কারণ ধান্য ২/৩ বৎসর গোলাযাত করিয়া রাখা যায়, কিন্তু পাট বৎসরের অধিক থাকিলেই নষ্ট হইতে থাকে, কাজেই মূল্য কমিয়া যায়। পুরান চাউলের দাম বরং অধিক হয়। ক্ষণিক লাভাশয়ে যাহারা ধান্য পরিত্যাগ করিয়া এইরূপ পাটের চাষ করিতেছে, তাহারাই দেশের ধান্য, চাউল দুর্ম্মুল্য হওয়ার প্রধান পথপ্রদর্শক বা সাধারণের শত্রু। ফরিদপুর জেলায় পাটের চাষ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়া ধান্যের চাষ কমিয়া পড়িতেছে। অন্ততঃ ধান্য ও পাট সমভাবে বপন না করিলে, দারুণ দুর্ম্মূল্যের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইবার আর উপায় নাই। স্বদেশসেবীগণের এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

অধুনা স্বদেশ বস্ত্রের আমদানী ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে; ইহাতে তাঁতি, জুগী, জোলা (কারিকর) দের অবস্থার বহু পরিবর্ত্তন দেখা যায়। কিন্তু মিলের ব্যবস্থা না হইলে, হাতে খাটিয়া প্রতিযোগিতা রক্ষার সম্ভাবনা নাই। স্বদেশী ধনীগণ কোম্পানীর প্রথাগত এই ব্যবসায়ের জন্য সেয়ার খুলিলে, দেশের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে এবং উহাতেই তাঁতি, জুগী প্রভৃতি ও বহু দেশীয় দরিদ্র প্রতিপালিত হইতে পারে। কার্পাস বৃক্ষের বৃদ্ধি না করিতে পারিলে, কাপড়ের ব্যবসায়ের উন্নতির সম্ভাবনা নাই, যাহাতে ভাল বীজ বপন করিয়া উৎকৃষ্ট কার্পাস জন্মিতে পারে, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আমাদের দেশে পূর্ব্বে নবশাখগণই নানারূপ ব্যবসায় চালাইত। কিন্তু অধুনা ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থগণও ব্যবসায় করিতে লজ্জাবোধ করেন না। দেশের পক্ষে এটী শুভ লক্ষণ। কিন্তু অনেকেরই অর্থ সংস্থাপন নাই, দশজনে মিলিয়া কার্য্য চালাইবার প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু সাধুতাই উহার প্রধান অবলম্বন। যতদিন আমরা মন খাঁটী করিয়া এইরূপ সাধুতা রক্ষা করিয়া দশজনের কার্য্য একজনে সম্পন্ন না করিতে পারিব, ততদিন আমাদের উন্নতির কোন আশা নাই। মোসলমানদের মধ্যে বহুকাল যাবত বাণিজ্য করিবার প্রথা থাকিলেও অতি অল্প লোকই তাহা করিয়া থাকে। চাষই

অধিকাংশের জীবিকা।

নিম্নশ্রেণীর মোসলমান ও হিন্দুগণের মধ্যে অনেকে নৌকার মাঝিগিরি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ঝালো ও কৈবর্ত্তগণ এই কার্য্যে বিশেষ পটু। মেঘনা, পদ্মা প্রভৃতি প্রবল স্রোতস্বতীর বীচিমালা উল্লঙ্ঘন করিয়া উহারা অনায়াসে পারাপার হইয়া থাকে। কিন্তু নৌবিভাগের নূতন কোন উন্নতির আমাদের দেশে কেহ উদ্ভব করিতে সমর্থ হইতেছেন না। এবিষয়ে মস্তিষ্ক পরিচালনা করা কর্ত্তব্য।

বাদিয়া সম্প্রদায় অধুনা মোসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। ইহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট বাড়ী ঘর নাই। কেবল নৌকাযোগে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়, স্ত্রী পুরুষে সমভাবে নৌকা চালাইয়া ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে। নানাবিধ মনোহারি জিনিষ বিক্রয় করাই ইহাদের কার্য্য, হাটে বাজারে ভিন্ন গ্রামে গিয়াও ইহারা ফিরিওয়ালার ন্যায় সাধারণের নিকট মনোহারি দ্রব্য উপস্থিত করিয়া বিক্রয় করে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ মৎস্য বিক্রয় করিয়াও থাকে। বাস্তবিক ইহারা আমাদের দেশের মধ্য শ্রেণীর ব্যবসায়ী। কিন্তু এই দলের কোন কোন শাখা চুরি ডাকাইতি করে বলিয়া, পুলিশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সর্ব্বদাই তাহাদের প্রতি রহিয়াছে। স্বদেশীর প্রতি ইহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিলে বিশেষ উপকার সাধিত হইতে পারে।

আমরা একটী উৎকৃষ্ট শিল্পের বিষয় উল্লেখ করি নাই— উহা সাতৈরের শীতল পাটী। ছয় ফুট লম্বা ও ৪ ফুট প্রস্থে একটী পাটীর মূল্য ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে ১৫০ টাকা পর্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। (মিঃ হুইলের রিপোর্ট দেখ)। এই শিল্পের কতকটা অবনতি ঘটিয়াছে।

এক সময়ে ফতোয়াবাদের স্থপতিকুল বাঙ্গালার নানা স্থানে মঠ ও অট্টালিকা ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিত। জপসাবাসী কায়স্থ জাতীয় রাজমিস্ত্রী-গণ এ বিষয়ে বিশেষ পটু ছিল। ফতোয়াবাদের কারিকরদিগের নিকট এই রাজাদের পূর্ব্বপুরুষ শান্তিরাম দে শিক্ষা লাভ করে।

বর্ত্তমান সময়ে যে সকল শিল্পের উন্নতি হইয়াছে, আমরা পরে তাহা উল্লেখ করিব।

# ফরিদপুরের প্রাকৃতিক বিবরণ

তিনটী জেলার আংশিক সমবায়ে ফরিদপুর জেলার পূর্ণ বিকাশ। তন্মধ্যে ১ম ঢাকা, ২য় যশোহর, ৩য় বাখরগঞ্জ। প্রাচীনত্ব হিসাবে ঢাকার অংশই শ্রেষ্ঠ; অতএব উহার বিবরণই প্রথম উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। ঢাকা জেলা হইতে যে সকল স্থান বিচ্ছিন্ন হইয়া ফরিদপুরান্তর্গত হইয়াছে, তন্মধ্যে বিক্রমপুরের দক্ষিণাংশ অতি প্রাচীন স্থান। এতৎসম্বন্ধে জানা যায় যে, ঐ ভূভাগ পূর্ব্বে সমতট বঙ্গের অন্তর্গত ছিল; পরে রাজা বিক্রমাদিত্য কতক কাল ঢাকার দক্ষিণাংশে অবস্থান করায় ঐ অংশ বিক্রমপুর আখ্যা প্রাপ্ত হয়।[১] কেহ কেহ বলেন যে, বিক্রমশালী সেন রাজগণই তাঁহাদের প্রিয় নিকেতনটীকে "বিক্রমপুর" নাম প্রদান করেন। যাহা হউক "বিক্রমপুর" নাম যত দিবসেরই হউক না কেন, সমতট বঙ্গের অন্তর্গত থাকায়, উহা যে খ্রীষ্টীয় আব্দরম্ভের পূর্ব্বেই স্থলভাগে পরিণত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অতঃপর যশোহর হইতে যে ভূভাগ বিচ্ছিন্ন হইয়া ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তাহাও কম প্রাচীন নয়। ভূষণা ও ফতেয়াবাদের বিবরণ আমরা মোগল রাজত্বের পূর্ব্ব হইতেই প্রাপ্ত হই। আকবরনামা ও আইন-ই-আকবরিতে ফতেয়াবাদের নাম উল্লেখ আছে।[২] তবে ঐ ভূভাগ কত কালের, তাহা স্পষ্ট অনুমান করা যায় না। কোটালীপাড়ার অন্তর্গত পিঞ্জরী এবং ইদিলপুরের অন্তর্গত সামন্তসার গ্রামের পরিচয় সেনরাজগণের সময় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাতে অনুমান হয় যে, ফতেয়াবাদ বিভাগ ও তন্নিকটস্থ কতক স্থান অন্ততঃ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নিশ্চয় স্থল ভাগে পরিণত হইয়াছিল।

"সমতট বঙ্গের নিম্ন দিয়া পূর্ব্বে-সাগর-স্রোত প্রবাহিত হইত, ক্রমে চড়া পড়িয়া উহা বহুশত ক্রোশ পর্য্যন্ত ভূভাগরূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু সম্যকরূপে উহার জল নিঃসরণ না হওয়ায়, কোথাও বা হ্রদাকারে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। এ সকল হ্রদ সাধারণতঃ "বিল" নামে অভিহিত। এইরূপ বহু বিলের সমষ্টিতে ফতেয়াবাদ বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। আরিয়াল খাঁ নদীর পশ্চিমপ্রান্ত হইতে মধুমতী নদীর পূর্ব্বতট পর্যন্ত যে কোন স্থানে খাল বা পুষ্করিণী খনন করা যায়, সেই স্থানের মৃত্তিকার কিছু নিম্নেই একটা কাল স্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে; ভীট দাম পচিয়া যেরূপ মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়, উহা সাধারণতঃ, ঠিক তদনুরূপ। এজন্য বোধ হয়, বিস্তৃত বিলের উপর যে সকল ভীট দাম ছিল, কালক্রমে উহাই পচিয়া এইরূপে মৃত্তিকা-রাশির সৃষ্টি হইয়াছে এবং উহাতে ক্রমে স্থলভাগের উদ্ভব হইয়া থাকিবে। এইরূপ বহু বিলের বিলয়ে ফতেয়াবাদ বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। ফতেয়াবাদের অধিকাংশ অধুনা ফরিদপুর বিভাগের অন্তর্গত। বোধ হয়, ফরিদপুর পূর্ব্বে এই ফতেয়াবাদের অন্তর্গত ছিল।"[৩]

১। হন্টার প্রণীত স্টেটেসটিকাল একাউন্ট অব ঢাকা, ৭০ পৃষ্ঠা।

২। ইলিয়টঃ হিষ্টরী অব ইণ্ডিয়া, ৬৭ পৃষ্ঠা এবং আকবরনামা ৫ম ভাগ, ৪২৭ পৃষ্ঠা।

৩। ১৫৮২ খ্রীঃ অব্দে আকবর বাদসাহের শাসন সময়ে সমস্ত বাঙ্গালা দেশ ৩৩টী সরকারে বিভক্ত হয়। ফরিদপুর মহম্মদ আবুদের সরকারের অন্তর্গত ছিল বলিয়া বোধ হয়। হন্টার, স্টেটেসটিক্যাল একাউন্ট অব ফরিদপুর, ২৫৬ পৃষ্ঠা।

"প্রবাদ আছে, পূর্ব্বে এই স্থান বহু জলা ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ থাকায়, কেহই আবাদ করিয়া উঠিতে পারে নাই। পরে ফতে আলি নামে এক মুসলমান বহু আয়াসে, এই স্থানে মনুষ্য-বাসোপযোগী করিয়া উঠাইলে, উহার নাম হয়, ফতেয়াবাদ।"

পরে বাখরগঞ্জ জেলা হইতে যে স্থানগুলি খারিজ হইয়া ফরিদপুরের অন্তর্গত হইয়াছে, উহার ঐতিহাসিক তত্ত্বও ঐরূপ। কারণ বাখরগঞ্জের অধিকাংশ স্থান পূর্ব্বে সাগরজলে নিমজ্জিত ছিল, পরে ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা কর্ত্তৃক উচ্চ ভূপৃষ্ঠ হইতে পঙ্কিল মৃত্তিকা ও প্রস্তররাশি বিধৌত হইয়া স্রোতোবেগে যেস্থানে আসিয়া কতকটা স্থির হইয়া থাকিতে পারিয়াছে, তাহায়ই চড়া বা দ্বীপবৎ স্থানের সৃষ্টি হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালার "দ্বীপ" "ডাঙ্গা" "কূল" প্রভৃতি যে সকল স্থানের সহিত সংযোগে দেখা যায়, তাহাদের উদ্ভব, প্রায়ই এইরূপ উপায়ে, সংঘটিত হইয়াছে।

আবার ভূকম্প বা অত্যধিক জলপ্লাবন দ্বারাও অনেকরূপ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। উহাতে কোন স্থানের অধঃপতন ও কোন স্থানের উন্নয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্ত্তী "ব" দ্বীপবৎ ভূভাগে নদীর বিপর্য্যয়ে সময় সময় নানারূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। সমুদ্রোপকূলেই সাধারণতঃ ঘন ঘন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়।

পূর্ব্ব-দক্ষিণ বঙ্গের নিকট মহাসমুদ্র থাকায় অনেক বড় নদী উহার বক্ষঃভেদ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এজন্য বন্যাদি দ্বারা সমুদ্রজল-বৃদ্ধির সহিত ও নদীর গতি পরিবর্ত্তন সহকারে ও ভূভাগের বিপর্য্যয় প্রত্যেক শতাব্দীতে কিছু না কিছু অবশ্যই হইয়া থাকে। পদ্মার তীরস্থ স্থানগুলির প্রতি দৃষ্টি করিলেই ইহা পরিলক্ষিত হয়। চাঁদ রায় ও কেদার রায় যখন বিক্রমপুর শাসন করিতেন, তখন উহা কতকগুলি দ্বীপসমষ্টি ছিল মাত্র।[৪] কোন বৃহৎ নদী বিক্রমপুরের মধ্যে ছিল না, এখন কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা এস্থলে নদীর গতির পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ প্রদান করিলাম।

প্রবাদ অনুসারে জানা যায়, পদ্মানদী ফরিদপুরের ২৫ মাইল উত্তরে "সেলিমপুর" গ্রামের দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া কানাইপুরের নিকট দিয়া পূর্ব্বমুখে প্রবাহিত হইত। পরে ফরিদপুরের নিম্নস্থ ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী সহ সম্মিলিত হইয়াছিল, পরিণামে ঐ ক্ষুদ্র নদীই প্রবল পদ্মারূপে পরিণত হইয়া উহার পূর্ব্বতন প্রবল খাতটীকে মরা-পদ্মারূপে পরিচিত করিয়াছে। ৬০/৭০ বৎসর গত হইল মধুখালি বন্দরটী চন্দনা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ছিল। ক্রমে নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া বন্দরের দক্ষিণ দিক্ দিয়া প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইলে, বন্দরটী আবার উঠিয়া নদীর দক্ষিণ পারে সংস্থাপিত হয়।

৪৮/৪৯ বৎসর পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠপুর চন্দনা নদীর উত্তর পারে অবস্থিত ছিল। কিন্তু নদীর গতি পরিবর্ত্তন হইয়া এখন ঐ গ্রাম নদীর দক্ষিণ পার হইয়া পড়িয়াছে।

পদ্মার পরিবর্ত্তন সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক সংঘটিত হইয়া থাকে। অতি পূর্ব্বকালে পদ্মা নদীর মোহনা ঘুরিয়া ফিরিয়া নানা স্থান অতিক্রম করতঃ মেঘনার সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। মিঃ রেনেল ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গের যে মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যায়, পদ্মা বিক্রমপুরের বহু পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া, ভুবনেশ্বর

৪। হার্টন, রেইলি র‍্যালফ ফিচ, ১১৮-১১৯ পৃষ্ঠা।

নামক একটী নদীর সহিত মিলিত হইয়া বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত মেহেদিগঞ্জ থানার মধ্য দিয়া মেঘনার সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। এখন ভুবনেশ্বর সম্পূর্ণ স্বীয় অস্তিত্ব হারাইয়া "আরিয়াল খাঁ" নাম ধারণ করিয়াছে। সাধারণতঃ কন্দর্পপুর মোহনাই পূর্ব্বে পদ্মা ও মেঘনার সম্মিলন স্থান ছিল। তখন "কীর্ত্তিনাশা" বা "নয়াভাঙ্গনী" নামে কোন নদীর পরিচয় ছিল না। বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাজনগর ও ভদ্রেশ্বর গ্রামের মধ্যে একটা অপ্রশস্ত জলপ্রণালী বর্ত্তমান ছিল। উহা প্রাচীন কালীগঙ্গার শেষ চিহ্ন মাত্র। শ্রীপুর, নওপাড়া, ফুলবাড়িয়া মূলফৎগঞ্জ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রাম, কালীগঙ্গার তটেই বিদ্যমান ছিল।* পরে শত বৎসরের মধ্যে কীর্ত্তিনাশা উদ্ভূত হইয়া বিক্রমপুরের মধ্য ভেদ করিয়া এবং নয়াভাঙ্গনী আবির্ভূত হইয়া ইদিলপুরেব প্রান্ত দিয়া পদ্মা ও মেঘনাকে পরস্পর সংযুক্ত করিয়াছে।

মূল কথা, ব্রহ্মপুত্র মেঘনার সহিত মিলিত হইয়া যখন প্রবাহিত হইত, তখন উহার স্রোতবেগ অতি প্রবল থাকায় পদ্মাকে বহু পশ্চিম দিকে রাখিয়াছিল। পরে আবার যখন ব্রহ্মপুত্রের সহিত মেঘনার ততটা সম্বন্ধ রহিল না, ব্রহ্মপুত্র যমুনার সহিত মিলিত হইয়া গোয়ালন্দের নিকট পদ্মার সহিত সম্মিলিত হইল, তখন পদ্মার বেগই প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়া ক্রমে পশ্চিমদিক পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, তাহার ফল স্বরূপই কীর্ত্তিনাশার ও নয়াভাঙ্গনীর উদ্ভব।

পদ্মার গতি পরিবর্ত্তন অতি বিচিত্র। উহার মধ্যে হঠাৎ এমন সকল চর উৎপন্ন হয় যে, কোন ষ্টিমার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে যে জল অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, পর সপ্তাহে আর সে স্থান অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। যে স্থানে পূর্ব্বে অল্প জল বিদ্যমান ছিল, উহাই আবার অত্যন্ত গভীর হইয়া পড়িয়াছে, দেখা যায়। তীরস্থ গ্রামগুলি ভগ্ন করিয়া এমন শ্রীভ্রষ্ট করে যে, বৎসরান্তে গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নদী-তীর হইতে পরিচিত স্থান ঠিক করিয়া লওয়া সুকঠিন হয়।

পদ্মা নদী কোন সময়ে মধুমতী ও হরিণঘাটার সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য, একটী প্রধান শাখা অবলম্বন করিয়াছিল। ইহাতে নদীয়া ও যশোহর জেলার নদীগুলি প্রায়ই বন্ধ হইয়াছে, নৌকাযোগে পূর্ব্বে এই সকল নদী বাহিয়া পশ্চিমবঙ্গে, এমন কি, উত্তর পশ্চিম প্রদেশেও যাতায়াত করা যাইতে পারিত, ষ্টিমার চলাচলেরও বাধা ছিল না। এখন মধুমতী ও হরিণঘাটা অবলম্বনে সুন্দরবনের মধ্য অথবা নিম্ন দিয়া পশ্চিমবঙ্গে যাইতে হয়।

১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে কুষ্টিয়ার নিকট গড়াই নদীর বিস্তারমাত্র ৬০০ শত ফুট ছিল। ১৮৫৪/৫৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন রেভিনিউ আফিসার মিঃ লেম্বারটন কর্ত্তৃক উহার পরিমাপ হয়, তখন ভদ্রখালী হইতে মীরপুর পর্য্যন্ত ইহার প্রসার ১৩২০ ফুট হইয়াছিল। দেখা যায় ২৭ বৎসর মধ্যে উহার শক্তি দ্বিগুণ লাভ করে। এখন আবার গড়াই নদীর উপর দিয়া

হার্টন রেইলী রালফ ফিচ ১১৮-১১৯ পৃষ্ঠা- রালফ ফিচ এই নদীটীকে কেবল মাত্র গঙ্গা বলিয়া যাওয়ায় শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় এটীকে পদ্মা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। বাস্তবিক তাহা নয়। তৎকালে পদ্মা অপেক্ষা বরং মেঘনা নদী শ্রীপুর গ্রামের নিকটবর্ত্তী ছিল। চরকালীগঙ্গা বলিয়া যে মহালের পরিচয় ফরিদপুরের কালেক্টরের তৌজীতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই কালীগঙ্গাভরটী মহাল। কালীগঙ্গার অধিকাংশ এখন কীর্ত্তিনাশার অঙ্কে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

ইষ্টারণ- বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানী কর্ত্তৃক লৌহসেতু নির্ম্মিত হওয়ায়, উহার আকার খর্ব্ব হইয়া আসিতেছে।

পূর্ব্বে গড়াই আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ছিল; পদ্মা হইতে মধুমতী চন্দনা নদী হইয়া যাইতে হইত। এখন গ্রীষ্মকালে চন্দনার মোহনা, একেবারে শুষ্ক হইয়া যায়। চন্দনা গড়াই নদীর ২৬ মাইল নিম্নে পদ্মা হইতে বাহির হইয়াছিল। উভয় নদী প্রায় চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে।

ফরিদপুর জেলার উত্তর পূর্ব্বাংশে যেরূপ নদী কর্ত্তৃক নানাবিধ পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে, পশ্চিম দক্ষিণ-ভাগেও তদনুরূপ বিলের সমষ্টিতে ভিন্ন রূপ দৃশ্য প্রতিফলিত করিয়াছে। জেলার উত্তরাংশ হইতে দক্ষিণাংশ ক্রমশঃই ঢালু হইয়া চলিয়াছে। পরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিলের সমষ্টিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। বিলের অধিকাংশ প্রায় জলপূর্ণ থাকিত, অধুনা অনেকটা উচ্চ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফরিদপুরের নিম্নস্থ ঢোল সমুদ্র একেবারে উচ্চ ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। বিলের মধ্যে দিয়া অসংখ্য খালের চিহ্ন দৃষ্ট হওয়ায় প্রতীত হয় যে, এই সকল খাল দিয়া পূর্ব্বে নদীর জল নিঃসৃত হইত, পরে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে, নদীর গতি ভিন্ন দিকে পরিবর্ত্তিত এবং খালের মোহানাগুলি উচ্চ হওয়ায় নদীর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। বর্ষার সময়ে এই সকল বিলগুলি প্রায় সাগর শাখাতে পরিণত হয়। যে সকল বিলে একেবারেই শস্য অথবা ধাপ থাকে না, প্রবল বাতাসের সময় নৌকা যোগে ঐ সকল স্থান অতিক্রম করিতে বড়ই কষ্ট পাইতে হয়।

# প্রাচীন ইতিহাস

## বিক্রমপুর ও সেন রাজবংশ

যে সুপ্রসিদ্ধ সেনরাজগণ বঙ্গে অবস্থান করিয়া, ভারতের নানাস্থানে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন; যাঁহারা কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ সাগ্নিক বিপ্র আনয়ন করিয়া, বঙ্গে প্রথমতঃ শ্রৌত যজ্ঞকার্য্যের অবতারণা করেন; যাঁহাদের নিকট ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ কুলোৎপন্ন গুণিগণ কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এবং যাহাদের শাসনপ্রভাবে দুষ্ট দমিত ও শিষ্ট পালিত হওয়ায় বঙ্গে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল, সেই রাজাদের বাসস্থান বিক্রমপুরে ছিল। বিক্রমপুরের আলোচনা করিতে হইলে সেন রাজাদিগের কথা প্রথমেই মনে পড়ে। সুতরাং তাঁহাদের বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা পাঠকের বিরক্তিকর হইবে না। অপর চাঁদ রায় কেদার রায়, পরে বিক্রমপুরের আধিপত্য লাভ করিয়া বাদসাহের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিতেও পশ্চাৎপদ হয় নাই; এই কারণে বাদসাহের প্রেরিত সেনাপতি রাজপুত বীর মানসিংহের বিক্রমপুর পর্য্যন্ত আগমন করিতে হইয়াছিল। অতএব এইরূপ প্রসিদ্ধ স্থান সম্বন্ধে কিছু বলিলেও বোধ হয় বঙ্গবাসী মাত্রেই উহা শুনিতে কতকটা ইচ্ছা প্রকাশ করিবেন। আমরা এই সাহসের উপর নির্ভর করিয়া বিক্রমপুরের কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক তথ্য প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বঙ্গদেশের অন্তর্গত বিবিধ প্রদেশের তুলনায় বিক্রমপুর অতি প্রাচীন স্থান। যখন গৌড়, নবদ্বীপ, সোনারগাঁ, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থানগুলির নাম জনগণের শ্রুতিগোচর হয় নাই, তৎপূর্ব্বে বিক্রমপুরের পূর্ণ বিকাশ। ঢাকা, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানগুলি বিক্রমপুরের বহু পরে বিকাশ পাইয়াছে।

নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গোপসাগরের তীরব্যাপী কতকগুলি স্থান "সমতট" নামে বলিয়া পরিচিত ছিল। তখন বিক্রমপুর এই সমতট আখ্যা প্রাপ্ত স্থানের অন্তর্গত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে আমরা সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত যে স্থানগুলি অবলোকন করি, সমতট আখ্যাপ্রাপ্তির সময়ে উহার অধিকাংশ স্থান জলগর্ভ হইতে উত্থিত হয় নাই মিঃ বিভারেজকৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাস পাঠ করিয়া জানা যায় যে, বিক্রমপুরের দক্ষিণ ভাগে বিস্তৃত জলরাশি বর্ত্তমান থাকিয়া দক্ষিণ বঙ্গকে একরূপ নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে দুই একটী দ্বীপবৎ স্থান মাত্র লোকলোচনের আয়ত্ত হইত। এইরূপ চড়া পড়িয়া ইদিলপুর, চন্দ্রদ্বীপ, সাহবাজপুর, হাতিয়া, সন্দ্বীপ প্রভৃতি স্থানের উৎপত্তি হয়। নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থানগুলির উৎপত্তিও পরে হইয়াছে। মিনহাজ-ই-সিরাজ তাঁহার "তবকতই নাসিরি" গ্রন্থে এই সমতটকে কোন স্থানে "সনকট" কোথাও "সকাট" বা "সাকাট" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে প্রথম সমতট নামের উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উত্তরে ব্রহ্মপুত্র বা লৌহিত্য নদ, পূর্ব্বে মেঘনা নদ, দক্ষিণে বঙ্গ অখাত, পশ্চিমে ভাগীরথী, এই চতুঃসীমান্তর্ব্বর্ত্তী স্থান সমতট নামে কথিত হইত।

হিউএন সাহেব সময়ে বঙ্গদেশের যে কয়েকটী বিভাগ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে সমতটের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বৈদ্যবংশীয় রাজা আদিশূর* বিক্রমপুরান্তর্গত রামপাল নামক স্থানে বৃহৎ যজ্ঞের আয়োজন করিয়া, কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। এই সকল বিপ্রেরা যোদ্ধাবেশে আগমন করায়, রাজা বিরক্ত হইয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। কিন্তু বিপ্রগণ বুঝিতে পারিলেন যে, রাজা তাঁহাদের বেশভূষার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বিরক্ত হইয়াছেন, অতএব তাঁহাকে ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব দেখাইবার ব্যপদেশে তাঁহারা মৃত মল্লকাষ্ঠে আশীর্ব্বাদী পুষ্প (যাহা রাজাকে প্রদান করিবার জন্য আনিয়াছিলেন) স্থাপন করিলেন; দেখিতে দেখিতে শুষ্ক কাষ্ঠ পুনরুজ্জীবিত হইয়া, পত্রপুষ্পে পরিশোভিত হইয়া উঠিল। অনুচরেরা রাজাকে এই বিস্ময়কর বিস্ময় অবগত করাইল। আদিশূর তখন স্বীয় অবিমৃষ্যকারিতার জন্য ম্রিয়মাণ হইয়া স্বয়ং অগ্রসর হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে নানারূপ স্তব স্তুতিবাদে সন্তুষ্ট করিলেন। পরে তাঁহাদিগকে রাজভবনে আনিয়া ঈপ্সিত কার্য্যান্তে বহু পরিমাণে ধনরত্ন প্রদান করিলেন।

বিক্রমপুরের পূর্ব্বোত্তর প্রান্তে মেঘনা নদীর পশ্চিম তটে রামপাল নামক গ্রাম অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, উহা ঢাকা জেলার অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জ সাবডিবিসনের অধীন। এই স্থানে প্রায় দুই মাইল দীর্ঘ এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার খাত বর্ত্তমান আছে। কেহ কেহ বলেন যে, রামপাল নামীয় কোন রাজা কর্ত্তৃক এই জলাশয় খনিত হওয়ায়, তাঁহার নামানুসারে স্থানের নাম রামপাল হইয়াছে। এই স্থানে কতকগুলি ইষ্টকস্তূপ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। কতকগুলি দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি এখানে মৃত্তিকা গর্ভে পাওয়া যায়, সেগুলি সম্প্রতি ঢাকা নগরীতে রক্ষিত হইয়াছে। এই সকল কারণে প্রতীতি হয় পূর্ব্বকালে এই স্থানে একজন পরাক্রমশালী রাজার রাজধানী ছিল। আরও প্রবাদ যে, পূর্ব্বে অনেক ইতর লোক বনে কাষ্ঠ কর্ত্তন কবিত গিয়া, কি মাঠে হালচালনকালে এই স্থানে অনেক স্বর্ণ, রৌপ্য ও বহুমূল্য প্রস্তরাদি প্রাপ্ত হইয়াছে। একবার ৮০ হাজার টাকা মূল্যের একখণ্ড হীরক এই স্থানে পাওয়া গিয়াছিল।** সেনরাজগণের সুবিশাল ও পরাক্রান্ত রাজ্য যদিও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের বাসস্থান বর্ত্তমান থাকিয়া আজিও তাহাদের মহৈশ্বর্য্যের ও কীর্ত্তির চূড়ান্ত নিদর্শন লোকপরম্পরায় স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

সেনরাজগণ সম্বন্ধে আজকাল বড়ই গোলযোগ চলিতেছে, পূর্ব্বে তাঁহারা এই দেশে

* অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ।
রাঢ়গৌড়বরেন্দ্রশ্চ বঙ্গদেশস্তথৈবচ॥
এতেষাং নৃপতিশ্চৈব সর্ব্বভূমীশ্বরো যদা।
অমাত্যৈর্বান্ধবৈশ্চৈব মন্ত্রিভির্দ্বিজবৃন্দকৈঃ॥
এতৈঃ সহ মহীপাল একদা স নিজালয়ে।
উপবিষ্টা দ্বিজান্ পৃষ্টঃ ধর্ম্মশাস্ত্র পবায়ণঃ॥
ইতি দেবীবর ঘটককারিকা ২য় সংস্করণ
শব্দকল্পদ্রুম, ৭১২ পৃষ্ঠা।

অথ গৌড়দেশে কেন প্রকারেণ ব্রাহ্মণাগমনং তৎশৃণু। অথ সকলদিগ্দেশীয়রাজমধ্যে কলি-যুগাবতার ইব নিখিল মঙ্গলালয়ঃ শ্রীলশ্রীআদিশূরো নাম রাজাসদ্বৈদ্যকুলোদ্ভবঃ পরমধার্ম্মিক আসীৎ। ইত্যাদি। বারেন্দ্র ঘটক কারিকা ; রামধন তর্কপঞ্চানন মহাশয় অতি প্রাচীন ও প্রামাণ্য কুলজিগ্রন্থ হইতে এই শ্লোকটী এবং অপর একটী শ্লোক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অপর শ্লোকটী পাঠে জানা যায় আদিশূর রাজার কন্যার কূলে বল্লাল সেন জন্মগ্রহণ করেন।

** রামপালের বিবরণ দেখ। Taylor's Topography of Dacca.

বৈদ্য বলিয়াই বিখ্যাত ছিলেন। সম্প্রতি কেহ তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয়, কেহ কেহ বা কায়স্থ প্রমাণ করিতে বিশেষ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। নানাবিধ তাম্রশাসন ও প্রস্তরফলক নিত্য নূতন আবিষ্কৃত হইয়া, তাহার সাক্ষী স্বরূপ আবিভূত হইতেছে। ঐ সকল শাসনে কি ফলকে যে যে শ্লোকাবলী অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহার অর্থ লইয়াও বাদানুবাদ চলিতেছে। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ সকল মূল শাসনপত্র অনেকগুলিই পাওয়া যায় না আবার তাঁহাদের সময় ও বংশাবলী লইয়া অন্য দিকে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়াছে। এ পর্য্যন্ত আমরা শুনিয়া আসিতেছিলাম, বল্লালের অধস্তন সপ্তম কি অষ্টম পুরুষে লক্ষণ বা লাক্ষণীয়া মুসলমান ভয়ে নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া, পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে পলায়ন করেন। কিন্তু সম্প্রতি আবার ইতিহাস পাঠ করিয়া জানিতেছি. মুসলমানগণ বল্লাল পুত্র লক্ষণ সেনের সময়েই বঙ্গ বিজয় করিয়াছিলেন। পলায়িত রাজা প্রথমতঃ পুরুষোত্তমে, তৎক্ষণাৎ তাঁহার জ্ঞাতিদের রাজ্য বিক্রমপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। "১১৮১ শকাব্দে (১৭৬৭ খ্রীঃ) যখন মিনহাজ স্বীয় গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তখন তিনি লিখিয়াছেন যে লক্ষ্মণ সেনের উত্তব পুরুষগণ অদ্যাপি বঙ্গদেশ শাসন করিতেছে। তৎপর "তওয়ারিখ ফিরোজসাহী" লেখক "জুই বারণি" লিখিয়াছেন (১২৬৮ খ্রীঃ) সুলতান "বুলবন" যখন বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তা মুঘিসুদ্দিন তুঘলকের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া জাজনগর (ত্রিপুরা) অভিমুখে যাইতেছিলেন, সেই সময় বঙ্গেশ্বর দনুজ রায় সম্রাটকে যথোচিত সাহায্য করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, লক্ষ্মণ সেন নদীয়া হইতে পালাইলে পরও ৭৫ বৎসর এই রাজ্য তাঁহার উত্তর পুরুষের হস্তগত ছিল।"

নিতান্ত ক্ষোভের বিষয় এই যে, আজকালকার ঐতিহাসিক গবেষণাবুদ্ধির পরিমাণ বুঝিতে আমরা যথার্থই অক্ষম। যে সকল মহাশয়েরা এত পরিশ্রম করিয়া উল্লিখিত কথাগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহাদের তালিকায় বল্লালের অধস্তন অষ্টম পুরুষে মহারাজ লক্ষণসেন দেবের সময় বঙ্গদেশ মুসলমান করকবলিত হইয়াছিল, স্পষ্ট উল্লেখ আছে; আজ কি না তাঁহাদের মতও পরিবর্ত্তিত হইয়া বল্লাল পুত্র লক্ষণের সমকালেই বঙ্গে প্রথম মুসলমানধিপত্য স্থাপন স্থিরীকৃত হইতেছে। আরও আশ্চর্য্যের কথা, যেমন আদিশূরের নামান্তর বীর সেন ধরিয়া লইয়া একটা প্রমাণের স্থান বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া হইয়াছে, তেমন আবার "দনুজ মাওধাকে" দনুজমর্দ্দন ঠিক করিয়া, চন্দ্রদ্বীপের রাজসিংহাসনে উপবেশন করাইতেও কম অনুষ্ঠান করা হয় নাই, কারণ চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ কায়স্থ দে বংশ। বল্লাল সেনের নামের পশ্চাতে এই দেব উপাধি সংযোগ করিয়া এইজন্য এতকাল লেখাপড়া চলিয়াছিল। পরে একেবারে তাঁহারা বিক্রমপুরের জীর্ণ সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া বাকলার নূতন সিংহাসনে গিয়া উপবেশন করিলেন। ইহা অপেক্ষা লেখক মহাশয়েরা যদি ঘৃতকৌশিক গোত্রীয় দে-উপাধিধারী চাঁদ রায় ও কেদার রায়কে সেনবংশীয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেন, তবে বরং অধিক সঙ্গত বোধ হইত। বিক্রমপুর মুসলমানকরতলগত হইলে বাকলা বা চন্দ্রদ্বীপ যে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল, এই কষ্ট কল্পনা না করাই সুসঙ্গত।

যাহা হউক, সেনরাজগণ মধ্যে লক্ষণ সেন আপনাকে বিক্রমপুরবাসী বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন।* আজকাল আবার স্থানমাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিবার আশায় কেহ কেহ

* মজিলপুর ২৪ পরগণা তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে উল্লেখ আছে যথা– " সখলু বিক্রমপুর সমাবাসিত জয়স্কন্ধ বীরা মহারাজাধিবাজঃ শ্রী বল্লাল সেন পদানুধ্যানাৎ পরমেশ্বর পরমবীরসিংহ পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজঃ যলক্ষণদেবঃ" ইত্যাদি।

গৌড়নগরকে সেনরাজগণের সর্ব্বপ্রথম রাজধানী বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার জন্য যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিতেছেন। রামকে শ্যাম, জলকে স্থল বানান আজকালকার ঐতিহাসিক গবেষণার একটা অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ দেখিয়া, কেহ বা না দেখিয়া ঢিল ছুঁড়িতেছেন, যেটা যথায় গিয়া পড়ুক না কেন।

সেনরাজগণ বিক্রমপুরবাসী ছিলেন, হয়ত রাজকার্য্যের সুবিধার জন্য তাঁহারা গৌড়দেশেও একটা রাজধানী করিয়া, তথায় সময় সময় অবস্থিতি করিতেন। তৎপর তথা হইতে গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে রাজধানী সংস্থাপিত হয়। কৌলিণ্য মর্য্যাদা বিক্রমপুর হইতেই সর্ব্বপ্রথমে বিতরিত হয়; তৎপর কেন যে সদবংশজগণ বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা অবধারণ করিতে গেলে বল্লাল সম্বন্ধে কতকগুলি দোষারোপ করিতে হয়। গোপালকৃষ্ণকবীন্দ্রবল্লভকৃত অম্বষ্ঠসম্পাদিকাতে বল্লালের দোষের বিষয় উল্লেখ আছে; কিন্তু অন্য কোন কুলজি লেখকেরা তদ্বিষয়ে কিছু বলেন নাই। আমরা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম বারেন্দ্রকায়স্থকুলপঞ্জিকাকার (ঢাকুরে) কবীন্দ্রবল্লভকৃত গ্রন্থর বহুপূর্ব্বে তদবিষয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তথাপি বৈদ্যজাতি এই অপবাদের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া নিন্দিত হইয়াছেন; নিম্নে বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকার এই কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যথা—

"একদিন রাজা গেলা মৃগয়া করিতে।
ঝড় বৃষ্টি দুর্য্যোগ হইল আচম্বিতে॥
ত্যজিয়া বিপিন রাজা গেলা লোকালয়ে।
তথায় বসতি করে ডোমের আলয়ে॥
সেই রাত্রি তথায় রহিল উপবাসী।
মিলিলেক ডোমকন্যা প্রাতঃকালে আসি
* * * *
বিবাহ করিব বলি লইয়া আইলা।
যেবা শুনে যেবা জানে শত নিন্দা কৈলা॥
* * * *
যদি কালক্রমে রাজা শুনে নিন্দাবাণী।
সর্ব্বস্ব হরিয়া তারে তাড়ায় তখনি॥
* * * *
এত বলি রাজসুত মন দুঃখ পেয়ে।
চলিল পিতার কাছে ক্রোধান্বিত হয়ে॥
* * * *
জলের দৃষ্টান্তে বলে রাজাকে বচন।
পরম পবিত্র হইয়া নীচেতে গমন॥
ইঙ্গিত বুঝিয়ে রাজা কহে প্রত্যুত্তর।
হস্তীকে ভ্রমর হয়ে দিলেক ঝঙ্কার॥
অনেক ভাবিয়া রাজা বিবাহ না কৈল।
তথাপি ডোমের কন্যা ছাড়িতে নারিল॥

এই উপলক্ষ্য করিয়া বল্লাল ও লক্ষণ সেনের মধ্যে কয়েকটী শ্লোক লেখালেখি হয়, তাহাও বারেন্দ্রকায়স্থকুলপঞ্জিকা, "ঢাকুরে" স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

কি জন্য সদ্বংশজতা ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থগণ বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তৎসম্বন্ধে ১০৫ সনের কার্ত্তিক মাসের নির্ম্মাল্য পত্রিকায় যাহা লিখিয়োছিলাম, তাহা এই স্থলে উদ্বৃত করিয়া দিলাম।

"বহুকাল যাবৎ বিক্রমপুর উৎকৃষ্ট বৈদ্যগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল। প্রবাদ, বৈদ্য রাজা বল্লাল সেন ও তৎপুত্র লক্ষণসেনের পরস্পর সংঘর্ষণে সদ্বংশজ বৈদ্যরা বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিয়া সুদূর পঞ্চকূট প্রদেশে প্রস্থান করেন। রাজা আদিশূরের এবং বল্লাল সেনের সমকালে যদিও উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি দ্বারা বিক্রমপুর পরিপূর্ণ ছিল, ও তথাপি, তৎপর হইতে নানা কারণে ঐ সকল বংশসম্ভূত কুলীনসন্ততিগণ বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এই জন্য ব্রাহ্মণ মধ্যে রাঢ়ী বারেন্দ্র; বৈদ্যদিগের মধ্যেও রাঢ়ী, বঙ্গজ, পঞ্চকূট, বরেন্দ্র; এবং কায়স্থগণ মধ্যে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বঙ্গজ প্রভৃতি সমাজের সৃষ্টি হয়। এইটী নিঃসন্দেহ যে, কৌলীণ্য প্রথা প্রথমতঃ বিক্রমপুর হইতেই প্রচারিত হইয়াছিল, তৎপর নানা কারণে কেন যে এইরূপ বিপ্লবের সূত্রপাত হয়, তাহা অবধারণ করা সুকঠিন। তবে কোন কোন বৈদ্যকুলপঞ্জিকা এবং বারেন্দ্র কায়স্থকুলপঞ্জিকা (ঢাকুর) প্রভৃতি পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে বল্লালের কতকগুলি দোষনিবন্ধন সামাজিকগণ বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অথবা বোধ হয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বহুসংখ্যক হিন্দু গঙ্গাতীর আশ্রয় করিয়াছিল, তন্নিবন্ধনও বা বিক্রমপুরের এইরূপ শোচনীয় দশা সংঘটিত হইয়া থাকিবে।"

উল্লিখিত কারণ ভিন্ন, উহার আর একটী প্রধান কারণ রাজধানী পরিবর্ত্তন। যখন গৌড়ে রাজধানী স্থপিত হইল, তখন অনেক লোক রাজধানীতে ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থান করিতে আরম্ভ করিল। পরে যখন নবদ্বীপে নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন তথায় ক্রমে বহু জনগণ বাড়ী ঘর করিয়া অবস্থিতি করিতে আরম্ভ করিল এবং গঙ্গাতীর বলিয়া সেইস্থান ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি বহুসংখ্যক হিন্দুর আবাসস্থানে পরিণত হইল। কেবল তীর্থ বলিয়া তথায় এত লোকের সমাগম হইয়াছিল না। রাজধানীর সন্নিহিত ও তীর্থ, এই দুই উপলক্ষ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ হিন্দু গঙ্গাতীর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানগুলিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। বল্লাল সেনের কতকটা অসদাচরণ যে উহার কথাঞ্চিৎ পরিপোষক হইয়া উঠিয়াছিল, তদ্বিষয়েও সন্দেহ নাই।*

আদিশূর ও সেনরাজগণের সময় লইয়া বড়ই গোলমাল চলিতেছে। কে বলিতেছেন, পাঁচটা তিন মিনিট দুই সেকেন্ডর সময়, লক্ষণ সেন সিংহাসনচ্যুত হন এবং বঙ্গে

* আর এক সমস্যা সেনবাজগণেব ও আদিশূরের এতদিন বিক্রমপুর রাজধানী ও যজ্ঞস্থান বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস ছিল, অধুনা পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গবাসী কেহ কেহ গৌড়ে রাজধানী ও যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ করিতে উদ্যোগী। কিন্তু সেন রাজগণের জাতিত্বের প্রমাণের ন্যায় এই সকল প্রমাণেরও যে বিশেষ কোন মূল্য আছে, তাহা আমাদের বোধ হয় না। এখন একটা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাই যখন ২/৩টা আড্ডা স্থাপন করিয়া এক এক সময়ে এক এক স্থানে অবস্থান করেন, তখন একটা স্বাধীন নৃপতিব পক্ষে কি উহা অসম্ভব? আমাদের বিশ্বাস তখন স্বাস্থ্যরক্ষা হইতে ধর্ম্মের প্রতি লোকের টান অধিক ছিল, এইজন্য ব্রহ্মপুত্রের সন্নিকটে বিক্রমপুর, ভাগীরথীর তীরে নবদ্বীপ এবং করতোয়া তীরে গৌড়ে পৃথক তিনটী রাজধানী সংস্থাপিত হয়। আদিশূরের যজ্ঞ বিক্রমপুরের হওয়ার প্রবাদ এক নিশ্বাসে উড়াইয়া দিলে চলিবে না।

যবনাধিকার আরম্ভ হয়;– কেহ বলেন, তোমার গণনা শুদ্ধ হয় নাই। আমি সিদ্ধান্ত করিয়া দেখিয়াছি, চারি ঘটিকা পৌনে তিন মিনিটের সময় লক্ষণসেন খিড়কীর দরজা অতিক্রম করিয়া পুরুষোত্তম প্রস্থান করিয়াছিলেন, তখনই প্রকৃতরূপে যবনাধিকার আরম্ভ হইয়াছিল, এই ত নানা মুনির নানা মত। এইরূপ সন তারিখ লইয়া যখন নানারূপ গোলযোগ অদ্য পর্যন্ত চলিতেছে, তখন তৎসম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া, সেনরাজগণের রাজত্বের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে এই মাত্র বলিতে পারি যে, তাঁহারা নবম শতাব্দীর অন্তভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উত্তর পুরুষে আরও কয়েক জন পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তৎপর তাঁহাদের রাজ্যের অবসান হয়। ত্রয়োদশ হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিক্রমপুরের চরম পতন হয়, তখন মুসলমান শাসনকাল—পাঠান বংশ দেশের রাজা, তাহারা পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী বিক্রমপুর হইতে সোণারগাঁয়ে স্থানান্তরিত করেন।

আইন-ই-আকবরি গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, মোগল শাসন সময়ে সরকার সোণারগাঁয়ের অন্তর্গত নিম্নলিখিত পরগণাগুলি ছিল, যথা—১. অবতার সাহপুর, ২. আনচাপ, ৩. অবতার ওসমানপুর, ৪. বিক্রমপুর, ৫. বেলা জোওয়ার, ৬. বলদাখান, ৭. বোয়ালিয়া, ৮. পারচাঁদে, ৯. বাটখারা, ১০. পলাশবাটী, ১১. চবদিয়া, ১২. ফুলরী, ১৩. পানহাটী, ১৪. তাতরা, ১৫. তাজপুর, ১৬. তিরকী, ১৭. যোগীদিয়া, ১৮. জেওয়ার বন্দর, ১৯. চোকেন্দী, ২০ চণ্ডীহার, ২১. চাঁদপুর ২২. হাবেলী সোণারগা মরু সহর, ২৩. খিজিরপুর, ২৪. দৌহার, ২৫. ডানডেরা, ২৬. দক্ষিণ সাহপুর, ২৭. দেওয়ানপুর, ২৮. দেকান ওসমানপুর, ২৯. রায়পুর, ৩০. সুখারগঞ্জ, ৩১. সুকেরী, ৩২. সোলিমপুর, ৩৩. সেলিসেবি, সব জলকর, ৩৪. সুকাওশা, ৩৫. সুকদিয়া, ৩৬. সেবারচল, ৩৭. শমসপুর, ৩৮. কড়াপুর, ৩৯. গবদী, ৪০. কার্ত্তিকপুর, ৪১. কাঁদী, ৪২. কোলহরি, ৪৩. ঘাটীদুনাই, ৪৪. মারকোর, ৪৫. মজমপুর, ৪৬. মেহার, ৪৭. মনোহরপুর, ৪৮. সাহীজল, ৪৯. নরায়ণপুর ও সায়র জেকাত, ৫০. লেপুয়াকোট, ৫১. হিমতীবাজু, ৫২. হাটঘাটী, এই বায়ান্ন মহলের রাজস্ব ১০,৩৩,১৩,৩৩৩ দাম। তন্মধ্যে বিক্রমপুর পরগণার রাজস্ব ৩৩,৩৫,০৫২ দাম* অর্থাৎ সমগ্র মহাল মধ্যে বিক্রমপুরের রাজস্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল দেখা যায়। সম্প্রতি কার্ত্তিকপুরবাসীরা আপনাদের বসতির পরিচয় স্থলে বিক্রমপুরের নামোল্লেখ করিয়া থাকে, বাস্তবিক কার্ত্তিকপুর একটী পৃথক্ পরগণা বলিয়া বহুকাল যাবৎ উল্লেখ দেখা যায়। মহালের নাম গণনায় পাঠকগণ দেখিবেন উপরে কার্ত্তিকপুরকে পৃথক ধরা হইয়াছে। উহার বার্ষিক কর ৮০,০০০ হাজার দাম। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পঞ্চম রিপোর্টেও দুটী পৃথক পরগণা বলিয়া বিক্রমপুর ও কার্ত্তিকপুরের উল্লেখ দেখা যায়। উপরে যে সকল মহাল বা পরগণার নামোল্লেখ করা হইয়াছে, উহার অধিকাংশ অধুনা ঢাকা, ফরিদপুর, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, এই চারি জেলাতে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। কার্ত্তিকপুর ও বিক্রমপুরের কতকাংশ ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত, বিক্রমপুরের অধিকাংশ ঢাকা জিলার অন্তর্গত।

বিক্রমপুর, কার্ত্তিকপুর ও চাঁদপুর সরকার সোণারগাঁয়ের অন্তর্গত এবং ইদিলপুর সরকার বাকলার অন্তর্গত এবং সন্দীপ ও সাবাজপুর সরকার ফতেয়া আবাদারের অন্তর্ব্বর্ত্তী ছিল। এখন যেমন এক এক জমিদারের জমিদারী বিভিন্ন জিলায় আছে, তখনও তদ্রূপ

* তাম্র মুদ্রাবিশেষ-চল্লিশ দামে এক টাকা।

একজন জমিদারের জমিদারী হয়ত পৃথক্ পৃথক্ সরকারের অন্তর্গত থাকিত। প্রত্যেক সরকারের তহশীলদারকে (দেওয়ানকে) তদন্তর্গত মহালের জন্য পৃথক্‌ভাবে রাজস্ব প্রদান করিতে হইত। আকবরের সময় বিক্রমপুরের চাঁদরায়ের অভ্যুদয় হয়। তাঁহার নামানুসারে চাঁদপুরের নামকরণ হয়, চাঁদপুর বর্ত্তমান সময়ে ত্রিপুরা জিলার একটী সাবডিবিসন, মেঘনা নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। চাঁদরায় বিক্রমপুর, কার্ত্তিকপুর, চাঁদপুর, সরকার সোণারগাঁয়ের অন্তর্গত এই তিন মহালের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। ইদিলপুর তখন একটা চড়া স্থান মাত্র ছিল, উহা এবং সাহাবাজপুর ও সন্দীপ পরে কেদার রায়ের হস্ত গত হয়। কারণ ইয়োরোপীয় ভ্রমণকারী যে রালফ ফিচ ১৫৬৬ খ্রীঃ অব্দে+ যখন এ দেশে আগমন করেন, তখন পর্য্যন্ত সন্দীপ মোগল রাজগণের করায়ত্ত হয় নাই। মোগলেরা উহা হস্তগত করিলে পর ঐ স্থান কেদার রায়ের নিকট গচ্ছিত হয়।

অধুনা বিক্রমপুর ও মাদারীপুরের অন্তর্গত সম্প্রতি যে অবস্থায় পরিণত হইয়াছে, শত বৎসর পূর্ব্বে উহার স্থানীয় অবস্থা এতদপেক্ষা বহু উৎকৃষ্ট ছিল। কীর্ত্তিনাশা তৎকাল পর্য্যন্ত উদ্ভুত হইয়া বিক্রমপুরের বক্ষ বিদারণ করিয়া তাহাকে শ্রীহীনা করিয়া ফেলিয়াছিল না। নয়াভাঙ্গনী বা আরিয়লখাঁ ও বহু স্থানের বিলয় সাধন করে নাই। জনপূর্ণ-শ্যামল-শস্যরাজি-পরিবৃত জনপদ সকল তখন লোকলোচনের যথেষ্ট আনন্দ বর্ধিত করিত। মৎস্যপরিপূর্ণ ঝিল ও বিলগুলি নানাবিধ মৎস্য দানে রসনার তৃপ্তিবিধানে সতত নিযুক্ত থাকিত। বিলোৎপন্ন দাম ও তৎপার্শ্বস্থিত প্রশস্ত ক্ষেত্রোৎপন্ন ঘাসগুলি ভক্ষণ করিয়া গাভীগুলি যথেষ্ট হৃষ্টপুষ্ট হইয়া অমৃতনিভ সুস্বাদু দুগ্ধ প্রদান করিয়া জনগণকে পরিপোষণ করিত। তত্রত্য অধিবাসীরা তৎকালে চাউল, মৎস্য, দুগ্ধ যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া, স্ব স্ব পরিজন লইয়া যারপরনাই সুখে কাল কর্ত্তন করিত। বিক্রমপুরের মত উৎকৃষ্ট ক্ষীর ও মৎস্য বঙ্গের আর কোথাও মিলিত না। এই পরগণার, পূর্ব্বদিকে মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র ও পশ্চিম দিকে পদ্মানদী প্রবাহিত থাকায়, ইলিশ, চাইন, রোহিত প্রভৃতি সুস্বাদু নদীজ মৎস্যও তাহারা প্রচুর পরিমাণ প্রাপ্ত হইত। হায়! একমাত্র কীর্ত্তিনাশা নদীর প্রাদুর্ভাবে সেই রমণীয় স্থান এখন শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, অধিকাংশ বিল ঝিল কীর্ত্তিনাশার গর্ভস্থ হইয়া গিয়াছে, হতাবশিষ্ট যাহা কিছু ছিল, তাহাও আবার নদীস্রোত সংমিশ্রিত বালুকারাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, কৃষিক্ষেত্রগুলি লোকালয়ে পরিণত ও বালুকারাশিতে নিমজ্জিত হওয়াতে শস্যোৎপন্নের পক্ষে যথেষ্ট অন্তরায় হইয়া পড়িয়াছে। নদীগর্ভে অধিকাংশ স্থান বিলীন হওয়ায়, তত্তৎস্থানীয় লোকেরা অত্যল্প পরিসর স্থানে একত্র সমাবিষ্ট হইয়া বাস করিতেছে। এইরূপ বহুজনতার একত্র সমাবেশে, স্থানগুলি ক্রমে অস্বাস্থ্যকর হইয়া ওলাউঠার মূর্ত্তিমতী রাজধানীতে পরিণত হইয়াছে। আবার এদেশের বর্ষাকালের দশা ভাবিতে গেলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তখন বিক্রমপুর ও তৎসন্নিহিত স্থানগুলি দ্বিতীয় সাগরশাখাতে পরিণত হয়, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাতায়াত দূরের কথা, এক গৃহ হইতে ভিন্ন গৃহে যাইতে হইলেও সাঁক বা নৌকার সাহায্য ব্যতীত যাওয়া আইসার সাধ্য নাই। বোধ হয়, বিধাতা বিক্রমপুরের ভবিষ্যৎ বিষয় গণনা করিয়াই দুইটী প্রয়োজনীয় বিষয়ের সৃষ্টি পূর্ব্ব হইতে করিয়া রাখিয়াছিলেন, উহার একটী "ধূড়ী" নামে এক প্রকার কাষ্ঠ যান, অপরটী "গামলা" নামে মৃত্তিকা যান। দক্ষিণবিক্রমপুর ও ইদিলপুরবাসিগণ প্রথমটী এবং উত্তর বিক্রমপুরবাসী অবস্থাপন্ন

---

+ মি. বিভারেজ কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাসের সাধারণ বিবরণ দেখ।

লোকে দ্বিতীয়াটি ব্যবহার করিয়া গৃহ হইতে গৃহান্তরে ও প্রয়োজনীয় স্থানে চলিয়া বেড়ায়। এই সময় বহু হতভাগ্য লোক "মাচা" বান্ধিয়া গৃহভিত্তির কার্য্য সম্পাদন করে, গৃহের মৃত্তিকা নির্ম্মিত ভিটী সকল এই সময় স্রোতবেগে ধসিয়া পড়িয়া যায়। গৃহ মধ্যে নানাবিধ সরীসৃপ আশ্রয় লইয়া, আবার আশ্রয় স্থানের মালিকের অনিষ্ট সম্পাদন করিতে ক্রুটি করে না। কত মনুষ্য সর্পদষ্ট হইয়া এই সময় মানবলীলা সম্বরণ করে। দরিদ্রেরা গৃহবহির্গমনে অসমর্থ হইয়া এই সময় অনশন ব্রত অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। হায়! সুখপূর্ণদেশের এই অশুভ পরিবর্ত্তনের কথা কয়জন লোকে ভাবিয়া থাকে? এই পরগণাতে, বহুসংখ্যক কৃতবিদ্য, ধনী, গুণী মনুষ্যের বাসস্থান আছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের সহিত দেশের বড়ই অল্প সম্বন্ধ। কার্য্যানুরোধে তাঁহারা অধিকাংশ সময় বিদেশে অতিবাহিত করেন, দেশের দুর্দ্দশা তাঁহারা বড় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন না, কাজেই তাঁহারা তৎপ্রতিকারেও কখন কোন আয়াস স্বীকার করা দূরে থাকুক, একবার ভাবিবারও সময় পান না। এ কথাটি যে কেবল আমরা বিক্রমপুর সম্বন্ধে বলিতেছি, তাহা নয়, ফরিদপুরের অধিকাংশ স্থান সম্বন্ধেই এই উক্তি প্রযুক্ত হইতেছে। দামোদরের বন্যায় মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমানের একবার মাত্র দুর্দ্দশা করায় তাহার জন্য নানাবিধ পত্রিকায় কত লেখা পড়া চলিয়াছিল, কিন্তু আমাদের ফরিদপুরে এরূপ বন্যা প্রায় প্রতি বৎসর ঘটিয়া থাকে। তবে পূর্ব্ব হইতে সতর্ক থাকায় মনুষ্য বা পশ্বাদির জীবনটা মাত্র রক্ষা পায়। দামোদরের বন্যার প্রসঙ্গ কাউনসেলে পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল, আমাদের দুর্দ্দশার বিষয় স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট বা কমিশনারের কর্ণগোচর হয় কিনা সন্দেহ। অধুনা ফরিদপুর সম্মিলনী সভা দেশের অভাব বিমোচনে অগ্রসর হইয়াছে, আমাদের বিবেচনায় তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রে এই জলপ্লাবনের প্রতিকার জন্য যত্ন করা কর্ত্তব্য। অবশ্য দেশ হইতে নদী তাড়াইবার সাধ্য বৃটিশ গবর্ণমেন্টেরও নাই, কিন্তু যাহাতে অন্ততঃ স্থানীয় লোকে অনায়াসে সর্ব্বদা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে চলা ফিরা করিতে পারে, এইরূপ বিধান অবশ্য হইতে পারে। বর্ষার সময়ে মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত তাবত স্থানে এইরূপ শোচনীয় ভাব ধারণ করে।

লালারামগতি রায় কৃত "মায়া তিমির চন্দ্রিকা" গ্রন্থ দেড় শত বৎসরের পূর্ব্বে বিরচিত হয় নাই, তন্মধ্যে বিক্রমপুরের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতেও কীর্ত্তিনাশার উল্লেখ নাই। আমরা উক্ত গ্রন্থ হইতে সেই অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

মহাতীর্থ ব্রহ্মপুত্র পূর্ব্বেতে প্রচার।
পশ্চিমেতে পদ্মাবতী বিদিত সংসার॥
মধ্যেতে বিক্রমপুর রাজা মনোহর।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাহে সদজ্ঞানী বিস্তর॥"

আমরা উপরে যে কবিতাটি উল্লেখ করিলাম, তৎপাঠে এই মাত্র জানা যায় যে, বিক্রমপুরের পশ্চিমে পদ্মা ও পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত হইত। রাক্ষসী কীর্ত্তিনাশা তখন বিকট বদন ব্যাদান করিয়া বিক্রমপুরের দিকে অগ্রসর হয় নাই। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, বিক্রমপুরের পূর্ব্বদিকে যে বৃহৎ স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইয়া মেঘনা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, কবি লালারামগতি তাহাকে ব্রহ্মপুত্র বলিয়া পরিচিত করিলেন কেন? এই কথার উত্তর আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

সিদ্ধ শ্রোত্রীয়কুলোদ্ভব গোসাঞি ভট্টাচার্য্য নামে এক মহাত্মা বিক্রমপুরে বাস

করিতেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কেদার রায়ের গুরু ছিলেন। তৎসময় বীরাচারী তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল। সর্ব্ববিদ্যা, সিদ্ধিবিদ্যা, অর্দ্ধকারীর সন্তানেরা তখন তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের গুরুস্থানীয়। তৎকালে পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ লোক শক্তির উপাসনায় নিরত,—স্থানীয় রাজারাও শক্তি-মন্ত্র দীক্ষিত। প্রতাপাদিত্য শাক্ত ছিলেন "যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী" এই উক্তি যে তদ্বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ করিবার কারণ নাই। চন্দ্রদ্বীপের, ভুলুয়ার, বিক্রমপুরের অধিপতিরা সকলেই শক্তি সেবক ছিলেন। শক্তির কৃপাপাত্র হইয়া তাঁহারা যথার্থ শক্তি-সঞ্চয় করিয়া মায়ের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। শুধু প্রেমের বন্যায় যে কখনও মায়ের উদ্ধার সাধন হইবে, এরূপ আশা দুরাশা মাত্র। প্রকৃত শাক্ত হইয়া শক্তিসঞ্চয় করিলেই বরং তাহার আশা করা যায়। যাহা হউক, তৎসময় শাক্তগণের মধ্যে অনেক অসাধারণ ক্ষমতাশালী লোক জন্ম গ্রহণ করিয়া, জনগণকে যথার্থই বিমোহিত করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে গোসাঞি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের একটি ঘটনা এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতেছে। বিশেষতঃ এই প্রসঙ্গ পাঠ করিলে মেঘনার একাংশ কেন ব্রহ্মপুত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছে, তাহাও বিশেষরূপে জানা যাইতে পারিবে।

একদা কেদার রায়, গুরু ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে জানাইলেন, "দেব, অশোকাষ্টমী প্রায় সমাগত, ইচ্ছা আপনার সহিত একত্র হইয়া তীর্থরাজ ব্রহ্মপুত্র নীরে অবগাহনান্তে পাপময় দেহ পবিত্র করি।" তখন ভট্টাচার্য্য সহাস্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, বৎস, তোমার বা আমার লাঙ্গলবন্ধ* যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। লৌহিত্যদেব তোমার রাজধানীর পূর্ব্বপ্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন, উহাতে স্নান করিলেই তোমার ব্রহ্মপুত্রে স্নান করা হইবে; তখন রাজা বলিলেন, দেব, আমার রাজ্যের পূর্ব্বপ্রান্ত দিয়া ত মেঘনা নদী প্রবাহিত হইতেছে, উহাকে আপনি কিরূপে লৌহিত্য বলিতেছেন। তৎশ্রবণে ভট্টচার্য্য, নিজ সম্মুখস্থ একটি কমলালেবু উত্তোলন করিয়া রাজাকে দিয়া বলিলেন, তুমি এই লেবুটি ব্রহ্মপুত্রের জলে যাইয়া নিক্ষেপ কর, যে স্থান হইতে স্বয়ং লৌহিত্য দেব হস্ত প্রসারণ করিয়া উহা গ্রহণ করিবেন, জানিও এতদূর পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত হইতেছে। যাও বৎস, আমার কথানুযায়ী কার্য্য করিয়া উহার যথার্থ্য প্রত্যক্ষ কর। রাজা গুরুর আদেশে তৎক্ষণাৎ কতিপয় লোকসহ তরণী আরোহণ করিয়া ব্রহ্মপুত্র উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। তৎপর লাঙ্গলবন্ধের কতক উত্তরবর্ত্তী পঞ্চমীঘাট নামক স্থানে যাইয়া, কমলালেবুটি ব্রহ্মপুত্র জলে নিক্ষেপ করিলেন। যেমন লেবুটি স্রোতবেগে ভাসিয়া চলিল, তৎ পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজার নৌকাও চলিতে লাগিল, কিন্তু লাঙ্গলবন্ধ অতিক্রম করিয়া যখন লেবুটি লক্ষ্মা নদী অভিমুখে চলিল, তখন রাজার মনে একটুকু অবিশ্বাসের উদ্রেক হইল, ক্রমে যেমন কমলালেবু ভাসিয়া চলিল, রাজাও তৎ-পশ্চাৎ স্বীয় যান চালাইতে লাগিলেন। ক্রমে ঐ লেবুটি আসিয়া কার্ত্তিকপুরের পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত মেঘনার একটি ঘোলার মধ্যে পড়িয়া আবর্ত্তিত হইতে লাগিল, রাজাও তথায় নঙ্গর করিয়া নৌকা রাখিয়া দিলেন। এই কথা পূর্ব্বেই দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল, রাজার তরণী নদীমধ্যে অবস্থান করায়,

* ঢাকা জেলার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জের পূর্ব্বদিকস্থ ব্রহ্মপুত্রের অংশ বিশেষ। বলরাম হল (লাঙ্গল) দ্বারা এই স্থান কর্ষণ করিয়া ব্রহ্মপুত্রে জল নিষ্কাসিত করিয়াছিলেন বলিয়া উহার নাম লাঙ্গলবন্ধ হয়। প্রতিবৎসর অশোকাষ্টমীর দিবস এখানে বিস্তর লোক গমন করিয়া স্নানদানাদি করিয়া থাকে।

চতুর্দ্দিক হইতে নৌকাযোগে লোক আসিয়া তথায় জড় হইতে লাগিল। পরে যখন মধুশুক্লাষ্টমী তিথির আবির্ভাব হইয়া ব্রহ্মপুত্র স্নানের প্রকৃত সময় আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন সহস্র মানব দেখিতে পাইল, নদীগর্ভ হইতে দিব্যালঙ্কারভূষিত এক দেবমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। এদিকে গোসাঞি ভট্টাচার্য্য ঐ কমলালেবুটী নদীগর্ভ হইতে উঠাইয়া ঐ মূর্ত্তির হস্তে প্রদান করিলেন। দেখিতে দেখিতে দিব্যপুরুষ জলে বিলীন হইয়া গেলেন। দর্শক-গণের আর আশ্চর্য্যের ইয়ত্তা রহিল না, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে গোসাঞির গুণগান করিতে করিতে ঐ জলে অবগাহন করিয়া ব্রহ্মপুত্রস্নানের ফললাভ করিলেন। রাজা গুরুপদানত হইয়া, তৎবাক্যের পরীক্ষা করার ক্রটি জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পরে গুরুর উপদেশানুযায়ী স্নানদানাদি করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। তদবধি এই তীর্থস্থান কমলাপুর নামে বিখ্যাত হইল; অশোকাষ্টমীর দিবস প্রতিবর্ষে বহুসংখ্যক যাত্রী অদ্যাপি তথায় স্নান করিয়া থাকে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই ছিল যে, প্রতিবর্ষে ঠিক ঐ অষ্টমী দিবসে বহুসংখ্যক বক কোথা হইতে আসিয়া এই জলে স্নান করিয়া যাইত। এই জন্য এই স্থানের অপর নাম বগিধলি! প্রকৃত প্রস্তাবে মেঘনার এই অংশ প্রকৃত কমলাপুর উদরস্থ করিয়া, অনেক পশ্চিমে সরিয়া পড়িয়াছে।

কবি রামগিত একজন সাধক যোগী পুরুষ ছিলেন। মহাজনগণের এই সকল ঘটনার প্রতি তাঁহার অণুমাত্র অবিশ্বাস ছিল না, এই কারণে তিনি গোসাঞি ভট্টচার্য্যের কথার উপর নির্ভর করিয়া মেঘনার এই অংশকে ব্রহ্ম-পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

গোসাঞি ভট্টাচার্য্য সম্বন্ধে আরও অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা শ্রুত হওয়া যায়। তন্মধ্যে যেগুলি কেদার রায়ের সহিত সম্বন্ধজড়িত আছে, তাহা পশ্চাৎ উল্লেখ করা হইবে; এমন কি, এই গোসাঞি ভট্টাচার্য্যের ক্রিয়াকলাপে অনাস্থা প্রকাশই কেদার রায়ের পতনের মূল কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

# বিক্রমপুর

## চাঁদ রায় ও কেদার রায়

ষোড়শ শতাব্দীর অন্তভাগে বঙ্গদেশে কতকগুলি ভূম্যধিকারী এক মতাবলম্বী হইয়া দিল্লীশ্বরের অধীনতা হইতে, আপনাদিগকে বিমুক্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। সাধারণতঃ তাঁহারা বারভূঞা নামে প্রসিদ্ধ। আজিও বারভূঞার নাম বঙ্গদেশ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই, তাহাদের কীর্ত্তির ও কার্য্যকলাপের কোন কোন ভগ্নাংশ বর্ত্তমান থাকিয়া, অদ্যাপি সেই মহানুভবগণের প্রাচীনলুপ্ত স্মৃতি জনগণের মনে ক্ষণস্থায়ী তড়িৎসদৃশ সময় সময় একটা আভাস প্রদান করিয়া থাকে।

বারভূঞার নাম লইয়া বড়ই গোলযোগ, কিন্তু তন্মধ্যে জন কয়েক নির্ব্বিবাদে দখলিসত্ব বজায় রাখিয়া আসিতেছেন। তন্মধ্যে ১ম যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য, ২য় চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্প রায়, ৩য় বিক্রমপুরের কেদার রায়, ৪র্থ ভুলুয়ার লক্ষণ মাণিক্য, ৫ম ভূষণার মুকুন্দ রায়, ৬ষ্ঠ ভাওয়ালের ফজল গাজী, ৭ম ফিজিরের ঈশাখাঁ মসনদী আলি, ৮ম চাঁদপ্রতাপের চাঁদগাজী, এই আটজন সর্ব্ববাদী-সম্মত ভূঞা।

মি. বিভারিজ তৎকৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাসের একস্থলে লিখিয়াছেন, পাদ্রী সুইট ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন বঙ্গদেশে আগমন করেন, তৎসময়ে তিনি তৎস্থানীয় দ্বাদশজন ভূম্যধিকারীর আধিপত্য সন্দর্শন ও সেই দ্বাদশজনের মধ্যে ৯ (নয়) জনকেই মুসলমান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমরা এই কথার কোন ভাব পরিগ্রহ করিতে পারিলাম না। অনেকে মুকুন্দ রায়কে ভূঞা না বলিয়া জমিদার শ্রেণীতে রাখিয়া, মাত্র কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য, কন্দর্প রায় এই তিন জনকেই ভূঞা বলিয়া অবশিষ্ট নয়জনকে মুসলমান বলিতে চাহেন, কিন্তু তাঁহাদের নাম গোত্রাদি উল্লেখ করিতে পারেন না। আমাদের মতে তখন যাহারা মোগল বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিয়াছিলেন, সেই কালে তাঁহারাই ভূঞা পদবাচ্য ছিলেন।

আমাদের প্রবন্ধোক্ত কেদার রায়ের নাম বারভূঞার তালিকায় স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। চাঁদ রায়কে কেহ কেহ কেদার রায়ের ভ্রাতা বলিয়া থাকেন, কোন কোন মতে তাঁহারা পিতা পুত্র ছিলেন। এই রায়গণ ঘৃতকৌশিকী গোত্রীয় কায়স্থ বলিয়া পরিচিত; আবার কেহ কেহ বা কটকী কায়েথ বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মূল বংশ বিশুদ্ধ না হওয়া প্রযুক্ত ঘটকেরা তাঁহাদের বংশাবলী কুলজী গ্রন্থে উল্লেখ করেন নাই। বিদ্বানই হউন, সাধু বা রাজা হউন, যদি কুলের মূলে কিছু সার না থাকিত, তবে আমাদের বঙ্গীয় কুলজী লেখকেরা তাহাদের গ্রন্থে কখনও সেই সকল মহাত্মা লোকদিগকে স্থান প্রদান করিতেন না। অথচ কুলীনের অসাধু, মুর্খ সন্তানগুলির নামের তালিকা দ্বারা গ্রন্থ পূর্ণ করিতে কতই যত্ন ও প্রয়াস পাইয়াছেন। এই কারণে কি ব্রাহ্মণ, কি বৈদ্য, কি কায়স্থ, এইরূপ ভদ্র বংশসম্ভূত কত কত মহাত্মার বংশাবলীর উল্লেখাভাব প্রযুক্ত আমাদের জাতীয় ইতিহাস লিখার পক্ষে মহা অন্তরায় হইয়া পড়িয়াছে। একমাত্র কিম্বদন্তী ও

পারসী ইতিহাসে দুই চারিপঙ্ক্তিতে যদি কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবেই আমাদের একমাত্র ইতিহাস লিখার সুযোগ হয়। আমরা এই সুবিধাটী কম মনে করি না, যদি তাহাও না পাইতাম, তবে হয়ত কত মহাত্মার অনন্ত নিদ্রার সহিত, তাঁহার কার্য্যাবলী বা গুণগ্রামের পরিচয়ও কালের অনন্ত তামসীতে চিরবিলীন হইয়া যাইত। আমরা শত চেষ্টা করিয়াও তাহার পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইতাম না।

পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গ বারভূঞাগণের প্রধানতম লীলাক্ষেত্র। ভাগীরথীর পূর্ব্ব তট হইতে আরম্ভ করিয়া, বরাবর সমুদ্র তীর দিয়া বর্ত্তমান যশোহর, খুলনা, বাকরগঞ্জ, নোয়াখালী প্রভৃতি জেলার অধিকাংশ এবং তৎপর উত্তর দিকে ফরিদপুর ও ঢাকার কতকাংশ এবং তদুত্তর পশ্চিম দিকে রাজসাহী ও পাবনা ও দিনাজ্‌পুর জেলার কতক স্থান লইয়া বারভূঞাদের একটী দেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎসময়, বঙ্গীয় ভূম্যধিকারীরা যেরূপ দলবল সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হয় উহাদের স্বাধীন হইবার আশাটা তত অসম্ভব কার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইবার কথা ছিল না। তবে বিধাতা চিরকাল যাহাদের প্রতি বিমুখ. যে দেশ চিরদিন স্বজনদ্রোহী দ্বারা পরিবৃত, ভ্রাতৃহিংসা পর্য্যন্ত যে দেশ হইতে বিদূরিত হয় নাই. সে দেশের কল্যাণ আর কিরূপে হইতে পারে? বারভূম্যধিকারীরা বহু চেষ্টা করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কতিপয় স্বদেশদ্রোহী স্বজনের হিংসা ও পরশ্রীকাতরতায় তাহাদের সে আশা শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও যখন আর কুল কিনারা পাইলেন না, তখন আত্মাহুতি প্রদান করিয়া, জন্মভূমির নিকট চির-বিদায় গ্রহণ করিলেন। স্বদেশদ্রোহী তাঁহাদিগকে ধিক্কার দিতে লাগিল, মায়ের সু-সন্তানের জন্য সহৃদয় দুই চারি জন দুই চারি বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া, রাজপুরুষগণের অলক্ষিতে তাহা আবার মুছিয়া, রাজার জয়জয়কার দিতে বসিল।

এই ভূম্যধিকারী দলের অভ্যুত্থানের সমকালে বঙ্গদেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার কিছু বিবরণ প্রকাশ করা কর্তব্য বোধে আমরা এস্থলে তৎসময়ের কতিপয় বিবরণ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। মোগল বাদসাহগণের রাজত্ব পর্য্যন্ত, বাদসাহের প্রতিনিধিস্বরূপ মুসলমান নবাব দ্বারা বঙ্গদেশ শাসিত হইত বটে, কিন্তু তৎকাল পর্য্যন্ত সাধারণ প্রজা ও দেশ রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেশীয় জমিদারগণের উপরেই অধিক পরিমাণে নির্ভর করিত। এই জন্য প্রত্যেক জমিদারের অধীনেই পদাতিক, অশ্বারোহী নৌ-সৈন্যের গমনোপযোগী যান সকল সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। আইন-ই আকবরি গ্রন্থ পাঠ করিয়া জানা যায়, বাদসাহ আকবর সাহের রাজত্ব সময়ে বঙ্গদেশীয় জমিদারেরা ২৩৩৩০ জন অশ্বারোহী, ৮০১১৫০ জন পদাতিক, ১৭০টী হস্তী, ৪২৬০টী কামান এবং ৪৪০০ নৌকা সম্রাটের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখিতেন। সম্রাট যখন আদেশ করিতেন তখনই জমিদারেরা এই সকল সৈন্য ও হস্তী অশ্বাদি লইয়া তাঁহার কার্য্যে নিয়োগ করিতেন। আমাদের নিকট এই কথাগুলি অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হইলেও, জমিদারেরা যে তৎকালে আধুনিক করদ ও মিত্র রাজগণের মত বলসম্পন্ন ছিলেন, তৎবিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান করদ ও মিত্র রাজগণ, রেসিডেন্টরূপ রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া, যেমন ত্রাহি ত্রাহি চীৎকারে, সময় সময় সুধাধবলিত হর্ম্যরাজি বিদীর্ণ করিয়া ফেলেন, তখনকার এই জমিদারগণ এতদপেক্ষা সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিতেন বলিয়া বোধ হয়। একমাত্র নির্দ্দিষ্ট রাজকর প্রদান করিলেই

তাঁহারা স্বাধীন নৃপতির ন্যায় আপনাপন অধিকারের কার্য্য পরিচালনা করিতে সমর্থ হইতেন।

মহাত্মা আকবরের রাজত্বসময়ে এই সকল ভূম্যধিকারীর মধ্যে কতক, তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া চলিত। কিন্তু বাদসাহের কর্ম্মচারীর সহিত তাহাদের ততটা সম্মিলন ঘটিল না, কেন এই মনোমালিন্য ঘটিল, কাহার জন্য দ্বাদশ ভূম্যধিকারী বাদসাহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল তাহার বিবরণ অনুসন্ধান করিতে গেলে বোধ হয় যে তৎকাল পর্য্যন্ত যদিও বাদসাহ বাঙ্গালার অধিপতি ছিলেন, তথাপি পাঠানেরা সময় সময় তাহাদের আধিপত্য স্বীকার করিতে চাহিত না। বিশেষতঃ যদি তাহারা কোনরূপ বুঝিত, সম্রাট, তাহাদের স্বশ্রেণীর কোন ব্যক্তির প্রতি অন্যায়রূপে অত্যাচার করিয়াছেন বা করিতেছেন তখন পাঠানেরা আত্মহারা হইত, আপনাদের পূর্ব্ব বলও অধিকার মনে ভাবিয়া তাহাদের শিরায় শিরায় শোণিত উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। তখন ভালমন্দ বিবেচনা তাহাদের অন্তঃকরণে আর স্থান পাইত না। কেবল প্রতিহিংসা ও পূর্ব্বাধিকারের পুনরভ্যুদয় তাহাদিগের স্মৃতিতে জাগরিত হইয়া তাঁহাদিগকে মোগল বাদসাহগণের প্রতিকূলে উত্তেজিত করিয়া তুলিত, ভবিষ্যৎ ভাবিবার আর সময় থাকিত না। টোডরমল্লের অন্যায় বন্দোবস্ত ভূম্যধিকারীদের বিদ্রোহের অন্যতম কারণ।

মানসিংহের আগমনের পূর্ব্বে রালফ ফিচ নামে একজন ইয়োরোপীয় ভ্রমণকারী, বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত বিবরণী হইতে জানা যায়, তৎসময় বঙ্গদেশে দ্বাদশজন ভৌমিক ছিল। তন্মধ্যে বাকলা (চন্দ্রদ্বীপ) ও শ্রীপুর (বিক্রমপুর) দক্ষিণ ও পূর্ব্ববিভাগের দুইটী রাজধানী ছিল। ১৫০৬ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত বৃহৎ হিন্দুনগরী বাকলা নামে অভিহিত হইত। সন্দীপ পর্য্যন্ত বিক্রমপুরের কেদার রায়ের রাজ্য বিস্তারের বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু উহা পর্টুগীশদের সাহায্য ব্যতীত হস্তগত রাখিবার উপায় ছিল না। আরাকানের মঘেরা ঐ স্থান কি সমুদ্র তীরস্থ অন্যান্য স্থানে আপতিত হইয়া তত্রত্য অধিবাসীদিগকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল, হিন্দুরাজগণ জলযুদ্ধে অক্ষম ছিলেন কিন্তু মঘেদের মধ্যে অনেক পরিশ্রমী ও বহুদর্শী নাবিক ছিল। ডাক্তার জেকির লিখিয়াছেন* কেদার রায়কে পর্টুগীশ সৈন্যর সাহায্য লইয়া সন্দ্বীপ রক্ষা করিতে হইত।

সন্দ্বীপ দক্ষিণ সাহাবাজপুরের পূর্ব্বদিকে মেঘনা নদীর সহিত সাগরসঙ্গমের মধ্যস্থলে সংস্থাপিত, ততদূর পর্য্যন্ত কেদার রায়ের অধিকার প্রসারিত থাকিলে মধ্যবর্ত্তী ইদিলপুর, কার্ত্তিকপুর, উত্তর ও দক্ষিণ সাহাবাজপুর, প্রভৃতি স্থানগুলি নিশ্চয় কেদার রায়ের অধিকারভুক্ত ছিল। এই হিসাবে পশ্চিমে পদ্মা, পূর্ব্ব উত্তরে ধলেশ্বরী, দক্ষিণদিকে আরিয়ল খাঁ নদী ও পূর্ব্বে মেঘনার সম্মিলিত সাগরাংশ এই চতুঃসীমা মধ্যবর্ত্তী স্থানগুলি, নিশ্চয় কেদার রায়ের হস্তগত থাকা বিবেচিত হয়।

মিঃ ফারনেন্‌ডে আরাকান, শ্রীপুর (বিক্রমপুর) চণ্ডীখান্ (যশোহর) এই তিনটী রাজ্যকে বাঙ্গালার অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাহেব লিখিয়াছেন, "মোগলদের পরাক্রম সত্ত্বেও ঐ প্রদেশাধিপতিরা যথেষ্ট প্রভুত্ব ভোগ করিত। বিশেষত চণ্ডীখান ও শ্রীপুরাধিপতিরা মোগল পরাক্রম সত্ত্বেও স্ব স্ব রাজ্যে সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন।** প্রবল

* মি. বিভারেজ কৃত বাখরগঞ্জ ইতিহাসের সাধারণ বিবরণ দেখ।

** Early Travels in India by Farnandez pp. 3 &. 11

পরাক্রান্ত মোগলাধিপত্য সময়ে যাঁহারা এইরূপে স্বাধিকৃত প্রদেশে সর্ব্বতোভাবে ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিতেন, তাঁহারা যে কম ক্ষমতাশালী ছিলেন, তাহা কোনরূপে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না।

চাঁদ ও কেদার রায়ের সময়ে বিক্রমপুরের রাজধানী 'শ্রীপুর' নামক স্থানে সংস্থাপিত ছিল। এতদ্ভিন্ন তাঁহাদের প্রচুর কীর্ত্তির নিদর্শন স্বরূপ অত্যুচ্চ ও মনোহর হর্ম্ম্যমালা, দেবালয় ও বৃহৎ জলাশয় প্রভৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া, [illegible] শ্রীপুর যথার্থ শ্রীস্থানীয় ও লোকলোচনানন্দদায়ী হইয়া উঠিয়াছিল। পরে [illegible] ও পদ্মার অন্যতর শাখা কীর্ত্তিনাশা নদীর উদ্ভবে ও তাহার প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে ঐ সকল কীর্ত্তিরাজি বিলোপপ্রাপ্ত হইয়া বিস্মৃতির চিরতামসে বিলীন হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি একমাত্র কীর্ত্তিনাশার সহিত উহার যে অর্থ সংযুক্ত রহিয়াছে, তাহাতেই রায় রাজগণের কীর্ত্তির কথাটা সময় সময় ক্ষণস্থায়ী তড়িৎবৎ অদ্যাপি মানবগণের মর্ম্ম স্পর্শ করিতে সমর্থ হয়।

বারভূঞা দল ক্রমে এইরূপ দুর্দ্ধর্ষ হইয়া পড়িল যে, বাদশাহের প্রতিনিধিরা তাহাদিগকে আর কোন মতেও বাধ্য রাখিতে পারিল না। দূরদূরান্তের [illegible] বিবেচনা করিতে লাগিল, এইবার বুঝি বঙ্গদেশ মুসলমানের হস্ত হইতে [illegible] হইয়া আবার হিন্দু সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। বঙ্গসন্তানেরা, কিছুকাল পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও বিশ্বাস রাখিয়া, কার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিধাতার কি বিধান যে, পরে কিন্তু তাঁহারা আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। সেই [illegible] করিয়া তাঁহারা পরস্পরের প্রতি হিংসানল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরিণামে সকলেই উহাতে পতঙ্গবৎ বিদগ্ধ হইয়া স্ব স্ব কর্ম্ম ফলানুযায়ী উপযুক্ত শাস্তি প্রাপ্ত হইলেন।

"আত্মদ্রোহিতা মহাপাপ" এই কথা ভারতবাসীরা যে কখনও বুঝিয়াছে, অথবা বুঝিবে, তাহা বিশ্বাসাতীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সত্যযুগই বল আর কলিযুগেই বল, ভারতের যত কিছু বীরানুষ্ঠান সীমাবদ্ধস্থানে স্বজাতীয়ের প্রতি অত্যাচারে প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতীয় রাজগণের অশ্বমেধ যৌটক, দিগ্বিজয়, রাজসূয় প্রভৃতি অনুষ্ঠান করিয়া, কখনই ভিন্নদেশে শুভগমন করে নাই। বিশেষতঃ পরকে ক্লেশ দিয়া প্রতিবাসীর গৃহভিত্তি উচ্ছিন্ন করিতে এই ভারতীয় জনগণ যতদূর মজবুত, বোধ হয় পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচরণ করিলেও এমন দ্বিতীয় জাতি মিলে কিনা সন্দেহ। বঙ্গদেশ, এই [illegible] একাংশ মাত্র সমভাবাপন্ন অপেক্ষা স্বজন-নিপীড়ন-স্পৃহা ইহাদের বরং এক ডিগ্রী উপরে। বঙ্গের মৃত্তিকার এমনই আশ্চর্য্য গুণ যে তদ্দারা শিব গড়িতে গেলেও বানর হইয়া দাঁড়ায়। উহা বঙ্গের নৈসর্গিক নিয়ম কি তদ্দেশীয় জনগণের ললাটের অদৃষ্টের দোষ তাহা আজিও নির্ণীত হয় নাই। আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত উহারা দশে মিলিয়া কোন কার্য্য এ পর্য্যন্ত করিতে পারিয়াছে কি না তাহা সাধারণ জনগণের অবিদিত নাই। বঙ্গীয় দ্বাদশ ভূম্যধিকারী স্বদেশ-উদ্ধার-কল্পে ব্রতী হইয়াছিলেন বটে কিন্তু পরে আর সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন নাই। কতিপয় স্বদেশদ্রোহীর প্ররোচনায় ও কূট মন্ত্রণা জালে পতিত হইয়া তাঁহার আত্মহারা হইয়াছিলেন। এবং পরস্পর একে অন্যের প্রতি অত্যাচার ও প্রভুত্ব স্থাপনের ক্রটি করেন নাই। উহার পরিণাম ফল এই দাঁড়াইল যে কেহই আর সঙ্কল্প সিদ্ধি করিয়া মস্তকোন্নত রাখিতে পারিলেন না। কাহারও মুণ্ড ধরায় নিপতিত হইয়া মুসলমান রাজার চরণচুম্বনে কৃতার্থম্মন্য হইল; যাঁহারা তদ্বিরীত আচরণ করিলেন তাঁহাদের মস্তক

মহম্মদীয়গণের অসি প্রহারে দ্বিখণ্ডিত হইয়া ধরাবলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। সেই স্বদেশ-প্রেমিকগণের দেশহিতৈষিতার ও আত্মত্যাগের কথা সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই বিস্মৃত হইল না।

গ্রহবৈগুণ্য বা দূরদৃষ্টবশত যখন মানব স্কন্ধে দুর্ব্বুদ্ধির আবির্ভাব হয়, তখন সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও তাহা অপনোদন করা সহজসাধ্য হইয়া উঠে না। দ্বাদশ ভূম্যধিকারীরা মিলিয়া মিশিয়া বাদসাহের হস্ত হইতে স্বদেশ উদ্ধার করিবার জন্য, অনেক দূর অগ্রসর হইলেন বটে, কিন্তু পরিণামে উহা, আকাশ-কুসুমবৎ কোথায় যাইয়া যে সরিয়া পড়িল, তাহা আর লোক-লোচনের আয়ত্তাধীন হইল না।

একটি সামাজিক বিষয় লইয়া, কেদার রায়ের সহিত তদীয় অমাত্য শ্রীমন্তখাঁর বড়ই মনান্তর ঘটিয়াছিল। কোটীশ্বরের দেবল ব্রাহ্মণকে গোষ্ঠীপতিত্ব পদ প্রদান করায়, প্রকৃত শ্রোত্রিয় শ্রীমন্ত উহার প্রতিকূলাচরণ করে। কিন্তু রাজাজ্ঞানুসারে পশ্চাৎ তিনি ঐ দেবল ব্রাহ্মণকে গোষ্ঠীপতি শ্রোত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হন। হীনভাবাপন্ন লোকের সমকক্ষ করায়, কেদার রায়ের প্রতি শ্রীমন্ত আন্তরিক ক্রুদ্ধ হন। তদবধি কি প্রকারে রাজশ্রী বিনষ্ট হইবে, এই দুশ্চিন্তা নিয়ত তাঁহার হৃদয়ে পরিপোষিত হইয়া আসিতেছিল। ইতিমধ্যে এমন এক মহা সুযোগ সংঘটিত হইল, যদাশ্রয়ে পাপিষ্ঠ অমাত্য আপনার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি, চরিতার্থ করিয়া লইতে, সম্পূর্ণ সক্ষম হইয়াছিল।

কোন সময়ে খিজিরাধিপতি ঈশা খাঁ, মিত্ররাজ কেদার রায়ের ভবনে শুভাগমনে করিয়া, তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করেন। খাঁ সাহেবের আগমনে শ্রীপুর নানারূপ আমোদ উৎসবে মাতিয়া উঠে। কেদার রায় যথাসাধ্য তাঁহাকে যত্ন ও অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিধাতার কি বিধান যে, এই আমোদ আহলাদই পরিণামে তাঁহাদের বন্ধুতাচ্ছেদের ও চির মনান্তরের কারণে পরিণত হইল।

চাঁদ রায়ের কন্যা স্বর্ণ বা সোণামণি, অসামান্য রূপলাবণ্যবতী ষোড়শী যুবতী রমণী ছিল। ভাগ্যদোষে বাল্যকালে তাহার পতির মৃত্যু হয়। তদবধি সেই লাবণ্যবতী বালবিধবা পিতা ও খুল্লতাতের আশ্রয়ে থাকিয়া, জীবন যাপন করিতেছিল। ঈশা খাঁ যখন বিক্রমপুরাধিপতি কেদার রায়ের ভবনে অবস্থান করেন, তৎকালে খাঁ সাহেব একদা কোন ক্রমে সেই ললনারত্ন সোণামণিকে দেখিতে পান। এই সন্দর্শনই বঙ্গের চিরপরাধীনতা স্খলনের প্রধান অন্তরায় হইয়া, মিত্ররাজদ্বয়ের পক্ষে, ঘোর মনোমালিন্যের কারণ হইয়া পড়ে।

ঈশা খাঁ, স্বদেশে প্রস্থানান্তর সোণামণিকে পাইবার জন্য চাঁদ ও কেদার রায়ের নিকট দূত প্রেরণ করেন। বোধ হয়, তাঁহার মনে এই বিশ্বাস ছিল যে বিধবা রমণীকে পরিত্যাগ করিতে, বিশেষতঃ তাঁহার মত যোগ্য ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিতে রায়রাজগণ কখনই অসম্মত হইবেন না। কিন্তু হিন্দুর, বিশেষতঃ একজন স্বাধীন পরাক্রান্ত নৃপতির নিকট ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর স্ত্রী কন্যা ভগিনী চাহিয়া পাঠান যে কতদূর ধৃষ্টতা, ফল প্রাপ্তির পূর্ব্বে পর্য্যন্ত তৎসাময়িক মুসলমানেরা অনেকেই তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

দূত প্রমুখাৎ ঈসা খাঁর মনোগত ভাব অবগত হইয়া, কেদার রায় তৎক্ষণাৎ সেই বার্ত্তাবাহককে দূরীকৃত এবং পরে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া প্রথমেই ঈশা খাঁর অধিকৃত কলা

গাইছার দুর্গ আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করেন। অতঃপর ঈশাখাঁ ত্রিবেণীর দুর্গে আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় গ্রহণ করেন। চাঁদ ও কেদার রায় ঐ দুর্গ আক্রমণ করিয়া খিজিরপুর লুণ্ঠন করেন। তখন খাঁ সাহেবের চৈতন্যোদয় হইল যে, হিন্দুর নিকট তাহাদের কন্যা ভগ্নী প্রার্থনা করিয়া কি মারাত্মক ব্যাপার সংঘটিত করা হইয়াছে। এখন যাহাতে উভয় দিক রক্ষা পায়, তাহার কোন সুযোগ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময় শ্রীমন্ত খাঁ, চাঁদ রায়ের সহিত খিজিরপুর অবস্থান করিত। রায় রাজগণের জয়াপেক্ষা পরাজয়ই তাহার আন্তরিক ইচ্ছা। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও সেই মনোগতভাব প্রকাশ করা দূরে থাকুক, বরং সমধিক বন্ধুতার ভাণ করিয়া চলিত। কোন সুযোগে এই অমাত্য ঈশা খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিলে পর, খাঁ সাহেব তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। তাহাদের পরস্পর কথাবার্ত্তার পর ঠিক হয়, যে কোন উপায় হউক, শ্রীমন্ত সোণামণিকে আনিয়া ঈশা খাঁর অঙ্কশায়িনী করিয়া দিবে। তৎপরিবর্ত্তে খাঁ সাহেব তাহাকে প্রচুর পুরস্কার প্রদান করিবেন। কিছু নগদ পুরস্কার গ্রহণান্তর শ্রীমন্ত ঐ সোণামণিকে করায়ত্ত করিবার জন্য, বিক্রমপুর প্রস্থান করে।

চাঁদ ও কেদার রায়ের অজ্ঞাতসারে, শ্রীপুর আসিয়া শ্রীমন্ত প্রকাশ করিল রাজাদ্বয় শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছেন। ঈশা খাঁ অচিরে সসৈন্যে শ্রীপুর আক্রমণ করিয়া, সোণামণিকে আত্মসাৎ করিবে। এই সংবাদ প্রচারিত হইবা মাত্র, রাজপুরীতে হাহাকার রব পড়িয়া গেল। কি রূপে রাজধানী ও সোণামণিকে রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহারই পরামর্শ চলিতে লাগিল। শ্রীমন্ত, রাজপরিজনকে পলায়নের পরামর্শ প্রদান করেন। কিন্তু সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রী বৈদ্য বংশীয় রঘুনন্দন চৌধুরী, তাহার কোন কথায়ই স্বীকৃত না হইয়া রাজধানী রক্ষার উপায়াবলম্বন করিতে লাগিলেন। এদিকে রাণী রাজ্য রক্ষার জন্য যতদূর সম্ভব ব্যস্ত না হউন কন্যা সোণামণিকে রক্ষার জন্য তদপেক্ষা অধিকতর উতলা হইয়া উঠিলেন। পরে শ্রীমন্তের প্ররোচনায় এই ঠিক হইল যে সোণামণিকে তাহার শ্বশুরালয় চন্দ্রদ্বীপে রাখিয়া আসিলে একরূপ নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে। রঘুনন্দন এই কথারও প্রতিবাদ করিলেন বটে কিন্তু রাণীকে কোন রূপেই স্বমতে আনিতে পারিলেন না। নৌকাযোগে রাজ কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠান স্থিরীকৃত হইলে ধূর্ত্ত শ্রীমন্তই তাহার রক্ষক হইয়া চলিল। এদিকে নাবিকদের সহিত পূর্ব্বেই শ্রীমন্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল তদনুসারে তাহারা চন্দ্রদ্বীপের পরিবর্ত্তে নৌকা সোণার গাঁ অভিমুখে চালাইয়া দিল। বলা বাহুল্য শ্রীমন্ত সোণামণির সহিত অচিরে সোণার গাঁ পৌঁহুছিয়া চাঁদ রায়ের সেই অসামান্য রূপলাবণ্যবতী তনয়াকে ঈশা খাঁর হস্তে সমর্পণ করিল। উহা এইরূপে সুসম্পন্ন হইল যে চাঁদ বা কেদার রায় এ বিষয়ের কিছুমাত্র পূর্ব্বে অবগত হইতে পারেন নাই। পরে যখন সমুদয় প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন মনঃক্ষোভে চাঁদ রায় যুদ্ধভার কেদার রায়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া খিজিরপুর হইতে স্বীয় রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন।

চাঁদ রায় রাজধানীতে পৌঁহুছিয়া অমাত্য বন্ধুবান্ধব কাহারও সহিত আর বাক্যালাপ করিলেন না কেবল অনশনব্রত অবলম্বন করিয়া কোটীশ্বরের মন্দির মধ্যে পতিত হইয়া রহিলেন। প্রবাদ আছে এই অবস্থায় দুই দিবস অতিবাহিত হইলে পর তদীয় ইষ্টদেবী তাঁহাকে স্বপ্নাবস্থায় দর্শন দিয়া বলিলেন, "বৎস, যাহা হইবার হইয়াছে, এখন অকারণে এই লোকক্ষয়কর যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত থাকাই শ্রেয়স্কর। এখন ভবিষ্যৎ বিপদ হইতে মুক্ত

হইবার জন্য বদ্ধপরিকর হও।” এই প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া চাঁদ রায় মনে ভাবিলেন যে, সোণামণিকে উদ্ধার করিতে পারিলেও আর তাহাকে সমাজে গ্রহণ করা যাইতে পারিবে না। বিশেষতঃ বাদসাহের সহিত যেরূপ বিবাদ বাধিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে কখন কি হয়, বলা যায় না। অতএব এই যুদ্ধ হইতে এখন বিরত থাকাই কর্ত্তব্য। তৎপর কেদার রায়কে যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া রাজধানীতে আসিবার জন্য বিশ্বস্ত দূত প্রেরিত হইল। এই সময় কেদার রায়, খিজিরপুর মথিত ও ঈশা খাঁর দুর্গগুলি বিধ্বস্ত করিয়া, তাহার আশ্রয়স্থান ত্রিবেণী দুর্গও অবরোধ করিয়াছিলেন। এখন ভ্রাতৃ আদেশ প্রাপান্তে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত দুর্গাবরোধ পরিত্যাগ করিয়া, স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

এই সকল ঘটনার পর, কন্যারত্ন হারাইয়া ও রাজ্যের পবিণাম চিন্তা করিয়া চাঁদ রায় অন্তিম শয্যায় শায়িত হন। সেই বীরজীবন, পরিণত বয়সে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া, কোটীশ্বরের পদমূলে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহজগতের সুখদুঃখের সহিত তাহার আর কোন সম্বন্ধ রহিল না। দুষ্ট ধূর্ত্ত বিশ্বাসঘাতক শ্রীমন্তখাঁ বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিয়া, খিজিরপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কেদার রায় বিক্রমপুরের সিঙহাসনে উপবেশন করিলে, আকবর বাদসাহের মৃত্যুর পর, ১৬০৬ খ্রীঃ অব্দে, সেলিম, জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করিয়া পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। পরে সেরকে হত্যা করিয়া, তৎপত্নী মেহেরুন্নেসাকে নূরজাহান নাম প্রদান করতঃ আপন সিংহাসনের অর্দ্ধাংশভাগিনী করিয়া লন। এই সময় বঙ্গীয় জমিদারেরা, বাদসাহের প্রতিকূলে নানারূপ ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। সুযোগ পাইয়া পর্ত্তুগীস গেঞ্জালিস্, চাঁদ রায়ের হস্ত হইতে সন্দ্বীপের আধিপত্য কাড়িয়া লইল। বারভূঞাদল একযোগে কোন কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত না হইয়া, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের সহিত তাঁহার জামাতা চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রাজা রামচন্দ্রের মনোমালিন্য ঘটিল। আবার রামচন্দ্রের সহিত ভুলুয়ার লক্ষণ মাণিক্যের বিষম শত্রুতা হইয়া দাঁড়াইল। বিক্রমপুরাধিপতি কেদার রায়ের সহিত খিজিরপুরের ঈশা খাঁর মস্‌নদই আলির অনৈক্য ও যুদ্ধাদির কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সকল অনর্থকর গৃহবিচ্ছেদে লিপ্ত থাকিয়া, বারভুঞা দল যখন স্বীয় স্বীয় পদে কুঠারাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই সুযোগে বাদসাহ অম্বরাদিপতি রাজা মানসিংহের প্রতি বাঙ্গালার বিদ্রোহী জমিদারদিগকে দমন জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। মানসিংহ ১৬০৫ খ্রীঃ অব্দে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা পদে নিযুক্ত হইয়া, রাজমহলে রাজধানী সংস্থাপন করেন। তৎকালে ভূম্যধিকারিগণ, বাদসাহের প্রতিকূলে যে কিরূপ উদ্ধত ভাব ধারণ করিয়াছিলেন তাহার একটী চিত্র জনৈক মুসলমান গ্রন্থকারের লিখিত বিবরণী হইতে উদ্ধৃত করিয়া এ স্থলে প্রদর্শন করা যাইতেছে।

“জাফর খুলনাৎ-উৎতওয়ারিখ নামক পারশ্য পুস্তক অবলম্বনে, লক্ষ্মৌ নিবাসী সের আমিজাফর ‘আরশ-ই-মহামিন্দ’, নামক যে উর্দ্দুগ্রন্থ ১৮০৫ খ্রীঃ অব্দে অনুবাদ করেন তাহাতে জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা) সম্বন্ধে এইরূপ জানা যায় “বাঙ্গালার জমিদারেরা নিতান্ত উদ্ধত ও অভদ্র হইয়া পড়িয়াছে তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় সম্রাট সরকারে রাজস্ব দেয় না উহারা তাহার প্রতিফল পাইয়াছে।”

মানসিংহের সময়ে বাঙ্গালার রাজধানী রাজমহল হইতে ঢাকাতে পরিবর্ত্তিত হয়। ঢাকা বাদসাহের নামানুসারে জাহাঙ্গীরনগর নামে প্রসিদ্ধ লাভ করে। বর্দ্ধমান ও ঢাকা এই

দুইটীকে প্রধান কেন্দ্র স্থান করিয়া মানসিংহ বার ভূঞাদল নির্ম্মূল করেন। মুসলমান ইতিহাস-লেখক, জমিদারগণকে অভদ্রই বলুন, বা যাহাই বলুন, কিন্তু তৎকালের প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তারাই যে সকল গোলযোগের মূল ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের অযথা আবদার ও অর্থ-লালসা পূর্ণ করিতে না পারায় অনেক ভূম্যধিকারী লাঞ্ছিত হন। এই কারণে আপনাদের মান ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য প্রধান প্রধান কয়েক জন জমিদার একত্র হইয়া বাদসাহের অধীনতা হইতে আপনাদিগকে স্বাধীন ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হন। জাহাঙ্গীরের সিংহাসনারোহণের সহিত সের সা হত ও তৎপত্নী মেহেরউন্নেসা অপহৃত হওয়ায় তাঁহার নিকট সুবিচারের আশাও কাহারও রহিল না; কাজেই বাদসাহের বিরুদ্ধে অনেক জমিদারই চলিতে লাগিলেন।

বঙ্গদেশে আগমন করিয়া মানসিংহ ভূঞাদলের মধ্যে মতভেদ জন্মাইয়া দিবার জন্য প্রয়াস পাইলেন। ভবানন্দ মজুমদার ও শ্রীমন্ত খাঁ প্রভৃতি তাঁহার সহায়তায় নিযুক্ত হইল। তাহারা মানসিংহকে ঘরের যাবতীয় বিবরণ প্রকাশ করিয়া দিল। সৈন্য কিরূপ ভাবে কোন পথে চালাইলে অনায়াসে যুদ্ধের সুবিধা হইতে পারে, তৎসমুদয়ের পরামর্শ প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইল না। মানসিংহ সমুদায় অবগত হইয়া রাজগণের নিকটে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দূত প্রেরণ করেন। যাহারা মানের প্রলোভনে বা ভয়ে অভিভূত হইয়াছিল, তাহারা বাধ্য হইয়া মোগল সেনাপতির আনুগত্য স্বীকার করায় মানসিংহ তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। ঈশা খাঁ বহুপূর্ব্বেই ভূঞাদল পরিত্যাগ করিয়া মোগলচরণে আত্মসমর্পন করে। অতঃপর মহারাজ প্রতাপাদিত্য, রাজা কেদার রায়, রাজা মুকুন্দ রায়, চাঁদ গাজী ব্যতীত আর সকলেই মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। ১৬০৬ খ্রীঃ অব্দের যুদ্ধে মহারাজ প্রতাপাদিত্য অমানুষিক বীর্য্য প্রকাশ করিয়াও দেশ রক্ষা করিতে পারিলেন না; পরে ধৃত হইয়া পিঞ্জরাবদ্ধ হন। পরে মুকুন্দ রায়ের রাজধানী ভূষণা আক্রমণ করিয়া মোগল সেনাপতি উহা বিধ্বস্ত ও হস্তগত করেন। তৎপর মোগল বাহিনী ক্রমে অগ্রসর হইয়া বিক্রমপুর আক্রমণ করে।

মানসিংহ শ্রীপুরের সন্নিকটবর্ত্তী হইলে তৎকর্তৃক কতিপয় দূত কেদার রায়ের নিকট প্রেরিত হয়। ঐ দূতের নিকট তরবারি ও শৃঙ্খল প্রদান করিয়া বলিয়া দেওয়া হয় যে, যদি কেদার রায় শৃঙ্খল গ্রহণ করিয়া বাদসাহের আনুগত্য স্বীকার করেন, তবে তদ্বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করা হইবে না; অন্যথা তরবারি গ্রহণ করিয়া যদি শত্রুতার ভাব প্রকাশ করেন, তবে অবশ্য যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বিনাশ করা হইবে। এতদ্ভিন্ন ঐ দূতের সহিত মানসিংহ কেদার রায়ের নিকট অতিরিক্ত একখানি লিপি প্রেরণ করেন। তাহাতে একটী শ্লোক লিখিত ছিল। দূত তরবারি, শৃঙ্খল ও ঐ লিপি লইয়া কেদার রায়ের নিকট উপস্থিত হয়।

দূত প্রভু-নির্দ্দিষ্ট বাক্যানুসারে যাবতীয় বিষয় কেদার রায়ের নিকট বর্ণনা করিয়া মানসিংহের প্রদত্ত পত্রও তাঁহাকে প্রদান করিল। কেদার রায় প্রথমে লিপি পাঠ করিলেন, উহাতে এইরূপ লেখা ছিল,—

"ত্রিপুর মঘ বাঙ্গালী কাক কুলী চাকালী
সকল পুরুষ মেতৎ ভাগ যাও পালায়ী।

হয়-গজ-নর-নৌকা কম্পিতা বঙ্গভূমি
বিষমসমরসিংহো মানসিংহঃ প্রয়াতি॥"

ইহা পাঠান্তে কেদার রায় উহার উত্তরসূচক আর একটী শ্লোক লিখিয়া দূতের হস্তে দিয়া বলিলেন, "যাও দূত, তোমার প্রভুকে গিয়া বল আমি তরবারি গ্রহণ করিলাম। তাঁহার যতদূর ক্ষমতা থাকে, তাহা প্রয়োগ করিতে তিনি যেন কুণ্ঠিত না হয়। হয় তাঁহার অস্ত্রাঘাতে আমার স্কন্ধ ছিন্ন হইবে, নতুবা তৎপ্রদত্ত এই অসির আঘাতে তাঁহারই মুণ্ড দেহ-বিচ্যুত হইয়া এই যুদ্ধের অবসান হইবে।" কেদার রায় উত্তরসূচক যে শ্লোকটী মানসিংহের নিকট প্রেরণ করেন, তাহা আমরা এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম,—

"ভিনত্তি নিত্যং করিরাজকুম্ভং বিভর্ত্তি বেগং পবনাতিরেকম্।
করোতি বাসং গিরিরাজশৃঙ্গে তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ॥"[১]

মানসিংহ, কেদার রায়ের বিবরণ শ্রবণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ শ্রীপুর অবরোধ করিবার জন্য সৈন্যগণকে আদেশ প্রদান করিলেন। আমরা এইস্থলে, কেদার রায়ের অন্যান্য কয়েকটী বিষয় উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ মানসিংহের সহিত তাঁহার সমরাভিনয়ের বর্ণনা করিব।

কেদার রায়ের গুরু গোসাঞি ভট্টাচার্য্য এই সময় রাজসকাশে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে যুদ্ধ ক্ষান্ত করিবার জন্য অনেক উপদেশ প্রদান করেন। কিন্তু কেদার, তাঁহার সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কোন দৈবানুষ্ঠান দ্বারা যাহাতে তাঁহার মঙ্গল হয়, সেই কার্য্যে ব্রতী থাকিবার জন্য গুরুদেবকে অনুরোধ করেন। অগত্যা গুরুদেব তৎকার্য্যসাধনমানসে, মৃন্ময়ী কালী প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া তদর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইলেন। গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ কেদার রায়ের এই কার্য্য হিতের পরিবর্ত্তে অহিতকর হইয়া দাঁড়াইল।

প্রবাদ আছে, গোসাঞি ভট্টাচার্য্য, তান্ত্রিক বীরাচারী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁহারা বৈদিকাচারী বা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মত কোন পূজা বন্দনাদি প্রায়ই অনাহারে অনুষ্ঠান করিতেন না। তন্ত্রানুযায়ী অনুষ্ঠান দ্বারা ইষ্টদেবীকে অন্ন ব্যঞ্জন উৎসর্গ করিয়া ঐ প্রসাদ গ্রহণান্তর, নিশীথে পুনরায় দেবীর পূজা-বন্দনাদি করিতেন। গোসাঞি, এই দিবসে আহার করিয়া, রাত্রিতে রাজ-নিয়োজিত পূজা করিতে যাওয়ায়, কেদার রায় রুষ্ট হন, অথচ গুরুদেবকে কিছু বলিতেও সাহস পান না। গুরুদেব পূজান্তে কেদার রায়কে আশীর্ব্বাদ নির্ম্মাল্য গ্রহণ জন্য, বার বার ডাকিয়া পাঠান, কিন্তু কেদার রায় আর তৎসমীপে আগমন করেন না। তৎকারণ কেদারের উপর গোসাঞির ক্রোধের উদ্রেক হয়। তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার অর্চ্চনার উপর শিষ্যের নিতান্ত অভক্তি জন্মিয়াছে, এই কারণে সে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিল না। তখন ব্রাহ্মণ ক্রমে তাঁর পরিচয় প্রদান জন্য তিনি সমবেত লোকমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দেখ, তোমাদের রাজার এই দেবার্চ্চনার প্রতি বড়ই সন্দেহ ও ঘৃণা জন্মিয়াছে। আমি তাহার কল্যাণকামনায়, নানা

(১) বৈদ্যবংশীয় বিশ্বনাথ সেন চাঁদ ও কেদার রায়ের সময়ে মুন্সীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, এই প্রত্যুত্তরের শ্লোকটী পণ্ডিত বিশ্বনাথের বিরচিত, যথা-

"চাঁদ রায় কেদার রায় বিক্রমপুর শাসব
বৃয়ীবংশী বিশ্বনাথ তৎপত্র লেখক।।"

গোপালকৃষ্ণ কবীন্দ্র কৃত অম্বষ্ঠ সম্পাদিকা দেখ।

উপদেশ প্রদান করিয়া, বাদসাহের আনুগত্য স্বীকার করিতে বলিলাম। সে যখন তাহা শুনে নাই, তখনই জানিয়াছি, তাহার কল্যাণ অসম্ভব। অতঃপর যদিও এই দৈব-কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করিয়া, তাহার রক্ষার্থ চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহাও সে উপেক্ষা করিল। অতএব তাহার অশুভ অনিবার্য্য। তোমরা আমার প্রভাব স্বচক্ষে অবলোকন কর। এই বলিয়া শাণিত খড়্গ তুলিয়া প্রতিমার বুকে আঘাত করিলেন। তৎক্ষণাৎ ঐ ক্ষত স্থান হইতে অবিরল ধারায় রক্ত পতিত হইতে লাগিল। দর্শকগণের আর আশ্চর্য্যের ইয়ত্তা রহিল না। গোসাঞি তৎক্ষণাৎ কোথায় চলিয়া গেলেন। এই সকল সমাচার অচিরে কেদার রায় শুনিতে পাইয়া ভয়ে অভিভূত হইলেন। পরে গুরুদেবের শরণাপন্ন হইবার অভিপ্রায়ে বাহিরে আসিয়া তাঁহার অনেক অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু আর দর্শন পাইলেন না।

বহুকাল হইতে বিক্রমপুরে দুইটী কালীক্ষেত্র পীঠস্থানবৎ [illegible]। তন্মধ্যে একটী চাঁচুরতলার "ঠারিণ বাড়ী" অপরটী মাঐসারে "[illegible] বাড়ী" [illegible] প্রসিদ্ধ। প্রবাদ চাঁচুরতলাতে ব্রহ্মানন্দগিরি এবং মাঐসারে গোসাঞি ভট্টাচার্য্য সিদ্ধ প্রাপ্ত হন।[1] ঐ উভয় স্থানে নানাস্থান হইতে, হিন্দুরা আসিয়া পূজা অর্চনাদি করিয়া থাকে। ঐ

(১) ব্রহ্মানন্দ সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনা শ্রুত হওয়া যায়, তন্মধ্যে যেটা বর্ত্তমান ইতিহাস সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য তাহাই বিবৃত করা হইল।

ব্রহ্মানন্দ তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের এক মহাসিদ্ধ পুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। চাঁদ রায় ও কেদার রায় তাঁহাকে যথোচিত ভক্তি করিতেন। তান্ত্রিক গুরুর শিষ্য হইলেও আচার বিষয়ে তাঁহারা উঁহার সমুদয় অনুশাসন মানিয়া চলিতেন না, বিশেষতঃ মদের প্রতি তাঁহাদের বিশেষ দ্বেষ ছিল।

একদা গিরিঠাকুর কারণপানে বিভোর হইয়া [illegible] সমাগত হন। রাজগণ তাঁহাকে পরমযত্নসহকারে গ্রহণ ও পদবন্দনা করিয়া, মদ্যপানের জন্য একটুকু বিরক্তি প্রকাশ করেন। তাহাতে ব্রহ্মানন্দ বলেন, দেখ তোমরা যে কার্য্য অসঙ্গত বিবেচনা কর, তাহা আমি সঙ্গত বিবেচনা করি, কিন্তু সাধারণের জন্য এই নিয়ম প্রযোজনীয় নয়, তাহাও স্পষ্ট বলিতে পারি। কারণ যে ব্যক্তি যে বিষয়ে শক্ত তাহার পক্ষে মাত্র উহা ব্যবস্থা হইতে পারে। তোমাদের [illegible] আছে, যে মদ্যপান করাইয়া আমাকে অজ্ঞান করিতে পার।

রাজগণ তাঁহার কথা শুনিয়া বহু পরিমাণে সুরার আয়োজন করিয়া তাঁহাকে [illegible] লাগিলেন। ব্রহ্মানন্দ অবলীলাক্রমে [illegible] আর মদে [illegible] হইতে উত্তপ্ত সুরা আসিতে লাগিল, [illegible] অনবরত পান করি[illegible] হইলে, রাজগণ আশ্চর্য্য [illegible] গিরিঠাকুরের পদে পতিত হইয়া [illegible] অন্যায়ানুষ্ঠানের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হইলেন

গিরি বলিলেন, [illegible] হইয়াছে, এখন আমি প্রস্রাব করিব, [illegible] সে স্থানের যাবতীয় [illegible] পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইব। [illegible] কাহারও অবিশ্বাস [illegible] তৎকালে রাজধানীর পশ্চিমদিকে [illegible] ছিল, সকলে তাঁহাকে [illegible] আনয়ন করিয়া প্রস্রাব করিবার স্থান দেখাইয়া দেওয়ায় ব্রহ্মানন্দ প্রস্রাব করিতে লাগিলেন। [illegible] আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিল, বাস্তবিক অরণ্যে যেন দাবানল উত্থিত হইয়া অচিরে সমস্ত পোড়াইয়া ভস্মে পরিণত করিয়া দিল। ঠাকুর অন্তর্হিত হইলেন।

তদবধি এই স্থান পোড়াগাছা নামে অভিহিত হয়। তৎপর ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি এই স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। মূলফৎগঞ্জের থানা, পোষ্টাফিস এইস্থানে পরে উঠিয়া আইসে। এই স্থান পূর্ব্বে একটী প্রধান বন্দর ছিল। রাজনগর ও এই স্থান একসময়ে কীর্ত্তিনাশার গর্ভস্থ হয়

পোড়াগাছাবাসী বৈদ্য শিয়াল সেনের বংশধর [illegible] পরিচিত। এখানকার ত্রিপুরগুপ্তগণ পূর্ব্বে কালায়াবাসী ছিলেন, তাঁহাদের শেষ বংশধর [illegible] দেওয়ান [illegible] লালা রাম প্রসাদের পুত্র লালা জয়নারায়ণের [illegible] পোড়াগাছা [illegible] বাসস্থাপন করেন। রাজপাশা গ্রাম নদী কর্ত্তৃক [illegible] রামসেনের বংশধরগণ ঐ গ্রামে বাস করিতেন। অধুনা এই বৈদ্যগণ কুরাশী দাসারতা ও কোটাপাড়া ও কোয়রপুর বাস করিতেছেন।

সময়ের তান্ত্রিক গুরুগণ সম্বন্ধে আরও নানারূপ উপাখ্যান শুনিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বানন্দ ঠাকুর মেহার প্রদেশে দশমহাবিদ্যা সিদ্ধি করিয়া, উহার মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করণান্তে স্বয়ং সর্ব্ববিদ্যাবলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। বিল্বপুকুর-নিবাসী রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্য* সিদ্ধিলাভ করিয়া "বেলপুকুরে ভট্টাচার্য্য" নামে প্রসিদ্ধ হন। আমরা এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করায় হয়ত পাঠক মহোদয়গণ বিরক্ত হইতে পারেন, তবে তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত যে প্রাচীন বিবরণ সংগ্রহ করা বড়ই সুকঠিন ব্যাপার। বহু চেষ্টায় যতটুকু জানা যায়, তাহা পরিত্যাগ করিতে, কোন মতেও ইচ্ছা জন্মে না। এখন উহা পরিত্যাগ করিলে, ভবিষ্যতে আর পাইবারও সম্ভাবনা অতি অল্প। এই কারণে অস্বাভাবিক গল্প বলিয়া বিবেচিত হইলেও উহার কতকটা না রাখিয়া পারা যায় না। কেদার রায় মাতৃনির্দ্দেশ ক্রমে এই পীঠস্থানবৎ চাচুরতলার নিকটে অপর একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি রাজাবাড়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই স্থানে বাস করিয়া, অনায়াসে দেবীর অর্চ্চনা করা যাইতে পারিবে, এই মানসেই এ বাড়ী নির্ম্মিত হয়। রালফ ফিচ ভ্রমণবৃত্তান্ত পুস্তকে লিখিয়াছেন, এই রাজাবাড়ীর ১৮ মাইল ব্যবধানে ঈশা খাঁ মসনদ আলির রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল।

এই রাজাবাড়ীর অনতিদূরে "কেশার মার দীঘী" নামে এক বৃহৎ জলাশয় ছিল। প্রবাদ, কেশার মা বা কেশবের মাতা, পতি-পুত্রহীনা হইয়া, পতি-কুলের প্রভু চাঁদ রায়ের আশ্রয়ে থাকিয়া জীবন যাপন করে। বিক্রমপুর অঞ্চলে সিকদার বা নফর বলিয়া এক সম্প্রদায় কৃতদাস আছে; তাহাদের রমণীরা বিপন্ন অবস্থাতে এইরূপে প্রভুকুলের আশ্রয় গ্রহণান্তর, প্রভুপরিবারের অপরাপর রমণীর ন্যায়, স্বচ্ছন্দে কালাতিবাহিত করিয়া থাকে। এই সিকদার শ্রেণীর মধ্যে যাহারা প্রভুপুত্রের 'ধাই ভাই' হইতে পারে, তাহারা বহু সম্মান বোধ করিয়া থাকে। ধাই ভাই বিক্রমপুরের 'আতা ভাই' বলিয়া প্রসিদ্ধ। কেদার রায় জন্মগ্রহণ করিলে পর, কেশার মাকে তাঁহারা ধাত্রী-পদে নিযুক্ত করিয়া, রাজা পুত্রের প্রতিপালনভার তৎকরে ন্যস্ত করেন। কেদার রায় বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে পর, ধাত্রীর ইচ্ছানুসারে এই বৃহৎ জলাশয় খনন করাইয়া তদ্দারা উৎসর্গ করাইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত উহার নাম হয় "কেশার মার দীঘী।" আরও প্রবাদ, কেশার মা যতদূর হাঁটিয়া যাইতে পারিবে, ততদূর পর্য্যন্ত এই সরোবর খনিত হইবে বলিয়া কেদার রায় প্রতিশ্রুত হন। তদনুসারে ধাত্রী প্রায় ১ মাইল ব্যাপী স্থান হাঁটিয়া অতিক্রম করার পর অন্য কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া গমনে ক্ষান্ত হয়। এজন্য দীঘীও এক মাইল ব্যাপী স্থান লইয়া খনিত হইয়াছিল। অদ্যাপি উহার ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। উহার তীরস্থ বন্দর "দীঘীর পাড়ের হাট" নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

বিক্রমপুরান্তর্গত শ্রীপুর গ্রামে কেদার রায়ের রাজধানী ছিল। বস্তুতঃ চাঁদ রায় উহার প্রতিষ্ঠা সাধন করিয়াছিলেন। উক্ত রায়গণের জ্ঞাতি যাঁহারা অদ্যাপি বিক্রমপুর বাস

* গোসাঁঞি ভট্টাচার্য্যের দৌহিত্র রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পিতার নাম যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতার নাম লীলাবতী। এই বেলপুকুরের ভট্টাচার্য্যবংশীয়গণ মধ্যে কয়েক ঘর বিক্রমপুর অঞ্চলে বাস করেন; জপসা, রাজনগর, নড়িয়া এই তিন গ্রামে বহুকাল তাঁহাদের বংশধরগণ বাস করিয়া নদী কর্ত্তৃক গ্রাম বিনষ্টের পর অধুনা সিরঙ্গল, পালং, লোণসিংহ, চান্দনী, ছয়গা প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন। ইহাদের বহু কুলীন ব্রাহ্মণ, ঘটক শিষ্য আছে।

করিতেছেন, তাঁহারাও রায় উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। দক্ষিণ বিক্রমপুরের দেভোগ গ্রামে এবং উত্তর বিক্রমপুরের মূলচর গ্রামে ইহাদের জ্ঞাতি আছে বলিয়া জানা যায়। এজন্য নিঃসন্দেহে বোধ হয় যে, চাঁদ রায়ের ঊর্দ্ধতন পুরুষে কেহ শ্রীপুর বাস করিতেন এবং সেই মহাত্মা হইতেই কতিপয় শাখা প্রশাখা বাহির হইয়াছিল। অন্যথা তাঁহাদের জ্ঞাতিবংশ বর্ত্তমান থাকিবার সম্ভাবনা কি? তবে চাঁদ রায় ক্ষমতাশালী হইয়া শ্রীপুরের যথার্থ শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

শ্রীপুর বিক্রমপুরের রাজধানী ছিল। তথায় রাজপ্রাসাদ, সৈনিকাবাস, বিচারালয়, কারাগার, কোষাগার, প্রভৃতি রাজোচিত যাবতীয় বন্দোবস্ত ছিল। তৎসন্নিহিত আলাফুল-বাড়িয়া স্থানে বিস্তৃত বন্দর এবং কোটীশ্বর নামে দেবালয় ছিল। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি তৎকালে কীর্ত্তিনাশা নামে কোন নদীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ছিল না। একটা ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া বক্রভাবে চলিয়া গিয়াছিল। উহা কালীগঙ্গা নামেও পরিচিত। ঐ নদীতীরে শ্রীপুর রাজধানী বিদ্যমান ছিল। জনশ্রুতিতে প্রকাশ, এক ক্রোর টাকা বেদিমূলে প্রোথিত করিয়া তদুপরি এই কোটীশ্বর সংস্থাপিত[1] এবং স্থাপিত স্থানটীও ঐ অভিধান প্রাপ্ত হয়। এই কোটীশ্বরপল্লীতে রায়গণ কর্ত্তৃক দশমহাবিদ্যা এবং স্বর্ণনির্ম্মিত দশভূজা দুর্গামূর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। সর্ব্বসাধারণের নিকট উহা "স্বর্ণময়ী" নামে, প্রসিদ্ধ হন। এই দেবালয় অথবা দেবমূর্ত্তি এখন কিছুই বিদ্যমান নাই। তবে রায়বংশের দুই চারিটী কীর্ত্তির ক্ষীণরেখা বর্ত্তমান থাকিয়া আজিও তাঁহাদের নাম সময়ে সময়ে দর্শকগণকে স্মরণ করাইয়া দেয়। তাহার বিবরণ যতদূর পারিলাম, পাঠক মহোদয়গণের কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য তাহাই নিম্নে বিবৃত করা হইল।

কাচকির দরজা। উহা এক বৃহৎ রথ্যা-ইদিলপুরের নিকটস্থ বুড়ীর হাট ও দেওভোগ স্থান হইতে উহার এক শাখা আরম্ভ হইয়া বিক্রমপুর ভেদ করিয়া উত্তর দিকে বরাবর ধলেশ্বরী নদীর তট পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিল। অপরটি মেঘনা নদীর তট হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম দিকে বরাবর পদ্মাতট পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। রাস্তা দুইটি বক্রগতিতে নানা জনপদ ঘুরিয়া ফিরিয়া যাওয়ায় বিক্রমপুরের অধিকাংশ গ্রামের যাতায়াতের সুবিধা ছিল।

---

[1] যদি কাহারও মনে কোটি টাকার উপর দেবমূর্ত্তি সংস্থাপন সম্বন্ধে সন্দেহ হয়, তবে তাঁহাদের প্রবোধার্থে বলিতেছি, তাঁহারা একবার, সোমনাথদেব ও জগন্নাথদেবের অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা স্মরণ করিয়া দেখুন। এই সম্পত্তির অধিপতি বলিয়া, বিগ্রহদ্বয়কে মুসলমান হস্তে কত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। প্রাচীন কাল হইতেই কোন দেবতা প্রতিষ্ঠাকালে তন্নিম্নে বেদিমূলে অন্ততঃ এক খণ্ড অষ্টধাতু ও অষ্টরত্ন দিবার প্রথা চলিয়া আসিয়াছে। প্রবাদ বাক্যেও এইরূপ দেবতার গৃহে কতজন কত অর্থ পাইয়াছে, এইরূপ কথা শুনা যায়। প্রবাদ-বাখরগঞ্জ জিলার কোন কায়স্থ জমিদারবংশের পূর্ব্বপুরুষ ছাগ বিক্রয় করিতে গিয়া বাগেরহাট অঞ্চলে কোন দেবগৃহ নদী কর্ত্তৃক ভগ্ন হইবার সময় তন্মধ্যে হইতে বিপুল মুদ্রা পতিত হইতেছে দেখিয়া, অজপাল নৌকা হইতে তটে নামাইয়া দিয়া, সেই নৌকাতে ঐ মুদ্রা ভরিয়া লইয়া যান এবং তদদ্বারা ক্রমে বড় বিষয় সম্পত্তি ক্রয় করিয়া জমিদার হইয়া বসেন। নড়াইলের জমিদার সুবিখ্যাত রামরতন রায় ও হরনাথ রায়ের সহিত মনোমালিন্য প্রযুক্ত তাঁহাদের পিতৃব্য পুত্রদ্বয় দুর্গাদাস রায় ও গুরুদাস রায় গৃহবহিস্কৃত হন। পরে তাঁহাদের পৈতৃক সংস্থাপিত রূপাপাতের কালীদেবীর বেদির নিম্নে লক্ষাধিক টাকা পাইয়া, দুর্গাদাস ও গুরুদাস তদবলম্বনে রতন বাবুর সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যখন এইরূপ আরও অনেক কথা শুনা যায়, তখন চাঁদ ও কেদার রায়ের মত একজন স্বাধীন রাজার পক্ষে এক কোটি টাকার উপর বিগ্রহ সংস্থাপন কিছু আশ্চর্য্য নহে।

সেনরাজগণের সময়ে যে সমস্ত রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার কতকাংশ এই কাচকির দরজার সহিত পরে সংযোজিত হয়। সুতরাং এই রাস্তার সমুদয় ভাগ রায় মহাশয়দের নিজকৃত নয়। এই পথটির অধিকাংশ এখন কীর্ত্তিনাশা নদীর কুক্ষিগত হইয়াছে। স্থানে স্থানে যাহা আছে, তাহা পরে কোথাও বা ভগ্ন হইয়া ক্ষেত্রে, কোথাও বা লোকালয়ে, এবং অবশিষ্ট শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যানীতে পরিণত হইয়াছে। ১৪/১৫ বৎসর অতীত হইল পালং ষ্টেসন হইতে যে রাস্তাটি ভোজেশ্বর পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছিল উহার অধিকাংশ এই কাচকির দরজার উপর দিয়া চলিয়া আসিয়াছিল। এই রাস্তাটির উৎপত্তি সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় যে, কেদার রায়ের মাতার অদৃষ্ট গণনা করিয়া কোন জ্যোতির্ব্বিদ বলিয়াছিল, মৎস্যের কণ্টক বিদ্ধ হইয়া তাঁহার মৃত্যু সংঘটন হইবে। এই কারণে কেদার রায় রাণীর জন্য কণ্টকহীন মৎস্যের ব্যবস্থা করেন। কাচকির গুড়া নামে এক প্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য নদীতে সর্ব্বদা পাওয়া যায়। সেই মৎস্য পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী নদীতে প্রত্যহ ধৃত হইয়া যাহাতে সুবিধামত রাণীর জন্য পৌঁছিতে পাবে, তন্নিমিত্ত চাঁদ রায় কর্ত্তৃক এই রাস্তার পত্তন আরম্ভ হইয়া কেদার রায়ের সময়ে পরিসমাপ্ত হয়। কথার মূলে যাহাই থাকুক, কাচকিমৎস্য ধৃত করিবার ব্যপদেশে উহার সৃষ্টি এই কিংবদন্তীই চলিয়া আসিয়াছে, এবং এইজন্য রাস্তার নামও "কাচকির দরজা" হইয়াছিল। প্রবাদ সত্য বা মিথ্যা হউক, কিন্তু এই চতুর্দ্দিক প্রসারিত পথগুলি যখন পর্ণাবয়বে, বিক্রমপুরে বিদ্যমান ছিল, তখন তদ্দেশবাসীরা যে বর্ত্তমান অধিবাসিগণের অপেক্ষা অধিক সুখস্বচ্ছন্দে যাতায়াত করিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কেদার বাড়ী। কেদার রায় কার্ত্তিকপুর, ও বিক্রমপুর এই পরগণাদ্বয়ের সন্ধিস্থলে এক প্রকাণ্ড বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। উহার চতুর্দ্দিক সুপ্রশস্ত পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছিল; রাশীকৃত ইষ্টকাবলী সংগৃহীত হইয়া কয়েক খানা অট্টালিকার ভিত্তি পর্য্যন্ত গ্রথিত হয়; কিন্তু উহা আর সম্পন্ন হইয়া উঠে না। আজি পর্য্যন্ত ও সর্ব্বসাধারণে ঐ স্থানকে কেদার বাড়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এই গ্রাম পালং ষ্টেসনের অন্তর্গত। বর্ত্তমান সময়ে কেদার বাড়ীতে কতিপয় ধনী সাহা সন্তান বাস করিয়া কেদার বাড়ীর নাম উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

রাজবাড়ীর মঠ।—কীর্ত্তিনাশা নদীর তটে এতাদৃশ প্রাচীন কীর্ত্তি আর এখন দেখা যায় না। উত্তাল তরঙ্গময়ী স্রোতস্বতী খরবেগে যেমন একদিকে চলিয়া যাইতেছে, তেমন আপনার গতি সঞ্চালন করিয়া এক একবার ঐ উচ্চ মন্দিরের প্রতি বক্র দৃষ্টিপাত করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না। পরবর্ত্তী কত অত্যুচ্চ সুদৃশ্য হর্ম্ম্যরাজী, কীর্ত্তিনাশার উদরস্থ হইয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, জানি না, কেদার রায়ের কি পুণ্যবলে এই মঠ অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার যশের একটি ক্ষীণ জ্যোতি লোকলোচনের সম্মুখে ধরিয়া দিতেছে। এই মঠ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে যতদূর বিবরণ অবগত হওয়া যায়, উহা গ্রন্থান্তরে প্রকাশ করা যাইবে।

চাঁদ ও কেদার সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ বারভূঞা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে, এস্থলে অতঃপর সংক্ষেপে মানসিংহের সহিত কেদার রায়ের যুদ্ধ বিবরণ প্রদান করা হইল।

দেশীয় প্রবাদ মতে কেদার রায় গুপ্ত ঘাতকের হস্তে প্রাণত্যাগ করেন, কিন্তু

আকবরনামা প্রণেতা বলেন, যুদ্ধক্ষেত্রেই এই বীরবলের পতন হয়। আমরা ঐ অংশ উক্ত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

কেদার রায় ও ঈশা খাঁ এক দলবদ্ধ হইয়া, মোগল বাদসাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, এই সময়ে ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে বিপুল বাহিনী ও রণতরী সুসজ্জিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও কালীগঙ্গার তটও সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। মোগল সেনাপতি বাজ বাহাদুর বিপুল আয়োজন করিয়া কেদার রায়কে দমন করিবার জন্য শ্রীপুর উপনীত হন। কিন্তু কেদার রায়ের বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া মানসিংহের নিকট আরও সৈন্য সাহায্য চাহিয়া পাঠান। রাজা মান তৎক্ষণাৎ একদল সুশিক্ষিত সৈন্য বাজ বাহাদুরের সাহায্যার্থে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং পশ্চাৎ অনুসরণ করেন। মানসিংহ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কেদার রায়কে পরাস্ত করেন বটে, কিন্তু তাহার রাজ্য গ্রহণ করেন নাই।* সম্ভবতঃ সেই যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া কেদার রায়ের একটী কন্যাকে গ্রহণ করেন।+

আকবর বাদসাহের রাজত্বের ৪৮ বৎসরে ১৬০৩ খ্রীঃ পুনরায় কেদার রায় মোগলের বশ্যতা অস্বীকার করেন, এই সময়ে তাহার সহিত ঈশা খাঁর বিবাদ হয়। ঈশা মোগল পদে মস্তক অবনত করিয়াছে, এক মাত্র মগরাজকে অবলম্বন করিয়া কেদার বঙ্গমাতার স্বাধীনতা সংরক্ষণপ্রয়াসে বদ্ধপরিকর। কেদার রায় পাঁচশত জাহাজ সংগ্রহ করিয়া মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ কিলমককে অবরোধ করিয়া ফেলিলেন, এবার ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল, মোগল সেনা পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিতে অসমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু মানসিংহ পুনরায় বহু সৈন্যসহ যুদ্ধস্থলে উপনীত হইয়া শ্রীপুর অবরোধ করিলেন। আকবরনামাতে দেখা যায়, কেদার রায় ভয়ানক যুদ্ধে আহত হইয়া ধৃত হন—কিন্তু মানসিংহের নিকট আনীত হইবার অল্পক্ষণ পরেই তিনি সেই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া সুরলোকে প্রস্থান করেন।**

বারভূঞাগণের মধ্যে যদি কাহাকেও সর্ব্ব প্রথম আসন প্রদান করা কর্ত্তব্য হয়, আমাদের বিবেচনায়, তবে তাহা বিক্রমপুরের কেদার রায়েরই প্রাপ্য। ঈশা খাঁ মসনদ আলী সর্ব্ব প্রধান ছিলেন বটে, কিন্তু পরিণামে তিনিও মোগল পতাকামূলে মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইলেন। অধিকাংশই তৎপথাবলম্বন করেন, করিলেন না কেবল তিনটী মহাপ্রাণ, বিক্রমপুরের কেদার রায়, ভূসণার মুকুন্দ রায় ও যশোহরের প্রতাপাদিত্য। আকবরনামাতে কেদার রায় ও মুকুন্দরাম রায়ের নাম স্পষ্ট উল্লেখ আছে, জানি না প্রতাপাদিত্যের নাম উহাতে উল্লেখ নাই কেন। এমন কি, এখন দেখা যায়, যে শীলাময়ী মানসিংহ বঙ্গদেশ হইতে জয়পুর স্বীয় রাজধানীতে লইয়া যান, তাহাও প্রতাপাদিত্যের গৃহদেবী নন, কেদার রায়ের গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়াই অবগত হওয়া যায়।[১]

* ইলিয়াট ১০৬ পৃষ্ঠা কালাম ৩।

\+ মেঘনাদ ভট্টাচার্য্য প্রেরিত প্রবন্ধ, সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা। জয়দেবপুরের ইতিহাস দেখ।

** ইলিয়াট ১১৬ পৃষ্ঠা আকবরনামা। এই যুদ্ধ যেস্থান হয়, উহা ফতেজঙ্গপুর নামে পরিচিত।

১. ঐতিহাসিক চিত্র ১৩১৪ সন ১৬ পৃষ্ঠা। কেদার রায় প্রতিষ্ঠিত ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত লাখরিয়ার চৌধুরীদের বাটীতে অদ্যাপি প্রতিষ্ঠিত আছে। দশমহাবিদ্যা শক্তি মধ্যে উহা চতুর্থ স্থানীয়।

## নয়পাড়ার চৌধুরী

বারভূঞার পতনের পর, তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি নানা বিভাগে বিভক্ত হইয়া আবার বহু জমিদারের অভ্যুদয় হয়। কেদার রায়ের জমিদারী নিজ বিক্রমপুর নয়পাড়ার ভরদ্বাজ গোত্রজ বৈদ্য চৌধুরীদের হস্তগত হয়। প্রথম জমিদার রঘুনন্দন অতি সচ্চরিত্র এবং বীর পুরুষ ছিলেন। এজন্য মানসিংহ তাঁহার হস্তেই ঐ জমিদারী ন্যস্ত করেন। রঘুনন্দন জমিদারী লাভ করিয়া স্বদেশের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়া তুলেন। নানাস্থান হইতে নানা শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত লোক আসিয়া এই সময়ে তথায় বাস করিতে আরম্ভ করেন। বিশেষ বৈদ্য সম্প্রদায় মধ্যে তাঁহার স্থান অতি নিম্নে ছিল, এজন্য যশোহরাঞ্চল হইতে বহু সম্ভ্রান্ত বৈদ্য আনিয়া স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠা করেন।[২] ক্রমে দুই তিন পুরুষ পর যাঁহারা এই বংশে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন তাঁহারা কিন্তু আর কাহাকেও সম্মানী বলিয়া গ্রাহ্য করিতেন না। নানারূপ অত্যাচার অবিচার চলিতে লাগিল। শুনা যায়, ইহারা সাড়ে সাত শত ঘর লোককে ক্রীতদাসের কার্য্যে নিযুক্ত করেন, ভদ্রলোকের বাটীর নিকট দিয়া, অশ্লীল সারি গাহিয়া বাইচের নৌকা চালাইতেও ইতস্ততঃ করিতেন না।

অত্যাচারের মাত্রা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া সকল শ্রেণীর উপরই চলিতে লাগিল, একদা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা, যাঁহাদের পদধূলি পড়িলে, আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন, সেই সকল স্বজাতীয়দিগের এখন আর তাঁহারা মনুষ্য বলিয়াই বিবেচনা করিতেন না।

দিন কাহারও সমানে যায় না, এদিকে বৈদ্য বংশের মধ্যে যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে কেবল কৌলিণ্য ও ঔষধ সম্বল করিয়া এতকাল জীবনযাপন করিতেছিলেন, এখন আবার তাঁহাদের বংশধরেরা অনেকেই সংস্কৃত শ্লোকাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, পারস্য ভাষায় মনোনিবেশ করিলেন। অচিরাৎ ফলও ফলিল, তন্মধ্যে অনেকে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। এই সময় তাহাদের নিকট জমিদারের অন্যায় অত্যাচার বা আদব কায়দা ভাল লাগিত না। বোধ হয় সকলেই অনুমান করিতে পারেন যে, মানব যতই উন্নতিলাভে অগ্রসর হয়, ততই তাহার দৃষ্টি তদপেক্ষা উন্নতমানের প্রতি পতিত হয়; আর যাহাতে তাহারা সেই পদ লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য বদ্ধপরিকর হয়।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে বিক্রমপুরস্থ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় মধ্যে পাণ্ডিত্যের প্রাধান্য ব্যতীত বৈষয়িক বিষয়ে বড় কেহ লিপ্ত ছিলেন না। স্বাবলম্বনে এই সময়ে বৈদ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে জপসার রায়, সোনারঙ্গের ও সোমকাটের ভূঞা বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন।

ক্রমে এই কয়েক ঘর একত্রিত হইয়া জমিদারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। জমিদারও নূতন অভ্যুত্থিত প্রজাগণকে দমন জন্য নিত্য নূতন অত্যাচারের সৃষ্টি করিতে লাগিলেন, উভয় পক্ষের দাঙ্গা হাঙ্গামায় বিক্রমপুর উৎসন্ন হইতে বসিল। এই কথা ক্রমে ঢাকার সুবেদারের কর্ণগোচর হইল। এই সময় সুবেদার সরফরাজ খাঁর প্রতিনিধি ঘালেব আলি খাঁ ঢাকার নায়েব এবং যশোবন্ত রায় তাঁহার দেওয়ান ছিলেন।

প্রজারা জমিদারের বিরুদ্ধে নানারূপ অত্যাচারের, আবার জমিদার পক্ষ হইতে

২. এই রঘুনন্দন চাঁদ কেদার রায়ের প্রধান অমাত্য ও রঘুনন্দন চৌধুরী ইদিলপুরে কায়স্থ চৌধুরীগণের পূর্ব্বপুরুষ সেনাপতি ছিলেন। ক্রমবশতঃ তৎবংশীয় কমল শরণকে সেনাপতি বলা হইয়াছিল।

তাহাদের বোট ও বাইচের নৌকা ভঙ্গের বাবদ অভিযোগ উপস্থিত হইল, প্রমাণে জমিদার পরাস্ত হইলেন। সমবেত প্রজামণ্ডলীর কাতর ক্রন্দনে, ঘালেব আলি খাঁ ও যশোবন্ত রায় ব্যথিত হইলেন, প্রজারা বলিল, যদি অতঃপর আর জমিদারের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করা হয়, তবে আর তাহাদের মান সম্ভ্রম রক্ষা পাইবার উপায় নাই। ইহার পর রাজাজ্ঞাও প্রচার হইল, অতঃপর যে কোন প্রজা জমিদারের অধীন হইতে আপন বিষয় সম্পত্তি নবাব সরকারের সেরেস্তায় নাম পত্তন করিবে, তাহাদের সহিত জমিদারের আর কোন সংস্রব থাকিবে না। যেমন হুকুম প্রচার, অমনি সাত শত আবেদনকারী আসিয়া স্ব স্ব জমা জোত সম্বন্ধে নবাব সেরেস্তায় নাম পত্তন করিয়া লইল।[১]

সেই দিন হইতে নয়পাড়া রাজলক্ষ্মী চির অন্তর্হিত হইলেন, এ দিকে বিক্রমপুরের প্রজামণ্ডলীর স্বাধীনতা লাভের সহিত দিন দিন উন্নতি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আজ বিক্রমপুরের যে এতটা উন্নতি দেখা যায়, তাহার প্রধান কারণ জমিদারের হস্ত হইতে নিস্কৃতি লাভ। দেওয়ান যশোবন্ত রায়ের রাম রাজ্যের ফল বিক্রমপুরবাসিগণ অদ্যাপি সম্ভোগ করিয়া সেই মহাত্মার আত্মার চির কল্যাণ কামনায় কীর্ত্তনাশার উভয় তীর হইতে সমভাবে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছে। আর যে বীরগণের স্বার্থত্যাগ ও উদ্যোগে এই দাসত্বের মোচন, তাঁহারাও সমুদয় বিক্রমপুরবাসিগণের নিকট অদ্যাপি দেববৎ প্রতীয়মান হইতেছে।

বিক্রমপুর এইরূপে জমিদারগণের হস্ত ভ্রষ্ট হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে যে অংশ হুজুরি সেরেস্তার অন্তর্গত থাকে, তাহার রাজকর আদায় হইত ১৭২৮ খ্রীঃ অব্দের বন্দোবস্তে ১৪২৬১ টাকা ও ১৭৬৩ খ্রীঃ অব্দের বন্দোবস্তে বৃদ্ধি পাইয়া ২৪৫৬৫ টাকা। উহার তহশীলদার ছিলেন রাজারাম,[২] জপসার কৃষ্ণরাম দেওয়ানের ভ্রাতা। অপর অংশের নাম বিক্রমপুর সাহাবন্দর; বিক্রমপুর পরগণাও তদন্তর্গত সাহাবন্দর নামে একটি সায়র মহাল হইতে উহার রাজস্ব আদায় হইত ১২৫০০০ টাকা, সাহাবন্দর দক্ষিণ বিক্রমপুরান্তর্গত নরিকুল গ্রামের পশ্চিম দক্ষিণ; দেভোগ গ্রামের দক্ষিণ ও জপসা গ্রামের উত্তর কালীগঙ্গাতটে বড় জাকাল বন্দর ছিল। দেশী বড় বড় মহাজন ও পার্টুগীশ; ইংরেজদের কুঠী পর্য্যন্ত এই স্থানে বাণিজ্যব্যপদেশে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কালীগঙ্গা মজিয়া গেলে এই বন্দরেরও পতন হয়। এইস্থলে ফৌজদার অবস্থান করিতেন। মসজিদ তৎসংসৃষ্ট পারস্যভাষা শিক্ষার জন্য একটী মখতব ছিল। এই মখতবে বিক্রমপুরের বহু গ্রামের জনগণ পারস্যভাষা অধ্যয়ন করিতেন। নদী কর্ত্তৃক দেভোগ ও নরিকুর ভগ্ন হইবার পূর্ব্বপর্য্যন্ত এই মসজিদ ও একটী ইষ্টকানর্ম্মিত সেতুর ভগ্নাবশেষ এই স্থানে দৃষ্ট হইত। বহু ব্যবসায়ী স্বর্ণবণিক কর্ম্মকার সাহা, ও জোলা (মোসলমান বস্ত্রবয়নকারী) মুসলমান জাতীয় কাগজ প্রস্তুতকারী (কাগজী) বন্দর থাকা সময়াবধি গ্রামবধ্বংসের শেষ পর্য্যন্ত এই স্থানে বাস করিয়াছে। পরে বহু ব্রাহ্মণ কায়স্থও এই গ্রামে বসতবাটী নির্ম্মাণ

১. এই সময়ে এই জমিদার বংশে রঘুরাম রায় চৌধুরী বর্ত্তমান ছিলেন, কিন্তু অতি বৃদ্ধ নিবন্ধন পুত্রগণই কর্ত্তৃত্ব করিতেন। তাহাদের দোষে এই বংশের অধঃপতন হয়। বৌদ্যঘটক কারিকায় উল্লেখ আছে। "বিক্রমপুরে রগুরাম রায় সমাজপতি।"

২. ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানীর পঞ্চম রিপোর্ট ঢাকা নেয়াবতী দেখ।

করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কায়স্থ জাতীয় সরকার উপাধিধারী ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা নবাব সরকারে কার্য্য করিয়া যথেষ্ট অর্থসংগ্রহ করেন ও তদ্বারা কতিপয় ইষ্টকালয় ও মঠ নির্ম্মাণ করিয়া কিঞ্চিৎ কীর্ত্তির সাক্ষী রাখিয়াছিলেন। আজিও ভূম্যধিকারিগণের বহু কাগজপত্রে সাহাবন্দরের নাম উল্লেখ দেখা যায়। যথা সরকার সোণার গাঁ চাকলেজাহাঙ্গীর নগর পরগণে বিক্রমপুর সাহাবন্দর। এতদ্ভিন্ন গ্রদবন্দর নামে এইরূপ একটী বন্দর বিক্রমপুরের অন্তর্গত ছিল, গ্রদবন্দরের নামও বহু প্রাচীন কাগজপত্রে দৃষ্ট হয়। বিক্রমপুর খাস হইলে মোসলমান রাজসরকারে আয় দাঁড়ায় মোট ১৪৯৫৬৬ টাকা। এতদ্ভিন্ন জমিদারী বলিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার সদর রাজস্ব অতি অল্পই ছিল। যাহার আয় বর্ত্তমান সময়ে ৩ পাউণ্ড বা ৪৫ টাকা। এতদ্ভিন্ন আর সমুদয়ই তালুকদারীতে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে।

## ফতেয়াবাদ

যে ফতে আলীর নামানুসারে ফতেয়াবাদের নামকরণ হয়, ষ্টুয়ার্ট তাঁহাকে মোগলপক্ষের সুন্দ্বীপের শাসনকর্ত্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জনষ্টিভেন্স কর্ত্তৃক ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে যে পুস্তক ভাষান্তরিত হইয়া মুদ্রিত হয়, তাহাতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, ফতেখাঁ পর্টুগীস্ মাটুস কর্ত্তৃক নিযুক্ত ও সুন্দ্বীপের শাসনভারপ্রাপ্ত হন। পরে বিশ্বাসঘাতক ফতেখাঁ মোগলের পক্ষাবলম্বন করিয়া খ্রীষ্টীয়ানদিগের নিধন সাধন করে। ফতেখাঁর সুন্দ্বীপের অধীশ্বর, খ্রীষ্টীয়ানের রক্তপাতকারী ও পর্টুগীস্ জাতির বিনাশকর্ত্তা।" পরে কিন্তু পর্টুগীসদের হস্তেই তাঁহার নিধন সাধন হয়।

সরকার ফতেয়াবাদের অন্তর্গত সুন্দ্বীপ ও সাহাবাজপুর পরগণাদ্বয় যেমন মধ্যবর্ত্তী সরকার বাকলা অতিক্রম করিয়া মেঘনা নদ মধ্যে বিদ্যমান ছিল, ঠিক তদ্রুপ পরগণে বোজের গোউমেদপুর পরগণা সরকার বাকলার নিকটবর্ত্তী হইলেও উহা সরকার সোণারগাঁ মধ্যে রাখিয়া তদুত্তরবর্ত্তী সরকার বাজু-হায়ের অধীন ছিল। বাদসাহী আমলে সদর রাজস্ব আদায়ের একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা ছিল না। যে পরগণা যে সরকারের অধীন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তত্রত্য পরগনার নিযুক্তির কানুনগো ও ক্রোড়ীগণ উহার রাজস্ব আদায় করিয়া, সরকারের প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিতেন।

সরকার ফতেয়াবাদের অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি ছিল। জয়সিয়াচার্জ্জ, ফুলচৌল, চেলন, ভাগলপুর, বাধাদিয়া, তেলিহাটী, চরণলক্ষী, চরহাটী, হাবেলীফতেয়াবাদ, লবণের শুল্ক, হজরতপুর, হাটের খাজনা, রসুলপুর, সন্দ্বীপ, সিরহরগরল, সিবিমালী, সিরোহী, সুদ দেওয়া, সোয়ামীল (জালালপুর), সাহাবাজপুর খড়গহর, কুশদিয়া, কওসা, মাকরগগঞ্জ, মসুলদাড়, মিরণপুর, ক্ষুদ্র তালুকদার, নাকতুল্যামির, হাজাবহাটী, ইউসফপুর; এই ৩১ মহালের ও পরগণার মোট রাজস্ব ৭৯৬৯৫৫৭ দাম* ৯০০ অশ্বারোহী ও ৫০৭০০ পদাতিক সরবরাহ হইত।

* ৪০ দামে এক টাকা।

## ফতেয়াবাদ ও মুকুন্দরায়

মুকুন্দ রায়ের পূর্ব্বপুরুষেরা কিরূপে এই ফতেয়াবাদ প্রদেশে প্রথম আগমন করেন, তাঁহার কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমাদের অনুমান হয়, যে সময়ে চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের পূর্ব্বপুরুষেরা বিক্রমপুর আগমন করেন, মুকুন্দ রায়ের পূর্ব্ববর্ত্তীগণও সেই সময় পূর্ব্ববঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন। বিক্রমপুরের রায় রাজগণ চন্দ্রদ্বীপের রায় রাজগণ ও ফতেয়াবাদের রায় রাজগণ সকলেই 'দে' উপাধিধারী কায়স্থ ছিলেন। আমাদের বিবেচনায় এই তিন রাজবংশের মূল পুরুষ একই ব্যক্তি হইবেন, কেবল আমাদের যে এই মত, এমন নয়, এতৎ সম্বন্ধে ভারতী ও বালক পত্রিকায়+ যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, অন্যান্য লেখকের মতেও এইরূপ অনুমান সপ্রমাণিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে ঐ অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"বক্তিয়ার খিলিজী যখন বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিয়া প্রবল বাত্যারূপে পূর্ব্ববঙ্গের দিকে আপতিত হইতেছিল, অনুমান হয়, সেই সময় বাকলা চন্দ্রদ্বীপের দনুজ মর্দ্দণ রায়ের বংশাবলী অথবা নিকট সম্পর্কীয় জ্ঞাতি কি কুটম্বগণ ছড়াইয়া পড়িয়া পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে কয়টী জমীদারী সৃষ্টি করেন। কালে সেই জমিদারীর সৃষ্টি-কর্ত্তাগণ আপন আপন গৃহবিচ্ছেদ, সমাজ বিরোধ প্রভৃতি কারণে নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়েন। দনুজ মর্দ্দন রায় বঙ্গজ কায়স্থ, এই সমস্ত ক্ষুদ্র জমিদারীর প্রবর্ত্তয়িতাগণও বঙ্গজ কায়স্থ শ্রেণীভুক্ত।"

যদিও বক্তিয়ার খিলিজী পূর্ব্ববঙ্গের সীমাতেও পদার্পণ করেন নাই, তথাপি দে বংশীয় রাজগণ যে, একই বংশোদ্ভব ছিলেন, তাহা আমরাও স্বীকার করি।

এই সময়ে ভূষণাপটী বলয়াই একটা সাধারণ সমাজের সৃষ্টি হয়। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ মধ্যে ভূষণাপটী বলিয়া এক সম্প্রদায় বর্ত্তমান দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন তিলি, বণিক, কর্ম্মকার শ্রেণীর মধ্যেও ভূষণাই পটী বলয়া একটা সমাজ আছে।

এই রাজবংশের উৎসাহে ভূষণাতে বিবিধ প্রকার শিল্প কার্য্যের উৎকর্ষ সংসাধিত হয়। ভূষণার অন্তর্গত সাতৈরের শীতলপাটী সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন বহুদিন পর্য্যন্ত ঐ বিভাগের বোয়ালমারির কার্পাস ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রসাদাৎ ইয়োরোপে আমদানী হইত। ফতেয়াবাদের স্থপতিরা এক সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের যাবতীয় হর্ম্ম্যমালা ও মঠাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া স্ব স্ব গুণপনার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছে। স্বাধীন প্রদেশে ব্যবসায়ের ও শিল্প কার্য্যের যে কত উন্নতি হইতে পারে, তৎকালীন ভূষণা, ফতেয়াবাদের প্রতি দৃষ্টি করিলেই তাহার সম্যক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

হিজরী ৯৭৮ সনে (১৫৭০ খ্রীঃ অব্দে) সম্রাট আকবর সাহেব বঙ্গাধিকারের সমকাল মোরদ খাঁ পাঠান সুবেদার দাউদের অধীনে থাকিয়া ফতেয়াবাদ শাসন করিতেন। পরে মেদিনীপুর ও জলেশ্বরের মধ্যবর্ত্তী মোগলমারি (তুকারো) নামক স্থানে মোগল পাঠানে যে যুদ্ধ হয় (১৫৭৫), তাহাতে পাঠানেরা পরাস্ত হইয়া কটকে প্রস্থান করিলে পর হিজলীর (উড়িষ্যার) থামার খাঁ, ফতেয়াবাদের মোরাদ খাঁ এবং সাতগাঁর মীরজানজাদ খাঁ সহজেই মোগল রাজের বশ্যতা স্বীকার করে। মোগল সেনাপতি হোসেন কুলি খাঁর মৃত্যু হইলে

+ ১২৯৯ সালের ফাল্গুন মাসের ভারতী দেখ।

পর, পাঠান কোতোল খাঁ এই অবসরে পুনরায় বাঙ্গালা আক্রমণ করিল, বিশেষতঃ যে সকল প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা তাহার অবাধ্য হইয়া মোগল রাজের শরণাপন্ন হইয়াছিল, তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়াই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।*

কোতল খাঁ প্রথমতঃ সাতগাঁর শাসনকর্ত্তা মীরজানজাদ খাঁকে আক্রমণ করিলেন, মীর সাহেব আত্মরক্ষার্থ পলাইয়া ছলিমাবাদ (সেলিমাবাদে) প্রস্থান করিলেন, তথায়ও আপনাকে নিরাপদ জ্ঞান না করিয়া দর্প-নারায়ণ (কন্দর্পনারায়ণ) প্রতাপ বার ফিরিঙ্গির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এদিকে কোতল খাঁর আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্বেই ফতেয়াবাদের শাসনকর্ত্তা মোরাদ খাঁর মৃত্যু হইল। এই সময় মুকুন্দ রায় তথাকার এক সামান্য জমিদার বলিয়া পরিচিত। মোরাদের সহিত তাহার বিশেষরূপ সখ্য ভাব থাকায় মুকুন্দ তাহার পুত্রগণের যথোচিত সহায়তা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন।

কোতল খাঁ ফতেয়াবাদ আক্রমণ করিল, মুকুন্দ রায় মোরাদের সৈন্যগণের সহিত নিজ দলবল মিলাইয়া কোতল খাঁর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। এ দিকে মোগলসেনাপতি রাজা মানসিংহও ঠিক এই সময়ে বহুসংখ্যক সেনা সহিত বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়া কোতল খাঁর প্রতিকূলে উপস্থিত হইলেন। অনন্যোপায় হইয়া পাঠানেরা বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার উড়িষ্যায় পলায়ন করিল।"+

মানসিংহ জানিতে পারিলেন, মুকুন্দ মোগল পক্ষাবলম্বী হইয়া পাঠানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, এজন্য নিতান্ত পরিতুষ্ট হইয়া ফতেয়াবাদের অন্য কোন মুসলমান শাসনকর্ত্তা নিয়োগ না করিয়া, মুকুন্দ রায়কে রাজোপাধি প্রদান করিয়া ঐ স্থানের সম্পূর্ণ ভারার্পণ করিলেন। রাজা মুকুন্দ অকৃতজ্ঞ ছিলেন না, তিনি পূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা মোরাদ খাঁর পরিবারবর্গকে যথোচিত ভূবৃত্তি প্রদান করিয়া যাহাতে তাহারা সুখ-স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকিতে পারে, তাহার উপায় করিয়া দিলেন। এইরূপে নামে মাত্র মোগলাধীনে থাকিয়া যখন মুকুন্দ রায় ভূষণার কর্ত্তৃত্ব করিতেছিলেন, তৎকালে উঁহার যেরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণনা করা গিয়াছে। অতঃপর কিন্তু তিনি বিদ্রোহী দলে যোগদান করেন।

মানসিংহ বাঙ্গালায় আসিয়া যেরূপভাবে বিদ্রোহী জমিদারদিগকে দমন করিয়াছিলেন, তাহার বার বার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ভূষণাও মোগল সেনাপতির হস্তগত হইল। বিশেষ পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়াও মুকুন্দ রায় আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না। অগণিত মোগল-বাহিনীর সহিত মুষ্টিমেয় যোদ্ধা লইয়া যতক্ষণ পারিলেন, তিনি আপন ভূজবলের পরিচয় দিতে ক্ষান্ত হইলেন না, পরিণামে সম্মুখ সমরে জীবন-বিসর্জ্জন করিয়া ভবিষ্যবংশীয়গণও এইরূপে স্বদেশের উদ্ধার কল্পে জীবন ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত না হয়, এই উপদেশ প্রদানচ্ছলে যেন সেই শূরভোগ্য ত্রিদিবধামে গমন করিলেন।* প্রবাদ

---

* আকবরনামা মুকুন্দরায় জমিদার দেখ।

\+ ডাক্তার ওয়াইজ অথবা অন্য কোন ইতিহাস লেখক মুকুন্দ রায় সম্বন্ধে কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই। আমরা পারস্য ভাষায় লিখিত মূল "আকবরনামা" অনুবাদ করাইয়া এসম্বন্ধে যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাই এস্থানে উল্লেখ করিলাম।

* এই যুদ্ধ জঙ্গ জিতিয়া ফতে করিয়া রণস্থানের নাম মানসিংহ ফতেপুর বা ফতেজঙ্গপুর রাখিয়াছিলেন। অধুনা উহা মাদারীপুর সবডিভিশনের অন্তর্গত একটী পরগণা।

এই সময়ে এক মোগলসেনাপতি মুকুন্দ রায়ের কন্যার সতীত্বনাশের উদ্যোগ করিলে, রাজনন্দিনী হস্তস্থিত অসিদ্বারা সেই আততায়ীর বক্ষ বিদ্ধ করিয়া দেন; পরে স্বীয় বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিয়া ইহলোক হইতে শূরলোকে প্রস্থান করেন। পামর সেনাপতিও আর জীবিত থাকিল না; অনন্ত নরকে তাহার স্থান নির্দ্দেশ হইল। মুকুন্দের ছয় পুত্র, তন্মধ্যে শত্রুজিৎ ও শিবরামের নাম অবগত হওয়া যায়। শত্রুজিৎ পুনরায় স্বাধীন হইবার উদ্যোগী হওয়ায়, বাদশাহের সৈন্যকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত ও তথায় হত হন। তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি যশোহর শত্রুজিৎপুরে বাস করিতেছেন। তৎপর সমগ্র ফতেয়াবাদের অন্তর্গত চাকলে ভূষণা সংগ্রামসাহের করায়ত্ত্ব হয়।

দীঘলবালা গ্রামে প্রাণনাথ ভট্টাচার্য্যের গৃহের ১৬০৮ নং তায়দাদও গঙ্গারামপুরের পরেশনাথ স্মৃতিতীর্থের গৃহে ১৯৩৩ নং তায়দাদ ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দের যাহা মুকুন্দরাম ব্রহ্মত্র প্রদান করেন, তাহাও তৎপুত্র শত্রুজিতের নিষ্কর দানপত্র যাহা সম্পাদিত হয়, উহা যশোহরের কালেক্টরীর ১২০৯ সনের তায়দাদ কাগজপত্র দৃষ্টে জানা যায়।

ব্রকমানের আইন-ই-আকবরী পাঠে অবগত হওয়া যায়; ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মোরাদ খাঁ মুনিম খাঁর আদেশে ফতেয়াবাদ চাকলা অধিকার করে। আমাদের বিবেচনায় তৎসময়ে ফতেয়াবাদ মোগলের নাম মাত্র অধিকারে আইসে, বাস্তবিক তৎসময়েও পাঠানদের হস্ত হইতে ফতেয়াবাদ বিচ্যুত হয় নাই।

## কালাপাহাড়

আকবর বাদসাহের শাসনের ২৮ বৎসরে (১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে) খানি আজাম বাদসাহের পক্ষ হইতে বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত ছিলেন। মাশুম কাবুলীও কতুরু লোহালী (কুতুল খাঁ) বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন। কালীগঙ্গার নিকট উভয় পক্ষের যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

রাজকীয় সৈন্য শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হইয়া একমাস পর্য্যন্ত যুদ্ধ করেন। প্রত্যহই উভয় পক্ষের যুদ্ধ ঘটিত। উভয়পক্ষই সমভাবে সাহস প্রদর্শন করেন, কিন্তু পরিশেষে বিদ্রোহীদলের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হওয়ায় মোগলপক্ষ জয়লাভ করে। এই সময়ে বিদ্রোহীদলের অন্যতর নেতা কাজীজাদা ফতেয়াবাদ হইতে অনেকগুলি যুদ্ধজাহাজ ও কামানবন্দুক লইয়া স্বপক্ষের সাহায্যার্থে উপস্থিত হন; কিন্তু বাদসাহী সেনার গোলাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। মাসুম খার আদেশে কালাপাহাড় কাজীজাদার অধীনস্থ সৈন্যের নায়ক পদে বরিত হন। (ইলিয়ট কৃত আকবরনামা ৬৭ পৃষ্ঠা।)

পূর্ব্ববঙ্গে বহু প্রস্তর-নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি ভগ্নাবস্থায় দৃষ্ট হয়। উহাদের মধ্যে কাহারও নাসিকা, কাহারও বা কর্ণ, মুণ্ড ইত্যাদি ভগ্ন দেখা যায়, তাহা কালাপাহাড়ের কুকীর্ত্তি বলিয়াই অবগত হওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই সময়েতেই ফতেয়াবাদের আধিপত্য লাভ করিয়া কালাপাহাড় এই কুকর্ম্মের অবতারণা করে। উড়িষ্যার স্বাধীনতা ইহার হস্তে নষ্ট হয়।

কালাপাহাড় ব্রাহ্মণনন্দন; পূর্ব্বনাম রাজু; পরে কোন মোসলমান আমিরের কন্যার রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া মোসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ করে। কেহ কেহ বলেন যে, জোর করিয়া তাহার সহিত মোসলমান কন্যা বিবাহ দেওয়া হয়।

ইলিয়টকৃত আইন আকবরির অনুবাদ পাঠে অবগত হওয়া যায়, মাসুম কাবুলী, বাদসাহের সহিত যখন পরাস্ত হইয়াছেন, তখনই ফতেয়াবাদে আশ্রয় পাইয়াছেন। এ হিসাবে ফতেয়াবাদ বাদসাহের বিপক্ষদলের এক প্রধান আড্ডা বলিয়া অনুমিত হয়।

## সংগ্রামসাহ

প্রায় সার্দ্ধ দ্বিশত বৎসর অতীত হইলে, বঙ্গদেশে সংগ্রাম সাহ নামে এক ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে আজিও তাঁহার পরিচয়ের কতিপয় চিহ্ন বর্ত্তমান থাকিয়া, তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। যশোহর, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালি প্রভৃতি জেলা, সংগ্রামের, প্রধানতঃ লীলাক্ষেত্র ছিল বলিয়া বোধ হয়। এতদ্ভিন্ন সুদূর মারবাড় বা যোধপুরের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলেও সংগ্রামের গুণগ্রামের ও শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয় পাইয়া স্বতঃই তাঁহার ধন্যবাদ করিতে ইচ্ছা হয়। কেহ যেন মনে না করেন যে, আমরা একটী প্রবাদমূলক বাক্যকে কতকগুলি অসার উপকরণে সজ্জিত করিয়া পাঠকগণের ক্ষণিক মনস্তুষ্টি বিধানে প্রয়াস পাইতেছি। বাস্তবিক প্রকৃত বিষয়ে সত্য ঘটনা পরম্পরার উপর নির্ভর করিয়াই আমরা এই প্রস্তাবের ভিত্তিসংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তবে তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইব, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রহিয়াছে। আজ কেবল মহাত্মা সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাঠকগণের অবগতির জন্য এই স্থলে উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

কবিকণ্ঠহারকৃত সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা, মহমহোপাধ্যায় ভরত মল্লিককৃত চন্দ্র-প্রভা, আলমগীর-নামার আংশিক অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত 'কলিকতা রিভিউ'র কতিপয় প্রবন্ধ, মিঃ বিভারেজকৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাস এবং মহাত্মা কর্ণেল টড্ কৃত রাজস্থানের ইতিহাস এবং অন্যান্য কতিপয় প্রবন্ধাবলম্বনে এই প্রস্তাব সংক্রান্ত উপকরণগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। এক্ষণে যথাক্রমে এতদ্বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

যে সময়ে দিল্লীর মোগল বাদসাহগণ, ভারতে রাজ্যবিস্তার করিয়া একাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, তৎসময়ে বঙ্গদেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার একটুকু নমুনা প্রদান না করিলে, আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবের একাংশ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এই জন্য তৎসমসাময়িক কিছু বিবরণ এস্থলে উল্লেখ করা গেল।

মোগল রাজত্বের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বাদসাহের প্রতিনিধি স্বরূপ মোসলমান নবাবগণের দ্বারা বঙ্গদেশ শাসিত হইত বটে, কিন্তু তৎকালে সাধারণ প্রজা ও দেশরক্ষণাবেক্ষণের ভার দেশীয় জমিদারগণের উপরই অধিক পরিমাণে নির্ভর করিত।

এই সময়ে বঙ্গের অন্যান্য প্রদেশের অবস্থা একরূপ নিরাপদ হইলেও পূর্ব্ব-দক্ষিণ বঙ্গ দুইটি বিদেশীয় জাতির দ্বারা বড়ই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। উহার একদল আরাকানবাসী মগ ও অপর দল ইউরোপের নরপিশাচ পর্টুগীজ দস্যু। এতদুভয় দল কখনও একত্রভাবে কখনও বা বিভিন্নভাবে বিভক্ত হইয়া, পূর্ব্বদক্ষিণ বঙ্গকে একরূপ জনহীন করিয়া তুলিয়াছিল। মোসলমান বাদসাহকুলতিলক আকবর বাদসাহের সময়ে এই উপদ্রবের প্রথম সূত্রপাত হয়; এই জন্য বাদসাহ, সাহবাজ নামক একজন সুদক্ষ সেনাপতিকে এই দস্যুদলন-ব্যপদেশে পূর্ব্ববঙ্গে প্রেরণ করেন। সাহাবাজ খাঁ মেঘনা

নদীর মোহনায় সেনানিবেশ করিয়া স্বীয় নামানুসারে এই স্থানকে সাহাবাজপুর আখ্যা প্রদান করেন।* সাহাবাজ -১৫৮৫ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৫৮৬ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া মগ ও পর্ত্তুগীজদের প্রভাব অনেক পরিমাণে তিরোহিত করিয়াছিলেন। তৎপর আর এই জন্য তথায় কোনরূপ সৈন্য রাখা অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া বাদসাহ তৎপ্রদেশীয় ভূম্যধিকারিগণের উপর দস্যুদমনের ভার দিয়া একরূপ নিশ্চিন্ত থাকেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন সমুদ্রতীরস্থ অধিকাংশ অধিবাসীরা হিন্দু ছিল এবং সুন্দরবন অঞ্চলে বহুজনাকীর্ণ জনপদ সকল বর্ত্তমান ছিল। সম্ভবতঃ কোনরূপ সংক্রামক-রোগের প্রকোপ অথবা অন্য কোন দৈব দুর্ঘটনার আয়ত্ত হইয়া তাহারা ঐ সকল স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আইন-ই-আকবরী পাঠে জানা যায়, ১৫৮৪ খ্রীঃ অব্দে একটি প্রবল বন্যার উৎপত্তি হইয়া প্রায় দুই লক্ষ লোক স্রোতোবেগে ভাসাইয়া লইয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে এই ঝড় বৃষ্টির সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদান করা গেল।** তৎপরে দুর্ভাগ্যের সহচর মহামারীতেও বহুলোক কাল-কবলিত হওয়ায় জনহীনতার মাত্রা বর্দ্ধিত হয়। মিঃ গ্রান্ট উল্লিখিত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করিয়া বলিয়াছেন, এই সকল কারণে, বিশেষতঃ পরিশেষে মগ ও পর্ত্তুগীজদিগের উৎপাতেই সমুদ্রতীর জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। সম্ভবতঃ শেষোক্ত কারণটি প্রথমটির অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর ছিল।

তৎসময়ে মগদিগকে এরূপ নরপিশাচ বলিয়া সাধারণের মনে ধারণা হইয়াছিল যে, তাহারা কোন পল্লীতে প্রবেশ করিলেই, তত্রত্য অধিবাসীরা অন্যস্থানীয় লোকদিগের চক্ষে জাতিভ্রষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। এই কারণে, সন্দীপ ও দক্ষিণ সাহবাজপুরবাসী শূদ্র ও নরসুন্দরেরা, ভিন্ন দেশের জল স্পর্শ করিতে পারে না। পূর্ব্ববঙ্গে এইরূপ মঘে-তিলি মঘে-কামার মঘে-কুমার প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে, যাহারা অন্য সম্প্রদায়ের সহিত কোনরূপেও মিশিতে পারে না।

মিঃ বিভারেজ বাখরগঞ্জের ইতিহাসে এ বিষয়ের একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন। তাহা পাঠে অনুমিত হয় যে, মঘেরা যদি কখনও সদিচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াও কোন কার্য্য করিতে অগ্রসর হইত, তথাপি তাহার ফল লোকে কু ব্যতীত সু বলিয়া বিশ্বাস করিত না। সাহেব লিখিয়াছেন, আরিয়াল খাঁ নদীর তীরবর্ত্তী রমজানপুরের দাসেরা বলে তাহাদের একটী স্ত্রীলোক নদীতে স্নান করিতেছিল, সেই সময়ে একজন মঘ নদীতট দিয়া স্থানান্তরে

* বিভারেজ কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাসের ১৩৪ পৃষ্ঠা দেখ। অধুনা সাহাবাজপুর উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই ভাগে দুইটী পরগণায় পরিগণিত হইয়াছে। বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ভোলা সবডিভিসন্ এই পরগণার মধ্যে স্থাপিত।

** "বাকলা সরকার সমুদ্রতীরে অবস্থিত। বর্ত্তমান বাতসাহের (আকবরের) রাজত্বের উনবিংশ বৎসরে একদিন অপরাহ্ন তিনটার সময়ে সমুদ্রজল বাড়িতে আরম্ভ হয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই এমন জলপ্লাবন হয় যে সমস্ত বাকলা সরকার জলমগ্ন হইয়া যায়। বাকলার রাজা সেদিন একস্থানে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন, সমুদ্রের জল ক্রমাগত বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া, তিনি একখানি নৌকায় আরোহণ করেন, কিন্তু পরে জলমগ্ন হন। রাজপুত্র কতকগুলি অনুচরসহ একটি উচ্চ মন্দিরের চূড়ায় আরোহণ করেন। সদাগরগণ যেখানে একটু উচ্চস্থান পাইল, সেই স্থানেই আশ্রয়গ্রহণ করিল। ক্রমাগত পাঁচ ঘণ্টা ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি ও অশনিপাত হইয়াছিল। ঘরবাড়ী সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া স্রোতোবেগে প্রবল বায়ুর প্রকোপে কোথায় চলিয়া গেল। কেবল দেবমন্দির ব্যতীত আর কিছুরই চিহ্ন রহিল না। প্রায় দুইলক্ষ লোক জীবন বিসর্জ্জন করিল।" আইন-ই-আকবরী।

যাইতেছিল। মঘকে দেখিয়া ঐ রমণী তাহার দৃষ্টি হইতে আপনাকে অন্তরাল করিবার জন্য জলে ডুব দিল। কিন্তু মঘ বিবেচনা করিল, ঐ মহিলা বুঝি জল নিমগ্ন হইয়াছে। তখন সে দয়ার্দ্রচিত্তে জলে নামিয়া উহাকে তীরে উঠাইয়া লইয়া আসিল। এই ব্যাপারে পরিণামে ঐ স্ত্রীলোকটি তাহার আত্মীয়স্বজনগণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং সাধারণে তাহাদিগকে জাতিভ্রষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল। বাস্তবিক তৎকালে মঘেরা যে সকল অসভ্যোচিত উৎপাত করিয়া সমুদ্রতীরটাকে ছারখার করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাতে তাহাদের শত শত সাধুতা তাহার একাংশও পূরণ করিতে সমর্থ হয় নাই।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সাহাবাজ খাঁর প্রতি প্রথমতঃ এই আততায়ী দস্যু দলের দমন করিবার ভার অর্পিত হয়। সাহবাজ খাঁ উহাদিগকে একরূপ দেশবিতাড়িত করেন। তখন আর সাহাবাজপুরে সৈন্য রাখা নিস্প্রয়োজন বিবেচনায়, বঙ্গীয় ভৌমিকগণের উপর দস্যুদলনের ভারার্পণ করিয়া সম্রাট সাহবাজকে রাজধানীতে থাকতে আদেশ করেন। সে সময়ে দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিকে বাকলা ও বিক্রমপুরের, দুইটি প্রসিদ্ধ রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত ছিল।

কুক্ষণে বারভূঞা দলের সহিত বাদশাহ জাহাঙ্গীরের মনোমালিন্য সংঘটিত হয়। তাহারা সম্রাটের অবাধ্য হওয়ায় রাজা মানসিংহ আসিয়া তাহাদিগকে উৎসাদিত করেন। এই সুযোগে মঘ ও পর্তুগীজেরা প্রশ্রয় পাইয়া পুনরায় সমুদ্রতীরে উৎপাত আরম্ভ করে। তখন পুনরায় আজিম ওসমানের প্রতি ঐ সকল দস্যুদলনের ভার অর্পিত হয়। আজিম ওসমান মঘদিগকে বিতাড়িত করেন এবং কতকগুলি পর্তুগীজকে ধৃত করিয়া চট্টগ্রামে ও ঢাকার নিকটবর্ত্তী মুন্সীগঞ্জ উপরিভাগের অন্তর্গত একটা স্থানে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। এই স্থানটি অধুনা "ফিরিঙ্গি বাজার" নামে পরিচিত। আজিও তথায় সেই সকল পর্তুগীজদিগের বংশধরেরা বাস করিতেছে।

তৎপর হইতে ক্রমে একজন প্রধান সেনাপতির অধীনতায় কতকগুলি বাদসাহী সৈন্য মেঘনা নদীর মোহনায় নিয়ত অবস্থান করিয়া, মঘ ও পর্তুগীজদিগের উৎপাত নিবারণ করিত। যখন ঔরংজেব বাদসাহ ভারতবর্ষের প্রায় একচ্ছত্র রাজা বলিয়া পরিচিত হন, তখন এই দস্যুদমনের ভার, হিন্দু সেনাপতি সংগ্রাম সাহের উপর অর্পিত হয়। বাদসাহ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া সংগ্রাম সাহাবাজপুরে আগমন করেন। তখন তথায় এমন কোন দুর্গ ছিল না, যাহাতে নিরাপদে সৈন্য রক্ষা করিতে পারা যায়। এইজন্য সংগ্রাম তথায় একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, প্রায় স্বার্দ্ধ দ্বিশত বৎসর পর্য্যন্ত লোকে তাহাকে "সংগ্রামের কেল্লা" বলিয়া নির্দ্দেশ করিত। আলমগীর-নামাতে এই দুর্গের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ১৬৭৫ খ্রীঃ অব্দে উহা নির্ম্মিত হয়। 'কলিকাতা রিভিউর' ৫৩ ভল্যুমের ৭৩ পৃষ্ঠায় 'চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গি' শীর্ষক প্রস্তাবে এই দুর্গ এবং সংগ্রামের প্রতিষ্ঠিত আরও দুইটী দুর্গের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। মিঃ বিভারেজ তাঁহার বাখরগঞ্জের ইতিহাসের ৪২ পৃষ্ঠায় এই কেল্লা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

*"প্রফেসর ব্লক্ ডিকলন এবং বাঞ্জার কৃত একখানা ক্ষুদ্র ম্যাপ আছে, তাহা (১৭২৪-২৬ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত) ফ্যাঙ্কনবেলটাইন্ কৃত পুস্তকে সংযোজিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, বাকলা একটা দ্বীপ মাত্র ছিল। সংক্রাণের অন্তরীপ বলিয়া একটা চিহ্ন ঐ ম্যাপে*

দৃষ্ট হইত। ঐ চিহ্নিত স্থান দেখিলে অনুমিত হয়, মেহেন্দিগঞ্জের থানায় একটী প্রাচীন মোগলদুর্গ ছিল, তাহাকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।"

আমরা সাহেবের এ কথায় সম্পূর্ণ অনুমান করি; কারণ সাহাবাজপুররবাসী অনেক প্রাচীন লোকের নিকট শ্রুত আছি, এ পরগণার অন্তঃর্গত গাদ্ধিয়া গ্রামের অনতিদূরে ইলিসা নদীর তীরে সংগ্রামের কেল্লা বর্ত্তমান ছিল। এই স্থানটী মেহেন্দিগঞ্জ থানার অন্তর্গত। পঞ্চসনার বন্দোবস্তের* কালেক-টরির কাগজপত্রে সাহাবাজপুর পরগণার অন্তর্গত গাদ্ধিয়া গ্রামের যে সীমানির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতে সংগ্রামের গড়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।** এই কারণে সংক্রাণের অন্তরীপ ও সংগ্রামের কেল্লা যে একই স্থান, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ বোধ হয় না। অর্দ্ধশতাব্দী অতীত হয় নাই, এই প্রাচীন মোগলদুর্গ মেঘনার শাখা ইলিসা নদীর গর্ভস্থ হইয়া, সংগ্রামের নামের একরূপ বিলোপসাধন করিয়াছে।

বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ঝালকাঠি থানার অধীন রামনগর গাবখান প্রভৃতি স্থানের মধ্য দিয়ে সংগ্রামনীলের খাল বলিয়া একটা দোনের পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ উহা সংগ্রামসাহ কর্তৃক নিখাত হইয়াছিল। এইজন্য তাহার নামের সহিত ঐ খালের নাম সংযোজিত হইয়াছে। ইহাতে আরও বোধ হয়, সংগ্রাম সাহ একটা উপাধি মাত্র ছিল। নীল শব্দের সহিত অন্য কোনও শব্দ যুক্ত থাকিয়া তাহার নামকে পূর্ণাবয়ব করিত; যেমন নীলকণ্ঠ বা নীলচন্দ্র প্রভৃতি। পূর্ব্বাপর যেমন অনেকের উপাধিতেই পরিচয় পর্য্যবসিত হইয়াছে, নামে কেহ ততটা পরিজ্ঞাত নহেন, তদ্রূপ সংগ্রাম সাহ এই উপাধিতেই তিনি পরিচিত ছিলেন, তাঁহার সম্পূর্ণ নাম লইবার আবশ্যকতা হয় নাই; কাজেই নামটী একরূপ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

দস্যুদলের অপসারণ করিবার জন্য সংগ্রাম নানা স্থানে গড়বন্দী করিয়া, সৈন্য রক্ষার উপায় করিয়া লইলেন। পরে মঘ ও পর্তুগীজদিগের প্রতিকূলে সৈন্য পরিচালনাপূর্ব্বক তিনি তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া বঙ্গদেশ হইতে দূরীভূত করিয়া দেন। এই সময়ে চাঁদ রায় নামে বৈদ্যবংশীয় অপর এক মহাত্মা সংগ্রামের প্রধান সহকারী ছিলেন। সংগ্রাম তাঁহার দ্বারা নানা বিষয়ে সহায়তা প্রাপ্ত হন। সে যাহা হউক, এই সকল শত্রুদমনের কথা অচিরে সম্রাট ঔরংজেবের নিকট পৌছিলে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া সংগ্রামকে পুরস্কারস্বরূপ ভূষণা, মামুদপুর ও চাঁদ রায়কে সাহাবাজপুর পরগণার জমিদারী প্রদান করেন।

বঙ্গদেশের দ্বাদশ জন ভৌমিকের মধ্যে যাঁহারা রাজা মানসিংহের বঙ্গে আগমনের পরে ও বাদসাহের বশ্যতা স্বীকার করিলেন না, তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জা হইয়াছিল। যশোহরের প্রতাপাদিত্য, ভূষণার মুকুন্দরায়, বিক্রমপুরের কেদার রায়, চাঁদ প্রতাপের চাঁদগাজি কোন মতে বাদসাহকে কর দিতে স্বীকৃত হইলেন না। অনেক ষড়যন্ত্রে ভবানন্দ মজুমদার ও শ্রীমন্ত খাঁ প্রভৃতি কতিপয় কূটবুদ্ধি বাঙ্গালি ব্রাহ্মণের সহায়তায় মানসিংহ এই সকল বিদ্রোহীদিগকে দমন করিতে সমর্থ হইলেন। তখন বিদ্রোহী রাজন্যগণের রাজ্য কতক সম্রাটের সরকারে খাস রাখা হইল, এবং উহার কত কত অন্য জমিদারের

* ওয়ারেন হেষ্টিংয়ের সময় জমিদারগণের সহিত প্রথম জমিদারি পাঁচসন মিয়াদে বন্দোবস্ত হয়, তাহাকে পঞ্চসনা বলে, পরে দশ বৎসরের জন্য দশসনা বন্দোবস্ত হয়।

** জেলা বাখরগঞ্জের কালেক্টরীর তৌজিভুক্ত ২৭৫০ নং তালুক দুর্গাপ্রসাদ সেনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ১২০৪ সনের মৌজা ওয়ারি দেখ।

হস্তে ন্যস্ত হইল। খাস অর্থাৎ বাজেয়াপ্ত মহাল হইতে জলযুদ্ধ ও নৌপাতের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য নাওরা মহাল সামিল করিয়া রাখা হইল। মুকুন্দরায়ের ভূষণা মামুদপুর এইরূপ নাওরা মহালের অন্তর্গত রহিয়াছিল।

ঔরংজেব এই খাস নাওরা ভূষণা মামুদপুর, পুরস্কারস্বরূপ সংগ্রামকে প্রদান করিলেন, সংগ্রাম তথায় এক প্রকাণ্ড বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। আমরা অতঃপর সংগ্রামের পারিবারিক ও জাতীয়-মর্যাদা সম্বন্ধে কতকগুলি কথার অবতারণা করিয়া তৎপরে তাঁহার প্রধানতম বীরত্বের ও সম্মানের বিষয় বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইব।

আমাদের দেশে এইরূপ প্রবাদ চলিয়া আসিয়াছে যে, সংগ্রাম বঙ্গদেশে আগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণের নিম্নেই এদেশে কোন জাতি শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয়? তদুত্তরে নাকি এইরূপ জানিতে পান যে "বৈদ্য জাতিই ব্রাহ্মণের পরবর্ত্তী শ্রেষ্ঠ জাতি।" তখন তিনি আপনাকে "হাম বৈদ্য" বলিয়া পরিচিত করেন।

সংগ্রাম বাণীবহগ্রামবাসী শক্তি মাধব বংশীয় সদাশিব সেনের কন্যার পাণি গ্রহণ করেন* এবং তৎপুত্র রাধাকান্ত, ধম্বন্তরি আদিত্যবংশীয় কাশীনাথ সেনের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাহার ছয়টী কন্যা ক্রমে ধম্বন্তরি উচলি বিশ্বনাথ সেনের সহিত ও উচলি রঘুনাথ সেনের সহিত ও আদিত্য রঘুনাত সেনের সহিত ও বিকর্ত্তন রামচন্দ্রের সহিত ও শক্তিগণবংশীয় দুর্গাদাস সেনের সহিত ও আদ্যগোত্রীয় রঘুনাথ মজুমদারের সহিত পরিণীতা হয়। তন্মধ্যে মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক শেষটীর মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন।+ অপর কয়েকটা সম্বন্ধের বিষয় রামকান্ত কবিকণ্ঠহারকৃত কুলপঞ্জিকায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে। সংগ্রাম সাহ কেবল অর্থব্যয়ে কার্য্য সুসিদ্ধ করিতে না পারিয়া অনেক স্থলে বলপ্রয়োগ করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। ধম্বন্তরি উচলিবংশীয় বিজয় সেনের অধস্তন চতুর্থ স্থানীয় রামচন্দ্র সেন বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজের সমাজপতি পদে বরিত ছিলেন। অবশ্য তাঁহার ধনবল ও কুলকার্য্য পরায়ণতা না থাকিলে তিনি কখনও এতাদৃশ উচ্চ সম্মান পাইতে পারেন নাই। সংগ্রামের এইরূপ উচ্চপদস্থ সম্মানীয় ঘরে কার্য্য করিবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু ধন বা জমি জমা প্রভৃতির প্রলোভন দেখাইয়াও তিনি তাঁহাদিগকে কোন মতে বাধ্য করিতে পারেন না। তখন বল প্রকাশে রামচন্দ্রের পৌত্র রঘুনাথকে ধৃত করিয়া আনিয়া আপনার এক তনয়ার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। কবিকণ্ঠহার কৃত গ্রন্থে উহার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে, যথা—

* সদাশিবের পুত্র গোপীরমণ সেন তৎপুত্র মাধব রায় ও জগদানন্দ রায়। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোঁয়ারপুর গ্রামে মাধবের বংশ এবং বাণীবহ গ্রামে জগদানন্দের বংশ বাস করিতেছে। কণ্ঠহার কৃত কুলপঞ্জিকা। ৪০ পৃষ্ঠা দেখ।

\+ "রঘুনাথ মজুমদার রতিনাথ বিধানকৌ।
চত্বারো রঘুনাথস্য তনয়াঃ বিনয়াম্বিতাঃ।।
রামকৃষ্ণো রামচন্দ্র রমাকান্তস্তৃতীয়কঃ।
গঙ্গারামোহনুজঃ সর্ব্বে মজুমদার ইতিশ্রুতাঃ
ভূষণা রাজসংগ্রাম সাহাখ্যকন্নকোদ্ভবাঃ।।"
চন্দ্রপ্রভা ৩৪৯ পৃষ্ঠা।

"দুর্দ্দেবাশনিসম্পাতাদ্রঘুনাথো যুবা মৃতঃ॥
সংগ্রামসাহতনয়া পাণিগ্রহণ-পীড়িত॥"

আমরা আবার এই সংগ্রামকেই ১৬৮৪ খ্রীঃ অব্দে পরিণত বয়সে রাজপুতদিগের বিরুদ্ধে মারওয়াড় প্রদেশের যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিতে পাই। তখন ঔরংজেব বাদসাহ দিল্লীর সিংহাসনে বিরাজ করিতেছিলেন।

ইতঃপূর্ব্বে বিবিধ যুদ্ধে বাদসাহের পক্ষে জয়লাভ করিয়া বিশেষতঃ মঘ ও পর্ত্তুগীজদিগকে বিতাড়িত করিয়া সংগ্রাম মধ্যবাঙ্গালায় কতকগুলি ভূবৃত্তি প্রাপ্ত হন এবং সম্রাট তাঁহাকে মনসবদারের সম্মানীয় পদে বরণ করিয়াছিলেন। এখন সেই বয়োবৃদ্ধ সেনাপতি যোধপুরে পৌঁছিয়া কয়েকটী যুদ্ধ করিলেন, বিজয়লক্ষ্মী তাঁহার অঙ্কশায়িনী হইল, যোধপুরের বীরপুত্রেরা প্রমাদ গণিয়া যুদ্ধ করিয়াও যোধপুর রক্ষার আর কোন উপায় করিতে পারিল না। তখন তাহারা সেনাপতি সংগ্রামের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া প্রধান ভাট কবিকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিল। মহাত্মা টড্ সাহেব তাঁহার রাজস্থান ইতিহাসের দ্বিতীয় ভল্যুমের ৬১ পৃষ্ঠায় এতৎসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বাবু তাহার যে সুন্দর অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা কতিপয় পংক্তি এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"সংবৎ ১৭৪১ অব্দের প্রারম্ভকালে কি যুদ্ধ, কি বিভীষিকা, কিছুই শান্তি হইল না। সুজনসিংহ রাঠোর সেনা লইয়া দক্ষিণাপথে যাত্রা করিলেন। এদিকে লাক্ষ্যচম্পাবত, কেশর কুম্পাবত, ভট্টি ও চৌহান সৈন্যদের সাহায্যে যোধপুরস্থ যবন সেনাদিগকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন। সুজনসিংহ হত হইলে ভট্ট কবি সেনাপতি সংগ্রামের নিকট বিনীত ভাবে নিবেদন করিল, আপনি স্বজাতীয় ভ্রাতৃদলে মিলিত হউন। সংগ্রাম তখন মনসবদার পদে অভিষিক্ত থাকিয়া ভূসম্পত্তি সম্ভোগ করিতেছিলেন।"

(বরাট-প্রেস রাজস্তান ২য় খণ্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা)

সংগ্রামও হিন্দু ছিলেন, সুতরাং হিন্দুদিগের দুর্গতি দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অচিরে রাঠোর দলের সহিত তিনি সন্ধি করিলেন, এবং বাদসাহের সর্ব্ববাদিসম্মত প্রভুত্ব রাঠোরদিগকে স্বীকার করাইয়া, তথা হইতে সসৈন্যে চলিয়া আসিলেন। এতৎসম্বন্ধে টড্ সাহেব, তাঁহার ইতিহাসের দ্বিতীয় ভল্যুমের ৬২ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহারও অনুবাদ নিম্নে প্রদান করা গেল। "সংগ্রাম যে কোন কুলসম্ভূত এবং কিরূপ উচ্চপদারূঢ় ছিলেন, তাহা আমরা নির্ণয় করিতে সমর্থ হইলাম না। তবে তাঁহার হৃদয় যেরূপ উচ্চ ছিল, তাহাতে বোধ হয় যে, তিনি কোন মহদ্বংশকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।" মহাত্মা টড্ স্বীকার করিয়াছেন, সংগ্রাম ঔরংজেব বাদসাহের প্রধান সেনাপতি ও একজন মনসবদার ছিলেন। এই সময়ে আলিবর্দ্দিখাঁকেও একজন সেনাপতি ও একজন মনসবদার পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে দেখা যায়। পরে তিনি সৌভাগ্যবশতঃ বাঙ্গালার নবাবী পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একই সময়ে সংগ্রাম ও আলিবর্দ্দি, একই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সংগ্রাম যে কতকগুলি ভূবৃত্তি ভোগ করিতেছিলেন, তাহাও টড্ উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই।

এখন দেখা উচিত, কবিকণ্ঠহার ও ভরত মল্লিক- প্রোক্ত সংগ্রাম আর সাহাবাজপুরের কেল্লা সংস্থাপক ও রাঠোরবিজয়ী সংগ্রাম, একই ব্যক্তি কি না। কবিকণ্ঠহার ১৫৭৫ শতকে অর্থাৎ ১৬৫৩ খ্রীঃ অব্দে বা ১৭১০ সংবতে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তৎপর ভরত মল্লিক চন্দ্র প্রভা নাম্নী কূলপঞ্জিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, উহা কণ্ঠহারের গ্রন্থের ২২ বৎসর পরে বিরচিত হয়। কিন্তু উভয় গ্রন্থেই সংগ্রামের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। কণ্ঠহার যখন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তখন সংগ্রাম সাহের পুত্র পর্য্যন্ত বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার শ্বশুরকুলের পরিচয় অনুসারে বোধ হয়, সংগ্রাম ও তৎপুত্র রাধাকান্ত এবং কবিকণ্ঠহার একসময়ের লোক ছিলেন। তৎপর ১৬৬৫ খ্রীঃ অব্দে সাহাবাজপুর সংগ্রাম স্বনামে গড়বন্দী করেন। আলমগীর নামাতে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তৎপর ১৬৮৪ খ্রীঃ অব্দে সংগ্রামকে রাজস্থানের অন্তর্গত মারবাড় প্রদেশে রাঠোরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে দেখা যায়।

১৬৫৩ হইতে ১৬৮৪ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত প্রায় একত্রিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত এই রূপে আমরা বঙ্গদেশে ও রাজপুতনায় সংগ্রামকে দেখিতে পাই। আবার এই সুদীর্ঘ সময় পর্য্যন্ত ঔরংজবে বাদসাহই দিল্লীর সিংহাসনে রাজত্ব করিতেছিলেন। মোগল রাজবংশ মধ্যে ঔরংজেব যত দীর্ঘকাল শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন, সেরূপ আর কেহই পারেন নাই। এই সম্রাটের অধীনে থাকিয়া যে একই সংগ্রাম বিভিন্ন স্থানে নানা কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। সম্রাট মধ্য-বাঙ্গালার ভূষণা মামুদপুর প্রভৃতি স্থান তাঁহাকে জায়গীর অর্পণ করেন এবং কালিয়াতেও তাঁহার একটা জায়গীর ছিল, যাহা আজিও 'নাওরা' বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

ভূষণা পরগণার অন্তর্গত মথুরাপুর নামক স্থানে তাঁহার প্রকাণ্ড বাড়ী বর্ত্তমান ছিল। এই স্থানটী অধুনা ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোঁড়কদি ও মধুখালি স্থানদ্বয়ের সন্নিকটে অবস্থিত। কোঁড়কদির মাননীয় ভট্টাচার্য্য বংশের পূর্ব্বপুরুষ তাঁহার গুরু ছিলেন। অদ্যাপি তৎপ্রদত্ত কতিপয় ভূবৃত্তির লিখন উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের নিকট বর্ত্তমান আছে। মথুরাপুর গ্রামে আজিও একটা প্রকাণ্ড মঠ দৃষ্ট হয়, যাহাকে সাধারণ সংগ্রামের দেউলি বলিয়া থাকে। সংগ্রাম সাহের সভায় শ্রীকান্ত বেদাচার্য্য নামে এক জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন। তিনি গণনা করিয়া পর দিবস সংগ্রামের মৃত্যু হইবে, এই কথা প্রকাশ করায় তাঁহার সম্পত্তি খাস করা হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন, ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে সংগ্রামের মৃত্যু হয়, তাহা যে সত্য নয়, আলমগীর নামা-কথিত কেল্লা স্থাপনেই উহা প্রতিপন্ন হইবে। সংগ্রামের পুত্রের পরলোক গমনের পর সীতারাম রায়ের পিতা উদয়নারায়ণ ভূষণার সাজোয়াল হইয়া আইসেন।

বিখ্যাতনামা রাণী ভবানীর সময়ে ভূষণাবাসী কোন ব্রাহ্মণের বৃত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। তখন ঐ ব্রাহ্মণ রাণীর নিকট যে আবেদন পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে ভূষণার পূর্ব্বস্বামী সংগ্রাম ও সীতারাম রায়ের নাম স্পষ্ট উল্লেখ আছে। আমরা প্রয়োজন বোধে ঐ আবেদন পত্র হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ঃ—

"পূর্ব্বৈঃ সংগ্রাম সাহা নৃপতি প্রভৃতিভিঃ পালিতা ভুষণা যা,
সীতারামেণ পশ্চাত্তদনু সবতী রামকান্তেন চোঢ়া*

* রাণী ভবানী নাটোররাজ রামকান্তের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। রামকান্তই ভূষণাধিপতি ছিলেন। তদন্তরে রাণী ভবানীর হস্তগত হয়, এইজন্য কবি ভূষণাকে "সপত্নী-করযুগলগতা" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

সা চেদানীং সপত্নীকরযুগলতা স্বামিহীনা বিরূপা,
কেষাং বা নানুগাসো নচ ভবতি কথং কেন বা নানুদম্যা।।"

যশোহর কালেক্টরীর ১২০৯ সালের ১৭০৬ নং তায়াদাদ দৃষ্টে অবগত হওয়া যায়, নলদী পরগণার অন্তর্গত ভাঁটুদহ গ্রামের ১৩০১ সালে ১৯ আকবর (১৬২৬ খ্রীঃ অব্দে) রামভদ্র ন্যায়লঙ্কারকে এবং ১৯১৩ নং তায়দাদ ১০৪৯ সনের পৌষ মাসে ১৭৪১ খ্রীঃ অব্দে জানুয়ারী মাসে রামতনু ভট্টাচার্য্যকে সংগ্রাম সাহ ব্রহ্মত্র জমি দান করেন।

## সীতারাম রায়

সীতারামের প্রপিতামহ রাম রামদাস রাজমহলের নবাব সরকারের খাস সেরেস্তায় কোন রাজ পদে বিচক্ষণতার সহিত কার্য্য করিয়া বিশ্বাস খাস উপাধি ধারণ করেন। তৎপুত্র হরিশ্চন্দ্র ঐ স্থানের একটা উচ্চ রাজপদ লাভ করিয়া ছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের পুত্র উদয় নারায়ণ, প্রথম পিতৃপদে, পরে নবাব ইব্রাহীম খাঁর অধীন ঢাকার রাজ কার্য্যে নিযুক্ত হন। সংগ্রামের বংশধরগণ হইতে ফতেয়াবাদ চাকলা নবাব সরকারে খাস হইলে পর উদয়নারায়ণ বন্দোবস্ত জন্য এই স্থানে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ঔরংজেব বাদসাহের রাজত্ব সময়ে ইব্রাহীম খাঁ বঙ্গদেশের শাসন কার্য্যে নিযুক্ত হন (১৬৮৯-১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে)। এই সময় পশ্চিম বঙ্গে সভা সিংহ ও রহিম খাঁ বিদ্রোহী হইয়া বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থান লুঠ করিয়া উৎসন্ন প্রায় করে। ঠিক ঐ সময়ে ভূষণা মহম্মদপুরের কায়স্থ বংশীয় সীতারাম রায় অভ্যুদয় লাভ করেন। সংগ্রামের কোন বংশধর না থাকায় রাজস্ব আদায় জন্য যৎকালে ভূষণার বন্দোবস্ত আরম্ভ হয়, তৎ সময়ে সীতারাম আরও কতকগুলি স্থান বন্দোবস্ত করিয়া লন, পরে নবাব ইব্রাহীম খাঁ দুর্ব্বল বিবেচনা করিয়া, স্বয়ং স্বাধীনতা অবলম্বন করিবার চেষ্টা পান। এই সময় ভূষণা নলদী ও তন্নিকটবর্ত্তী পরগণাগুলি তাঁহার হস্তগত হয়। ইব্রাহীমকে অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করিয়া বাদসাহ তাঁকে পদচ্যুত করিয়া তৎপদে ক্রমে আজিম ওসমান ও তৎপর মুর্শিকুলী খাঁকে নিযুক্ত করেন।

মুর্শিদকুলীর সময়ে সীতারাম ক্রমেই গর্ব্বিতভাব ধারণ করেন। পরে এক বারে বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়ান, তখন নবাব আবুতোরাপ নামক বাদসাহের নিকট সম্পর্কিত সেনাপতিকে সীতারাম রায়কে দমন করার জন্য প্রেরণ করেন। আবুতোরাপের সহিত সীতারামের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে তিনি নিহত হন। সীতারাম পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই, আবুতোরাপ বাদসাহের নিকট সম্পর্কিত লোক। পরে জানিতে পারিয়াও আবুতোরাপের শৌর্য্য বীর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া বিশেষ অনুতাপ বোধ করেন।

এদিকে মুর্শিদকুলী জানিতে পারিলেন, আবুতোরাপ যুদ্ধে হত হইয়াছে। তখন তাহার বিশেষ ভাবনার বিষয় হইল, কারণ আবু বাদসাহের স্বসম্পর্কিত লোক। যাহা হউক, কালবিলম্ব না করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ আপন শালীপতি-ভ্রাতা বক্‌শ আলিকেও পরামর্শ প্রদান জন্য রঘুনন্দনকে ভূষণায় প্রেরণ করিলেন।

সীতারামের সেনাপতি মেনাহাতী এক দিন অতি প্রত্যুষে বিপক্ষের গতিবিধি অবগত জন্য যেমন ছদ্মবেশে বাহির হইয়াছেন, অমনি নবাব সৈন্যগণ তাহা বুঝিতে পারিয়া বেষ্টন করতঃ পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রবৎ নানাদিক হইতে অস্ত্র প্রহারে হত করিয়া ফেলে।

অতঃপর সীতারাম রায়ের সহিত তাহাদের আরও কয়েকবার যুদ্ধ হয়, কিন্তু পরিণামে সীতারাম রায় পরাস্ত হইয়া বন্দী-দশায় মুর্শিদাবাদ প্রেরিত হন। তথায় বন্দী অবস্থায় তাঁহার প্রাণনাশ হয় (১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে)।

নবাবী আমলের জমিদারী খাস হইলে যেরূপ ব্যবহার হইয়া থাকিত, এ সূত্রেও তাহাই হইল। ভূষণার জমিদারী নিম্নলিখিত মত বাঁটোয়ারা হইয়া গেল।

১. রঘুনন্দন স্বীয় ভ্রাতা রামজীবনের নামে নলদী বিভাগে ভূষণা চাকলায় আমিরাবাদ, আরাঙ্গাবাদ, বাজুবস্ত, মামুদসাহী, নলদী, তেলীহাট, নসরৎসাহী, সেরদিয়া, কাশীম নগর প্রভৃতি ইহা ১৩০ পরগণায় বিভক্ত এবং রাজস্ব ১৬৯৬০৮৭ টাকা নির্দ্দিষ্ট হয়। নাটোর জমিদারীর ইহাই প্রধান অংশ।
২. কৃষ্ণনগরের রাজবংশ, ভূষণার অন্তঃর্গত হুলদা, চণ্ডিরা, জগন্নাথপুর প্রভৃতি চাকলা উহা ৭৩ পরগণায় ৫৯৪৮৪৬ টাকা জমা ধার্য্য হয়।
৩. বঙ্গাধিকারীগণের ভূষণা চাকলায়, জাহাঙ্গীরাবাদ, পাইগা, বাজুবস্ত প্রভৃতি ছিল।
৪. মামুদসাদী জমিদারী, ভূষণা চাকলা মধ্যে অবস্থিত ছিল। উহার কতকাংশ নলডাঙ্গার রাজাজাদের সহিত বন্দোবস্ত হয়। এতৎসহ আরঙ্গাবাদ বাজুমাল জাহাঙ্গীরাবাদ মামুদসাহী ও তাড়াভাঙ্গা প্রভৃতি কতকাংশ ছিল।

## চাকলে জাহাঙ্গীরনগর পরগণে জালালপুর

প্রাচীন ফতেয়াবাদের অন্তঃর্গত একটী মহাল। উহার অপর নাম সোয়া-মীল। খিলিজি বংশীয় জালালউদ্দীন সাহের নামানুসারে উহার জালালপুর নামকরণ হয়। টোডর মল্লের বন্দোবস্ত সময়ে, উহার রাজস্ব ছিল, ১৮৫৭২৩০ দাম। নবাব সুজা উদ্দীনের বন্দোবস্ত মতে ১৭২৮ খ্রীঃ অব্দে উহার কর ধার্য্য ১১০৩৩৫ টাকা হয়। তৎপর নবাব কাশীম আলী খাঁর বন্দোবস্ত মতে ১৭৬৩ খ্রীঃঅব্দে উহার খাজনা বৃদ্ধি হয়, ১৫৩০০৫ টাকা। সুজাউদ্দীন এবং মীর কাসেমের বন্দোবস্ত সময়ে এই পরগণার মালিক ছিলেন নুরউল্লা, কিন্তু শেষ বন্দোবস্ত সময়ে নুরউল্লা জীবিত ছিলেন না। তাঁহার শোচনীয় মৃত্যুর বিবরণ উল্লেখ করা যাইতেছে। জালালপুর অতি বৃহৎ পরগণা। এই পরগণা ভূষণার পূর্ব্ব হইতে পদ্মার পশ্চিম পর্য্যন্ত প্রসারিত। বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলা প্রথম "ঢাকা জালালপুর" জেলা নামে পরিচিত ছিল।

## নুরুউল্লা

চাকলা জাহাঙ্গীরনগরের অন্তঃর্গত সমস্ত ভূষণা, যশোহর ও ঘোড়াঘাটের কতক খাস ভূভাগ লইয়া, জালালপুর ও অন্যান্য কতকগুলি ক্ষুদ্র জমিদারীর সৃষ্টি হয়। তন্মধ্যে জালালপুর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া জানা যায়। নবাব নাজেম মুর্শিদকুলী জাফর খাঁর জামাতা সুজাউদ্দীন, তৎ জামাতা মুর্শিদ কুলী খাঁ এই সময়ে শ্বশুরের প্রতিনিধি স্বরূপ ঢাকার শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। মীর হবীব নামে তাঁহার এক অমাত্য ছিল, এই ব্যক্তি প্রথমাবস্থায়, হুগলিতে দালালের কার্য্য করিত, পরে ঢাকার মুর্শিদকুলী খাঁর অনুগ্রহ

প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার প্রধান অমাত্য পদে বরিত হন।

হবীব অতি ক্রুর প্রকৃতির লোক ছিলেন, বিশেষ ঢাকার সর্ব্ব প্রধান ধনী ও জমিদার আগাবাকের এর সহিত সখ্য থাকায়, তিনি আর কাহাকেও গ্রাহ্য করিয়া চলিতেন না। যদি জানিতে পারিতেন, কাহারও ধন সম্পত্তি আছে, তবেই আছিলা করিয়া তাহাকে কয়েদ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। বিশেষ শাসন কর্ত্তার প্রিয় পাত্র হওয়ায় ও স্বীয় প্রভু নবাবের জামাতার জামাতা হওয়ায় তাহার সাহস অত্যাধিক রূপে বাড়িয়া গিয়াছিল।

এই সময়ে জালালপুরের জমিদার নুরুউল্লার যথেষ্ট সম্পত্তি আছে বলিয়া প্রচারিত ছিল। হবীবের উৎক্রোশ দৃষ্টি তদুপরি নিপতিত হইল। কতক বার ছল করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বহু অর্থ সংগ্রহ করা হয়, পরে যখন আবার তাঁহাকে অন্যায়মত চাপিয়া ধরা হয়, তখন নুরুউল্লা একেবারে উহা অগ্রাহ্য করিয়া এক কপর্দ্দক দিতেও স্বীকৃত হন না।

হবীব তখন স্বীয় প্রভু মুর্শিদকুলি খাঁকে জানাইলেন, জালালপুরের জমিদার বিদ্রোহী হইয়াছে। যেমন জানান, তৎক্ষণাৎ তদ্বিরুদ্ধে সেনা সজ্জিত হইয়া জালালপুরের দিকে অগ্রসর হইল। নুরুউল্লাও তখন মরি বাঁচি বলিয়া বাধা প্রদান করিতে অগ্রসর হইলেন। উভয় পক্ষের যুদ্ধে বহু সৈন্যের পতন হইয়া পদ্মার স্বচ্ছ সলিল রক্তিমাকার হইয়া উঠিল। পরিণামে কিন্তু নুরুউল্লা ধৃত হইয়া ঢাকাতে নীত হন। পরে তথায় সেই শৌর্য্যশালী ও নিরপরাধ জমিদারের প্রাণদণ্ড বিধান হয়।

তাঁহার বহু সম্পত্তি ও ধনরত্ন বাজেয়াপ্ত করা হইলে ধনরত্ন কতক মুর্শিদাবাদে নবাব নাজিম নিকট ও অধিকাংশ হবীবের ও তৎ প্রভু মুর্শিদের ধনাগারে প্রেরিত হয়। নুরুউল্লার পাটপাশার পরগণা হবীব মিত্র আগাবাকেরের পুত্র সাদেককে দান করেন এই মীর হবীবের নামানুসারেই বরিশাল ও ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত পরগণে হবীবপুরের নামকরণ হয়। হবীবের সহকারী সোমকোটবাসী বৈদ্য দেওয়ান নিধিরাম দাস পরে এই পরগণা হস্তগত করেন। বিক্রমপুরের ন্যায় এই পরগণারও কোন জমিদার বর্ত্তমান সময়ে দৃষ্ট হয় না। গবর্ণমেন্টের অধীনে বহু তালুদকার এই পরগণা ভোগ করিতেছে।

## চাকলা বিভাগ

আকবর বাদসাহের রাজত্বকালে মহাত্মা টোডরমল্ল কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ ৩৩টী সরকারের বিভক্ত হইয়া রাজস্ব আদায়ের কার্য্য চলিতে থাকে। উহার পর ঔরঙ্গজেব বাদসাহের সময়ে মুর্শিদকুলী খাঁ যখন বাঙ্গালার শাসন কার্য্য আরম্ভ করেন, তৎকালে ঐ চাকলার পরিবর্ত্তে বঙ্গদেশকে ২৭টী সরকারের বিভক্ত করিয়া রাজস্ব আদায়ের সুবিধা করিয়া লন। তন্মধ্যে চাকলে জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা) ও চাকলে ভূষণার কতকাংশ লইয়া বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার সংগঠন হইয়াছে। এই চাকলা বিভাগ সময়ে ভূষণার সীতারাম একজন প্রবল প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন, তাঁহার সহিত ফরিদপুর ইতিহাসের সম্বন্ধ ততটা অধিক নয়। তথাপি সংক্ষেপে তৎ সম্বন্ধীয় বিবরণ পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এখন

[1] Riaz. Text-As 50 c. Edition, p. 300

ভূষণা ও জাহাঙ্গীরনগর চাকলা হইতে কোন স্থানে ফরিদপুরের এলেকা ভুক্ত হইয়াছে, তাহা আমরা মহাত্মা রেনেলের ম্যাপ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

## রেনেলের ম্যাপের পরিচয় স্থান

রেনেল সাহেবের নাম ইতিহাসজ্ঞ এবং ভূগোল ব্যবসায়ী ব্যক্তি মাত্রেই, পরিজ্ঞাত আছে। তৎকৃত ম্যাপের পরিচয় অনেকের নিকট শুনা যায়, কিন্তু তৎকৃত সংগ্রহ সকল অধিক লোকের নয়নপথের বশবর্ত্তী হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। অনেকে কোন কোন ইংরাজ অথবা বাঙ্গালীর লিখিত নোট দেখিয়া তদবলম্বনে তাঁহার নাম লইয়া থাকেন। সৌভাগ্যক্রমে, আমাদের উহা দর্শনের সম্যক সুবিধা ঘটিয়াছিল, সেই হেতু এসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইলাম।

রেনেলের পদবীসহ নাম– জেমস্ রেনেল, এফ,আর,এস। এই মহাত্মা বঙ্গদেশের সার্ব্বেয়ার জেনেরেল এবং ইঞ্জিনিয়ার শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছিলেন। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধিকার সময়ে, কোর্ট অব ডাইরেক্টরগণের অনুমত্যনুসারে তৎকৃত সমগ্র বঙ্গ বিহার ও এলাহাবাদের মানচিত্র অঙ্কিত ও মুদ্রিত হয়।

ইংরাজাধিকারের প্রথম সময়ে, বঙ্গ বিহার আট ভাগে বিভক্ত হয়, যথা– (১) হুগলী (২) মুর্শিদাবাদ (৩) পাটনা (৪) দ্বারভাঙ্গা, মুঙ্গের, বান্দীয়া, ছাপরা (৫) মালদহ (৬) ঢাকা (৭) মেদিনীপুর (৮) পালামো ও সিংহভূম প্রভৃতি। এই আটটী বিভাগে, একবিংশতি খানা মানচিত্র অঙ্কিত হয়।

আমরা এস্থলে দ্বাদশ ও সপ্তদশ সংখ্যক ম্যাপের কোন কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিতে প্রয়াস পাইলাম।[১] বঙ্গদেশের প্রাচীন মানচিত্র পরিদর্শন করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, খাস বাঙ্গালা প্রধানতঃ নৈসর্গিক কারণে, দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে যদিও প্রায় ঐরূপই পরিদৃষ্ট হয়, তথাপি উহার অনেক স্থান ও নদী নালার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। এস্থলে যে দুইটী ভাগের কথা উল্লেখ করা হইল, উহার এক ভাগ, পশ্চিমে হুগলী নদী হইতে আরম্ভ হইয়া পূর্ব্বদিকে গঙ্গা বা পদ্মা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উহার উত্তরে বেতরিয়া; দক্ষিণে, বঙ্গোপসাগর। অপর ভূভাগ, পশ্চিমে পদ্মা হইতে আরম্ভ হইয়া, পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর পশ্চিম তট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উহার উত্তরাংশ পর্ব্বতময় ও জঙ্গলাকীর্ণ ব্রহ্মপুত্র নদের তটবর্ত্তী স্থান-নিচয়; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর; এই ভূভাগই গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যস্ত "ব" দ্বীপ নামে পরিচিত।

## ইষ্ট-ইন্ডিয়া-কোম্পানীর রাজ্যশাসন সময়ে প্রথম বিভাগে—

(১) রাজসাহী পরগণা (২) চুনাখালী (৩) সাজন (৪) জাহানাবাদ (৫) কৃষ্ণনগর (৬) হুগলী (৭) যশোহর (৮) ভূষণা (৯) মহম্মদসাহী (১০) সুন্দরবন; এবং দ্বিতীয় বিভাগে ১ম-পাটপাসার, ২য়-ঢাকা, ৩য়-আটীয়া, ৪র্থ-পুখরিয়া, ৫ম-কাগমাইর, ৬ষ্ঠ-আমিরাবাদ এই কয়েকটী স্থান পরিলক্ষিত হইত। এতদ্ভিন্ন ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম স্বতন্ত্র

১. ১৭৮০ ও ১৭৮১ সনে এই ম্যাপ দুই খানা মুদ্রিত হয়। বাঙ্গলাদেশ আকবর বাদসাহের সময়ে ১৯টি সরকারের বিভক্ত হইয়া পরে মুর্শিদকুলী খাঁ দ্বারা তৎপরিবর্ত্তে চাকলায় পরিবর্ত্তিত হয়। পূর্ব পৃষ্ঠায় ভ্রম ক্রমে ২৭ সরকারের বিভক্ত লেখা হইয়াছে।

দুইটী স্থান, মেঘনা নদের পূর্ব্বতটে কোগইর নদীর আয়ত্তাধীন হইয়াছিল।

তৎসময় জাহাঙ্গীরনগর বা ঢাকা চাকলা বলিতে, 'উত্তরে-কড়ই বাড়ী, গোনাসার পাহাড় ও শ্রীহট্ট, পূর্ব্বদিকে-মেঘনার পূর্ব্বতটবর্ত্তী ভুলুয়া, লক্ষ্মীপুরা ও জুগদীয়ার পূর্ব্ব। পশ্চিমে-পুখরিয়া ও আবীয়ার পশ্চিম এবং ভূষণা, দক্ষিণে-বঙ্গোপাসাগর। বর্ত্তমান সময়ের সমুদয় বাখরগঞ্জ বা বরিশাল জেলা ফরিদপুরের চতুর্থাংশ এবং প্রায় সমস্ত নোয়াখালী ইহার অন্তর্গত ছিল।

ভূষণার সীমা তৎসময়ে এইরূপ ছিল-উত্তরে পদ্মা ও বেতরিয়ার ক্ষুদ্রাংশ এবং কুবারসাহী; পশ্চিমে মহম্মদসাহী, নলডাঙ্গা ও যশোহর; দক্ষিণে-ঢাকার অন্তর্গত বাখরগঞ্জের অংশ বিশেষ।

ঢাকা বিভাগের সম্পূর্ণ স্থানগুলির পরিচয় দেওয়া এস্থলে সহজসাধ্য নয়। এখানে মাত্র ঢাকা হইতে বরাবর দক্ষিণাভিমুখে গঙ্গা বা পদ্মার সহিত মেঘনা সম্মিলিত হইয়া যে স্থান হইতে সমুদ্রাভিমুখে গমন করিয়াছেন, সেই ভূভাগ মধ্যে কতিপয় স্থানের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে। তৎসময় নোয়াখালী ও ত্রিপুরার কতকাংশ ঢাকার অন্তর্গত ছিল, তাহাও পরিত্যক্ত হইল।

১. শ্যামপুর, ২. ফতুল্লা, ৩. নারায়াণগঞ্জ, ৪. ইদ্রাকপুর, (মুন্সীগঞ্জ প্রভৃতি) ৫. ফিরিঙ্গিবাজার, ৬. আবদুল্লাপুর, ৭. মীরগঞ্জ, ৮. মাকুহাটী, ৯. সেরাজদী, ১০. রাজবাড়ী, ১১. সেকেরনগর, ১২. হাসারা, ১৩. ষোলঘর, ১৪. বারইখালী, ১৫. নুরপুর, ১৬. গাউদিয়া, ১৭. বালী গাঁ, ১৮. নুনকিশোর, ১৯. চণ্ডীপুর। রেনেলের ম্যাপে ঢাকা হইতে আরম্ভ করিয়া এই স্থানগুলি ধলেশ্বরী, বুড়ীগঙ্গা ও কালীগঙ্গার উত্তর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যাহা অধুনা আইরলবিল নামে প্রসিদ্ধ, তৎসময় উহা চুরাইনবিল নামে পরিচিত ছিল।

**কালীগঙ্গা নদীর দক্ষিণ-তটবর্ত্তী স্থান—**

১. মূলফৎগঞ্জ, ২. করাতীকাল, ৩. জপসা, ৪. কান্দাপাড়া, ৫. শ্যামপুর, ৬. খীলগাঁ, ৭. সারেঙ্গা, ৮. চিকন্দী, ৯. গঙ্গানগর, ১০. রাধানগর, ১১. খাগটীয়া, ১২. সমকোট, ১৩. রাজনগর, ১৪ লড়িকুল, ১৫. নবীপুর, ১৬. ফুলবাড়ী, প্রভৃতি।

**মেঘনাতটে, কালীগঙ্গার দক্ষিণ—**

১. বুহার, ২. স্নানঘাটা, ৩. কার্ত্তিকপুর, ৪. ডনুই, ৫. রামগাও, ৬. ভয়রা, ৭. সাদকপুর, ৮. শ্রীরামপুর, ৯. পাতলাভাঙ্গা, ১০ সিরান্দী, ১১. দুদুলিয়া, ১২. সনসদীয়া (সিলন্দীয়া), ১৩. লক্ষীরদিয়া, ১৪. ঢেউখালী, ১৫. ছোটবাখরগঞ্জ, ১৬. গান্ধিয়া।

**পদ্মাতটে, কালীগঙ্গার দক্ষিণে—**

১. দীঘারিপাড়া, ২. রাজাখালী, ৩. ভাঙ্গাবাড়ী, ৪. কলারগাঁ, ৫. বালীসার, ৬. বুদারশাপ (বদরাসন), ৭. মাছুয়াখালী, ৮. গজারিয়া, ৯. সোনাপাড়া, ১০. সনরপুর, ১১. সলুয়ারহাট, ১২. বগাও, ১৩. কুশারিয়া, ১৪. ইসলারচর, ১৫. মেন্দিগঞ্জ, ১৬. আবদুল্লাপুর, ১৭. সুলতানী, ১৮. কন্দর্পপুর। এই কন্দর্পপুরের নিম্নে মেঘনা ও পদ্মার সম্মিলন ঘটে।

**গঙ্গা বা পদ্মার শাখা হরগঙ্গার তটবর্ত্তী স্থান—**

১. ফরিদপুর, ২. পাটপাসার, ৩. হাজিগঞ্জ, ৪. চরমনরিয়া (চরকুমুন্দিয়া), ৫. আলিপুর। এই আলিপুর হইতে হরগঙ্গা বরাবর দক্ষিণাভিমুখে হাবুল্লা নাম ধারণ করিয়াছিল। তাহার তীরে, ৬. সাহারপুর, ৭. সাজাদপুর, ৮. পাটিখালী, ৯. বন্দরখলা, ১০. পাঁচচর, ১১. সেকপাড়া, ১২. গোপালগঞ্জ, ১৩. হবিগঞ্জ, ১৪. আলুরাবাদ, ১৫. মাদারিপুর, ১৬. কুলপদ্বীপ, ১৭. কার্লাকিনী, ‘৮. সেলাপট্টি, ১৯. টেঙ্গরামারি, ২০. মসজীদ, ২১. রামনগর, ২২. গৌরনদী। আর বাহুল্য প্রযুক্ত উল্লেখ করা হইল না।

**ভূষণা চাকলার অন্তর্গত স্থানের নাম—**

১. কোষাখালী, ২. হোগলা, ৩. হাবাসপুর, ৪. কুমারখালী, ৫. বেরামপুর, ৬. সাদাপুর, ৭. গুলিশপুর, ৮. বেলগাছি, ৯. কলকাপুর, ১০. জাহাড়িঙ্গা, ১১. কমলদিঘী, ১২. মজুল, ১৩. সেনপাড়া, ১৪. বেরপুর, ১৫ বালীয়াকান্দী, ১৬. নহুয়া, ১৭. আভাসকুনারী, ১৮. গোব্রাখালী, ১৯. কৃষ্ণপুর, ২০. ফরিদপুর, ২১. ছোট- ডোমান, ২২. মথুরাপুর, ২৩. কানাইপুর, ২৪. হীরাপুর, ২৫. সহরভূষণা, ২৬. গোপালপুর, ২৭. মালিকনগর, ২৮. তালমা, ২৯. হাকিমপুর, ৩০. বাবুখালী, ৩১. জয়নগর, ৩২. গড়টী, ৩৩. রাজাপুর, ৩৪. বিনটপুর, ৩৫. মহম্মদপুর, ৩৬. কামারর্গা, ৩৭. কলনাপট্টি, ৩৮. কাগাইল, ৩৯. কালীনগর, ৪০. নহাট্টা, ৪১. মীরগঞ্জ, ৪২. মুকসুদপুর, ৪৩. বাইটকামারী, ৪৪. টেঙ্গরাখালী, ৪৫. মহারাজপুর, ৪৬. দীঘলনগর, ৪৭. পুলটীয়া, ৪৮. বঙ্গিগঙ্গ, ৪৯. সেকপাড়া, ৫০. কালীনগর, ৫১. গাঙ্গাটীয়া, ৫২. বলাসী ৫৩. কয়রা, ৫৪. মজুমপুর, ৫৫. শালখীয়া, ৫৬. খাজুরা, ৫৭. শ্রীরামপুর, ৫৮. দামনাখী, ৫৯. গাণ্ডারহাটী, ৬০. রাজাপুর, ৬১. সাতরিয়া, ৬২. ইনাইতপুর, ৬৩. আড়পাড়া, ৬৪. ডুকালী, (ঢেউখালী), ৬৫. রাজাপুর, ৬৬. গোড়াখালী, ৬৭. দাউদপুর, ৬৮ বানসরী, ৬৯. কলনা, ৭০. সামরুল, ৭১. কালন-ডিঙ্গা, ৭২. শৌনপুর, ৭৩. চামারী, ৭৪. কালীয়া, ৭৫. দেয়ানশ্রী, ৭৬. গোপালগঞ্জ, ৭৭. গোবরা, ৭৮. বারানী, ৭৯. টাঙ্গিপাড়া, ৮০. ঘোড়াডাঙ্গা, ৮১. শিবরামপুর, ৮২. চাঁদপুর, ৮৩. ফলসী, ৮৪. নেজারহাট, ৮৫. খড়রিয়ার কতকাংশ বিলসমষ্টি।

অধুনা ভূষণার কতকাংশ যশোহর ও খুলনা জেলার অন্তর্গত এবং কতকাংশ ফরিদপুর জেলার অন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়াছে। ফরিদপুর জেলার বর্ত্তমান ম্যাপ অনুসন্ধান করিয়া পরে উহা নির্দ্ধারণ করা যাইবে।

ঢাকার দক্ষিণে ধলেশ্বর নদীর দক্ষিণতট হইতে বরাবর দক্ষিণদিক অগ্রসর হইলে একমাত্র কালী গঙ্গা নামে একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর পরিচয় পাওয়া যায়। উহা বিক্রমপুরের বক্ষোদেশে উপবীতবৎ প্রতীয়মান হইত। মেঘনা হইতে একটী পয়োনালী বাহির হইয়া, প্রথমতঃ দক্ষিণতটে মূলফৎগঞ্জ ও উত্তর তটে ফুলবাড়ীর নিকট প্রবাহিত হইয়া পরে তথা হইতে দুইটী ক্ষুদ্র শাখা বরাবর পশ্চিমাভিমুখে দুই দিকে বিস্তৃত হইয়া রাধানগরের

নিকট পদ্মার সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। রাজনগর, সোমকোট, রাধানগর, ফুলবাড়ী প্রভৃতি স্থান উভয় নদীর মধ্যস্থলে বর্ত্তমান ছিল। দক্ষিণদিকের শাখা তটে মূলগঞ্জ, নবীপুর, জপসা, লরিকুল, কান্দাপাড়া, সারেঙ্গা, চিকন্দী, গঙ্গানগর এবং উত্তর দিকের শাখার উত্তর তটে চণ্ডীপুর, ঢোলসমুদ্র ধাউড্ডা, ধানকোণা, মুলগাঁ প্রভৃতি গ্রামগুলির অবস্থিতি ছিল। তৎসময় কার্ত্তিকপুর কালীগঙ্গার দক্ষিণ ভাগে মেঘনা তটে বিদ্যমান ছিল।

১৭৮১ খ্রীঃ অব্দে রেনেলের এই মানচিত্র অঙ্কিত হয়। তৎসময় পর্য্যন্ত বিক্রমপুর মধ্যে কীর্ত্তিনাশা বা ইদিলপুর মধ্যে নয়াভাঙ্গনীর উদ্ভব হয় নাই। পূর্ব্বে রাজাবাড়ী ও চণ্ডীপুর উভয় স্থান ও কালীগঙ্গার উত্তর দিকে ছিল; পরে যে সময় কীর্ত্তিনাশার বিস্তার হয়, তৎসময় আমরা কীর্ত্তিনাশার পূর্ব্বোত্তর পার রাজবাড়ী এবং দক্ষিণ পার চণ্ডীপুরের অবস্থান দেখিয়াছি। অধুনা চণ্ডীপুর নদীগর্ভস্থ হইয়া পুনরায় চরে পরিণত হইয়াছে।

অতঃপর কালীগঙ্গা হইতে পদ্মা ও মেঘনার সম্মিলিত স্থান কন্দর্পপুর পর্য্যন্ত আর কোন নদীর অস্তিত্ব এই মানচিত্রে বিদ্যমান নাই। পরে কিন্তু ইদিলপুর মধ্যে নয়াভাঙ্গনী এবং সাহাবাজপুর ও আবদুল্লাপুরের মধ্যে মেন্দিগঞ্জ নামে একটী নদীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এই সময় হইতেই কীর্ত্তিনাশা, নয়াভঙ্গানী, মেন্দিগঞ্জ নদীত্রয় সহিত পদ্মার সম্মিলন করিয়া দেয়।

ফরিদপুরের উত্তর-পূর্ব্বে পদ্মা বা গঙ্গা বিদ্যমান ছিল। অতি পূর্ব্বকালে এই নদী ফরিদপুর ও পাঠপাসারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। বর্ত্তমান সময়ে পাঠপাসারে পূর্ব্বোত্তর দিক দিয়া ইহার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পাঠপাসারের নিকট হরগঙ্গা নামে একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী পদ্মা হইতে বহির্গত হইয়া ক্রমে দক্ষিণামুখে প্রবাহিত হইয়া ফরিদপুরের উত্তরদিকে এবং কৃষ্ণপুরের দক্ষিণে পুনরায় পদ্মার সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। ফরিদপুরের নিকট হইতে আবার একটী ক্ষুদ্র শাখা বাহির হইয়া আলীপুরের নিকট পুনরায় পদ্মাতে পতিত হইয়াছিল। হরগঙ্গার তটে কলসদীঘি একটি বৃহৎ বন্দর ছিল। পশ্চিমে চন্দনানন্দী মধীপুরের নিকট পদ্মা হইতে বাহির হইয়া কানাইপুর, গোপালপুর, কুমারগঞ্জ, কালীনগর, টেঙ্গরাখালি, দিগনগর, কবিরাজপুর, হবিগঞ্জ হইয়া মাদারিপুরের নিকট হারবিলা নদীর সহিত মিলিয়াছিল। রেনেলের পরবর্ত্তী মানচিত্রে দেখা যায়, এই হারবিলার একাংশই ভুবনেশ্বর নাম ধারণ করিয়াছে। অবশিষ্টাংশ আরিয়ালখার মধ্যে বিল ও ভূভাগে পরিণত হইয়াছে। চন্দনার দক্ষিণাংশের নাম মধুমতী নদী ইহার তীরে গোপালগঞ্জ, গোবরা, খড়রিয়ার বিল ও কোটালীপাড়ার বিলসমষ্টি।

বলা বাহুল্য শত বৎসরের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গ বিশেষতঃ ফরিদপুর ও ঢাকার মধ্য-ভাগে নদী কর্ত্তৃক এমন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে, তাহা ভাবিতে গেলে বিস্ময়ে আপ্লুত হইতে হয়। স্থল ভাগ জলে, জল স্থলে এবং এক নদীর স্থানে অন্য আর একটা প্রাদুর্ভূত হইয়া পুরাতনকে সম্পূর্ণ নূতনে পরিণত করিয়াছে। একমাত্র মানচিত্রের সহায়তা ব্যতীত তাহা অনুমানে নির্ণয় করা কাহারও পক্ষে সহজসাধ্য নয়।

## গেরদার প্রস্তর লিপি

কস্‌বে মিরচ নামক পুরাতন দলিলে (কাগজে) গেরদার নাম উল্লেখ আছে। গেরদা ফরিদপুর সহরের ৪/৫ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত একটী মুসলমান প্রধান গ্রাম। পূর্ব্বে এই গ্রাম ও ফরিদপুর সহরের মধ্যে প্রায় ৩ মাইল লম্বা ও ১০/১১ মাইল পরিধি বেষ্টিত একটী প্রকাণ্ড বিল ব্যবধান ছিল, কিন্তু অধুনা এই প্রকাণ্ড বিলটীতে সম্পূর্ণরূপে চড়া পড়ায় এই স্থানটী বহু সংখ্যক লোকের বাসস্থান হইয়াছে। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, পূর্ব্বে এই স্থানে ঢোলনগর নামে একটী গ্রাম ছিল। কালক্রমে ঐ গ্রাম পদ্মার স্রোতে ধ্বংস হইয়া ক্রমে সরিয়া যায়, কিন্তু ঐ স্থানটীতে জল থাকিয়া বিলরূপে পরিণত এবং ঢোলসমুদ্র নামে অভিহিত হয়। ইহাও খুব সম্ভবপর, ঐ ঢোলনগরের কিয়দংশ বর্ত্তমান গেরদা গ্রামের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে। কারণ এই গ্রামে মকবেস অর্থাৎ কব্বর স্থান এখনও আছে।

এই কব্বর স্থানের একাংশ মাত্র (যাহা দরগা নামে অভিহিত হয়) এই গেরদা গ্রামের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে এখনও অবস্থিত আছে এবং গেরদা গ্রামের অন্তর্গত বলিয়াই পরিচিত। নামটী দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, গেরদা নামটী মুসলমানী নাম। কারণ গেরদা অর্থ গদী বুঝায়। গেরদা শব্দের অর্থ যে গদী ইহা "জয়নজবোলে" অর্থাৎ হাজরাত সা আলী বগদাদী সাহেবের আগমন স্থান নামক পার্সিয়ান পুস্তকে স্পষ্টই উল্লেখ আছে। এই গ্রামের পুরাতন নাম কি ছিল তাহা কেহই বলিতে পারেন না, কিন্তু ইহা সা সাহের অথবা তাঁহার সমসাময়িক লোকদিগের আগমনের বহু পূর্ব্ব হইতেই যে বেশ সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল, তাহা কেহই সন্দেহ করিতে পারেন না। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ এই গ্রামের অন্তর্গত দীঘি মুল্লুক খরসাদের উত্তর পাহাড়ে পীলখান অর্থাৎ হস্ত্যগার খরলানামে একটী স্থান আছে। ইহারই ঠিক উত্তরে একখণ্ড জমীতে কয়েকটী বড় পুকুর আছে, ইহার প্রত্যেক পুকুরই সম্পূর্ণ ভাবে অথবা প্রায়শঃ খুব বড় বড় পরিখা দ্বারা বেষ্টিত। এই পরিখাগুলিকে স্থানীয় লোকে গড় বলে। ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, পূর্ব্বে ঐ স্থানে একটী দুর্গ ছিল; ইহারই ঠিক পশ্চিমে নগর নামে এক স্থান আছে। ঐ স্থান সম্ভবতঃ নিকটবর্ত্তী স্থানের বাজার ছিল। বর্ত্তমান সময়ে অল্প দিন পূর্ব্বেও জমি চাষ করিবার সময় বিভিন্ন স্থানে পুরাতন দেওয়াল এবং ফটকের ভগ্নাবশেষ মাটীর তলে পাওয়া গিয়াছে; ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে কয়েকটী বড় বড় দীঘি ছিল, ইহার মধ্যে দীঘি মুল্লুক খরসেদ এখনও বর্ত্তমান আছে। অন্যগুলি বহু দিন পূর্ব্বেই চর পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু সাগরদীঘি "দিঘি মাথব্বখান" নিম দীঘি প্রভৃতি নামে ইহাদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। ঢোলসমুদ্রের দক্ষিণ পূর্ব্ব পাহাড়িতে কয়েকটী কব্বর স্থান যুক্ত একটী পুরাতন মসজিদের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এই মসজিদ সা আলী বগদাদের সময়ের বলিয়া প্রবাদ আছে। ইহার কয়েকটী প্রস্তর স্তম্ভ আছে এবং ইহার একখানি প্রস্তর লিপিতে আরবীয় ভাষায় বাহাদুর খাঁর নাম লিখিত আছে। যে খানখানা বইরাম খাঁ ফতেয়াবাদের রাজুব দৌলত রায়কে পরাস্ত করিয়াছিলেন, এই বাহাদুর খাঁ সম্ভবতঃ তাঁহারই বংশধর। সাহ আলি বগদাদের অন্যতম বংশধর সায়েদ মহম্মদ মড় ওরফে মদন মিঞা এখনও গেরদায় জীবিত আছেন। সাহ আলী বোগদাদের পুত্র সাহ ওসমান সাহেবের কব্বর অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। গেরদার সায়েদ আফজাল হোসেন সাহ

হোসেন টেগবরের বংশধর। ঢোলসমুদ্রের দক্ষিণ পারে সাহ হোসেন টেগবর হরনীর কব্বর অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

**বঙ্গানুবাদ**

১. যাঁহারা দয়ালু এবং অনুকম্পাবান পরমেশ্বরের নামে বিশ্বাস স্থাপন করে, তাঁহাদের যখন মিলন দিবসে প্রার্থনার ডাক পড়িবে; তখন পরমেশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইবে এবং সমস্ত ক্রয় বিক্রয় বন্ধ করিবে।

২. ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করেন, জগদীশ্বর স্বর্গে তাঁহার জন্য একখানা গৃহ নির্ম্মাণ করেন। এই ভবিষ্যৎ বক্তার প্রতি তাঁহার আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন তাহাকে শান্তি দান করুন।

৩. ক্ষমাশীলের (ঈশ্বরের) কৃতদাস দ্বারবান আজল বাহাদুর খান সুলতান ১০১৩ হিজরী।

এতদ্বারা জানা যায়, ৩১৪/১৫ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে এই মসজিদ প্রস্তুত হইয়াছিল।

**রাজা শ্যামল বর্ম্মার তাম্রশাসন**

কুলপঞ্জিকানুসারে রাজা শ্যামল বর্ম্মা ৯৯৪ শকে (১০৭২ খ্রীঃ অব্দে) সেন রাজাদের করদরূপে বিক্রমপুর শাসন করিতেন। সেনরাজগণ যেমন যজ্ঞ জন্য কনোজ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন, শ্যামল বর্ম্মাও ঠিক ঐ কারণ পঞ্চ গোত্রীয় পাঁচজন বৈদিককে বিক্রমপুর আনয়ন করেন। তন্মধ্যে শৌনক গোত্রীয় যশোধর শর্ম্মাকে সামন্ত সার প্রদান করেন। এই তাম্রশাসন থানা কত দূর বিশ্বাস্য, তাহা ঠিক করিতে পারি নাই, তবে দুই শত বৎসরের হস্ত লিখিত পুস্তক হইতে উহা উদ্ধৃত করা হইল।

"ইহ খলু বিক্রমপুরনিবাসি-কটকপতেঃ শ্রী শ্রীমতঃ জয়স্কন্ধাবারাৎ স্বস্তি সমস্ত-সু প্রশস্ত্যুপেত সতত বিরাজমান শ্বপতি-গজপতিনরপতি রাজত্রয়াধিপতি বর্ম্ম-বংশকুলকমলপ্রকাশভাস্ক সোমবংশপ্রদীপ-প্রতিপন্নকর্ণগাঙ্গেয়শরণাগত-বজ্রপঞ্জর-পরমেশ্বর-পরমভট্টারক পরমসৌর-মহারাজাধিরাজ অরিরাজ বৃষভশর-গৌড়েশ্বর শ্যামলবর্ম্ম দেবপাদবিজয়িনঃ সমুপগতাশেষ রাজন্যকরাজ্ঞীরাণকরাজপুত্র রাজামাত্যমহাধার্ম্মিকহা সান্ধিবিগ্রহিক পৌরপতিকদণ্ডনায়কবিষয়িপ্রভৃতীনন্যাংশ্চ রাজপাদোপজীবিনোহধ্যক্ষ প্রবরান্ চট্টভট্টজাতীয়মান্ জনপদক্ষেত্রকরান্ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তমান্ যথার্হং সমাজ্ঞাপয়তি বিদিতমস্তু ভবতাং বঙ্গবিষয়পাঠে বিক্রমপুরভুক্ত্যন্তে পূর্ব্বে নাগরকুণ্ডা দক্ষিণে ধীপুর পশ্চিমে লঙ্গাচুয়া উত্তরে কুলকণ্ঠী চতুঃসীমাবচ্ছিন্নপাঠকত্রয়া ভূমিঃ সজলস্থলাসখিলনানাসাকল্যপুলা সগুবাক নারিকেলাদি নানাবিধফলা মহাভূপেন ঘটিতা আচন্দ্রার্কক্ষিতিং যাবৎ স্বচ্ছন্দভোগেনোপভোক্তুং ঋগ্বেদীয় ঋগ্বেদান্তর্গতাশ্বায়নশাখৈকদেশধ্যায়িনে শুনকগোত্রয় শ্রীযশোধরদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় প্রাসাদোপরিশকুনপ্রপাতিতা যজ্ঞবিধৌ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তাস্মাভিঃ। যদেতদ্ধি দেয়া ভূমিস্ত্রিংশোত্তরমতা তাদৃশহরণে নরকপতনভয়ং পালনীয়ধর্ম্মগৌরবাৎ। ধর্ম্মার্থসংশ্লিষ্টাঃ।

ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্নাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।
তাবুভৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তৌ স্বর্গগমিনৌ ॥
বহুভির্বসুধা দত্ত রাজভিঃ সগরাদিভিঃ
যস্য যস্য যদা ভূমি স্তস্য তদা ফলম্ ॥
স্বদত্তাং পরদত্তা বা থো লবেচ্চ বসুন্ধরাম্।
স বিষ্ঠায়াং কৃমি ভুত্বা পচ্যতে পিতৃ ভিঃ সহ ॥
ময়াদত্তামিমাং ভূমিৎ যঃ করোতি হি পালনং।
তস্য দাসস্য দাসোহ হৎ ভবেয়ৎ জন্মজন্মানি ॥
তস্য হেয়া না কর্ত্তব্যা শ্রোত্রিয়াণাৎ কথঞ্চন।
যদীচ্ছসি মহারাজ শাশ্বতীৎ গতিমাত্মনঃ।
ভূমিদানস্য তু ফলং বৈকুণ্ঠগতিরক্ষয়া॥"

# ফরিদপুরের ইতিহাস

## দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীআনন্দনাথ রায়

985

# ফরিদপুরের ইতিহাস

## দ্বিতীয় খণ্ড

দক্ষিণ বিক্রমপুর ১ম ও ৮ম সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি
বিক্রমপুর ১৭শ বর্ষ সম্মিলনী সভার সভাপতি
ফরিদপুরের ইতিহাস ১ম খণ্ড এবং বারভুঞা
প্রণেতা; শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রের
বিবিধ প্রবন্ধ লেখক—

শ্রীআনন্দ নাথ
সাহিত্যশেখর
প্রণীত

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
জপসা বাবুর বাড়ী, নগর
পোঃ উপসী জিলা ফরিদপুর।
চৈত্র, ১৩২৮



মূল্য আড়াই টাকা

# ভূমিকা

যে আশা বক্ষে ধারণ করিয়া দশ বৎসর পূর্ব্বে ফরিদপুরের ইতিহাস ২য় খণ্ড মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, বিবিধ কারণে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। ভাবিয়াছিলাম এই বারই পরিসমাপ্ত করিব। কিন্তু তদোপযোগী অর্থ সংগ্রহ না হওয়ায় উহা হইয়া উঠে নাই। উহা গ্রন্থকারের দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে, কিন্তু অবস্থা পরিজ্ঞাত করিয়া প্রার্থনা সত্ত্বেও দেশবাসী কাহারও মন এদিকে আকৃষ্ট করিতে পারি নাই, কাজেই আমাকে অবস্থা মত ব্যবস্থা করিয়া অপূর্ণ অবস্থায় দীনহীন বেশেই উহাকে সর্ব্ব সমক্ষে উপনীত করিতে বাধ্য হইতে হইল।

এই গ্রন্থ সম্পন্ন করিবার অভিপ্রায়ে কাহারও নিকট হইতে ১ম ও ২য় খণ্ড ২্ দুই টাকা মূল্যে দিব বলিয়া কিঞ্চিৎ দাদন গ্রহণ করিতে বাধ্য হই। কেহ বা সাহায্য কল্পে যৎকিঞ্চিৎও দিয়াছিলেন, যাহাতে গ্রন্থকারের গমনাগমনের ব্যয় সঙ্কুলন হয় নাই। সেই সমস্ত মহোদয়গণ হয়ত দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইল দেখিয়া, গ্রন্থ সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া থাকিবেন, তজ্জন্যও আমাকে অসমাপ্ত অবস্থাতেই উহা পরিসমাপ্ত করিতে হইল।

বর্ত্তমান সময়ে গ্রন্থ প্রকাশ করা একরূপ অশ্বমেধ যজ্ঞ তুল্য ব্যাপার। নানাবিধ চিত্র, সুবর্ণরঞ্জিত মলাট, উচ্চদরের কাগজ সমন্বিত না হইয়া বাহির হইলে কেহ উহা পাঠ করিতে চাহেন না এমন কি হস্তে গ্রহণ করিতে চাহেন না। ইহাতে অর্থহীন লেখকগণকে ক্রমশঃই পশ্চাৎপদ করিয়া ফেলিতেছে। অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, আমিও অর্থ সমস্যাতে পতিত হইয়া এই গ্রন্থেব অঙ্গে কোনরূপ চারু বসন ভূষণ ব্যবস্থা করিতে পারিলাম না, পাঠকগণ এইজন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।

কতকগুলি স্থানের বিবরণ পুস্তক মুদ্রিত হইবার পরে উহার বিপরীত কোন কোন বিবরণ কেহ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, আমরা এইবারে উহার কোনরূপ ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারিলাম না। পরের খণ্ডে যাহা হয় করা যাইবে।

দপ্তরীর গৃহে কতকগুলি ফর্ম্মা নষ্ট হইয়া যাওয়ায় আমাকে বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে, এজন্য অতি অল্প পুস্তক লইয়াই আমাকে কার্য্য সমাপ্ত করিতে হইল, যাঁহারা বিলম্ব করিযা উহার অনুসন্ধান লইবেন, তাহারা হয়ত উহা প্রাপ্ত নাও পাইতে পারেন।

এই খণ্ডে যাহাদের গ্রামের বা বংশের পরিচয় প্রদত্ত হইল না তাঁহারা দেখিবেন একদা প্রচুর কীর্ত্তি কলাপ বক্ষে ধারণ করিয়া যে রাজনগর দিগদিগন্তর নাম বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল, যে জপসা কবিতা সম্ভার বক্ষে ধারণ করিয়া দিগদিগন্তর কবিত্ব সুগন্ধি বিতরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল এবং যে কোটালিপাড়ার পণ্ডিতমণ্ডলীর নানাবিধ শাস্ত্রীয়কলধ্বনিতে সমগ্র বঙ্গ মুখরিত হইয়াছিল উহাদের সংস্থানও এই খণ্ডে হইয়া উঠে নাই। যদি সময়ে সুবিধা ঘটে তবে বারান্তরে ৩য় খণ্ডে অন্যান্য স্থানের ও নীলকরের

বিবরণসহ ঐ সকল প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

পরিশেষে যাহাদের দয়ায় ও অর্থে প্রথম খণ্ড বাহির করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম সেই দাতা কলিকাতার প্রথিতনামা শ্রীযুত বাবু প্রফুল্লনাথ ঠাকুর ও কবিরাজপুরবাসী শ্রীযুত কৃষ্ণদাস রায় মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

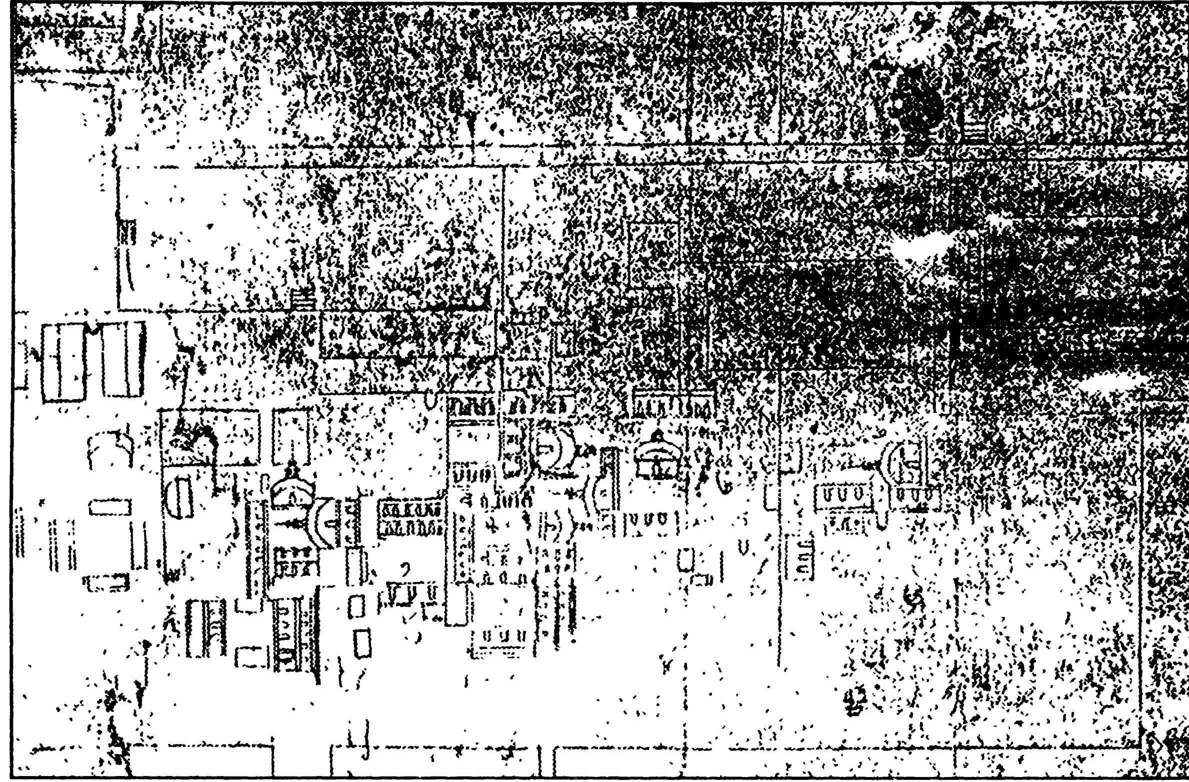
পুস্তক মুদ্রিত হইতে বিলম্ব হওয়ায় আরম্ভকালের অনেক ঘটনা এবং ব্যক্তি অতীতে পরিণত হইয়াছেন। আমরা উহার কোন প্রতিক্রিয়া করিতে পারিলাম না পাঠকগণ নিজ হইতে উহা সংশোধন করিয়া লইবেন।

যাঁহারা নানাবিধ সংবাদ প্রেরণ করিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, তাহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া ভূমিকার উপসংহার করা হইল। ইঁতি

"জপসা লালবাবুর কুটীর"
নগর
পো: উপসী (ফরিদপুর)

**শ্রীআনন্দনাথ রায়**
১৩২৮ সন মধুমাস
শুক্লা দ্বাদশী।

# সূচিপত্র



জপসা ছয় হাবেলী লালা বাবুরবাড়ী

# প্রথম অধ্যায়
## মহাল্‌ বা পরগণার সূচনা

প্রায় ত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইল প্রাচীন দলিলাদি অনুসন্ধান উপলক্ষে, একখানা বাটোয়ারা পত্র আমার হস্তগত হয়। কিন্তু উহাতে যে সনটির উল্লেখ রহিয়াছে তাহা বর্ত্তমান পঞ্জিকার উল্লিখিত সনগুলির সহিত মিলাইয়া দেখিলাম, উহার কোনটির সহিত এই সনের সামঞ্জস্য সাধন হইয়া উঠে না। বহুদিন পর্য্যন্ত এই সনটির অনুসন্ধান করিয়াও কোনরূপ কুল-কিনারা করিতে না পারিয়া এতদালোচনায় নিবৃত্ত রহিয়াছিলাম।

ঘটনা বশতঃ প্রায় দশ বৎসর পরে আমাদের অপর অংশীর কতকগুলি প্রাচীন দলিল আমার হস্তগত হয়। উহা পাঠ করিয়া জানিতে পারিলাম, পরগণাতি সন বলিয়া একটি সনের উল্লেখ কোন কোন কাগজে রহিয়াছে। আরও দেখিতে পাইলাম তৎসহ বাঙ্গলা সন ও তারিখ সংযোজিত আছে। তখন আমার সেই পুরাতন কথা মনে উদিত হইল; বুঝিলাম সেইটি এই পরগণাতি সন হইবারই সম্ভাবনা; তৎপর হিসাব করিয়া যে ফল লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমার অনুমানের প্রতি কোনরূপ সন্দেহ রহে নাই।

প্রথম হস্তগত সেই দলিলে ৪৯৭ সন মাত্র লেখা ছিল, তৎসহ বাঙ্গলা সনের কোনরূপ সংযোগ ছিল না। জপসাবাসী গোপীরমণ সেন তাঁহার ছয়টি পুত্রকে নিজ বসতবাটী ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া দেন; এই দলিলখানা সেই বাটোয়ারা পত্র। পরে যে দুইখানা দলিল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, সে দুইখানাই তাঁহার প্রপৌত্রদের সময়ের, এজন্য সন মিলাইয়া লইতে বিশেষ কোনও কষ্ট স্বীকার করিতে হয় নাই।

উহার একখানা পরগণাতি ৫৬৬ ও বাঙ্গলা ১১৭৫ সনে, এবং আর একখানা পরগণাতি ৫৭৪ ও বাঙ্গলা ১১৮৩ সনে সম্পাদিত হয়। গোপীরমণের দলিল সম্পাদিত হয় ৪৯৭ সনে। ৫৬৬ হইতে ৪৯৭ অন্তর করিলে দাঁড়ায় ৬৯ বৎসর। আবার ৫৭৪ হইতে ৪৯৭ অন্তর করিলে হয় ৭৭ বৎসর। গোপীরমণ পরিণত বয়সে পুত্রগণকে বাড়ী বিভক্ত করিয়া দেন, সেই হিসাবে ৬৯ কি ৭৭ বৎসর পরে তাহার প্রপৌত্রগণের আমলে এই কাগজ সম্পাদিত হইয়াছিল বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। অতএব গোপীরমণের দলিলে উল্লিখিত ৪৯৭ সন যে এই পরগণাতি সন, ইহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। এখন এই পরগণাতি সন খ্রীষ্টিয় কোন সনে প্রথম উদ্ভূত হয় তাহাই দেখা কর্ত্তব্য।

বাঙ্গালা সনের ৫৯২/৯৩ বৎসর পূর্ব্বে খ্রিষ্টীয় সন আরম্ভ হয়। এদিকে বাঙ্গালা সনের ৬০৯ বৎসরে পরগণাতি সন আরম্ভ হয়। অতএব পরগণাতি সনের প্রথম আরম্ভ হয় খ্রীষ্টাব্দের ১১০২/৩ বৎসরে।

এই সনটির সহিত যেন প্রচ্ছন্নভাবে একটা ঐতিহাসিক তথ্য এ পর্য্যন্ত সাধারণের অগোচরীভূত হইয়া রহিয়াছে। পরগণা শব্দটী মোসলমান রাজত্বের পূর্ব্বে এই দেশে ব্যবহৃত হইত কি না, দেশাংশ পরগণায় বিভক্ত ছিল কি না, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলেই এই

কথার মীমাংসা সাধিত হইতে পারে। যদি পূর্ব্বে উহার কোনরূপ নাম গন্ধ রূপ রেখ কিছুরই পরিচয় না পাই, তবে বলিতে পারি না কি, মোসলমানকর্তৃক বঙ্গ ও বিহার বিজয়ের সহিত এই পরগণাতি সনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে? বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদগণ একটা কিছু নতুন পাইলেই স্বীয় মস্তিষ্কের কোমল চিন্তা প্রসূত প্রমাণ প্রয়োগে হঠাৎ উহার প্রতি দৃঢ় আস্থা স্থাপন করিয়া বসেন। বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া, অদ্যাপি সেরূপ ভীষণ সাহসের বশবর্ত্তী হইতে পারি নাই। এই জন্য বঙ্গীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিক মহাশয়গণকে আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা এই পরগণাতি সন সমস্যার মীমাংসাসাধনে অগ্রসর হউন।

এই পরগণাতি সনের পরিচয় ১৩১৪ সনের ঐতিহাসিক চিত্রে মৎকর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে পরে বিক্রমপুরের ইতিহাসেও উহা আলোচিত হইয়াছে। উক্ত ইতিহাসে ও মৎপ্রণীত বারভুঞা-গ্রন্থে এতৎ সম্বন্ধীয় দলিল প্রকাশিত হয়। সুবিখ্যাত প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত ৺প্রিয়নাথ সেন, ডি, এল, মহাশয়ের খুল্লতাতের নিকটও এইরূপ পরগণাতি সনযুক্ত আছে। দলিল ঘটনাক্রমে কালীয়ানিবাসী ডেপুটী কালেক্টার শ্রীযুক্ত রসিকলাল সেন, বি-এ, মহোদয়ের নিকট শুনিয়াছি, সরকারী কার্য্য উপলক্ষে তিনি যখন ত্রিপুরায় ছিলেন, তথায় এই সনযুক্ত দলিল তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। ময়মনসিংহের কোন পত্রিকায় এক সময়ে কোনও এক ব্যক্তি একটি অপ্রচলিত সনের কথা জানিবার জন্য পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সকল কথার উপর নির্ভর করিলে অনুমান হয় পূর্ব্ববঙ্গে এই সনটি এক সময়ে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। পশ্চিম কি উত্তর বঙ্গে ইহার কোন পরিচয় ছিল কি না তাহা এ পর্যন্ত অবগত হইতে পারি নাই। যদি তাহা পাই তবে বুঝিব সমগ্র বঙ্গের সহিতই এই পরগণাতি সনের কোন সম্বন্ধ রহিয়াছে; অন্যথা যে কারণেই হউক উহা মাত্র পূর্ব্ব বঙ্গের সহিতই ঘটনা বশতঃ জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সনটি পঞ্জিকার গৃহীত হওয়া কর্ত্তব্য।

আমরা যে কয়েকখানি পরগণাতি সনযুক্ত দলিল হস্তগত করিয়াছি উহার মধ্যে একখানার কিছু বিশেষত্ব রহিয়াছে। আমরা ভাবি কেবল ইংরেজ রাজত্বকালেই দলিল পত্রাদির রেজেষ্টারী প্রথা সূচিত হইয়াছে। বাস্তবিক এরূপ ভাবা ঠিক নয়; মোসলমান রাজত্বেও রাজ্য রক্ষা ও প্রজাপালন জন্য নানারূপ উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে এই রেজেষ্টারী প্রথাও ছিল। তবে আজকালকারমত এত কড়াকড়ি নিয়ম ছিল না; তখন দলিল গ্রহীতার ইচ্ছানুসারে উহা কখন কখন সম্পন্ন হইত। ঐ রেজেষ্টারী কাগজে কাজি সাহেবের শীলমোহর অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হইত। আমাদের হস্তগত কাগজে এইরূপ পারস্য ভাষায় লিখিত শীল দেওয়া আছে।

তৎকালে জমি বিক্রয় করিতে হইলে এই কার্য্যের জন্য দুইখানা করিয়া দলিল লিপিবদ্ধ করিতে হইত। একখানার নাম হইত কবেলা, অপরখানার নাম হইত কবজ। উহার একখানা কেবল বাঙ্গালা লেখাতেই সম্পন্ন হইত, অপরখানা বাঙ্গলা ও পারস্য এই উভয় ভাষাতে লিখিত হইত। কাগজের নিম্নার্দ্ধে থাকিত বাঙ্গলা, উপরার্দ্ধে থাকিত পারসী। এইখানাতেই কাজি সাহেবের শীল ছাপাইয়া দেওয়া হইত।

**পরগণা বিভাগ ও বন্দোবস্ত :**

সমসুদ্দিনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র সেকেন্দরসাহ বঙ্গদেশের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করিলে, দিল্লীপতি তাঁহাকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধ চলিতে থাকিল, কিন্তু বাদসাহ এইবারও কিছু করিয়া উঠিতে পারেন না, অগত্যা তাঁহাকে ৪৮টী হস্তী ও অন্যান্য উপঢৌকন গ্রহণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিতে হয়। সেকেন্দর একডালার দুর্গে অবস্থান করিতেন। ইহার সময়ে বঙ্গদেশ জরিপ হইয়াছিল (১)। ইহা হইতে অনুমান হয় তাঁহার সময়ে একবার জমা ধার্য্য হয়। আমরা ১২০৩ খ্রীঃঅব্দে প্রথম পরগণাতি সন আরম্ভের কথা বলিয়াছি। সেই হিসাবে সেকেন্দর সম্পাদিত জরিপ জমাবন্দীর ১৫৬ বৎসর পূর্ব্বে পরগণাতি সনের আরম্ভ অনুমান করা যায়।

রিয়াজ উস সালাতিনে দৃষ্ট হয়, বাদসাহ হুমায়ুনকে বিতাড়িত করিয়া শেরসাহ দেশের আধিপত্য গ্রহণ করিলে, তৎকর্ত্তৃক বঙ্গদেশ নানাভাগে বিভক্ত হইয়া, বিচারালয় ও কর আদায় কার্য্যের সুশৃঙ্খলা বিহিত হয়। অতএব তৎকর্ত্তৃক যে একটা জমা নির্দ্দেশের কাগজ প্রস্তুত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেকেন্দরসাহ বা শেরসাহের সময়ের কোন কর বিষয়ক কাগজ পত্রের অনুসন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

অতঃপর আকবর বাদসাহের রাজত্বকালে টোডরমল্লকর্ত্তৃক এক জমাবন্দী পত্র প্রস্তুত হয়, যাহা সাধারণের নিকট ওয়াশীল তুমার জমা নামে প্রসিদ্ধ হয়। উহাতে সুবে বাঙ্গলার অন্তর্গত সমুদয় জমি ১৮টী সরকারে বিভক্ত হইয়া ৬৮২টী পরগণায় সন্নিবেশিত হয়। এই কাগজে পরগণাগুলি মহাল নামে উল্লিখিত হইয়াছে।

সাজাহান বাদসাহের রাজত্ব সময়ে তৎপুত্র বাঙ্গলার সুবেদার সাহসুজা কর্ত্তৃক ১৬৫৭ খ্রীঃ অব্দে পুনরায় আর একবার রাজস্বের হিসাব প্রস্তুত হয়। ১৭২২ খ্রীঃ অব্দে আরঙ্গজেব বাদসাহের রাজত্বকালে জাফর খাঁ কর্ত্তৃক পুনরায় এক রাজস্বের হিসাব প্রস্তুত হয়। এই হিসাবানুসারে বঙ্গদেশের রাজস্ব পূর্ব্বাপেক্ষা বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। তজ্জন্য বাদসাহ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পদ গৌরব বর্দ্ধিত করিয়া দেন। এই মহাত্মাই পরে মুর্শিদকুলী খাঁ নামে পরিচিত হন। তৎকর্ত্তৃক যে হিসাব প্রস্তুত হয় তাহার নাম হয় "জমা কামেলতুমারী।" মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যুর পরে তদীয় জামাতা সুজাউদ্দীন নবাবী-পদ গ্রহণ করিয়া (১৭২৫ খ্রীঃ অব্দে) এই হিসাব পাকা করিয়া লন ; ১৭২৮ খ্রীঃ অব্দে উহার সুমার (গোসাহারা) প্রস্তুত হয়। পরবর্ত্তী কাগজগুলিতে পরগণার কথা স্পষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অতঃপর মীর কাসেম আলীখাঁর নবাবী আমলে আর এক হিসাব প্রস্তুত আরম্ভ হইয়াছিল ; যাহা পরে সৈয়দ রেজা কর্ত্তৃক ১১৭০ সালে পরিসমাপ্ত হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পঞ্চম রিপোর্টে সুজাউদ্দীনের সময়ের ও সৈয়দ রেজার নির্দ্দিষ্ট উভয় হিসাবই উদ্ধৃত হইয়াছে।

ইংরেজ শাসনের প্রথম অবস্থায় নবাবী আমলের হিসাব দৃষ্টেই কর আদায় হইত। পরে লর্ড কর্ণওয়ালিশ গবর্ণর হইয়া ১৭৮৭ খ্রীঃ অব্দে পাঁচ বৎসরের জন্য এক বন্দোবস্ত করেন। তৎপর ১৭৯৩ খ্রীঃব্দে দশ সনা বন্দোবস্তের সূত্রপাত হইয়া পরে উহাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে পরিগৃহীত হয়।

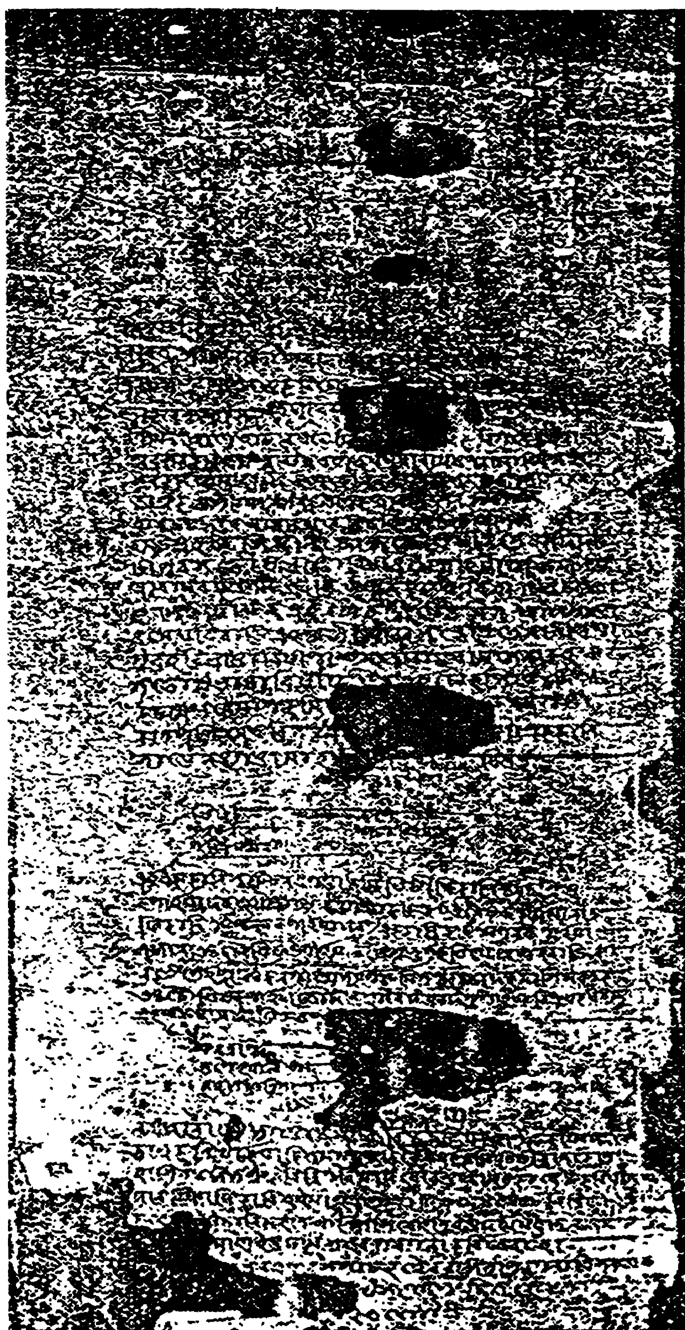
(১) বার ভূঞা ২০ পৃষ্ঠা। ১৩৫৯ খ্রীঃ অব্দে বাদসাহ ও সেকেন্দরের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপিত হয়।

এই সময়ে ফরিদপুর জেলা ছিল না। উহার কতকাংশ ঢাকা কতকাংশ যশোহর ও অপর কিছু নদীয়া জেলার অন্তর্গত ছিল। অতএব সেই সময়ের বিবরণ এই স্থানে লিপিবদ্ধ করা হইল না, পরগণা ও গ্রামের বিবরণ মধ্যে যথা সম্ভব উল্লেখ করা হইবে। তবে এই স্থানে বলা আবশ্যক যে ফতেয়াবাদ, খালীফেতাবাদ, সোণার গাঁ, বাজুহায় ও বাকলা সরকার অন্তর্গত কতিপয় মহাল বা মহালের অংশ লইয়া ফরিদপুর জেলার সংগঠন হইয়াছে।

মোসলমান রাজত্বকালে, শাসন সৌকর্য্যার্থে এক একটী পরগণার জন্য এক একজন কাননগো নিযুক্ত থাকিতেন। বড় বড় পরগণার মধ্যে ততোধিকও না থাকিত এরূপ নহে। এখনকার ইংরেজ শাসনে যে পুলিশ ষ্টেসন বা থানা সংস্থাপিত হইয়াছে, উহাতে পরগণার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া নিকটবর্ত্তী কতকগুলি গ্রামসমষ্টি লইয়া গঠন করা হইয়াছে মাত্র। পূর্ব্বে জন্মস্থানের পরিচয় দিতে হইলে গ্রাম ও পরগণার নাম বলিতে হইত, বর্ত্তমান সময়ের পরিচয় উপলক্ষে গ্রাম ও থানার নাম ব্যবহৃত হয়। পরগণার পরিচয় ক্রমশঃ লোপ প্রাপ্ত হইতেছে। আমাদের বিবেচনায় এই দুইটী অর্থাৎ পরগণা ও থানার কথা লিখিতে গেলে অগ্রে পরগণার বিবরণ প্রদান করাই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ পরগণার সহিত বহু পুরাতন ঐতিহাসিক সম্বন্ধ জড়িত রহিয়াছে। এই জন্য আমরা অগ্রে পরগণার বিবরণ প্রকাশ করিয়া পরে থানা ও তদধীন গ্রামগুলির পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইব।

এই স্থানে একটি কথা বলা সঙ্গত মনে করি। প্রদেশ বিভাগ, পরগণা বিভাগ, জেলা বিভাগ, থানা বিভাগ প্রভৃতি বিধাতার বিধান নয়, রাজশক্তির উপরেই উহার সম্পূর্ণ নির্ভর। রাজা উহা গড়িতেও পারেন, ভাঙ্গিতেও পারেন। যখন যে বিধির বিধান করেন, প্রজাকে তাহাই মানিয়া লইতে হয়। প্রথম যে সকল পরগণার সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল, এই কারণে সময় সময় উহার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই জেলার ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে যতগুলি পরগণার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে তন্মধ্যে ১৮৫৭ হইতে ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত কাপ্তেন জে, ই, গেস্ট্রেল ও এন, টী, ডেলী সার্ব্বেয়ারের অধ্যক্ষতায় যে সার্ভে হয় তাহাতে মাত্র সমগ্র জেলার পরগণাগুলিকে নিম্নলিখিত অধ্যক্ষতায় যে সার্বে হয় তাহাতে মাত্র সমগ্র জেলার পরগণাগুলিকে নিম্নলিখিত পরগণায় বিভক্ত করিয়া মানচিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে। তৎকালে মাদারীপুর সবডিভিসন ফরিদপুরের অন্তর্গত ছিল না, অতএব তদধীন পরগণা যাহা ঢাকা ও বরিশাল জেলার অন্তর্গত ছিল, তাহা ফরিদপুরের তৎকালীন ম্যাপে না থাকিলেও ঢাকা, বরিশালের ম্যাপ হইতে উহা সংগ্রহ করা হইল।

| নং | পরগণা | গ্রাম্য সার্কেল | স্কোয়ার মাইল |
|---|---|---|---|
| ১। | নসরৎসাহী<br>ও | ৫৭৮ | ১৯৭.২৬ |
| ৩। | মহম্মদসাহী প্রভৃতি<br>হাবেলী | ৭৭ | ৭৭.২৫ |
| ২। | সাতোর প্রভৃতি | ৪৪৭ | ২৮৭.১৩ |



পরগণাতিসন সম্বন্ধীয় পারসী ও বঙ্গভাষায় লিখিত দলীল

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪। | নলদী | ৩৪৭ | ১৯৫.৪০ |
| ৬। | তেলীহাটী | ৮০ | ৬৮.৩৬ |
| ৫। | জালালপুর | ৭৫৭ | ১৬৫.০৯ |
| ৯। | ১৪৪.৩৬ | | |
| ৭। | মকিমপুর | ৭৩৬ | ৭৮৯.০২ |
| | সুলতানপুর, খড়রিয়া | | |
| ৮। | চরমুকুন্দিয়া | ২২ | ৬৮.১৯ |
| | ঢাকা জেলা হইতে আগত | | |
| | রাজনগর | ৫ | ২৭.৭৭ |
| | বৈকুণ্ঠপুর | | |

বরিশাল হইতে আগত
কোটালী পাড়া
ইদিলপুর

ফরিদপুর জেলার সমুদয় পরগণাগুলিকে তৎকালে মাত্র এই কয়েকটি পরগণায় বিভক্ত করিয়া সার্ব্বে করা হইয়াছিল। ভুবনেশ্বর নদের পরিমাণ ৩০.৪৯ ধরিয়া ১৮৬০ সন পর্য্যন্ত ফরিদপুরের পরিমাণ ফল ছিল ১৩৫২.৯৫ স্কোয়ার মাইল।

# দ্বিতীয় অধ্যায়
# পরগণার বিবরণ

### সরকার সোণারগাঁ, চাকলে জাহাঙ্গীর নগর
### বিক্রমপুর (১)

এই নামটি কতকাল যাবৎ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা অবধারণ করা সহজ সাধ্য নয়। রাজা বিক্রমাদিত্যের অবস্থান নিবন্ধন অথবা বিক্রমশালী সেন রাজগণ হইতে বিক্রমপুর নামের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা ঠিকভাবে বলা যায় না। তবে সমতট বঙ্গ বলিয়া একটি স্থানের পরিচয়, বহুকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, উহার ব্যাপকতা কতদূর ছিল অধুনা তাহা নিরূপণ করাও সুকঠিন। ফার্গুসন সমতট বলিতে ঢাকা জেলা, ইৎচিঙের ভারতের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত কোনও স্থান, এবং ওয়ার্টসার ফরিদপুরের পূর্ব্ব এবং ঢাকার উত্তরবর্ত্তী স্থান নির্দ্দেশ করিতেছেন। ফার্গুসনের কথায় বিক্রমপুর সমতটের মধ্যেই পড়িয়া যায়। ইৎচিঙের বিভাগানুসারে পূর্ব্ব-ভারতের অন্তর্গত বলিয়াও বিক্রমপুরকে সমতটের অন্তর্গত ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ওয়ার্টসার যে ভাবে নির্দ্দেশ কবিয়াছেন, তাহাতে একমাত্র বিক্রমপুরকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। অনেকেই এই কথার অনুমোদন করিতেছেন; আমরাও উহা সমীচীন বলিয়া মনে করি।

সেন রাজগণের তাম্রশাসনে বিক্রমপুরের নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। এতদ্দারা অনুমান করা যাইতে পারে এই নামটি হয় সেন রাজত্বকালে অথবা তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পাল রাজগণ দ্বারা সংসিদ্ধ হইয়াছিল। এই কারণে বলা যাইতে পারে সহস্র বৎসর পূর্বে বিক্রমপুরের নামকরণ হইয়াছে।

অধুনা বিক্রমপুর বলিতে যে স্থানটুকু নির্দ্দিষ্ট হয়, বাস্তবিক পক্ষে প্রথমোদ্ভুত বিক্রমপুর কিছু এতটুকু স্থান লইয়া সংগঠিত হইয়াছিল না। তৎকালে বহু বিস্তীর্ণ ভূভাগ লইয়া উহার সংস্থিতি ছিল, পরে উহার অনেক স্থান বিভিন্ন পরগণায় পরিগণিত হইয়াছে। কার্ত্তিকপুর, ইদিলপুর, পারজোয়ার প্রভৃতি স্থানগুলি নিশ্চয়ই বিক্রমপুরের অন্তর্গত ছিল। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ঐ পরগাগুলির কোন অস্তিত্ব ছিল না। আমরা ক্রমে এই বিষয় প্রদর্শন করিতেছি।

ইদিলপুরে প্রাপ্ত সেন রাজগণের একখানা তাম্রশাসন এশিয়াটিক-জার্নেলের প্রথম অংশের ৮০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে লিখিত আছে "বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগ প্রদেশে প্রশস্ত** লতা** ঘোড়াঘটক পূর্ব্বে** স* একা** ধীগ্রাম সীমা দক্ষিণে শাঙ্কর বসাগোবিন্দ বসান্ত ভূসীমাপশ্চিমে** ইত্যাদি–

এই তাম্রশাসনে "লতা" ও "ধীগ্রাম" বলিয়া যে দুইটি স্থানের পরিচয় আছে; উহা

(১) বিশেষ বিবরণ প্রথমখণ্ডে দ্রষ্টব্য।

যে বর্ত্তমান ইদিলপুরের অন্তর্গত, লতা ও ধীপুর গ্রাম তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। শ্যামল বর্ম্মার তাম্রশাসনে* নাগরকুণ্ডী, সাদন্তসার, লঙ্কাচুয়া ও ধীপুর নামের উল্লেখ আছে। ঐ সকল শাসন পত্রের কোথাও ইদিলপুর বা কার্ত্তিকপুরের নামের উল্লেখ নাই। যে সকল নাম বিক্রমপুরের অন্তর্গত বলিয়া শাসনপত্রে দেওয়া হইয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে কিন্তু ঐ সকল স্থান ঐ দুই পরগণার অন্তর্গত দেখা যায়।

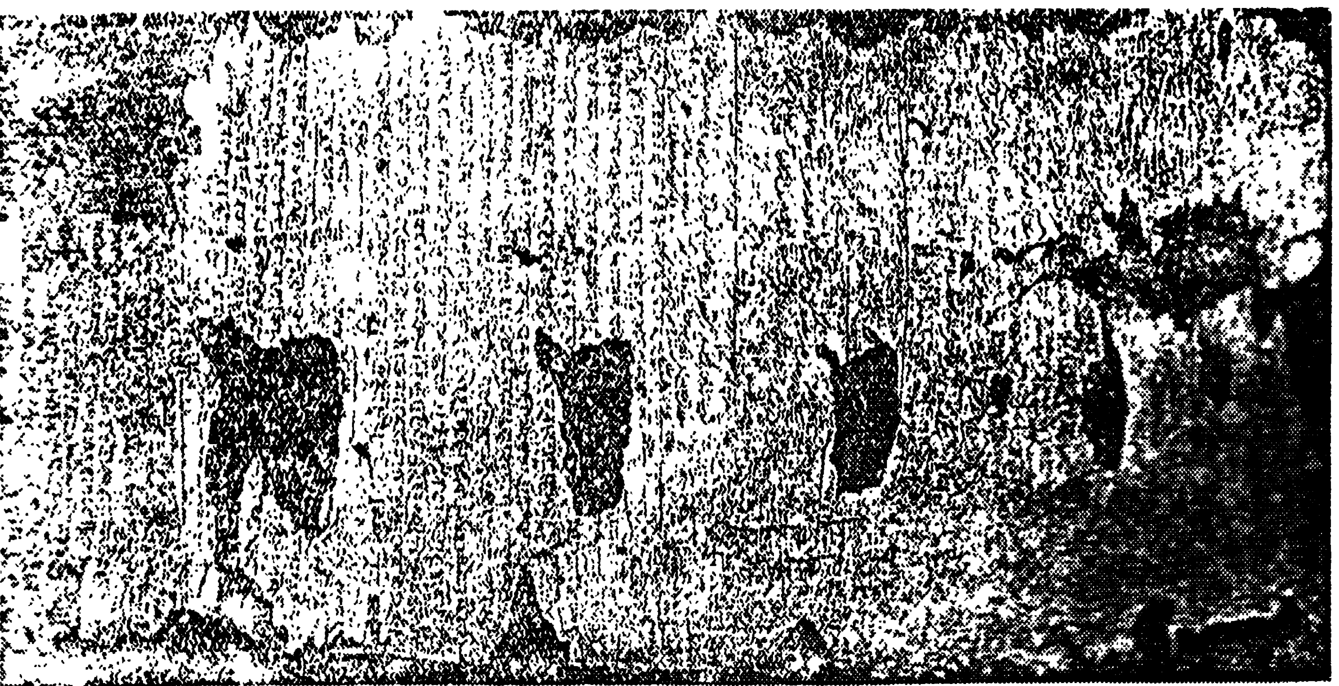
উপরে যে দুইখানা শাসনপত্রের কথা উল্লেখ করা হইল, উহা প্রায় আট নয় শত বৎসরের পূর্ব্বের বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। যদিও কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদদের মতে শ্যামল বর্ম্মার শাসনপত্র কৃত্রিম বলিয়া শুনা যায়, তথাপি ঐ কৃত্রিম দলিলও যে বহুশতবৎসর পূর্ব্বে গঠিত হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। অতএব স্বীকার করিতে হইবে ইদিলপুর ও কার্ত্তিকপুর এই দুইটি নাম পরগণা বিভাগেরও বহু পরে উৎপন্ন হইয়াছে।

সাহানসাহ আকবর বাদসাহের রাজত্বকালে ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা টোডরমল্ল দ্বারা বঙ্গদেশ উনিশটি চাকলায় বিভক্ত হয়। এই সময়ে সরকার সোণারগাঁর অর্ন্তগত ৫১টী মহলের মধ্যে বিক্রমপুর ও কার্ত্তিকপুর এবং সরকার বাকলার অন্তর্গত চারিটি মহালের মধ্যে ইদিলপুরের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদের বিশ্বাস বিক্রমপুরের অংশ হইতেই অন্যান্য নূতন পরগণার ন্যায় এই সময়ে কার্ত্তিকপুর-সুজাবাদ ও ইদিলপুর নামে দুইটি পৃথক পরগণা নির্দ্দেশ করা হয়। এইরূপে বাখরগঞ্জের অন্তর্গত প্রাচীন বাকলাচন্দ্রদ্বীপ হইতে বহু বিভিন্ন পরগণার উৎপত্তি হইয়াছে। মিঃ বিভারেজ তদীয় বাখরগঞ্জের ইতিহাসে উহা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সুজাবাদ ও ইদিলপুর, এই দুইটি নাম যে মুসলমান নামের সহিত সম্বন্ধ ও জড়িত তাহাতে অনুমাত্র সংশয় নাই। অতএব হিন্দু রাজত্বে উহা বিক্রমপুর বলিয়াই পরিচিত ছিল।

দেশের বিভাগ ঠিক রাখা বা না রাখা রাজার ইচ্ছা। আমরা বিক্রমপুর পরগণা দ্বারা উহা সপ্রমাণ করিতেছি। সেন রাজগণের সময়ে বিক্রমপুরের পরিধি যতদূর বিস্তৃত ছিল তাহার যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। তৎপর নবাবী আমলে এই বিক্রমপুর মধ্যেই আবার, আরাঙ্গাবাদ, রাজনগর ও বৈকুণ্ঠপুর প্রভৃতি তিন, চারিটি পরগণার সন্নিবেশ সাধিত হইয়াছে ১৮৫০ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৮৬০ পর্য্যন্ত গেষ্ট্রেল ও ডেলী কর্ত্তৃক যে সার্ব্বে হয়, তাহাতে দেখা যায় বিক্রমপুর পরগণাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

৮/৯ নং মকিমাবাদ। ১০নং বিক্রমপুর। ১৩/১৪ নং রাজনগর ও বৈকুণ্ঠপুর। এই তিন খণ্ডের মধ্যে ৮, ৯ ও ১৩, ১৪ নং এই দুই বিভাগে বিক্রমপুর ব্যতীত অপর কয়েক পরগণার জমিও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ৮/৯ নম্বরে মকিমাবাদ ও আরঙ্গাবাদের মধ্যে উত্তর বিক্রমপুরের দত্তপাড়া, সেকেরনগর, হাসারা, বীরতারা, ষোলঘর, দেওভোগ, শ্রীনগর, মাইজপাড়া, কামারগাঁ, পাটাভোগ, বেজগাঁ, পরাণীমণ্ডল, কয়কীর্ত্তন, নাগরভাগ, কুমারভোগ, মেদিনীমণ্ডল, হলদিয়া, ইছাপাশা, বাজপুর, দেড়শত, ভাওয়ার, মাওয়া, কাওলীপাড়া, কোয়রপুর প্রভৃতি বিক্রমপুরের বহু গ্রাম সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কীর্ত্তিনাশা নদীর দক্ষিণ তীরবর্ত্তী স্থান সমুদয় ১৩/১৪ নম্বর রাজনগর ও বৈকুণ্ঠপুর এই দুই বিভাগের

* ফরিদপুরের ইতিহাসের প্রথমভাগে এই তাম্রশাসন মুদ্রিত হইয়াছে।



পরগাতিসন সম্বন্ধীয় পারস্য ও বঙ্গভাষায় লিখিত দলীল

অন্তর্গত করা হইয়াছে। ৮/৯/১০ নম্বর উহা বর্ত্তমান সময়েও ঢাকার অন্তর্গত থাকায় সর্ব্বসাকুল্যে বিক্রমপুর নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। কীর্ত্তিনাশার দক্ষিণ তীরস্থ স্থানগুলি সম্প্রতি ফরিদপুরের অন্তর্গত হওয়ার উহা 'দক্ষিণ' বিশেষণ বিশিষ্ট হইয়া দক্ষিণ বিক্রমপুর নামে অভিহিত হইতে চলিয়াছে কিন্তু বিক্রমপুরবাসী কেহই পরিচয় প্রদানকালে, মকিমাবাদ, আরঙ্গাবাদ বা রাজনগর, বৈকুণ্ঠপুরের পরিচয় প্রদান করেন না। প্রকৃত রাজনগর গ্রামবাসীরাও বাড়ী রাজনগর, পরগণা বিক্রমপুর বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। রাজ্যবিধান কাগজ পত্রেই নিবদ্ধ আছে। বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বিস্তৃত বাকলা (চন্দ্রদ্বীপ) পরগণার বহু খর্ব্বতা সাধন হইলেও তত্রত্য পণ্ডিতগণ, যাঁহারা বিভিন্ন পরগণার বিভক্ত স্থানসমূহে বাস করিতেছেন, তাঁহারা সগর্ব্বে বাকলার পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হন না।

দক্ষিণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত শ্রীপুর নগরে সুপ্রসিদ্ধ চাঁদ ও কেদার রায়ের রাজধানী ছিল। এতদ্ভিন্ন সঙ্কট নামক স্থানে, সমতটের সদরস্থান ছিল। সমতটকে বৈদেশিক লেখকগণ কেহ সনকট, কেহ সকাট, বা সাকাট লিখিয়া গিয়াছেন। উচ্চারণের বৈষম্যবশতঃ বিক্রমপুরবাসিগণ উহাকে সঙ্কট বা সমকট বলিতেন(১)। সমগ্র বেহার প্রদেশ মধ্যে যেমন এক খণ্ড স্থানের নাম বেহার, সেইরূপ সরকার খলিফেতাবাদ, ফতেয়াবাদ, পূর্ণিয়া প্রভৃতির মধ্যে কয়েকটি খণ্ড স্থানেরও ঐরূপ নাম ছিল, যাহা তৎকালীন সেই সেই বিভাগের সদর স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত। এই সমকট (সমতট) ও তদ্রূপ সমগ্র সমতটের সদরস্থান ছিল। রামপালের পূর্ব্বে সমকটের অভ্যুদয় হয়। এক সময়ে এই সমকটের নিম্ন দিয়া সমুদ্র প্রবাহিত থাকাও অসম্ভব নয়। ১৭৬৩ খ্রীঃ অব্দে মেজর জেমস্ রেণেল গঙ্গা (পদ্মা) ব্রহ্মপুত্র বা মেঘনার সার্ভে উপলক্ষে যে মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই স্থানটির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই স্থানে বৈদ্যের এক সমাজ ছিল। এতদ্ভিন্ন, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অন্য সম্প্রদায়ের বহু হিন্দু এই স্থানে বাস করিতেন। প্রায় একশত বৎসর অতীত হইল দক্ষিণ বিক্রমপুরের এই প্রসিদ্ধ স্থানটি ও তন্নিকটবর্ত্তী গোবিন্দমঙ্গল, খাগটিয়া প্রভৃতি গ্রামগুলি নদীপ্রবাহে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে।

এতদ্ভিন্ন দক্ষিণ বিক্রমপুরের নিম্নলিখিত স্থানগুলি কীর্ত্তিনাশা দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। রাজনগর, জপসা, ভোজেশ্বর, লড়িকুল, কানার গাঁ, আকসাইল, সোণার দেউল, গজনাইপুর, পোড়াগাছা, মূলপাড়া, মূলনা, দেভোগ, খীলগাঁ, খারচাকা, বক্সী বাজার, রাজপাশা, রাউতপাড়া, পশ্চিম পাড়া, নারিকেলতা, পশাইল, কান্দাপাড়া, রণক, নবিপুর, শ্যামপুর, বিলাসপুর, আমবাড়িয়া, দক্ষিণ সিমলীয়া, পারগাঁ, গাগেরজোড়া, দিয়াপাড়া, হাসেরকান্দী, চণ্ডীপুর, বউলাসার, হাতারভোগ, গোপালপুর, মজগুন্নী, ছয়পাড়া, গোকুলগঞ্জ, গোড়াইল, করণগাঁ, বামগাঁ, মাইজপাড়া, একান্দল, লক্ষ্মীপুরা,

(১) বিক্রমপুরের বহু গ্রামের নাম আংশিকভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, যথা– সোণারটং (সোণারঙ্গ), কাউলীপাড়া (কালীপাড়া), মাঐসার (মহিসার) প্রভৃতি। সমতট প্রথম সঙ্কটে বা সমকটে উচ্চারিত হইত, পরে এখন যাহারা ঐ নাম উচ্চারণ করেন না বা লেখেন, তাহারা গাড়িয়া তুলিয়াছেন, সোমকোট।

সাড়া, দগরী প্রভৃতি আরও বহুগ্রাম এবং আংশিকভাবে নড়িয়া, কোমরপুর, চণ্ডীপুর প্রভৃতি স্থানের ভূমিও নদীগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে।

উপরের লিখিত ভগ্নস্থানগুলির মধ্যে আবার অনেক স্থান পরস্ত (alluvian) হইয়া, চর রাজনগর, চর জপসা প্রভৃতি নামে পরিচিত হইতেছে।

## সরকার বাকলা, চাকলে জাহাঙ্গীর নগর
## ইদিলপুর

বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন পাঠে অবগত হওয়া যায়, ইদিলপুর বিক্রমপুরের একাংশ মাত্র। ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত উহা বিক্রমপুরের রাজা চাঁদ ও কেদার রায়ের অধিকারভুক্ত ছিল। রাজা টোডরমল্লের বন্দোবস্তে উহা সরকার বাকলার অন্তর্গত হয়।

উত্তরে বিক্রমপুর, পূর্ব্বে মেঘনা নদী, শ্রীরামপুর ও সাহাবাজপুর, দক্ষিণে আড়িয়লখাঁ নদী ও আবদুল্লাপুরতপ্পা, পশ্চিমে আড়িয়লখাঁ ও ফুলতলা নদী ও বিক্রমপুরের একাংশ ও রায় নন্দলালপুর। দীর্ঘ প্রায় ৩০ মাইল প্রস্থে ২২ মাইল। প্রথম পরগণার বিস্তৃতি এতদূর ব্যাপ্ত ছিল না। জমিদারগণ বল প্রয়োগ দ্বারা উহা ক্রমে বৃদ্ধি করিয়া লইয়াছিলেন। ১৭৮০ খ্রীঃ অব্দের রেণেলকৃত ম্যাপে এতন্মধ্যবর্ত্তী নয়াভাঙ্গনী নদীর কোন চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয় না। টোড়রমল্লের বন্দোবস্ত সময়ে ইহার রাজস্ব ধার্য্য হয় ২৫৩৪৪০ দাম (৬৩৩৬ টাকা)। পরে ১১৩৫ সনে সুজাখাঁর বন্দোবস্ত সময়ে হয় খালসা বিভাগে ২৮১৬/ টাকা ও জায়গীর বিভাগে হয় ৪৪১৯৯/ টাকা মোট ৪৭০১৫/ টাকা। তৎপর কাশ্মীর আলী খাঁর বন্দোবস্ত মত হয় ১০৬২৭০/ টাকা (জমিদারীর নম্বর ৩ এবং মহলের নম্বর ৮ দেখা যায়)। মালিক স্থানে রামবল্লভের নাম দৃষ্ট হয়।

রামবল্লভ রঘুনন্দনের পৌত্র। চাঁদরায় কেদার রায়ের পরে রঘুনন্দনের হস্তে কিরূপে ইদিলপুর আইসে তাহা মৎ প্রকাশিত বারভূঞা গ্রন্থে এবং এই ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে উল্লেখ করা হইয়াছে। রঘুনন্দন কেদার রায়ের সেনাপতি ছিলেন।

রঘুনন্দনের পুত্র কমলনারায়ণ। রামবল্লভ, কৃষ্ণবল্লভ, রামনারায়ণ, রঘুনাথ, রামনাথ, রামজীবন, হরিবল্লভ ও রামেশ্বর নামে কমলনারায়ণের আটটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

খন্তাখালী গ্রাম উপলক্ষে ইদিলপুরের জমিদারগণের সহিত উত্তর সাহাবাজপুরের জমিদারগণের বিষম দাঙ্গা উপস্থিত হয়। উহাতে বহু নরহত্যা ও শোণিতপাত হওয়ার পর, মীমাংসাক্ষেত্রে উপনীত হইলে, সাহাবাজপুরের জমিদারগণ বলেন, যদি গোমুণ্ড মস্তকে ধারণ করিয়া চৌধুরীগণ সীমা নির্দ্দেশ করিতে স্বীকৃত হন, তবে এই কলহের নিবৃত্তি হয়। রামবল্লভ চৌধুরী উহাতে স্বীকৃত হইয়া, গোমুণ্ড গ্রহণ করতঃ গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া আইসেন। সাহাবাজপুরের বৈদ্য চৌধুরীগণ তৎক্ষণাৎ ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। এতৎ সম্বন্ধে একটি কবিতা চলিয়া আসিয়াছে যথা–

"রামবল্লভ 'উইঠা' বলেন কৃষ্ণবল্লভ ভাই।
গোমুণ্ড মাথায় লইলে খন্তাখালী পাই॥"

চৌধুরীগণের শাসন সময়ে ইদিলপুরের যথেষ্ট উন্নতি সংসাধিত হয়। কায়স্থ সমাজের বহু কুলীন ঘটক এই স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। বৈদ্যগণের সাতাইশ সমাজের মধ্যে ইদিলপুরের নাম শ্রুত হওয়া যায় কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তথায় একঘরও বৈদ্য দৃষ্ট হয় না। কেহ কেহ ইদিলপুরের কায়স্থ সমাজকে ফতেয়াবাদ সমাজের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাহা একেবারেই অযৌক্তিক কথা। ইহারা কুলকার্য্যকরণনিবন্ধন গোষ্ঠীপতিপদ লাভ করিয়াছেন। দুইটি প্রসিদ্ধ বংশ ইদিলপুর হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছে।(১)

এই চৌধুরীগণ অসীম প্রতাপশালী ছিলেন। ভাট কবিতায় "ইদিলপুরের জমিদার, দোহাই মানে বাঘে যার" ইত্যাদি শ্রুত হওয়া যায়। কিন্তু ইঁহাদের সম্বন্ধে ডাকাইতের দলপতি বলিয়া চির কিংবদন্তি চলিয়া আসিয়াছে। নড়িয়ার ঘটক চৌধুরীগণের গৃহবিবাদ উপলক্ষে ইঁহারা একপক্ষ অবলম্বন করিয়া অপর পক্ষের গৃহ লুণ্ঠন করেন, এই জন্য রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত হয়। বিচারে দোসী প্রতিপন্ন হওয়ায়, দলপতিকে তোপে উড়াইয়া দেওয়ার এবং তাঁহার সঙ্গিগণকে কারারুদ্ধ করার আদেশ হয়। চৌধুরীগণ অনন্যোপায় হইয়া তৎকালীন দেওয়ান রাজা বাজবল্লভকে হস্তগত করিয়া মুক্তিলাভ করেন।

ইঁহাদের ডাকাইতি সম্বন্ধে বহু গল্প শুনা যায়। একদা কোন স্থানে ডাকায়িতি করিতে যাইয়া, জমিদার মাধবকৃষ্ণ রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধৃত হন। তৎকালীন গৌরনদী থানার দারগা তাহাকে বন্দী অবস্থায় লইয়া, চৌধুরীগণের খানাতল্লাস উপলক্ষে বুড়ীর হাট থানার উপস্থিত হন। মাধব এই কথা অবগত হইয়া বুড়ীর হাট আগমন করেন। আসিয়াই শুনিতে পাইলেন উভয় দারগা ভ্রাতাকে বড়ই তজ্জন গর্জ্জন করিতেছেন। তাঁহার আর সহ্য হইল না। তিনি স্বক্রোধে বলিলেন, "আহা গৌরনদীর থানার দারগার চেতন (ক্রোধ) দেখিয়া আমার বুড়ীর হাটের দারোগাও "চেতলেন।" বলা বাহুল্য বুড়ীর হাট চৌধুরীগণের অধিকার ভুক্ত ছিল। তদবধি এতদ্দেশে সামান্য জনের ক্রোধ প্রকাশে লোকে ঐ কথাটি উল্লেখ করিয়া থাকে। মাধবের সিংহগর্জ্জন ও আরক্ত লোচন দেখিয়া দারগাদ্বয়ের প্রাণ উড়িয়া গেল। বাধা প্রদান করিতে আর সাহস হইল না। মাধব ভ্রাতাকে লইয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কোম্পানীর প্রথম সময়ে জমিদারগণের এতদূরই প্রতাপ ছিল।

রামবল্লভ রায় প্রচুর আহার কবিতে পারিতেন। এতদ্দেশে অদ্যাপি মৎস্য ধরিবার সময়ে, জলে যখন বড়শী ফেলা হয় তখন 'থত্তুরী' জল্লায়, রামবল্লভরায় এই নাম উচ্চারণ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করে।

কুক্ষণে মীরকাসেমের বন্দোবস্তে এই পরগণার রাজস্ব অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। নবাবী আমলে রাজস্ব আদায়ের কঠোরতা থাকিলেও সহজে সম্পত্তি ভূম্যধিকারিগণের হস্তচ্যুত হইত না। কোম্পানীর অধিকারকালে উহা আদায়ের বিশেষ বন্দোবস্ত হয়।

---

(১) উহার মধ্যে এক বংশের আদি পুরুষ বেদচরণ সেন, মুর্শিদাবাদবাসী হন। সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ডাক্তার রামদাস সেন এই বংশোদ্ভব। অপর বংশ উত্তর বিক্রমপুরের অন্তর্গত শ্রীনগরের বাবুদের পূর্ব্বপুরুষ লালা কীর্ত্তিনারায়ণ প্রভৃতি ইদিলপুবের অন্তর্গত দিকশুলগ্রামবাসী ছিলেন।

এইকালে পরগণার মালিক দাঁড়ান প্রায় ছত্রিশজন।* কাহারও সহিত কাহারও বনিবনা ছিল না। ভাদুড়ী উপাধিধারী জনৈক ব্রাহ্মণের প্রতি সমুদয়ের ভার অর্পিত ছিল। তিনি প্রধান প্রধান কয়েকজন জমিদারের সন্তোষ সাধন করিয়া অন্যান্যকে ইচ্ছামত যখন যৎকিঞ্চিৎ উপস্বত্ব প্রদান করিতেন মাত্র। সদর রাজস্ব প্রায়ই সম্পূর্ণ আদায় হইত না।

জমির পরিমাণ ধরিয়া কর ধার্য্য হইত বটে কিন্তু এই জমিদারীর অধিক স্থানই জঙ্গলে আবৃত ছিল। তথায় ব্যাঘ্র, মহিষ, শূকর প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর আবাস ছিল মাত্র। 'মনাই' নামে একব্যক্তি উহার কতক আবাদ করিয়াছিল, এই জন্য ঐ ব্যক্তি "মনাই জঙ্গলী" নামে প্রসিদ্ধ হয়। পরে ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক ঐ ব্যক্তি হত হওয়ায় আর সাহস করিয়া কেহই জঙ্গল আবাদ করিতে স্বীকৃত হইত না। তদবধি একটা কথা চলিয়া আসিয়াছে, "মনাই জঙ্গলীরে খেলো বাঘে, আর মানুষ কিসে লাগে"। অদ্যাপিও এতদ্দেশে পুতুল নাচ উপলক্ষে 'মনাই জঙ্গলী'র অভিনয় প্রদর্শিত হইয়া থাকে। তাহাতে মনাইর মৃত্যু হইলে, তাহার স্ত্রীর যে অভিনয় দেখান হয় উহাতে দুঃখের উদ্রেক না হইয়া বরং হাস্য-রসেরই অবতারণা হইয়া থাকে।

এতন্নিবন্ধন অতি অল্প লোকই ইদিলপুরে বাস করিত। জমিদারের আয় অনুসারে সদর খাজনা বর্দ্ধিত হওয়ায়, উহার বহু রাজস্ব অনাদায়নিবন্ধন সরকার পক্ষ হইতে উহা স্বহস্তে লইয়া কলিকাতা নিবাসী মাণিক বসুকে+ ৮১১১৫ টাকা কর ধার্য্যে সাত বৎসরের জন্য ইজারা প্রদান করেন। এই বন্দোবস্ত দ্বারা কোন সুবিধা না হওয়ায়, ১১৯৬ সাল অর্থাৎ ১৭৯০ খ্রীঃ অব্দের ২৯ এপ্রিল গবর্ণমেন্ট পূর্ব্বতন জমিদারগণকে আশি হাজার টাকা কর ধার্য্য, করিয়া এই পরগণা পুনবায় ছাড়িয়া দেন। এক বৎসর যাবৎ বহু চেষ্টা করিয়াও জমিদারগণ যখন সদর রাজস্ব আদায় করিতে অশক্ত হইলেন, তখন তাঁহারা আপনা হইতেই পুনরায় এই পরগণা ছাড়িয়া দিলেন। সেই বৎসর (১৭৯০ খ্রীঃ অঃ) মাত্র ৫৪৭৬৯ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়াছিল। এই বৎসর ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তথাপি কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ জমিদারগণের নিকট হইতে কর আদায় করিতে ক্রটী করেন নাই। পুনরায় তাঁহাদিগের সহিত বন্দোবস্ত গ্রহণের কথা হইলে জমিদারগণ উহাতে আর সম্মত হন না। পুনরায় সাজোয়াল নিযুক্ত হয় ; কিন্তু গবর্নমেন্টের ১৮০০ সনের ৯৬৪৪ নং রেকর্ডে অবগত হওয়া যায় জালালপুরনিবাসী রবিউল্লা নামে এক ব্যক্তি ঐ সাজোয়ালের হত্যা সাধন করিয়াছিল। সম্ভবতঃ চৌধুরীগণের প্ররোচনাতেই এই কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকিবে।

১৮০৪ খ্রীঃ অব্দে পুনরায় জমিদারগণ বন্দোবস্ত করেন। ইতিপূর্ব্বে কয়েকজন সুচতুর স্ব স্ব নামে কতক তালুক জমিদারীর অন্তর্গত করিয়া লন। তন্নিমিত্ত তাঁহারা জমিদারীর প্রতি ততটা মনোযোগী ছিলেন না। ভাদুড়ী ঠাকুরের আধিপত্য এই সময়েও সমভাবে চলিয়াছিল। এবারেও রাজস্ব আদায় হইল না। চৌধুরীগণ নিয়মানুসারে ১৮১২ খ্রীঃ অব্দে রেভিনিউ বোর্ডে ইদিলপুর পরগণা নিলামে উঠিলে ঐ সময়ে কলিকাতাবাসী সুপ্রসিদ্ধ দর্পনারায়ণ ঠাকুরের সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র মোহিনীমোহন ঠাকুরের পক্ষ হইতে

* দশসনার বন্দোবস্ত সময়ে রামবল্লভ, কৃষ্ণবল্লভ ও নরসিংহের নামে জমিদারী বন্দোবস্ত হয়।

\+ ইহার নামে কলিকাতা মাণিক বসুর ঘাট ও ষ্ট্রীট অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে। তৎপ্রতিষ্ঠিত একটী প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ ঐ ষ্ট্রীটে বর্ত্তমান আছে।

৯৮০০০/ টাকা মূল্যে এই পরগণা খরিদ হয়।* এই পরগণার বর্ত্তমান রাজস্ব ৬৫৯২৪।১১ পাই ও খারিজাতালুক ১১৯টির সদর রাজস্ব ৮৬৩।/৯ পাই মোট ৬৬৭৬৭৷৷৮ গবর্ণমেণ্ট পাইয়া থাকেন। জমিদারীর সদর রাজস্ব বাখরগঞ্জের কালেক্টরীতে আদায় হইয়া থাকে।

পূর্ব্ব জমিদারগণের সহিত বহু বৎসর পর্য্যন্ত ঠাকুর বাবুদের দাঙ্গা হাঙ্গামা চলিয়াছিল। তাঁহারা সহজে উহা দখল করিতে পারেন নাই। চৌধুরীগণ এই নিলাম রহিত কবিরার জন্য প্রিভিকাউন্সেলে পর্য্যন্ত আপীল করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

## (মন্তব্য)

প্রবাদ এই যে অতি পূর্ব্বে ইদিলপুর একটী সামান্য চররূপে পরিণত ছিল, পরে ইদিল খাঁ নামে কোন ব্যক্তি উহা আবাদ করিয়া বাসোপযোগী করেন। বর্ত্তমান সময়ে বিক্রমপুর ও ইদিলপুর পরগণার মধ্যে যে ধনুর বিল বিদ্যমান রহিয়াছে আমাদের অনুমান অতি পূর্ব্বকালে উহা এক প্রবল স্রোতস্বতীরূপে উভয় পরগণার মধ্যে প্রবাহিত হইত। কালক্রমে সেই নদী মজিয়া বিলে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে দক্ষিণ বিক্রমপুর ও উত্তর ইদিলপুর একই ভূভাগে পরিণত দৃষ্ট হয়, অথচ প্রবল কীর্ত্তিনাশা নদী উত্তর বিক্রমপুর হইতে দক্ষিণ বিক্রমপুরকে বহু ব্যবধান করিয়া ফেলিয়াছে। ইদিলপুর পরগণাও আবার নয়াভাঙ্গনী নদীকর্ত্তৃক উত্তর দক্ষিণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া উত্তরাংশ ফরিদপুর জেলার ও দক্ষিণাংশ বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, ইদিলপুর বিক্রমপুরের এক অংশ। ইদিলপুরের অন্তর্গত যে সকল গ্রাম এখন বর্ত্তমান, ৯৯৪ শকাব্দে (১০৭২) রাজা শ্যামলবর্ম্মার তাম্রশাসনে ঐ স্থানগুলির "বঙ্গ বিষয় পাঠে বিক্রমপুর ভুক্তান্তে" এই ভাবে উল্লেখ রহিয়াছে। নাগরকুণ্ডী, ধীপুর, লঙ্কাচুয়া, কুলকুণ্ঠি প্রভৃতি স্থানগুলিও ঐ পাঠের অন্তর্গত, অথচ ঐ স্থানসমূহ অধুনা ইদিলপুরের অন্তর্ভুক্ত। বাস্তবিক একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে ইদিলপুর নামের পত্তন হয় নাই এইটি নিশ্চিত কথা। মুসলমান শাসনকালেই উহা ভিন্ন পরগণা বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। ইদিলখাঁর নামের সহিত উহার যে প্রবাদ চলিয়া আসিয়াছে তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলেও ইহা যথার্থ বলিয়া অবধারিত হয়। বাস্তবিক তাম্রশাসন সত্য বা মিথ্যা যাহা হউক, যখন শ্লোকগুলি রচিত হইয়াছিল তখন পর্য্যন্ত ইদিলপুর নামের উৎপত্তি হইয়াছিল না, ইহা সত্য বলিয়া অনুমান হয়।

## চাকলে জাহাঙ্গীর নগর
## কোটালীপাড়া

কোটাল (কোতোয়াল) শব্দ হইতে কোটালীপাড়া নামের উৎপত্তি হইয়াছে। তাহা হইলে ও যে উহা অসঙ্গত হয় এমন বোধ হয় না। কারণ কোতোয়ালের বন্দোবস্তী

* ভাদুড়ীর ক্ষমতা এত বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, ক্ষুদ্র জমিদার অংশীগণ বলিয়া উঠিলেন এতদিনে ভাদুড়ী ঠাকুরের "ফটফটি" (স্পর্দ্ধা) ভাঙ্গিল। এই সময়ে তাহারা যে এই পরগণার মালিক উহা একরূপ ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

মহলের নাম কোটালীপাড়া হওয়া অসম্ভব নয়। এই কারণে আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি এই নামের উদ্ভব মুসলমান রাজত্বকালেই ঘটিয়াছিল। বৈদিককুলগ্রন্থে লিখিত আছে এই পরগণা রাজা হরিব্রহ্ম ১০০১ শকের (১০৭৯ খ্রীঃ অব্দের) কিছু পরে যশোধর শর্ম্মাকে দান করেন। উহা কতটা সম্ভবপর তাহা সুধী পাঠকগণ বিচার করিবেন। টোডরমল্লের বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত যখন এই পরগণা বা মহলের নাম করণ হয় নাই, তখন কোটালীপাড়া যে তৎপরে পরগণার পরিণত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই(১)।

অতি পূর্ব্বকালে বৈদ্যবংশীয় করমজুমদারগণ এই পরগণার মালিক ছিলেন। পরে দেনার দায়ে তাঁহারা স্বনামের পরিবর্ত্তে স্বীয় পুরোহিতের নামে সম্পত্তি বেনামী করেন। জমিদারীর কার্য্য পুরোহিতের নামে চলিতে থাকে। কিছু দিবস পরে পুরোহিত বলিলেন প্রকৃত প্রস্তাবে করগণ পরগণার কেহই নহেন। তিনি অর্থ দ্বারা তাঁহাদের নিকট হইতে উহা ক্রয় করিয়াছেন। তদবধি প্রকৃতরূপে পুরোহিতই জমিদার হন। করবংশীয়গণ অধুনা, আমতলী, ডহুয়াতলী, কাশাতলী প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন।

১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে বরিশালের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট এইচ, সি, সদরলেন্ড সাহেব কোটালীপাড়া পরগণা সম্বন্ধে এক রিপোর্ট ঢাকাবিভাগের কমিশনার সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন, আমরা ইহার সারাংশ এই স্থানে সন্নিবেশিত করিলাম।

"১২২৮ সনের বন্দোবস্তে এই পরগণার কর ৬৯২৬/ টাকা ধার্য্য হয়। তৎপূর্বে এতদপেক্ষা অধিক ছিল। এই বন্দোবস্তে অনেক পরগণার কর বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু কোটালীপাড়ার কর হ্রাস প্রাপ্ত হয়। ইহার কারণ এই যে অন্যান্য স্থানের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির সহিত মূল্যেরও বৃদ্ধি হয়, কিন্তু কোটালীপাড়ার পক্ষে তাহা হয় নাই।

এই পরগণা ৫০২টী ষ্টেট বা মহালে বিভক্ত। ইহার মধ্যে ১৮৪টী মহালের কর এক টাকারও ন্যূন আদায় হইয়া থাকে। দশ টাকা পর্য্যন্ত যে সকল মহালের কর, উহার আদায়ের তারিখ ২৮ জুন। এক পয়সা পর্য্যন্ত করদাতা আছেন। যে স্থানে এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার তথায় যে মোকদ্দমার সংখ্যা অধিক হইবে তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছু কারণ নাই।(২)

এই সকল নানারূপ অসুবিধা নিবন্ধন ১৮১৫ খ্রীঃ অব্দে মে মাসে এই পরগণা একবার সরকারে আটক করা হয়, আবার ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দের জুনমাসে উহা ছাড়িয়া দেওয়া হয় ; কিন্তু মালিকগণের মধ্যে পুনরায় বিবাদ আরম্ভ হওয়ায় পুনর্ব্বার ঐ সরকারপক্ষ মহল গ্রহণ করেন। এতৎসম্বন্ধে মন্তব্য এই যে, এই পরগণার উন্নতি সংঘটন করিতে হইলে, রেভিনিউ (কর) বাকী ফেলিয়া নিলাম করান আবশ্যক। এই অবস্থায় যদি

(১) কোশলার বিবরণে এই কথা, বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইবে। কোটালীপাড়া নামকরণের কারণ উৎপত্তি কি জন্য হইল, তাহার কতকটা আভাস উহা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

(২) সদরলেন্ড সাহেবের রিপোর্টে, মোকদ্দমার আধিক্য বিষয়ের যে কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা মিথ্যা নয়। উহার বহু বৎসর পরে যখন নবীনচন্দ্র সেন ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মাদারীপুরের অফিসার হইয়া গমন করেন, তখন ঢাকার কমিশনার পিকক সাহেব তাহাকে বলেন "মাদারীপুরের অবস্থা বড় শোচনীয়। তিন বৎসর যাবৎ কোটালীপাড়ায় পুলিসের নাকের নীচে হাঙ্গামা ও খুন হইতেছে, কিন্তু একটী আসামীও বিচারে আইসে নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট জেফ্রী বলেন কোটালীপাড়ায় হাঙ্গামার পর হাঙ্গামা ও খুনের পর খুন হইতেছে।"

কোনও উদ্যোগী ধনী ব্যক্তি এই পরগণার জমিদারী লাভ করিতে পারেন, তবে কোটালীপাড়া পরগণার জমি অন্যান্য পরগণা হইতে অধিক উন্নতিলাভ করিতে পারিবে। বর্ত্তমান উর্বরতা ও পতিত জমি উঠতি ইহার প্রধান কারণ। এই স্থানের অধিকাংশ স্থানই বিলপূর্ণ, অতএব বাসের পক্ষে অনুপযোগী।"

সৌভাগ্যের বিষয় এই যে কালেক্টার সাহেবের এই সুযুক্তিপূর্ণ উপদেশ উপরস্থিত রাজকর্ম্মচারিগণ যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। কাজেই একজন ধনীর ধনাগার পূর্ণ মাত্রায় পরিবর্দ্ধিত না হইয়া কতকগুলি মধ্যবিত্তের জীবনোপায়ের সংস্থান হইয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় জমিদারগণ এই পরগণার বাটওয়ারার প্রার্থনা করায় গভর্ণমেণ্ট পক্ষগণ মধ্যে উহা বিভাগ করিয়া দিয়াছেন।

**(মন্তব্য)**

কোটালীপাড়ার অধিকাংশই বৈদিক জমিদারগণের হস্তগত, বিশেষতঃ এই বৈদিক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেক সুবিখ্যাত পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। আজিও বহু প্রবীণ সুধীজনগণ সেই সকল বংশকে অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছেন। অতএব তাঁহাদের বিবরণ প্রদান করা আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন গচাপাড়ার রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ চৌধুরীবংশ এই পরগণার চারি আনি অংশের মালিক আছেন।

বৈদিক কুলপঞ্জিকা পাঠে অবগত হওয়া যায়, শ্যামলবর্ম্মা নামীয় এক রাজা একটী যজ্ঞ নির্ব্বাহার্থে কর্ণাবতীবাসী যশোধর মিশ্রকে বঙ্গদেশে আনয়ন করিয়াছিলেন। তৎসহ আরও চারিটী ব্রাহ্মণ এই দেশে আগমন করে, যথা বেদগর্ভ, গোবিন্দ, জিতমিশ্র ও পদ্মনাভ। ইহারা যথাক্রমে শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ ও সাবর্ণগোত্রীয় ছিলেন। যশোধর ও শুনকগোত্রীয় ছিলেন। তাঁহার শৌনকগোত্রসম্ভূত যশোধর নামে এক বন্ধু ছিলেন। তিনি শুনক যশোধরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রয়াসে বঙ্গে আগমন করিলে এই বন্ধু হইতে তদীয় ব্রহ্মত্রা সামন্তসার গ্রাম প্রাপ্ত হন। শৌনক যশোধর, রাজার দান গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। পরে তাঁহার হস্তে বৈদিককুলপঞ্জিকা লেখার ভার অর্পিত হয়। ইহারা উভয়েই বংশমর্যাদায় সমতুল্য ছিলেন। আমরা ইতি পূর্ব্বে রাজা শ্যামলবর্ম্মার তাম্রশাসনের উল্লেখ করিয়াছি। এই স্থানে তাহার পুনরালোচনা করা নিষ্প্রয়োজন বিধায় ক্ষান্ত থাকিলাম। কিন্তু এই তাম্রশাসন এ পর্য্যন্ত লোক-লোচনের আয়ত্তাধীন হয় নাই। অতএব উহা কতটা সত্য তাহা বিবেচনাসাপেক্ষ।

## সরকার ফতেয়াবাদ চাকলে ভূষণার অন্তর্গত তেলিহাটী

টোডরমল্লের বন্দোবস্ত মহলের মধ্যে সরকার ফতেয়াবাদের অন্তর্গত বলিয়া এই স্থানের নাম উল্লেখ আছে। তৎসময়ে উহার কর ধার্য্য হয় ৩৭৭২ দাম ; তৎপরে সুজাউদ্দীনের বন্দোবস্ত সময়ে উহা চাকলে ভূষণার অন্তর্গত হয়। এই পরগণার পূর্ব্বে মালিক কে ছিল উহার কোন পরিচয় অবগত হওয়া যায় না, তবে তেলি নামের প্রতি

লক্ষ্য করিলে বোধ হয় কোন তেলিবংশীয় বড়লোকের নাম হইতে তেলিহাটী নামের উৎপত্তি হইয়াছে। এই পরগণাটি তিন ভাগে বিভক্ত, খাস তেলিহাটী, আমিরাবাদ তেলিহাটী ও মহব্বতপুর তেলিহাটী। এই সকল স্থানগুলি সীতারাম রায়ের জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। তাঁহার অধঃপতনের পর নবাব মুর্শিদকুলিখাঁর অনুগ্রহে নাটোরের রঘুনন্দন যে সকল জমিদারী প্রাপ্ত হন, তাহার সহিত তেলিহাটী ও তৎকালে তাঁহার হস্তগত হয়। পরে নড়াইলের কালীশঙ্কর সরকার ঐ জমিদাবীর কতকাংশ লাভ করিবার পর, তেলিহাটী, রূপাপাত, কালিয়া, বিনোদপুর প্রভৃতি তরফ তাঁহার হস্তগত হয়। ১৭৯৫ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৭৯৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই সকল পরগণা ও নলদী, সাতৈর, মকিমপুর, নসরৎসাহী, নসীবপুর, মহিমসাহী, বেলগাছী, হাওলী, হাকিমপুর, বিনোদপুর, সাহপুর, পোকতানী, রোকনপুর, রূপাপাত, প্রভৃতি পরগণা ও তরফ, নাটোর রাজবংশের হস্তচ্যুত হইয়া বিভিন্ন নূতন জমিদারের হস্তগত হয়। নাটোরের রাজপক্ষ হইতে কর্ম্মচারী কালীশঙ্করের নামে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ করা হয়, উহার ফলে কালীশঙ্কর কিছু দিনের জন্য কারারুদ্ধ হন। তিনি জীবিত থাকা কাল পর্য্যন্ত জমিদারীর সুশৃঙ্খল বিধান করিয়া যাইতে পারেন নাই। তৎপরে তদীয় পৌত্র সুবিখ্যাত রামরতন রায় (রতন বাবু) সমুদয় জমিদারীর সুবন্দোবস্ত করিয়া যান।

নড়াইলের বাবুদের নাম বঙ্গবিশ্রুত। রতন বাবুকে তৎসময়ে কে না জানিতেন। তাঁহার জমিদারী শাসনকালে তেলিহাটীর বাইশজন তালুকদার একত্র হইয়া উক্ত জমিদারের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হন। প্রথমতঃ লাঠিয়ালের দ্বারা বল পরীক্ষিত হইতে লাগিল। জমিদার কর্ত্তৃক বহু প্রজার বাড়ী লুণ্ঠিত হইল, তালুকদারগণ ও জমিদারপক্ষকে কম নির্য্যাতন করিলেন না। দূরদর্শী রামরতন রায় পরে বুঝিলেন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে, বলের দ্বারা কার্য্য উদ্ধার হইবে না। অতঃপর সেই উপায় অবলম্বিত হইলে, তালুকদারগণ ক্রমে বশে আসতে বাধ্য হইলেন।

যে বাইশজন তালুকদার দলবদ্ধ হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে উজানীর রাজা, নারায়ণপুরের মুসলমান মুন্সী, খান্দারপাড়ের রায় এবং ডাকরীর সমদ্দারগণ প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রথমোক্ত দুই ঘর বড়লোক বটে ; কিন্তু শেষোক্ত দুই জন অতি ক্ষুদ্র তালুকদার ছিলেন। এই জন্য এই দাঙ্গা উপলক্ষ করিয়া যে কবিতা রচিত হয় তাহার দুইটী পদ এইরূপ ছিল।

"রাজা হাতী, মুন্সী ঘোড়া, নারায়ণ কুক্কুর।
বাঁশবনে ফেউ ফেউ করেন সমদ্দার ঠাকুর॥"

অগাধ বিল বক্ষে ধারণ করিয়া তেলিহাটী অতি অল্প গ্রামের সমষ্টিতে নিবদ্ধ ছিল। প্রবাদ রাজা সীতারাম রায় কার্য্য উপলক্ষে নলডাঙ্গার রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলে তদীয় সভাপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ অভিরাম সেন কবীন্দ্র সঙ্গে যান। নলডাঙ্গার রাজা সকলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায়, অভিরামের বাড়ী তেলিহাটী পরিচয় দেওয়া হয়। তখন রাজা বলিয়া উঠিলেন, "বার হাত নৌকার তের হাত কাঠি (লগি), তার নাম তেলিহাটী। সেই তেলিহাটী বিলে আপনি বাস করেন?" অভিরাম তখনই বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ যথার্থ বলিয়াছেন। উহারই একখানা গ্রামের নাম

'ভাবড়াগুর'।" শুনিয়া রাজা অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন, কারণ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা ভাবড়াশুর গ্রামের শ্রোত্রিয় বলিয়া পরিচিত। ভাবড়াশুর হইতে পরে তাঁহার নলডাঙ্গায় উঠিয়া যান। নলডাঙ্গার রাজা সন্ধির প্রার্থী হইলে, সীতারাম ব্রাহ্মণ জমিদারের সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করেন নাই।

## সরকার ফতেয়াবাদ তাণ্ডা, মামুদাবাদ, চাকলে ভূষণা হাবেলী, মকিমপুর, নসিবসাহী, সাতৈর, নলদী, পুখরিয়া

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে রাজা সীতারাম রায়ের বিস্তৃত জমিদারী নাটোরের রামজীবন রায়ের হস্তগত হয়। ভূষণার ইব্রাহিমপুর রাম-জীবনের হস্তগত হইবার পরে, জালালপুরের জমিদার এনায়েতুল্লা রাজস্ব প্রদানে অকৃতকার্য্য হওয়ায়, তদীয় ফতেয়াবাদ রামজীবন ক্রয় করেন। পুখরিয়ার জমিদার ইসকিন্দার নরহত্যা অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ায় ঐ জমিদারী বাজেয়াপ্ত হইয়া রামজীবনের হস্তগত হয়। এইরূপে তাঁহার জমিদারী পশ্চিমে সাহজালাল এবং ভূষণা হইতে পূর্ব্বদিকে নলদী ও মকিমপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে নলডাঙ্গার রাজা রঘুদেব রাজস্ব আদায় না করায় নবাব সুজাখাঁর অনুমতি মতে ঐ জমিদারী রামকান্তের হস্তগত হয়। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে স্বরূপপুর ও পাতলাদহ তাঁহার অধিকারে আইসে। এইরূপে চাকলা-ভূষণার অন্তর্গত ২১টী পরগণা নাটোরের রাজার জমিদারীর অন্তর্গত হইয়া পড়ে।

রামজীবন ও রামকান্তের দ্বারা নাটোরের পূর্ণ উন্নতি। রাণী ভবানী ও তৎপুত্র রামকৃষ্ণের সময়ে উহার অবনতির সূত্রপাত হয়। এই অবনতির কারণ লক্ষ্য করিয়া জনৈক প্রধান ব্যক্তি নাটোররাজের প্রাচীন ও বহুদর্শী কর্ম্মাধ্যক্ষ পরাণ নামক কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন. আপনাদের মত বিজ্ঞ কর্ম্মচারী থাকা সত্ত্বেও এত বড় সংসারের এইরূপ পতন হইতেছে কেন? তদুত্তরে বিচক্ষণ পরাণ একটী কথা তাঁহাকে শুনাইয়া উহার পরিষ্কার উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। উহার শেষ দুই পদ এই ছিল, "ছেলে রাজা, ভাই দেওয়ান, কি করবে তার একলা পরাণ।" আমরা অন্য কয়েক পদ এই স্থানে উল্লেখ করা সঙ্গত মনে কবিলাম না। অথবা লিখিত দুই চরণের ভাষ্য টীকাও করিতে চাহি না। প্রয়োজন হইলে পরে করিব।

এই সময়ে নাটোরের বহু কর্ম্মচারীর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। উহার মধ্যে দীঘাপাতিয়ার দয়ারামের পরেই নড়াইলের কালীশঙ্কর সরকারের নাম উল্লেখযোগ্য। উক্ত সরকার রাজা রামকৃষ্ণের প্রিয় কর্ম্মচারী ছিলেন। সুগায়ক বলিয়া রাজা তাঁহাকে সমধিক ভালবাসিতেন। রামকৃষ্ণ স্বরচিত গানগুলি কালীশঙ্করের দ্বারা গীত হইলে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। প্রবাদ ঋণাবদ্ধ রাজা এই সময়ে অতি অল্প মূল্য গ্রহণ করিয়া কালীশঙ্করের নিকট করইহাতী পরগণা বিক্রয় করেন। ভূষণার উন্নতি সাধন হইলে ঐ চাকলাও তাঁহাকে ইজারা দেওয়া হয়। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইজারা আরম্ভ হয়। এই বৎসর মহালের প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা বাবদে তিন লক্ষ চব্বিশ হাজার টাকার স্থানে তিন লক্ষ আটচল্লিশ হাজার টাকার দাবি করেন। প্রজারা তাহাতে স্বীকৃত না হওয়ায় তাহাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়,

তজ্জন্য তাঁহার নামে রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত হওয়ায় কালীশঙ্কর চারি মাসের জন্য কারারুদ্ধ হন। ইজারা উঠাইয়া রামকৃষ্ণ ঐ চাকলা স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র বিশ্বনাথের হস্তে সমর্পণ করেন। তৎকালে বিশ্বনাথ নাবালক থাকায় উহা কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন হয়। জমিদারীর নানারূপ বিশৃঙ্খলা দেখিয়া গবর্ণমেন্ট, মিঃ ইয়ারলেষ্টকে কমিসনার নিযুক্ত করেন।

এই বন্দোবস্তে জমিদারী রক্ষার উপায় কিছুই হইল না, বরং জমিদারীর রাজস্ব সমধিক পরিমাণে বৰ্দ্ধিত হইল। বিশ্বনাথ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে জমিদারী তৎকরে পুনঃ ন্যস্ত হয়। এই সময়ে সরকারী রাজস্ব বহু পরিমাণে বাকী পড়িয়াছিল। আইনের বিধানমতে কোর্ট অব ওয়ার্ডের হাতে থাকা সময়ে জমিদারী নিলামে বিক্রয় হয় নাই। এখন সমুদয় বাকী পড়া রাজস্বের জন্য বিশ্বনাথকে চাপিয়া ধরা হইল। তিনি কর আদায় করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন আংশিক ভাবে জমিদারী নিলাম হইতে লাগিল।

১৭৯৯ খ্রীঃ অব্দে যশোহরের কালেক্টর কর্তৃক নাটোরের রাজার নিম্নলিখিত পরগণাগুলি নিলামে বিক্রয় হয়।

| পরগণা | রাজস্ব | বিক্রয়ের তারিখ | ক্রেতার নাম |
|---|---|---|---|
| হাবেলী | ৩৬৬১৩ | ১৫।২।১৭৯৯ | রামনাথ রায় |
| মকিমপুর | ১৫৩৪৭ | ২৫।২।১৭৯৯ | ঐ |
| নসীবসাহী | ১৬৯৩৭ | ২৫।২।১৭৯৯ | ভৈরবনাথ রায় |
| সাতৈর | ৩৯৯৬৮ | ২২।২।১৭৯৯ | শিবপ্রসাদ রায় |
| নলদী | ৩৬৭৬০ | ২৩।৩।১৭৯৯ | ভৈরবনাথ রায় |

এই সময়ে জমা কি হারে বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল নিম্নলিখিত পরগণা দুইটীর হিসাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া যাইবে। ইসফপুরের ২৫২৩৭ টাকার জমা বৰ্দ্ধিত হইয়া ৩০২৩৭ টাকা এবং সৈদপুরের ৮৮৫৩৮ টাকার উপর দুই শত টাকা বৃদ্ধি করিয়া ৮৮৭৩৮= টাকা করা হয়।

মকিমপুর পরগণা, ঢাকা ও ফরিদপুর উভয় জেলাতে দেখা যায়। এই পরগণার অন্তর্গত ৩৭৬ নং তালুক নরসিংহ মজুমদার ঢাকা জেলার অন্তর্গত। এই পরগণা নাটোরের রাজার হস্ত হইতে কি প্রকারে রামনাথ রায়ের হস্তগত হয় তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে রাণী রাসমণির বংশধর মকিমপুরের, কান্দীর (পাইকপাড়ার) রাজবংশধর নলদী ও মহিমসাহীর, কৃষ্ণকিশোর ঘোষ (ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্টের উকিল) মহবেতপুরের, মহারাজ প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর হাবেলী পরগণার এবং পার্শ্বডাঙ্গার চৌধুরীগণ সাতৈর ও নসীবসাহীর কতকাংশের মালিক আছেন ।

**তপ্পে হায়দরাবাদ**

ইহা ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার কতক বিচ্ছিন্ন স্থান লইয়া সংঘটিত। জমিদারের দেয় কর ১২৩৭/ টাকা। তালুকদার ২০০ শত। দেয় কর ১৯৮৭ টাকা। (W, Daflas) ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টারের রিপোর্ট ১৭৯০।২৬ মে।

## চাকলে জাহাঙ্গীরনগর

### জালালপুর

এই পরগণার বিস্তৃত বিবরণ এই ইতিহাসের ১ম খণ্ডে বিবৃত করা হইয়াছে। সামান্য একটি কথা মাত্র এই স্থানে সন্নিবেশিত করা হইল। ১৮০৪ খ্রীঃ অব্দের ঢাকার কালেক্টর সাহেবের রিপোর্টে অবগত হওয়া যায়, জালালপুর পরগণার অন্তর্গত প্রায় দুই হাজার খারিজা তালুক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার মধ্যে একশত টাকা জমার ন্যূন করদায়ী মহালও বর্ত্তমান রহিয়াছে। ১৭৮৭ খ্রীঃ অব্দে এই পরগণায় জলপ্লাবন হইয়া অত্যন্ত ক্ষতির কারণ হয়। অধুনা ফরিদপুর, ঢাকা ও বরিশাল এই তিন জেলাতেই এই পরগণার অন্তর্গত খারিজা তালুকসমূহের কর আদায় হইয়া থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে ফরিদপুর জেলাতেই অধিকাংশ ভূমি থাকায়, করও তথায় অধিক পরিমাণে আদায় হয়। পূর্ব্বতন জমিদার নুরউল্লা ও রুহিউল্লার হস্তচ্যুত হওয়ার পরেই উহা বহু তালুকদার মহালে বিভক্ত হয়। পরগণার শেষ জমিদার এনায়েতুল্লা রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হওয়ায়, রামজীবন উহা ক্রয় করেন। পরগণার জমিদারের দেয় কর ১১০০০। তালুকদার ২১৪৮ জন। কর ৭৮০০১। মোট রাজস্ব ৮৭০০১। টাকা।

W. Daflas রিপোর্ট, ২৬ মে, ১৭৯০।

### পাট পাসার

১১৫ নং জমিদারী পাট পাসার পূর্ব্বে নাটোর রাজবংশের হস্তগত ছিল। রাজা রামকৃষ্ণের সময়ে নিলামে বিক্রয় হওয়ায় নদীয়া জেলার অন্তর্গত উলাবীর নগর নিবাসী মহাদেব মুখোপাধ্যায়, বাকী রাজস্বের দায়ে উহা ক্রয় করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে উহার কতকাংশ উক্ত মুখোপাধ্যায়ের বংশধরগণ, এবং কতক অংশ অন্যান ভূস্বামীগণ ভোগ করিতেছেন। পদ্মার উভয় তীরে ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার মধ্যে এই পরগণার জমি দৃষ্ট হয়। অধিকাংশ ভাগ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত।

## চাকলে ভূষণার অন্তর্গত

### মহব্বতপুর

ঢাকা নিবাসী "শেখ সাহেব" নামে পরিচিত একজন সুপ্রতিষ্ঠ লোক নবাব সরকার হইতে এই পরগণা প্রাপ্ত হন। এই পরগণা ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, ঢাকা এবং ফরিদপুর প্রভৃতির মধ্যেগত কতকগুলি জমিদারীর অংশ লইয়া সংগঠিত। তেলিহাটী পরগণার একাংশও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সেখ সাহেবের উত্তরাধিকারিগণ তাঁহাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ মধ্যে– যাঁহারা প্রধান ছিলেন তাহাদিগকে নগদ মাহিয়ানা প্রদান না করিয়া কতক ভূমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন, তাহার আয় হইতে তাঁহারা মাসহরা প্রাপ্ত হইতেন। যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় তৎকালে এই সকল কর্ম্মচারীরা অযোগ্য প্রভূবংশের হাত হইতে উহা বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া স্ব স্ব নামে পৃথক বন্দোবস্ত করিয়া লন। তদবধি তাঁহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের নিকটই রাজস্ব প্রদান করিয়া আসিতেছেন। এই সকল

* এই স্থানগুলি ত্রিপুরা ও নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত।

কর্ম্মচারিগণের মধ্যে বারদিয়ার মজুমদার, মহব্বতপুরের মজুমদার, বোয়ালিয়ার চৌধুরী, করদির কর চৌধুরী, আঠার বর্দ্ধন মজুমদার, খেরুদিয়ার চৌধুরী, কাঞ্চনপুরের গুপ্তগণ ও গোবিন্দপুরের বলগণ প্রসিদ্ধ। ফরিদপুরের অন্তর্গত আঁধারমাণিকের চৌধুরীও এইরূপে সেখ সাহেবের কার্য্য দ্বারা উন্নতি লাভ করেন ও ভূস্বামী হন। বাটিকামারী, মহারাজপুর প্রভৃতি স্থান এই পরগণার অন্তর্গত। এই স্থানগুলিও রাণী ভবানীর জমিদারীর অন্তর্গত ছিল, পরে কোড়কদির মধুসূদন সান্যাল উহা ক্রয় করেন। উহা এখন তদীয় বংশধরগণের হস্তভ্রষ্ট হইয়া কলিকাতা ভবানীপুরস্থ হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব উকীল কৃষ্ণকিশোর ঘোষের হস্তগত হইয়াছে। ঘোষ মহাশয় উহা ক্রয় করিয়া লন। মহব্বতপুর পরগণা যে টোডরমল্লের বন্দোবস্ত সময়ে ছিল না তাহা সরকার বিভাগের প্রতি লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়।

## খড়রিয়া

এই পরগণা সুলতানপুর খড়রিয়া নামে খ্যাত সরকার তাণ্ডার অন্তর্গত একটি মহালের নাম আছে সুলতানপুর। নবাবী আমলের বন্দোবস্তে উহা সুলতানপুর খড়রিয়া নামে পরিচিত হয়। পূর্ব্বে এই স্থানের অধিকাংশ জল-পরিপূর্ণ বিলে পরিণত ছিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রাজত্বকালে এই পরগণা বৈদ্যবংশীয় জানকীবল্লভ বিশ্বাস পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত হন। বিশ্বাস মহাশয় জানকীবল্লভ ঘোষকে অমাত্য পদে বরণ করিয়া তৎসহ মূলঘর গ্রামে বাস করেন। কায়স্থ ভঞ্জ চৌধুরীগণ এই পরগণার চারি আনা অংশের মালিক ছিলেন। শুনা যায় আবাদ কার্য্যের সহায়তা করার, বিশ্বাস তাঁহাকে এই অংশ প্রদান করেন।

প্রতাপাদিত্যের সহিত মানসিংহের যুদ্ধ সময়ে, জানকীবল্লভও প্রতাপের অধীনে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরে প্রতাপের পতন হইলে, তিনি স্বস্থানে প্রস্থান করেন। সেই সময়ে রাজার লক্ষ্মীনারায়ণ ও রাজরাজেশ্বর চক্র তাঁহার হস্তগত হয়। রাজা হরিনাথ রায় বিশ্বাস বংশের প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাম রায় ও লক্ষ্মণ রায়কে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিতে যাইয়া নিজেই জমিদারী হারান। রাম ও লক্ষণ রায়ের সন্তানগণ এই পরগণার দশ আনা অংশের এবং তদীয় পিতৃব্য কর্ণপুর রায়ের সন্তানগণ ছয় আনার মালিক হন। নিয়ম মত কর আদায় না হওয়ায় এই পরগণা গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে কলিকাতা হাটখোলার দত্ত চৌধুরীগণের পূর্ব্বপুরুষ কাশীনাথ দত্তকে ইজারা প্রদান করেন। পরে রেবিনিউবোর্ডকর্ত্তৃক নিলাম হইলে উক্ত কাশীনাথ দত্ত উহা ক্রয় করেন। বর্ত্তমান সময়ে এক অংশ মাত্র তাঁহার বংশধরগণের আছে, অপর দুই অংশ অপরের হস্তগত হইয়াছে। এই পরগণার অধিকাংশ স্থান ও প্রায় সমুদয় ভদ্রপল্লী খুলনা জেলার অন্তর্গত। যৎকিঞ্চিৎ স্থান মাত্র ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ জেলার মধ্যে বিদ্যমান আছে।

## বৈকুণ্ঠপুর

রাইসবর নিবাসী কীর্ত্তিনারায়ণ বসু নবাব সরকারে কার্য্য করিয়া "লালা" এই গৌরবাত্মক উপাধি লাভ ও বহু ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করেন। এই সময়ে স্বীয় বাসস্থান

রাইসবরের নামকরণ করা হয় শ্রীনগর। বর্ত্তমান ঢাকা জেলার অন্তর্গত শ্রীনগরের বাবুগণ, তাঁহার ও তদীয় ভ্রাতাদের বংশধর। বিভিন্ন স্থানে যে সকল সম্পত্তি তাঁহার হস্ত গত হয় উহা সমুদয় একত্র করিয়া বৈকুণ্ঠপুর নামে এক পরগণা নবাবী সেরেস্তার অন্তর্গত করিয়া লন। বর্ত্তমান সময়ের ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় এই পরগণার জমি আছে। ফরিদপুরের অন্তর্গত শিবচর থানার অনেক স্থান বৈকুণ্ঠপুর পরগণার অন্তর্গত। উহার কতকাংশ শ্রীনগরের বাবুদের হস্তভ্রষ্ট হইয়াছে, অবশিষ্ট তাঁহারা আজিও ভোগ করিতেছেন।

## দুর্গাপুর

বৈকুণ্ঠপুরের ন্যায় ঐ তিন জেলার কতক ভূমির সমষ্টি লইয়া এই পরগণার উদ্ভব হইয়াছে। মাণিক বসু নামে গবর্ণমেণ্ট পক্ষের একমাত্র ইজারাদার ছিলেন। এক সময়ে তিনি ইদিলপুরের ইজারাদারি কার্য্য করিতেন। তাঁহার নিবাস ছিল কলিকাতা। বসু মহাশয় বিভিন্ন জেলার সমুদয় সম্পত্তি দুর্গাপুর পরগণা নামকরণে বন্দোবস্ত করিয়া লন। মাদারীপুর ও শিবচর থানায় এই পরগণার জমি আছে। বর্ত্তমান সময়ে এই পরগণা বসুবংশের হস্তভ্রষ্ট হইয়া ঢাকা জেলার বালীয়াটীর সাহা বাবুগণের হস্তগত হইয়াছে।

## চাকলে জাহাঙ্গীর নগর
## রাজনগর

বৃহৎ পরগণাগুলির আদায় কার্য্যে সুবিধার জন্য উহাকে তরফ বা তপ্পায় বিভক্ত করিয়া এক একজন তহশীলদার নিযুক্ত করা হইত। তাহারা পরগণার কাননগোর অধীনে থাকিয়া স্ব স্ব কায্য নির্ব্বাহ করিতেন। বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত হয়দরাবাদ, পায়ন্দাবেগ, বিল দায়ুনীয়া, সাহাবন্দর, গ্রদবন্দর, রামকৃষ্ণপুর প্রভৃতি কএকটি তপ্পা ছিল। রাজবল্লভের উন্নতি সময়ে এই সকল তপ্পার বিশেষতঃ বিল দায়ুনীয়ার সমগ্র ভাগ ও হাবেলী পরগণা হইতে কতক ভূখণ্ড লইয়া, রাজনগর নামে একটি পরগণার নামকরণ করা হয়।

১১৩৫ সনে (১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে) সুজাউদ্দীন যখন বঙ্গদেশের নবাবী কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সমুদয় জমিদারীর গোসাহেরা প্রস্তুত করেন তখন এই রাজনগর পরগণার প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পঞ্চম রিপোর্টে দেখা যায়, ঢাকা নেয়াবতীর জমিদারীর তৌজিভুক্ত "২ নং পরগণা রাজনগর মহালের নম্বর ৩৮, জমিদারীর নম্বর ১৭, মালিক লক্ষ্মীনারয়ণ।" সুজাউদ্দীনের বন্দোবস্ত মতে এই পরগণার কর ধার্য্য হয় ৮৫২৯৮ টাকা ; পরে কাসেম আলী খাঁর সময়ে পুনরায় যে বন্দোবস্ত করা হয়, তৎকালে উহার সদর খাজানা বর্দ্ধিত হইয়া হয় ৮৮৩৮৯ টাকা।* রাজবল্লভ স্বীয় নামে কোন জমিদারী করিয়াছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায় না। গৃহদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ ও বাসুদেব বিগ্রহ প্রভৃতির নামে মালিক লেখাইয়া ভূসম্পত্তি করিয়াছিলেন ইহাই পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

---
* পঞ্চম রিপোর্ট ৩৬।২।৩৬৯ পৃষ্ঠা।

কোম্পানীর প্রথম আমলে নবাবী সেরেস্তার কাগজপত্র দৃষ্টেই কর আদায় হইত। পরে রাজবংশীয়দের মধ্যে কলহ আরম্ভ হইলে রাজবল্লভের তৃতীয় পুত্র রাজা গঙ্গাদাসের পুত্র কালীশঙ্কর, অন্যান্য সরিকগণের যোগে স্বীয় পিতৃব্য রায় গোপালকৃষ্ণের বিরুদ্ধে এক মোকদ্দমা উত্থাপন করিয়া জমিদারী বন্টনের প্রার্থনায় গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদন উপস্থিত করেন। তদনুসারে গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে টমসন সাহেব নিযুক্ত হইয়া সমুদয় পরগণা জরিপ করিয়া, উহা পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া দেন। তৎসহ জমিদারীর সদর রাজস্বও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ১১২৬৭৩ টাকা দাঁড়ায়। এইরূপে রাজবল্লভের অন্যান্য জমিদারীরও কর বৃদ্ধি হয়। রাজবংশধরগণ এই রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হওয়ায়, ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের সমুদয় জমিদারী নিলামে বিক্রয় হইয়া যায়। জমিদারীর অন্তর্গত কিছু তালুক মাত্র অবশিষ্ট থাকে। অধিকাংশ মহাল গবর্ণমেন্ট খরিদ করিয়া লন।

ডে সাহেবের রিপোর্টে অবগত হওয়া যায়, দুর্ভিক্ষ ও জলপ্লাবন নিবন্ধন এই পরগণার বিস্তর ক্ষতি হয়। তজ্জন্য কর আদায় সম্বন্ধে কিছু দয়া করার জন্য গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করা হয়, কিন্তু কার্য্যে উহাতে কোন সুফল ফলে না। রাজবল্লভের চতুর্থ পুত্র রায় গোপালকৃষ্ণের পুত্র পীতাম্বর বর্দ্ধিত করের কথা উল্লেখ করিয়া যাহাতে উহার ন্যূনতা সম্পাদন হয়, তজ্জন্য তৎকালীন গবর্ণর জেনেরেল লর্ড কর্ণওয়ালিসের নিকট এক আবেদনপত্র প্রেরণ করেন (১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দ)। তাহাতে বলেন "আমরা মহারাজ রাজবল্লভের বংশধর। তিনি কোম্পানীর সাহায্য করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্র কৃষ্ণদাস বাহাদুরকে কাসেম আলী খাঁ বধ করিয়া আকা রেজা দ্বারা বাড়ী, জমিদারী ও সম্পত্তি লুণ্ঠন করেন। টমসন সাহেবের প্রতি আমাদের সম্পত্তি-বন্টনের ভার অর্পিত হয়, কিন্তু তিনি আমাদের সম্পত্তির সদর রাজস্ব অকারণ বর্দ্ধিত করিয়াছেন। আমরা এই জন্য গবর্ণমেন্টের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলাম। তদনুসারে সার ইলাইজা ইম্পের প্রতি তদন্তের ভার অর্পিত হয়। তিনি আমাদের নিকট হইতে এক লক্ষ টাকা রসুন গ্রহণ করেন ; কিন্তু কোন প্রকার অভিমত প্রদান না করিয়া বিলাত্ চলিয়া গিয়াছেন।" (বিভারেজ কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাস।) বলা বাহুল্য এই স্থানেই এই পর্ব্বের যবনিকার পতন হয়।

## সরকার সোণার গাঁ চাকলে জাহাঙ্গীর নগর কার্ত্তিকপুর

টোডরমল্লের বন্দোবস্তে এই মহালের নাম উল্লেখ আছে। তৎকালে উহার রাজস্ব ছিল ৮০০০০ দাম বা ২০০০ টাকা। পরে সুজা উদ্দীন ও কাসেম আলীখাঁর বন্দোবস্ত সময়ে উহার রাজস্ব অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মালিকের স্থানে কাহারও নাম দেখা যায় না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই পরগণাও বিক্রমপুরের একাংশ মাত্র। এই পরগণার মালিকী স্বত্ব অনেক পরে রাজবল্লভের হস্তগত হয়। তৎপরবর্ত্তী বংশধরগণের সময়ে ডে সাহেব এই পরগণা সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রদান করেন নিম্নে তাহার সন্নিবেশ করা হইল। রাজবল্লভের বংশধরগণের হস্তভ্রষ্ট হইয়া এই পরগণা অধুনা ভাগ্যকুলের কুণ্ড, হাসারার সেন ও মাইজপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির হস্তগত হইয়াছে। বিস্তারিত গ্রাম্য বিবরণসহ প্রকাশ করা যাইবে। অন্যান্য পরগণার বিবরণ গ্রামের বিবরণসহ প্রকাশ

করার ইচ্ছা রহিল।

"এই পরগণা রাজনগর জমীদারীর অন্তর্গত। মিঃ ডে, তাঁহার প্রস্তাবিত বন্দোবস্ত করিবার উপায় মধ্যে এই পরগণার জন্য আরও ৪০০০ টাকা খরচ করিতে গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। প্রজারা গত কয়েক বৎসর যাবৎ জমীদারকে যে খাজানা আদায় করিয়াছে তাহার বেশী যদি আদায় করিতে না হয় তাহা হইলে এবং উক্ত ৪০০০ টাকা খরচ হইলে ঐ সমস্ত জমীর লাভ আরও খুব বেশী হইবে সে সম্বন্ধে তাঁহার কোনও সন্দেহ নাই বলিয়া মন্তব্যও প্রকাশ করিয়াছেন।" (বিভারিজকৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাস, ৪০১ পৃষ্ঠা)।

# তৃতীয় অধ্যায়
# জেলা সংস্থাপনের বিবরণ

১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দে কোম্পানী বাহাদুর স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিলে পর নবাব নাজেম বেতনভোগী হন। তৎসহ ঢাকায় সুবেদারও শূন্য 'নবাব' উপাধি ধারণ করিলে, তাঁহার জন্য মাসহারা নির্দ্দিষ্ট হয়। ১৯৪৫ খ্রীঃ অব্দে* ঢাকার শেষ নবাব গাজীউদ্দীন বাহাদুরের মৃত্যু হইলে পর কেবল মাত্র নবাবের আত্মীয় ও ভৃত্যগণ কিছু কিছু বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন। ১৭৬৯ খ্রীঃঅব্দে শাসনকার্য্য পরিচালন জন্য কোম্পানীর পক্ষ হইতে ঢাকাতে একজন সুপারভাইজার নিযুক্ত হন। ১৭৭২ খ্রীঃঅব্দে এই উপাধির পরিবর্ত্তে 'কালেক্টর' নামকরণ হয়। এই বৎসর রেজা খাঁর পরিবর্ত্তে দেওয়ানী আফিস কোম্পানী কর্ত্তৃক গৃহীত হয় ও দেওয়ানী আদালত নামে একটী কোর্ট সংস্থাপিত হয়। কালেক্টর তাহার অধীনে কার্য্য করিতে থাকেন। ১৭৭৪ খ্রীঃঅব্দে প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিল সংস্থাপিত হয়। তদধীন কর্ম্মচারিদ্বারা কর আদায় ও বিচার কার্য্য সম্পন্ন হইত। আপীল কাউন্সেলে হইত। মেম্বর হইতে কাহাকেও লইয়া গবর্ণর স্বয়ং এই বিচার কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। ১৭৮১ খ্রীঃঅব্দে কাউন্সেল উঠিয়া যায়। সেই বৎসর মিঃ ডে সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর নিযুক্ত হন। ১৭৯০ খ্রীঃঅব্দে কালেক্টরগণ ম্যাজিষ্ট্রেট পদ প্রাপ্ত হন। ১৭৯৩ খ্রীঃঅব্দে ঐ নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যভার একজনের উপরই ন্যস্ত করা হয়। এই বৎসর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আরম্ভ হইয়াছিল। তৎকালে ঢাকাতে দুই জন ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। একজন ঢাকার জন্য, অন্যজন ঢাকা জালালপুরের জন্য। উভয় বিচারকই ঢাকাতে অবস্থান করিতেন। জালালপুর একটি বিস্তৃত পরগণা। এই নামের সহিত ঢাকা সংযোগে ঢাকা জালালপুর নামে আর একটী জেলার নামকরণ করা হয়।

**ফরিদপুর জেলা সংস্থাপন**

এই ঢাকা জালালপুর বিভাগের ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনে পদ্মার পশ্চিম তীরস্থ কতক স্থান ও পূর্ব্বতটের জাফরগঞ্জ ও নবাবগঞ্জ থানার কার্য্য সম্পন্ন হইত। ১৮১১ খ্রীঃঅব্দে একটা পরিবর্ত্তন হয়। এই সময় ঢাকা জালালপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট আফিস ঢাকা হইতে উঠিয়া ফরিদপুরের সংস্থাপিত হয়। চন্দনানদীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী স্থান যশোহর হইতে খারিজ হইয়া এবং গোপীনাথপুরের থানা বাখরগঞ্জের অধীন হইতে, ঢাকা জালালপুরের অন্তর্গত হয়। ১৮৩৩ হইতে ১৮৪৮ খ্রীঃঅব্দের কোন সময়ে ঢাকা জালালপুরের অন্তর্গত হয়। ১৮৩৩ হইতে ১৮৩৮ খ্রীঃঅব্দের কোন সময়ে ঢাকা জালালপুর, ফরিদপুর নামে পরিবর্ত্তিত হয়। পদ্মার পূর্ব্বতীরবর্ত্তী মাণিকগঞ্জ প্রভৃতি স্থান প্রায় ৩৭ বৎসর এই জেলার অন্তর্গত থাকিয়া ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার অধীন হয়। ঢাকার জজ বৎসরে দুইবার আসিয়া

* এই সময় ঢাকার কার্য্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়। উহার নাম হুজুরি ও নেজামৎ। প্রথমটী মুর্শিদাবাদের দেওয়ানের অধীনে ছিল। ঢাকাতে তাঁহার একজন প্রতিনিধি দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হইত। এই ব্যক্তির হস্তে রাজস্ব ও তৎসম্পর্কিত মোকদ্দমার ভার ছিল। নেজামৎ বিভাগে দেওয়ানী ও ফৌজদারী নিষ্পন্ন হইত।

এই স্থানের আপীল ইত্যাদি বিচার কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। ১৮৭৪ সন হইতে এই স্থানে স্থায়ী জজ নিযুক্ত হন।

১৮৭১ খ্রীঃঅব্দের ১৭ সেপ্টেম্বর* হইতে গবর্ণমেন্টের আদেশে কীর্ত্তিনাশার দক্ষিণ তীরবর্ত্তী মুলফৎগঞ্জ থানার অন্তর্গত ৪৫৮ খানি গ্রাম ঢাকা জেলা হইতে খারিজ হইয়া, বাখরগঞ্জের অধীন হয়। মুলফৎগঞ্জ মাদারীপুর সবডিভিসনের মধ্যে ভুক্ত হইয়া যায়। কিন্তু আদালত সংক্রান্ত মোকদ্দমা ঢাকার অধীনেই থাকে। ছোট মোকদ্দমা বহর মুন্সেফিতে(১) ও বড় মোকদ্দমার আপীল ঢাকার জজের নিকট সম্পন্ন হইত। মাদারীপুর সবডিভিসন ১৮৭৩/৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত হয়। তদবধি মুলফৎগঞ্জ বা পালং থানাও ফরিদপুরের অন্তর্গত হইয়াছে। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১ম ভাগের ১৪১৩ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনানুসারে ফরিদপুর ও ঢাকা জেলার সীমা নির্দ্ধারিত হয়। এবং ঐ তারিখে, কলিকাতা গেজেটের প্রথম খণ্ডের ১৪৪১ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনানুসারে সবডিভিসনসমূহের সীমা নির্দ্ধারিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে নদীয়া জেলা হইতে খারিজ হইয়া ৩৩ খানা গ্রাম ফরিদপুর জেলা ভুক্ত হইয়াছে। এখন জেলার সীমা এইরূপ দাড়াইয়াছে :-

উত্তর ও ঈষৎ পূর্ব্বদিকে পদ্মা, পূর্ব্বদিকে মেঘনা ; দক্ষিণ ভাগে গৌরনদী থানা ও নয়াভাঙ্গনী নদী। পশ্চিমে মধুমতী ও বারাশীয়া নদী ও কুষ্টিয়া সব ডিভিসন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নম্বর ৫৬২৮। পরিমাণফল ১৩৫১৪৩৫ একর। কর==। অস্থায়ী বন্দোবস্তের নম্বর ১৪৬। পরিমাণ ফল ২৯৬১৩ একর। কর ৩৭১৬ টাকা গবর্ণমেন্টের খাস তহশীল ১৭৭ মহাল। পরিমাণ ফল ৪৮৯২২০ একর। রাজস্ব ১৫৬৩৬০= টাকা। মোট রাজস্ব ৬২৭১০৪ টাকা

## সাবডিভিসন থানা, মুন্সেফী ও মিউনিসিপলিটী।

| বিভাগ | থানা | মুন্সেফী | সাবরেজিষ্টার | জনসংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| | ১ ফরিদপুর মিউনিসিপলিটী | ফরিদপুর | ফরিদপুর | ৮৬২১১ |
| সদর | ২ ভূষণা | ও | ভাঙ্গা | ১৮৭৮৮৯ |
| | ৩ নাগরকান্দা* | ভাঙ্গা | নাগরকান্দা | ১০২৯৪৮ |
| | ৪ ভাঙ্গা | | ভূষণা | ১০১৮২ |
| | ৫ মাদারীপুর মিউনিসিপালিটী | মাদারীপুর | মাদারীপুর | ১৭৯৭৭৬ |
| | ৬ পালং | চিকন্দী | পালং | |
| | ৭ ডামড্যা আউট পোষ্ট | | ডামড্যা | ২৭৯০৮৪ |
| মাদারীপুর | | | গোসাইর হাট | |
| | ৮ গোসাইর হাট আউট পোষ্ট | | | |
| | ৯ শিবচর | | শিবচর | ১৩১৮৫২ |
| | ১০ রাজবাড়ী মিউনিসিপালিটী | রাজবাড়ি | | ১২৬০৩৮ |

* ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ জুন তারিখের গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপনানুসারে।

(১) ইতিপূর্ব্বে মুলফৎগঞ্জ (পোড়াগাছাতে) একটি মুন্সেফী আফিস স্থাপিত হইয়া পরে বহর পরিবর্ত্তিত হয়।

রাজবাড়ি

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ১১ বালিয়াকান্দী | বালিয়াকান্দী | ৯৭৭৯৯ |
| | ১২ পাংসা | পাংসা | ১২৬৬১৫ |
| গোপালগঞ্জ | ১৩ গোপালগঞ্জ | গোপালগঞ্জ | ৭৯১২৯ |
| | ১৪ কোটালীপাড়া | কোটালীপাড়া | ১৩১৮৫২ |
| | ১৫ মুখসুদপুর | মুখসুদপুর | ১৭৬৪১৮ |
| | ১৬ কাশীয়ানী | কাশীয়ানী | |

জেলা, মহকুমা ও থানা সমূহের সীমা নির্দ্দেশের তারিখ।

ফরিদপুরের ও ঢাকার সীমা নির্ধারণের তারিখ। ১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দে ১৬ ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা গেজেটের ১ ম ভাগ ১৪১৩ পৃষ্ঠার বিধান মত নিদ্দিষ্ট হয়।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখের ৮৫৫ পৃষ্টায় বিধান মতে পরে আবার সীমা নিদ্দিষ্ট হয়।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১ম খণ্ডের ১৪৪১ পৃষ্ঠার বিধান মতে সবডিভিসন বা মহকুমার সীমা নির্দ্দেশ হয়।

বালিয়াকান্দী থানার সীমা : -১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দের ২৩ জানুয়ারী, কলিকাতা গেজেট ১ম খণ্ড ২য় পৃষ্ঠা।

কামারখালী আউট পোষ্ট খোলা হয় ১৮৮৫ খ্রীঃ ২২ জানুয়ারি এই গেজেটের প্রথম খণ্ড ৭২৭ পৃষ্ঠা। কামারখালী আউ পোষ্ট মধুখালী যায় ১৮৯৪ সনের ২ মে এই গেজেট ১ম খণ্ড ৫৫০ পৃষ্ঠা।

সদরপুর কাশীয়ানী, ভেদেরগঞ্জ, গোসাইর হাট, মধুখালী থানার সীমা নির্ধারিত হয় (সংশোধিত রূপে)১৯০৮/ ৩রা মে এই গেজেট ৮১৭ পৃষ্ঠা।

ঢাকা জেলা হইতে কতিপয় গ্রাম খারিজ হইয়া শিবচর থানার অধীন হয় ১৮৯৪ /৭ নবেম্বর কলিকাতা গেজেট ১ম খণ্ড ১২০ পৃষ্ঠা। ফরিদপুর ও ঢাকার সীমা নির্দ্ধারণ ১৮৭৪ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর কলিকাতা গেজেট ১ম ভাগ ১৪১৩ পৃষ্ঠা এই ১৮৩১ সনের ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখের ৮৫৫২ পৃষ্ঠা সবডিভিসনসমূহের সীমা নির্দ্ধারণ ১৮৭৪ সনের ১৬ সেপ্টেম্বর এই গেজেট ১ম খণ্ড ১৪৪১ পৃষ্ঠা।

দেওড়া (ভাঙ্গা) থানার কয়েকটি গ্রাম মাদারীপুরের মধ্যে যায় ১৮৭৫ সনের ২৭ জানুয়ারী এই গেজেট ১ম খণ্ড ১৪৯ পৃষ্ঠা।

* আইনপুরের থানা পরিবর্ত্তিত হইয়া নগরকান্দায় আসিয়াছে। পূর্ব্বে নিম্নলিখিত থানা লইয়া ফরিদপুরে জেলা নির্দ্দেশ ছিল। বেলগাছী ফরিদপুর হইতে ১৬ মাইল পূর্ব্ববর্ত্তী আউট পোষ্ট ধোয়াপাড়া বেলগাছী হইতে ৯ মাইল। বেতকা সহর হইতে ১০ মাইল, তালমা ১০ মাইল, আউট পোষ্ট জগন্নাথদীতালমা হইতে ১০ মাইল। ভূষণা সহর হইতে ২০ মাইল, আউট পোষ্ট মুকুন্দ বা মসনদপুর ভূষণা হইতে ১২ মাইল। সদরপুর সহর হইতে ১৭ মাইল থানা মুকসুদপুর সহর হইতে ২২ মাইল, আউট পোষ্ট কাশিয়ানা মুকসুদপুর হইতে ১২ মাইল, আউট পোষ্ট ভাঙ্গা সহর হইতে ৯ মাইল, থানা গোপীনাথপুর সহর হইতে ২৩ মাইল থানা শিবচর সহর ইহতে ৩৬ মাইল দূরবর্ত্তী ছিল।

গোপালগঞ্জের থানা সদর হইতে মাদারীপুরের অন্তর্গত হয় ১৮৭৫ সনের ১১ আগষ্ট এই গেজেট ১০৩০ পৃষ্ঠা।

শিবচর আউট পোষ্ট মাদারীপুর থানা হইতে পালং থানার অন্তর্গত হয় ১৮৭৫ সনের ২৫ আগষ্ট এই গেজেট ১ম খণ্ড ১০৮১।

পালং থানার সীমা নির্দ্ধারণ হয় ১৮৮১ সনের ৯ই মার্চ এই গেজেটের ১ম খণ্ড ২৯৫ পৃষ্ঠা।

## ষ্টেসন ফরিদপুর

সদর থানার অধীন কতিপয় গ্রামের নাম উল্লেখ করা হইল। দুর্গাপুর, ভাটলেকচর, দরিচাঁদপুর, দুর্গাপুরচর চাঁদপুর, নুসিপুর, ফটিকপুর, কৃষ্ণপুর, ফতেপুর, চরবেলাবাদ, জয়দেবপুর, লক্ষ্মীপুর, পুরাপুর, রঘুনন্দনপুর, কোয়ারপুর, পারচর, শিবপুর, রতনগঞ্জ, গোবিন্দপুর, গোপিচাঁদপুর লক্ষ্মীকুল, বিষ্ণুদিয়া, কাচারদিয়া বড়কান্দীপাড়া, নারায়ণপুর, মাধবপুর, মহম্মদপুর, সাদিপুর, গোপালপুর, সাদিপুর, খোয়াজপুর, কানাইপুর, রায়খালী, ফুরসী, বামিচাঁদ, রণকাইল, আউরাকান্দী, চন্দ্রপাড়া, গট্টি, পিপরাইল, হাটুরী, থানথানাপুর, ঢুসাজারী, ইচাইল, কুজারদী, বেলবাড়িয়া, উখাইল, ভোগানদা, ছাচিয়া, সাধুহাটী, বোকাই, কাফরা, কমলাপুর, সাদীপুর, ভুজানদরগা। গাজুরি, গীরদা, আলী আরা, আলিয়াবাদ, কৃষ্ণ আরিডাঙ্গা, গোপালপুর, রামনগর, শ্রীকৃষ্ণপুর, কৃষ্ণপুর, ফরিদপুর, গাজুলা, মানিকগঞ্জ, রাধানগর, সুদরবেরা, হাটুরি, পিবারাইল, মারুকি, তালমা, আজিয়া, চর অযোধ্যা, টালীডাঙ্গা, ইমামদিপুর, কাবাডাঙ্গা, ঠাকুরপাড়া, দাসপাড়া, গারদান পাড়া, মুন্সীডাঙ্গা, জালচর, চরকুলীয়ানপুর, রতনপুরা, খাবাসপুর রুলুপাড়া, চরহাজীগঞ্জ, জাঞ্চ, টুরিয়ারচর। হরিরামপুরের চর ও টেঙ্গরাখলা। দামরাকান্দী, ট্হলা মুরারীদহ, মুন্সীব, কাফ্রা, সধুহাটী, বাকাইল।

## থানা ভূষণার অধীন গ্রামসমূহ

আজনবিরা চাঁদপুর, চাত্তর, কুমদপুর, বঙ্গেশ্বরদী, মুজুরদিয়া, কারকিরিদ ভেড়াদি, গোলাজয়নগর, মহেশহাটা, হেমামদ্দী, নাওদিয়া রামচন্দ্রপুর, কুন্দরদিয়া, কয়রা, দেব্রা, কৃষ্ণপুর, লক্ষ্মীপুর, আদিয়াসুল, দেওপুর, ভূষণা, সিট্টাছি, মিঠাপুর, দাদপুর, বড়কান্দি, আমগ্রাম, শিবপুর, হাসামদি, রাইপুর, চলনা, ঢুলপুকুরা, বোয়ালমারি, কালিম, দেব্রামদারপুর, কালীপাড়া, বুরুরকান্দি, মুলিয়াপাড়া, মাসাইল, বেথুর, জয়পাশা, বাজিত তেলিজুরি, রাইবর, বনচাকি, সাখর, আটজোল, সারনদি, বনচাকি, ভাটপাড়া, বায়রকান্দা, বরঙ্গকোঠা, কুমরাইল কাশালার, মোরা, রুপাল, সাহসরাইল, কদমি, কালীমাজুটা, ছত্রবন্দী বনমালীপুর, টাঙ্গরাইল, দেউলি, মিছাডাঙ্গা। কারুণ্যপুর, রামদিয়া নাগ, চাপকান দহ, বিশ্বনাথপুর।

## থানা নগরকান্দার অধীন গ্রামসমূহ

আলঘুরা, তেঁতুলিয়া, ভগারকান্দী, পুটীয়া গোয়ালপাড়া, জয়কল সরমঙ্গলখুর, সরুকদিয়া, বাগাট, জয়ঝাপ, গারলীরা, ফুকরকান্দী, কীত্তা, ভাওয়াল, বনগ্রাম, সাতলা, ভরকমাদিয়া, বেনানীকান্দী, মীনাপাড়া, মেহাবাদিয়া জয়পুর, তাতীপাড়া, সলটা, সোয়ালডুবি, টাগুনদিয়া, কামারকান্দা, বহরদিয়া, ছিনারকামদিয়া, ঈশ্বরদিয়া ও নারায়ণদিয়া, ফুক্রা, ইশবদিয়া, মাঝারাদিয়া, রাজাবাড়ি, নাটখলা, গোপালীয়া,

আজনপটীয়া, মুরটীয়া, সুরাদিয়া, রাঙ্গদিয়া, চাঁদখালী, সোনাপুর, বায়েরচর, টাকুরকান্দী, বিষ্ণুদি, ডুকা, ফুলবাড়িয়া, ব্রাহ্মণডাঙ্গা, দুকা, বেইতা, কাজীপুর, জুগনদিয়া, বালীচর, কেদারবাড়ী, বল্লভদি, গজারিয়া, বায়মাল, জোগানাদি, কাদুরবাড়ি, চাঁদেরহাট, দহীসরা, ধরমাদি, তারাকান্দী, নিখারহাটী, বায়জাক, রামচর, আলগদিয়া, নুনক্ষীর, মানিকদি সামুহামাদি, আলগাছিয়া, বাসুদেবপুর, পট্টি, নলীয়া, মরদিয়া, বালায়াচর, টয়াকান্দী, খুলন, বারইকান্দী, নুরপুর, গোপীনাথপুর, কান্দী, কোদালী, কয়ালাবাড়ি, খালীশপুটী, ছাগলদি, ছিলিনপুর, কাঁচাইল, গজারিয়া, বালীয়া জগদিয়া, কালাম হটী, জাঙ্গারদিয়া, বাগলিরা, আইনপুর সালিখা, রণপাশা, ডাঙ্গী, পুখরিয়া, বাউতীপাড়া, মাঝকান্দী, গোড়াইল, সাকরাইল, মোনাকোলা, জামপুর, ভাবুকদিয়া, দাদপুর, আটাইল, লক্ষ্মীপুর, বিলভুঁইয়া, সউলভুরি, সেরনগল, খইয়া, নয়গ্রাম, শ্যামনগর, যাত্রাবাড়ি, ঘরচর, ঠেঙ্গামারী, মিসজিয়াল, নগরকান্দা।

## থানা ভাঙ্গার অন্তর্গত গ্রামসমূহ

ফতেপুর, গোয়ালবাহার, বিদ্যামন্দী, হরিদাসদি, বিশ্বম্ভরাদি, শ্রীরামপুর, চাঁদবট্টি, শ্রীকৃষ্ণদি, সাতুবাটী, পাইকপাড়া, ডেনারক, নিলখী, বাগমারা, নাজিরিখান, গোদর, ভাজাডা, প্রাণাবিচর, সেনামই, কাকইর, সারুল, সাওতুর, কাশীমপুর, দেওরা, শ্যামনগর, ভাসরা, আত্রা, খারদিয়া, চামারাদি, নোয়াকান্দা, দারমহী, মোকামপট্টি, খামারভাগ, আজীমনগর, ঘোষগ্রাম, তাজপুর, ইনাতপাড়া, দত্তপাড়া, ঈশ্বরদি, গোয়ালদিয়া, আটাদি চৌধুরী কান্দা, মেদিগ্রাম, দীঘলকান্দী, পুইলা, বিশ্রীকান্দা, আরজুনপট্টি, আটাদি, ভাঙ্গা, তুজুরপুর, চন্দ্রচর, মুকাডোবা, পানাবেড়া, মৃজাপুরচর, গোপীনাথপুর, জাহানাবাদ, আবদুল্লাহবাদ, মাজিগাতি, দোয়াইর, সরইবাড়ি, কামারদীয়া, হাবদী, কাফুরপুর, পুবারিয়া, হাজীরপুর, ফুকুরহাটী, গজারিয়া, বেড়া, খাটরা, কোষাভঙ্গা, লোচনগঞ্জি, বারতলী, যয়দুনন্দী, বাগপুর, কুতুবডাঙ্গা বারতলী, চর ভুবাইল, খাত্রিয় নুলাল্লাগঞ্জি, পুলসী, ব্রাহ্মণদি, সাতরশি, নরুল্লাগঞ্জ, রাজাপুর, সাড়ে সাতরশি, চরবরমদি, দাসহাজো, শ্যামপুর, সদরপুর, দুর্গাপুর, শুকদেবপুর, ঠাকুরগঞ্জ, শ্যামগ্রাম, কালামৃধা, কবিরাজপুর, পাথরাইল, মথুরাপুর। বাগপুর, বেলদারপাড়া, চাঁদপুর, সন্ন্যাসীডাঙ্গা, ময়নাকাটা, বন্দরখলা, মাঝীগাতী।

## থানা মাদারীপুরান্তর্গত গ্রামসমূহ

নিলখী, কামারকান্দী, ঘুনসদী, গোসার, করকান্দা, চানদী, নিজ ধুরাইল, চাচার, বল্লভদী, শিরখাড়া, সাকারপুর, বিরঙ্গন, হোসেনকান্দী, মস্তবাপুর, কাগচামরা, হবিগঞ্জ, সাচারাদি, নন্দী, বাহাদুরপুর, পাটাভুকা, গন্ধর্ব্বদি, ইসিফপুর, কাফিমা, দুদখালী, নারায়ণকান্দী, দৌলতপুর, দিয়াপাড়া, সরমঙ্গল, গোপালগঞ্জ, কেন্দুয়া, বনগ্রাম, রাজোর, দুর্গাবির্মদি, কুলীয়াশুর, বরদিয়া, মিরার, হগলী, দক্ষিণরাজোর, মাজচর, কুনীয়া, ওজ্রাপুর, সাতপাড়, কাপালীকান্দী, বাজিতপুর, পেয়ারপুর, গজারিয়া, আমগ্রাম, হোগলা, সাতুরিয়া, দত্তের হাট, নাইয়া, কেন্দুয়া, বৈবাশী, মালীভাঙ্গা, ইক্রাবাড়ী, দীঘির পাড়,

কাজবার খেল, বেড়া, নাউশুর, সাচিয়ার ভাঙ্গা, বেলবাড়ী, জোয়ার হাকারপুর, জলিরপাড়, পাখুলা, গজারিয়া, রোকমেক, বাহাদুরপুর, খাজচুরা বেলবাড়ী, পশ্চিমচাটা, পাণ্ডুপাড়া, বিলঝারি, বটা, এইসা, দরশনা, মাইজপাড়া, ধামসার, ক্লাল গ্রাম, আলিসাকান্দী, কদমপট্টি, ভাটরু রামশীল, ফটীক বাহাদুরপুর, দাশুরিচর, মাণিকগঞ্জ, চরটেঙ্গামারী, চরকৃষ্ণনগর, অনুচর, চরলক্ষ্মীপুর, চর কালকিনী, কালীনগর, খাজুরতলা, গণ্ডারকান্দী, খোয়াজপুর, মেদাকদ, বনগ্রাম, রাজদী, পুরখান্দলা, বিনতিলক, কাশীমপুর, মাইজপাড়া, কানাইপুর, কবলপাড়া, চরগমুগরিয়া, কালাইমারা, ধুলগ্রাম, টুবহিয়া, হোগলপটীয়া, সানমানাদি, কাটীয়াল, চররিপাড়া, মাদ্রা, ঝাউদি, গানখাম, চাবনা, কুলপদী, গইদি, খাগদী, মাদারীপুর, ঘাটমাঝী, রূপরীয়া, বৌলগ্রাম, মহেশ মাঝীচর, খালীয়া, সেনদিয়া, করণরাড়া ও ফাইসাতলা।

## থানা পালংএর অধীন গ্রামসমূহ

নড়িয়া, কলুকাঠী, খএরপটী, লোনাসিং, চাকদহ, মুলফৎগঞ্জ, মানাখান, সিরঙ্গল, যোগপাট্টা, চান্দভাওরী, সাতপাড়, ভূমখাড়া, জালীয়াহাটী, ফতেজঙ্গপুর, নগর, দেওজুরী উপসী, মসুরা, আকসা, চান্দনী, আচুড়া, ভূচুড়া, ডিঙ্গামানিক, কোয়ারাগ, মাণ্ডা, কাঠকুলী, আলকাদ, চান্দা, কেদারপুর, কাপাসপাড়া, বিঝারি, ভড্ডা, দিনারা, বোকাইনগর, বাঘীয়া, দুলুখণ্ড, মগর, আটীপাড়া, ধামারণ, চামট, গোনমাইজ, কুড়াশী, দাশরতা, পালঙ্গ, তুলাসার, বিলাসখান, বাটানগোহী, সাভুপুরা, ধামসী। গঙ্গামার, কোমরপুর, জানসার, ডোমসার, শউলা, আবুরা, সুজন্দল, চিকন্দী, সুন্ধিসার, দশকান, বিনোদপুর, আড়িগা, পাটানিধি, গুরিপাড়া, লতাবাগ, দাড়খোলা, বড় নিদানপুর, ঘাশীখোলা, পশ্চিমপার, বাহেরচর, আউলিয়াপুর, জাফ্রাবাদ. বড় পাচন, গোবিন্দপুর, খোয়াজপুর, মাধু, শূন্যঘোষ, রামভদ্রপুর, মামুদপুর, নিলকুণ্ডী, কাকদি, ধানুকা, হুগলী, বালীচারা, ছয়-ঘরিয়া, মাঐসার, কাঞ্চনপাড়া, লাকারতা, গইড্ডা, দিনারা, পাইয়াতলী, পণ্ডিতসার। নলতা, হোগলা, ঘড়ীসার, আমতলী, পাচলেজা, গুনমাইজ, ঝাটুগুহি, সিতুপুরা, মহিষকান্দী, সিঙ্গাচূড়া, কামটলা ভেদেরগঞ্জ, সামন্তসারা, নলমুড়ি, দুরয়ার, মাকসাহা, মির্জাপুর, পুটীজুরী, ছয়গাঁ, দেভোগ, সাজনপুর, পাণরাইল, চন্দনকর, সোণামুখী, রুদ্রকর, চরচাটগণ, মানুয়া, আগকসা; সিড্ডা, ভাসানচর, দাদপুর, চররসনন্দী, চরলক্ষ্মী, নারায়ণ, দালুই, ডামড্ডা, কনকসার, দক্ষিণপাড়া, নামুলজদ্দী, সিংহগাড়ায়া, মূলনাপাড়া, পইকাঠী। বিশাকড়ী, চলআস্থা, কান্থা, গোবাড়ী, দাদপুর, লক্ষ্মীপুর, স্নানঘাটা, চরপাড়া, চরমালগা, ধানকাঠী, ভুলুয়া, চরপদ্মা, দিকশুল, কান্দাপাড়া, টিগোলিয়া, কিয়পদা, ছাপকাঠী, দাসের জঙ্গল, মহেশখালী, হাটুরিয়া, গজারিয়া, ফাগনসা, কালুগাঁ, রামচন্দ্রপুর, নাগেরপাড়া, বাঁশগাড়ী, রাণীসার, বানেদৃগুরি, কাঞ্জারচর, তারুলিয়া, বিলটীয়া, সিংগারডা, চররতনা, কলারগাঁ, মালনাপাড়া, ঝিকায়কাঠী, এড়িকাঠী, টেঙ্গরা। বেজনী সার, পাতলা, মসুরগা, পট্টি, বুড়ীর হাট গোসাইর হাট, তিলৈ, পিয়কাঠী, কাশাভোগ মধ্যপাড়া। এতদ্ভিন্ন রাজনগর, জপসা, পোড়াগাছা প্রভৃতি নদীগর্ভস্থ স্থানগুলি পুনরায় উত্থিত হইয়া চড়াতে পরিণত হইয়াছে। চর মাজিরার অন্তর্গত এইরূপ প্রায় ৫০/৬০ খানা গ্রামের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

## থানা শিবচরের অন্তর্গত গ্রামসমূহ

রঘুরামপুর, কালিকাপুর, হাসনাবাদ, বোহারচর, বাঘাই, বউলারচর, ছিলারচর, হবিগঞ্জ, সন্তোষপুর, বাজিৎপুর, সেখপুর, লক্ষ্মীপুর, আড়াচণ্ডী, রণখোলা, রায়পুর, শিবপুর, আটপাড়া, শ্রীপাশা, গাজীপুর, ভাণ্ডারীকান্দা, আচইর, জেটমহল মৃজানগর, খামার গঙ্গারামপুর, রায়মিগার, বোয়ালিয়া, উমেদপুর, জয়সাগর, গয়ঘর, চরগাজীপুর, রামনগর, সবিত্রগাঁ, পরশি সাহেবাজনগর, চন্দ্রা, ডাটর, গোপালপুর, বাঘীয়া, চাটীভোগ, ডহরপাড়া, কৃষ্ণনগর, বাহেরচর, পাচ্চর, বরমগঞ্জ, কেশবপুর, রঘুনাথপুর, খাজুর, টডা, বাহাদুরপুর, খানকান্দা, টেঙ্গরামারী, হীজাস্থান, সামাইল, কুবীদপুর, গোপালপুর, নীকান্দি, কাকইর, দতিয়াকান্দী, বয়রাতলা, জোরশিবচর, ফুরাঙ্ক, গোয়ারেকেস, চরবদ্রাসন, চরনিলখী, কাবিদপুর, নিলখী, চান্দারচর, গোলাঘাট, চাইবিবপুর, কেলনগর, চরজরিপ, সোনাঘাট, মৃজানগর, হাজুরাকান্দা, শিবপুর।

## থানা গোপালগঞ্জের অন্তর্গত গ্রামসমূহ

ঢাগরডাঙ্গা, সিংহীপাড়া, টঙ্গিপাড়া, বাসুরী, জিমাডাঙ্গা, ঘোনাপাড়া, পাইককান্দী, গোবরা, হরিদাসপুর, বারাসী, পঞ্জরিয়া, গোপালগঞ্জ, গোপালপুর, মানিকদহ, খাগবাড়ী, হাতীকান্দা, ওল্পপুর, খাগাইল, চন্দ্রদি, বশীয়া, ঘোনাপাড়া, গোয়ালাডাঙ্গা, পীটশুডাঙ্গা, নিশ্চিন্তপুর, নিজ্রা, নিজামকান্দী, ফুলশা, বৈরাগীপাড়া, বাতবাড়ী, রাউৎপাড়া, রাজবাড়ী, হাতীবাড়ী, বাণীহার, ভোজেরগাতী, পারদীঘলীয়া, বন্যাবাড়ী, চন্দ্রদীঘলীয়া, শ্রীরামকান্দী, বনটিয়া, করণকোপা, বায়বাজী পাড়া, গোপীনাথপুর, কায়ালিয়া, বাটবাড়ী, সুরগ্রাম, যাদুপুর, বিদ্যাধর, সীতারামপুর, বিথুরী, শীতলাডাঙ্গা, কাজুলিয়া, বাজনীয়া, মালীবাটা, রায়পাশা, উত্তরপাড়া, পীলবাড়ী, মাণিখারা, হাটবাড়ী, কৃষ্ণপুর, পাটকেলবাড়ীয়া, সাতপার, কালীবাড়ী, গন্ধীয়াসার, দোগ্রাসার, আরপাড়া, খাম্বারিয়া, গোপালপুর বিল, কজলাবিল, মটরভাঙ্গাবিল, বসুববিল, হারজোড়বিল, পটলুভাঙ্গা।

## থানা কোটালীপাড়ার অন্তর্গত গ্রামসমূহ

বারইডাঙ্গা, ছোটডুমরিয়া খয়রানগর, গোয়ালীয়া, ঘাগর, বাহের সীমন্দা, তারাকান্দা, ঘুদ্রামতী, ডুমুড়িয়া, গোপালপুর, বঙ্গনদীয়া, শ্রীরামপুর, উনশীয়া, গচাপাড়া, রাজাপুর, নাওড়া, মধুনগর পারকনা, বুরিয়া, ডুলহার, আমতলী, কাশ্যপপাড়া, বাগডাল, তেরশ্রী, জলীয়া, মূলসার, কশল্যা, বিষ্ণুপুর, আগুলিয়া, ঢাককুরপাড়া, মাজবাড়ী, হীরণ, বিতসী, ছত্রকান্দা, আদগঙ্গা, দেওপুরা, তিলক, জলী, জামুনা, চরখালী, সীতাকুণ্ড, সাদুল্লাপুর, কদমবাড়ী, দীঘলীয়, পুখড়িয়া, সাউপাড়া, কদমবাড়ী, পীঞ্জরী, মদনপাড়া, মাদারবাড়ী, ঝনঝনিয়া-বিল, দেওপুরাবিল, বরুয়াবিল, তেলীবাড়ী, নকীরপাড়, বাগাট, পারকণা, রাজাপুর, তাড়াশী, কালীগঞ্জ, কাশাতলী, ডউয়াতলী।

## থানা মুকসুদপুরের অধীন গ্রামসমূহ

বাহেরক, খাঞ্জাপুর, ফুটীপট্টি, বড়বনগ্রাম, তেঘরিয়া, ঘোষাদি, বনগ্রাম, লোহাইর, চাওচা, খাঁপুরা, আগদিয়া, পাগদিয়া, পদ্মাকান্দা, দিগনগর, রামকৃষ্ণপুর, কুমরিয়া, ভাজনদী, সাতআনী, ষোলঘড়িয়া, বাকাইল, ধোপাদি, বাঘাদিয়া, সুমীয়াকান্দী, ছয়গলিহারা, বাগদিয়া, গোরিনাখকান্দী, দেমনাকান্দী থানাপদিয়া, বামনা খাগদি, রাগদি, প্রসন্নদি, ফতেপুর, গোহালা, গণিয়ারী, খানপদ্রা, ডুমরিয়া, কালীমাগ, ঘুনসী, বালীয়াকান্দী, বামনচোরা, কৃষ্ণপুর, কুটীয়া, পাথরাইল, নলডাঙ্গা, কালীয়া, বাইটকামারী মহারাজপুর, বোহারো কদমপুর, মুকসুদপুর, পূর্ব্বকান্দী, কমলাপুর, পিলালপুরী, দামোদর, থলনাবাড়দী সিলনাপুর, বামনগাতী, উজানী, কইমাড়া, তেলীবাড়ী, মুনকী, বেতীগ্রাম, বাসুদেশপুর, মহাজনী, ধরম, বলহাটী, বেনীনাই, কালীগ্রাম, মহিষদল ধারিয়া, কালীবাড়ী মুনখী, বেলগ্রাম, ভাট্রা, এরুয়াকান্দী, গুণধর, বহুকলর, হাইতারা পইসুর, সিঙ্গা, আন্ধারকোঠা, পাটীগ্রাম লখারচর, কৃষ্ণাদি টেঙ্গা, খলা, কুনাদিয়া, বাহিভাগ, বলুগ্রাম, পাচরিয়া, ভাকুরিয়া, ডলা, সুরুলী দাসেরহাট, হোগলডাঙ্গা, গুপ্তেরগাতী, ঝাকীয়, দুর্গাপুর, ফুলরাপুর ফুলহর, কাজীটোলা থান্দারপাড়া, রামচন্দ্রপুর, কেন্দুয়া, কোরায়ারা, রুপাপাত, গোপালপুর, কানপাড়া দুবলাশুর, ভাবরাশুর, খুরট, বেজ্রা, বড়তারাইল, মাজীগাতী, ছোট তাড়াইল, মামুদপুর, খান্দালিয়া, লীলাগঞ্জ, দাম্রাকান্দী, ঝিকাবাড়ী, দয়রা, ধাপ্রা, রণা, লক্ষ্মীপুর, পারলীয়া, সাজাইল. মাজিরা, কুমরিয়া, শিবপুর, ইক্রাইন, ধুত্তা, ধোপা, বাগঝাপা, খারাহিরি, দরবন্ত, মাধুপুর, জোনাশুর, বাণীয়াভাঙ্গা, হিজলী, বাগীয়া, হোগলডাঙ্গা, হোব্রা, মহিষপুর, বিশ্বনাথপুর, দস্তান, বায়সখালী বদপাশা, খানসিয়া খাদী, ধামপোরা, চাপতা, ভালিয়াপাড়া, আবরিয়া পাচাইল বাটোয়ার, সোচেইন, মামুদপুর, খাগ্রাবাড়ীয়া, মাজকান্দী, মাজীগাতী, সীতা, রাজপাট, আরুয়াকান্দী। পরাণপুর ঈশরাদি বিল, সীতারামপুর, চন্দনধুলা, ঘৃতকান্দী, তাড়াইল, সকটিডাঙ্গা. বেজয়, ফুক্রা, ভুলবাড়ী. পুকুরপার, ঢলগ্রাম, বাহিভাটা, বাহেরবাড়িয়া. লবলিয়া, লোকান্দা, বালীয়াডাঙ্গা, দড়রবসন্ত, ইকাইল, কাশীয়ানী, রথকান্দা, বানা, পিঙ্গালিয়া. মহানাগ, লীলাগঞ্জ, বোধপাশা, ধানকুরিয়া, ভাটীয়াপাড়া, আরোরা, পাঠাইল, বাটোয়ার।

## থানা রাজবাড়ীর অন্তর্গত গ্রামসমূহ

মানপাড়া, মালগাড়ী, রামকান্তপুর ধরমসী, সুলতানপুর, লক্ষ্মণদিয়া, মুচিদা সোনাপুর, শিব্বরপুর, শিববামপুর, বাজীতপুর, কারউদয়পুর মীরঝিপুর, নরপুর, কোলো, এরেণ্ডা, গৌরীপুর, রাজিয়া, আয়জী জয়পুর, মোগলরেক, সারকালো, সৌদপুর আল্লাদিপুর ইব্রাহিমপুর, বামপুর, সরসোল, বরবাদপুর, পাচরিয়া, লক্ষ্মীচরণপুর, বাণীয়াবহ, কোমরপুর, মাতীবপুরা, ভনবাড়ী, বেথলিয়া, কায়েসপুরা, নাওয়ানদিয়া, চারাখালী, লঙ্কাদিয়া, রাজগঞ্জ, গোপালপুর, দরোয়াপুর লক্ষ্মীকোল, রাজবাড়ী. ভবানীপুর. বায়নগর, শ্রীপুর, দুপ্রা, শ্রীকল, কুটীলা, বায়হিপাড়া, চররাট ; ধুলদি, উত্তরজব্রা, কামারডাঙ্গা, বেলীয়াবেঘাটা, বরসিঙ্গা, নারায়ণদহ, গোবিন্দপুর, গোয়ালন্দ, কাণীদিয়া, দিনানদী,

বারখীপাড়া, বাতুলতলা, মহম্মদপুর, চরদৌলতভিয়া, হামন্তর, বাণীকা, মঠিকান্দি, কুলটুপী, বাহেবাকাইরী, খানখানাপুর, দুলপাড়া।

## থানা বালীয়াকান্দীর অন্তর্গত স্থানসমূহ

বাসপুর উজানদিয়া, ভাটমেকিয়া, কোরকদি, খুদিরামপুর, মসকুন্দ, শ্যাম-সুন্দরপুর, বামনদিয়া, কালআচি, নিরকোঠা, ডোমন, জগন্নাথদি, বাসানসী, বনগ্রাম, জানমাগর, সাধুখালী, পমিআমলা, পরতিয়া, বউলাকুণ্ড, ছোচাপুর, ডাগলীজানি, ইকারচর পেট্রো, এনকারর, দড়িমাকড়ি, বগা, বালিয়াকান্দি, নাশেপুর, লবওয়া, যবোকান্দি, বিলজখান্দ, হিঢজী, মোচারভলা, শাথরিয়া দেলওয়া, চিকামলা, কোলাগ্রাম, পাচগাথী, হিজলী, জিল্লাও, কুলুকান্দী, বেরলী, দেলালপুর নলীয়া, সাদকপুর, পদমদি কোমরগুসী, কালীবাড়ী, মেটিন, চিদামলা, গড়িয়া, দাখীরবাড়ী, টেণী, নোয়াপাড়া, দিয়েরা, শ্রীপুর রামদিয়া. খালকুলা, নারাণপুর, ডহর, বাহারপুর, পাকরিয়া, ফিয়ারিদপুর, তেতুলিয়া, নসিবসাহী, বরুগ্রাম, ভার, খুবদখুপদি, মালসালিয়া, দুর্গাবরদি, ইলিশকোল, মাতলাকান্দি, রাজ, ইকারচুর, মাগুরী, সউদা, বদটী, জমালপুর, সাগুরা, ইসফপুর, শ্রীকারীকান্দী, গইনা মসকুণ্ডমথুলোপুর, মঘচাপি, দড়িয়াপুর, মহেশতিপুর।

## থানা পাংশার অন্তর্গত গ্রামসমূহ

ছোটচিকনটী, বনগ্রাম, মনচারি, পণ্ডিতবাড়ী, কৃষ্ণনগর, বিমিশন, এমডিশ্রী, মলুয়া, লতিবহরগো, বাবকোলা, কোয়াগ্রাম, আকনীপুর, কাগমরি, আরা, কোমরমাইজহাল, বিলজোনা, দোনোআরাবা, হামোখলা, বেনুগ্রাম, পদুনা, আগুরহল, হোদয়বিনগ্রাম, মিচেকতলা, নিভা, সরসা, দিউটি, বিরজানোয়া, জিমটপুর, পাচুরিয়া, বনেকুড়ি, হেমেলখলা, কুটলিয়া, বড়বিলা, কুষ্টিয়া, ছিলক্রী, মাঝবাড়ী, দিয়ারামপুর, বাণীপুর, সলফ, ধুলট, পঞ্চবাড়ী, কালীপুর, মুশুরিয়া, ঘোড়াদ, বালীয়া, পুলকালর্ত্ত, চৌবেড়িয়া, নকুলডাঙ্গী বাঙ্গলাট, লক্ষ্মীপুর, সুরনগর, কোয়রপুর, বিষ্ণুপুর, ইহাগ্রাম, মীরজিডাঙ্গা, ভেলিয়া বোরা, কৃষ্ণপুর, রামনগর, জারমিউনপাড়া, জানাপুর, খেতারপাড়া, গুলপাড়া, বাশগ্রাম, হরেকৃষ্ণ, উদদিপুর, জোসাই, হন্দুদবাড়ী, হাবাস এব্রোখালী, মাচপাড়া, কালুপুর, ভানড়ুম, বাগমারা, বাহাদুরপুর, হাবাসপুর, কেশবপুর, ইউখীখালী, লক্ষ্মীপুর, সেনগ্রাম, মলা, কৃষ্ণবাসদিয়া, ইকদারখালী, নদীবলপুর, আজুদিয়া, পুদপাড়া, অতুসকান্দীয়ার, কালাবাড়ী, ধাবুডিয়া, ভোনাবাড়ীয়া, আজমপুর, মাদাপুর, রাওকোঠা, জোটলগুড়ি, বাওকোলা, চানারী, আফ্রা, জোকাই, সুরিদিয়া, কাশীনাথপুর, গোরিআলা, হারের, বল্লভপুর খাজান আটীপুর, করিমগঞ্জ, মহীন্দ্রপুর, চরপদ্ম, রঘুনাথপুর, ভবানীপুর, হরিণবাড়ীয়া, সাবাতপুর, বায়নগর, মীরগীডাঙ্গা, দিওটী, মশলিয়া, বেলগাছী, পাংশা।

# চতুর্থ অধ্যায়
## নগর ও গ্রামের বিবরণ

### ফরিদপুর

প্রায় সার্দ্ধ দ্বিশতবৎসর পূর্ব্বে ফরিদপুর স্থানটীর প্রথম পরিচয় ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়াছে তৎপূর্ব্বের বিশেষ কোন পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

আরঙ্গজেব বাদসাহের রাজত্বকালে ১৬৬৪ খ্রীঃ অব্দের ১৬ অক্টোবর সায়েস্তা খাঁ যখন রাজমহল হইতে ঢাকা আসিতেছিলেন, তখন হাজরাহাটী নামক স্থানে উপনীত হইলে, সুবার কয়েকজন বিচক্ষণ লোক তাঁহাকে বলেন, ফরিদপুরের পথে তাঁহার ঢাকা গমন করা কর্ত্তব্য নয়। উহা বিপজ্জনক হইতে পারে ; কারণ শত্রুপক্ষীয় মগেরা সর্ব্বদা ঐ স্থান দিয়া গমনাগমন করিয়া থাকে ; অতএব তাঁহার পক্ষে ঝানকের রাস্তা অবলম্বন করিয়া ঢাকাভিমুখে চলিয়া যাওয়া যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু সায়েস্তাখাঁ ঐ কথা শ্রবণে উহা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া, সেই বিপদসঙ্কুল পথ অবলম্বন করিয়াই ঢাকাতে গমন করেন।

সায়েস্তাখাঁর শাসন সময়ে সেখ জিয়াউদ্দীন ইউসুফ লড়িকুলের দারগা ছিলেন, তাঁহার সাহায্যার্থে আবুল হোসেন দেড়শত রণতরীসহ শ্রীপুর অবস্থান করিতে আদিষ্ট হন। এই আবুল হোসেন মীরজুমলার সহকারী ছিলেন, আসাম অভিজানকালে নৌযুদ্ধে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে সক্ষম হন।

জিয়াউদ্দীন ইউসুফের লড়িকুল অবস্থানকালে মগেরা ফরিদপুরের পথে উহার সমীপবর্ত্তী হয়। এদিকে মহম্মদ আবকাশ আবুল হোসেনের সাহায্যার্থে এই স্থানে আগমন করেন। উভয়পক্ষ সম্মুখীন লইলে বজ্রনিনাদে মোগলের দুর্জ্জয় আগ্নেয়াস্ত্র গর্জ্জিয়া উঠিয়া শত্রুশরীর ও জলযানসমূহ বিদ্ধস্ত করিয়া দিতে আরম্ভ করিল। মগেরা আর তিষ্টিতে সক্ষম হইল না, তাহাদের বিপুল বাহিনী দ্বারা এই রণযজ্ঞের আহুতির কার্য্য সমাধা হইলে, অবশিষ্ট জনগণ পলাইয়া প্রস্থান করিতে বাধ্য হয়। (ফাৎ হইয়া ইব্রিয়া সায়াবদ্দীন ১৩৪/৩৫ পৃষ্ঠা ও শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত ঢাকার ইতিহাস ৫০৮/৯ পৃষ্ঠা)।

আমরা ফরিদপুরের নাম এই প্রথম অবগত হই। পরে রেণেল ১৭৬৪ খ্রীঃঅব্দে বঙ্গদেশের যে মানচিত্র অঙ্কিত করেন তাহাতেও ফরিদপুরের স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আমাদের অনুমানে এই দুই ঘটনার বহু পূর্ব্ব হইতেই "ফরিদপুর" এই নামটীর উদ্ভব হইয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী চলিয়া আসিয়াছে, উহাই নিম্নে সন্নিবেশিত করা হইল।

ফরিদ খাঁ নামে এক ফকির এই স্থানে একটী দরগা নির্ম্মাণ করেন, তাঁহার নামানুসারেই এই স্থানের নাম হয় ফরিদপুর। ঐ দরগা এখনও কালেক্টারী কাছারির উত্তর দিকে বর্ত্তমান আছে। রেণেলের ম্যাপে এই স্থানের নাম দৃষ্ট হয়। ফরিদপুরের একাংশের নাম কমলাপুর। তথায় দুর্ল্লভ সাহা নামে এক ধনীর বাসস্থান ছিল। প্রবাদ তাঁহার বাণিজ্য

কার্য্যের জন্য ৮০ খানা নৌকা ব্যবহৃত হইত। তৎকালে পদ্মানদী এই স্থানের উত্তর পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত হইত। বহুকাল পর্য্যন্ত এই স্থানে নিবিড় অরণ্য থাকায় উহা শ্বাপদসঙ্কুল ও ডাকাইতগণের আশ্রয় স্থানে পরিণত হয়। ইহার প্রান্ত দিয়া যে অপ্রশস্ত স্রোতস্বতী ছিল উহার প্রবেশ ও নির্গম মুখে উহাদের আড্ডা ছিল ; ছবদরা নাম্নী একটী স্ত্রীলোক এই দলের নেত্রী ছিল। প্রায় ৯০ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। এই ডাকাইতের দল নির্ম্মূল করা ব্যপদেশেই প্রথম তথায় একটী সবডিভিজন প্রতিষ্ঠিত হইয়া, পরে ক্রমে জেলাতে পরিণত হইয়াছে। তৎকালে নদীয়ার অন্তর্গত কুমারখালী এই স্থানের অন্তর্গত থাকার কথা অবগত হওয়া যায়। ডাকাইতেরা একটী লোকের প্রাণ সংহার করিয়া একটী আম্র-বৃক্ষে ঝুলাইয়া রাখে। 'খুনে আম গাছ' ফরিদপুর ও নদীয়ার মধ্যে বর্ত্তমান ছিল। ফরিদপুরের ও নদীয়ার পুলিশেরা 'উহা আমাদের এলেকার অন্তর্গত নহে, তোমাদের এলাকাধীন বলিয়া কেহই আর কোনরূপ তদন্ত না করায়, গবর্ণমেন্ট কুমারখালীকে ফরিদপুর হইতে নদীয়ার অন্তর্গত করিয়া দিয়া সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দেন।

এই নগর কলিকাতা হইতে ১৬৫ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে ও ঢাকা হইতে ৩২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পদ্মা নদীর অনতিদূরে অবস্থিত। এই স্থানটীতে ষ্টীমার ষ্টেসন ও রেলওয়ে ষ্টেসন আছে। উহা জেলার সদর স্থান ; স্কুল, মিউনিসিপালিটী, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড প্রভৃতি জেলার উপযোগী যাবতীয় আফিস এই স্থানে বিদ্যমান আছে। ঢোলসমুদ্র সলিল পূর্ণ থাকা সময়ে উহার সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্য উৎকৃষ্ট ছিল। উহা মজিয়া যাওয়ায় মৎস্যাদিরও বড়ই অভাব হইয়া পড়িয়াছে। দুর্ভাগ্যের কথা এই যে ইহা জেলার সদর স্থান হইলেও ২৩টী স্কুল, ব্যতীত সাধারণের পাঠোপযোগী কোন পুস্তকালয় (লাইব্রেরী) সংস্থাপিত নাই। এই স্থানটী কলিকাতাবাসী মহারাজ বাহাদুর সার্ প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের জমিদারীর অন্তর্গত। তথায় তাহার তহশীল কাছারি আছে। অন্যান্য কতিপয় ভূম্যধিকারিগণের জমি জমাও ফরিদপুর সহরতলিতে না আছে এমত নয়। ঢাকা হইতে যশোহর রোড বরাবর ফরিদপুরের সহর ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই সময়ের রোপিত কতকগুলি বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষ রাস্তার উভয় পার্শ্বে বিদ্যমান থাকিয়া এই রাস্তার শোভা বিশেষভাবে সংবর্দ্ধিত করিয়াছিল। কিন্তু উহা ক্রমেই লয় প্রাপ্ত হইতেছে। উৎকৃষ্ট ইক্ষু ও খেজুর গুড় ও বিছানার চাদর ও কাপড়ের রঙ্গিন ছিট এই স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শতাধিক ইষ্টকালয় বিদ্যমান আছে। ফরিদপুর জজ কোর্ট ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের দালান দুইটী দেখিতে মন্দ নয়। হিন্দুদের কালীবাড়ী, ব্রাহ্মদের সমাজ মন্দির, মোসলমানদের একটী মসজিদ ও খৃষ্টানদের ভজনালয় আছে। ফরিদপুর হিতৈষিণী এই জেলার একমাত্র মুখপত্রিকা। পণ্ডিত রাজমোহন মজুমদার ইহার সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকাখানি আজিও চলিতেছে। সঞ্জয় নামে আর একখানা পত্রিকা আছে। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে বিশপ্ হিবার ফরিদপুর সন্দর্শন করিয়া এতৎসম্বন্ধে যে কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা পরিশিষ্ট ভাগে সন্নিবিষ্ট করা যাইবে। এই নগরের সন্নিহিত 'গেরদা' একটী প্রসিদ্ধ স্থান। সে বিষয়ে প্রথম খণ্ডে লেখা হইয়াছে। আর একটী স্থান ছিল হাজিগঞ্জ উহা নদী-গর্ভস্থ হইয়া পুনরায় চড়াতে পরিণত হইয়াছে। পরিশিষ্ট ভাগে হাজিগঞ্জের পূর্ব্ব বিবরণ যথাসম্ভব প্রকাশিত হইবে।

## হোগলা কার্ত্তিকপুর ও মুন্সী চৌধুরী

এই স্থানটী পালং থানার অন্তর্গত, মেঘনানদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত। যখন দুর্জ্জয় বারভূঞাগণ পূর্ব্ববঙ্গে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া বাদসাহপক্ষীয়গণকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই সময়ে বহু মোগল সৈন্য প্রেরণ করিয়া বাদসাহ সেই রাজগণকে আয়ত্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। ফতে মহম্মদ নামে একজন সৈনিক পুরুষ তৎকালে বঙ্গদেশে আগমন করেন। মানসিংহের অধীনে তিনিও একজন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। প্রবলপ্রতাপ কেদাব রায় নিহত হইলে, তাঁহার বিস্তীর্ণ জমিদারী নানাভাগে বিভক্ত হইল। মূল বিক্রমপুর প্রাপ্ত হইলেন বৈদ্য রঘুনন্দন দাশ চৌধুরী ; উহার অপরাংশ কার্ত্তিকপুর প্রাপ্ত হইলেন সেক কালু ; অপরাংশ ইদিলপুর কায়স্থ রঘুনন্দন গুহ চৌধুরীর হস্তগত হইল।

সেক কালুর সহিত কুটুম্বিতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ফতে মহম্মদ কার্ত্তিকপুর বাস করিতে মনস্থ করেন। ঘটনাক্রমে মেঘনা নদী অতিক্রমকালে ফতে মহম্মদ ইদিলপুরের জমীদার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই সময়ে রঘুনন্দনের বংশের একটি অল্পবয়স্কা সুন্দরী কন্যা খেলা করিয়া বেড়াইতেছিল, ফতে মহম্মদ সাগ্রহে তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। এই কথা তত্রত্য জমিদার মহাশয় অবগত হইয়া, যে বালিকা মুসলমানের অঙ্কে গৃহীতা হইয়াছে, তাহাকে আর গৃহে ফিরাইয়া আনা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন না। ইহাতে ফতে মহম্মদ লজ্জিত হন। কি করেন, ঐ কন্যাটীকে লইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।* অচিরে ঐ জমিদার কন্যার সহিত স্বীয় পুত্রের পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করিলেন। ইদিলপুরের চৌধুরী এই কথা অবগত হইয়া আপনার জমিদারী হইতে ৩৬ খানা গ্রাম জামাতাকে যৌতুক দান করেন। এই কন্যার গর্ভে মাইনদ্দিনের জন্ম হয়। তাঁহার দুই পুত্র ইমামদ্দি ও নৈমুদ্দি। মাইনদ্দিন হইতেই ইঁহাদের মুন্সী উপাধি আয়ত্ব হয়।

মাইনদ্দিন অল্প বয়সে লোকান্তরিত হন। তাঁহার দুই পুত্র অল্পবয়স্ক থাকায় জমিদারীর সম্পূর্ণ তার স্বগ্রামবাসী রঘুনন্দন সেনের হস্তে ন্যস্ত হয়। মাইনদ্দিন তাঁহাকে বিশ্বাসী কর্ম্মচারী বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন। মুন্সী ইমামদ্দি এই সময়ে বিদ্যা শিক্ষার জন্য মুর্শিদাবাদ অবস্থান করিতেছিলেন। প্রবাদ–দিল্লী হইতে আগত একখানি চিঠির পাঠোদ্ধার করায়, নাজেম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কার্ত্তিকপুর হইতে খারিজ করিয়া কতক স্থান প্রদান করেন। পূর্ব্বোল্লিখিত ৩৬ খানি গ্রাম ও এই নূতন ভূসম্পত্তি একত্র করিয়া রসুলপুর নামে এক পরগণার উদ্ভব হয়। এই সকল স্থানের অধিকাংশ কার্ত্তিকপুরের পূর্ব্বতন মালিক চাকদহনিবাসী রাঘব চৌধুরীর অধিকারভুক্ত ছিল। সেক কালু পূর্ব্বেই উহার অধিকাংশ আত্মসাৎ করেন। অবশিষ্ট যাহা ছিল তাহার কতকাংশ এখন ইমামদ্দিন হস্তগত হইল। রাঘবের বংশধরগণ কতক জমি জীবিকানির্ব্বাহার্থ প্রাপ্ত হয়েন। উহা "জীবিকা" নামে আজিও প্রসিদ্ধ আছে। মুন্সী ইমামদ্দি ১০৮ বৎসর জীবিত থাকিয়া পরে

* এই কন্যা শশানিবি নামে পরিচিতা ছিলেন। বোধ হয় শশী নামের পরিবর্ত্তে মোসলমান গৃহে শশা নামই প্রচলিত হইয়াছিল।

লোকান্তরিত হন। সাধারণে তাঁহাকে ধার্ম্মিক বলিয়া মান্য করিত।

মুন্সী নৈমুদ্দি ইমামদ্দির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র–জাহির, জমির, হাসেন ও হোসেন। নৈমুদ্দিও কৃতবিদ্য লোক ছিলেন, অল্প বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে মুন্সী জাহির বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার সহিত রাজবল্লভের পুত্র দেওয়ান রামদাসের বন্ধুতা ছিল। মুন্সী ইমামদ্দির সহিত, মুন্সী জহরদ্দিন বিশেষ প্রণয় ছিল। জহর মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইলে ইমামদ্দী তাঁহাকে দেখিবার জন্য উপনীত হন। তখন জহরদ্দী ইমামদ্দীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "চাচা, বাঁচা অপেক্ষা মরাই ভাল।" ইমামদ্দী ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন 'আমরা চারি ভ্রাতা জমিদারীর আট আনা অংশ পাইব, আর আপনি একক আট আনা ভোগ করিবেন। আমাদের অন্ন নির্ব্বাহ হইবে কিরূপে?' ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা শ্রবণ করিয়া ইমামদ্দী বলিলেন,–"আমার অংশ হইতে আরও দুই আনা অংশ তোমরা প্রাপ্ত হইবে। অদ্য হইতে তোমরা দশ আনা ও আমার বংশধর ছয় আনা অংশ ভোগ করিবেক।"

নৈমুদ্দীন পুত্রগণ মধ্যে প্রথম দুইটী এক স্ত্রীর গর্ভজাত, অপর দুইটী অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত। এই জন্য তাহার সম্পত্তি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া বড় পাঁচ আনি ও ছোট পাঁচ আনি নামে প্রসিদ্ধ হয়। ইমামদ্দীর এই সদাশয়তা এস্থলে প্রকৃতভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইতিপূর্ব্বে মুন্সী ইমামদ্দী, সেক কালুর বংশধরগণ হইতে পাকে প্রকারে কার্ত্তিকপুর পরগণার কতকাংশ আত্মসাৎ করেন, কিন্তু তীক্ষ্ণদৃষ্টি নবাবের দেওয়ান রাজবল্লভের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারিলেন না। ইমামদ্দী নবাবী সেরেস্তায় নাম পত্তন করিবার পূর্ব্বেই রাজবল্লভ উহা স্বীয় জমিদারীর অন্তর্গত করিয়া লন। কিন্তু তথায় যাইয়া সম্যক্ অধিকার সংস্থাপনের কোন সুযোগ প্রাপ্ত হন না। এদিকে ইমামদ্দী স্বীয় ক্ষমতায় ঐ জমিদারী দখল করিয়া লন। পাছে উহার অংশও ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রাপ্ত হন, এজন্য স্বীয়স্ত্রী চাঁদবিবির নামে এক হোবানামা (দানপত্র) রাখিয়া যান। জহরদ্দী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও পরে আরোগ্য লাভ করেন। তখন খুল্লতাতের স্বোপার্জ্জিত বিষয়ের প্রতিও তাঁহার লোভ জন্মিল। কিন্তু অন্য কোনরূপ সুবিধা প্রাপ্ত না হইয়া রাজা রাজবল্লভের পুত্র গোপালকৃষ্ণ বাহাদুরের শরণাপন্ন হইলেন।

জমিদারীর মালিক হইয়াও রাজবল্লভ তাঁহার জীবদ্দশায় উহা সম্যক্ হস্তগত করিতে পারেন নাই। এখন মুন্সীগণের গৃহবিচ্ছেদ অবলম্বন করিয়া গোপালকৃষ্ণ উহা অধিকারে আনয়ন করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হইলেন। রায় গোপালকৃষ্ণ বহু সংখ্য দেশী লাঠিয়াল ও হিন্দুস্থানী সিপাহীদ্বারা কার্ত্তিকপুর অধিকার করিবার জন্য মুন্সীপক্ষকে আক্রমণ করিলেন। মুনসীদের পক্ষেও বহু লাঠিয়াল ও সিপাহী ছিল, তাঁহারা বাধা দিতে অগ্রসর হইল।* প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উভয় পক্ষের সমভাবে যুদ্ধ চলিল, কিন্তু পরিণামে মুন্সীপক্ষ পরাস্ত হইয়া পশ্চাৎপদ হন। বর্ত্তমান বাজারের পশ্চিমাংশে ঘড়িসারের খালের পারে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রক্তস্রোত খাল রঞ্জিত করিয়া মেঘনা নদীকে পর্য্যন্ত উহার অংশ প্রদান করিয়াছিল। হতাহতের সংখ্যা প্রায় সহস্রাধিক হইবে। এই হত ব্যক্তিগণের অনেকের মস্তক সংগ্রহ করিয়া গোপালকৃষ্ণ স্বীয় আবাস রাজনগরে, "রণদক্ষিণা" নামে দেবীর

* ইমামদ্দীর স্ত্রীর নাম চাঁদবিবি প্রবাদ–এই যুদ্ধ ঘটনার সময়ে স্বীয় পক্ষের সৈন্যগণের নিরুৎসাহ সন্দর্শনে, এই বীররমণী তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া যুদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত করান।

\+ কনকেশ্বর গ্রামের ভূম্যধিকারী জগবন্ধু চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী মমতাজকর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয়।

ঘট সংস্থাপন করেন। তদবধি কার্ত্তিকপুর পরগণা রাজনগরের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয়।

মুন্সী ইমামদ্দীনের তিন পুত্র, মনিরদ্দী, ওয়াহিনদ্দী ও ফৈজঙ্গী। মনিরদ্দীর কোন সন্তান না থাকার নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত গজারিয়ার ঠাকুর উপাধিধারী মোসলমান বংশ হইতে একটী পালকপুত্র গ্রহণ করেন, তাহার নাম হয় মমতাজউদ্দীন চৌধুরী। তিনি অত্যন্ত তেজীয়ান্ পুরুষ ছিলেন। মনিরদ্দী মুন্সী, হিন্দু ঠাকুরের প্রতি আস্থাবান্ ছিলেন। মনিরদ্দীর স্ত্রী বাকতেন্নেছা বিষয় কার্য্য পরিদর্শন করিতেন। তাঁহার যথেষ্ট নগদ সম্পত্তি ছিল। এই সম্পত্তির কথা অবগত হইয়া ইদিলপুরের জমিদার মাধবকৃষ্ণ রায় স্বীয় ডাকাইতের দলসহ কার্ত্তিকপুর উপস্থিত হইয়া বাকতেন্নেছার নিকট টাকা চাহিয়া পাঠান। কিন্তু তেজস্বিনী রমণী তাহাতে সম্মতা না হইয়া বাধা প্রদান করিতে উদ্যতা হন। কার্ত্তিকপুরের তৎকালীন প্রসিদ্ধ মল্ল জিন্দারপার রণ-কৌশল সন্দর্শন করিয়া মাধবকৃষ্ণ রায় দলবল লইয়া প্রস্থান করেন। জেন্দার পূর্ব্বে চণ্ডালজাতীয় লোক ছিল, পরে মোসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে। সে কার্ত্তিকপুর হইতে ঘড়িসারের নীলকুঠী পর্য্যন্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া দেয়। উহা অদ্যাপি জেন্দার খাঁর দরজা নামে প্রসিদ্ধ আছে। পরে জেন্দার নীলকুঠীর দেওয়ানী কার্য্য পর্য্যন্ত করিয়াছিল। বাকতেন্নেছার অনেক কীর্ত্তি চিহ্ন অদ্যাপি কার্ত্তিকপুরে বর্ত্তমান আছে! তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ্, তত্রত্য দীঘী, কাঠকুলী ও ভূমিসারের দীঘি তন্মধ্যে প্রধান।

ফৈজদ্দীর পুত্র ফেরউদ্দীন (দানুমিঞা) হিন্দুধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন। গলদেশে যজ্ঞোপবীত ধারণ ও হিন্দুর ন্যায় মহোৎসবাদি কার্য্য সম্পন্ন করিলে, পূণ্যার্জ্জন হয় বলিয়া তিনি ধারণা করিতেন। তাঁহার মনে বিশ্বাস ছিল তিনি শাপভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ, কর্ম্মবৈগুণ্যে মোসলমানগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ওয়াহিনদ্দীর পুত্র করিমদ্দী চৌধুরী, ফেরউদ্দীনের কন্যা ওমরজান বিবিকে বিবাহ করেন। করিমদ্দীর পুত্র নাজিমদ্দীন চৌধুরী, পৈত্রিক ও মাতামহের বিষয়সম্পত্তি লাভ করিয়া বার আনা অংশের মালিক হন। করিমদ্দীর সময়ে শরণখলা-নিবাসী শিবকান্ত কর দাসের প্রতিষ্ঠিত অষ্টধাতু-নির্ম্মিত কালীমূর্ত্তি* করিমদ্দীর ব্যয়ে বাজারের পশ্চিমাংশের হিন্দুপল্লীতে সংস্থাপিত হয়। পূর্ব্ব দেওয়ান রঘুনাথ চৌধুরীর কূল-পুরোহিত বংশধরগণের প্রতি ঐ দেবীর অর্চ্চনার ভার অর্পিত ছিল। মুন্সী করিমদ্দীর নিজ ব্যয়ে এই কালীবাড়ীতে দোল, চড়ক প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান হইত। তৎপুত্র নাজিমদ্দীন চৌধুরী, শালি খাঁর মুন্সী তাজিমদ্দীনের উপদেশে এই সকল হিন্দু-ধর্ম্মানুষ্ঠিত কার্য্য হইতে বিরত হন। করিমদ্দী চৌধুরীর সখের যাত্রা গানের দল পর্য্যন্ত ছিল। কার্ত্তিকপুর নিবাসী গোপীকান্ত চক্রবর্ত্তী এই দলের গান বাঁধিয়া দিতেন।

নাজিমদ্দীন চৌধুরী সম্পত্তির যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়া যান। রাজনগরের স্টেট্ পাঁচ অংশই দেনার দায়ে ও বাকি খাজনায় নিলাম বিক্রয় হওয়ায় বিভিন্ন ব্যক্তিগণ উহা খরিদ করেন। নাজিমদ্দীন সেই সমুদয় মালিকগণ হইতে ঐ সম্পত্তি পত্তনি লইয়া প্রায় সমুদয় পরগণা হস্তগত করিয়া গিয়াছেন। তন্নিবন্ধন দেশে তাঁহার আধিপত্য সমধিক বদ্ধমূল হইয়াছে। কার্ত্তিকপুরবাসী লইয়াও ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা তথাকার ভূমি বা প্রজার উপর কোনরূপ ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারেন নাই।

* এই কালী বর্ত্তমান সময়ে ধামারণ গ্রামে মুন্সীগণের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান মহেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাড়ীতে সংস্থাপিত আছেন।

ইঁহার সময়ে কার্ত্তিকপুরের যথেষ্ট উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে। ১২৮৪ সালে কার্ত্তিকপুর হইতে ঘড়িসার পর্য্যন্ত রাস্তা নির্ম্মাণ ও ১২৭৩ সালে ইংরাজি মাইনর স্কুল ইহা দ্বারা সংস্থাপিত হয়। ঢাকার নবাব আবদুল গণি সাহেবের পুত্র নবাব আসানুল্লা সাহেবের সহিত নাজিমদ্দীন চৌধুরীর এক তনয়ার পরিণয় কার্য্য সম্পাদিত হয়। তাঁহার গর্ভে আসানুল্লার পুত্র ঢাকার বর্ত্তমান নবাব সলিমোল্লা জন্মগ্রহণ করেন। পরে ঢাকার বর্ত্তমান নবাব বংশের সহিত এই চৌধুরী বংশের আরও আদান প্রদান কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে।

কি পারস্যভাষাবিৎ কি সংস্কৃতভাষাবিৎ উভয়বিধ পণ্ডিতগণের প্রতিই ইঁহারা সমান সম্মান প্রদর্শন করিতেন।

প্রবাদ মুন্সী ইমামদ্দীন জমিদারী লাভ ও বিদ্যা উপার্জ্জন শেষ করিয়া যখন দেশে প্রত্যাগমন করেন, তখন কার্য্য উপলক্ষে পথিমধ্যে নবদ্বীপে নৌকা রাখা হয়। তত্রত্য ব্যক্তিগণ তাঁহার দেশের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কার্ত্তিকপুরবাসী বলিয়া পরিচয় দেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণ উহা কোথায় বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু তত্রত্য পণ্ডিতসমাজ তৎক্ষণাৎ বলিলেন, বিক্রমপুর কার্ত্তিকপুর যেখানে রঘু বিদ্যাবাগীশের নিবাস? চৌধুরী বলিলেন হ্যাঁ, 'সেই কার্ত্তিকপুর।' এই কথা হইতেই তাঁহার মনে এই ভাবোদয় হইল যে কোন একজন কৃতী পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া যে কেবল আপনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকেন তাহা নহে, তাঁহার স্বদেশের নামও চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত করিয়া ঐ দেশটিকেও অমর করিয়া তুলে। ধন্য বিদ্যাবাগীশ! তোমাদ্বারা আমি পরিচিত হইলাম। ইমামদ্দী দেশে প্রত্যাগমন করিয়া সর্ব্বপ্রথমেই বিদ্যাবাগীশকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি উপস্থিত হইলে তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মানের সহিত আসন প্রদান করিয়া পরে নবদ্বীপের সমুদয় কথা বর্ণনা করিলেন। তদবধি তাঁহার জন্য চৌধুরী সরকার হইতে বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইল। কার্ত্তিকপুর হোগলা গ্রামের ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ এই বিদ্যাবাগীশের বংশধর।

মুন্সী চৌধুরী বংশের সকলের অবস্থা সমান না হইলেও এক নাজিমদ্দীন চৌধুরীর বুদ্ধিবলে তাঁহার সম্পত্তি উন্নতি সংসাধিত হইয়া এই প্রাচীন বংশের গৌরব অক্ষুণ্ন রহিয়াছে। তাঁহার পুত্র মুন্সী কফিলউদ্দীন চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত মুন্সী সেরাজদ্দীন চৌধুরী সর্ব্বসাধারণের পরিচিত। পূর্ব্ববঙ্গের মোসলমানগণ মধ্যে ইহাঁরা অতিশয় সম্মানিত।

## হোগলা

এটিও ভদ্রপ্রধান্ স্থান। এই স্থানে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের বাস অধিক। বৈদ্য বংশোদ্ভব দুর্গাপ্রাসাদ দাস বহু সৎকার্য করিয়া গিয়াছেন। তৎপুত্র দীনবন্ধু রায় খ্যাত লোক। এতদ্ভিন্ন গোবিন্দচন্দ্র দাশ মুন্সেফকোর্টের উকীল। সেন ও সরকার পরিবার সাধারণের পরিচিত। সেনবংশীয় কবিরাজ মহেন্দ্রচন্দ্র সেন সুশিক্ষিত ও সরকার বংশের রজনীকান্ত সেন একজন লেখক। হোগলার ভট্টচার্য্যবংশ প্রসিদ্ধ, কার্ত্তিকপুরের বিবরণে তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। এই গ্রামবাসী গোলকচন্দ্র সার্ব্বভৌম একজন প্রধান নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। বাস্তবিক পরগণার নাম ভিন্ন কার্ত্তিকপুর বলিয়া কোন গ্রামের পরিচয় নাই। মুন্সী চৌধুরীদের বাসনিবন্ধন হোগলাই কার্ত্তিকপুর বলিয়া খ্যাত হইয়া আসিয়াছে। কার্ত্তিকপুরের বাজারটী প্রসিদ্ধ।

## রাহাপাড়া ও শালদহ

ভ্রম বশতঃ এই উভয় স্থানের নাম পালং থানার অন্তর্গত স্থানগুলির মধ্যে লিখিত

হয় নাই। কতিপয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ এই গ্রামে বাস করিয়া থাকেন। রাহাপাড়ার জনসংখ্যা মোট ২৭৯ জন মাত্র। শালদহও প্রায় তদ্রূপ। রাহাপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায়গণ প্রসিদ্ধ। 'দহ' শব্দ যোগ থাকায়, শালদহ যে এক সময়ে জলনিমজ্জিত স্থান ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। শালদহনিবাসী গোকুলচন্দ্র দে একজন সম্পন্ন লোক ছিলেন।

**চাকদহ, নলতা ও দক্ষিণপাড়া**

কার্ত্তিকপুরের প্রাচীন ভূম্যধিকারীর বংশধরগণ অধুনা এই তিন গ্রামে বাস করিতেছেন। তাঁহারা বলেন তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ কীর্ত্তিধর বসু রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্যের নিমন্ত্রণ রক্ষা না করায় তৎকালীন সমাজপতিগণ দ্বারা কুলচ্যুত হন। কীর্ত্তিধরের বংশীয় কৃষ্ণগোবিন্দ রায় চৌধুরী কার্ত্তিকপুর সুজাবাদের মালিক ছিলেন। সদর রাজস্ব আদায় না করার কারারুদ্ধ হন, পরে অতিভোজনের দ্বারা বাদসাহের বিস্ময় জন্মাইয়া জীবিকাস্বরূপ কার্ত্তিকপুরের অন্তর্গত চাকদহ, ভূমিখাড়া, তেলিপাড়া, বারৈজঙ্গল, মাঐসার, পাচগাঁও, সুরেশ্বর এই সাতখানি মৌজা নিষ্কর প্রাপ্ত হন। আমাদের বিশ্বাস কৃষ্ণগোবিন্দ, চাঁদ ও কেদার রায়ের অধীনে কার্ত্তিকপুরের ভূম্যধিকারী ছিলেন। পরে কেদার রায়ের পতনের পর, যখন তদীয় সেনাপতি সেখ কালুকে এই স্থান মানসিংহ বাদসাহ সরকার হইতে প্রদান করেন, তৎকালে কৃষ্ণগোবিন্দকে মাত্র এই সাতখানি গ্রাম জীবিকানির্ব্বাহের জন্য প্রদান করিয়া অবশিষ্ট সমুদয় কালুকে প্রদান করা হয়। এই সনন্দ ঢাকা কালেক্টরির ২৬৪ তোজীভুক্ত ছিল, অধুনা ফরিদপুরের কালেক্টরীর নাখেরাজ জীবিকা ২১৭ (বি) বর্ণনায় গোবিন্দ রায় চৌধুরী বলিয়া লেখা যায়। ইহার মধ্যে কতক জমি ব্রহ্মাত্রা দান করায় ও ব্যয়নির্ব্বহার্থে কতক সম্পত্তি বিক্রীত হওয়ায়, এখন অতি অল্প মাত্র অবশিষ্ট আছে। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সে সম্পন্ন লোক ছিলেন, তাহার কতক প্রমাণ প্রাচীন ঝিটকা দালান, পিত্তলনির্ম্মিত লক্ষ্মীগোবিন্দ বিগ্রহ এবং একটী বড় দীঘিকার খাত দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। বাড়ীর চতুর্দ্দিকেই গড়খাই ছিল।

চাকদহের ঠাকুরতা উপধিবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় প্রসিদ্ধ। তাহাদের অনেক বৈষ্ণববিদ্যা আছে। এই বংশের রেবতীকান্ত ঠাকুরতা বি-এল, মুন্সেফী কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

সুলেখক ও বিবিধ গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘটক দক্ষিণপাড়া নিবাসী। নলতাগ্রামে একটি বৌদ্ধমূর্ত্তি দেখা যায়।

**রামভদ্রপুর**

প্রসিদ্ধ সিদ্ধপুরুষ গোসাঞি ভট্টাচার্য্যের জন্মস্থান বলিয়া সর্বসাধারণের নিকট এই স্থান সুপরিচিত। এই বংশের দ্বারা বহু কুলীন স্বগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, "গোসাঞি পিরাইওলায় সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন, ঐ বৃক্ষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।" এই বংশের বহু শিষ্য বর্ত্তমান দেখা যায়। গোসাঞি ভট্টচার্য্যের বিস্তৃত বিবরণ এই ইতিহাসের ১ম খণ্ডে লিখিত হইয়াছে, অতএব তৎসম্বন্ধে আর কোন আলোচনা করা

হইল না। রামভদ্রপুর মুন্সেফ চন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের জন্মস্থান।

## মামুদপুর

এই স্থানবাসী বৈদ্য চৌধুরীগণ এক সময়ে সম্পন্ন লোক ছিলেন। এই বংশের কবিরাজ বসন্তকুমার চৌধুরী কবিরঞ্জন কলিকাতায় প্রতিপত্তি লাভ করিয়া স্বীয় ব্যবসায় পরিচালন করিতেছেন।

## পণ্ডিতসার

এই স্থানে বহু ভদ্রলোক বাস করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে বৈদ্যবংশ প্রধান। তত্রত্য শিবচন্দ্র দাশ। প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। শরৎচন্দ্র দাশ, বি-এল ফরিদপুর জজকোর্টের একজন প্রধান উকীল। সার শব্দ যোগ থাকার বোধ হয় এই স্থানে বৌদ্ধ সংঘারাম ছিল।

## ঘড়িসার

এই গ্রাম দক্ষিণ বিক্রমপুরের পূর্ব্বসীমায় পদ্মা ও মেঘনার সঙ্গমস্থানের নিকট অবস্থিত। এই স্থানের হাট বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ, এখানে বহু ব্যবসায়ী লোকের বাস। এই স্থানের অনতিদূরে বারুণী ও অশোকাষ্টমীর সময়ে বহু লোক নদীসঙ্গমে স্নান করিয়া ব্রহ্মপুত্র স্নানের সমান ফল প্রাপ্তি জ্ঞান করিয়া থাকে। উহাই কমলাপুর ও বগিধলীর স্নান বলিয়া খ্যাত। এই পুস্তকের ১ম খণ্ডে গোসাঞি ভট্টাচার্যে প্রসঙ্গে এই বিষয় বিস্তারিত বলা হইয়াছে। স্নানের সময়ে এখানে মেলা মিলিয়া থাকে। এই স্থানেও বৌদ্ধ সংঘারাম থাকার সম্ভাবনা।

## মুলফৎগঞ্জ, পোড়াগাছা, বিলাসপুর

মূলফৎগঞ্জ একটি প্রধান বাণিজ্য স্থান। রবি ও বৃহস্পতিবার হাট বসিয়া থাকে। একটি মাদ্রাসা, একটি পাঠশালা ও ব্রাঞ্চ পোষ্টাফিস বর্ত্তমান আছে। মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মৌলবী মহম্মদ ফাজেল হাফেজ সাহেব আরবী ও ফারসী ভাষায় অতিশয় বিদ্বান। সমগ্র কোরাণ তাঁহার কণ্ঠস্থ।

ইংরেজ অধিকারের প্রথম সময়ে দক্ষিণ বিক্রমপুরের মধ্যে গোকুলগঞ্জ নামক স্থানে প্রথম থানা সংস্থাপিত হয়, পরে প্রাচীন পদ্মা কর্তৃক এই স্থানের ধ্বংশ সাধিত হইলে, উহা মূলফৎগঞ্জে পরিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু অত্যল্পকাল মাত্র তথায় থানা থাকিয়া, পরে পোড়াগাছা গ্রামে উঠিয়া যায়। পোড়াগাছার ধ্বংস সাধন না হওয়া পর্যন্ত থানা (পুলিশ ষ্টেশন) তথায় ছিল, কিন্তু উহা বরাবর মূলফৎগঞ্জ থানা নামেই কথিত হইত। পোড়াগাছার পোষ্টাফিসের নামও মূলফৎগঞ্জ পোষ্টাফিস ছিল।

পোড়াগাছার বিশেষ বিবরণ এই পুস্তকের ১ম খণ্ডে উল্লেখ করা হইয়াছে, এজন্য আর বলিবার আবশ্যক নাই। বহুদিন পূর্ব্বে পোড়াগাছাতে একটি মুনসেফী অফিস ছিল। নিত্যানন্দ গাঙ্গুলি মুনসেফ ছিলেন[১]। উহা উঠিয়া নদীর উত্তর পারে বহর গ্রামে পরিবর্ত্তিত হয়। এই স্থানের একটি বিখ্যাত কবিরাজের নাম উল্লেখযোগ্য। কবিরাজ রামলোচন সেন

---

(১) একখানি প্রাচীন দলিলে দৃষ্ট হয়, "চৌকী মূলফৎগঞ্জ মোকাম পোড়াগাছা জিলা ঢাকা বৈঠক শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসু মুনসেফ, সন ১৮৫৪ ইং ২৯ নবেম্বর মোতাবেক সন ১২৬১ বাং ১৫ অগ্রহায়ণ। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে পোড়াগাছার বিস্তৃত বিবরণ লেখা হইয়াছে।

কবীন্দ্র, বৈদ্যকুলোৎপন্ন পণ্ডিত ছিলেন। ইহার সান্নিধ্যে বিলাসপুরগ্রামে দীর্ঘলালশ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতের বাস ছিল। নিত্যানন্দ গাঙ্গুলী মহাশয়ের একটি সুন্দর উদ্যান এই স্থানে দৃষ্ট হইত। জয়দেবপুরের রাজজামাতা স্বর্গীয় রাসমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ও প্রধান বৈরাকরণ উদয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জন্মস্থান। পোড়াগাছা ও বিলাসপুর নদীগর্ভস্থ হইয়াছে।

## কেদারপুর

সুপ্রসিদ্ধ কেদার রায় এই স্থানে একটি বৃহৎ বাড়ীর পত্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু উহার সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। বাড়ীর চতুর্দ্দিকে যে পরিখা খনন করাইয়াছিলেন, উহার চিহ্ন ও কতকগুলি ইষ্টক নানাস্থানে বিভিন্ন হইয়া রহিয়াছে। দেখিলে স্পষ্ট অনুমান হয় কোন বড় লোক এই স্থানে বাসস্থাপন করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। বিক্রমপুরাধিপতি কেদার রায়ের নামেই যে, এই স্থানের নাম হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অধুনা এই স্থানে অনেক ব্যবসায়ী লোক ও ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন। এক সময়ে এই গ্রামে গোবিন্দ সাহা নামে এক জন ধনী লোক ছিলেন, তাঁহার বাড়ীতে ঝুলন যাত্রার সময়ে মহাসমারোহ হইত। মেঘনার পূর্ব্বতীরবর্ত্তী চাঁদপুর বোধ হয় চাঁদ রায়ের নামানুসারে হইয়াছে।

## দিনাড়া

ইহা কার্ত্তিকপুরের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র স্থান। কার্ত্তিকপুরের প্রাচীন জমিদারবংশীয় প্রসিদ্ধ মন্তাজদ্দীন চৌধুরীর বংশধরগণের সহিত কাছারি দখল উপলক্ষে ঢাকার প্রসিদ্ধ জমিদার ওয়াইজ্ সাহেবের পক্ষীয়, কাজী উপাধিধারী একজন কর্ম্মচারীর ভয়ানক দাঙ্গা হয়। উহাতে জপ্সাবাসী মুল্লুকচাঁদ সর্দ্দার নামে একটি লোক হত হইয়াছিল। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ নবীনচন্দ্র সেন মাদারীপুরের সবডিভিসানেল অফিসার ছিলেন। তদ্বিরচিত "আমার জীবন" নামক গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে "একটি খুন" বলিয়া যে গল্প রহিয়াছে, উহা ঐ খুনের মোকদ্দমা উপলক্ষ করিয়া লিখিত হইয়াছিল বলিয়াই অনুমিত হয়। এই মোকদ্দমার মিথ্যা তদন্ত উপলক্ষে পালং স্টেশনের যাবতীয় পুলিশের কর্ম্মচ্যুতি ঘটে।

এই স্থানে একটি হাট আছে, উহা গোপালগঞ্জের হাট নামে খ্যাত। রাজবল্লভের পুত্র, রায় গোপালকৃষ্ণের নামে উহার এই নাম হয়। উহার সন্নিকটে যুক্তিতলা বলিয়া যে স্থান আছে, প্রবাদ কার্ত্তিকপুরের সহিত রাজনগরের বিবাদ উপলক্ষে, রাজপক্ষীয় লোকেরা এই স্থানে বসিয়া, যুক্তি (পরামর্শ) করিয়াছিল বলিয়া উহার এই নামকরণ হয়।

## ধামারণ

এই স্থানের দেওয়ান উপাধিধারী তালুকদার মহেশচন্দ্র সেন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কার্ত্তিকপুরের মুন্সী চৌধুরীগণের দেওয়ানী কর্ম্ম করিয়া যথেষ্ট সম্পত্তি সঞ্চিত করেন। এই বাড়ীতে অষ্টধাতুনির্ম্মিত কালীমূর্ত্তি সংস্থাপিত থাকিয়া পূজিত হইতেছেন। ইহাদের কার্ত্তিকপুরের বাড়ী নদীগর্ভস্থ হইলে ইনি ধামারণ গ্রামে গৃহসংস্থাপন করেন।

সেন পরিবার ভিন্ন আরও কয়েক ঘর বৈদ্য এই গ্রামে বাস করিতেছেন। এইস্থানে কয়েক জন জ্যোতির্বিদ ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই গ্রামে একটি সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বৎসরান্তে এক দিন মেলা বসিয়া থাকে।

**নগর ও ফতেজঙ্গপুর**

উহাদের প্রাচীন নাম শ্রীনগর। আকবর বাদসাহের রাজত্বকালে এই স্থানে একজন ফৌজদার অবস্থান করিতেন। যদিও চাঁদ ও কেদার রায় এই প্রদেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন, তথাপি বর্ত্তমান রেসিডেন্টের নিয়ামানুসারে বাদসাহসরকারী এক একটি অফিসও উহার অনতিদূরে সংস্থাপিত থাকিত। যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজত্বকালে তদীয় রাজত্বের অন্তর্গত সুজানগর নামক স্থানে এবং ঈশা খাঁর রাজধানীর সন্নিকটে ঢাকাতে এইরূপ ফৌজদার বা থানাদার থাকার বিবরণ অবগত হওয়া যায়।

মোগলবাহিনীসহ রাজা মানসিংহের বিক্রমপুর শেষ আক্রমণ সময়ে তদীয় সরকারী কিলমক কেদার রায় কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া এই শ্রীনগরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মান-সিংহ তাঁহার উদ্ধারের জন্য উপনীত হন। এই যুদ্ধে কেদার রায় আহত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইলেন। কিছুদিন পরে জয়ের চিহ্নস্বরূপ মানসিংহ শ্রীনগরের পরিবর্ত্তে এই স্থানকে ফতেজঙ্গপুর আখ্যা প্রদান করেন। (১৬০২ খ্রীঃ অব্দ)।

ফৌজদারের অবস্থানকালে, এই স্থানের নিম্ন দিয়া কালীগঙ্গা নদীর এবং শাখাস্রোত প্রবাহিত হইত। উহার তটে বৃহৎ বন্দর সংস্থাপিত ছিল। এই সময়ে বহু হিন্দু মোসলমান নানাজাতীয় লোক এই স্থানে বাস করিত।

আমাদের বিশ্বাস মোসলমান বিজয়ের পূর্ব্বেও এই স্থানটিতে হিন্দু অধিবাসীর বাসস্থান ছিল। কারণ কতিপয় বৎসর অতীত হইল এই স্থানে পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার উপলক্ষে কতকটা স্থান খনিত হইলে তন্মধ্যে হইতে কতিপয় দেবমূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এইরূপ ধাতুনির্ম্মিত একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি এই লেখককর্ত্তৃক সাহিত্যপরিষদে প্রদর্শিত হইয়াছিল। তাহা অদ্যাপি তথায় বিদ্যমান আছে। উহা হিন্দু-রাজত্ব সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়াই প্রত্নতত্ত্ববিদগণ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

সম্ভবতঃ মানসিংহ ও কেদার রায়ের যুদ্ধ ঘটনার পর হইতেই এই স্থানের পতন হইয়াছে, কারণ যতদূর অবগত হওয়া যায় দেড়শত বৎসরের পূর্ব্বে যে কোন হিন্দু অধিবাসী এই স্থানে বাস করিত এরূপ অনুমান হয় না। প্রাচীন মোসলমান অধিবাসীর পরিচয়ও সেইরূপ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উহা রাজা রাজবল্লভের জমিদারীর অন্তর্গত হয়। রাজবল্লভের নিকট বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া রামদের জ্যোতির্ব্বিদ প্রথম এই স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। প্রবাদ এই স্থান নিবিড় অরণ্যানীতে পরিণত ছিল। উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে রামদেব ঐ জঙ্গল পরিস্কারের কার্য্য আরম্ভ করেন, কিন্তু কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় ঐ দিবস যে বাস্ত পূজা দিতে হইবে তিনি তাহা বিস্মৃত হন। পরে অপরাহ্নে আয়োজন করিয়া বাস্তু পূজা সমাপন করেন। ইহা হইতে অনুমান হয় যে বহুকাল অরণ্যে পরিণত থাকার পর সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে ফতেজঙ্গপুরে লোকের বাস আরম্ভ হয়।

এক সময়ে এই জ্যোতির্ব্বিদগণের পঞ্জিকার গণনানুসারেই পূর্ব্বে বঙ্গের দিন স্থির

ও হিন্দু-ধর্ম্মানুমোদিত সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইত। বঙ্গের পঞ্জিকা বিক্রমপুরের পঞ্জিকার সময় ধরিয়াই গণনা করা হইত। মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পঞ্জিকা সংস্কার-সমিতি হইতে যে পঞ্জিকা প্রকাশিত হইয়াছে, উহা পাঠ করিলেই তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। নিম্নে উহার সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। "পূর্ব্বে বিক্রমপুরে পঞ্জিকা প্রস্তুত হইত এবং বিক্রমপুরের সময় দেওয়া হইত। উজ্জয়িনী হইতে বিক্রমপুরের দেশান্তর দুই দণ্ড পয়ত্রিশ পল এবং উজ্জয়িনী হইতে কলিকাতার দেশান্তর দুই দণ্ড আট পল। বিক্রমপুর হইতে নবদ্বীপে পঞ্জিকা প্রস্তুত হইলেও দেশান্তর আর বদল হয় নাই। উজ্জয়িনী হইতে নবদ্বীপের দেশান্তর দুই দণ্ড চৌত্রিশ পল থাকিল ; এক্ষণে কলিকাতায় পঞ্জিকা প্রস্তুত হইতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রচলিত পঞ্জিকাসমূহের দেশান্তর বদল হয় নাই। সেই দুই দণ্ড চৌত্রিশ পল রহিয়া গিয়াছে। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকায় যে মহাবিষুব সংক্রান্তির সময় লিখিত হইয়াছে, তাহা উজ্জয়িনীর মহাবিষুব সংক্রান্তি সময়ে। উজ্জয়িনী হইতে কলিকাতার দেশান্তর দুই দণ্ড আট পল যোগ করিয়া আনয়ন করিয়া লিখিত হইয়াছে। কারণ রাঘবানন্দ যে দুই দণ্ড চৌত্রিশপল দেশান্তর স্থির করিয়াছেন, তাহা বিক্রমপুরের দেশান্তর, কলিকাতার নহে।"

আমরা বহু প্রাচীনগণ নিকট হইতে অবগত হইয়াছি, ফতেজঙ্গপুরের জ্যোতিষিগণ বহু পুরুষ যাবৎ ব্যবসায় করিয়া আসিতেছেন। চন্দ্রশেখরের পূর্ব্ববর্ত্তিগণও এই ব্যবসায় করিতেন। চন্দ্রশেখরের অগাধ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া রাজবল্লভ তাঁহাকে এই গ্রাম দান করেন। এ দেশীয় অন্যান্য সম্পন্ন লোকের নিকটেও তিনি এইরূপ আরও অনেক ভূবৃত্তি পাইয়াছেন। রাজবল্লভের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রশেখরকে যে ভূবৃত্তির সনন্দ লিখিয়া দেন তাহা পরিশিষ্ট সন্নিবেশিত হইল। এই বংশে বহু বিখ্যাত জ্যোতিষী জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে কাশীকান্ত বিদ্যালঙ্কারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মদনমোহন বিদ্যাভূষণের সহিত প্রায় উহার বিলোপ সাধিত হইয়াছে। পঞ্জিকা এখন আর প্রস্তুত হয় না। তৎপুত্র ঈশ্বরচন্দ্র কেবল জ্যোতিষী ব্যবসায় করিয়া থাকেন।

কীর্ত্তিনাশা কর্ত্তৃক মূলপাড়া গ্রামের ধ্বংশসাধন হইলে, তত্রত্য অধিবাসী বহু ব্রাহ্মণ এই স্থানের অধিবাসী হন। তন্মধ্যে কেদার রায়ের সৈন্যাধ্যক্ষ সর্দ্দার রাম রাজার বংশধরগণ ও মূলপাড়ার ভট্টাচার্য্যবংশীয়গণ প্রধান। রাম রাজার বংশধরগণ সর্দ্দার নামেই বিখ্যাত ছিলেন। মূলপাড়ার সর্দ্দার বলিতে তাঁহাদিগকেই বুঝাইত। বর্ত্তমান সময়ে উহারা পৈত্রিক চাটাতি ও চট্টোপাধ্যায় নামেই পরিচয় দিতে প্রয়াসী। এই বংশের দুর্গাচরণ ও কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। উভয়েই মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় মোক্তারি কার্য্য করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। প্রতি বৎসর তাঁহাদের ফতেজঙ্গপুরের বাড়ীতে মহাসমারোহে দীপান্বিতার সময়ে কালী পূজা হইত। উহাতে দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বিদায়দান করা এবং ভূরিভোজনের আয়োজন করিয়া সকল সম্প্রদায়ের লোককেই নিমন্ত্রণ করা হইত। এই বংশের শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায় এম,এ, বি,এল, জজকোর্টের উকীল ও জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য মহাশয় একজন তালুকদার। শ্রীশচন্দ্র মল্লিক কলিকাতা মাতৃভাণ্ডার নামক মনোহারি দোকানের স্বত্বাধিকারী, অন্নদাচরণ চক্রবর্ত্তী, বি,এল, উকীল। জপসার প্রধান বৈয়াকরণ হরচন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশের

পুত্র কালীমোহন বিদ্যাবাগীশ এই গ্রামে বাস করিতেছেন। এই বাড়ীতে কালীদেবী সংস্থাপিত আছেন।

শ্রীনগরের নাম ফতেজঙ্গপুর হইলেও, উহার একাংশ নগর নামে পরিচিত আছে। জপসা নদীগর্ভস্থ হইলে, এই গ্রামবাসী ঢাকার জজকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত এই স্থানে গৃহ সংস্থাপন করেন। জপসার অনেক বৈদ্য ও প্রাচীন জমিদারবংশীয়গণ অধুনা এই স্থানে বাস করিতেছেন। ব্যাঘ্রের নিবসতি স্থান এখন জনপদে পরিণত হইয়াছে।

জ্যোতির্ব্বিদগণের বাড়ীতে প্রাচীন অট্টালিকা ও মন্দির আছে। কয়েকটী প্রাচীন ভগ্ন প্রস্তরনির্ম্মিত বিগ্রহ ফতেজঙ্গপুরে দৃষ্ট হইয়া থাকে। জপসার লালাবাবুদের প্রস্তরনির্ম্মিত বিগ্রহগুলিও প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ এখন নগর গ্রামেই পরিদৃষ্ট হয়।

## সিরঙ্গল, কানুরগাঁ

বারভূঞার দল শক্তিহীন হইবার পর প্রত্যেক বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র সেনাবাস সংস্থাপিত হয়। পূর্ব্বে শ্রীনগরে কতিপয় সৈনিক মাত্র অবস্থান করিত। বাদসাহ সরকার হইতে অতঃপর ঐস্থান হইতে উঠাইয়া তন্নিকটবর্ত্তী কানুরগাতে সৈন্যবাসের জন্য এক কেল্লা সংস্থাপিত করা হয়। বাদসাহ সেলিমের (জাহাঙ্গীরের) নামানুসারে উহার নাম হয় সেলিমনগর। উচ্চারণের বৈষম্যতার সহিত উহা সম্প্রতি সিরঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। সিরঙ্গলের মধ্যবর্ত্তী বাগবাড়ী নামক স্থানে প্রকৃত কেল্লা ছিল।*

সিরঙ্গল গ্রামে বহু ব্রাহ্মণ ও অপরাপর হিন্দু ও মুসলমানের বাস ছিল। এই গ্রামের চক্রবর্ত্তী ও ঘটকগণ বিশেষ সম্পন্ন লোক ছিলেন। জপসা ও কানুরগাঁ নদীসীকান্ত হইবার পর ঐ স্থানের বহুলোক এই গ্রামে বাস করিতেছে। অথচ সিরঙ্গলের কতকাংশ নদীগর্ভস্থ হওয়ায় তত্রত্য কতক লোক অন্য গ্রামে চলিয়া গিয়াছে। জপসা ও কানুরগাঁর বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ, জপসার বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও জপসার বিল্বপুষ্করিণী ভট্টাচার্য্য বংশের কেহ কেহ ও জপসার শূদ্র ও অন্য সম্প্রদায়ের অনেকেই অধুনা এই স্থানে বাস করিতেছেন।

"শাণ্ডিল্য শ্রীকৃষ্ণ বেদভূষণের প্রপৌত্র প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ দুর্গারাম একজন সাধু প্রকৃতি লোক ছিলেন। তাঁহার বিশুদ্ধ চরিত্র, পাণ্ডিত্য ও দেবভাব দেখিয়া তাঁহার পৈত্রিক শিষ্যমণ্ডলী সকলেই তাঁহার অনুরক্ত হইয়া পড়েন। পিতৃব্যগণ একদিন কৌশল করিয়া জানাইলেন সে, দুর্গারাম পৈত্রিক শিষ্যরক্ষাব্যবসায় গ্রহণ না করিলে তাঁহাকে পৈত্রিক বিষয়ের ভাগ দেওয়া হইবে না। দুর্গারাম অসঙ্কুচিতচিত্তে পৈত্রিক শিষ্যসম্পদ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় জননীসহ কাশীবাসী হইবার ইচ্ছায় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিলেন। পথে কানুরগাঁয়ের কৃষ্ণাত্রেয় ন্যায়বাগীশের গৃহে মায়ে পোয়ে অতিথি হইলেন। ন্যায়বাগীশের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া তাঁহার একমাত্র কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া দুর্গারাম এইখানেই বাস করিলেন। এই কানুরগাঁয়ে বাসনিবন্ধন তাহার বংশধরগণ "কানুরগাঁয়ের বশিষ্ঠ" নামে খ্যাত। এই বংশে বহু পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কানুরগাঁয়ের বৈদিক সম্প্রদায় মধ্যে পদ্ম চক্রবর্ত্তী, ভৈরবচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, আনন্দচন্দ্র সার্ব্বভৌম, দুর্গাচরণ

---

* বাগবাড়ী জপসার লালাবাবুদের কৃষ্ণরামসেনতালুকের অন্তর্গত বলিয়া কাগজপত্রাদিতে উল্লেখ করা যায়। ইহার চতুর্দ্দিক গড়ে পরিবেষ্টিত ছিল।

স্মৃতিতীর্থ, হরিদাস বিদ্যারত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণের নাম উল্লেখযোগ্য।

কানুরগাঁতে রাঢ়ীশ্রেণীর কুশারী এবং বটব্যাল শ্রোত্রিয় ও কয়েক ঘর কুলীনবংশজ বাস করিতেন।

বারেন্দ্রশ্রেণীর রায়পরিবার কানুরগাঁর অন্তর্গত বকসীবাজার পল্লীতে বাস করিতেন। গৌরসুন্দর রায় ঢাকার একজন শ্রেষ্ঠ মোক্তার ছিলেন। স্বদেশের অনেক জমাজমি ক্রয় করিয়া তালুকদার বলিয়া গণনীয় হন। তাঁহার বাড়ীতে একটি উচ্চ মৃত্তিকানির্ম্মিত দোলমঞ্চ ছিল। দোলোৎসবের সময়ে সমারোহ হইত। এই মহানুভবের জ্যেষ্ঠপুত্র গোবিন্দচন্দ্র রায় বহুকাল যাবৎ আগরাতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। তিনি একজন সুকবিও বটে।–

"নির্ম্মল সলিলে বহিছে সদা, তটশালিনী সুন্দর যমুনে ও।"

"কত কাল পরে বল ভারত যে, দুখ সাগর সাঁতারি পার হবে।"

প্রভৃতি সঙ্গীত রচয়িতা এই গোবিন্দচন্দ্র রায়। বহুকাল বিগত হয় এই গানটি রচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু গোবিন্দের সেই বাঁশরীর সুতান আজিও লেখকের কর্ণে প্রবেশ লাভ করিয়া তাহাকে যেন অতীতের সেই স্মৃতিসাগরে নিমজ্জিত করিয়া ফেলিতেছে। গোবিন্দচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বঙ্গবিখ্যাত ঢাকা জজকোর্টের উকিল আনন্দচন্দ্র রায়। এই মহাত্মা ওকালতি ব্যবসায়ে কিরূপ তীক্ষ্মমনীষা-সম্পন্ন তাহা কাহারও অবিদিত নাই; কিন্তু সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় তদীয় ব্যুৎপত্তির বিষয় অনেকেই অনবগত। যাঁহারা আনন্দচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন, ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা এই ভাষাত্রয়ে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যলাভ হইয়াছে। এই বয়োবৃদ্ধ স্বদেশের পরিবারবিশেষের অবস্থা যেরূপ পরিজ্ঞাত, আজকালকার দিনে তদনুরূপ অনুসন্ধান লওয়া প্রায় কেহই প্রয়োজন মনে করেন না। এই মহাত্মা লেজিসলেটিব কাউন্সেলের মেম্বর-পদে নিযুক্ত হইয়া বর্ত্তমান সময়ে উহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমরা মাননীয় আনন্দচন্দ্র রায়ের দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি। কিন্তু আমাদের নিতান্ত ক্ষোভের কথা এই যে, এই উন্নত রায়পরিবার দক্ষিণ বিক্রমপুরের সহিত সমুদয় সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া সম্প্রতি ঢাকাতেই স্থায়ী বাসস্থান করিয়াছেন।

এই বক্সীবাজারের কুণ্ডুগণ একসময়ে দক্ষিণ বিক্রমপুর মধ্যে প্রধান ধনী বলিয়া গণনীয় ছিলেন। তিলিবংশমধ্যে তাঁহাদের মত সৌভাগ্যশালী এই দেশে আর কেহই ছিল না। মুজাপুর ইহাদের বিস্তৃত কারবার ছিল।

## লোনসিংহ

এই স্থানে অনেক ব্রাহ্মণ বাস করেন। কয়েক ঘর কায়স্থের মধ্যে দাসবংশীয় ভূম্যধিকারিগণ সুপ্রসিদ্ধ। এই বংশের বহুলোক ডিপুটীকালেক্টারের কার্য্য করায় তাঁহাদের বাড়ী ডিপুটীবাড়ী নামে বিখ্যাত। ইহাদের পূর্ব নিবাস কার্ত্তিকপুরের অন্তর্গত সিংহলমুড়ি গ্রামে ছিল। তৎপরে বুন্নাগ্রামে বাস স্থাপন করেন। ঐ গ্রাম নদীকর্ত্তৃক ভগ্ন হওয়ায় লোন-সিংহ গ্রামে সম্পত্তি ক্রয় করিয়া তথায় আসিয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন।

এই দাসবংশের আদিপুরুষ রামকেশব ঢাকার নবাববাড়ীর উকীল ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র, গঙ্গাহরি ও কালীশঙ্কর। গঙ্গাহরি ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ ধনী জমিদার জীবনবাবুর

বাড়ীর দেওয়ানীপদে এবং কালীশঙ্কর ঢাকা কালেক্টারীর মীরমুন্সীপদে কার্য্য করিতেন। গঙ্গাহরির পুত্র রামচন্দ্রদাস ও গৌরচন্দ্র দাস। কালীশঙ্করের পুত্র অভয়চন্দ্র দাস ও বঙ্গচন্দ্র দাস।

রামচন্দ্র দাস হইতেই এই বংশের প্রকৃত উন্নতির সূত্রপাত হয়। এই ভাগ্যবান্ পুরুষ কোন কার্য্যসূত্রে চট্টগ্রাম অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় সার হেনরী রিকেট সাহেব কর্ত্তৃক ১৮৪১ হইতে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে, চট্টগ্রামের নূতন বন্দোবস্ত হয়। তৎকালে রামচন্দ্র হেনরী রিকেটকর্ত্তৃক ডিপুটী কালেক্টারের পদে নিযুক্ত হইয়া কার্য্যে পারদর্শিতায় সাহেবের বিশেষ প্রিয়পাত্র হন। এই সময়ে অনেকগুলি ডিপুটী এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন ; কিন্তু রামচন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ছিলেন বলিয়া সকলে তাঁহাকে 'আলা ডিপুটী' বলিত। তৎসময়ের নিয়মানুসারে প্রথমশ্রেণীর ডিপুটীদের ৬০০ টাকা বেতন ধার্য্য ছিল। রামচন্দ্র তাহাত পাইতেনই, তদতিরিক্ত ভাতা বলিয়া আরও একশত টাকা প্রাপ্ত হইতেন। তদীয় চট্টগ্রামের বাসবভনে বহুলোক আহার প্রাপ্ত হইত। তাঁহার অনুরোধে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা গৌরচন্দ্রও ডিপুটী কালেক্টারের পদ প্রাপ্ত হন। ইহার বেতন ছয় শত টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ইনি বৃদ্ধবয়সে পেন্সিয়ান গ্রহণ করেন। রামচন্দ্র চট্টগ্রাম হইতে বদলী হইয়া কৃষ্ণনগর গমন করেন। তথায় এক বৎসর কার্য্য করার পর তিনি তথায় মৃত্যুমুখে নিপতিত হন। কৃষ্ণনগরে অবস্থানকালে তদীয় পুত্র প্রসন্নকুমার দাসের পরিণয় কার্য্য রাজা বসন্ত রায়ের বংশে সম্পাদিত হয়। প্রফুল্লকুমার চট্টগ্রামের কমিসনের অফিসের হেডক্লার্ক ও সেরেস্তাদার ছিলেন। অল্প বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হয়। রামচন্দ্র ও গৌরচন্দ্র উভয়েই রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন।

অভয়চন্দ্র দাস ঢাকার কমিসনর আফিসের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পরে ক্রমে এসিষ্টান্ট কমিসনরের পদ প্রাপ্ত হন। ইনি এই কার্য্যে তাহাতে অনেক কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। ঢাকার তৎকালীন যে কোন সৎকার্য্যের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিল। এই জন্য তাঁহার মৃত্যুর পব ঢাকা নর্থব্রুক হলে তাঁহার তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এসিষ্টান্ট কমিসনরী হইতে ডিপুটীকালেক্টারের পদে নিযুক্ত হইয়া কিছুদিন আলীপুরে কার্য্য করিয়া, প্রথম শ্রেণীর পেন্সিয়ান গ্রহণ করেন ও রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। লোনসিংহ গ্রামের স্কুল, রাস্তা, পোষ্টাফিস, দাতব্য ডাক্তারখানা ইত্যাদি এই মহাত্মার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। অভয়দাস লোনসিংহের প্রকৃত উন্নতির মূলপুরুষ ছিলেন। ইঁহার ছয়টী পুত্র। সকলেই কৃতবিদ্য ও কর্ম্মক্ষম। তন্মধ্যে প্রাণকুমার দাস ও ললিতকুমার দাস ডিপুটী কালেক্টর এবং অক্ষয়কুমার দাস মুন্সেফের কার্য্য করিতেন। প্রাণকুমার দাসের বিদুষী তনয়া আমোদিনী ঘোষ সুকবি। প্রাণকুমারের পুত্র লালবিহারী দাস বর্ত্তমান সময়ে ডিপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিতেছেন। গৌরচন্দ্র দাসের পাঁচ পুত্র উপযুক্ত, তন্মধ্যে চন্দ্রকুমার দাস ও সূর্য্যকুমার দাস ডিপুটী কালেক্টরের কার্য্য করিতেন। যাত্রা ও কবিগান রচয়িতা ও কবিতাকুসুম গ্রন্থ প্রণেতা রাসমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রামের লোক ছিলেন। তিনি সুন্দর যাত্রার পালা প্রস্তুত করিতে পারিতেন। প্রসন্নকুমারের পুত্র রাজবিহারী দাস একসময়ে ঢাকা প্রকাশ ও সারস্বত পত্রের সহকারী সম্পাদক ও সম্পাদকের কার্য্য করিতেন। লোনসিংহ স্কুলের পণ্ডিত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, লোনসিংহ হইতে ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে অবলা-বান্ধব নামে

একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন, এই দ্বারকানাথ পরে কাদম্বিনী বসু বি-এর পাণিগ্রহণ করেন। বর্ত্তমান সময়ে এই স্থানে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও টেলিগ্রাফ আফিস সংস্থাপিত হইয়া, জনসাধারণের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে।

নড়িয়ার ঘটক চৌধুরীগণের গুণানন্দী পরগণা নিলামে ক্রয় করিয়া, ইহারা স্বদেশে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ঘটক করুণাচরণ বিদ্যাসাগর ও দুর্গাচরণ তর্কলঙ্কার প্রভৃতি এই স্থানের প্রসিদ্ধ লোক। এই গ্রামের কৃষ্ণকান্ত শীল চিকিৎসা ব্যবসায়ে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন।

বিক্রমপুর মধ্যভাগ সমাজ ধুল্লা, নদীতে ধ্বংস হওয়ায় বৈদিক শুনক কৃষ্ণানন্দ বেদবিদ্যালঙ্কারের কনিষ্ঠ পুত্রের বংশধরগণ, নড়িয়া ও লোনাসিংহ গ্রামে বাস করিতেছেন। এই বংশে বহু পণ্ডিতের জন্ম হয়, বৈদিক কার্য্যে ইহারা সুদক্ষ ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রাণকৃষ্ণ শিরোমণি, গোবিন্দচন্দ্র বিদ্যারত্ন, চন্দ্রকান্ত চূড়ামণি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

## নরিয়া

এই প্রাচীন গ্রামটী বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ, পূর্ব্বে এই স্থান উত্তর ও দক্ষিণদিকে লম্বিত ছিল, প্রায় ৮০ বৎসর অতীত হইল, কীর্ত্তিনাশা নদীর প্রথম উদ্ভবের সহিত এই স্থানের প্রায় আট ভাগের সাত অংশ নদীগর্ভস্থ হয়। তজ্জন্য এই গ্রাম পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে লম্বিত হইয়া পড়ে। এই গ্রামের উত্তর সীমাতেই, প্রসিদ্ধ বন্দর আলা ফুলবাড়ীয়া বিদ্যমান ছিল, উহার বিলয়সাধনও সেইকালে ঘটিয়াছে।

রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সমাজে যে কয়েকটা মেলের পরিচয় আছে, তন্মধ্যে নরিয়া মেলের উৎপত্তি এই গ্রামের নামানুসারেই সংগঠিত হয়। কুলগ্রন্থে লিখিত আছে "গাঙ্গে গঙ্গাধরমেলো নরিয়া নাম বিশ্রুত।" এই গঙ্গাধর গাঙ্গুলীর দুই পুত্র, যদুনাথ পণ্ডিত ও রঘুনাথ বাচস্পতি। উক্ত বাচস্পতির কন্যাকে রাঢ়বাসী মাধ্যই মেলের লোকনাথ মুখোপাধ্যায় বিবাহ করেন, তজ্জন্য এই মেলের পালটী ও প্রকৃতি না থাকায় এই দলস্থগণের বরাবর মেলভ্রম করিয়া পরিণয় ব্যাপার সম্পাদিত হইতেছে। তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন মেলে কন্যাদান ও শ্রোত্রীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া স্বীয় স্বীয় মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। বাচস্পতির দৌহিত্রগণ ঘটক ভট্টাচার্য্য উপাধি গ্রহণ করিয়া, এই গ্রামের অধিবাসী হন। বাস্তবিক পক্ষে ইহারা প্রকৃত সাবর্ণ ঘটক বংশ।* কীর্ত্তিনাশার প্রথম আক্রমণের। সহিত, গ্রামের ক্ষীণতা আরম্ভ হইয়া, পুনরায় ঐ নদীকর্ত্তৃক ক্ষীণতর হইলে, এই ঘটকবংশের ও অন্যান্য অধিবাসিগণের মধ্যে অনেকেই এই স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তথাপি পালং থানার মধ্যে এই স্থানের বর্ত্তমান জনসংখ্যা অধিক। জাহাজঘাটার সহিত ইহার লোকসংখ্যা ৪৬৫১। ইহার মধ্যে পুরুষ ২০৬২ জন, স্ত্রী ২৫৮৯টি, হিন্দুর সংখ্যা ৩২১০ মোসলমানের সংখ্যা ১৪৪১।

রঘুনাথ বাচস্পতির তিন পুত্র, তাঁহাদের উপাধি ছিল, ঘটক সার্ব্বভৌম ঘটক শিরোমণি এবং ঘটক চক্রবর্ত্তী। উপাধি ব্যতীত ইহাদের প্রকৃত নাম অবগত হওয়া যায় না। বাচস্পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদুনাথ পণ্ডিত নরিয়া হইতে উঠিয়া যশোহর জেলার অন্তর্গত

* গোপী গাঙ্গুলী, প্রপিতনামা সাবর্ণগোত্রীয় বেদগর্ভের বংশোদ্ভব। এই মহাত্মা লক্ষ্মণ সেনের সময়ে বিক্রমপুর অবস্থান করেন, এই কিম্বদন্তী চলিয়া আসিতেছে।

নড়াইল সবডিভিসনের অধীন ব্রাহ্মণডাঙ্গা গ্রামে বাস সংস্থাপন করেন। তদ্বংশধরগণ অদ্যাপি ও তথায় বাস করিতেছেন।

এই সার্ব্বভৌমের পুত্র ঘটকরায়, ইঁহারও প্রকৃত নাম অবগত হওয়া যায় না। ঘটকরায়ের অপর দুই ভ্রাতার নাম, আদিত্য ও পুরন্দর। ঘটকরায় বিক্রমপুরাধিপতি কেদার রায়ের সহিত মিলিত হইয়া, মোগল সেনাপতি মানসিংহের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হন, এই জন্য মানসিংহ সংগ্রামে জয়ী হইয়া, ঘটকরায়ের ব্রহ্মত্র বাজেয়াপ্ত করেন। পরে রায়ের পৌত্র ইন্দ্রনারায়ণ কর্ত্তৃক উহার উদ্ধার সাধন হয়। রায় উপাধি ধারণের সহিত ইঁহারা ঘটকতা ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন।

দোস্ত ফিরিঙ্গী নামে এক পর্টুগীস, বণিক, নরিয়া গ্রামের একটি হীনবর্ণা রমণীর প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া, গ্রামের একাংশে বাস করিত। ইন্দ্রনারায়ণ রায়কে এই ব্যক্তি স্নেহের চক্ষে অবলোকন করিতেন। এই ফিরিঙ্গীর কোন সন্তান সন্ততি না থাকায়, আপন যাবতীয় সম্পত্তি অন্তিমকালে ইন্দ্রনারায়ণকে প্রদান করেন। এই অর্থ বলে ইন্দ্র, গুণানন্দী পরগণার বন্দোবস্ত গ্রহণ ও পৈত্রিক সম্পত্তি গ্রদবন্দর মধ্যে যে তালুক তাহাদের হস্তভ্রষ্ট হইয়াছিল, উহা উদ্ধারসাধন করেন।

ইন্দ্রনারায়ণের পুত্রগণের সময়ে দেয় রাজস্ব বন্ধ করায়, নবাবসৈন্য তাঁহাদিগকে অবরুদ্ধ করার মানসে, নরিয়াতে উপস্থিত হয়। রায়গণও উহাতে বাধা দিতে অগ্রসর হন, কিছু দিনের মধ্যেই নবাব প্রেরিত লোকেরা জয়ী হইয়া, ঘটক রায়গণের বাড়ী লুণ্ঠন করে, রায়গণ পলাইয়া অন্যত্র অবস্থান করিতে বাধ্য হন। এতৎসম্বন্ধে একটি গ্রাম্য গীত রচিত হইয়াছিল, উহার সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই, যেটুকু পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছি, তাহাই এই স্থানে সংযোজনা করা হইল।

"তরি পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি পড়ে রৈয়া
নৈরার ঘটক যুদ্ধ করে কচু বনে রইয়া,
ঘটক পলাইলরে নৈরার সোণার পুরী কারে দিলা রে।
দিন নাই ক্ষণ নাই রাত্রি অন্ধকার,
একুশ দিনে সোণার লঙ্কা হৈল ছারখার
ঘটক পলাইল রে–ইত্যাদি
তেতৈলের পাতে,
রঘু ঘটক তীর ছারে ডান হাতে বা হাতে
ঘটক পলাইল রে–ইত্যাদি,
* * *
লক্ষ্মীকান্ত ঠাকুর লৈয়া ফিরেন বাড়ী বাড়ী
* * *
গোপালের বালাখানা করল চুরমার।
ঘটক পলাইল রে নৈরার সোণার পুরী কারে দিলা রে।"

গুণানন্দী পরগণা যত দিন হস্তগত ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত ইঁহাদের প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল, এই পরগণা ঢাকা, ত্রিপুরা এবং ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত, ফরিদপুরের মধ্যে মোট পরগণার দুই আনা পরিমাণ অংশ হইবে। আত্মকলহ ইঁহাদের পতনের প্রধান কারণ।

নরিয়া পণ্ডিতপ্রধান স্থান, এই গ্রামের যাবতীয় উন্নতি ঘটক চৌধুরী বংশদ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। নানা শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ ইঁহাদের দ্বারাই সংস্থাপিত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে বহু উন্নত ও শিক্ষিত কুলীন সন্তান বিদ্যমান আছেন। মুন্সেফ শ্রীযুক্ত রেবতীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, বি-এল, ও উকীল শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বি-এল, প্রভৃতি এই গ্রামবাসী। অতীত সময়ে ঘটকবংশে বহু কৃতী লোক জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। শম্ভুচন্দ্র, শিবচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র, হরিপ্রসাদ রায়, উকীল রজনীকান্ত রায় ঘটক প্রভৃতি পরবর্ত্তী সময়ের প্রসিদ্ধ লোক। বর্ত্তমান সময়ে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ রায় প্রভৃতি যোগ্য ব্যক্তি বর্ত্তমান আছেন।

কয়েক বৎসর অতীত হইল, বঙ্গের একজন প্রধান মল্ল শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও তদীয় অনুজ শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল নরিয়া গ্রামে বাস স্থাপন করিয়াছেন। শ্যামাকান্তকে কে না অবগত আছেন, এই বীর পুরুষ বর্ত্তমান সময়ে সংসারাশ্রম হইতে দূরে অবস্থান করিয়া সোহং স্বামী নাম পরিগ্রহ করিয়াছেন। তদ্‌বিরচিত সোহং গীতা সর্ব্বসাধারণের নিকট আদৃত হইয়াছে।

নরিয়ার যে অংশ সিকস্ত হইয়াছিল, অধুনা উহার আবার পয়স্ত হইয়া লোকের বাসোপযোগী হইয়াছে, এই গ্রামের নিকটেই প্রসিদ্ধ আলা ফুলবাড়ীয়া গ্রাম বিদ্যমান ছিল, পরে নদীকর্ত্তৃক ভগ্ন হয়, সম্প্রতি বসাকের চর বলিয়া যে স্থানটির পরিচয় হইয়াছে, অনেকের বিশ্বাস উহাই প্রাচীন আলা ফুলবাড়ীয়া। চর নরিয়ার লোকসংখ্যা ৪৬২ ও বসাকের চরের লোকসংখ্যা ১৩৮২। আমাদের বিশ্বাস নবীপুর নামে যে একটি গ্রাম ছিল, যথায় সর্ব্বপ্রথম ত্রিনাথের মেলা বসে, বসাকের চর মধ্যে কতকটা ঐ নবীপুরের পয়স্ত ভূমির অংশ হইতে পারে; নরিয়াতে একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল, সম্প্রতি উহার কতকটা অবনতি ঘটিয়াছে। স্থানীয় সিদ্ধেশ্বরীতলা ও গোপালদেব প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া প্রচলিত। নিকটবর্ত্তী স্থানবাসীগণ আজিও মানস করিয়া তাঁহার পূর্জার্চ্চনাদি করে। পালা অনুসারে গ্রামবাসীগণ দ্বারা গোপালের অর্চ্চনা হইয়া থাকে।

অনেক ধনী ব্যবসায়ী এই গ্রাম হইতে উঠিয়া পালং ষ্টেশনের নানাস্থানে যাইয়া গৃহসংস্থাপন করিয়াছেন। নরিয়াতে অনেক লগ্নাচার্য্যের বাস, তন্মধ্যে হরিঠাকুরের এক যাত্রার দল ছিল, অধুনা তাঁহার পুত্র চন্দ্রকান্ত এই দল চালাইতেছেন।

### ভোজেশ্বর ও মসুরা

ভোজেশ্বরও বহুকাল যাবৎ বিখ্যাত ছিল। এই গ্রামটী বেদগর্ব্ভ সেনের বংশধরগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। তন্মধ্যে যে অংশ জপসার নীলকণ্ঠ সেনের ভাগে পতিত হয়, উহা জপসার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া ছয়পাড়া ও লালারবাগ নামে পরিগণিত হয়। ভোজেশ্বরের অপরাংশ রাজনগরের শ্রীকৃষ্ণ সেনের বংশে বিভক্ত হইয়া যায়। এই জন্য কৃষ্ণজীবন মজুমদারের বংশধর, রাউত পাড়ার মজুমদার ও পশ্চিম পাড়ার সেন সকলেরই এই গ্রামে সম্পত্তি ছিল। রাজবল্লভের বংশধরগণ কর্ত্তৃক এই গ্রামে একটী হাট স্থাপিত হয় ; এই হাটে বিস্তর কাপড় ও গামছা বিক্রয় হইত। মসুরার দীঘীটীও রাজবংশের খনিত বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

এই উভয় স্থানে বহু ব্রাহ্মণ ও তিলির বাসস্থান ছিল। এক সময়ে মসুরার তিলিগণ ধনে মানে তাঁহাদের সমাজ মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল ; একটি আশ্চর্য্যের কথা এই যে, এ দেশের তিলি মাত্রই বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু মসুরার পাল উপাধিধারীগণ শাক্ত সম্প্রদায় ভুক্ত। ইহাদের বাড়ীতে, কালীপূজা ও দুর্গোৎসব ইত্যাদি সমারোহে সম্পন্ন হইত। অধুনা এই শাক্তগণ মধ্যে অনেকেই বৈষ্ণব মতালম্বী হইয়া পড়িতেছে।

অধুনা ভোজেশ্বরের পালগণ এই দেশের একঘর প্রধান ধনী ও ভূম্যধিকারী। রামচন্দ্র, রামলোচন, হরিশ্চন্দ্র এই তিন ভ্রাতা নিজ নিজ অধ্যবসায়ে ও কষ্ট সহিষ্ণুতার সহিত, ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া এই উন্নতির ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। বাখরগঞ্জের অন্তর্গত মধিপুর একটী প্রসিদ্ধ প্রাচীন বন্দর ছিল, উহা জপসার লালা বাবুদের অধিকার ভুক্ত থাকিলেও মিঃ মনোরো উহার ইজারাদার ছিলেন। মধিপুরবাসী রামকানাই সাহা এই স্থানের প্রধান ব্যবসায়ী ও ধনী মহাজন, পাল ভ্রাতৃগণ তাহার আশ্রয়েতে প্রথম বাণিজ্য কার্য্যে আরম্ভ করেন। উত্তরোত্তর তাহাদের ভাগ্যলক্ষী পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল, এই সময়ে নদী কর্ত্তৃক এই বন্দরটীর ধ্বংস সাধন হইলে, সেলিমাবাদ পরগণার জমিদার কলিকাতাবাসী রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর তদীয় পরগণার সদর কাছারি গুরুধামের নিকটবর্ত্তী ঝালকাঠী নামক স্থানে বন্দরটী আনয়ন করেন। এই সময় হইতে পালগণের পূর্ণ উন্নতির সূত্রপাত হয়। তৎপর কলিকাতাতে তাহারা এক কারবার খুলিয়া, ঝালকাঠীর কারবারের সহিত একীভূত করিয়া ধনাগমের উপায় করিয়া লন। পাল ভ্রাতৃত্রয় অর্থার্জ্জনের সহিত বিবিধ সদব্যয়ের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। মহোৎসব ও মহাভারতাদি পুরাণ পাঠ উপলক্ষে বহু টাকা খরচ করিয়াছেন। ইঁহাদের মৃত্যুর পর, তাঁহাদের উত্তরাধিগণ শ্রাদ্ধ ব্যাপারে নানাদিক দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করিয়া দান সাগরের ব্যবস্থা করিতে ক্রুটী করেন নাই। কিন্তু দেশীয় সাধারণের উপকার জনক এমন কোন কার্য্য এ পর্য্যন্ত সংসাধিত হয় নাই, যদ্দারা এই পালগণ স্মরণীয় হইতে পারেন। রাজকুমার পাল, হরলাল পাল এবং হীরালাল পাল প্রভৃতি এই বংশের প্রধান ব্যক্তি। নদীকর্ত্তৃক ইহাদের ভোজেশ্বরের বাড়ী ভগ্ন হইবার পর, ইহারা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া মসুরাগ্রামে বাস করিতেছেন। কতিপয় বৎসর অতীত হয়, তাঁহারা নূতন বাড়ীর পুষ্করিণী খনন উপলক্ষে, কাল প্রস্তর নির্ম্মিত একখানা বাসুদেব মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন, পরে উহা যথানিয়ম সংস্থাপন করিয়া, অর্চ্চনার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। প্রাচীন ভোজেশ্বর হাটের নামানুসারে, মসুরাতে একটী বৃহৎ বন্দর পাল চৌধুরীগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ সম্প্রদার মধ্যে ভোজেশ্বরের বৈদিক, মসুরার মুখটীগণ প্রসিদ্ধ এতদ্ভিন্ন মৌলিক উপাধিধারী ব্রাহ্মণগণ অধুনা পরিচিত।

এই স্থানীয় বৈদিকগণ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, বশিষ্ঠ ও শাণ্ডিল্য। প্রথম বশিষ্ঠবংশের বিবরণ প্রদত্ত হইল। "বশিষ্ঠ-গোত্রীয় তপন তৎপুত্র গোবিন্দ উপাধ্যায়। বৈদিক কুলজ্ঞ ঈশ্বর বৈদিকের মতানুসারে অবগত হওয়া যায়, ১১৬৪ শব্দে গোবিন্দ বঙ্গে আগমন করেন। বঙ্গাধীশ্বরের নিকট হইতে তদীয় পৌত্র হলেশ্বর জয়াড়ি, চন্দ্রেশ্বর বা চন্দ্রশেখর গৌরালী এবং কনিষ্ঠ পৌত্র সিদ্ধেশ্বর অলাধি গ্রাম প্রাপ্ত হন। পদ্মার প্রচণ্ড স্রোতোবেগে এই তিনটী স্থানই সলিল গত হওয়ার পর চন্দ্রশেখরের সন্তানগণ,

ইদিলপুর, কানুরগাও ও ভোজেশ্বরে আসিয়া বাস করিতেছেন। এই বংশের পূর্ব্ব পুরুষগণ সকলেই সুপণ্ডিত ছিলেন। বর্ত্তমানেও অনেক পণ্ডিত এই বশিষ্ঠবংশে বর্ত্তমান আছেন।"

"গৌরালী সমাজ ভঙ্গের পর এই বংশীয় কার্ত্তিক উপাধ্যায়ের অপর পুত্র পরমানন্দ, ভোজেশ্বরবাসী হন। তাঁহার পৌত্র শ্রীহর্ষ উপাধ্যায় একজন অদ্বিতীয় শাব্দিক হইয়াছিলেন। শ্রীহর্ষের প্রপৌত্র-পুত্র দুর্গাদাস বেদাচার্য্য একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ছিলেন। তিনি বিক্রমপুরের জমিদারবর্গের নিকট প্রভূত বিত্ত লাভ করেন এবং বাস স্থানের চতুর্দ্দিকে গড় বেষ্টিত করিয়া লন। দুর্গাদাসের পৌত্র রঘুনাথ বেদান্ত বাগীশ একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান ছিলেন, মহারাজ রাজবল্লভ তাহাকে সাক্ষাৎ "বটুক ভৈরব" বলিয়া ভক্তি করিতেন। রঘুনাথের পুত্র গোবিন্দ দেব শিরোমণি, কৃষ্ণদেব স্মৃতিরত্ন। গোবিন্দের পুত্র ভবানীপ্রবাদ ন্যায়ভূষণ। ভবানীপ্রসাদের পুত্র নীলকণ্ঠ তর্কপঞ্চানন, রামরত্ন বিদ্যাবাগীশ ও কৃষ্ণচন্দ্র তর্কালঙ্কার। নীলকণ্ঠের পুত্র গঙ্গাপ্রসাদ, বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়ার দক্ষ ছিলেন। শাব্দিক রামরত্নের পৌত্র সুপ্রসিদ্ধ মহামহোপাধ্যায় তারিণীচরণ শিরোমণি; পূর্ব্ববঙ্গের পণ্ডিতগণের মধ্যে এই মহাত্মা সর্ব্ব প্রথমবারে গবর্ণমেন্ট হইতে এই উপাধি লাভ করেন। রামরত্নের অপর পৌত্র পার্ব্বতীনাথ বিদ্যাভূষণ। গঙ্গাপ্রসাদের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ গুরুচরণ ও কালীকিশোর। গুরুচরণ বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম সানুবাদ শুক্র নীতি প্রকাশ করেন তৎপুত্র চন্দ্রকিশোর বিদ্যানিধি, সম্প্রতি কলিকাতা টালাতে বাস করিতেছেন।"

শাণ্ডিল্য বৈদিকগণ ও প্রসিদ্ধ ছিলেন, এই বংশে বহু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে স্বর্গীয় কালীনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রকিশোর বিদ্যারত্ন একজন প্রধান বৈয়াকরণ ছিলেন। শ্রীযুক্ত কালীশচন্দ্র কৃতিতীর্থ এতদঞ্চলের একজন পুরাণবেত্তা কথক, তাঁহার বাগ্মিতা ও যথেষ্ট রহিয়াছে। এতদঞ্চলের জল আচরণীয় প্রায় সমুদয় হিন্দু এই বশিষ্ঠ ও শাণ্ডিল্য বংশের যজমান।

মসুরার মুখটী বংশের শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র মুখটী বি, এল মুন্সেফের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন এবং শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মুখটী বাঙ্গলা সাহিত্যের বিশেষ চর্চ্চা করিয়া থাকেন।

ভোজেশ্বরের তহবিলদার বংশ প্রসিদ্ধ ছিল, রাজনগরের রায়গোপাল কৃষ্ণের পুত্র দুর্গাপ্রসাদ বাবু ; তাঁহার আতাভাই এই তহবিলদার উপাধি লাভ করেন। রাজ-পরিবারের অনুগ্রহে তাঁহার যথেষ্ট ভূসম্পত্তি লাভ হয়, ইহাদিগকে সাধারণে ভূঞা বলিয়া সম্বোধন করিত। বাড়ীতে শিব প্রতিষ্ঠা ছিল, জলাশয়ে বাঁধা ঘাট ছিল, দুর্গাদালান ছিল। বর্ত্তমান ভোজেশ্বরের পালগণের পূর্ব্বপুরুষেরা পর্য্যন্ত ইহাদিগকে মান্য করিত। কাশীকান্ত তহবিলদারের সময় পর্য্যন্ত বাড়ীতে দশক্রিয়ার ব্যবস্থা ছিল। অধুনা অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে।

ধোপাবংশে রাধানাথ কীর্ত্তনীয়া একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুগায়ক ছিল, তাহার যাত্রার দল স্বদেশে বিশেষভাবে আদৃত হইত।

অধুনা ভোজেশ্বর সম্পূর্ণভাবে এবং মসুরার কতকাংশ নদীগর্ভস্থ হওয়ায়

ভোজেশ্বরের অধিকাংশ লোক এবং জপসার প্রসিদ্ধ সরকারবংশ এই মসুরা গ্রামে বাস করিতেছেন, অথচ মসুরার পালগণ মধ্যে অনেকে ধানুকা, দেভোগ প্রভৃতি স্থানে চলিয়া গিয়াছে। সরকার মহাশয়গণের পৈত্রিক তালুকের অনেক জমি মুসরা গ্রামে বিদ্যমান আছে।

## আক্‌শা

ভড্ডাপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, ভবানীশঙ্কর ঘোষাল নামে দুই ব্যক্তি, আক্‌শা ও ভড্ডাগ্রামে বাস করিতেন, তাঁহাদের পৃথকত্ব নিরূপণ জন্য দুইজনকে ঘোষাদের পরিবর্ত্তে গ্রামের নামে অভিধা দেওয়া হয়। আক্‌শাবংশ বহুকাল যাবৎ এই গ্রামে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের বিষয়সম্পত্তিও কিঞ্চিৎ রহিয়াছে।

এই বংশের কালীকান্ত চক্রবর্ত্তীর নাম উল্লেখযোগ্য। ১২২০ সনের আশ্বিন মাসে স্বগ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। পিতা রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দরিদ্র ছিলেন, পুত্রকে ভালরূপ লেখাপড়ার সুবিধা করিয়া দিতে পারেন নাই। কালীকান্ত স্বচেষ্টার কিঞ্চিৎ পারস্যভাষা অধ্যয়ন করিয়া, সেটেলমেণ্ট আফিসে পাঁচ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। তৎপরে কার্য্যের সাধুতায়, উপরিতন কর্ম্মচারিগণের মন আকৃষ্ট করিয়া ক্রমে ক্রমে একশত টাকা বেতনে প্রথম শ্রেণীর দারগার পদে উন্নীত হন। এবং পরে ডিটেক্‌টিভ বিভাগে নিযুক্ত হইয়া শত শত বদমায়েস গ্রেপ্তার করিয়া, তাহাদিগকে দণ্ডিত করেন। গভর্ণমেন্ট পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া, দুইশত টাকা পর্য্যন্ত করিয়া দেন। এতদ্ভিন্ন তিনি সময় সময় নগদ পুরস্কারও প্রাপ্ত হইতেন। ৪১ বৎসর গভর্ণমেন্টের অধীনে চাকুরি করিয়া ১২৫৮ সনে ৬৫ বৎসর বয়সে পেনসন গ্রহণ করেন। তৎপরে কাশীবাসী হইয়া ১৩০৫ সনের বৈশাখ মাসে কাশীধামে প্রাণ পরিত্যাগ করেন।

কালীকান্তের পুত্র তরণীকান্ত একজন উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক। নানা মাসিক পত্রিকায় তাঁহার লিখিত সন্দর্ভ বাহির হইয়া থাকে। কালীকান্তের ভ্রাতুষ্পুত্র মহিম চক্রবর্ত্তী (ইঁহারা এখন এই উপাধি গ্রহণ করেন) এক সময়ে আসামের একষ্ট্রা এসিষ্টান্ট কমিশনার ছিলেন।

ভোজেশ্বর নদী সিকস্ত হইলে এক ঘর বৈদিক তথা হইতে আসিয়া এই স্থানে বাস করিতেছেন। সপ্তশতী ব্রাহ্মণের পরিচয় এই গ্রামে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এতদ্ভিন্ন আরও কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই স্থানের অধিবাসী দেখা যায়।

## মগর ও চামটা

মগরে কয়েক ঘর বৈদ্য বাস করেন। তথাকার সেন পরিবার জমিদারী ও গবর্ণমেন্টের আফিসে কার্য্য করিয়া উন্নত হইয়াছেন। এই বংশের জগবন্ধু সেন নানাবিধ কার্য্য করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরাজকুমার সেন সুশিক্ষিত ও কলিকাতা দাসাশ্রম মেডিকেল হলের স্বত্বাধিকারী। এই বংশের কবিরাজ গুরুপ্রসাদ সেন ও তাঁহার অনুজ ঢাকার বিখ্যাত ডাক্তার রামপ্রসাদ সেন সাধারণের পরিচিত। রামপ্রসাদ সেন মহাশয়ের পুত্র মিঃ অতুলচন্দ্র সেন ব্যারিষ্টারি কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। অত্রত্য কায়

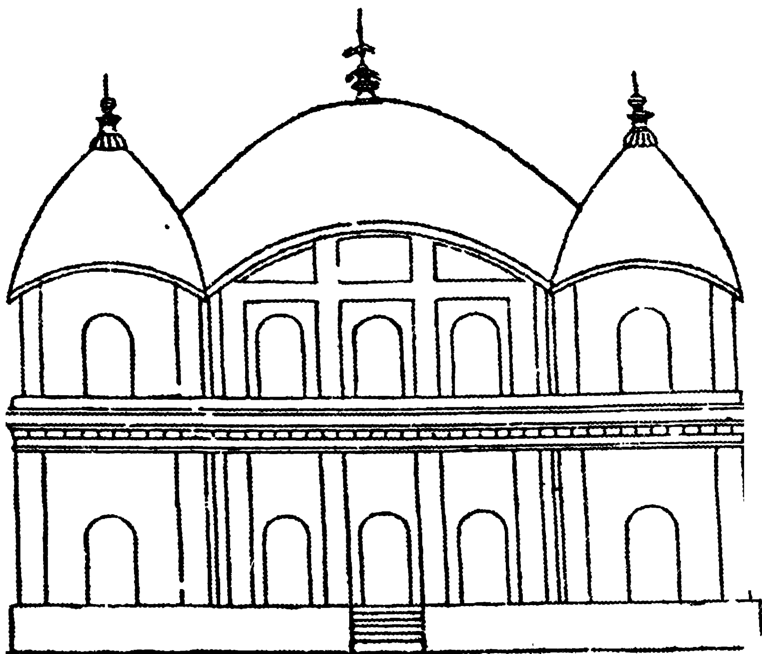
গুপ্তগণের পূর্ব্বনিবাস ছিল—জল্সা গ্রাম। এই বংশের হরিপ্রসন্ন গুপ্ত সবরেজিষ্টার ছিলেন।

চামটা ব্রাহ্মণ প্রধান স্থান। এই গ্রামবাসী ধনী মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। কায়স্থ সোমগণ এই স্থানের প্রাচীন অধিবাসী। "চামটা এখন 'তামটা' নামে পরিচিত হইতে চলিয়াছে।

## বিঝারি

একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই স্থানে বহু ব্রাহ্মণ বাস করেন, তন্মধ্যে ঘোষাল ও বাড়রীগণ তালুকদার ও প্রাচীন অধিবাসী। কায়স্থ করবংশও তালুকদার। ঘোষালগণের আদিম নিবাস ছিল। এই গ্রামের নিকটবর্ত্তী কান্দাপাড়া গ্রাম। তথায় ডাকাইতের উৎপাতে তিষ্ঠিতে না পারিয়া তাঁহারা বিঝারিতে বাসস্থাপন করেন। এই স্থানটী যে প্রাচীন তাহার কোন সন্দেহ নাই, কারণ বর্ত্তমান সময়ে কোনরূপ মৃত্তিকা খনন করিতে, ভূগর্ভ হইতে নানাবিধ প্রস্তরমূর্ত্তি ও ইষ্টক প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পূর্ব্বে এই স্থান রাজনগরের জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। এই জমিদারীর কতকাংশ খরিদ করিয়া, ঢাকাবাসী কাদের বক্স দারগা, কাছারি সংস্থাপন করেন, কিন্তু ঘোষালগণের সহিত দারগার কর্ম্মচারিগণের বিবাদ উপস্থিত হইলে, ঘোষালগণ



একটী দেবমন্দির (সেঘড়া)

তাহাদিগকে অপমানিত করিয়াছিলেন। এই সূত্রে দারগা লাঠিয়াল প্রেরণ করিয়া ঘোষালবাড়ী লুণ্ঠন করতঃ, রামদয়াল ও রামজীবন ঘোষালকে বন্দীভাবে টাকা লইয়া যায়। তাঁহারা কোনমতে পলাইয়া জীবন রক্ষা করেন। শুনা যায় প্রতিবেশী শত্রুর সাহায্যেই কাদের বক্স এই লুণ্ঠন কার্য্য করিতে সমর্থ হন। ঘোষল ও বাড়রী এই উভয় বাড়ীতেই প্রাচীন ইষ্টকালয় বর্ত্তমান আছে।

করবংশীয়গণ বহুকাল যাবৎ এই গ্রামে বাস করিতেছেন, তাঁহারাও তালুকদার। হরমোহন কর এই বংশের উন্নত লোক।

কালীগঙ্গার শাখা প্রশাখা দ্বারা অতি পূর্ব্বে এই অঞ্চল পরিব্যাপ্ত ছিল, উহার তীরে এই স্থানে একটি হাট বসে, পরে পয়ঃপ্রণালী বন্ধ হওয়ায় হাট উঠিয়া যায়। ঐ সময় হইতে বহু ব্যবসায়ী ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দু এই স্থানে অবস্থান করিতেছে। গুণাহারের আন্দী নামে এই স্থানে একটি জলাশয় আছে। আন্দী মাত্রেই পূর্ব্বে ও পশ্চিমে লম্বিত দেখা যায়।

জপসাগ্রাম নদীকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবার পরে তথাকার অধিবাসী বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই গ্রামে বাস সংস্থাপন করেন। তন্মধ্যে হরমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রমোহন ও আনন্দমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান সময়ে এই স্থানটির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। হাট, গ্রাম্য রাস্তা ও কালীদেবী প্রতিষ্ঠিত হইয়া গ্রামের সৌষ্ঠব সংসাধিত হইয়াছে। একটি উচ্চ ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়া গ্রামে ঔজ্জ্বল্য বৰ্দ্ধিত করিয়াছিল ; ঐ স্কুলটী উপসী গ্রামে উঠিয়া গেলেও বিঝারি স্কুল নামেই পরিচিত আছে। শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র ঘোষাল স্কুলের সেক্রেটারী। ভূতপূর্ব্ব পুলিস ইনস্পেক্টর প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই সকল উন্নতির মূল ছিলেন।

এই গ্রামে পূর্ব্ববঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ কথক ও সঙ্গীত রচয়িতা কৃষ্ণকান্ত পাঠক মহোদয় জন্মগ্রহণ করেন। তদ্বিরচিত অনেক ভাবোদ্দীপক গান আজিও হিন্দু ও ব্রাহ্ম এই উভয় সমাজেই শ্রুত হওয়া যায়। দক্ষিণ বিক্রমপুর সাহিত্য সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন এই গ্রামে হইয়াছে। সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায় উৎসাহী যুবক এই কার্য্যের একজন প্রধান উদ্যোক্তা। বিঝারিতে বহু সঙ্গীত রচয়িতার পরিচয় পাওয়া যায়। গানবাজনার আলোচনাও যথেষ্ট ছিল। চন্দ্রকুমার ঘটক একজন গ্রন্থকার, তদবিরচিত অষ্টবজ্র মিলন ও দিগম্বরী গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই গ্রামের ডেঙ্গুর ডাক্তার ক্ষতচিকিৎসার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। জপসাবাসী প্রধান শিল্পী প্রসন্ন মণ্ডল অধুনা এই গ্রামে বাস করিতেছে।

## ভড্ডা

এই গ্রামের ঘোষাল পরিবার প্রাচীন তালুকদার, তাঁহাদের নামের শেষে গ্রামের নামানুসারে ভড্ডা শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডুমুরিয়া হইতে ঘনশ্যাম ঘোষালের পিতামহ এই স্থানে বাস পরিবর্ত্তন করেন। তাঁহার পৌত্রের নাম ভবানীশঙ্কর ঘোষাল। আক্‌শা গ্রামে এই নামে আর একজন লোক বাস করিতেন। কর আদায়ের শৈথিল্য

হইলে নবাবসরকারী কর্ম্মচারী একের পরিবর্ত্তে অন্যকেও ধৃত করিয়া লইয়া যাইতেন। তাঁহারা এই বিপদবিমুক্ত হইতে চেষ্টা করিলে, নবাব-সরকারী কর্ম্মচারী তাঁহাদের ঘোষাল পদবীর পরিবর্ত্তে স্ব স্ব গ্রামের নাম যোগ করিয়া, ঘনশ্যাম ভড্ডা ও ঘনশ্যাম আক্‌শা বলিয়া ঠিক করিয়া দেন। অধুনা ইহারা পুনরায় ঘোষাল নামেই পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু সরকারী কাগজপত্রে ভড্ডা নামই ব্যবহৃত হয়।

এই স্থানে সোহাগ আন্দী নামে একটী পুরাতন জলাশয় আছে। কতিপয় বৎসর অতীত হয়, উহার ভিতরে একখানি প্রস্তর নির্ম্মিত বাসুদেব মূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। খোদাই পুকুর নামে আর একটী পুরাতন জলাশয় আছে, উহার মৎস্য যাহার ইচ্ছা হয় সে ধরিয়া লইতে পারে। এই নাম হইতে অনুমান হয়, কোন প্রধান মুসলমান এই জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন।

ভড্ডাতে দুইটি প্রাচীন মঠের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। তন্মধ্যে একটী ইষ্টক স্তূপে পরিণত হইয়াছে। তাহার নির্ম্মাণকর্ত্তার নাম অবগত হওয়া যায় না। দ্বিতীয়টী নম-শূদ্র বংশীয় ঠাকুর মণ্ডল তদীয় মাতৃশ্মশানোপরি প্রতিষ্ঠা করে।

ঘোষাল পরিবারে রত্নেশ্বর ভড্ডা ও ভগবান ভড্ডা পরিচিত লোক ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে এই গ্রামস্থ ভূতপূর্ব্ব নির্ম্মাল্য পত্রিকার সম্পাদক রাজেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি-এ, দক্ষিণ বিক্রমপুর সাহিত্য-সম্মিলনীর প্রথম উদ্যোগকারীগণের অন্যতম। রাজেন্দ্রনারায়ণ দ্বারা "স্বপ্ন ও তন্দ্রা" প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর কাব্যপুস্তক রচিত হইয়াছে। বিঝারি গ্রামের স্কুল, হাট ইত্যাদি প্রত্যেক দেশহিতকর কার্য্যে ভড্ডাবাসিগণ সহায়ক ছিলেন।

## দুলুখণ্ড

বর্ত্তমান সময়ে বহু লোকের বাসস্থান। প্রাচীন অধিবাসীর মধ্যে মুখোপাধ্যায় ও চক্রবর্ত্তী বংশের নাম উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বহু বৎসর পূর্ব্বে এতদঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎপুত্র রেবতীকান্ত মুখোপাধ্যায় একজন গ্রন্থকার। তৎপ্রণীত 'প্রাঞ্জল কবিতা' ও "একটি ফুল" নামক পদ্যগ্রন্থ এবং "অশ্রুবিন্দু" নামে একখানি উপন্যাস আছে। চক্রবর্ত্তী বংশে কালীচরণ তর্কালঙ্কারের নাম করা যাইতে পারে।

জপ্সা নদীগর্ভস্থ হওয়ার পর ঐ স্থানের কতিপয় ধনী ও শূদ্র এই স্থানে বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে পালগণের বড় ও ছোট বাড়ী প্রসিদ্ধ। শূদ্রগণ দুলুখণ্ডের দীঘীরপাড় বাস করিতেছে। এতদঞ্চলে মাত্র এই দীঘীর জল ব্যবহারযোগ্য আছে। রাজবল্লভের পুত্র রাজা গঙ্গাদাস, তৎপুত্র কালীশঙ্কর; তাঁহার কর্ম্মচারী রামমণি দেওয়ানকর্ত্তৃক সম্ভবতঃ এই জলাশয় খনিত হইয়াছিল। দেওয়ান বাড়ীর ভগ্নাবশেষ আজিও বিদ্যমান আছে।

## চান্দনী

এই স্থানের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ সমাজে প্রসিদ্ধ। ব্রাহ্মণ কুশারী মজুমদারগণের বাড়ীতে প্রাচীন অট্টালিকা বর্ত্তমান আছে। তাহাদের গুরু বেলপুকুরে ভট্টাচার্য্য বংশের

কেহ কেহ বিলম্ব পুষ্করিণী পরিত্যাগ করিয়া, এই স্থানে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। পরে তাঁহারা তথা হইতে বিক্রমপুরের বিভিন্ন গ্রামবাসী হইয়াছেন।

"বিশ্বম্ভর সুরের তিন কি চারি পুরুষ পরে রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্যের অভ্যুদয় হয়। তিনি গাভার ঘোষ বংশীয় পরমানন্দ ঘোষের সহিত আপনার এক তনয়ার বিবাহ দেন। ঘোষ স্বস্ত্রীক স্বালয়ে প্রস্থান করিলে, চন্দ্রদ্বীপ সমাজস্থ অপরাপর সামাজিকেরা তাঁহার সহিত সমাজ সামাজিকতা করিতে স্বীকৃত হন না। পরমানন্দ অনন্যোপায় হইয়া বনিতাসহ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার ভুলুয়াতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য তৎপ্রতিকারমানসে বদ্ধপরিকর হন। তৎকালে বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজে চন্দ্রদ্বীপের রাজা কন্দর্প নারায়ণের পুত্র রাজা রামচন্দ্র, যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য, বিক্রমপুরের কেদার রায় এবং ভূষণার মুকুন্দ রায়, এই চারি জন দলপতি ছিলেন। ভুলুয়াধিপতি এই চারি জন দলপতির অনুগ্রহপ্রার্থী হওয়ায়, সকলেই তাঁহার সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যেব বাড়ীতে কোন এক বিবাহ ব্যাপারে, এই সকল দলপতিরা নিমন্ত্রিত হইয়া, স্ব স্ব দল সহ ভুলুয়াতে আগমন করেন, কিন্তু বিক্রমপুরের সকল সামাজিক তাহাতে যোগদান করেন না। এই জন্য রাজগণের আদেশে এই উদ্ধত সামাজিকগণকে কুলচ্যুত করিয়া, ঘটকগণ তৎক্ষণাৎ একটী শ্লোক রচনা করেন, যথা–

"বেজগ্রামে স্থিতাঃ সর্ব্বে যে চতুর্ম্মণ্ডলে স্থিতাঃ।
চান্দনী চাকুলী যে চ নাস্তি তেষাং কুলং বুধা"॥

এই কারণে বিক্রমপুরস্থ বেজগাঁ, চতুর্ম্মণ্ডল, চান্দনী ও চাকুলীবাসী শ্রেষ্ঠ কায়স্থগণ কুলচ্যুত হন, এমন কি এই সকল স্থানে যদি কোন কুলীন আসিয়া বাসও করেন, তবে তাঁহারাও কুলচ্যুত হইয়া থাকেন। (বারভূঞা ১৪৯ ও ২৫০ পৃষ্ঠা)।

চান্দনী গ্রামের কতকাংশ কীর্ত্তিনাশার উদরসাৎ হইয়াছে।

## উপসী

মহারাজ রাজবল্লভ, এই স্থানে আর একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করিবেন মনে করিয়া, উহার চতুর্দ্দিক পরিখা খনন করাইয়াছিলেন, বিস্তর ইষ্টক ও তথায় নীত হইয়াছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইয়া উঠে না। বহুদিন পর্য্যন্ত উহা অরণ্যে পরিণত থাকিয়া ব্যাঘ্র, শূকর প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর আবাসে পরিণত ছিল, পরে রাজনগর ধ্বংসের পর, তথাকার প্রসিদ্ধ কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশের বংশধর স্বর্গীয় হরপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য জমিদার ও চন্দ্রশেখর তাকলাদার প্রভৃতি এই স্থানে গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের সহিত বহু জনগণ এই গ্রামবাসী হয়। পরে দেভোগের দেওয়ানবংশীয় রজনীকান্ত মুখটীও তথায় বাস স্থাপন করেন। এই মুখটী মহাশয় একজন পণ্ডিত লোক। উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রযত্নে বিঝারীর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় উপসীতে সংস্থাপিত হইয়া সাধারণের অধিকতর সংসাধিত হইয়াছে। উপসীতে একটী পোষ্টাফিস আছে।

## বাঘীয়া, কোটাপাড়া

এই স্থানে বহু ভদ্রলোক বাস করিয়া থাকেন। রাজনগরের ব্রাহ্মণ কাশ্যপবংশসম্ভূত, নবকুমার চক্রবর্ত্তী ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি এই স্থানে গৃহ-প্রতিষ্ঠা করেন। কোটাপাড়ার বৈদ্য মজুমদারগণের পূর্ব্ব নিবাস ছিল সোনার দেউল গ্রামে। তথায় এক ঘর প্রসিদ্ধ কায়স্থ মজুমদার বংশও বাস করিতেন। নদীকর্ত্তৃক সোনার দেউল ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, বৈদ্য মজুমদারগণ কোটাপাড়াবাসী হন। এই বংশের হরিশ্চন্দ্র মজুমদার, কোর্ট অব ওয়ার্ডের ম্যানেজার ছিলেন। তাঁহার প্রথম পুত্র প্রসন্নচন্দ্র মজুমদারকর্ত্তৃক "কৃষি কার্য্যের মত" নামক একখানা গ্রন্থ প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত হয়। বোধ হয় উহাই বঙ্গদেশের কৃষিসম্বন্ধীয় প্রথম পুস্তক হইবে। দ্বিতীয় পুত্র নবীনচন্দ্র সেন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেন। তৃতীয় পুত্র গিরীশচন্দ্র সেন সবরেজিষ্টার ছিলেন। এই বংশের কালীকিশোর সেন কবিরাজ ঢাকাতে সুখ্যাতির সহিত ব্যবসায় চালাইতেছেন।

অত্রত্য কায়স্থ ঘোষ পরিবার স্থানীয় প্রাচীন অধিবাসী ও তালুকদার ; হরেকৃষ্ণ ঘোষ এই বংশের প্রধান লোক ছিলেন। হাইকোর্টের ট্রানসলেটার মজুমদার শশীভূষণ বসুর মাতামহালয় এই গ্রামে। তিনি তথায় গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, কিন্তু অধুনা স্বদেশ চাদশীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

রাজনগরবাসী বহু কাঁসারী—এখন এই স্থানের অধিবাসী হইয়াছে। ব্যবসায় বাণিজ্যে তাহারা অনেকেই উন্নত। তন্মধ্যে নবচন্দ্র ও রঘুনাথের নাম উল্লেখযোগ্য।

## কুরাশী, দাসারতা

রাজনগরবাসী দেওয়ান রায় মৃত্যুঞ্জয়ের প্রধান কীর্ত্তিনিকেতন। এই স্থানে কএকটি প্রাচীন মঠ ও অনেকগুলি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠাপিত আছে। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি দীর্ঘিকা দৃষ্ট হয়। সেই সমুদয়ই রায় মৃত্যুঞ্জয়ের অর্থ দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অনেক দেবালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়। কিন্তু তাহার কোন অস্তিত্ব বিদ্যমান নাই। বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রবাদ, দেওয়ান উহাকে কাশী সদৃশ করিবার অভিপ্রায়ে কোটি শিব প্রতিষ্ঠার মনন করিয়াছিলেন। ঊনকোটি হইল বটে কিন্তু আর একটি আনীত হইলে সেইটী কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। কাজেই আর কাশী হইল না, নাম হইল কুরাশী। এই কথার যে কোন মূল্য নাই তাহা আর বলিতে হইবে না। বহুসংখ্যক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এইরূপ প্রবাদ রচিত হইয়াছে। শিবচতুর্দ্দশীতে এই স্থানে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। বহুকাল যাবৎ এই স্থানে কএক ঘর ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন, তাঁহারা কুরাশী উপাধি বিশিষ্ট।

রাজনগর নদীকর্ত্তৃক ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে, রায় মৃত্যুঞ্জয়ের বংশধর কালীপ্রসন্ন, তারাপ্রসন্ন ও রাধাবল্লভ বাবু প্রভৃতি এই স্থানে বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। তৎসহ অনেক বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ, কুরাশী ও তৎসন্নিহিত স্থানে বাস করিতেছেন। পোড়াগাছা ও জপসার কএক ঘর বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ অধুনা এই গ্রামবাসী হইয়াছেন।

দাসারতা গ্রামে একটী বাজার আছে। এই গ্রামবাসী নোয়াখালীর উকিল পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন প্রসিদ্ধ। তৎপুত্র বসন্তকুমার সেন,বি-এ, বি-এল, একজন

সুলেখক। তৎকৃত বৈদ্যজাতির ইতিহাস প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছে। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ রাজপাশা গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহারা তৎকালীন বিক্রমপুর পরগণার জমিদার বৈদ্য চৌধুরীগণের প্রধান অমাত্য পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই বংশে কয়েকজন পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে জগন্নাথ সার্ব্বভৌমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজপাশা নদীকর্ত্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহারা পোড়াগাছা গ্রামে, এবং তৎপরে ঐ গ্রামেরও ধ্বংস হইলে দাসারতা আসিয়া বাস করিতেছেন। রাজকুমার সেন মহাশয়ের এক কন্যা কাশীর পণ্ডিতগণ হইতে 'সরস্বতী' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা এই বিদুষীর উন্নতি ও কুশল প্রার্থনা করি।

## পালং

অধুনা পালং একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এই স্থানে গবর্ণমেণ্টের পুলিশ ষ্টেশন (থানা), রেজেষ্টারী আফিস, মুসলমান বিবাহের রেজেষ্টারী আফিস, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আফিস প্রভৃতি সংস্থাপিত আছে। একটি উচ্চ ইংরেজী স্কুল এবং দাতব্য চিকিৎসালয় (ডাক্তারখানা) সংস্থাপিত থাকায় উহার গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে। অতি পূর্ব্বে এই স্থানে কয়েক ঘর চক্রবর্ত্তী ও অধিকারী উপাধি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, নবশায়ক ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর বাস ছিল। অত্রত্য বৈষ্ণবগণের আখড়াতে ঝুলনযাত্রা হইত। এখানে একটি হাট ও পুলিশ আউটপোষ্ট (ফাড়ি) ছিল। অধুনা বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি এই স্থানের অধিবাসী হইয়াছেন।

রাজনগরের মহারাজ রাজবল্লভের বংশধরগণ ও রাজনগরস্থ তদীয় জ্ঞাতিগণ, ঐ স্থানীয় মুখটী, ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী উপাধিধারী সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণগণ এবং লরিকুলের ধনী সাহাগণ এই স্থানে বাসস্থাপন করায় উহার গৌরব সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরও বহু জনতাবৃদ্ধির সহিত স্থানটী একটি ক্ষুদ্র নগরবৎ প্রতীয়মান হয়। গ্রামের মধ্যে কয়েকটি রাস্তার অবস্থাও মন্দ নয়। এতদ্ভিন্ন এই স্থান হইতে একটি বিস্তীর্ণ রাস্তা বরাবর কার্ত্তিকপুর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে, অপর একটি প্রশস্ত রাস্তা বুড়ীর হাট পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইয়াছে। এই দুইটি পথের বিশেষভাবে সংস্কার সাধিত হইলে, পালং ষ্টেশনের অন্তর্গত বহু স্থানে গমনাগমন পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবার কথা।

এই গ্রামের শ্রীমতী আশালতা দেবী (সেন) সুশিক্ষিতা ও সুকবি।

বাবু রাধাবল্লভ সেন পালং বন্দরের মালিক। গ্রামের তলবাহী খাল বিস্তীর্ণ আকার ধারণ করিয়া উহার অনেকাংশ গ্রাস করিয়াছে, এই জন্য এই সুন্দর বন্দরটির অবস্থা শোচনীয় হইতে চলিয়াছে। এই স্থানে বিস্তর কাঁসারীর কারবার। রাধাগোবিন্দ বণিক এই বন্দরের প্রধান ব্যবসায়ী। লরিকুলের ধ্বংস সাধিত হইলে, ঐ স্থানের প্রধান ধনী প্যারীমোহন সাহা এইস্থানে বাস করিতেছিলেন, জলাবর্ত্তে তাঁহার বাড়ী পুনরায় নদীগর্ভে নিপতিত হইয়াছে।

অত্রত্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের অনেকের নাম ও বিবরণ রাজনগর প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইল। অতএব এখন উহা হইতে ক্ষান্ত থাকা হইল।

## বিলাস খাল

এই স্থানে অনেক বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাস করেন। সান্ন্যাল ও রায়বংশ প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের সংস্থাপিত কালীদেবীর মন্দিরে পূজা দিবার জন্য নানাস্থান হইতে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। এই স্থানের নবকিশোর শীল চিকিৎসা ব্যবসায়ে বিখ্যাত ছিলেন। অত্রত্য এই শীলবংশীয়গণ চিকিৎসার জন্য বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিয়াছেন। চৈত্রসংক্রান্তিতে সিদ্ধেশ্বরী কালীর বাড়ীতে একটি মেলা বসিয়া থাকে। এই গ্রামের অশ্বিনীকুমার আচার্য্য (ভূতপূর্ব্ব ইঞ্জিনিয়ার) ও মহিমচন্দ্র রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

## কাগদি

এই স্থানের চাটার্তিবংশ প্রসিদ্ধ। আনন্দমোহন চাটাতি তালুকদার। অতি প্রাচীন একটি ক্ষুদ্র মঠ এই স্থানে দৃষ্ট হয়।

## ধানুকা

এই স্থানটি বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ। পণ্ডিত ও বিষয়ী বৈদিকবংশ এই গ্রামের প্রধান অধিবাসী। ইঁহারা প্রসিদ্ধ ময়ূর ভট্টের সন্তান বলিয়া পরিচিত। এই ভট্ট সম্বন্ধে বহুবিধ কিংবদন্তী শ্রুত হওয়া যায়।

ময়ূর ভট্টের পিতামাতা তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইয়া নানাতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া পরে জগন্নাথদেবের সন্দর্শন জন্য পুরীধামে যাইবার জন্য অগ্রসর হন। এই সময়ে রথযাত্রা উপলক্ষে তথায় বহু লোক গমন করিতেছিলেন। এই ব্রাহ্মণ দম্পতি তাহাদের সঙ্গী হন। ব্রাহ্মণী পথিমধ্যে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। এই সময়ে তিনি এত দুর্ব্বল যে তাঁহার গাত্রোত্থানের শক্তি পর্য্যন্ত ছিল না। অথচ সঙ্গিগণ দস্যুর উপদ্রবের ভয়ে সেই রাত্রিতেই ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। তখন ব্রাহ্মণ মহাবিপদে পতিত হইয়া, এই আসন্ন বিপদ হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাইবেন তাহা ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণীকে লইয়া যাওয়াই সঙ্কট, তদুপরি শিশুর ভার কিরূপে বহন করিবেন। অনেক চিন্তার পরে স্ত্রীকে বহন করিয়া কোনরূপে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। সদ্যোজাত সন্তানটির প্রতি আর চাহিয়া দেখিবার অবসরও পাইলেন না। উভয়ে মনোদুঃখ কোনরূপে পুরীতে উপনীত হইলেন। সেই দিবস রাত্রিতে ব্রাহ্মণ স্বপ্নাদিষ্টে দেখিতে পাইলেন যে, একজন ব্রাহ্মণ তর্জ্জন করিযা বলিতেছেন, রে পাপিষ্ঠ তুই এখনই আমার পুরী হইতে বহির্গত হইয়া যা, অন্যথা তোর ভাগ্যে কখনই পুরুষোত্তম সন্দর্শন ঘটিবে না। যদি তুই সেই পরিত্যক্ত শিশুটিকে পুনরায় লইয়া আসিতে পারিস তবেই তোর আশা পূর্ণ হইতে পারিবে।

অন্য কাহাকেও কিছু না বলিয়া সেই ব্রাহ্মণ অতি প্রত্যুষেই সন্তানের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন, কয়েক দিন পরে তথায় উপনীত হইবামাত্র একটি ময়ূর সেই স্থান হইতে উড়িয়া প্রস্থান করিল। তিনি দেখিতে পাইলেন, শিশুটি তখনও জীবিত রহিয়াছে। তখন ভগবানের নাম স্মরণপূর্ব্বক তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া আনন্দাশ্রুতে প্লাবিত

হইয়া গেলেন। পরে পুনরায় পুরীধামে আগমন পূর্ব্বক সেই পুত্রটিকে স্বীয় বনিতার করে সমর্পণ করিলেন। মাতা হারানিধি পুত্রকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া যে কত পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন, উহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। ময়ূর কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া, এই শিশুর নাম রাখা হয় "ময়ূর"। পিতৃসহায়ে ময়ূর কালে কৃতবিদ্য হইয়া ময়ূরভট্ট নামে বিখ্যাত হন।

ময়ূর ভট্টের যশে আকৃষ্ট হইয়া অনেক বিদ্যার্থী তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতেন। প্রবাদ ময়ূর স্বীয় তনয়ার রূপবর্ণনা উপলক্ষে তাহার সর্ব্বাঙ্গের যথাযথ বর্ণনা করায়, কন্যাকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হন। তন্নিবন্ধন তদীয় অঙ্গে কুষ্ঠের সঞ্চার হয়। বার্দ্ধক্য দশায় উপনীত হইলে, তদীয় কতিপয় ছাত্র তাঁহাকে বাসস্থান কনোজ হইতে কাশীধামে লইয়া যান। এই সময়ে তদীয় "সূর্য্যশতক" বিরচিত হয় ও তিনি দিবাকরের অনুগ্রহে রোগ হইতে বিমুক্ত হন।

প্রবাদ এই ময়ূরের বংশোদ্ভব লক্ষ্মণ মিশ্র বঙ্গে আগমন করিয়া ধানুকা গ্রামে বাসস্থাপন করেন। এই কথা কতদূর সত্য তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। কেহ কেহ বলেন শ্রীহট্ট জেলার কোন ভট্ট ধানুকায় আগমন করিয়া এই বৈদিকবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই ভট্ট হইতেই ময়ূর ভট্টের কল্পনা করা হইয়াছে। বাস্তবিক যাহাই হউক এই কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় বৈদিকগণ যে স্বসমাজে বিশেষ সম্মান অর্জ্জন করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। ধানুকা, জপসা ও কানুরগার কৃষ্ণাত্রেয়গণ একই বংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। এই বংশে বহু পণ্ডিতের উদ্ভবই এই সম্মানের প্রকৃত কারণ।

এই বংশের বলরাম বাচস্পতি ১৬৭৫ শকাব্দে ছয়টি মন্দির স্থাপিত করিয়া একটি মনিময় গৃহে পার্ব্বতী সহ শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন। মন্দিরে নিবদ্ধ শ্লোকটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

"শাকে পঞ্চসমুদ্রষটকরজনীনাথে ধরিত্রীতলে
দুর্গাপাদবলাভিরামবলরামোহহং ভবান্যাত্মজাঃ।
কৃত্বা ষট্সুরমন্দিরং মণিগৃহে শ্রীপার্ব্বতীসঙ্গতং
শ্রীকাশীশ্বরমর্পয়ামি নিতরাং তাতস্য নিঃশ্রেয়সে॥"

অপর মন্দিরের গাত্রে আর একটি শ্লোক পাওয়া যায়। যথা--

"আজন্মসঞ্চিততপঃফলমেতদেব
যন্মূর্ত্তিমান। স্মরহরো মম মন্দিরেহপি।
বাচে বরং তদপি লোকসুখায় দেব
পাদারবিন্দবসতিশ্চিরমত্র ভূয়াৎ॥"

ছয়টি মন্দিরের মধ্যে শ্যামাঠাকুরাণী, অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মীগোবিন্দ, শিব ও অম্বিকার মন্দির সুদর্শনীয়। শ্যামাঠাকুরাণী প্রত্যক্ষ দেবতা। তৎসম্বন্ধে নানাবিধ কিবংদন্তি শ্রুত হওয়া যায়। একদা কোন প্রবল শত্রুপক্ষ ইঁহাদের বাড়ী আক্রমণ করিলে, স্বয়ং দেবী খর্পরাঘাতে আততায়িপক্ষের লোক বিনাশ করেন। নিকটবর্ত্তী বহু লোক এই স্থানে দেবীর অর্চ্চনার জন্য সমাগত হয়।

মালখানগরের বসুবংশের আদিপুরুষ পুষ্করিণী খনন উপলক্ষে এই প্রস্তরময়ী

দেবীমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া ধানুকার স্বীয় গুরুদেবকে উহা প্রদান করেন। তদবধি উহা ধানুকায় সংস্থাপিত আছেন। এই মূর্ত্তি সংস্থাপনের পর হইতে ভট্টাচার্য্যগণের নানাবিধ উন্নতির সূত্রপাত হয়।

বসুদেব দত্ত গোপাল ধর তালুক ও স্বকৃত হোগলার চর তালুক হইতে তাঁহাদের বহু আয় হইত। নানাকারণে উহা কমিয়া গিয়াছে। এই মহানবংশে বহু সুপণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে চন্দ্রমণি ন্যায়পঞ্চাননের নামই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ। বঙ্গদেশীয় তৎকালীন ন্যায়ের পণ্ডিতগণের মধ্যে এই ন্যায়পঞ্চানন সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ছিলেন। তদীয় বংশধরগণ বহুকাল পর্যন্ত নবদ্বীপের প্রাধান্য স্বীকার করেন নাই। মহারাজ রণজিৎসিংহ এই পণ্ডিতবরকে স্বীয় সভাপণ্ডিত রূপে স্বদেশে লইয়া যান। তৎকালে ইনি কাশীবাসী হইয়া তথায় বাস করিতেছিলেন। পরে পুনরায় কাশীতে আগমন করেন, এবং তথায় তাঁহার স্বর্গ লাভ হয়। এই বংশের একটা ললনা রত্নবিদ্যা ও খ্যাতিতে বঙ্গীয় পণ্ডিতগণকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল জয়ন্তী দেবী। যথাস্থানে এই বিদুষীর পরিচয় প্রদান করা হইবে।

## আমতলী

আমতলীর শাণ্ডিল্য বংশে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত রঘুনাথ চক্রবর্ত্তীর জন্ম হয়। তিনি অমরকোষের একখানি টীকা রচনা করিয়েছিলেন। তাঁহার পিতা গৌরীকান্ত মাতামহের সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া সামন্তসারবাসী হন। এই স্থান নদী কর্ত্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে আমতলীগ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই বংশে বহু পণ্ডিত জন্মিয়া গিয়েছেন। বর্ত্তমান সময় এই স্থানবাসী শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র তর্কপঞ্চানন একজন প্রধান স্মার্ত্ত পণ্ডিত।

## তুলাসার

কোটালীপাড়ানিবাসী গোষ্ঠীপতি হরিহর চক্রবর্ত্তীর বংশে রমানাথের জন্ম হয়। তৎপৌত্র রামকেশব পণ্ডিত ছিলেন। গুনক কাশীনাথের কন্যা যশোদার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই সাধ্বী সহগামিনী হইয়াছিলেন। প্রবাদ তদীয় ভগিনীগণও অনুমৃতা হইয়াছিলেন। রামকেশবের যশোদার গর্ভজাত পুত্র কালীকান্ত ও কাশীশচন্দ্র তর্কালঙ্কার মাতামহের সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া তুলাসার আসিয়া বাস করেন। এই বংশেও বহু পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

তুলাসার পালংএর সংলগ্ন গ্রাম। নদী কর্ত্তৃক ষ্টেসন ও রেজিষ্টরী আফিস ভগ্ন হওয়ার উহা উঠিয়া এই স্থানে স্থাপিত হইলেও পালং নামেই আফিসের কার্য্য চলিতেছে। নরিয়ার কতকাংশ নদী কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইলে, তথাকার ধনী গুরুদাস সাহা এই গ্রামে আসিয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই নতুন বাড়ী হইতে পালং বাজার পয্যন্ত একটা রাস্তা তাঁহার নিজ ব্যয়ে নির্ম্মিত করিয়া দিয়াছেন। গুরুদাসের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র শচীনাথ সাহা স্বব্যয়ে পিতার নামে একটা ইংরেজী স্কুল সংস্থাপিত করিয়াছেন। এতদ্বারা সাধারণের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। এই স্থানের চাটাতীগণও প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের বাড়িতে একটা বৃহৎ সরোবর আছে। তুলাসার নাম হইতে অনুমিত হয়, পূর্ব্বে এই স্থানে কার্পাসের আবাদ ও তুলা প্রস্তুত হইত।

## ডোমসার

ভট্টাচার্য্যবংশ এই গ্রামের আদিম অধিবাসী তাঁহাদের বাড়িতে মন্দির ও শিব প্রতিষ্ঠিত ছিল।

দানবীর বিখ্যাত বিশ্বেশ্বর দাশের বাস নিবন্ধন এই গ্রাম প্রসিদ্ধি লাভ করে। বিশ্বেশ্বর বরিশাল জজকোর্টের প্রধান উকীল ছিলেন। বিস্তর অর্থ অর্জ্জন করিয়া উহা নানাবিধ সৎকর্ম্মে ব্যয় করিতে ত্রুটি করেন নাই। তদীয় বরিশালের বাসভবনে শতাধিক লোক নিয়ত আহার প্রাপ্ত হইত। ইহার মধ্যে বহুলোককেই তিনি চিনিতেন না। আহারের সময় যে কেহ পাতা করিয়া বসিয়া যাইত তাহার পাতেই অন্ন পারবেশিত হইত। কাহারও কোন পরিচয় জিজ্ঞাসার আবশ্যক ছিল না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, দীন জনগণ যে কেহ তাঁহার নিকট প্রার্থী হইয়াছেন, তিনি যথাসাধ্য তাঁহাদের অভীষ্ট সাধন করিতে ত্রুটি করেন নাই। কত বিদ্যার্থী যে তদীয় অন্নে প্রতিপালিত হইয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহা নিরুপণ করা সুকঠিন। তিনি গবর্ণমেন্টের উকিল ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র অভয়ানন্দ দাশ এই পদে নিযুক্ত হন। অভয়ানন্দ কিছু ভুসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহার পুত্রগণ সকলেই উপযুক্ত হইয়াছেন। দুঃখের কথা এই যে এই রূপ পরোপকারী মহাত্মা বিশ্বেশ্বরের পুত্রগণ সকলেই অকালে কালকবলিত হওয়ায় তাঁহার বংশের বিলোপ সাধন ঘটিয়াছে। এই বংশীয় গোবিন্দচন্দ্র দাস কলিকাতা হাইকোর্টের ক্লার্ক ছিলেন।

এই গ্রামবাসী কবিরাজ কামিনীকান্ত সেন মহাশয় চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন। তদীয় পুত্রগণ সুশিক্ষিত। তন্মধ্যে মধ্যম পুত্রকে সেরপুরের জমিদার গোবিন্দকুমার রায়চৌধুরী মহাশয়ের নিকট দত্তক প্রদান করেন। এই পুত্রটীই সেরপুরের সুশিক্ষিত জমিদার গোপালদাস চৌধুরী এম,এ।

বর্ত্তমান সময়ে এই গ্রামে সমাগত কুণ্ডু পরিবার ধনে জনে পালং ষ্টেসন মধ্যে প্রধান ও বিশেষ প্রসিদ্ধ। চট্টগ্রাম, কলিকাতা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি বন্দরে তাঁহাদের বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্যাগার সংস্থাপিত আছে। চট্টগ্রামে ইঁহাদের বিস্তর জমিদারী। এই বংশীয় নিত্যানন্দ কুণ্ডু, গবর্ণমেন্ট হইতে রায়বাহাদুর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

এই বংশের মূল পুরুষ কৃষ্ণদাস কুণ্ডু, সনাতন কুণ্ডু ও জগচ্চন্দ কুণ্ডু। তিন সহোদরে বাণিজ্য দ্বারা বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করেন। নদীকর্ত্তৃক রাজনগরের ধ্বংসের সহিত তাঁহাদের পৈত্রিক বাড়ী বিনষ্ট ইহলে, তাঁহারা এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। ভাগ্যকুলের ধনকুবের গুরুপ্রসাদ ও প্রেমচাঁদ কুণ্ডুর ভাগিনেয় এই তিন মহাজন, মাতুল পরিবার হইতেই উন্নতির সূত্র প্রাপ্ত হন। কিন্তু কৃষ্ণদাস ও সনাতনের পুত্র নিত্যানন্দ রায় উন্নতির কারণ, লবণের ব্যবসায়ে ইহাদের প্রচুর আয় হইয়া থাকে। এই বংশীয় হরেন্দ্র রায় আপন জনক জগচ্চন্দ্র কুণ্ডুর নামে একটী উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া নিকটবর্ত্তী স্থানীয় বালকদের শিক্ষার উপায় করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন এই ধনকুবেরগণ কর্ত্তৃক এরূপ কোন কীর্ত্তি বা সাধারণের হিতকর কার্য্যে সম্পাদিত হয় নাই, যদ্দারা তাঁহারা স্বদেশে স্মরণীয় থাকিতে পারেন। রাসযাত্রা উপলক্ষে এ বাড়ীতে বিশেষ

সমারোহ হইয়া থাকে। বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারেই তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যের একমাত্র পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রীমান হরেন্দ্রর সংস্থাপিত স্কুল দ্বারা সর্ব সাধারণের বিশেষ উপকার সংসাধিত হইয়া, তাঁহাকে ও তদীয় জনক স্বগীয় জগচ্চন্দ্রকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। বিক্রমপুরের সর্ব্বপ্রথম এম-এ, স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ সেন এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জ্ঞাতিগণ মধ্যে কেহ গ্রামে বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে শ্রীনিবারণচন্দ্র সেন বি,এ, একজন গ্রন্থকার।

## কোয়রপুর

এই প্রসিদ্ধ গ্রামটিতে বিস্তর ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ও অপরাপর হিন্দু সম্প্রদায় বাস করিতেছেন। মোসলমানের সংখ্যা ও অল্প নয়। সাধারণতঃ বৈদ্য সম্প্রদায়ের জন্য স্থানটী প্রসিদ্ধ। বৈদ্যবংশীয় মাধব সেনের বংশধরগণ গ্রামের প্রাচীন অধিবাসী। ইঁহাদের পুর্ব্বপুরুষ গোয়ালন্দের অন্তগর্ত পাঁচথুপী পঞ্চস্তূপ হইতে এই স্থানে আগমন করেন[১]। ইহাদের মধ্যে মাধবরূপ রায় একজন প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন; প্রবাদ তাঁহার মন্ত্র বলে কতিপয় ভূত তাঁহার ভৃত্যত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। দুষ্কর কার্য্যসমূহও তাহাদের দ্বারা সম্পাদন করিয়া লওয়া হইত। বিশেষতঃ স্থানান্তরে গমনাগমন সময়ে তাহারাই তাহার পালকী বহন করিয়া লইয়া যাইত। একবার আহারান্তে তাঁহার পরিবারস্থ কোন একটি বালকের শরীর উচ্ছিষ্টযুক্ত হয়; তখন একজন ভূত ভৃত্যকে তাহাকে উচ্ছিষ্টমুক্ত করিয়া আনিবার জন্য অনুমতি করা হয়। ভূতের সহিত কথা ছিল যখন যাহা বলা হইবে তখনই তাহা তাহার সম্পাদন করিতে হইবে। ভূত প্রভুর অনুমতি প্রাপ্তি মাত্র বালককে পুকুরে লইয়া গিয়ে তাহার শরীরে ও উদর মধ্যে যতটা দ্রব্য পাইল তাহা সমুদয় অপহৃত করিয়া লইয়া আসিল। বলা বাহুল্য যে বালকের উদর বিদীর্ণ করিয়া পাকস্থলী পরিষ্কার করায়, বালকের পঞ্চত্ব পাইতে অধিক বিলম্ব ঘটিল না। এইরূপ অবস্থায় শিশুটাকে ঘরের চালের উপর রৌদ্রে রাখিয়া দেয়। কিছুকাল পরে বালকের অনুসন্ধান হইতেই সেই ভূত ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করা হইল 'বালক কোথায়?' ভূত ঘরের চাল দেখাইয়া দিল। এই দৃশ্যে বাড়িতে শোকের প্রবাহ প্রবাহিত হইল। মাধব রায় ভূতকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন সে কেন এ দুষ্কর্ম্ম করিল। ভূত বলিল হুকুম মান্য করিবার জন্যই আমি উহার ভিতরের বাহিরের সমুদয় উচ্ছিষ্ট ফেলিয়া দিয়া শুদ্ধ করিয়া লইয়া আসিয়াছি। তখন তিনি আর কি করিবেন, বুঝিলেন বাহিরের অন্নের কথা বিশেষ করিয়া না বলায় তাহারই মূখতার কার্য্যে হইয়াছে। ভূত আর ও তাঁহার বেতন ভোগী চাকর নয়, ছুতোয় নাতায় যতটা অনিষ্ট করিয়া বাহির হইতে পারে, তাহারই চেষ্টা করিবে। আরও প্রবাদ এক দিবস নিমন্ত্রণ উপলক্ষে ভূত ভৃত্যগণকে আদেশ করা হয়, কিছু মৎস্য সংগ্রহ করিযা লইয়া আইস। ইহারা কোন মোসলমান বাড়ীর পাক করা কৈ মৎসা উপস্থিত করিল। তখন আবার তাহাদিগকে বলা হয় কেন রাধা মৎস্য আনিলে? উত্তর হইল "আমরা যাহা সম্মুখে পাইয়াছি তাহাই লইয়া আসিয়াছি, জীয়ন্ত মাছ আনিতে হইবে এরূপ ত আমাদিগকে বলা

১. ফরিদপুরের ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে লেখা হইয়াছিল, কোয়রপুরের মাধববংশের সহিত সংগ্রাম সাহের সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গেল উহা সত্য নহে।

হয় নাই।" এই সকল ব্যাপার অবলোকনে, সর্ব্বসাধারণে রায় মহাশয়কে ভূত বিদায়ের জন্য ধরিয়া বসিল। রায় মহাশয় বাধ্য হইয়া তাহাই করিলেন। কিন্তু যাইবার কালে তাহাদিগকে কিছু পারিতোষিক প্রদান করিয়াছিলেন কি না তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারি নাই।

রায় পরিবার গ্রামের তালুকদার, তন্মধ্যে রামকান্ত রায়, রাধাকান্ত রায়. ঈশানচন্দ্র রায়, নবকৃষ্ণ রায়, জগচ্চন্দ্র রায় ও উকিল শশীভূষণ রায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। রামকান্তের বাড়ীতে কালী এবং রাধাকান্তের বাড়ীতে মঠ ও শিব প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাজারটী জগৎচন্দ্র রায়ের ও তদীয় ভ্রাতা শশিভূষণ রায় প্রভৃতির ছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

নবকৃষ্ণ রায়ের প্রথম পুত্র দুর্গামোহন রায় আগরতলা মহারাজের পেস্কারী হইতে এই ষ্টেটের ডেপুটী কালেক্টরের পদে বরিত হন। এবং দ্বিতীয় পুত্র চন্দ্রমোহন রায় বহুকাল পর্য্যন্ত ঢাকাতে মোক্তারী কার্য্য করিয়াছেন। কোয়রপুরের সার্কেল স্কুল ও পোষ্টাফিস ইহাদের বাড়ীতেই সংস্থাপিত ছিল। স্বগ্রামের উন্নতিকল্পে এই ভ্রাতৃদ্বয় যথাসাধ্য অর্থ ব্যয় করিতে ক্রটি করেন নাই। রামকান্ত রায়ের সময়ে তাহার বাড়ীর নাম প্রসিদ্ধ ছিল, তৎপুত্র কালীপ্রসন্ন রায়, তৎপুত্র অনুকূল রায় বর্ত্তমান পুলিস ইনস্পেক্টর। এতদ্ভিন্ন গিরীশচন্দ্র রায়, অনুকূল রায় বি.এ, অতুল রায় এল,এম,এস প্রভৃতি এই রায় বংশের খ্যাতলোক।

এই সেন পরিবারের শাখায় রামকুমার সেন আগরতলার রাজপরিবারের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। ভারত ভ্রমণ, চাঁদের বিয়ে হেমপ্রভা প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থপ্রণেতা প্রসিদ্ধ সুলেখক বরদাকান্ত সেনের নাম উল্লেখযোগ্য। কয়েক মাস অতীত হইল পণ্ডিত বরদাকান্ত লোকান্তরিত হইয়া বাঙ্গলার একজন প্রধান লেখকের স্থান শূন্য করিয়াছেন।

সোমকোট অতি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল ; কীর্ত্তিনাশার প্রথম উদ্ভবকালে, এই স্থান ; নদীকর্ত্তৃক ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ায়, তত্রত্য অধিবাসীগণ নানা স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সোমকোটের নিমদাশ বংশে অনেক বিদ্যান ও রাজকর্ম্মচারী জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন।

তন্মধ্যে ভূঞা, সরকার, লালা মৌস্তফী প্রভৃতি উপাধিধারী নবাব সরকারী কর্ম্মচারিগণ প্রসিদ্ধ ছিলেন। সোমকোট বিলয়ের পরে সরকার এবং লাল মৌস্তফীর বংশধর ও অপরদাশ মহোদয়গণ গোবিন্দমঙ্গল গ্রামে, পরে ঐ গ্রাম নদী সিকস্ত হওয়ায় কোয়রপুর গ্রামে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। তৎসহ ইহাদের গুরু পুরোহিতগণও এই গ্রামে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। সরকারগণ বিক্রমপুরান্তর্গত তপ্পে রামকৃষ্ণপুরের ভূম্যধিকারী ছিলেন। এই বংশের তারানাথ দাশ বহুদিন ঢাকা জজকোর্টের নাজিরি কার্য্য করেন। হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকিল বৈকুণ্ঠনাথ দাশ, এম-এ, বি-এল, সরকার বংশের উজ্জ্বল রত্ন। মহিমচন্দ্র দাশ এই বংশের একজন সামাজিক ও সাহসিক পুরুষ ছিলেন। এতদ্ভিন্ন নিমদাস বংশে মদনমোহন দাস মোক্তার ও ডিপুটী কালেক্টর গিরীশচন্দ্র দাশ রায় বাহাদুর কোর্ট অব ওয়ার্ডের ম্যানেজার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। নিম দাশবংশীয় প্রসিদ্ধ রামরাজা দাশ কবিরাজ এইরূপ সুচিকিৎসক ছিলেন যে, দূরদেশ হইতে বহু ধনী তদীয় আলয়ে সমাগত হইয়া তদ্বারা চিকিৎসা করাইতে বাধ্য হইয়াছেন। স্বদেশে তাহার বিস্তর পশার ছিল।

রাজপাশা গ্রাম নদী দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, তত্রত্য রাম বংশোদ্ভব চৌধুরী মহাশয়গণ এই স্থানে গৃহ সংস্থাপন করেন, তন্মধ্যে গৌরকিশোর চৌধুরীরও বর্ত্তমান সময়ে এই বংশের ব্রজেন্দ্রকুমার সেন, এম এ মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

কোয়রপুর নিবাসী ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক রতনমণি গুপ্ত মহাশয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে রায় সাহেব উপাধি প্রাপ্ত হন। স্বগ্রামে জলাশয় খনন করাইয়া ও ঢাকাস্থ রামমোহন লাইব্রেরীর ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া এই মহাত্মা সাধারণের স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। এই বংশের পণ্ডিত নবকুমার গুপ্ত মহাশয় বহুদিন পর্য্যন্ত ঢাকা নবাব স্কুলে পণ্ডিতি কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তৎবিরচিত অনেক পুস্তক স্কুলপাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হইত। তৎপুত্র সুযোগ্য কবিরাজ অনুকূলচন্দ্র শাস্ত্রী, তোষিণী নামক মাসিক পত্রিকার এবং অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ, বিশ্ববার্ত্তা ও শিক্ষা সমাচার এই দুই সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক। এই গ্রামের কবিরাজ রাজকিশোর দাশ কবীন্দ্র একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন।

সরকার বংশ দ্বারা, সেনহাটীর হিঙ্গু কৃষ্ণরাম সেন ও লালা মৌস্তফির দ্বারা গণ বংশ এই গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হন। গণ বংশীয় উকীল অন্নদাচরণ সেন ও তৎপুত্র সবজজ কালী প্রসন্ন সেন, বিএল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় মধ্যে রাঢ়ী শ্রেণীর পাঠক ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ভট্টাচার্য্যগণ প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই ভট্টাচার্য্যগণ স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত বৈদ্যগণের গুরু ও পুরোহিত। ভট্টাচার্য্য বংশের করুণাকান্ত বিদ্যাসাগর ও রামপ্রসাদ শিরোমণি পণ্ডিত ছিলেন। বারেন্দ্র কালীকিশোর চৌধুরী উচ্চ শ্রেণীর পুলিশ ইনস্পেক্টরি কার্য্য করিতেন, কার্য্য দক্ষতায় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে রায় সাহেব উপাধি প্রাপ্ত হন।

যৎকালে বিক্রমপুরের পশ্চিমাংশ দিয়া পদ্মা নদী প্রবাহিত হইত, তৎসময়ে কোয়রপুরের পশ্চিম দিকের কতকটা পদ্মার গর্ভস্থ হয় ; পরে ঐ নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া কীর্ত্তিনাশার উদ্ভব হইলে, একটী পয়ঃপ্রণালী মাত্র বর্ত্তমান থাকে, উহার পশ্চিমে বহুদূর পর্য্যন্ত চড়া পড়িয়া যায়। এইরূপে বহু সৈন্য বসতি স্থান সুজন্দল গ্রাম ভগ্ন হইয়া পুনরায় চড়াতে পরিণত হয়। এই সকল স্থান চরকোয়রপুরও চরসুজন্দলল নামে পরিচিত হইয়াছে। আবার কীর্ত্তিনাশা নদী উত্তর দিক হইতে অগ্রসর হইয়া কোয়রপুর গ্রামের কতকাংশ বিনষ্ট করায় বহু লোককেই বাস স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া গ্রামের দক্ষিণ দিকে গৃহ সংস্থাপন করিতে হইয়াছে।

## চিকন্দী ও সুন্দীপ

চিকন্দী গ্রামে অনেক গোপজাতীয় লোকের বাস। উৎকৃষ্ট দধি ক্ষীরের জন্য উহা চির প্রসিদ্ধ। সম্প্রতি কতক বৎসর যাবৎ চিকন্দীর মুন্সেফী নামে একটী আফিসের পরিচয় হইয়া আসিতেছে, বাস্তবিক এই আফিসটী চিকন্দীর নিকটবর্ত্তী সুন্দীপ নামক স্থানে সংস্থাপিত, ইহার নিম্নবর্ত্তী খালটী প্রাচীন পদ্মার খাত ; অধুনা খালে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্ব অধিবাসীরা অধিকাংশ মোসলমান।

প্রায় ৪০ বৎসর অতীত হইল ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মুকসুদপুরের মুন্সেফী আফিস উঠিয়া মূলফৎগঞ্জ থানায় পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু ঐ সময়ে মূলফৎগঞ্জ [পোড়াগাছ] নদী সিকস্ত হওয়ায় মুন্সেফীর আফিস সম্বন্ধীয় যাবতীয় সরঞ্জাম, কর্ম্মচারী উকিল ও মুন্সেফ বাবু রমেশচন্দ্র লাহিড়ী, জপসাতে সমাগত হন, এই স্থানটীও নদীর সমীপবর্ত্তী বলিয়া, অন্য স্থান নির্দ্দেশ না হওয়া পর্য্যন্ত উহার কার্য্য ডোংসার গ্রামের প্রসিদ্ধ উকিল বিশ্বেশ্বর দাশ মহাশয়ের বাড়ীতে আরম্ভ হয়। তৎপর সুন্দীপ স্থান মনোনীত হওয়ায় তথায় আফিস সংস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু সুন্দীপ বলিতে নোয়াখালীর প্রসিদ্ধ সোণ দ্বীপকে লক্ষ্য করে বলিয়া উহার নাম নিকটবর্ত্তী চিকন্দী গ্রামের নামানুসারে গঠন করা হইয়াছে। স্কুল, পোষ্টাফিস প্রভৃতিও চিকন্দী নামে চলিতেছে।

আফিস সংস্থাপিত হইবার পরে, এই স্থানের আকার একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তিনটী মুন্সেফী আফিস, মুন্সেফগণ ও আমলা উকিলগণের বাস নিবন্ধন তথায় বহু কৃতবিদ্য লোকের সমাগম হইয়াছে ; তদ্ধেতু পোষ্টাফিস ও একটী উচ্চ ইংরাজী স্কুল এই স্থানে সংস্থাপিত হয়। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সাহায্যে এই স্থানে একটী পুকুর ও রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। সাধারণের অর্থে একটী কালীবাড়ী ও টিনের ঘর নির্ম্মিত হইয়া তন্মধ্যে দেবী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। সুন্দীপ হইতে এক রাস্তা পালংএর দিকে অপর একটী রাস্তা কোয়রপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে।

## মাঐসার, কাঞ্চনপাড়া

দক্ষিণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত এই স্থানটী বিশেষ প্রসিদ্ধ। বহু ব্রাহ্মণের বাস বিশেষতঃ অত্রত্য সিদ্ধপীঠ দিগম্বরী তলার জন্য এই স্থানের পরিচয় বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে ; সুপ্রসিদ্ধ গোসাঞি ভট্টাচার্য্য এই পীঠে সিদ্ধি লাভ করেন, তদীয় বিবরণ এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক গঙ্গাচরণ ন্যায় পঞ্চানন মহাশয়ের জন্মস্থান।

এই স্থানের অবয়বের সহিত নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের অবয়ব ও মৃত্তিকার কতকটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই প্রদেশে বহু দীঘি সরোবর দৃষ্ট হয় কিন্তু তটের উচ্চতার প্রতি লক্ষ্য করিলে মাঐসারের প্রাচীন দীর্ঘীকার তট যতটা উচ্চ বলিয়া বিবেচিত হয়, অন্যত্র তাহা দৃষ্ট গোচর হয় না। এই বৃহৎ সরোবরটী পুনরায় খনন করিলে সম্ভবতঃ বহু প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন উহার ভিতর হইতে উদ্ভূত হইতে পারে। অত্রত্য গাঙ্গুলী ও ঘোষাল বংশ প্রসিদ্ধ।

কাঞ্চনপাড়া গ্রামে একটী বাজার আছে, তৎস্থানীয় চক্রবর্ত্তীগণ তালুকদার। ইহার সন্নিকটে নিলগুণ নামক স্থানে একটী প্রাচীন দীর্ঘীকা পরিদৃষ্ট হয়।

## ছয় গাঁ

ব্রাহ্মণ প্রধান স্থান, এত ব্রাহ্মণ দক্ষিণ বিক্রমপুরের আর কোন গ্রামে বাস করেন না। অতি পূর্ব্ব সময়ে লেদার নদী উহার প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইত। অধুনা উহা একেবারে স্থলে পরিণত হইয়া, কৃষিক্ষেত্র ও জনগণের বাসোপযোগী হইয়া পড়িয়াছে।

মৃত্তিকা খননকালে তথায় প্রাচীন নৌকার কাষ্ঠ ও লোহার শিকল ইত্যাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই ব্রাহ্মণ সমাগমের পূর্ব্বে, বর খাঁ নামে জনৈক মোসলমান তথায় ক্ষমতাশালী ছিলেন। বর্ত্তমান চৌধুরীগণের ছয় আনির বাড়ী তাঁহার গৃহ প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া জানা যায়। তাঁহার ছয়টী স্ত্রী ছিল উহাদের প্রত্যেকের নামে একটী দীর্ঘিকা খনন করাইয়া উহার পাড়ও সেই নামানুসারে গঠন করেন। এই ছয়টী পাড়া হইতে গ্রামের নাম হয়ত ছয় গাঁ হইয়াছে। উহার কোন কোন জলাশয়ে কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত সলিল পূর্ণ থাকে। এই সকল দীঘিগুলি পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বিত বলিয়া অনেকে উহাকে মগদের দ্বারা খনিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করেন। মগেরা পরে মোসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া এই স্থানেই বাস করিয়াছিল। ছয় গাঁতে একটী হাট ছিল তথায় সুপারীর যথেষ্ট কারবার হইত, বাণিজ্য উপলক্ষে মগের তথায় আগমন অসম্ভব নয়, তাহারা মোসলমান ধর্ম্মও গ্রহণ করিতে পারে। "বর খাঁ" সেই দলের লোক বলিয়াই অনুমিত হয়।

তৎপর বসন্ত রায় নামে জনৈক কায়স্থ সিঙ্গাচূড়া গ্রামে প্রাধান্য লাভ করে, ছয় গাঁ প্রভৃতি স্থান তাঁহারই কর্ত্তৃত্বাধীন হয়, তৎগঠিত রাস্তাটী কাচকির দরজা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

কয়েক বৎসর হইল মৃত্তিকা খননকালে প্রাচীর বেষ্টিত আর একটা বাড়ীর চিহ্ন তথায় দৃষ্টি গোচর হয়, উহা কাহার দ্বারা নির্ম্মিত তৎসম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কেহ কেহ উহা ডাকাতের নিভৃত নিকেতন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাহা হউক গ্রামটির অবস্থা দৃষ্টে বোধ হয় উহা অতি পুরাতন স্থান।

বর্ত্তমান ষোলআনি চৌধুরীগণের পূর্ব্বপুরুষ রামচন্দ্র আচার্য্য শূন্য সোমগ্রাম হইতে আসিয়া ছয় গাঁতে গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। রামচন্দ্র প্রসিদ্ধ গোসাঁঞি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, সম্ভবতঃ গোঁসাঞির শিষ্য চাঁদ ও কেদার রায়ের অনুগ্রহে এই গ্রামের ভূসম্পত্তি বন্দোবস্ত পাইয়া, তথায় বাসস্থাপন করিয়াছিলেন। তৎকালে এই গ্রামের কর ছিল শতেক টাকা। পরে রাজবল্লভের পুত্র দেওয়ান রামদাসের অনুগ্রহে উহার ন্যূন হয়।

ছয় গাঁ চিরকাল সংস্কৃত শাস্ত্রালোচনার স্থান। আচার্য্য চূড়ামণির বংশধর কৃষ্ণ দাস সার্ব্বভৌম প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। হরিচরণ বিদ্যালঙ্কার ও বৈয়াকরণ রামহরি চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। কয়েকটী টোল পূর্ব্বে এই স্থানে সংস্থাপিত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে এই গ্রামবাসী বঙ্গচন্দ্র ন্যায়ভূষণ মহাশয় একজন প্রধান নৈয়ায়িক। ইনি প্রাচীন হইলেও অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। তৎপুত্র শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ওকালতি কার্য্য করিতেছেন, ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভোলা মহকুমায় একজন খ্যাতনামা উকিল ছিলেন। বহুলোক তাহার বাসাবাটীতে থাকিয়া আহার প্রাপ্ত হইত। বিখ্যাত পাঠক গুরুচরণ বিদ্যাভূষণ এই গ্রামবাসী ছিলেন তৎবংশীয় তারাকান্ত পাঠক বর্ত্তমান আছেন। এই গ্রামবাসী শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, বি-এ, দক্ষিণ বিক্রমপুর সাহিত্য সম্মিলনীর একজন প্রধান উদ্যোক্তা। অত্রত্য গাঙ্গুলীবংশও প্রসিদ্ধ, তন্মধ্যে পার্ব্বতীচরণ পুলিশ সবইনস্পেক্টর

ছিলেন। স্থানীয় মধুসূদনচক্রপালা ক্রমে ছয় গাঁ বাসীও দেভোগবাসীগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হন। জাগ্রত দেবতা বলিয়া দূরবর্ত্তী স্থান হইতে লোক সমাগত হইয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকে। এই স্থানে একটী হাট আছে। বিক্রমপুর মধ্যে এই স্থানে প্রচুর নারিকেল জন্মে বলিয়া সাধারণে ইহাকে নারিকেলী ছয় গাঁও বলিয়া থাকে।

## দেভোগ

এই স্থানে বহু ব্রাহ্মণ ও ব্যবসায়ী লোকের অবস্থান। জপসা নদী সিকস্ত হইলে এই স্থানের জমিদার বংশীয় ভূতপূর্ব্ব মহাফেজ দীননাথ রায় এবং বরিশালের প্রধান মোক্তার ভবানীচরণ রায় এই দেভোগ গ্রামে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। পালং হইতে দেভোগ পর্যন্ত যে লোকাল বোর্ডের রাস্তা বুড়ির হাট পর্যন্ত গিয়াছে তাহা এই দেভোগ ভেদ করিয়া যাওয়ায় স্থানটী মনোরম বলিয়া বোধ হয়। ভাবনীচরণ রায়ের পুত্র এবং তদীয় ভ্রাতা গিরিশচন্দ্র রায় ও ডাক্তার অম্বিকাচরণ রায় কর্ত্তৃক তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত পাষাণময়ী কালী বর্তমান সময়ে এই স্থানে সংস্থাপিত হইয়া পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

চাঁদ ও কেদার রায়ের জ্ঞাতি রায় উপাধিধারী কেহ কেহ এই গ্রামে বাস করেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

রাস্তা প্রস্তুত উপলক্ষে মৃত্তিকা খনন করিতে, দেভোগ ও বুড়ির হাটের মধ্যবর্ত্তী একটি স্থানে প্রস্তর নির্ম্মিত এক বৃহৎ ষণ্ড প্রাপ্ত হওয়া যায়, সম্প্রতি উহা ঢাকা মিউজিয়মের জন্য তথায় প্রেরিত হইয়াছে, প্রত্নতত্ত্ববিদগণ যেন উহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় কোন নতুন কথা অবগত হওয়া যাইতে পারিবে। স্বদেশী কেহই এত সম্বন্ধীয় কোন কথা অবগত নহে। দেভোগের বা তন্নিকটস্থ অধিবাসীগণের প্রতি লক্ষ্য করিলে বোধ হয় না তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ মধ্যে এমন সম্পন্ন লোক ছিলেন যাহা দ্বারা এইরূপ প্রস্তরমুত্তি পুরুষগণ মধ্যে এমন কোন সম্পন্ন লোক ছিলেন যাহা দ্বারা উহা আনীত হইয়াছিল। এই বৃষভ যে একক আসিয়াছিল এমনও অনুমান হয় না কারণ প্রভু শিব ব্যতীত ধাতু প্রস্তর নির্ম্মিত একমাত্র বৃষভ কোথাও দৃষ্টি গোচর হয় না। নিশ্চয় শিব বৃষভোপরি আসীন হইয়া আসিয়াছিলেন। বিশেষ অনুসন্ধান করিলে তাহার অস্তিত্ব জ্ঞাপিত হইতে পারে। ঢাকা মিউজিয়ামের কমিটী হইতে এই বিষয়ের অনুসন্ধান হওয়া অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করি।

## কাশাভোগ, মধ্যপাড়া

এক স্থানে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ ও বহু ব্যবসায়ী লোক বাস করিয়া থাকে। জপসার প্রসিদ্ধ রামমোহন ক্রোড়ীর সংস্থাপিত কালী এই স্থানে বর্তমান থাকিয়া আজিও পূজিত হইতেছেন, ক্রোড়ী প্রদত্ত দেবোত্তর ভূমি দ্বারা উহার অর্চ্চনার সহায়তা চলিতেছে।

কৃষ্ণকান্ত পাঠক মহাশয় সর্ব্ব সাধারণের পরিচিত লোক, বিঝারি গ্রামে তাহার জন্ম হইলেও কাশাভোগ গ্রামে গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায়ই জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। কথকতা ব্যবসায়ে ইনি যেরূপ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, গান রচনা দ্বারা তাহার ততোধিক যশঃ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পাঠক মহাশয়ের বিরচিত

"ওরে মন বসে ভাব কি? তোমার মরণের বিলম্ব আছে কি " এই গানটী হিন্দু ব্রাহ্ম উভয় সম্প্রদায় মধ্যে গীত হইত। প্রবাদ উড়িষ্যায় ডাকাত কালেন্ডা কামাল, এই সঙ্গীত শুনিয়া ডাকাতি পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করে। "আমার গতি কি হবে, যদি পাতকী বলিয়া ত্যাজিবে তবে" গানটী ভারতের নানা স্থানে নানা ভাবে গীত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন "জানি কার রূপসাগরে ঝাঁপ দিয়া গৌর হয়েছে।" এই সঙ্গীতটীও পূর্ব্ববঙ্গের পথে, ঘাটে গীত হইত। তাহার বিরচিত সঙ্গীত একত্র করিলে একখানা বৃহৎ পুস্তক বিরচিত হইতে পারে। কৃষ্ণকান্ত প্রেমিক কবি, অথচ সঙ্গীতের ব্যঙ্গোক্তিতে রসিকতার ভাবও পরিস্ফুট হইয়া পড়িত। "আত্মীয়তা কুটুম্বিতা টাকা, টাকার জন্য কে না হয় ঠেকা" ইত্যাদি সঙ্গীত উহার উদাহরণ। ১২২৮/২৯ সনে তাহার অনুমানিক জন্ম সন ধরিয়া লইলে প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হইয়াছে বলা যায়। বাস্তবিক তিনি অত্যন্ত প্রাচীন হইয়াছিলেন। পাঠক মহাশয় প্রায়ই কৃষ্ণকমল গোস্বামী বিরচিত "অয়ি রাধে" এই সংস্কৃত গানটী করিতেন। তাহার বহু শিষ্য সেবক ছিল। কাশাভোগের রাজকুমার পাঠক ও ভোজেশ্বরবাসী পাঠক কালীশচন্দ্র কৃতিতীর্থ এই মহাত্মার প্রধান ছাত্র।

### আঙ্গারিয়া, রাজগঞ্জ

ভেন ডেকব্রুক তদীয় ম্যাপে এই স্থান ওলরি কুলের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ১৫৪১ খ্রীঃ অব্দে ডিপারোজের যে মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতেও এই দুইটি স্থান নির্দ্দেশিত আছে। ব্লকম্যানকৃত বঙ্গদেশের ভুগোল ও ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, মেঘনা ও পদ্মার মধ্যবর্ত্তী ঢাকার দক্ষিণাংশে এই দুইটি বন্দরের সংস্থিতি। বাস্তবিক পক্ষে, এই দুইটি বন্দর যে বহুদিনের তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উহা রাজনগরের রাজাদের হস্তগত হইলে আঙ্গারিয়ার বন্দর রাজগঞ্জের হাট নামে পরিচিত হয়। মূল কথা, রাজাদের পদবী অনুসরণে উহার নাম হয় রাজগঞ্জ। কেহ কেহ বলেন এই বন্দরে প্রচুর কয়লার[১] আমদানী হইত বলিয়া উহা আঙ্গারিয়া নামে প্রসিদ্ধ ছিল। লৌহ, পিত্তল, স্বর্ণ, তাম্র প্রভৃতি ধাতুকার্য্যের জন্য এই কয়লার আবশ্যক হইত। এই বৃহৎ হাট যে স্থানে বর্ত্তমান ছিল, উহা নদী কর্ত্তৃক ধ্বংস হওয়ার নীলকুণ্ঠী নামক স্থানে স্থাপিত হইলেও পূর্ব্ব নামেই পরিচিত আছে। এই স্থানে একঘর কায়স্থ সাধারণের পরিচিত ছিল, কেহ তাহাকে ভুঞা বলিত। বারেন্দ্র বাক্ছীগণ এই স্থানের সর্ব্বপ্রধান প্রসিদ্ধ, তন্মধ্যে হরীশচন্দ্র বাক্ছী মহাশয় সুখ্যাতির সহিত আসাম ডিব্রুগড়ে ওকালতি করিতেন, অধুনা তৎপুত্র শ্রীযুত বিপিন বাক্ছী তথায় ওকালতি করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন বহু ব্যবসায়ী লোকের বাস নিবন্ধন স্থানটী উন্নত বলিয়া প্রতীয়মান হইত।

আঙ্গারিয়ার সংলগ্ন পরাশরদির খালের পারে একটী নীলকুঠী ছিল, এই স্থানে অনেক 'বেদে' বাস করিত। কিংবদন্তী, এই খালের দ্বারা বিক্রমপুর ও ইদিলপুরের সীমা নির্দ্দেশিত হইয়াছিল। এই স্থানের নিকটবর্ত্তী দাদপুর, গোবিন্দপুর, খাজুরতলা প্রভৃতি স্থানে অনেক মুসলমান বাস করিয়া থাকে।

১. বিক্রমপুরাঞ্চলে কয়লা "আঙ্গার " বলিয়া কথিত হয়।

### পম ও সাজনপুর[২]

বহু দিবস পর্য্যন্ত এই দুই স্থান অরণ্যে পরিণত ছিল, দুই তিন ঘর মুসলমান মাত্র বাস করিত। অধুনা উহা জনপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। জপসার রাজ (স্থপতি) বংশ অনেকে যাইয়া তথায় গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। স্থানটী চতুঃসীমান্তর্গত স্থান হইতে উচ্চ।

### তেলীপাড়া

সম্ভবতঃ এই স্থানে বহু তেলী বাস করিত বলিয়া উহার নাম হয় তেলীপাড়া। বর্ত্তমান অধিবাসী দৃষ্টে উহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অধুনা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রভৃতির সংখ্যাই এই স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে। অত্রত্য চক্রবর্ত্তীবংশ মধ্যে রমানাথ চক্রবর্ত্তী কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তদ্বিরচিত গান মন্দ ছিল না। তৎকনিষ্ঠ কৈলাস চক্রবর্ত্তী মোক্তার একজন বহুদর্শী কাব্যজ্ঞ ছিলেন। এই চক্রবর্ত্তী ভ্রাতৃদ্বয় উপসীর ভট্টাচার্য্য সরকারের প্রধান কার্য্যকারক ও মোক্তার ছিলেন।

## জোয়ার বিনোদপুর

### বাহেরচর ও দাতরা

পরগণে রাজনগরের অন্তর্গত জোয়ার বিনোদপুর পূর্ব্বে রাজা রাজবল্লভের জমিদারীভুক্ত ছিল। রাজা রাজবল্লভের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র গোপালকৃষ্ণ অন্যান্য জমিদারীর সহিত বিনোদপুর জমিদারীরও উত্তরাধিকারী হন। গোপালকৃষ্ণের মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে জোয়ার বিনোদপুর জমিদারী হাওলা স্বরূপ তাঁহার পুত্র পীতাম্বর সেনকে প্রদান করিয়া যান। সেই অবধি হাওলা পীতাম্বর সেনকে প্রদান করিয়া যান। সেই অবধি হাওলা পীতাম্বর সেন মধ্যগত জোয়ার বিনোদপুর বলিয়া কথিত হইয়া আসিতেছে। পীতাম্বর সেনের বংশধরগণের অবস্থার পরিবর্ত্তন হেতু এই সম্পত্তি নিলাম হইয়া যায়।

কালক্রমে জোয়ার বিনোদপুর ঢাকার মোগলবংশ সম্ভূত মৃজা জয়নাল আবদীন ও মৃজা জাফর সাহেব ভ্রাতৃদ্বয় কট কবলায় ষোল আনা অংশ ক্রয় করিয়া লন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মৃজা জাফরের মৃত্যুর পর তাঁহার কন্যা আচমতন্নেছা খাতুন অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঋণ দায়ে এই ৷৷০ আট আনা অংশের =১০ নিলাম হওয়ায় ময়মনসিংহ জেলার রামগোপালপুরের জমিদার = কালীকিশোর রায়-চৌধুরী স্বীয় -পত্নী = হরসুন্দরী দেবী-চৌধুরাণীর নামে ১২৭৬ বঙ্গাব্দে প্রথম ক্রয় করেন। বাকী = ১০ গণ্ডা অংশ আচমতন্নেছা খাতুনের পর সরফন্নেছা বেগম, গোলাপচাঁদ বাবু ও মৌলবী আমিরউদ্দিন নিলাম ক্রয় করিয়াছিলেন। সরফন্নেছা বেগম মৃজা জয়নাল আবদীনের পুত্রবধু। তিনি আছমতন্নেছা খাতুনের =০ আনা অংশ ক্রয় করেন। বাকী = ১০ গণ্ডা গোলাপ চাঁদ বাবু ও মৌলবী আমিরউদ্দিন ক্রয় করিয়াই =কালীকিশোর রায় চৌধুরীর নিকট বিক্রয় করেন। ইহাও = হরসুন্দরী দেবী-চৌধুরাণীর নামে ক্রয় করা হইয়াছিল। মৃজা জয়নাল আবদীনের পুত্রবধূ সরফন্নেছা বেগম জোয়ার বিনোদপুরের ৷৷০ আনা অংশ হেবা দান সূত্রে স্বামী মৃজা কুচকের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি বিনোদপুরের ৷৷০= আনা অংশের

২. সাজনপুর সম্ভবতঃ বাদসাহ সাহজাহানের নামানুসারে সাহজাহানপুরের অপভ্রংশ হইবে।

অধিকারিণী হইয়াই =০ আনা অংশ ১২৭৭ সালে =হরসুন্দরী দেবী-চৌধুরাণীর নিকট খোস কবলায় বিক্রয় করেন। =হরসুন্দরী দেবী-চৌধুরাণী এক্ষণে ৷৷=০ আনা অংশের অধিকারিণী হইলেন।

সরফন্নেছা বেগমের =০ আনা অংশ বাদে =০ আনা অংশ মধ্যে তাঁহার কন্যা সমসেরন্নেছা =৪ গণ্ডা, প্রথম পুত্র ছদাকত মহম্মদ খাঁ =৮ গন্ডা ও দ্বিতীয় পুত্র মৃজা মহম্মদ তকী =৮ গণ্ডা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কন্যা সমসেরন্নেছা তাঁহার অংশ বিক্রয় করাতে = কালীকিশোর রায়-চৌধুরী তদীয় পুত্র যোগেন্দ্র-কিশোর রায়-চৌধুরীর তদীয় পুত্র যোগেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরীর নামে ১২৮৯ সালে উহা ক্রয় করেন। ছদাকত মহম্মদ খাঁর অংশ তাঁহার স্ত্রী জিবনন্নেছা বেগম প্রাপ্ত হন। মৃজা মহম্মদ তকীর অংশ সাহাজাদা বেগম ক্রয় করেন। অল্পকাল পরেই সাহাজাদা বেগমের মৃত্যু হইলে তাঁহার স্বামী মৃজা মহম্মদ কাজেম উত্তরাধিকারীসূত্রে ঐ অংশ প্রাপ্ত হইলেন, জিবনন্নেছা বেগম ও মৃজা মহম্মদ কাজেমের =১৬ চারি আনা ষোল গণ্ডা অংশ বিক্রয় করাতে রাজা যোগেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী পিতার মৃত্যুর পর উহা নিজ নামে ১২৯৬ সালে ক্রয় করিয়া বিনোদপুরের ষোল আনা অংশের অধিকারী হইলেন।

রাজনগর পরগণার অন্তর্গত জোয়ার বাহেরচর ও কিসমত দাতরা পূর্ব্বে পীতাম্বর সেনের হাওলা ছিল। এই দুই মহাল বিনোদপুরের সংলগ্ন। কালক্রমে ইহাও ঢাকার মোগলবংশীয়েরা ক্রয় করেন। কিন্তু তাঁহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হেতু জোয়ার বাহেরচরের ৷৷=১২ নয় আনা বার গন্ডা ও কিসমত দাতরার = ১০ গণ্ডা ঢাকার মোগলবংশীয়গণ বিক্রয় করাতে কালীকিশোর রায়-চৌধুরী তাহা ক্রয় করেন। জোয়ার বাহেরচরের অংশ কালীকিশোর নিজ স্ত্রীর নামে ও দাতরার অংশ পুত্রের নামে ক্রয় করিয়াছিলেন। জোযার বিনোদপুর, জোয়ার বাহেরচরের৷৷= ১২ গণ্ডা ও কিসমত দাতরার =১০ গন্ডার সদর খাজনা ২২৩৮=১১ ও সেস ৬২১ =২ মাত্র। বিনোদপুর ৬৩৪২ নং কালেক্টরীর তৌজিভুক্ত। জোয়ার বাহেরচর ও কিসমত দাতরার হিসাব পৃথক। রাজা যোগেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরীই বর্ত্তমানে বিনোদপুরের ষোল আনা, জোয়ার বাহেরচরের ৷৷=১২ গণ্ডা ও কিসমত দাতরার= ১০ গণ্ডা হিস্যার মালিক দখলিকায় আছেন।

বিনোদপুর ও তাহার সংলগ্ন স্থানের অধিবাসিগণ মধ্যে মুসলমানই অধিক। ইহাদিগের মধ্যে অবস্থাপন্ন লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। মুসলমান অধিবাসিগণ স্বভাবতই দুর্দ্ধর্ষ। ইহাদিগের মধ্যে অনেক ঘরই দস্যুতাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া উন্নীত হইয়াছে। জমিদার নিজব্যয়ে পয়ঃপ্রণালী খনন করিয়া জমির উর্ব্বরতা করিয়াও বৃদ্ধি নিরিখে খাজনা আদায় কবিতে সাহসী হন না।

বিনোদপুরের নায়েব লোকনাথ চক্রবর্ত্তীকে প্রজাগণ হত্যা করে, পরেও অনেক নায়েব ইহাদের দ্বারা অপমানিত হইয়াছে। হত্যাপরাধে বিনোদপুরের একজন প্রধান তালুকদার শঙ্খমৃধার প্রাণদণ্ড হয়।

বড় বিনোদপুর, চর বিনোদপুর, মামুদপুর, গৈয়াতলা, মৃধাকান্দী, রণখোলা প্রভৃতি স্থান লইয়া বিনোদপুর জোয়ার। একবার এই সকল স্থানের প্রজাগণ মোগল জমিদারগণের কাছারী লুণ্ঠন করাতেও নানাবিধ আইনবহির্ভূত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ায়,

গভর্ণমেন্ট তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যে স্থানে প্রজারা এই সেনাগণের সম্মুখীন হইয়াছিল, উহা অদ্যাপি "রণখোলা" নামে পরিচিত আছে। এই সম্বন্ধে একটী গ্রাম্য কবিতা আছে। যথা-

বাজিল রণের কাড়া, সিপাহী হইল খাড়া,
বিনোদপুরে পৈল সাড়া, ইত্যাদি।

## শূন্যঘোষ

এই স্থানটী বিক্রমপুর পরগণার মধ্যবর্ত্তী হইলেও ইদিলপুর পরগণার জমিদারীর অন্তর্গত হইয়াছে। এই স্থানটীর অবস্থা নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থান হইতে স্বতন্ত্র। এইরূপ উচ্চ ভূভাগ দক্ষিণ বিক্রমপুর মধ্যে নাই বলিলেই হয়, যেন কোন নৈসর্গিক কারণে উহার উন্নয়ন কার্য্য সংসাধিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের বসতি জন্য গ্রামটী প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে কালী প্রসন্ন চৌধুরী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বনিবাস আন্ধারমাণিক নদী কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইলে তথা হইতে আসিয়া ইঁহারা এই স্থানে বাস স্থাপন করেন। রাজনগরের ভট্টাচার্য্য বংশের কেহ কেহ এবং কালারগাঁর প্রসিদ্ধ দত্ত ও জপসার দাস উপাধিধারী কায়স্থগণ অধুনা এই গ্রামে বাস করিতেছেন। এই স্থানটী মুসলমান-পরিবেষ্টিত।

## রুদ্রকর

এই গ্রামটী বিক্রমপুর ও ইদিলপুরের মধ্যবর্ত্তী। বহু ব্রাহ্মণ এই স্থানে বাস করিয়া থাকেন। চক্রবর্ত্তীবংশ প্রসিদ্ধ তালুকদার; ইঁহারা কুলীন চট্টোপাধ্যায় বংশ হইলেও চক্রবর্ত্তী নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের বাড়ী বহু হর্ম্ম্যমালা ও একটী মঠ দ্বারা পরিশোভিত। একদিকে নানাবিধ সদনুষ্ঠান ও অপর দিকে দাঙ্গাবাজ বলিয়া ইঁহারা দেশ মধ্যে বিশেষ পরিচিত। গুরুচরণ, শশিভূষণ, অভয়চরণ ও শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি এই বংশের প্রধান লোক। এই স্থানবাসী শ্রীযুত গঙ্গাচরণ বিদ্যাভূষণ একজন প্রধান বৈয়াকরণ। তৎপুত্র পণ্ডিত শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী একজন সুলেখক। গ্রামে সংস্কৃত টোল ও সার্কেল স্কুল আছে। স্নানঘাটা নামক স্থানের প্রজাদের সহিত বিবাদ হইয়া চক্রবর্ত্তী বংশের কোন ব্যক্তি এবং কর্ম্মচারী হত হওয়ার বিবরণ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। গুরুচরণ, শশিভূষণ, বৈকুণ্ঠ চক্রবর্ত্তী মহাশয়গণের মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে বিপুল দান ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় এবং ভুরিভোজনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইঁহাদের বাড়ির তিন হিস্যাতে প্রতিদিন শত শত লোকের আহার প্রাপ্তির ব্যবস্থা আছে। এইরূপ স্বজন প্রতিপালক আজ কালকার দিনে অতি বিরল দৃষ্ট হইয়া থাকে।

নবীনচন্দ্র সেন "আমার জীবনচরিত" পুস্তকের তৃতীয়ভাগে "আল্লার ঢিল" বলিয়া যে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, উহা স্নানঘাটার প্রথম বিবাদ উপলক্ষের বিবরণ ভিন্ন আর কিছু নয়। এতদ্ভিন্ন একখানি দলীল রেজিষ্টারী ব্যাপারে চক্রবর্ত্তীদের যে বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয় উহাও ঐ গ্রন্থের অংশবিশেষ পাঠ করিয়া উপলব্দি করা যায়। মহাভারত পাঠ সমাপন উপলক্ষেও ইহারা বিস্তর ব্যয় করিয়াছিলেন।

## নলমুড়ি

প্রাচীন জমিদার বংশের কেহ কেহ এই গ্রামে বাস করিতেন। সম্প্রতি মেঘনার দ্বারা বাড়ি ধ্বংস হওয়ায় তাঁহার অন্যত্র গৃহ সংস্থাপন করিয়াছেন। এই বংশের শ্রীযুত বিশ্বেশ্বর রায় চৌধুরী একজন অভিজ্ঞ লোক, ইনি ঐতিহাসিক বহু তথ্য পরিজ্ঞাত আছেন। এই গ্রামের অল্পাংশ মাত্র বর্ত্তমান আছে।

## পিয়কাঠী, তিলৈ

উভয় গ্রামে বহু ব্রাহ্মণ বাস করেন। পিয়কাঠীর মুখোপাধ্যায় ও বারড়ী এবং তিলৈর চক্রবর্ত্তিগণ প্রসিদ্ধ। অত্রত্য মুসলমান হাজামজাতীয় ঢুলীগণ প্রসিদ্ধ ছিল। বহু শূদ্র এই সকল স্থানে বাস করিতেছে।

## টেঙ্গরা

এই স্থানে অনেক ভদ্রলোক অবস্থান করেন; তন্মধ্যে কায়স্থ বংশ প্রধান। পরগণার পূর্ব্ব জমিদারবংশ অধুনা তালুকদারে পরিণত হইলেও বিশেষ প্রতিপত্তির সহিত এই স্থানে বাস করিতেছেন। এই বংশীয় রামচন্দ্র রায় ও মহেশ চন্দ্র রায় বিখ্যাত লোক ছিলেন। রামচন্দ্র রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বি-এ, শিক্ষিত ও প্রসিদ্ধ লোক। বহু গোষ্ঠী একই বাড়িতে অবস্থান করিতেছেন। বাড়িতে কালীদেবী সংস্থাপিত আছেন। প্রতি অমাবশ্যায় ভোগ ও বলিদান হইয়া থাকে। টেঙ্গরার বাৎসরিক মেলাটী কম প্রসিদ্ধ নয়।

## বেজনীসার

এই স্থানটী মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত একটী ষ্টীমার ষ্টেশন আছে। বহু কায়স্থের বাসস্থান। পূর্ব্বতন জমিদারবংশের এক শাখা এই স্থানে বাস করেন। কতিপয় বৎসর অতীত হইল, এই স্থানবাসী ভূম্যধিকারী পূর্ণচন্দ্র রায়কে তাঁহার তালুকদারীর অন্তর্গত নাগেরপাড়ার প্রজাগণ নৃশংসভাবে হত্যা করে। ভূম্যধিকারীর অত্যাচারই নাকি ইহার মূল কারণ, কিন্তু উহার কোন রূপ প্রমাণ না হওয়ার প্রজারা কোনরূপ শাস্তি প্রাপ্ত হয় না। চন্দ্রকুমার রায় প্রভৃতি এই বংশের প্রধান লোক।

## দিক্‌শূল

এই স্থানের সীকদার-উপাধিবিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ স্বসমাজে প্রসিদ্ধ।

## পাতলা খানকাটি

এই গ্রামেও পরগণার ভূতপূর্ব্ব জমিদারবংশ বাস করিতেছেন। ইহা কালীপ্রসাদ রায়ের ভগিনী সন্তোষের ভূম্যধিকারিণী সুবিখ্যাত জাহ্নবী চৌধুরাণীর জন্মস্থান। এই স্থান মেঘনার গর্ভে বিলীন হওয়ায়, কালীপ্রসাদের পুত্র কৈলাসনাথ রায়, ধানকাটী গ্রামে বাস পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। পিতৃষসা চৌধুরাণীর অনুগ্রহে তাঁহার অবস্থা বিশেষরূপে

পরিবর্ত্তিত হইয়া সৌভগ্যে পরিণত হইয়াছে। ধানকাটী ইতিপুর্ব্বে জপসা ষ্টেটের অন্তর্গত ছিল।

### মসুরগাঁ দাসের জঙ্গল

পূর্ব্বতন জমিদারবংশের গোলোকচন্দ্র রায় ও অন্যান্য সকলে পূর্ব্বে মসুরগাঁ গ্রামে বাস করিতেন। পরে নদীকর্ত্তৃক গ্রাম ধ্বংসের পর দাসের জঙ্গলে গৃহ সংস্থাপন করিয়াছেন। গোলাকচন্দ্র ও মহেশচন্দ্র রায় তালুকদার। এক সময়ে এই স্থানে একটী সখের উৎকৃষ্ট যাত্রার দল ছিল।

### সিঙ্গারডা, বিনটীয়া (বিনয়তিলক?)

কায়স্থপ্রধান স্থান। পূর্ব্বতন জমিদার বংশের এক শাখা এই স্থানে বাস করেন। হরিচরণ রায় প্রধান লোক। বিনটীয়াতে বৈশাখ মাসে একটি মেলা বসিয়া থাকে।

### এড়িকাটী

কায়স্থপ্রধান স্থান। অত্রত্য গুহবংশ ধনী ও প্রসিদ্ধ। এখানে একটি বাজার ও পোষ্টাফিস আছে।

### পট্টী

এই স্থানে বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের ঘটক ব্রাহ্মণবংশের এক শাখা বাস করিয়া থাকেন। এই ঘটকবংশীয় গোলোকচন্দ্রও লোকনাথ কর্ত্তৃক সন্তোষের জাহ্নবী চৌধুরাণীর অর্থানুকুল্যে বঙ্গজ কায়স্থগণের এক কুলকারিকা লিপিবদ্ধ হয়। এই ঘটক মহোদয়গণ কায়স্থ সমাজে বিশেষ সম্মানিত। এই স্থানের ঘোষবাড়ি প্রসিদ্ধ।

### গোসাইর হাট

এই স্থানে একটি আউট্‌পোষ্ট আছে। ইদিলপুরের উচ্চ ইংরেজী বঙ্গবিদ্যালয়টী এই স্থানে সংস্থাপিত। এই গ্রামে কালী দেবী সংস্থাপিত।

### বুড়ীর হাট

অতি পূর্ব্ব সময়ে এই স্থানে একটি পুলিশ ষ্টেশন বা থানা ছিল। লেদাম নদী এই স্থানের প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইত; উহার তীরে একটি প্রসিদ্ধ হাট ছিল, উহারই নাম বুড়ীর হাট। এখন নদী মজিয়া প্রান্তরে ও গ্রামে পরিণত হইয়াছে। যোগেশচন্দ্র রায় প্রভৃতি হাটের মালিক। এখানে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রম আছে। বর্ষাকালে এই হাটে বিস্তর নারিকেল ও মালগার বন (খড়) বিক্রয় হয়।

## কনকসার (কনেশ্বর)

এইটী ব্রাহ্মণ প্রধান স্থান। এই স্থানবাসী জগবন্ধু চট্টোপাধ্যায় হুদাভুলুয়ার চাকুরী করিয়া বিস্তর অর্থ সঞ্চয় করেন। তাঁহাদের এক জ্ঞাতি নীলকমল চট্টোপাধ্যায়ের সহিতবিষয়ঘটিত বিবাদ উপস্থিত হওয়ার, জ্ঞাতি কার্ত্তিকপুরের জমিদার মমতাজউদ্দীন চৌধুরীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। চৌধুরী তদুপলক্ষে জগবন্ধু চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান। পরে এই জন্য মোকদ্দমা স্থাপিত হইলে চৌধুরী ও তৎপক্ষীয়গণের শাস্তি বিধান হয়।

তৎপুত্র শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন। পিতা ইদিলপুর পরগণার মধ্যে কতকগুলি স্থান পত্তনী গ্রহণ করিয়া যান, উহার আয় দ্বারা তিনি মহা সমারোহে মাতৃশ্রাদ্ধ ও মহাভারত পাঠ উদ্যাপন করেন। এই স্থানে একটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে।

## হাটুরিয়া

বর্ত্তমান জমিদার ঠাকুর বাবুদের ইদিলপুর পরগণার সদর কাছারি এই স্থানে সংস্থাপিত আছে. দর্পনারায়ণ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র মোহিনীমোহন ঠাকুরের নামে এই পরগণা নিলামে খরিদ হয়। মোহিনীমোহনের দুই পুত্র, প্রথম কানাইলাল, দ্বিতীয় গোপাললাল। কানাইলাল নিঃসন্তান থাকায় তিনি জমিদারীর নিজ অংশ গোপাললালকে পত্তনী প্রদান করিয়া বার্ষিক ২৪,০০০ হাজার টাকা মালিকানা বাবদ প্রাপ্ত হইতেন। বাবু গোপাললাল ঠাকুরের পুত্র কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, তৎপুত্র প্রথম শরদিন্দ্রমোহন, দ্বিতীয় শৈরীন্দ্রমোহন, কনিষ্ঠ নিঃসন্তান; জ্যেষ্ঠের পুত্র প্রশংসনীয় শ্রীযুত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর পরগণার মালীক ও জমিদার।

হাটুরিয়ার কাছারি ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহে সংস্থিত। বাসন্তী দুর্গোৎসবে যথেষ্ট ব্যয় হইয়া থাকে।

গোলাম আলি চৌধুরী (নকড়ি মিঞা) ইদিলপুর পরগণার সর্ব্বপ্রধান তালুকদার। তাঁহার পিতা আশক মৃধা ঠাকুর জমিদারগণের সরকারে কার্য্য করিয়া যথেষ্ট সম্পত্তি সঞ্চয় করেন। ইদিলপুর দখল উপলক্ষে যখন পূর্ব্বতন মালিকগণের সহিত ঠাকুর বাবুদের বিবাদ চলিতেছিল, তৎসময়ে আশক ঠাকুর পক্ষ অবলম্বন করিয়া, প্রভুর অনুকূলে যথেষ্ট কার্য্য সাধন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র গোলামালী ঐ সম্পত্তির যথেষ্ট উন্নতি সংসাধন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রতি ডাকাইতির অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। এই সকল ও দাঙ্গা ইত্যাদি এবং ঠাকুর বাবুদের সহিত মোকদ্দমা করিয়া গোলাম আলীর কম অর্থ ব্যয় করিতে হয় নাই। তথাপি তাঁহার অর্থের প্রাচুর্য্যতার খর্ব্ব সাধন হইয়াছিল না। তদীয় অর্থে সবডিভিসনের ম্যাজিষ্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে মাদারীপুরের নদীতে পাকা ঘাট, পাকা পোল নির্ম্মিত হইয়াছিল। তৎপ্রতিষ্ঠিত স্বনিবাস হাটুরিয়া গ্রামের মেলাটী আজিও প্রতি বৎসর যথা সময়ে বসিয়া থাকে। গোলাম আলী চৌধুরী একজন ভাগ্যবান পুরুষ ছিলেন, কিন্তু তদীয় পুত্রগণের দ্বারা এই বিষয়ে সম্পত্তির অপচয় হইয়া পড়িতেছে। এই বাড়িতে ইষ্টকালয় আছে, নয়াভাঙ্গনী নদীতীরে এই স্থানটীর

সংস্থিতি, রাস্তার বন্দোবস্ত মন্দ নয়, হাট ও একটী ষ্টীমার ষ্টেসন আছে।

### ভেদেরগঞ্জ

এই স্থানে একটা হাট, পুলিশ আউট পোষ্ট (ফাড়ি) ও রেজেষ্টরী আফিস আছে। ইহার নিকটবর্ত্তী পাইয়াতলীচরে বিস্তর মুসলমান বাস করে।

### গঙ্গানগর

ইতিপূর্ব্বে এই গণ্ডগ্রামে অনেক ব্যবসায়ী ও ব্রাহ্মণ, কায়স্থের বাস ছিল। কীর্ত্তিনাশা নদী উহার অনেককাংশ উদরসাৎ করায়, বহু বাসেন্দা এই স্থান হইতে অন্যত্র যাইয়া বাসস্থাপন করিয়াছে, অথচ নগর বোয়ালিয়া নদী সীকস্ত হওয়ায় তথাকার অনেকে আসিয়া এই স্থানে বাসস্থাপন করিয়াছে। এই স্থানে একটী হাট ও ষ্টীমার ষ্টেসন আছে।

### গয়ঘর ও উমেদপুর

এই উভয় গ্রামে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেব সংখ্যা মন্দ নয়। রায়বাড়ি প্রসিদ্ধ। অধিবাসীর মধ্যে উকীল ও মোক্তারের সংখ্যা অধিক। উমেদপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এল মহাশয় ফরিদপুর গবর্ণমেন্টের ওকালতি কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। গয়ঘরে একটী পোষ্টাফিস ও স্কুল আছে। এই স্থানে সাহজাতীয় বহু ধনীর বাসস্থান।

### কৃষ্ণনগর

কীর্ত্তিনাশা নদীর অতি সন্নিকটে দক্ষিণ পারে অবস্থিত। উহা পূর্ব্বে রাজনগরের জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। এই স্থানের হাট মন্দ প্রসিদ্ধ নয়।

### শীলার চর

আরিয়ল খাঁর অতি সন্নিকটে, একটী হাট আছে, মোসলমানের সংখ্যা অধিক। এই স্থানটীও রাজনগরেব জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। অধুনা সুয়াপুরের জমিদার শ্রীযুত কুলদাকিঙ্কর রায় বি,এল মহাশয় এই স্থানের মালীক।

### নীলখী

আরিয়ালখাঁর সন্নিকটে। এই স্থানে একটী বৃহৎ বন্দর ছিল, অধুনা ভগ্নাবস্থা। জপসাবাসী রামানন্দ সরকারের কাছারি আজিও বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বে একটী পোষ্টাফিস ছিল সম্প্রতি উহা এই স্থান হইতে উঠিয়া গিয়াছে।

### কাকর ও সরদার মামুদের চর

এই সকল স্থানে, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ প্রভৃতি নানাশ্রেণীর হিন্দুগণ বাস করিয়া থাকেন। মুসলমানের বাসও মন্দ নহে।

## পাচ্চর ও বরমগঞ্জ

পদ্মা ও আরিয়ালখাঁর সঙ্গম স্থানের অতি সন্নিকটে কয়েকটী চর দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহা সাধারণতঃ মধ্য, বাহের ও বড় চর নামে অভিহিত হয়। অতঃপর সর্ব্বশেষ আর একটা চর একপার্শ্বে অবস্থিত ছিল উহার নাম ছিল পাশ চর পরে উহাই পাচ্চর নামে পরিচিত হইয়া আসিয়াছে। জানা যায় এই চর প্রথমতঃ ২৪ পরগণার অন্তর্গত ভূকৈলাসের রাজাদের বিষয় সম্পত্তির অন্তর্গত ছিল; পরে জালালপুরের কোন মুসলমান উহার স্বত্বাধিকারী হন। রমানাথ গোপ এই স্থানে বিস্তর গরু চরাইত, দুগ্ধের ব্যবসায়াবলম্বনে তাহার বিস্তর অর্থ সঞ্চয় হয় তদ্দারা রমানাথ একটী তালুক খরিদ করিয়া পাচ্চরে বাস সংস্থাপন করে। আজিও তদীয় আবাসে একটী প্রাচীন মঠ দৃষ্ট হয়, যাহা হইতে গোপবংশের সমৃদ্ধি পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সম্ভবতঃ বৈদ্যগণ মধ্যে ধন্বন্তরি গোত্রজ বিনায়কবংশীয় কেহ কেহ সর্ব্বপ্রথম এই স্থানে বাস স্থাপন করেন, পরে বিক্রমপুরের দক্ষিণপার হইতে শক্তিমাধব সেনের বংশধর বকশী উপাধিবিশিষ্ট কেহ কেহ তথায় বাস করিতে থাকেন।

জ্ঞাতিগণের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া, আইনপুর থানার অন্তর্গত ভাবুকদিয়া গ্রাম হইতে এক বিধবা বর্ষিয়সী আগমন করিয়া, পাচচরবাসী রামশরণ সেনের বাড়ীতে তদাশ্রয়ে বাস করিতে থাকেন। একমাত্র শিশুপুত্র ব্যতীত তাঁহার আর কিছুমাত্র সম্বল ছিল না। এই বালকের নাম ছিল দেবীচরণ ; বৈদ্য ধন্বন্তরি গোত্রজ রোষবংশসম্ভূত মূরারী সেনের বংশে তাঁহার জন্ম হয়।

বয়োবৃদ্ধির সহিত পাঠশালার পাঠ পরিসমাপ্ত করিয়া দেবীচরণ, নারায়ণগঞ্জের কোন মহাজনের হিসাব-লেখক পদে নিযুক্ত হন। স্বীয় বুদ্ধিবলে ও চতুরতায় তিনি অচিরে বাণিজ্য কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া, মহাজনের প্রিয়পাত্র ও সর্ব্বপ্রধান কার্য্যকারকের পদে বরিত হন। একদা মহাজনের অনুপস্থিতিতে দেবীচরণ এক জাহাজের সমুদয় লবণ ক্রয় করিয়া উহার বায়নাস্বরূপ কিছু অর্থ প্রদান করেন। পরে মহাজন উপস্থিত হইলে তাঁহাকে এই কথা পরিজ্ঞাত করেন ; কিন্তু মহাজন এই কথা শ্রবণ করিয়া, দেবীকে বলেন, আজকাল বাজারের যেরূপ ভাব, তাহাতে এই দরে খরিদ করিয়া কখনও লাভবান্ হইবার সম্ভাবনা নাই, অতএব আমি উহা প্রত্যাখ্যান করিলাম, উহা ক্রয় করিয়া কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হইব না।

মহাজনের বাক্য শ্রবণ করিয়া, দেবীচরণ মহাবিপদে পতিত হইলেন, তখন কি করেন, একমাত্র অদৃষ্টের প্রতি নির্ভর করিয়া সেই দিন অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু তৎপরদিবস সূর্য্যোদয় সহিত দেবীর সৌভাগ্য সূর্য্যও সমুদিত হইল, দেখা গেল যে দরে লবণ ক্রয় হইয়াছে উহার দ্বিগুণ মূল্যে বাজারে তাহা বিক্রয় হইতেছে ; তৎক্ষণাৎ সমুদয় লবণ বিক্রয় করিয়া, তাহার প্রায লক্ষ টাকা মুনাফা দাঁড়াইল। প্রভুভক্ত দেবী কিন্তু, তখনও উহা আপনাব লভ্য বিবেচনা মনে না করিয়া, লভ্য অর্থ মহাজনের নিকট উপস্থিত করিলেন। মহাজন সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বলিলেন, দেখ দেবি, এই টাকা আমার নয়, তোমার কার্য্যে আজ যদি লভ্য না দাঁড়াইয়া ক্ষতি হইত উহা যখন আমি বহন করিতাম না, তখন এই লভ্যাংশ আমি লইব কিরূপে? ভগবান তোমাকেই দয়া করিয়া

উহা অর্পণ করিয়াছেন, তুমি উহা লইয়া স্বাধীনভাবে ব্যবসা করিতে আরম্ভ কর, নিশ্চয় তোমার উন্নতিলাভ হইবে। দেবী মহাজনের আজ্ঞাক্রমে সেই দিন হতেই পৃথক ভাবে বাণিজ্য ব্যবসায় চালাইতে আরম্ভ করিলেন, দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃই তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকিল। এই সময়ে নারায়ণগঞ্জের মহাজনগণ মধ্যে, নন্দী, পাস্থি, লোহাগড়ার রায়, দেবুসেন প্রধান ব্যবসায়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন।

প্রবাদ, কোন যোগীপুরুষ দেবীপ্রসাদকে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্র প্রদান করেন, তৎপর হইতে তাঁহার ভূসম্পত্তিও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। ক্রমে ঢাকা ফরিদপুরের মধ্যে অনেক স্থান তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। এই সময়ে তিনি জমিদার মধ্যে পরিগণিত হন।

দেবীচরণের দুই পুত্র, রাজকিশোর ও রামকিশোর। জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর বিষয় ও বাণিজ্য সংক্রান্ত কার্য্যভার অর্পণ করিয়া দেবীচরণ একমাত্র লক্ষ্মীনারায়ণ সেবাতেই জীবন অতিবাহিত করিতে থাকেন, পরে সেই অরাধ্য দেবের পাদপদ্মে আত্মনির্ভর করিয়া ইহলোক হইতে পঞ্চভৌতিক নশ্বর দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্যধামে প্রস্থান করেন।

পুত্রদ্বয় দেবীচরণের শ্রাদ্ধ মহাসমারোহে সম্পন্ন করেন। নানাস্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় দীনহীনগণকে অন্নবস্ত্র দান ও দানসাগর শ্রাদ্ধের আনুসঙ্গিক ব্যাপরে বহু অর্থ ব্যয় হয়। এই কার্য্যে দধি, ক্ষীর, ঘৃত, মধু প্রভৃতি তরল খাদ্য সংরক্ষণ জন্য যে সকল ইষ্টক দ্বাবা বাধান হইয়াছিল, উহার চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

দেবীচরণের উত্তরাধিকারীরা আর কিন্তু বাণিজ্য ব্যাবসায়েব প্রতি মনোযোগী থাকিলেন না, তাঁহারা জমিদার হইয়া তদ্রূপ ভাবেই চলিতে লাগলেন। উহাতে একদিকে যেমন তাঁহার "বাবু ও রায়চৌধুরী" আখ্যায় বিভূষিত হইলেন, অপরদিকে মূল সম্পত্তির প্রধান কারণ, নারায়ণগঞ্জের বাণিজ্যাগারও ক্রমশঃ অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতে লাগিল। অতঃপর আবার দেবীচরণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকান্ত, ভ্রাতুষ্পুত্রগণের সহিত সম্পত্তি লইয়া মহা গোলযোগ উপস্থিত করিলেন। বহুদিন বিবাদ বিসম্বাদের পর, উভয় পক্ষ সালিসগণের ব্যবস্থায় ১২১৩ সনের ৭ই বৈশাখ উহার মীমাংসা সাধন করেন। এই বাড়িতে বিস্তর দেবোত্তর ছিল। পাচ্চরের হাট এই লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের নামে বিস্তার দেবোত্তর ছিল। পাচ্চরের হাট এই লক্ষ্মীনারায়ণের নামানুসারে লক্ষ্মীগঞ্জ নামে পরিচিত ছিল। ইঁহাদের বিস্তর নীলের কুঠী ছিল, তদুপলক্ষে ফরাজী সম্প্রদায়ের নেতা দুধুমিয়ার সহিত ইঁহাদের বিস্তর দাঙ্গা ও মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। এই সকল নীলের কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন জজ্জ ওয়ারেণ সাহেব।

রাজকিশোরের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র গোপীমোহন সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত হন। গোপীমোহন একজন বিদ্যোৎসাহী জমিদার ছিলেন, তাঁহার সমকালে পাচ্চরবাসী স্বর্গীয় পণ্ডিত রামকুমার ন্যায়ভূষণ মহাশয় মুগ্ধবোধ, সারস্বত ও কলাপ ব্যাকরণ সার সংগ্রহপূর্ব্বক যে কলাপসার নামক ব্যাকরণ রচনা করেন তাহা গোপীমোহনের বিদ্যালোচনার প্রভাবে ও উৎসাহেই সংসাধিত হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থোক্ত নিম্নলিখিত কবিতাটিই উহার সাক্ষ্যস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে।

"ধ্যাত্বেষ্ট দেবতাংশ শ্রীরামপূর্ব্বকুমারকঃ।  
ব্যাকরণ মুগ্ধবোধ সারস্বত-কলাপকরণ॥

দৃষ্টাকলাপসারাখ্যং কুরুচেতাশুবোধকং।
ব্যাক্রিয়াং * * * শ্রীল গোপীমোহন * * *॥
আদেশাৎ পাচ্চরগ্রামনিবাসী বন্দ্যবংশজঃ।
সুধীরো রামগতিবাচস্পতিসুতোনতঃ॥

দিন কাহারও সমান ভাবে যায় না, তাই আজ দেবীচরণের বংশধরগণের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ইঁহাদের কতক সম্পত্তি গোপীমোহনের ভগ্নিপতি সেনহাটী নিবাসী গৌরচন্দ্র দাশ মহাশয়ের নামে বেনামী করা হয়, দাশ মহাশয়ের কোন পুত্রসন্তান না থাকায়, তদীয় উত্তরাধিকারী এই সম্পত্তি তাঁহার প্রাপ্য বলিয়া দাবি করায়, বহু অর্থব্যয় করিয়া তাঁহার নিকট হইতে উহা গ্রহণ করা হয়। ইঁহারা বৈদ্যবংশ মধ্যে কুলকার্য্যাদি দ্বারা বিশেষ সম্মান অর্জ্জন করিয়াছেন।

গোপীমোহনের পুত্র প্রসন্নকুমার বঙ্গভাষার যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছিলেন, সদ্ভাবশতকপ্রণেতা সুকবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, ঢাকার তৎকালিক কবি হরিশ্চন্দ্র ও প্রসন্নকুমার একত্রে সম্মিলিত হইয়া কবিতা প্রণয়ন করিয়া কাগজ বাহির করিতেন। গোপীমোহনের কনিষ্ঠ ব্রজমোহন, যিনি ফরিদপুর উকীল সরকার ছিলেন, তিনিও কাব্যপ্রিয় ছিলেন, তদ্বিরচিত বহু সঙ্গীতের কথা অবগত হওয়া যায়।

এই পরিবারের অন্তঃপুরেও বিদ্যাচর্চ্চার অনুশীলন ছিল। গোপীমোহনের দ্বিতীয়া কন্যা শরৎকুমারীর হস্তলিপি তৎকালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই পরিবারের রমণীগণ অধুনাতন কালে সমাদৃত মেয়েলী কবিতার যথেষ্ট আলোচনা করিতেন। তন্মধ্যে শরৎকুমারীর রচিত একটী ছড়া উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল :-

"তাঁতির ঘরে ছিল এক বেঙের ছানা।
খায় দায় নিদ্রা যায় তাঁতঘরে তার খানা
সুবুদ্ধি তাঁতির ছেলে সুবুদ্ধি লাগিল।
তার একটা বেঙের ছানা ওহাতে মারিল।
একদিন তাঁতির ছেলে গিয়াছিল হাটে।
সোনা কোলা বেঙের সহিত পরে গেল হটে॥" ইত্যাদি

গোপীমোহনের খুল্লতাত ভ্রাতা জগচ্চন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্রের সময়ে সুপ্রসিদ্ধ দুধু মিয়ার প্রাদুর্ভাব। কিন্তু ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রভাবে দুধু মিয়া তাঁহাদের বিশেষ কোনও অনিষ্ট সাধন করিতে সক্ষম হন নাই। এই সকল নানাবিধ কারণেই তাঁহারা অবসন্ন হইয়া পড়েন।

পাচ্চরের জমিদারবংশের হরিহর, কালীপ্রসন্ন, বৈকুণ্ঠরঞ্জন, সতীশরঞ্জন, নিরঞ্জন, সতিনাথ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

অতঃপর এই গ্রামের শম্ভুচন্দ্র কবিভূষণ কবিরাজ একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষাতে একখানা ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, যাহা তৎপুত্র ফরিদপুরের ভূতপূর্ব্ব প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র সেন কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রামবাসী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট উমেশচন্দ্র সেন ও নগেন্দ্রনাথ সেন ও ভূতপূর্ব্ব সবজজ রমেশচন্দ্র সেন, কবিরাজ রামনিধি দাস, গোবিন্দচন্দ্র সেন কবিরাজ, তারাপ্রসন্ন সেন কবিরাজ, বিশ্ববিষ গ্রন্থপ্রণেতা ডাক্তার হরিমোহন সেন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বাসস্থান।

পাচ্চর গ্রামবাসী সাহাবংশোদ্ভব বংশীবদন, পীতাম্বর ও নিলাম্বর সাহা প্রধান ব্যবসায়ী ও ধনী। কলিকাতা বেলেঘাটাতে তাহাদের চাউলের বৃহৎ কারখানা আছে। শিবচরের ইংরাজী বিদ্যালয়টী ইহাদের ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত।

বরমগঞ্জ প্রসিদ্ধ স্থান, তথায় বৃহৎ বন্দর, থানা ও রেজেষ্টারী আফিস বর্ত্তমান, শিবচরের থানা বলিয়া যাহা প্রসিদ্ধ, উহা এই বরমগঞ্জতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। বহু ব্রাহ্মণ ও ব্যবসায়ী লোক এই স্থানে বাস করিয়া থাকেন।

রামদাস বিদ্যালঙ্কার, রামকুমার ন্যায়ভূষণ, দুর্গাপ্রসাদ ন্যায়লঙ্কার স্মার্ত্ত গুরুনাথ ও উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির জন্মস্থান।

## টেঙ্গরামারি

বহু ব্যবসায়ী লোকের বাসস্থান নিবন্ধন স্থানটী পরিচিত।

## মাদারিপুর*

মাদাবিপুর স্থানটি অতি সুদৃশ্য, উহার একদিকে আড়িয়লখাঁ ও অন্য দিকে কুমার নদ প্রবাহিত থাকায়, বাণিজ্যকার্য্যপক্ষেও বিশেষ সুবিধাজনক। প্রকৃত পক্ষে মাদারিপুর একটি গ্রামের ও একটী পরগণার নামের সহিত জড়িত। সাহ মাদার নামে জনৈক মুসলমান ফকির এই স্থানে থাকিয়া যোগ সাধনা করিতেন। প্রবাদ তাঁহার নাম হইতে স্থানের নাম হয় মাদারিপুর। পবে উহা একটি পরগণায় পরিণত হয়। মাদারিপুরের কতকাংশ আবার পরগণা রাজনগরের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই পরগণার পরিমাণ ৭৮৩৬ একর বা ১২.২৪ স্কোয়ার মাইল। ৪২টি ষ্টেটের কর ৮২ পাউণ্ড ৮ শিলিং। বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত থাকা সময়ে, উহার লোকসংখ্যা ছিল দুই সহস্র, বর্ত্তমান সময়ে দ্বিগুণ হইয়াছে। রেণেলের মানচিত্রে এই স্থানের নাম দেখা যায়। সম্ভবতঃ জালালপুর ও কাশীমপুরের কতকস্থান লইয়া এই মাদারিপুর পরগণার উদ্ভব হইয়াছে।

বাখরগঞ্জ জেলার বহুপূর্ব্বতন জজ সিরিটার মফঃস্বল পরিদর্শন উপলক্ষে গোবিন্দপুরের নিকটবর্ত্তী আড়িয়লখাঁ নদে বজরায় অবস্থান করিতেছিলেন, এই সময় একদল ডাকাত তাঁহাকে আক্রমণ করে, কিন্তু উহারা অকৃতকার্য্যাবস্থায় প্রস্থান করিতে বাধ্য হয়। সিরিটার জেলায় আগমন করিয়া, আড়িয়লখাঁর তীরে একটি মহকুমা স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে এই বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ হয়, পরে নয় বৎসর অতীত হইলে, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে মাদারিপুর মনোনীত হইয়া, তথায় ফৌজদারী ও দেওয়ানী কার্য্যের বিচার জন্য মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয়।

গৌরদাস বসাক এই সবডিভিসনের অফিসার হইয়াও অধিকাংশ সময় বরিশালে অবস্থান করিতেন। বলরামের আখড়াতে এই সময়ে মুন্সেফের বিচারালয় ছিল। ঠাকুরদাসবাবু এই স্থানের সর্ব্বপ্রথম মুন্সেফ হইয়া আগমন করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ী নির্ম্মিত হইলে, জে, এ, রিকেট সাহেব প্রথম সবডিভিসনাল অফিসার হইয়া এই স্থানে আগমন করেন। বরিশাল জেলার অধীন থাকা সময়ে, বুড়ীরহাট,

* শতবর্ষ আগে

কোটালীপাড়া, মূলফৎগঞ্জ এবং শিবচর থানার কতকাংশ এই মহকুমার অন্তর্গত ছিল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মূলফৎগঞ্জ ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমা হইতে খারিজ হইয়া, এই মহকুমার অন্তর্গত হয়। এই সময়ে ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট দীনবন্ধু মৌলিক এই মহকুমায় অপ্রতিহত-প্রভাবে শাসন করিতেন। তাঁহার সময়ে ফৌজদারী মোকদ্দমা হইতে বিমুক্ত গোলাম আলি চৌধুরীর অর্থব্যয়ে মাদারিপুরের ইষ্টকপোল নির্ম্মিত হয়। দীনবন্ধুবাবুর পূর্ব্বে, ই, বি, গড্‌ফ্রী মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। এই সময়ে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে মুন্সেফ ভগবান্ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উদ্যোগে মাদারিপুর মাইনর স্কুল সংস্থাপিত হয়। তারকনাথ মল্লিক ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের সময়ে কাছারীর নিকটবর্ত্তী নদীতে পাকা ঘাট নির্ম্মিত হয়। তারকবাবু সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। প্রত্যেক রবিবার কোন না কোন সম্প্রদায়ের লোক ভোজন করাইয়া তৃপ্তি লাভ করিতেন। ডিপুটি তোজেম্বল আলীর সময়ে বঙ্গের ছোট লাট সার রিচার্ড টেম্পল মাদারিপুর আগমন করেন। ইতিপূর্ব্বে আর কোন গভর্ণর এই স্থানে আসেন নাই। এই সময়ে এই মহকুমা বাখরগঞ্জ হইতে ফরিদপুরের অন্তর্গত হয়। এই বৎসর, আর, এফ, ককরেল মাদারিপুর মিউনিসিপালিটি সংস্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৮৭৫ সনে পচফোর্ড সাহেব এই মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হইয়া আগমন করেন। ইঁহার সময়ে ঢাকার খ্যাতনামা জমিদার বাবু মোহিনীমোহন দাসের অর্থানুকূল্যে স্কুলের দালান এবং হাটুরিয়ার গোলাম আলী চৌধুরীর ব্যয়ে ডাক্তারখানার দালানের নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়। এই সময়ে এই মহকুমায় মিউনিসিপালিটির প্রবর্ত্তন হয়।

অতঃপর সুবিখ্যাত কবি নবীনচন্দ্র সেন ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে আগমন করেন। ইঁহার সময়ে স্কুলের দালান-নির্ম্মাণকার্য্য শেষ ও মিউনিসিপালিটির কার্য্যের জন্য মেথর আনয়ন করা হয়। মধুর ও অম্লসংযুক্ত চাটনির ন্যায় ইহার শাসনকার্য্যে জনগণের একটা রুচি জন্মিয়া গিয়াছিল। মাদারিপুর হইতেই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য রঙ্গমতী প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে সুবিখ্যাত পার্শী সিভিলিয়ান কে, জে, বাদশা মাদারিপুর মহকুমার ভার প্রাপ্ত হন। ইনি অতি পরিশ্রমী লোক ছিলেন। অধিকাংশ সময় এলাকার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তাঁহার সময়ে মাদারিপুরের অন্তর্গত স্থানসমূহের জঙ্গল পরিস্কৃত হয়। ১৮৮৬ সনে দ্বারকানাথ রায় মহকুমার ভার প্রাপ্ত হন। এই সময়ে স্বায়ত্তশাসন প্রথার প্রচলন হওয়ায়, মাদারিপুর লোকাল বোর্ড সংস্থাপিত হয়।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্যাটুটরি সিভিলিয়ান্ উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট্ নিযুক্ত হইয়া আগমন করেন। তৎকালে স্থানীয় প্রবীণ মোক্তার দীননাথ সেন মহাশয়ের দ্বারা মিউনিসিপাল বাজার বসাইবার প্রস্তাব হয়। তৎপরে ষ্ট্যাটুটরি সিভিলিয়ান্ সূর্য্যকুমার অগস্তির সময়ে ঐ বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে রাজমোহন চক্রবর্ত্তী মহকুমার ভার প্রাপ্ত হন। ঐ সময়ে ছোট লাট্ সার চার্লস্ ইলিয়ট পরিদর্শন উপলক্ষে মাদারিপুর আগমন করেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী ফজল করিমের সময়ে মাদারিপুর পাব্লিক্ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০১/২ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাচরণ রায় মহকুমার ভার প্রাপ্ত হন। তৎকালে ছোট লাট, সার জন উডবরণ 'বিল-রুট' পরিদর্শন উপলক্ষে এই স্থানে আগমন করেন। তারপর ১৯০২ সনের জুলাই মাসে মৌলবী আবদুল করিম

মহকুমার ভার প্রাপ্ত হন। এসেসর কর্ত্তৃক অন্যায়রূপে ইনকমট্যাক্স ধার্য্য হওয়ায়, ইহার সুবিচারে অনেকেই ঐ দায় হইতে অব্যাহতি পায়।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে এই স্থানে রেজেষ্টারী আফিস সংস্থাপিত হয়। তৎকালে ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতেই এই কার্য্যের ভার ছিল। পরে ঐ বিভাগ স্বতন্ত্র হইলে, ১৮৮৩ সনের ৯ই আগষ্ট তাবিখে স্বতন্ত্র রেজেষ্টারী আফিস স্থাপিত হয়। এই আফিস সংস্থাপনের প্রথম তারিখ হইতেই দ্বারকানাথ সেন রেজিষ্টারের কার্য্য আরম্ভ করিয়া, ১৮৯১ সন পর্য্যন্ত ঐ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি প্রথমাবধিই মাদারিপুর লোকাল বোর্ডেরও চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ও সাধারণের অর্থব্যয়ে কুমার নদের পাকা ঘাট প্রস্তুত হয়। এই ঘাট 'জুবিলি ঘাট' নামে অভিহিত হইত। ১৮৮৯ সন পর্য্যন্ত কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ, শিবচর প্রভৃতি থানার রেজেষ্টারী কার্য্য মাদারিপুরে সম্পন্ন হইত। দ্বারকানাথ সেন দক্ষতার সহিত এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সাধারণেব ধন্যবাদের পাত্র হন। তাঁহার কার্য্যকাল অতীত হইলে তৎপুত্র শ্রীমান্ উপেন্দ্রনাথ সেন কতককাল মাদারিপুরের সবরেজিষ্টারের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অন্যত্র বদলি হইয়াছেন। তাঁহারা পিতাপুত্র উভয়েই সাধারণের প্রিয় ছিলেন

মাদারিপুরের ফৌজদারীর দালান ১৯০০ সনে, মুন্সেফীর দালান ১৯০১ সনে এবং ইনস্পেকসন্ বাঙ্গলা ১৯০৩ সনে নির্ম্মিত হয়। ১৮৮২ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে তত্রত্য মধ্য-ইংবাজি বিদ্যালয় এন্ট্রান্স স্কুলে পরিণত হয়। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন এই স্কুলের প্রথম হেড্ মাষ্টার নিযুক্ত হন। এই সময়ে মিঃ ফ্রেজার সবডিভিসনাল অফিসার ছিলেন। ইহার ২০ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে উহা মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ১৮৮২ সালে মিঃ গডফ্রে সবডিভিসনাল অফিসার ছিলেন। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসু সবজজ, ক্ষীরোদচন্দ্র সেন, বি-এ, ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, উকীল শশিকান্ত রায়, বি-এল ও নিবারণচন্দ্র দাশ, এম-এ, বি-এল্ এবং রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ (রায় বাহাদুর) কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু গণনীয় লোকে এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। এই স্কুল পুনরায় মধ্যবিদ্যালয়ে এবং পরে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় এন্ট্রেন্স স্কুলে পরিণত হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাসা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইলে উহার ছাত্র কমিয়া যায়।

স্কুল ঘরখানি প্রথমতঃ খড়ের ছিল পরে সর্ব্বজয়া নাম্নী এক পতিতা রমণী ঘরের জন্য ৩০০্ টাকা দান করিয়া লোকান্তরিত হয় এবং ঢাকার বিখ্যাত জমিদার মোহিনীমোহনবাবু এই জন্য ৬০০্ টাকা দান করেন। তদ্বারা পাকা বাড়ী প্রস্তুত হয়। প্রথমাবস্থায় স্কুল সাহায্য প্রাপ্ত ছিল, পরে উহা গভর্ণমেন্ট স্কুলে পরিণত হইয়াছে।

এইস্থানে একটি প্রেস আছে। এই শান্তিপ্রেস হইতে মালিক শ্রীযুত স্বর্ণকমলবাবুর প্রযত্নে "শান্তি" নামে একখানি সংবাদপত্র বাহির হইত; সম্প্রতি উহা বন্ধ হইয়াছে। অত্রত্য লোন আফিসটি বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে।

মাদারিপুরের মাইনর মাদ্রাসা ও মসজিদ, ঢাকার নবাব বাহাদুরের অর্থানুকূল্যেই চলিয়া আসিতেছে। সাধারণের সাহায্যও না আছে এমন নয়।

অত্রত্য কালীদেবী হিন্দু সম্প্রদায়ের যত্নে সংস্থাপিত। ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রাজমোহন

চক্রবর্ত্তীর উদ্যোগে কবিরাজপুরবাসী ৺পার্ব্বতীচরণ রায় মহাশয়ের অর্থে দেবীর প্রস্তরমূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। এই বাড়ী মহকুমার মধ্যে এক দর্শনীয় স্থান। মাদারিপুরের পশ্চিমাংশে লক্ষ্মীগঞ্জ নামক স্থানে মহাপ্রভু চৈতন্য ও নিত্যানন্দের কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। রাজনগরের রাজগণ এইস্থানের মালিক ছিলেন। এই প্রতিমা ও বলরামের শ্বেত প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তি তাঁহাদের অর্থানুকূল্যেই সংস্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহাদের প্রদত্ত বাড়ী ও বৃত্তি দ্বারা এই বিগ্রহ সেবার সহায়তা আজিও চলিতেছে। উহা হাওলা পীতাম্বর সেনের অন্তর্গত বলিয়া বোধ হয় রায় গোপালকৃষ্ণ অথবা তৎপুত্রের সময়ে, তাঁহাদের সাহায্যে বিগ্রহ সংস্থাপিত হয়। এই বৃত্তির ভূমিতে মাদারিপুরের প্রধান ব্যবসায়ী ও ধনী গোবিন্দ সাহা এবং লোকনাথ সাহার বাসভবন বলিয়া, মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের সেবার ভার তাঁহারাই গ্রহণ করিয়াছেন। মোহন্তের নাম চণ্ডীচরণ শর্ম্মা। পূর্ব্বে যে ইষ্টকালয়ে বিগ্রহ সংস্থাপিত ছিলেন, উক্ত সাহাদ্বয় প্রচুর অর্থ ব্যয়ে সেই মন্দিরের নূতন সংস্করণ করিয়া উহা সুদর্শনীয় করিয়াছেন। সম্মুখে সুন্দর নাট-মন্দির। সাহাদের বাসভবন হর্ম্ম্য দ্বারা পরিশোভিত। এতদ্ভিন্ন জগন্নাথ-বিগ্রহও রাজাদের বৃত্তি দ্বারা অর্চ্চিত হইতেছেন। নদীকর্ত্তৃক বলরামের আখড়া বিনষ্ট হইলে, ঐ বিগ্রহ আমিরবাদ গ্রামে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। অত্রত্য বণিক্ বাড়ীটী দেখিতেও সুন্দর।

মাদারিপুরের বৈদিক পাঠক বাড়ী প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতির কথকতা করায় পাঠক নামে পরিচিত হন। বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা এই বংশের রামকৃষ্ণ পাঠক বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করেন। তদীয় উপার্জ্জিত অর্থে বহু সৎকার্য্য সংসাধিত হইয়াছে। এই বংশের ভুবনমোহন পাঠক, বি,এ, বিখ্যাত লোক।

মাদারিপুর একটী প্রধান বাণিজ্য-স্থান। এই স্থানে যথেষ্ট পরিমাণ পাটের আমদানী ও রপ্তানী হয়। বহু দেশীয় ও ইংরেজ ব্যবসায়ীর পাটের গুদাম এই স্থানে ও তৎসংলগ্ন চরমুগরিতে দৃষ্ট হয়। ইতিপূর্ব্বে যে সাহ মাদারের কথা বলা হইয়াছে, যাঁহার নাম হইতে মাদারিপুর নামের উৎপত্তি, স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ সন্ধ্যার সময়ে ধুপ্র দীপ প্রদানকালে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন।[১] এইস্থান বাণিজ্য ব্যবসায়ের উপযুক্ত বলিয়া কলিকাতা, আসাম, ঢাকা, গোয়ালন্দ প্রভৃতি স্থান হইতে নিয়তই ষ্টীমার গমনাগমন করিয়া থাকে। আড়িয়লখাঁর আক্রমণে মাদারিপুরের অনেকাংশ জলসাৎ হইয়া উহাকে অনেকটা শ্রীভ্রষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ইষ্টকনির্ম্মিত ফৌজদারী ও মুন্সেফী আদালত, স্কুল, পোষ্টাফিস এবং সবডিভিসনাল অফিসারের অবস্থানগৃহ প্রভৃতিই উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দালান আরও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। মাদারিপুর হইতে একটী বৃহৎ রাস্তা বরিশালের দিকে চলিয়া গিয়াছে।

১. মাদারিপুরের পূর্ব্বদিকে সাহ মাদারের দরগাতে তাঁহার সমাধিস্থান অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে বটবৃক্ষমূলে উক্ত ফকির যোগ সাধনা করিতেন ঐ বৃক্ষ না থাকিলেও উহার শাখা হইতে উদ্ভূত দুইটী বটবৃক্ষ অদ্যাপি সজীবাবস্থায় বিদ্যমান আছে। বৃক্ষমূল ইষ্টক গ্রথিত ; কি হিন্দু কি মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই ঐ স্থানটীকে প্রীতিব চক্ষে অবলোকন করিয়া থাকেন। টিনের ঘরে ও একটী সমাধি তথায় দেখা যায়। এইস্থানে 'মানত' প্রদত্ত হইয়া থাকে।

## কুলপদ্দী

মাদারিপুরের সংলগ্ন। এইস্থানে বহু কলুজাতির বাস ছিল। এই সকল কলুর তৈলের ঘানি টানিতে যে সকল বলদ ব্যবহার হয়, উহা এতদ্দেশীয় অন্যান্য স্থানের বলদ অপেক্ষা সমধিক হৃষ্টপুষ্ট। কুলপদ্দীর অনেকাংশ আড়িয়লখার গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

## মাইজপাড়া

মাদারিপুরের দক্ষিণে। বরিশাল রাস্তার সন্নিকটে। এই গ্রাম ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রভৃতি হিন্দুজাতির বাসস্থান। খালিয়া গ্রামবাসী রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায় ডিপুটী ম্যাজিস্ট্রেট পরে এই গ্রামবাসী হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রদ্বয় শ্রীযুত হেমচন্দ্র ও শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও ডিপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। অত্রত্য ব্রাহ্মণ লস্কর বাড়ী প্রসিদ্ধ। তাঁহারা ভূম্যধিকারী। এই বাটীতে অনেক পদস্থ লোক আছেন তন্মধ্যে শ্রীযুত আশুতোষ লস্কর প্রসিদ্ধ। একটী ইংরেজী বিদ্যালয় আছে। কোন কোন স্থানে জঙ্গল থাকায় মধ্যে মধ্যে ব্যাঘ্রের উপদ্রব হইয়া থাকে। একটী ক্ষুদ্র মঠ আছে।

## ধুলগাঁও

এই স্থানটীও বরিশাল রাস্তার সন্নিকট, ব্রাহ্মণ-প্রধান স্থান। রায়চৌধুরিগণ ইহার প্রাচীন অধিবাসী। এই বংশের চিন্তাহরণ রায়চৌধুরী মাদারিপুরে মোক্তারি কার্য্য করিয়া থাকেন। এইস্থানে একটী বৃহৎ দীঘী আছে।

## খৈয়ারভাঙ্গা

অধিবাসিগণের মধ্যে বৈদ্যই প্রধান। ইহার নিকটে একটী বৃহৎ সরোবর আছে। তাহা 'সেনাপতির দীঘী' বলিয়া পরিচিত। চৈত্র-সংক্রান্তি দিবসে বহু লোক তথায় উপস্থিত হইয়া স্নান করিয়া থাকে ও জলে মানত "খৈ" প্রদান করিয়া থাকে। তত্রত্য অমরচন্দ্র দাশ প্রসিদ্ধ কবিরাজ ছিলেন। তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপচন্দ্র দাশ সুসঙ্গের মহারাজের পারিবারিক চিকিৎসক। মধ্যম পুত্র ললিতমোহন দাশ মাদারিপুরে কবিরাজী করেন। তত্রত্য শরচ্চন্দ্র দাশ, বি,এল, ফরিদপুর জজকোর্টের অন্যতম উকীল।

## ধুয়াসার

এই গ্রামটি বরিশাল রাস্তার সন্নিকটে, ব্রাহ্মণ-প্রধান স্থান। চৌধুরিগণ প্রসিদ্ধ। এই স্থানে পুষ্করিণী খননকালে একটি প্রস্তরনির্ম্মিত বাসুদেব-মূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এইস্থানে একটি দীঘী আছে। এই চৌধুরিগণও ধুলগায়ের চৌধুরিগণ একবংশ সম্ভূত। তাঁহাদের ও এই চৌধুরিগণের সম্বন্ধে একটি প্রাচীন কাহিনী এই দীঘীর সহিত জড়িত রহিয়াছে। প্রবাদ এই চৌধুরিগণের সহিত অপর কোন ব্যক্তির বিষয়ঘটিত মোকদ্দমা ছিল। তাহার জয়পরাজয়ের উপর তাঁহাদের জীবনোপায়ের নির্ভর ছিল। চৌধুরী-পক্ষ হইতে যিনি মোকদ্দমার তদ্বিরের জন্য গমন করেন, তাঁহার সহিত একটি পোষা কবুতর

দেওয়া হয় ; উদ্দেশ্য, জয় পরাজয়ের বার্ত্তা তাঁহারা সত্বর প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। এদিকে তাঁহারা মোকদ্দমায় জয়ী হইলেন বটে, কিন্তু শত্রুপক্ষ তাঁহাদের গোপনীয় তথ্য অবগত হইয়া, তৎসদৃশ্য আর একটি কবুতরের গলদেশে পরাজয়সূচক লিপি বদ্ধ করিয়া উহা উড্ডীন করিয়া দেন। কবুতর চৌধুরিদের প্রাঙ্গণে উপনীত হইলে, তাঁহারা উহার গলবদ্ধ চিঠি উন্মোচনপূর্ব্বক পাঠ করিয়া অবগত হন যে মোকদ্দমায় তাঁহাদেরই পরাজয় হইয়াছে। তাহাতে এই চৌধুরি বংশের যাবতীয় স্ত্রীপুরুষ দলবদ্ধ হইয়া এই দীঘীতে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। এই সময়ে একটিমাত্র কুলবধূ অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় পিত্রালয়ে অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি মাত্র জীবিত থাকেন। সেই গর্ভে একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই এই বর্ত্তমান চৌধুরি-বংশের বীজিপুরুষ। ধুলগাঁও ও ধুয়াসারের চৌধুরিগণ শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ ; তাঁহাদের সংস্থাপিত কুলীনগণ এই উভয় স্থানে বাস করিতেছেন।

## ঘাটমাঝী

এই গ্রাম মাদারিপুরের নিকটবর্ত্তী। এখানে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় লোকের বাস আছে। এইস্থানের একটি পুরাতন ঘটনা উল্লেখ করা যাইতেছে। এই স্থান পূর্ব্বে জালালপুর জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। তাঁহাদের কর্ম্মচারী রতিরাম দাস ঐ জমিদারীর মধ্যে এক বৃহৎ তালুক করিয়া লন। এজন্য জমিদারগণের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য হয়। জমিদার মেঘা মিঞা রতিরামের তালুক লুণ্ঠন করিতে গমন করিলে উভয়পক্ষে একটি দাঙ্গা হয়। তাহাতে জমিদার মেঘা মিঞা হত হন। এই সময়ে জমিদারের অধিকৃত বহুস্থান রতিরাম লুণ্ঠন করিয়া লন। এতৎসম্বন্ধে একটী গ্রাম্য কবিতা শুনা যায়।

"মেঘা মিঞা চেগা হইল বিধি হইল বাম।
ঘাটমাঝী লুটিয়া নিল বুড়া রতিরাম॥"

উল্লিখিত ঘটনার পরে মেঘামিঞার স্ত্রী, রতিরামের আত্মীয় তিতুরাম মিত্র ও ভীমদাস দ্বারা কৌশলে রতিরামকে আবদ্ধ করিয়া বলেন–'রতি যদি আমাকে বিবাহ করে, তবে তাহার মুক্তি ; অন্যথা রতিকে হত্যা করা হইবে।' রতিরাম এই প্রস্তাবে স্বীকৃত না হওয়ায়, তাহাকে বধ করা হয়।

## ফাসিয়াতলা

আড়িয়লখাঁর তীরবর্ত্তী এই স্থানে বহুকালের একটি হাট আছে। উহার নাম "ফাসিয়াতলার" হাট। এই সম্বন্ধে এক কিংবদন্তী অবগত হওয়া যায় যে, ইংরেজ অধিকারের প্রথমাবস্থায় রাজদণ্ডে দণ্ডিত এক ব্যক্তির ফাঁসি এইস্থানে হইয়াছিল, এইজন্য উহার নাম হয় 'ফাসিয়াতলা'। তৎকালে ডাকাইতির স্থানে লইয়া যাইয়া ফাঁসি দেওয়া হইত। বহুকাল যাবৎ আড়িয়লখাঁ নদী ডাকাইতগণের লীলাক্ষেত্র ছিল। এইস্থান হইতে প্রচুর লোনা ইলিশ মৎস্য বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে।

## খাজুরতলা ও কালকিনী

কাল্‌কিনীর উসুল-তহশীলের জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক খাজুরতলাতে একটি কাছারী

সংস্থাপিত হয়। একজন ডেপুটীকালেক্টর উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তথায় অবস্থান করিতেন। এই জন্য তথায় একটি হাটও বসিয়াছিল। আনন্দচন্দ্র বসু ডেপুটী কালেক্টর কর্ত্তক এই স্থানের বিশেষ উন্নতি সংসাধিত হয়। আড়িয়লখাঁ হইতে একটি ধারা ফাসিয়াতলার নিম্ন দিয়া বরাবর দক্ষিণদিকে প্রধাবিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র স্রোতোধারা বেগবতী হইয়া গৌরনদী প্রভৃতি বহু জনপদ উদরসাৎ করে। সেই সকল গ্রাম পুনরায় চর পড়িয়া যে স্থানের উৎপত্তি হয় তাহাই 'কালকিনী' নামে অভিহিত হয়। খাজুরতলা ও কালকিনীর চর এই উভয়ের মধ্যে এখন একটি ক্ষীণতোয়া স্রোতস্বতী বিদ্যমানা আছে। গভর্ণমেন্টের খাস মহাল কালকিনীতে প্রায় লক্ষ টাকা আদায় হইয়া থাকে। অধিকাংশ অধিবাসীই নমশূদ্র ও মুসলমান।

## বাজিতপুর

এই গ্রামে অনেক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বাস করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ মজুমদার বংশ প্রসিদ্ধ। এই বংশের আদিপুরুষ আত্মারাম সান্যাল বরেন্দ্রভূমি হইতে রাজকার্য্য ব্যপদেশে এই দেশে আগমন করিয়া এখানেই বাস স্থাপন করেন। নবাব সরকারের কার্য্যদ্বারা তিনি কতক ভূসম্পত্তি ও মজুমদার উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রাচীন বাড়ীতে একটী বৃহৎ সরোবর ও প্রাচীন ইষ্টকালয় অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম-এ, প্রভৃতি এই বাড়ীতে বাস করেন। আত্মারামের বংশধরগণ মধ্যে কেহ এই গ্রাম মধ্যে নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতেছেন ; এই বাড়ীর ঈশ্বরচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পাঁচটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তন্মধ্যে একটী অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। অপর চারি পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ করুণাকান্ত মজুমদার, দ্বিতীয় রাজকুমার, তৃতীয় দীনবন্ধু ও চতুর্থ সূর্য্যকান্ত জীবিত থাকেন। মুক্তাগাছার জমিদার কাশীকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের স্ত্রী লক্ষ্মীদেব্যা চৌধুরাণী এই সূর্য্যকান্তকে দত্তক গ্রহণ করেন। এই মহাত্মাই মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুর, পরে ময়মনসিংহের মহারাজ নামে পরিচিত হন। সূর্য্যকান্ত লক্ষ্মীর বরপুত্র হইয়াও বীণাপানির অনুগ্রহলাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন না, তৎপ্রণীত শীকার-কাহিনী গ্রন্থই উহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সূর্য্যকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বীয় অগ্রজ রাজকুমার মজুমদার মহাশয়কে জমিদারীর সর্ব্বপ্রধান তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত করেন। তীক্ষ্ণবৃদ্ধি রাজকুমার যথাবিধানে সুশৃঙ্খলার সহিত স্বপদোচিত কার্য্য সমাধা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, এই কারণে মহারাজ সূর্য্যকান্ত তাহাকে কতকগুলি বিষয় সম্পত্তি করিয়া দেন। এতদ্ভিন্ন মহারাজের সাহায্যে রাজকুমার আপনার জ্যেষ্ঠ তনয়া ইন্দুবালাকে ময়মনসিংহের রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র কুমার উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরীর সহিত ও দ্বিতীয়া কন্যাকে রাজসাহী খাজুরাবাসী ভোলানাথ খাঁর সহিত বিবাহ দেন। এই উভয় কার্য্যে যথেষ্ট অর্থব্যয় হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে কুলীন ও ঘটক নিমন্ত্রিত হইয়া যথোচিত বিদায় প্রাপ্ত হন। আমরা যে ইন্দুবালা দেবীর নাম উল্লেখ করিলাম তিনি একজন বিদুষী গ্রন্থরচয়িত্রী।

মহারাজ স্বীয় গর্ভধারিণী মাতা ত্রিপুরাসুন্দরীর নামে একটী দাতব্য চিকিৎসালয়

বাজিতপুর গ্রামে সংস্থাপিত করিয়া সমুদয় ব্যয় স্বয়ং বহন করিয়াছেন। উহাতে যে এই স্থানের যথেষ্ট উপকার সংসাধিত হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। মহারাজের অর্থানুকুল্যেও রাজকুমার মজুমদার মহাশয়ের উদ্যোগেই এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহার অল্পকাল পরেই রাজকুমার মৃত্যুমুখে পতিত হন। রাজকুমার দ্বারা হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত বহু সৎকার্য্য সংসাধিত হয়।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার মজুমদার তাঁহাদের পিতৃদেব রাজকুমার মজুমদার মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ বহু সমারোহে সম্পন্ন করেন। উহাতে দানসাগর কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় এবং বহু লোককে পরিতোষ সহকারে ভোজ্য প্রদানের এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। উক্ত ভ্রাতৃদ্বয় স্বীয় পিতৃদেব রাজকুমারের নামে একটী উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া সাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

## মস্তাফাপুর

এই গ্রামটী মাদারিপুরের অনতিদূরে কুমার নদের তীরে সংস্থাপিত। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের বাস নিবন্ধন গ্রামটী উন্নত। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ মজুমদারগণ প্রসিদ্ধ; বৈদ্যদের মধ্যে কয়েকজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। এইস্থানে একটী মঠ আছে। সম্ভবতঃ আলিবর্দ্দীখাঁর প্রধান সেনাপতি মস্তাফাখাঁর নাম অনুসারে এই স্থানের নাম হইয়াছে।

## রাজোর ও গোবিন্দপুর

এই উভয় স্থানে অনেক ব্রাহ্মণ বাস করিয়া থাকেন। রাজ্যের গ্রামে পূর্ব্বে একটী পুলিশ আউট-পোষ্ট ছিল। গোবিন্দপুর গ্রামে একটী প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। এই স্থানে একজন ফৌজদার অবস্থান করিতেন। সেনদিয়ার মজুমদার বংশের পূর্ব্বপুরুষ বাণীনাথ মজুমদার গোবিন্দপুরে যে তারা দেবীর বিগ্রহ সংস্থাপন করেন, উহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। মজুমদার বংশের বৃত্তিদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা চলিতেছে।

## সেনদিয়া

বৈদ্য বিষ্ণুদাশবংশীয় শ্রীনায়ক দাশ মহাশয়ের, জানকীবল্লভ, বাণীনাথ, গৌরীনাথ, রমানাথ ও লক্ষ্মীনাথ নামে পাঁচটা পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। জানকী স্বীয় ক্ষমতায়-খুলনার অন্তর্গত খড়রিয়া পরগণার জমিদারী লাভ করেন,[১] কিন্তু তাঁহার আশঙ্কা হয়, পাছে কনিষ্ঠগণ উহার অংশ দাবি করিয়া বসেন। রমা ও লক্ষ্মী ইতিপূর্ব্বেই কালগ্রাসে পতিত হন; এখন বাণী ও গৌরী এই দুই শিশুভ্রাতাও যাহাতে সেই পথের বশবর্ত্তী হন জানকীবল্লভ তাহার চেষ্টাতেই ব্রতী হইলেন। জানকীর পত্নী কিন্তু উহা লক্ষ্য করিয়া বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়েন, কারণ পতির এই বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণকে তিনিই মাতৃস্থানীয় হইয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এখন অনন্যোপায় হইয়া, এক বৃদ্ধ ভৃত্যকে বশ করিয়া, তদ্দারা যাহাতে এই শিশুদ্বয় দূরদেশে প্রস্থান করিতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া

১. খড়রিয়া পরগণার বিবরণ দেখ।

দেন। কাজে তাহাই হইল; এক তমসাবৃত নিশ্চিতে ভৃত্য এই দুই শিশুকে লইয়া স্বদেশ হইতে প্রস্থান করিল। প্রবাদ, জানকীবল্লভের স্ত্রী ভৃত্যকে বলিয়া দেন যে, সে যেন উহাদিগকে লইয়া ভুষণার রাজ-মহিষীর করে সমর্পণ করে; তিনি অবশ্যই তাঁহাদের সম্বন্ধে যে কোন সুবিধা করিয়া দিতে পারিবেন। ভৃত্য আদেশমত কার্য্য করিল। ভূষণার রাণী ইহাদিগকে অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিলেন, এবং তাঁহারা যাহাতে উত্তরকালে ক্ষমতার্জ্জন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তদুপযোগী বিদ্যার্জ্জনের উপায় ও নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

দিন কাহারও সমভাবে বিগত হয় না। বয়োবৃদ্ধির সহিত বাণী ও গৌরী কৃতবিদ্য হইয়া, বিষয় কর্ম্মানুসন্ধানের জন্য রাণীর নিকট বিদায় গ্রহণান্তর তৎকালীন রাজধানী ঢাকাতে উপনীত হন। এই সময় গোবিন্দপুর গ্রামে একজন ফৌজদার অবস্থান করিতেন, বাণী তদধীনে এক কার্য্য গ্রহণ করিয়া, গোবিন্দপুরে আগমন করেন। তদীয় কার্য্যকুশলতায় পরিতুষ্ট হইয়া ফৌজদার তৎপ্রতি যারপরনাই অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ফৌজদারের সহায়তাতেই তিনি ফতেজঙ্গপুর পরগণার তিন আনা পাঁচ গণ্ডা জমিদারী লাভ করিতে সমর্থ হন এবং গোবিন্দপুরেই প্রথম বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া তথায় তারাদেবী মূর্ত্তি সংস্থাপন করেন। এই সময়ে বাণীনাথের 'মজুমদার' উপাধি লাভ হইয়াছিল। বাণীনাথের এই জমিদারী, কবিশেখর নামের সহিত জড়িত দেখিয়া, বোধ হয় যে উহা তদীয় পৌত্র কৃষ্ণদেব কবিশেখরের নামে গৃহীত হইয়াছিল। এই কবিশেখর গোবিন্দপুর পরিত্যাগ করিয়া কানুড়িয়াতে বাস স্থাপন করেন। পরে বাণীর দ্বিতীয় পুত্র রত্নেশ্বর গোবিন্দপুর পরিত্যাগ করিয়া সেনদিয়া আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

সেনদিয়া অতি ক্ষুদ্র স্থান, ইহার চতুর্দ্দিক্ গড়ে পরিবেষ্টিত। তন্মধ্যে একটী বৃহৎ দীর্ঘিকা বিদ্যমান দেখা যায়। কিংবদন্তী, উহা মুকুটরায় নামক জনৈক সমৃদ্ধিসম্পন্ন লোক কর্ত্তৃক নিখাত হইয়াছিল। বঙ্গদেশের নানা স্থানে মুকুট রায় নামধারী বহু লোকের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে কে এই মুকুট রায় ছিলেন উহা নির্দ্দেশ করা সহজ সাধ্য নয়। কেহ কেহ এই দীঘী মজুমদারগণের খনিত বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এক সময়ে এই সরোবরে যে ইষ্টক নির্ম্মিত ঘাট ছিল তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই মজুমদার বংশে রামচন্দ্র কর্ণাভরণ ও বিষ্ণুরাম কবিরাজচন্দ্র মজুমদারের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন আরও পণ্ডিত এই বংশে ছিলেন বলিয়া তাঁহারা গৌরব করিয়া এই স্থানকে, সেন-দিয়া বলিয়া গৌরব প্রকাশ করিতেন। কবিরাজচন্দ্র মজুমদার সেনদিয়া জন্মগ্রহণ করিলেও পশ্চাৎ খান্দারপাড় গ্রামে যাইয়া বাস করেন। এতন্নিবন্ধন তাঁহার ও তদ্বংশধরগণের বিবরণ খান্দারপাড়ের বিবরণে বিশেষভাবে উল্লেখ থাকিবে।

রামচন্দ্রের পুত্র রঘুরাম ও মধুসূদন। কিন্তু মধু জমিদারীর অংশ প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার অংশে একখানা তালুক মাত্র ছিল। মধু মজুমদার সম্বন্ধে এই কিংবদন্তী শ্রুত হওয়া যায় যে, তিনি অপরিমিত ভোজন করিতে পারিতেন। বিবাহ রাত্রিতে বাসরঘরে নবপরিণীতা অকস্মাৎ এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া ভয়ে চীৎকার করায় বাটীস্থ জনগণ তথায় সমবেত হইয়া চীৎকারের কারণ অবগত হন। অনেকেই মধুর পরিচয় অবগত ছিলেন ; একডোল খৈ ৩৪ কাঁদি কলা দ্বারা ফলাহার করা যে মধুর পক্ষে কোনরূপ

আশ্চর্য্যের কথা নয়, এই কথা তাহারা বধূকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া বলায়, মধুর স্ত্রী আশ্বস্তা হন।

শ্রুত হওয়া যায় যে বাণীনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামনারায়ণ কণ্ঠাভরণ ভ্রাতাদিগকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া সমুদয় সম্পত্তি হস্তগত করেন। পরে কণ্ঠাভরণের সর্ব্বকনিষ্ঠ রত্নেশ্বরের পৌত্র রঘুরাম মজুমদার উহার উদ্ধার সাধন করিয়া কতক অংশ বাহির করিয়া লন। তদবধি তদীয় সন্তানগণ এই জমিদারী ভোগ করিয়া আসিতেছেন। রামচন্দ্র কর্ণাভরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুরামের চারি পুত্র উহা সমানভাবে প্রাপ্ত হইলেও তদীয় তৃতীয় পুত্র রামশঙ্কর এই জমিদারীর অন্তর্গত এক বিস্তৃত তালুক করিয়া অন্যান্য অংশীদারগণের অপেক্ষায় বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হন।

জপসাবাসী লালা রামপ্রসাদের চতুর্থ পুত্র লালা রাজনারায়ণের সহিত রামশঙ্কর মজুমদারের কন্যার এবং রামশঙ্করের পুত্র কীর্ত্তিনারায়ণ মজুমদারের কন্যার সহিত রাজনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র কবিবর লালা জয়নারায়ণের পুত্র জগচ্চন্দ্র বাবুর পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। কীর্ত্তিনারায়ণ অতি তাপস লোক ছিলেন, অধিক বয়সে জপসা গ্রামে তাঁহার মৃত্যু সংঘটিত হয়। তৎসম্বন্ধে যে সকল বিবরণ মদীয় পিতাও পিতৃব্যগণ এবং অন্যান্য প্রাচীন লোক নিকট অবগত হইতে পারিয়াছি উহা নিম্নে বিবৃত করা হইল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কীর্ত্তিনারায়ণ সর্ব্বদাই তপস্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। যৎকালে স্বদেশে থাকিতেন তখন প্রায়ই পূর্ব্বপুরুষ সংস্থাপিত গোবিন্দপুরের ৺তারাদেবীর আলয়ে এবং যখন জপসা আসিতেন তৎকালে লালা জয়নারায়ণ প্রতিষ্ঠিত ৺কালীদেবীর মন্দিরেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি প্রচুর আহার করিতে সমর্থ ছিলেন। অশীতি বৎসর অতিক্রান্ত হইলে, তাহার অন্নাহারের কিঞ্চিৎ ন্যূনতা হয়, তদ্দৃষ্টে তিনি তাঁহার তনয়া শশী দেবীকে (জগচ্চন্দ্র বাবুর স্ত্রীকে) বলেন, 'আমার আসন্নকাল উপস্থিত, অতি শীঘ্রই আমার জীবনাবশান হইবে, তোমার ভ্রাতাকে সত্বর এই স্থানে আসিতে পত্র প্রেরণ কর।' তদুত্তরে কন্যা বলিলেন, 'আপনি কি বলিতেছেন? এক সেরের স্থানে তিন পোয়া অন্ন হওয়াতেই আপনার মৃত্যু হইবে! আপনি এখন যে পরিমাণ খাইয়া থাকেন উহাব একচতুর্থাংশ খাইয়া কত লোক বাঁচিয়া রহিয়াছে।' কীর্ত্তিনারায়ণ আর কোন কথা না বলিয়া স্বয়ং নিজ বিবরণ পুত্রকে লিখিলেন, পুত্রও ভগ্নীর ন্যায় এই অবস্থায় মৃত্যু অসম্ভব বিবেচনায়, বৈষয়িক কার্য্য সমাপনান্তে কিছুদিন পরে পিতৃসকাশে যাইবেন স্থির করিয়া, পিতৃদেবকে তাহাই লিখিয়া পাঠাইলেন।

এই চিঠী প্রাপ্ত হওয়ার পর দিবস অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া কীর্ত্তিনারায়ণ প্রাতঃস্নান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনান্তে সূর্য্যোদয় হইলেই যখন সকলে গাত্রোত্থান করিল, তখন তাহাদিগকে বলিলেন, 'তোমরা সকলে শীঘ্র সমবেত হও অদ্য আমার শেষদিন্ উপস্থিত।' এই কথায় সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কেহ বিশ্বাসে, কেহ অবিশ্বাসে, তথায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। এই কথা ক্রমশঃ গ্রামময় রাষ্ট্র হইলে সকলেই কীর্ত্তিনারায়ণকে শেষ দেখার জন্য আসিয়া উপস্থিত। লালার বাড়ীতে যেন হাট বসিয়া গেল ; শুনিয়াছি আত্মীয় স্বজন সকলেই উপস্থিত কিন্তু কীর্ত্তিনারায়ণের ভাগিনেয়-পুত্র বিশ্বনাথ বাবুর স্ত্রী তখন পর্য্যন্ত তথায় আসিয়া উপস্থিত হন নাই। তাঁহার সহিত

দেখা না করিয়া যা তাহাকে আশীর্ব্বাদ না করিয়া বৃদ্ধ যাইতে পারেন না, কিছু পরেই তিনি আসিয়া বৃদ্ধের পদধূলি গ্রহণ করিতেই, আর বিলম্ব করা উচিত নয় বলিয়া কীর্ত্তিনারায়ণ বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। ক্রমে তিনখণ্ড অতিক্রম করিয়া যখন চতুর্থ তোরণে উপনীত হইলেন। তখন আর তাঁহার স্বয়ং হাঁটিয়া যাইবার বল থাকিল না, তাঁহারই আজ্ঞামত তাঁহার দুইজন সজাতি তাঁহার বাহু তাঁহাদের স্কন্ধে স্থাপন করিয়া চলিতে লাগিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল স্বয়ং পদব্রজেই কালীদেবীর মন্দিরে উপনীত হন কিন্তু বিশ্বনাথের স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ উপলক্ষে বিলম্ব হওয়ায় তাহা আর পারিয়া উঠিলেন না।

এই সময়ে তিনি কন্যা ও জামাতাকে ডাকিয়া বলিলেন, দেখ ৺কালীদেবীর বাড়ীতেই যেন আমার সৎকার কার্য্য শেষ হয় ; আর যে ভূমিতে আমাকে দাহ করা হইবে, উহা আমার নিজস্ব হওয়া চাই, এই পাঁচগণ্ডা কড়ি, আমি দিতেছি, তৎপরিবর্ত্তে, আমাকে কতকটুকু জমির স্বত্ব ত্যাগ করিয়া দেও। তাঁহারা আসন্নকাল নিকটবর্ত্তী বলিয়া আর কোন কথা না বলিয়া কতকটুকু জমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। কীর্ত্তিনারায়ণ ৺কালীবাড়ীতে উপস্থিতান্তে দেবীর নিকট বসিয়া কিঞ্চিৎকাল জপ করিয়া পুনরায় গৃহ হইতে বাহির হইয়া তত্রত্য পঞ্চবটী মূলে কুশাসনে শয়ন করিয়াই বলিলেন, আমি চলিলাম এখন তোমরা তোমাদের কার্য্য সম্পাদন কর। ইতিপূর্ব্বেই তথায় জনতা হইয়া হরিসংকীর্ত্তন, কালী কীর্ত্তন চলিতেছিল, কীর্ত্তিনারায়ণের দেহাবসানের সহিত উহা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া, দূরদূরান্তরে তাঁহার স্বর্গগমন বিঘোষিত করিয়া দিল। কীর্ত্তিনারায়ণের পুত্র তথায় উপস্থিত না থাকিলেও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র তারিণীপ্রসাদ স্বীয় মাতামহ ভবন এই লালাবাবুর বাড়ীতেই অবস্থান করিতেছিলেন, তিনিই তাহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদনের ভার প্রাপ্ত হইয়া অন্যান্য সজাতির সহায়তায় তাঁহার শেষকার্য্য সম্পাদন করেন।

কীর্ত্তিনারায়ণের পুত্র রামকিশোর মজুমদার তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ঘোর বিষয়ী লোক ছিলেন। তৎপুত্র রাধামাধব কিন্তু পিতামহের ন্যায়ই জপ ও তপেই নিযুক্ত থাকিতেন। এই রাধামাধব মজুমদার মহাশয়ের যথাক্রমে পাঁচটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে স্বদেশহিতৈষী বাগ্মীপ্রবর অনারেবল্ শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার চতুর্থ। এই বংশের সকলেই বিশেষ বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের কনিষ্ঠভ্রাতা রাসবিহারী মজুমদার, বি, এল, তদীয় মধ্যমভ্রাতা পার্ব্বতীচরণ মজুমদার মহাশয়ের পুত্র যতীন্দ্রচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের পুত্র চারুচন্দ্র মজুমদার বি,এল, ওকালতী কার্য্যে এবং অম্বিকা মজুমদার মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র কিরণচন্দ্র মজুমদার বি,এ, শিক্ষকতা ও তদীয় তৃতীয় পুত্র হেমচন্দ্র মজুমদার, বি,এল্ কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺গুরুচরণ মজুমদার মহাশয়ের প্রণীত একখানি গ্রন্থ আছে, তৎপুত্র শীতলচন্দ্র মজমুদার বি,এ। মধুসূদন মজুমদার মহাশয়ের বংশে শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ মজুমদার যশোহরের জজকোর্টের সেরেস্তাবাদী পদে নিযুক্ত ছিলেন। তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত শশধর মজমুদার, বি-এ, কবিরাজ লালবিহারী মজুমদার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কীর্ত্তিনারায়ণ মজুমদার মহাশয়ের ভ্রাতা কালীপ্রসাদ মুন্সী মজুমদার উপযুক্ত লোক ছিলেন। মুন্সী মজমুদারের বংশধর চন্দ্রকুমার মজুমদারকে অনেকেই পরিজ্ঞাত আছেন।

বহুকাল পর্য্যন্ত সেনদিয়া গ্রামে বৈদ্যবংশ মধ্যে একমাত্র মজুমদার বংশই অবস্থান করিতেছিলেন, পরে শক্তি গোত্রজ হিঙ্গুবংশীয় মহিমাচন্দ্র রায় ও শ্রীযুত দুর্গাচরণ রায় সিদ্ধকাঠী গ্রাম হইতে এবং শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ রায় খান্দারপাড় গ্রাম হইতে আসিয়া এই গ্রামে বাস স্থাপন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন দুই তিন ঘর ব্রাহ্মণ মাত্র এই স্থানে বাস করেন। জনহীনতা প্রযুক্ত স্থানীয় গৌরব ততটা পরিস্ফুট নয়।

## খালিয়া

ফরিদপুর জেলার একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম, ইহা মাদারিপুর সবিডিভিসনের অন্তর্গত। মাদারিপুর হইতে খুলনা পর্য্যন্ত ষ্টীমার গমনাগমনের জন্য যে খাল কাটান হইয়াছে, উহার অনতিদূরে এই গ্রাম অবস্থিত। খালিয়া গ্রাম হইতে একটী খাল দক্ষিণমুখ হইয়া পরে পশ্চিমে বিলের দিকে এবং অপর একটী খাল পূর্ব্বদিক দিয়া বিলের দিকে চলিয়া গিয়াছে, সম্প্রতি ষ্টীমার চলাচলের জন্য 'বিলরুট' হওয়ায় এই খালগুলি ক্রমশঃই মজিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। কালে খালগুলির লোপনিবন্ধন গ্রামবাসিগণের যে বিশেষ অসুবিধা হইবে তদবিষয়ে সন্দেহ নাই।

খালিয়া ফতেজঙ্গপুর পরগণার অন্তর্গত এই স্থানে পরগণার জমিদার ব্রাহ্মণ চৌধুরীগণের বাসস্থান[১]। এই পরগণার পাঁচ ভাগের দুই ভাগের মালিক চৌধুরীগণ, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ রাজারাম রায়চৌধুরী এই জমিদারী অর্জ্জন করেন। এক সময়ে তদীয় বংশীয়গণ বিশেষ প্রতিপত্তির সহিত এই জমিদারী সংরক্ষণ করিয়া নানাবিধ সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন। দাঙ্গাবাজ বলিয়া ইহারা সুপরিচিত ছিলেন। প্রবাদ, বিখ্যাত জমিদার রামরতন রায় কোন পদস্থ লোককে বন্দী অবস্থায়, খালিয়ার চৌধুরীগণের জমিদারীর মধ্য দিয়া লইয়া যাইতেছিলেন ; চৌধুরীগণ উহা অবগত হইয়া এই প্রবল জমিদারের বিক্রম গ্রাহ্য না করিয়া সেই বন্দিকে মুক্ত করিয়া লইয়া যথাস্থানে প্রেরণ করেন। বর্ত্তমান অবস্থায় এই জমিদারী বহু অংশে বিভক্ত হওয়ায়, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, এই কারণে উহার কতকাংশ বৈদ্য ও কায়স্থ ধনিগণের হস্তগত হইয়াছে।

এই চৌধুরীগণ রাঢ়ীয় ডিংসাই শ্রোত্রিয় এবং ভরদ্বাজ গোত্রসম্ভূত, এইজন্য মুখোপাধ্যায় বংশ ব্যতীত রাঢ়ী শ্রেণীর অপরাপর কুলীনগণের সহিত ইহাদের যথেষ্ট কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। কন্যা কুলীনে সম্প্রদান করিয়া বহু কুলীন স্বগ্রামে সংস্থাপন করিয়াছেন। রাঢ়ীয় শ্রেণীর যে যে স্থানে বড় সমাজ আছে, খালিয়ার কুলীনগণের সহিত কার্য্য নাই এমন স্থান অতি বিরল। এই জন্য এই গ্রাম সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

খালিয়ার চট্টোপাধ্যায় বংশ রায়চৌধুরী বংশের সহিত নিতান্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। স্বর্গীয় কৃষ্ণজীবন চট্টোপাধ্যায়ের নিবাস বরিশাল জেলার অধীন বার্থীগ্রামে ছিল ; কৃষ্ণজীবনের পুত্র রামনাথ, প্রথম জমিদার রাজারাম চৌধুরী মহাশয়ের কন্যার পাণিগ্রহণ

১. ইঁহাদের বংশ-স্থাপয়িতা রাজারাম রায় প্রথমতঃ ফতেজঙ্গপুরের অন্তর্গত নারায়ণপুর গ্রামে গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্যাপি তথায় ইষ্টক সোপান সমন্বিত দীর্ঘিকার চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহারা পরে ঐস্থান পরিত্যাগ করিয়া খালিয়া আসিয়া বাসস্থাপন করেন।

করিয়া খালিয়াতে বাস করেন। তাঁহার তিন পুত্র ; অযোধ্যারাম, কৃষ্ণচন্দ্র এবং নারায়ণচন্দ্র। ইঁহাদের বংশধরগণ খালিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন। এই চট্টোপাধ্যায় বংশে বহু কৃতী লোক জন্মগ্রহণ কবিয়াছেন, তন্মধ্যে দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, যখন অতি অল্পলোকেই পশ্চিমাঞ্চলে যাইতে সাহসী হইত, তখন এই চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, দিল্লী, হামিরপুর, বান্দা, কটক প্রভৃতি সুদূর প্রবাসে যাইয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে ইঁহার পৌত্র কিরণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং প্রপৌত্র অমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জীবিত আছেন।

দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতা কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্রগণ মধ্যে রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ইনি পরে খালিয়া হইতে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিয়া মাদারিপুরের নিকটবর্ত্তী মাইজপাড়া গ্রামে গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় বাস করেন। রজনী বাবু ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ পাশ করিয়া তৎকালীন ছোটলাট ক্যাম্বেলসাহেব প্রবর্ত্তিত প্রতিযোগী পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন। তৎকনিষ্ঠ ভ্রাতা উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, বি,এল মুন্সেফ ছিলেন। এই সময়ে খালিয়া বরিশাল জেলার অন্তর্গত ছিল। উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায় তৎকালে বরিশাল জেলার প্রথম এম্-এ, ছিলেন। কৃষ্ণকান্তের অপর পৌত্র শ্রীযুত নীলকান্ত চট্টোপাধ্যায় বি-এল. ওকালতি কার্য্য করিতেছেন। এই চট্টোপাধ্যায় বংশের অপর শাখার রায় গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর এম-এ, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটী পদে নিযুক্ত ছিলেন।

কৃষ্ণজীবন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বংশধর রামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চৌধুবী বংশের নীলকান্ত রায় মহাশয়ের কন্যা বিবাহ করিয়া খালিয়াতে বাস করেন। তদীয় বংশের আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্র দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় পুলিশে কার্য্য করিতেন, আনন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিত্যানন্দ চট্টোপাধ্যায় ডেপুটী কালেক্টর ছিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে চট্টোপাধ্যায় বংশের রেবতীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ডেপুটী কার্য্যে এবং তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় এম-এ, কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত আছেন। শ্রীযুত বিমলাচরণ চট্টোপাধ্যায় মুন্সেফী কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

গঙ্গোপাধ্যায়বংশও চৌধুরীগণের সহিত কার্য্য সূত্রে এই গ্রামে বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বহু দিবস বরিশালের কালেক্‌টরি বিভাগে কার্য্য করিয়া পরে ঐ বিভাগের সেরেস্তাদারি পদে উন্নীত হন। ইনি অতি যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। যে সময়ে কালেকটরী পদে অবস্থান করিয়া বিভারিজ সাহেব বরিশালের ইতিহাস প্রণয়ন করেন, সেই সময়ে কৈলাস গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার এই গ্রন্থ প্রণয়ন ব্যাপারে বহু সহায়তা করিয়াছিলেন। বিভারেজ স্বীয় গ্রন্থের ভূমিকায় উহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তদীয় পুত্রগণ সকলেই কৃতবিদ্য, তন্মধ্যে শ্রীযুত প্রিয়লাল গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এ, রায়বাহাদুর ডেপুটী কালেক্টরী কার্য্য এবং অপর পুত্র শ্রীযুত অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এল ওকালতি কার্য্য করিতেছেন।

গ্রামের ভূম্যধিকারী বংশ বৃত্তি, ব্রহ্মত্র দান করিয়া এই সমুদয় কুলীন সংস্থাপন

করিয়াছিলেন, কিন্তু অধুনা চৌধুরীবংশ হইতেও এই কুলীনগণ মধ্যে অনেক সম্পন্ন লোক দেখা যায়। চৌধুরীবংশে বহু কীর্ত্তিমান লোক জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন ; তন্মধ্যে স্বর্গীয় কালীকিঙ্কর রায় মহাশয় অগ্নিহোত্র করেন ; এতদ্ভিন্ন তৎপ্রতিষ্ঠিত ৺অন্নপূর্ণা দেবীর নাম উল্লেখ করাও কর্ত্তব্য। কাশী হইতে শিল্পী আনয়ন করিয়া এই অষ্টধাতু নির্ম্মিত দেবীমূর্ত্তির নির্ম্মাণ করা হয়। এতদ্ভিন্ন ইন্দ্রমণি চৌধুরাণী কালীমূর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়া ঐ দেবীর অর্চ্চনার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। রাজারাম নির্ম্মিত মঠ ও উহাতে সংস্থাপিত গোবিন্দ দেবের কথা ও উল্লেখযোগ্য। এই বংশের দীপচন্দ্র রায়চৌধুরী ডেপুটী কালেকটরের পদে নিযুক্ত ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে চৌধুরী বংশে কয়েকটী গ্রাজুয়েট বর্ত্তমান আছেন।

ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের পরেই অত্রত্য বৈদ্যগণের কথা উল্লেখযোগ্য। এই বৈদ্যগণ কবিরাজী ব্যবসায়ী, চৌধুরীগণ স্বগ্রামে ইঁহাদিগকে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইঁহাদিগকে এরূপ যত্ন করিতেন যে, শারদীয়া পূজার প্রথম ক্ষণেই ইঁহাদের দেবীর বোধন হইলে, তবে চৌধুরীগণের বাড়ীর পূজা আরম্ভ হইত। এই কবিরাজ বংশের স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র সেন কবিরাজ মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তৎসদৃশ অতিথিপরায়ণ লোক অতি অল্পই দৃষ্ট হয়, তৎসম্বন্ধে বহু আশ্চর্য্য কিংবদন্তী পরিশ্রুত হওয়া যায়। বাহুল্য প্রযুক্ত উহা আর লিপিবদ্ধ হইল না। তদীয় পুত্রদ্বয় শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র সেন কবিরাজ ও শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সেন কবিরাজ বর্ত্তমান আছেন। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সেন কলিকাতার মহামহোপাধ্যায় কবিরাজপ্রবর দ্বারকানাথ সেন মহাশয়ের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ক্ষেত্রনাথ বহুকাল স্বদেশে চিকিৎসা ব্যবসায় দ্বারা যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন ও পরোপকার সাধন করিয়াছেন। দেশের জলকষ্ট সন্দর্শনে তিনি সুব্যয়ে একটী পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে ক্ষেত্রনাথ আর দেশে অবস্থান করেন না। ৺কাশীধামের যোগাশ্রমেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়া আশ্রম কার্য্যের সাহায্য করিয়া থাকেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেন মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মোহনচন্দ্র সেন কবিরাজ মহাশয়ের অতি আশ্চর্য্য নাড়ীজ্ঞান ছিল। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন, এল,এম,এস্ ডাক্তারি কার্য্য করিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ইঁহারা সাধারণের নিকট মহলানবীশ বলিয়া পরিচিত।

## বল্লভদী ও শিরখাড়া

এই উভয় স্থানে বহু ভদ্রলোক বাস করেন। বল্লভদীর বৈদ্যগুপ্ত ও কাকরের সেনদের পূর্ব্বপুরুষগণ জমিদার সরকারে কার্য্য করিয়া বিশেষ প্রতিপত্তির সহিত এই উভয় স্থানে বাস করিতেন। শশিকুমার ও প্রসন্নকুমার গুপ্ত ভ্রাতৃদ্বয় যথাক্রমে ঢাকা ও মাদারিপুরে মোক্তারি কার্য্য করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন। বল্লভদীর সেন পরিবার প্রসিদ্ধ। তদ্বংশীয় তারিণীচরণ সেন একজন কৃতবিদ্য ও সুলেখক ছিলেন। এক সময়ে তৎকর্ত্তৃক "বঙ্গজীবন" নামীয় একখানি মাসিকপত্র পরিচালিত হইত। তৎপ্রণীত "সহানুভূতি" নামক গ্রন্থ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, তারিণীচরণ একজন ভাবুক ও সুলেখক ছিলেন। দুঃখের কথা এই যে, এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়া বাহির হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই গ্রন্থকার মানবলীলা সংবরণ করেন। এই গ্রন্থখানার সুসমালোচনা তিনি পরিজ্ঞাত হইয়া যাইতে পারেন নাই। অর্থাভাব প্রযুক্ত দুঃস্থ

গ্রন্থকারগণ, তাঁহাদের বিরচিত গ্রন্থ প্রকাশ করিতে যে সকল অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন, তাঁহার ভাগ্যে সে সমুদয়ই ঘটিয়াছিল। শিরখাড়া গ্রামে বহু লোক বাস করিয়া থাকেন। এই উভয় স্থান রাজনগর ষ্টেটের অন্তর্গত ছিল।

## কাজুলিয়া

গোপালগঞ্জ সবডিভিসনের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। বৈদ্যকুলীন বিষ্ণুদাশ বংশোদ্ভব জানকীবল্লভ বিশ্বাস, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের অধীনে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি যেরূপে খড়রিয়া পরগণা প্রাপ্ত হন তদ্বিবরণ পরগণার ইতিবৃত্তে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, অতএব পুনরুল্লেখ নিস্প্রয়োজন।

জানকীবল্লভের প্রথম পুত্র রামভদ্র কবিকর্ণপুর, দ্বিতীয় পুত্র বলভদ্র কবীন্দ্রচন্দ্র! কবীন্দ্রচন্দ্রের বংশধরগণ জমিদারী দশ আনা অংশের এবং কবিকর্ণপুরেব সন্তানগণ পরগণার ছয় আনা অংশের মালিক ছিলেন। কালক্রমে এই পরগণার রাজস্ব অনাদায় হেতুতে তৎকালীন আইন অনুসারে রেভিনিউ বোর্ডে নিলামে উঠিলে, কলিকাতা হাটখোলা (নিমতলা) নিবাসী কাশ্মীনাথ দত্ত উহা ক্রয় করেন, এই দত্ত ইতিপূর্ব্বে গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে এই পরগণার উসুল তহশীলের ভার প্রাপ্ত হন।[১]

জমিদারী হস্তান্তরিত হইলে কর্ণপুরের পৌত্র রামদেব কর্ণাভরণের বংশধরগণ আর এই পরগণার বাস করা যুক্তিসঙ্গত নয় মনে করিয়া খড়রিয়ার অন্তর্গত মূলঘর গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া, ফতেজঙ্গপুর পরগণার অন্তর্গত কাজুলিয়া গ্রামে আসিয়া গৃহ স্থাপন করেন। বৃহৎ বিলের মধ্যে এই গ্রাম সংস্থাপিত। তাঁহারা ফতেজঙ্গপুর পরগণার মালিক না হইলেও ঐ পরগণা মধ্যে এক বিস্তৃত তালুক করিয়া লইতে সক্ষম হন, উহার রাজস্ব জমিদার সরকারে প্রদান না করিয়া একেবারে গভর্ণমেন্টের কালেক্টরিতেই প্রদত্ত হইয়া থাকে। কাজুলিয়াতে বসতি স্থাপনের পরে তাঁহারা পৈত্রিক সম্পত্তি খড়রিয়া পরগণা উদ্ধার জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন, কিন্তু উহাতে কোনরূপ সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হয়েন না।

রামদেব কর্ণাভরণের দুই পুত্র, রঘুনাথ রায় কবিরত্ন ও কন্দর্প রায়। রঘুনাথের পুত্র রমাকান্ত রায়, তৎপুত্র হরিপ্রসাদ রায়। কন্দর্প রায়ের প্রথমা পত্নীর গর্ভে একটি পুত্রসন্তান ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। পরে এই পত্নী লোকান্তরিতা হইলে তিনি জপসাবাসী দেওয়ান কৃষ্ণরাম রায়ের এক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই শেষোক্ত গৃহিণীর গর্ভে কোন সন্তানসন্ততি হইবার পূর্ব্বেই কন্দর্প রায় মানবলীলা সংবরণ করেন।

কন্দর্পরায়ের পুত্র কৃষ্ণরাম রায় পিতৃবিয়োগের অব্যবহিত পরেই লোকান্তরিত হইলে, তদীয় শিশুপুত্র রত্নেশ্বরের ও তদীয় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার রঘুনাথের

১. নবাবী আমলে এই পদকেই ওয়েদদার বলা হইত। কোম্পানীর আমলে উহার নাম হয় সাজলদার। মূল কথা এই যে, জমিদার রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হইলে অথবা অন্য কোন ক্রটী প্রদর্শন করিলে, গভর্ণমেন্ট হইতে ঐ সম্পত্তির খাজনা আদায় জন্য লোক নিযুক্ত হইত। রাজ কর্ম্মচারিদের মধ্য হইতে ঐ লোক মনোনীত হইতেন বটে, তবে তিনি অথবা তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ যে কেহই ঐ আদায়ী কার্য্য করিতে পারিতেন। গভর্ণমেন্টের প্রাপ্য আদায় হইলে পূর্ব্ব মালেক পুনরায় ঐ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইতেন ; অন্যথা উহা নিলামে বিক্রয় হইয়া যাইত।

পুত্র রমাকান্ত রায়ের হস্তে ন্যস্ত হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে রমাকান্ত ভ্রাতুষ্পুত্রের বিত্ত সম্পত্তি যেরূপ সাদরে গ্রহণ করেন, ভ্রাতৃতনয় রত্নেশ্বরকে সেইভাবে গ্রহণ করিতে না পারিয়া, তাহাকে দূরীভূত করিয়া দেন। এই সময়ে এক বিশ্বস্ত ভৃত্য রত্নেশ্বরকে লইয়া তাঁহার পিতার বিমাতার নিকট জপসা গ্রামে উপস্থিত হয়। এই রমণী পৌত্র রত্নেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া ও তাঁহার গৃহ পরিত্যাগের কারণ অবগত হইয়া সমুদয় বিবরণ স্বীয় ভ্রাতা লালা রামপ্রসাদকে অবগত করান। রামপ্রসাদ ভগ্নীকে ঐ শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ করিবার অনুমতি প্রদান করেন, এতদ্ভিন্ন রামপ্রসাদ স্বয় ভাগিনেয়পুত্রবৎ রত্নেশ্বরের সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করিতেন।

রমাকান্ত রায় সমুদয় সম্পত্তি হস্তগত করিলেন বটে কিন্তু, এইরূপ নানা ঘটনা ঘটিল যে, তাহার পরে রাজস্ব আদায় অসম্ভব হইয়া পড়িল। নবাব সরকার হইতে তাঁহার নিকট রাজস্ব আদায়ের জন্য লোক প্রেরিত হইল, তখন আর তিনি স্থির থাকিতে না পারিয়া স্বয়ং ঢাকাতে উপস্থিত হন। এই সময়ে ঢাকাতে রামপ্রসাদ, দেওয়ান রাজবল্লভের সহকারী দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রমাকান্ত কুটুম্বিতা সূত্রে রামপ্রসাদের শরণাপন্ন হইলেন, কিন্তু যে কন্দর্পরায়ের সম্পর্কে কুটুম্বিতা সেই কন্দপের পৌত্রের সহিত তিনি যে কুব্যবহার করিয়াছেন, উহা তখন আর তাঁহার স্মরণ পণে উপনীত না হইলেও রামপ্রসাদ কিন্তু উহা বিস্মৃত হন নাই। তিনি রমাকান্তকে বলিলেন, রায় মহাশয়, আমি স্বীয় কন্যার বিবাহ উপলক্ষে শীঘ্রই দেশে যাইতেছি, আপনি এখন দেশে চলিয়া যান, আবার যখন আপনাকে আসিতে লিখিব তখন আসিলেই সমুদয় কথার মীমাংসা হইতে পারিবে। তবে যতিদন পর্য্যন্ত উভয়ের পুনরায় সাক্ষাৎ না হয়, ততদিন মধ্যে আপনার কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই।'

অতঃপর বামপ্রসাদ দেশে গমনান্তে পয়োগ্রাম নিবাসী বৈদ্যকুলীন প্রভাকর বংশীয় রামধন সেন মহাশয়ের সহিত তনয়া সর্ব্বেশ্বরীর সম্বন্ধ সুস্থির করিয়া, চন্দনের আয়োজন করেন। এই কার্য্য উপলক্ষে সমুদয় বৈদ্য কুলীন উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। নিমন্ত্রিত হইয়া সকলে আসিলেন; কাজুলিয়াবাসী রমাকান্ত রায় ও তদুপলক্ষে তথায় আগমন করেন। বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া গেলে পর, ক্রমে ক্রমে সমুদয় কুলীন বিদায় হইলেন, অবশিষ্ট রহিলেন রমাকান্ত; কারণ, তিনি একমাত্র বিবাহের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আইসেন নাই, স্বীয় বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য।

একদিন রামপ্রসাদ অন্যান্য স্বজনগণ সহিত একত্র উপবেশনান্তে রমাকান্ত রায় চৌধুরীকে ডাকিয়া পাঠান, চৌধুরী উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহাকে সম্ভ্রমের সহিত গ্রহণ করিয়া একটি বালকের দিকে আঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, চৌধুরী মহাশয়, আপনি কি ইহাকে আর কখন দেখিয়াছেন? রমাকান্ত বিশেষ রূপ নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন, এই রত্নেশ্বর; তখন চৌধুরী মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। রামপ্রসাদ সমুদয় বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, মহাশয়, এই হইতেছে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র রত্নেশ্বর; আপনি অন্যায় করিয়া ইহাকে গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া উহার সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়াছেন। আমি বলিতেছি, আপনি ইহাকে গ্রহণ করিয়া সমুদয় সম্পত্তি সমান অংশে বিভক্তি করিয়া দিন, যদি না দেন তবে জানিবেন, রামপ্রসাদ সেন উহার যে হয় প্রতিবিধান করিবেন।

রমাকান্ত নিতান্ত বিপদে পড়িয়াই লালা রামপ্রসাদের অনুগ্রহ প্রার্থী হইয়াছিলেন, এখন এই কথা শ্রবণ করিয়া আর কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করিয়া রত্নেশ্বরকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন, রত্নেশ্বর ও তাঁহার পদে প্রণত হইল। বলা বাহুল্য অতঃপর আর সদর রাজত্বের জন্য রমাকান্তকে ভাবিতে হইল না; রামপ্রসাদ ঐ টাকা পরিশোধ করিয়া দিলেন। রমাকান্ত, রত্নেশ্বরের সহিত কাজুলিয়া আগমন করিয়া তাহাকে সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ বিভাগ করিয়া দিলেন। কিন্তু কেহ কেহ বলেন নামে অর্দ্ধাংশ হইলে ও রমাকান্তের দিকের তুলাদণ্ডটী নিম্নাভিমুখী হইয়া পড়িয়াছিল। পরে এই রমাকান্ত রায়ের কন্যার সহিত মহারাজ রাজবল্লভের পুত্র রায় রতনকৃষ্ণের শুভপরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়।।

এই রায় চৌধুরী বংশ বিশেষ সম্মানের সহিত কাজুলিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন। তাহার মধ্যে উমাকান্ত রায় ও কবিরাজ রেবতীকান্ত রায়, ঈশানচন্দ্র রায়, প্রতাপচন্দ্র রায়, ভুতপূর্ব্ব সবরেজিষ্ট্রার বনমালী রায়, উকীল শ্রীযুক্ত শশীকান্ত রায়, বি-এল, রাজকুমার রায়, লালবিহারী রায় ওভারসিয়ার, অনন্তকুমার রায় বি-এল, উকীল ও প্রমথনাথ রায়, প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই বিষ্ণুদাস বংশের সহিত কার্য্যসূত্রে ধন্বন্তরি গোত্রীয় আরও কয়েক ঘর কুলীন বৈদ্য এইস্থানে বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে পুলিশ ট্রেনিং স্কুলের শিক্ষক বিপিনবিহারী সেন, উকীল শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন ও শ্রীযুত দুর্গাচরণ সেন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

কাজুলিয়াতে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র বাস করিতেছেন। গ্রামবাসী সকলেই সম্পন্ন, অথচ এই স্থানে শিক্ষাবিধানের জন্য ভাল বিদ্যালয়ের অভাব; এইটি বড়ই লজ্জার কথা। গোপালগঞ্জ হইতে বৎসরের সমুদয় ভাগ এইস্থান পর্য্যন্ত নৌকা গমনাগমন করিতে পারে। খালের পার দিয়ে একটি রাস্তা প্রস্তুত হওয়ায় পদব্রজে গমনপক্ষেও সুবিধা হইয়াছে।

### ভোজেরগাঁতি, রায়পাশা, মালীখাড়া ও বাজুনীয়া

এই স্থানগুলি খড়রিয়া পরগণার অন্তর্গত। ভোজেরগাঁতি গ্রামে কয়েক ঘর রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাস করেন। ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষ মাধবানন্দ চক্রবর্ত্তী বিক্রমপুর নিবাসী ডিংসাই শ্রোত্রিয় ছিলেন। রায়পাশা ও মালীখাড়া গ্রামে বারেন্দ্র ও বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ বাস করেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই খড়রিয়া পরগণার পূর্ব্ব জমিদার বৈদ্য রায় চৌধুরী বংশের দত্ত ব্রহ্মত্র অদ্যাপি ভোগ করিতেছেন।

এই স্থানগুলি সমুদয়ই বিলের মধ্যবর্ত্তী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বোধ হয় যেন প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে এই সকল স্থানের নিকটবর্ত্তী বিলসমূহের উদ্ভব হইয়া থাকিবে। কারণ এই সকল স্থানের কাল একটা স্তরের পরে বালুকাময় স্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জলাভূমি হইতে এক বিস্তৃত বিল (কাজলা বিল) বাখরগঞ্জ দক্ষিণাবর্ত্তী আমুয়া পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে "রাজবাড়ী" বলিয়া একটা স্থানের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথায় যে জলাশয় বিদ্যমান আছে, উহাতে ইষ্টক নির্ম্মিত ঘাট দৃষ্ট হয়। উহার নিকটবর্ত্তী আর একটি স্থানের নাম হাতীবাড়ী অর্থাৎ পীলখানা। ইহাতে বোধ হয় এ স্থানে কোন রাজার বাড়ী ছিল। নমঃশূদ্র জাতি এই স্থানের প্রধান অধিবাসী।

যে পঞ্চজন কায়স্থ সন্তান প্রথম বঙ্গে আগমন করেন তাহাদের মধ্যে দশরথ বসুর নাম অবগত হওয়া যায়। তাহার অধঃস্তন সপ্তম পুরুষে অহস্পতি বসুর জন্ম হয়। এই মহাত্মার চারি পুত্র, বনমালা পুরবসু, সাদু ও রাঘব।

পুরবসু স্বীয় তনয়াকে শক্তি হিঙ্গুসেনের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। এজন্য তৎ কনিষ্ঠদ্বয় অগ্রজের প্রতি কুলাচারী হন। এজন্য পুরবসুর অভিসম্পাতে তাহারা কুলচ্যুত হন। রাঘবের বংশ বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। সাদুর বংশধরগণ বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ভর্তিশালা ও সতীগ্রামে বাস করিতেছেন। পুরবসুর বংশধরগণ মধ্যে বহরের চৌধুরীগণ কৌলিন্য ভ্রষ্ট, কারণ তাহারা ভুলুয়ার লক্ষণ মাণিক্যের সমন্বয় ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন না। এতদ্ভিন্ন বাখরগঞ্জের হস্তীগুণ্ড, কাচাবালীয়া, শীতলপাড়া এবং ফতেয়াবাদ সমাজের ভাজনডাঙ্গা গ্রামে বাস করিতেছেন।

পুরবসুর অধঃস্থানীয় সপ্তম পুরুষে বলভদ্র বসু চন্দ্রদ্বীপের রাজ্য জয়দেব দেবের[২] কন্যা কমলার পাণিগ্রহণ করেন। বলভদ্রের পুত্র পরমানন্দ মাতামহের সম্পত্তির অধিকারী হইয়া রাজা উপাধী ধারণ করেন। তৎপুত্র রাজা জগদানন্দ বসু তৎপুত্র রাজজিমূল নারায়ণ ও রাজবল্লভ। রাজবল্লভের সন্তানগণ ইদিলপুরে বাস করিতেছেন।

পুরবসুর বংশীয় থাকবসুর সন্তানের বাখরগঞ্জের অন্তর্গত, আঠক, কেন্দুয়া, লঙ্কাকাটীতে এবং এই বংশের যাদবেন্দ্র বসু মজুমদারের সন্তানগণ চাদসী হইতে ফতেয়াবাদের অন্তর্গত আলগী গ্রামে যাইয়া বাস করেন।

পুরবসুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বনমালীর অধঃস্তন দশম স্থানীয় গোপাল বসু বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই মহাপুরুষ কাশীধামে ২২টী সুরশ্চর শ্লোক করিয়া সিদ্ধপুরুষ মধ্যে গণনীয় হন। তাহার যথাক্রমে চারিটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। প্রথম মহেশ ওরফে রাজবল্লভ, দ্বিতীয় গোবিন্দ, ৩য় শিবনাথ ৪র্থ যদুনাথ। দ্বিতীয় গোবিন্দ বসুর সন্তানগণ বিক্রমপুর মালখানগরে বাস করিতেছেন।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ মহেশ বসুর দুই পুত্র রমানাথ ও যাদবেন্দ্ররমানাথের সন্তানগণ বাখরগঞ্জের ফথুল্লাবাদে ও তার পাশায় ও ইদিলপুরে বাস করিতেছেন, ইহারা মীর বহর উপাধীতে প্রসিদ্ধ।

বনমালীর বংশীয় পৃথ্বীধর বসুর বংশধরেরা বাখরগঞ্জের অন্তর্গত, কাশীপুর, কড়াইতলী এবং বিক্রমপুরে অন্তর্গত ভরাকর গ্রামে বাস করেন। পৃথ্বীধরের অধঃস্তন পঞ্চম স্থানীয় কেশব বসু রাজা প্রতাপাদিত্যের মাতুল ছিলেন, এই কারণে সকলেই তাহাকে রায় কেশব নামে সম্বোধন করিত। তাঁহার সন্তানেরা ফতেয়াবাদের রামনগর গ্রামে কুলজ ভাবে অবস্থান করিতেছেন।

"যশোহর সমাজের কুলীন-শ্রেষ্ঠ চক্রপাণি বসুর সন্তান, গোপাল বসু ঠাকুর বংশাবতংস ঁরঘুনন্দন বিক্রমপুরের কোন আত্মীয় গৃহে গমন কালে পথিমধ্যে উজানীর রাজবাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজার অনুরোধ স্বত্ত্বেও রাজবাটীতে আহার করিতে প্রথম স্বীকার করেন নাই। কিন্তু রাজা নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ কবিয়া তাঁহাকে পক্কান্ন ভোজন করাইলেন এবং সাতখান মৌজা (গ্রাম ) ভোজনদক্ষিণা প্রদান করিয়া ও

২. মতান্তরে কৃষ্ণবল্লভ রায়ের।

রায়চৌধুরী উপাধিতে ভূষিত করিয়া তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। সেই সুবৃহৎ সাতখানা মৌজা ২৭ মৌজাতে পরিণত হইয়াছে; তদবধি রঘুনন্দন ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতী গোপালগঞ্জ সবডিভিশনের অধীন উলপুর গ্রামে বসবাস করিতে লাগিলেন। উলপুরের বসু রায়চৌধুরী বংশ কি শিক্ষায়, কি সভ্যতায়, কি স্বদেশ সেবায় কি স্বদেশানুরাগে, কি সমাজ সংস্কারে, কি স্বাধীন চিন্তায়, কি ধনবলে, কি জনবলে, কি বুদ্ধিবলে, সকল বিষয়েই ফরিদপুরে প্রসিদ্ধ। বরিশালের উকীল নবীনচন্দ্র রায়, ময়মনসিংহের উকীল পূর্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী, হইকোর্টের উকীল = সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী, প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশচন্দ্র রায়চৌধুরী, আবীপুরের উকীল শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর রায়চৌধুরী, অধ্যাপক সতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী প্রভৃতি মনস্বী ও যশস্বগণ এই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। উলপুরের রায়চৌধুরী বংশের মধ্যে ছোট পাই বা কোটাবাড়ির মালেক ঐশ্বর্য্যে ও ক্ষমতার শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণরাম রায়ের ন্যায় ও ধর্ম্ম বুদ্ধির উপর এই বাড়ীর গৌরব প্রতিষ্ঠিত। কৃষ্ণরাম রায়ের মধ্যম পুত্র নন্দরাম রায়ের পত্নী সহমরণে যাইয়া অনন্য সাধারণ পতিভক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন।

এই বংশের কৃষ্ণচন্দ্র রায় একজন খ্যাত লোক ছিলেন। তাহার পাঁচ পুত্র কালীপ্রসন্ন (সবজজ), শ্যামাপ্রসন্ন, দেবীপ্রসন্ন, রমাপ্রসন্ন ও গিরীজাপ্রসন্ন হাইকোর্টের উকীল। শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় এই জেলায় কেন বঙ্গ দেশে কাহারও নিকট অবিদিত নাই, তিনি স্বদেশ প্রেমিক, স্বদেশের অভাব সম্বন্ধীয় বিষয় প্রতিবিধান কল্পে এই মহাত্মা যতটা আয়াস স্বীকার করিয়াছেন বোধ হয়, ফরিদপুরের জন্য আর কেহ ততটা করে নাই। যথায় দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নিপতিত হইয়া মহাআতঙ্কের সঞ্চার করিয়া দিয়াছে। যেখানে মহামারীতে জনগণ উচ্ছন্ন যাইতে বসিয়াছে, তথায় দয়াল দেবীপ্রসন্ন, অন্ন ও ঔষধপথ্য সহ উপস্থিত। এজন্য তাহাকে সেই সময় কত কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। অবশ্য সাধারণের অর্থ দ্বারাই এই কার্য্য সংসাধিত হইয়াছে কিন্তু উহা সংগ্রহ ও নিয়মিত রূপে ব্যয় করিবার ভার দেবীর উপর। ফরিদপুর সুহৃদসভার একমাত্র প্রাণ দেবীপ্রসন্ন। কত জেলায়, পরগণার এইরূপ সভা হইয়া বিস্মৃতির অতল জলে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে কিন্তু দেবীর আশ্রয় লাভ করিয়া এই সভা অদ্যাপি জাগ্রত রহিয়াছে। ধন্য দেবীপ্রসন্ন– বহুলোকের অন্নদাতা, নব্যভারতের সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন। তদীয় নিরাভরণা অথচ লাবণ্যময়ী নব্যভারত বর্ষায়সী হইয়া আজিও লোক লোচনান্দদায়িনী হইয়া রহিয়ছে। নানা গ্রন্থের প্রণেতা দেবীপ্রসন্ন, এককথায় বড় ধনীর সন্তান বা ধনী না হইয়াও এই মহাত্মা, যেরূপ ভাবে যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। তদীয় একমাত্র পূত্র প্রভাতকুসুম রায় হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতেছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে বলিতে গেলে এই বংশে লক্ষ্মী সরস্বতী চিরবিরাজমান, তথায় কোনরূপ কীর্ত্তিকলাপের চিহ্ন না থাকিলেও একমাত্র বিদ্যা ও জ্ঞান বলে উহার ঔজ্জ্বল্য রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এই শ্রদ্ধেয় দেবীপ্রসন্ন ও তদীয় সুযোগ্য পুত্র অকালে কালকবলিত হইয়া দেশ তমসাচ্ছন্ন করিয়া গিয়াছেন।

## কবিরাজপুর

সদরের অন্তর্গত ভাঙ্গা থানার অধীন, এই গ্রামে অনেক ভদ্রলোক বাস করিয়া থাকেন তন্মধ্যে রায় উপাধিধারী রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ প্রতিষ্ঠিত। ইহাদের পূর্ব্ব নিবাস বিক্রমপুরের অন্তর্গত ধুল্লা, তথা হইতে জালালপুরের অন্তর্গত ধুরাইল গ্রামে বাস স্থাপন করেন, পরে নদী কর্ত্তৃক ঐ স্থান ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে ১২৭২ সালে এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছেন। এই বংশের তিলকচন্দ্র রায় একটি শিব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

কবিরাজপুরের মৃত পার্ব্বতীচরণ রায় একজন খ্যাতিনামা মহাত্মা লোক ছিলেন। বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা স্বীয় ক্ষমতায় প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া, তদ্দ্বারা বহু সৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতার বাড়ীতে প্রতি বৎসর মহাসমারোহে জগদ্ধাত্রী পূজা সম্পন্ন হইত, উহাতে ভুরিভোজনের আয়োজন হইত এবং আহুত অনাহুত অনেকেই তথায় পরিতোষ সহকারে আহার্য প্রাপ্ত হইতেন।

রায় মহাশয় মহাভারত পাঠ ও তুলাচতুরগ্নি প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা বিশেষ যশোলাভ করিয়াছিলেন। এই কার্য্য উপলক্ষে বিরাট অন্নসূত্র খোলা হইয়াছিল, কাশী কাঞ্চীর কোন কোন এবং বঙ্গদেশের প্রায় যাবতীয় স্থানের প্রধান পণ্ডিতগণ আহুত হইয়া উপযুক্ত ভাবে গৃহীত ও বিদায় প্রাপ্ত হন।

এই মহাত্মার সংস্থাপিত সংস্কৃত টোল অদ্যাপি তাহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে, অষ্টাদশটী ছাত্র তদীয় অন্নের সাহায্যে এই টোলে নিয়ত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিভিন্ন স্থান হইতে অন্য আবাসে আশ্রয় পাইয়াও কত ছাত্র এই টোলে পাঠ করিয়া কৃতবিদ্য হইতেছে। স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় এই টোলের স্মৃতির অধ্যাপক ছিলেন।

জালালপুর পরগণার বহু স্থান রায় মহাশয়ের অর্থে কৃত হইয়াছে, দেশের মধ্যে তিনি একজন প্রধান ভূম্যধিকারী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। তদীয় পুত্র কৃষ্ণদাস রায় ও আশুতোষ রায় পিতার উপযুক্ত পুত্র। কারবার ও জমিদারীর উত্তরাধিকারী হইয়া ইঁহারা পরোপকারী ও দাতা। ফরিদপুরের এমন কোন সদনুষ্ঠান নাই যাহাতে রায় মহাশয়েরা প্রচুর অর্থ সাহায্য না করিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস রায়, মহাশয় দেশহিতকর প্রায় সমুদয় কার্য্যেই যোগদান করেন। পরিশ্রমের সহিত কার্য্যোদ্ধার করিতে সচেষ্ট হন। বাস্তবিক পক্ষে ইঁহারা এই জেলার মধ্যে আদর্শ মহাজন।

ইহাদের প্রতিষ্ঠিত মাইনর স্কুল ও ডাক্তারখানা সাধারণের উপকার সাধন করিতেছে।

## খান্দারপাড়

মুকসুদপুর থানার অন্তর্গত এই স্থানটীতে বহু বৈদ্য, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রাদি জাতি বাস করা নিবন্ধন উহা বিশেষভাবে পরিচিত। বৈদ্য মজুমদার বংশের পূর্ব্বপুরুষ গৌরীনাথ দাশের বিবরণ ইতিপূর্ব্বে সেনাদিয়ার কাহিনী-সহ বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। বাণী ও গৌরী উভয়েই বাল্যাবস্থায় ভূষণার রাণী কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া, পরে গোবিন্দপুরের ফৌজদারের অধীনে কার্য্য করিয়া আপন আপন সৌভাগ্য সঞ্চয় করিতে সমর্থ হন। বাণীনাথ ফতেজঙ্গপুরের কতকাংশের জমিদারী লাভ করেন, গৌরীনাথ

তেলিহাটী আমিরাবাদ পরগণার খান্দারপাড় প্রভৃতি স্থানে এক তালুক লাভ করিয়া খান্দারপাড়ে বাস স্থাপন করেন। এই হইতে গৌরীনাথ "মজুমদার" বলিয়া পরিচিত হন।

এই মজুমদার বংশে যেসকল লোক জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে সদাশিব মজুমদারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সদাশিব জপসার জমিদার বংশের দেবীপ্রসাদ রায়ের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন ; রাজনগরের রাজবংশ ও জপসার জমিদারবংশ পরস্পর ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধে আবদ্ধ। সেই সূত্রে সদাশিব রাজবংশের নিকট পরিচিত হইয়া রাজার জমিদারী পরগণে বোজের গোমেদপুর পরগণার নায়েবি পদে প্রতিষ্ঠিত হন। বিভারিজ কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাসে ইহার নাম উল্লেখ রহিয়াছে, আমরা নিম্নে উহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম[১]।

বোজোরগোমেদপুর পরগণার অন্তর্গত, বামনা মৌজাতে সদাশিব কর্ত্তৃক মহম্মদ সাফী এক তালুক প্রাপ্ত হন। উহা রাজপাট হইতে নায়েব সদাশিব প্রদান করেন বলিয়া বামনার চৌধুরি বংশের পূর্ব্বপুরুষ প্রকাশ করিয়া, দশসনা বন্দোবস্তের সময়ে উহা স্বীয় নামে বন্দোবস্তের উদ্যোগী হইলে, সদাশিবের পুত্র রামকৃষ্ণ প্রভৃতি উহা প্রকৃত প্রস্তাবে চৌধুরীগণ ও সত তালুকদার মাত্র এবং তাহারাই প্রকৃত তালুকদার বলিয়া দাবি করিয়া বসেন। কিন্তু তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই মোসলমান চৌধুরীগণই জয়ী হইয়া সুবিস্তৃত বামনা মৌজার মালিক হন। এতদ্ভিন্ন বোজেরগোমেদপুর পরগণার মধ্যেও বিক্রমপুরের চিকন্দী প্রভৃতি স্থানে সদাশিব যে তালুক করিয়া গিয়াছিলেন উহা বহুদিন পর্য্যন্ত তদীয় উত্তরাধিগণের হস্তগত ছিল, পরে ঐ সকল তালুকও তাহাদের হস্তভ্রষ্ট হয়। সদাশিব গ্রামের উন্নতি কল্পে ভিন্ন স্থান হইতে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য আনয়ন করিয়া স্বগ্রামে সংস্থাপন করেন। রজনীকান্ত স্মৃতিভূষণ এই গ্রামের একজন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন ; তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ বিক্রমপুরান্তর্গত মূলপাড়া গ্রাম হইতে সদাশিব কর্ত্তৃত আনীত হইয়া এই গ্রামে সংস্থাপিত হয়। ইহারা মূলপাড়ার সর্দ্দার বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচিত।

খান্দারপাড় গ্রামে বিষ্ণুদাস বংশীয় রায় উপাধিধারী যে সকল ব্যক্তি বাস করেন, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ লক্ষ্মীনারায়ণও সদাশিব কর্ত্তৃক এই গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হন।

খড়বিয়া পরগণার ভূতপূর্ব্ব জমিদার জানকীবল্লভ বিশ্বাসের পুত্র বলভদ্র কবিন্দ্রচন্দ্র রায়, তৎজ্যেষ্ঠপুত্র রাজা হরিনাথ নামে পরিচিত ছিলেন কিন্তু বৈমাত্র ভ্রাতৃগণসহ কলহ করিয়া তাঁহাকে জমিদারীভ্রষ্ট হইয়া, মাত্র তালুক লইয়া জীবনধারণ করিতে হয়। লক্ষ্মীনারায়ণ রায় এই রাজা হরিনাথের প্রপৌত্র। সম্ভবতঃ লক্ষ্মীনারায়ণ বিষয় সম্পত্তি পরিভ্রষ্ট হইয়া জপসার জমিদারবংশীয় বানেশ্বর ক্রোড়ীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। এই সময়ে বানেশ্বরের খুল্লতাত পুত্র দেবীপ্রসাদের কন্যা বিবাহ করিতে খান্দরপাড়বাসী সদাশিব মজুমদার এবং সদাশিবের জ্ঞাতি নন্দকিশোর মজুমদার দৈব্যপ্রসাদের ভগ্নী বিবাহ করিতে জপসাতে গমন করেন, তাঁহারা অবগত হইলেন

১. The property was at one time in the possession of one Sadashib Majumdar who was Naib of the former Jamidar of Buzurgumedpur Sadashiv's she disputed Mahomed Shuttee's claim to it, and said that he was only ausat-talugdar, and that the father held a patta for it given in 88 by Raja Laki Narain Rai.

তাঁহাদেরই জ্ঞাতি লক্ষ্মীনারায়ণ বিবাহ করিয়া জপসাতে অবস্থান করিতেছেন। এই সূত্রে, লক্ষ্মীনারায়ণ রায়ের সহিত সদাশিব ও নন্দকিশোরের পরিচয় হয়, তাহারা স্বীয় জ্ঞাতি লক্ষ্মীনারায়ণকে স্বগ্রামে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিলে তিনি সম্মত হইয়া খান্দারপাড় গমন করেন। তদবধি তিনি এই গ্রামেই গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়া বাস করেন, তদীয় উত্তরাধিকারীগণ অদ্যাপি এই স্থানে বাস করিতেছেন। কলিকাতা ভবাণীপুরের সুবিখ্যাত কবিরাজ পঞ্চানন রায় কবিচিন্তামণি এই লক্ষ্মীনারায়ণ রায়ের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম, এ-এম,বি, কলিকাতা চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের পিতাপুত্রের জন্মস্থানও এই খান্দারপাড়। বর্ত্তমানে ইহারা খান্দারপাড়বাসী নহেন। পঞ্চানন রায় ও তাহার ভ্রাতৃগণ খান্দারপাড় পরিত্যাগ করিয়া মাতামহালয় খুলনা জেলার অন্তর্গত পয়োগ্রামে গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় বাস স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। লক্ষ্মীনারায়ণ রায়ের অপর বংশধর বিপিনবিহারী, লালবিহারী ও কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী রায় প্রভৃতিও খান্দারপাড় হইতে উঠিয়া স্বীয় মাতুলালয়ে পয়োগ্রামে যাইয়া বাস করিতেছেন। লক্ষ্মীনারায়ণের বংশধর মধ্যে কেহ কেহ অধুনা বিক্রমপুরের নানা স্থানে বাস করিতেছেন। লক্ষ্মীনারায়ণের অপর বংশধরগণ এই স্থানেই বিদ্যমান আছেন। তন্মধ্যে জজকোর্টের উকীল যাদবচন্দ্র রায়, বি,এল, ও গুণেন্দ্রনাথ রায়, বি,এল, প্রসিদ্ধ।

সদাশিব মজুমদারের প্রতিষ্ঠিত ৺কালী দেবী এই গ্রামের প্রধান বিগ্রহ কালীবাড়ীতে প্রতি সপ্তাহে হাট বসিয়া থাকে। বহু দূরদূরান্তর হইতে জনগণ আগমন করিয়া এই দেবীর অর্চ্চনার জন্য উপস্থিত হয়। নন্দকিশোর মজুমদার বাড়ীর শিবও জাগ্রত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সেনদিয়ার বিবরণে বলা হইয়াছে বাণীনাথ দাস মজুমদারের দ্বিতীয় পুত্র রামেশ্বর মজুমদার ও তৃতীয় পুত্র রত্নেশ্বর মজুমদার সেনদিয়া গ্রামে গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়া বাস করেন। বাণীনাথের প্রথম পুত্র কানুড়িয়াবাসী রামনারায়ণ কণ্ঠাভরণের পুত্র কৃষ্ণদেব কবিশেখরের "কবিশেখর" ও দ্বিতীয় রামেশ্বরের পুত্র যাদবেন্দ্রের নাম সহিত যোগ করিয়া, 'যাদবেন্দ্র কবিশেখর" নামে ফতেজঙ্গপুরের জমিদার নামকরণ হয়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে দেখা যায় এই যাদবেন্দ্রের বংশধরগণ ফতেজঙ্গপুর পরগণার স্বত্ববান নহেন। কি কারণে তাঁহারা জমি দাবীর অংশ প্রাপ্ত হন না, তাহার কোন কারণ অবগত হওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন, রামেশ্বরের বংশধরগণ সেনদিয়া পরিত্যাগ করিয়া খান্দারপাড়ে বাস স্থাপন করিবার, কালে, ঐ সম্পত্তি রত্নেশ্বরে বংশধরগণের তত্ত্বাবধানে, রাখিয়া আইসেন কারণ তৎকালে ঐ সম্পত্তির আয় দ্বারা সদর রাজস্ব চলাই দুষ্কর ছিল। এই কাল হইতেই তাহারা এই সম্পত্তি সম্বন্ধে আর কোন অনুসন্ধান লন না, দশসনা বন্দোবস্ত কালে রত্নেশ্বর বংশধরগণ সমুদয় সম্পত্তির মালিক বলিয়া উহা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া লন।

এই যাদবেন্দ্র মজুমদারের পৌত্র বিখ্যাত কবি, বিষ্ণুরাম কবিরাজের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। তিনি কালীদাস কৃত শৃঙ্গারতিলক কাব্যের শান্তি পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া বুধজনকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া গিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন কবিরাজ মহাশয় যে শ্লোক তৎ বিরচিত কুলীন বংশাবলী গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন উহা উদ্ধৃত করা হইল–

যোনোত্তর রাঘব পাণ্ডবীয়ং। মুক্তা প্রবালে বিবমান্যমাক্তন্॥
কণ্ঠে সতাং সাধু বিকাশমানং। কেষাং নচতাংসি চমচ্চ্যকর॥
কাব্যং চ শৃঙ্গার রসপ্রধানং। ব্যাখ্যানয়ঞ্চ তান্তিরসেন পূর্ণং
বিধায় যঃ প্রাপ যশোদুরাপং। নবেত্তি কান্তং কবিরাজ চন্দ্র॥

ইহার প্রকৃত নাম বিষ্ণুরাম মজুমদার, উপাধি কবিরাজ চন্দ্র। পরে উপাধিতেই তাঁহার নাম পর্য্যবসিত হয়। কবিরাজ চন্দ্র আপনাকে তৎকালীন বঙ্গাধিকারীর সভাপণ্ডিত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন যথা-

গঙ্গাতটে যবনরাজক রাজধান্যাং। বঙ্গাধিকারি সমিতৌ কবিমণ্ডিতায়াম
যঃ কাব্য কৌশল মনেকবিধং প্রদর্শ্য। বিখ্যাতমাপ কবিরাজ শিরোমণীতি।

বিষ্ণুরাম কবিরাজ চন্দ্র মহাশয়ের নিজবংশে কেহ বর্ত্তমান নাই। তদীয় ভ্রাতৃবংশের বহুকৃতবিদ্যালোক তাহার নাম রক্ষা করিয়া আসিতেছেন তন্মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, পি,এইচ,ডি ফরিদপুর হিতৈষিণী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। পণ্ডিত শ্রীরাম মজুমদারও কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল প্রকাশচন্দ্র মজুমদার বি,এল্ তদসুজ্ ইঞ্জিনিয়ার সতীশচন্দ্র মজমুদার প্রভৃতি এই বংশের খ্যাতনামা লোক।

জয়রামের পুত্র মধুসূদন মামুদপুরে নয়বংশে বিবাহ করেন। সেই সূত্রে মধুসূদনের পুত্র অভিরামপুরে যাতায়াত করিবার অবসর পান। জয়রামের এই পৌত্র অভিরামই মামুদপুরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরে খান্দারপাড়ায় বাসস্থান প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি খান্দারপাড়ার বিষ্ণু দাশবংশীয় গৌরীনাথ মজুমদারের কন্যা বিবাহ করেন। তদ্বংশীয়গণ অদ্যাপি সেই স্থলেই বাস করিতেছেন।

এই বংশে বহু পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে অভিরামের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অভিরাম কবিরাজ ভূষণাধিপতি সীতারাম রায়ের সভাসদ ও সভাপণ্ডিত ছিলেন। সীতারাম কবিরাজ মহাশয়কে যথেষ্ট সম্মান করিতেন এবং তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত করেন। একদা অভিরামের ছাত্র-মণ্ডলী মধ্যে সীতারামের প্রতিকূলে কোন কথার আলোচনা হওয়ায়, সীতারাম ক্রুদ্ধ হইয়া অভিরামকে কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু অভিরাম কোন কথারই মধ্যে ছিলেন না এই কথা প্রমাণিত হওয়ার পরে মুক্তিলাভ করেন। অভিরাম কৃত একখানা চিকিৎসা গ্রন্থ সংগ্রহ আছে উহা খান্দারপাড়া সংগ্রহ নামে প্রসিদ্ধ। অতঃপর এই বংশে যে সকল ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন কবিরাজ মহাশয় ভারতবিশ্রুত। এই কবিরাজ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গাচরণ সেন খুলনাতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল ছিলেন। জয়রামের পরবর্ত্তিগণ পুরুষানুক্রমিক পণ্ডিত ও কবিরাজ হওয়ায়, তাঁহার বংশধরগণ কবিরাজ এবং তাঁহাদের বাড়ী কবিরাজ বাড়ী নামে প্রসিদ্ধ। এই বাড়ীতে বহুকাল পর্য্যন্ত সংস্কৃত অধ্যয়নের টোল থাকায় বহুদূর হইতে বিদ্যার্থী উপস্থিত হইয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হইত। এই সকল ছাত্রদের অধিকাংশের আহার তাঁহারাই যোগাইতেন। এই কবিরাজবাড়ীতে যত অতিথিই উপস্থিত হউক না কেন তাহারা কখনও বিমুখ হইয়া প্রত্যাগমন করে নাই। বর্ত্তমান সময়ে বাড়ীতে সংস্কৃত টোল না থাকিলেও মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথের কলিকাতাস্থ ভবনে বহুছাত্র সমবেত হইয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতেছেন। উক্ত কবিরাজ

মহাশয়ের নিকট বহু বাঙ্গালী ছাত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত উত্তর পশ্চিম ভারতের জয়পুর যোধপুর প্রভৃতি রাজপুতবাসী এবং বোম্বাই, মাদ্রাজের বহু ছাত্র এইখানে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া কৃতিত্বের সহিত নানাস্থানে কবিরাজী ব্যবসা চালাইতেছেন। জয়পুর আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রধান অধ্যাপক আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য পণ্ডিত লক্ষ্মীরাম স্বামী এই মহাত্মার নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন। ভারতীয় কবিরাজগণের মধ্যে, গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক দ্বারকানাথ সেন কবির মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথম মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করেন। এই উপাধি উপলক্ষে যাবতীয় কবিরাজ মণ্ডলী ও জনসাধারণ এলবার্ট হলে এক বৃহতী সভা অধিবেশন করিয়া দ্বারকানাথের সংবর্দ্ধনা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরেও টাউন হলে এইরূপভাবে বিরাট সভার অধিবেশন করিয়া তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করা হয়, এবং সর্ব্ব সাধারণের ব্যয়ে তদীয় প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি বিডন গার্ডেনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, হাইকোর্টের সর্ব্বজনপ্রিয় চিফজষ্টিস স্যর লরেন্স জেঙ্কিন্স, এই মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করেন। কলিকাতার বহু প্রসিদ্ধ বক্তা তদুপলক্ষে ঐ স্থানে সমবেত হইয়া কবিরাজ মহাশয়ের নানা গুণের কথা উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন। দ্বারকানাথ কলিকাতায় চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেন এবং বঙ্গদেশের নানাস্থলে, সুদূর উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এবং উদয়পুর প্রভৃতি রাজ্যে রাজগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া প্রায়ই মফঃস্বলে গমন করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি একদিকে যেরূপ অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, অন্যদিকে তদ্রূপ দীনজনকে, অসমর্থ আত্মীয়গণকে ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে সর্ব্বদাই মুক্তহস্তে দান করিতেন। তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবনে এক বিরাট অন্নসূত্র খোলা ছিল ; তথায় উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রেই আহার প্রাপ্ত হইত এবং শতশত ছাত্র তদন্নে পরিপুষ্ট হইয়াছেন। তন্মধ্যে অনেকেই বর্ত্তমানে উচ্চশ্রেণীর কবিরাজ মধ্যে পরিগণিত অধুনা তদীয় উপযুক্ত জ্যেষ্ঠপুত্র কবিরাজ যোগীন্দ্রনাথ সেন এম,এ গভর্ণমেন্ট হইতে বৈদ্যরত্ন উপাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি পিতৃদেবের আচরিত পথেই অগ্রসর হইতেছেন। খান্দারপাড়বাসী উপরোক্ত বৈদ্যসম্প্রদায় ব্যতীত হিঙ্গুবংশোদ্ভব আরও কয়েকজন সিদ্ধকাঠী গ্রাম হইতে উঠিয়া এই স্থানে বাস করিতেছেন। তাঁহারা রায় ও রায়চৌধুরি উপাধি ধারণ করেন। শক্তি গোত্রীয় পীতাম্বর সেন পূর্বোক্ত কবিরাজ বংশের এবং রায়চৌধুরী বংশের আদি পুরুষ। ঢাকার প্রসিদ্ধ খ্যাতনামা কলাবিদ্ চন্দ্রনাথ রায় মহাশয় এই বংশের সুসন্তান ছিলেন। কবিরাজবাড়ীর খুলনার উকীল শ্রীযুত বাবু নগেন্দ্রনাথ সেন বিএল্ ও তদীয় কনিষ্ঠ কবিরাজ পণ্ডিত জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন বি-এ, কবিরত্ন অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেন, এম-এ, বিদ্যাবাগীশ, এবং মজুমদার বংশে মুন্সেফ শ্রীযুত যদুনাথ মজুমদার, এবং তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ কবিরাজ এবং রায়চৌধুরী বংশে মুন্সেফ মধুসূদন রায় এবং তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা যতীন্দ্রনাথ রায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট প্রসিদ্ধ লোক। খান্দারপাড়ের অন্য নাম রামচন্দ্রপুর। অতি পূর্ব্বকাল হইতেই এই গ্রামে টোল ছিল বলিয়া ইহাকে সাধারণতঃ টোলা রামচন্দ্র বলা হইত।

## কানুড়িয়া

বাণীনাথ দাশের বংশোদ্ভব ব্যক্তিগণের বিষয় সেনদিয়ার বিবরণে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। বাণীনাথের প্রথম পুত্র রামনারায়ণ কণ্ঠাভরণ, তৎপুত্র কৃষ্ণদেব

কবিশেখর মহবতপুর পরগণার অন্তর্গত কানুড়িয়া আসিয়া বাসস্থান স্থাপন করেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার পৈত্রিক জমিদারী ফতেজঙ্গ পুরের অংশও তিনি প্রাপ্ত হন। বাণীনাথের বংশীয় মজুমদারগণের জমিদারী "কবিশেখর যাদবেন্দ্র" নামে লেখা যায়। কৃষ্ণদেব কবিশেখরের-"কবিশেখর এবং বাণীনাথের দ্বিতীয় পুত্র রামেশ্বর মজুমদারের পুত্র যাদবেন্দ্র মজুমদারের -"যাদবেন্দ্র" একত্র করিয়া, এই "কবিশেখর যাদবেন্দ্র" নাম সন্নিবিষ্ট হয়। তৎকালে এইরূপ বহু নামের যোগে, জমিদারী ও তালুকদারী পত্তন গ্রহণের বিবরণ অবগত হওয়া যায়।

কৃষ্ণদেব কবিশেখরের পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহারাজ রাজবল্লভের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামরাম মজুমদারের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তদীয় বংশধরগণই উপরোক্ত বিষয় সম্পত্তির অধিকারী। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্র ও রাজ কিশোর। ঈশ্বরচন্দ্র একজন প্রতিষ্ঠান্বিত পুরুষ ছিলেন। তিনি যথাক্রমে, পুষ্করিণী উৎসর্গ, তুলা, চতুরাগ্নি প্রভৃতি শাস্ত্রানুমোদিত কার্য্য করিয়া ছিলেন। উহাতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়, দীনহীনকে অর্থদান ও বহুলোককে পরিতোষ সহকারে ভোজন করান হইয়াছিল। জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে এই বাড়িতে বিশেষ সমারোহ হইত।

এই গ্রামে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ বাস করেন। তাঁহার আজিও মহবতপুর পরগণার ভূতপূর্ব্ব মালিক রাণী ভবানীর প্রদত্ত ব্রহ্মত্র ভোগ করিতেছেন। এই গ্রামের তিলকচন্দ্র ন্যায়ভুষণ একজন প্রধান স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন।

বহুকাল পর্যন্ত এই স্থানে বৈদ্যের মধ্যে একমাত্র মজুমদারগণেরই বাস ছিল; পরে ঈশ্বরচন্দ্র মজুমদার মহাশয় স্বীয় জামাতা ঈশ্বরচন্দ্র রায় মহাশয়কে বিদ্ধকাঠী গ্রাম হইতে আনয়ন করিয়া, এস্থানে সংস্থাপন করেন। এই রায় বংশের শ্রীযুত গঙ্গাধর রায় কবিরাজ ও তদীয় ভ্রাতুস্পুত্র মন্মথনাথ রায় বি,এ, এবং মজুমদার বংশে কালীপ্রসন্ন মজুমদার ও কৃপানাথ মজুমদার, বি,এ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

## চাওচা

এই স্থানের কায়স্থ দত্ত পরিবার প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বাখরগঞ্জ জেলার কলসকাটীর জমিদারগণ মধ্যে কার্য্য করিয়া কতক ভূসম্পত্তি লাভ করেন। এই পরিবারের পদ্মদত্ত পরিচিত লোক ছিলেন। ইনি স্বীয় আবাসবাটী ইষ্টক নিস্মিত পাঁকাচকে নিবন্ধ করিয়া ছিলেন, তদীয় অর্থে ইষ্টক গ্রথিত দোলমঞ্চটী, অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া, গভর্ণমেন্টের প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষণ তালিকার অর্ন্তভুক্ত হইয়াছে। পদ্মদত্ত মহাশয়ের দুই পুত্র উমেশচন্দ্র ও রাজকুমার তাঁহাদের কোন পুত্রসন্তান বিদ্যমান না' থাকা প্রযুক্ত, রাজকুমারের কন্যা নির্ম্মলা মাত্র এখন উত্তরাধিকারিণী। দত্ত পরিবারের অপর শাখায় কালীপ্রসন্ন দত্ত একজন সুশিক্ষিত ও চরিত্রবান লোক ছিলেন, তিনি বহু দিবস পর্য্যন্ত আসামের অন্তর্গত বিজনী ষ্টেটের সবম্যানেজারের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তৎপ্রণীত 'রুষ ও জাপান যুদ্ধ' গ্রন্থ সাধারণের নিকট আদৃত হইয়াছিল। দত্ত পরিবারের সুঅবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অত্রত্য ঘোষ পরিবার পরিচিত।

## বাইটকামারী ও মাহারাজপুর

বাইটকামারী ও মহারাজপুর, মহবতপুর পরগণার অন্তর্গত মুকসুদপুর থানার অধীন। বাইটকামারী গ্রামে বহু ব্রাহ্মণগণের বাসস্থান; তন্মধ্যে ভট্টাচার্য্য বংশ প্রসিদ্ধ। ইহারা রাঢ়ীয় সর্ব্বনন্দী মেলের কুলীন। তাঁদের পূর্ব্বপুরুষ নিষ্ঠাবান ও তপঃসিদ্ধ ছিলেন বলিয়া ভট্টাচার্য্য বংশ বিষয় সম্পত্তিবান লোক ছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নাম উল্লেখ কার কর্ত্তব্য।

এই স্থানে বহু ব্যবসায়ী লোক বাস করিয়া থাকে। এতন্মধ্যে সাহা বংশ ধনে শ্রেষ্ঠ ছিল। প্রায় শতাধিক বৎসর অতীত হইল সুবোধচন্দ্র রায় এই স্থানে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। এই মন্দিরটীও গভর্ণমেন্টের কীর্ত্তি রক্ষণ তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। প্রবাদ সাহাগণ দত্ত ভূবৃত্তিতে ভট্টাচার্য্যগণ গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন।

## দিগনগর

বাইটকামারীর অনতিদূরে, এই স্থানে একটি হাট আছে। প্রায় আড়াই শত বৎসর অতীত হইল মোসলমান জাতীয় দেওয়ান সাহাওয়াজ নামক এক ব্যক্তি এই স্থানে একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। এই স্থানে বহু ব্যবসায়ী ও মুসলমান বাস করিয়া থাকে। উপরোক্ত মন্দিরটিও গভর্ণমেন্টের কীর্ত্তি রক্ষণ তালিকার অন্তর্গত।

## কালামৃধা

কুমার নদী তটে, আধার মাণিক, একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম ছিল। তথায় বহু ভদ্রলোক বাস করিতেন; তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ চৌধুরীগণ সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ বিক্রমপুরান্তর্গত বিলাসপুর হইতে এই স্থানে আসিয়া বাসস্থান স্থাপন করেন। এই বিলাসপুরের রাঢ়ী ব্রাহ্মণ শ্রেণীর অন্তর্গত দীর্ঘলাল (দীঘাল) শ্রোত্রীয়গণ সমাজপ্রসিদ্ধ এই চৌধুরীগণও সেই দীঘাল শ্রোত্রীয়। উপরোক্ত চৌধুরী বংশে হরিনারায়ণ চৌধুরী নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন, তাহা হইতেই এই বংশের উন্নতি সংসাধিত হয়।

প্রবাদ হরিনারায়ণ বয়স্ক হইয়াও কোনরূপ, উপার্জ্জনের চেষ্টা না করায়, তদীয় মাতা বিরক্ত হইয়া একদা তাঁহার অন্নের সহিত কিঞ্চিৎ ভস্ম রাখিয়া দেন; হরিনারায়ণ তদৃষ্টে উহা পরিত্যাগ করিয়া নিতান্ত ক্ষুণ্নমনে গৃহ পরিত্যাগ করেন। সেই রাত্রিতে তিনি সপ্নাবস্থায় দেখিতে পান কোন দেবী তৎসমীপে আগমন করিয়া বলিতেছেন "বৎস! তোমার দুঃখ অপনোদন মানসে আমি এই স্থানে সমাগত হইয়াছি। আমার বাক্য প্রতিপালন করিলে তোমার নিশ্চয় সৌভাগ্যের সঞ্চার হইবে। তুমি এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া মেঘনা নদীর পূর্ব্বতীরস্থ মতলবগঞ্জের হাটে গমন কর, দেখিতে পাইবে তথায় এক ব্যক্তি কালী দেবীর প্রতিমূর্ত্তি বিক্রয় জন্য উপনীত হইবে। সে যে মূল্য চাহিবে, তুমি যদি সেই মূল্যে ক্রয় করিয়া উহা সংস্থাপিত করিতে পার, তবে নিশ্চয় সৌভাগ্য সঞ্চার হইয়া তোমাকে যশস্বী করিয়া তুলিবে।" এই স্বপ্ন সন্দর্শনের পরে হরিনারায়ণ জাগ্রত হইয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু উহা দেববাক্য বলিয়া তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল এবং তিনি মতলবগঞ্জাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। স্বপ্নাদেশের সমুদয়

কথাই যথার্থে পরিণত হইল, হরিনারায়ণ দেবী প্রতিমা ক্রয় করিয়া উহা প্রতিষ্ঠা করিলেন, অচিরে তত্রত্য মহবতপুরের মুসলমান জমিদারের মধ্যে তাঁহার চাকুরী জুটিল ও সৌভাগ্যের সূত্রপাত হইল। ক্রমে তিনি ময়মনসিংহ জেলায় একটি পরগণার জমিদারী ক্রয় করেন। অদ্যাপি তদীয় বংশধরগণ মধ্যে কেহ কেহ উহার অংশ ভোগ করিতেছেন। প্রাচীন জমিদারবংশ যে যে সৎকার্য্যের দ্বারা প্রসিদ্ধ লাভ করিয়া গিয়াছেন হরিনারায়ণের বংশে উহা প্রায় সমুদয়ই সুসম্পন্ন হইয়াছে। আঁধার মাণিক গ্রামে ইহারা বাস করিতেন, পরে আরিয়লখা নদীকর্তৃক উহার বিলোপ সাধন হইলে তাঁহার দেওরা থানার অন্তর্গত কালামৃধা গ্রামে বাসস্থান স্থাপন করেন। এই গ্রামে একটি হাট আছে, বহু ব্যবসায়ী লোকের বাসস্থান; তন্মধ্যে সাহা বংশীয়গণ শ্রেষ্ঠ। চৌধুরীদের স্থাপিত বহু কুলীন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ এই গ্রামে বাস করিতেছেন। অধুনা অনেকেই চাকরী ব্যবসায় দ্বারা সম্মান রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। পুলিস সবইনস্পেক্টর লালমোহন চৌধুরী, সবরেজিষ্ট্রার চণ্ডিচরণ চৌধুরী, সবডিপুটী রজনীকান্ত চৌধুরী ও ভুবনমোহন চৌধুরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই গ্রামবাসী কালীভূষণ মুখোপাধ্যায় একজন সুলেখক ও গ্রন্থকার।

## বাণীবহ

ফরিদপুর জেলার গোয়লন্দ মহকুমার অন্তর্গত বাণীবহ গ্রামে অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। ১৫৭৫ শতকে কবিকণ্ঠহার কর্তৃক বৈদ্যগণের যে কুলজীগ্রন্থ বিরচিত হয়, তৎকালে ও এই স্থানের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৈদ্যশ্রেষ্ঠগণের বহু নিবসতি স্থান মূলঘর, সেনদিয়া, কাজুলিয়া, খান্দারপাড়. জপসা, রাজনগর, সোণারং প্রভৃতি গ্রামের নাম যৎকালে খ্যাতিলাভ করে নাই. তৎকালে এই স্থানের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৈদ্য শক্তি গোত্রোদ্ভব মাধব সেনের বংশ ও ধন্বন্তরি গোত্রজ বলভদ্র বংশ এই স্থানের প্রথম অধিবাসী বলিয়া অবগত হওয়া যায়[১]। এতন্মধ্যে মাধব বংশীয় জগদানন্দ ও মাধবানন্দ রায়ের বংশধরগণই বিশেষ প্রসিদ্ধতা লাভ করেন।

গোয়ালন্দ থানার অন্তর্গত পাঁচথুপি গ্রাম পূর্ব্বে পঞ্চ থুপি নামে[২] পরিচিত ছিল। কণ্ঠহার কৃত গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়, এইস্থানে শক্তিমাধব সেন বাসস্থাপন করেন। আমাদের বিবেচনায় পঞ্চস্তূপ হইতেই পঞ্চথুপি নামের উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপ অনুমান করাও অসঙ্গত নহে যে, এই স্থানে অতি পূর্ব্বকালে বৌদ্ধ সম্প্রদায়গণের নিবসতি ছিল। বৌদ্ধ সংস্থাপিত পঞ্চস্তুপ হইতে প্রথমতঃ উহা পঞ্চথুপি ও বর্ত্তমান কালে আরও সরল উচ্চারণ হেতু উহা পাঁচথুপিতে পরিণত হইয়াছে। এই পাঁচথুপি বৌদ্ধ পরিহীন হইবার বহু বৎসর পরে, বৈদ্যমাধব সেন এই স্থানে বাস সংস্থাপন করেন। মাধব বংশের উন্নতি সাধন সম্বন্ধে যাহা অবগত হওয়া যায় তাহা এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতেছে।

আরঙ্গজেব বাদসাহার রাজত্বকালে, সংগ্রাম সাহ নামে, এক সেনানায়কের নাম পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। মগ পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি আততায়ীর হস্ত হইতে বঙ্গীয় প্রজাদিগকে

১. সন্তি বাণীসহ গ্রামে গোবিনদাম্বরসম্ভবা।
২. গণস্তেনায়িস্তে ঘর্য্যাং পরোগায়ঞ্চ হিঙ্গুকামাধব পঞ্চথুপ্যাঞ্চ বসতিং তেহি জজ্ঞিরে। কণ্ঠহার।



একটী দেবমন্দির (মঠ)

রক্ষা কল্পে, বাদসাহার আদেশে সংগ্রাম প্রেরিত হইয়া পদ্মা ও মেঘনার সঙ্গমস্থলে দলবল সহ অবস্থান করেন, কারণ এই দুই পথ অবলম্বন করিয়া, জলযান যোগে, উক্ত দস্যুগণ পূর্ব্ববঙ্গে প্রবেশ করিয়া, প্রজাগণের যথা সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিত। এই পর্য্যন্ত বহু চেষ্টা করিয়াও বাদশাহপক্ষ তাহাদিগকে নির্য্যাতন করিতে পারেন নাই, এবার বিপুল বাহিনী প্রেরণ করিয়া তৎপ্রতি এই আদেশ প্রদত্ত হইল যে, মগও পর্ত্তুগীজদিগের গর্ব্ব যেন একবারে খর্ব্ব করা হয়, এ কার্য্যের সাফল্য অবশ্য পুরষ্কার, অন্যথায় অপরিমেয় তিরস্কার তজ্জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিল। সাজাহান বাদসাহার রাজত্বকালে এই ভাবে প্রেরিত হইয়া সংগ্রাম ইতঃপূর্ব্বে আর একবার পূর্ব্ববঙ্গে আগমন করিয়া ভুলুয়ার অন্তর্গত লক্ষ্মীপুরে এক গড়বন্দী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। উহাতে জলদস্যু উৎপাত কতকটা প্রসমিত হয়, পরে আরঙ্গজেব বাদসাহ পদ প্রাপ্ত হইলে তৎ আদেশে দিল্লীতে যাইতে বাধ্য হন এবং রাজপুতনার নানাস্থানে যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া কৃতকার্য্যতা লাভ করেন। এই সময়ে দস্যুগণের পীড়ন বর্দ্ধিত হওয়ার পুনরায় তাঁহাকে বঙ্গে প্রেরণ করা হয়। এবার আসিয়া সংগ্রাম পুনরায় পদ্মা ও মেঘনার সঙ্গশে সাহাবাজপুর পরগণার কন্দর্পপুর স্থানে আর একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া নদী প্রবেশের মুখেতেই সৈন্য সংস্থাপন করেন।[১] উহাতে তাহার আশা ফলবতী হইল, মগ ও পুর্ত্তগীজেরা জলযান যোগে এইবার বঙ্গের এই ভাগে প্রবেশ লাভ করিয়া একেবারে পরাস্ত ও ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া পরিশেষে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করে।

এই জলদস্যুর উৎপাত নিবারণ জন্য যে যুদ্ধ খরচ হয়, সেই খরচ সঙ্কুলন জন্য আবার যে জমি নির্দ্দিষ্ট হয় উহাকে "নাওরা মহাল" বলিত। বহু পরগণাতে এইস্থান নির্দ্দেশিত হইয়া ছিল, ঢাকা, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর খুলনা প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের জেলা কয়েকটীতেই নাওয়ার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জমির আয় হইতে, জলযান নির্ম্মাণের নাবিকগণের, সৈন্য সেনাপতিগণেরও যুদ্ধোপযোগী অন্যান্য আসবাবের যাবতীয় খরচ প্রদত্ত হইত। তৎকালে ঢাকা, বিক্রমপুর, চট্টগ্রাম, ভুলুয়া এবং ফরিদপুর জেলাস্থ বড় বড় নদীতীরে যুদ্ধোপযোগী রণতরী নির্ম্মাণের কারখানা ছিল। সংগ্রাম পরিদর্শন উপলক্ষে এই স্থানে সময় সময় গমন করিতেন। এই সময়ে চন্দনা তীরবর্ত্তী স্থানের মনোরমণীয়তায় মুগ্ধ হইয়া তিনি তথায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। দস্যু নির্যাতনের পুরস্কারস্বরূপ ইতঃপূর্ব্বেই তিনি বাদসাহার নিকট হইতে অত্র অঞ্চলের কতক ভূমি বৃত্তিস্বরূপ প্রাপ্ত হন। কেহ কেহ বলেন রায়নগর নামক স্থানে সংগ্রাম প্রথম বাসসংস্থাপন করেন। তদীয় কীর্ত্তির নিদর্শন স্বরূপ একটি মঠ অদ্যাপিও মথুরাপুর নামক স্থানে দৃষ্ট হয়, যাহাকে সর্ব্ব সাধারণে সংগ্রামে দেউল বলিয়া নির্দ্দেশ করে।

সংগ্রাম সম্ভবতঃ রাজপুত জাতীয় লোক ছিলেন, বঙ্গে বাসস্থাপন করিয়া তাঁহার আর স্বজাতি প্রাপ্তির আশা ছিল না, তখন কিরূপে কোন সমাজে প্রবেশলাভ করিবেন তাহার উপায় অন্বেষণ করিয়া স্থির করিলেন, ব্রাহ্মণের নিম্নে যে জাতি এই দেশে শ্রেষ্ঠ, তাহাদের সঙ্গেই মিলিত হইবেন। ব্রাহ্মণগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাদের নিম্নে এই দেশে কোন জাতি শ্রেষ্ঠ? তাঁহারা বলিলেন বৈদ্য। এইরূপে বৈদ্য হইয়া, তিনি প্রথমতঃ

১. বিভারেজকৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাস ৪২ পৃষ্ঠা।

কোরকদির ভট্টাচার্যগণের শিষ্যত্ব, গ্রহণ করিয়া, বৈদ্যকন্যা প্রাপ্তির জন্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে পাঁচথুপি গ্রামে নাওরার তহশীলদার সদাশিব নামে এক মহাত্ম বাস করিতেন, তাঁহার এক সুন্দরী বয়স্কা তনয়া ছিল; সংগ্রাম অনুসন্ধানে এই কথা অবগত হইয়া তাঁহার সমীপে কন্যা প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন, নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত, সংগ্রামের পরাক্রমে ভীত হইয়া সদাশিব উহাতে সম্মত হইলেন[১]। এইরূপে সংগ্রামের সহিত কুটুম্বিতাতে আবদ্ধ হইয়া সদাশিব যে কতকটা সৌভাগ্যের পথে উপনীত হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সময় হইতেই তাহারা নওরার চৌধুরী বলিয়া খ্যাত হন[২]।

বর্তমান পাঁচথুপি, বারবাকপুর, হন্দসপুর প্রভৃতি গ্রামের পূর্ব্বে দিয়া যে মরা পদ্মার চিহ্ন দৃষ্ট হয়, উহা বহু পূর্ব্বে অত্যন্ত বেগবতী ছিল। এই সময়ে নদীপথ ও প্রশস্ত বর্ত্তের নিকটই দস্যুভয় ছিল, এই জন্য সম্পত্তি ও প্রাণ রক্ষার জন্য নাওয়ার চৌধুরীরা পাঁচথুপি পরিত্যাগ করিয়া বাণীবহ গ্রামে বাস সংস্থাপন করেন। বিশেষতঃ পাঁচথুপির উত্তরে রাধাগঞ্জ নামে বড় একটি বন্দর ছিল। পদ্মা তীরে এই বন্দর সংস্থাপিত ছিল এবং তথা হইতে দক্ষিণ দিকে রাজাপুর পর্যন্ত পাঁচথুপির পূর্ব্বদিক দিয়া এক বিস্তীর্ণ বর্ত্ত বিদ্যমান ছিল, উহাকে সাধারণে পল্টনের রাস্তা বলিত। মোগল শাসন সময়ে সৈনিকগণের যাতায়াতের জন্য এই রাস্তা ব্যবহৃত হইত, এই জন্য লোকে ইহাকে পল্টনের রাস্তা নামে অভিহিত করিত। উহা তৎনিকটবর্ত্তী লোকের পক্ষে আশঙ্কার কারণ ছিল। এইরূপ স্থানে তখন ভদ্রলোকদিগেরও বাস করিবার পক্ষে বিশেষ ভয়ের কারণ ছিল। বাণীবহ বোধ হয় তৎকালে নিভৃত স্থান ছিল, এই কারণে নাওয়ার চৌধুরীরা সেই স্থানকেই বাসোপযোগী বলিয়া মনোনীত করেন। এই সময়ে বাণীবহের পশ্চিম দিক দিয়া হুরাই নদী (পদ্মার ক্ষুদ্র শাখা) প্রবাহিত হইত। রাধাগঞ্জ হইতে কুপাইখাল নামে একটা সোতা পুরাইখালের সহিত মিলিত হইয়াছিল। এখন বিল বুড়ী বা বাড়িয়া বিল যাহাকে বলে তাহাই এই নদীর উত্থিত জমি। রাধাগঞ্জের নিম্নস্থ পদ্মাভরটী স্থান, এখন রাধাগঞ্জের অথবা পেইজ ঘাটার বিল নামে প্রসিদ্ধ। যাহা হউক চৌধুরীগণ নানা উপদ্রবের আশঙ্কায়, পাঁচথুপি পরিত্যাগ করিয়া প্রায় ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে বাণীবহে আগমন করেন।

বাণীবহ গ্রাম উত্তর-দক্ষিণে সাড়ে তিন মাইল ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে তিন মাইল হইবে। এই গ্রামে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ প্রায় সাত আটশত ঘর, বৈদ্য প্রায় দুই শত ঘর, কায়স্থ ও অন্যান্য জাতি প্রায় আড়াই হাজার ঘর ছিল শুনা যায়। এই গ্রাম এইরূপ জনতাপূর্ণ ছিল যে, কাহারও বাহির খণ্ড ছিল না, স্ব স্ব বাসগৃহের বারেন্দাতেই বৈঠকখানা ছিল। এইরূপ জনতানিবন্ধন ১২৩৩ সালে তথায় ভীষণ মহামারী উপস্থিত হয়, উহাতে বহু লোক মৃত্যুমুখে ও বহু লোক স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। তথাপি তথায় এইরূপ

---

১. সদাশিব্য ক্রয়: পুত্রা গোপীরমণ সেনক:।
বামানন্দ স্তুপা কৃষ্ণানন্দশ্চ কন্যকে উভে।
হৃষিকেশ সৃতা পুত্রাঃ কন্যামেকং ব্যবাহচ।
শালঙ্কারণসম্ভুত সংগ্রামসাহ ভূপতি।
কণ্ঠহার কৃত কুলপঞ্জিকা, ১৪০ পৃষ্ঠা।

২ যশোহরের কালেকটরির তৌজী ৬৭ নং নরোত্তম রায় ও ফরিদপুরের কালেকটরীর ২৫৩০ নং নাওয়া কৃষ্ণকিঙ্কর রায় ও রাজচন্দ্র রায় নাম উল্লেখ দেখা যায়। বিক্রমপুর কোয়রপুত্রের মাধব এই সদাশিবের বংশ নহে।

জনপূর্ণ ছিল যে, গ্রামটিকে রক্ষা করিতে ১২৬২ সালে তথায় মিউনিসিপাল প্রবর্ত্তন উদ্দেশে গভর্ণমেন্ট হইতে এক নোটিশ জারি হয়, যথাস্থানে উহা সন্নিবেশিত হইবে। নানা কারণে উহা আর হইয়া উঠে নাই।

বিদ্যাবাগীশপাড়া, আচার্য্যপাড়া,[1] সরখেলপাড়া, ভট্টাচার্য্যপাড়া, সেনহাটীপাড়া, বসুপাড়া, বেণেপাড়া, ন্যূনেপাড়া, পাচপাড়া প্রভৃতি জনহীন পাড়া আজিও গ্রামে বিদ্যমান রহিয়াছে।

সংগ্রাম সাহেব সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধন চৌধুরীগণ স্ব সমাজে কতকটা নিন্দিত হওয়ায়, উহার পূরণার্থে যশোহর সমাজের কুলীন বৈদ্যের সহিত বহু আদান প্রদান করিয়া পুনরায় সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই সূত্রে সেনহাটীস্থ কুলীন বৈদ্য অরবিন্দ বংশের সহিত কার্য্য করিয়া তাঁহাদের এক শাখা আনয়ন করিয়া স্ব গ্রাম বাণীবহে সংস্থাপন করেন। এই দাশগণ যে স্থানে বাস করেন, উহারই নাম হয় সেনহাটীপাড়া। যদুনাথ দাশ তলাপাত্র এই বংশের আদিপুরুষ, তাঁহার বংশধরদ্বারা এই গ্রামে যে পুষ্করিণী খণিত হয় উহা আজিও তলাপাত্রের দীঘি নামে প্রসিদ্ধ। নাওয়ার চৌধুরীগণের বাড়ী, স্বদেশীয়গণের নিকট রাজবাড়ী নামে অভিহিত হয়, সাধারণতঃ ইহারা মহাশয় নামে খ্যাত। তাঁহারা দুই ভাগে বিভক্ত ; তন্মধ্যে সদাশিবের পৌত্র মাধবানন্দ রায় সম্পত্তির নয় আনা ও জগদানন্দ রায় সাত আনা[2] অংশ বিভাগ করিয়া লন। এই নাওয়ার ভূম্যধিকারীগণের বংশধরগণ নানাবিধ সৎকার্য্য দ্বারা যশোভাজন হইয়াছিলেন। ইহাদের দত্তবৃত্তি, ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতি জমি দ্বারা আজি পর্য্যন্তও বহু লোক প্রতিপালিত হইতেছে। ইহাদের বদান্যতার সাক্ষ্য স্বরূপ একটি গল্প চলিয়া আসিয়াছে, উহা এই স্থানে উল্লেখ করা হইল।

নাওয়ার চৌধুরী মহাশয়দের নিয়ম ছিল যে, গ্রামের ভিতর কোন লোক উপবাসী আছে কিনা উহার অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে আহার প্রদান করা। এই প্রকার অনুসন্ধানের উদ্দেশে একদা চৌধুরীদের কেহ এক ব্রাহ্মণের আলয়ে উপনীত হইয়া দেখিতে পান, একটি লোক পান্তা ভাত খাইতে বসিয়াছেন, তাহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণ আহার ত্যাগ করতঃ আচমনান্তর তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন। উপস্থিত ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে এরূপ করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বিপ্র তাহার বক্ষস্থলে পদাঘাত করিয়া বলিলেন, "দেশের অধিকারী হইয়া কোথায় লোকে সুখ সচ্ছন্দে থাকিবে তাহার ব্যবস্থা না করিয়া, উপস্থিত হইলেন, পান্তভাত খাইবার সময় উপহাস করিতে।" চৌধুরী উহাতে কিঞ্চিৎমাত্র দুঃখিত না হইয়া, তাহাকে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি এই তাম্বুল চর্ব্বণাবস্থায় যতদূর পর্য্যন্ত অতিক্রম করিতে পারিবেন ততদূর ভূমি আপনার ভরণপোষণের জন্য উৎসর্গীকৃত হইবে। কথামত কার্য্য হইল, ব্রাহ্মণ যতদূর পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন ততটা ভূমি তাহাকে দান করা হইল, ঐ স্থান সিদ্ধান্তের পাতী বলিয়া আজিও পরিচিত আছে। যিনি এই বৃত্তি প্রাপ্ত হন, তাঁহার উপাধি ছিল সিদ্ধান্ত, এতৎসম্বন্ধে এই কথাটি রচিত হয় :—

"পান খাইয়া মারিল লাথী।
তাইতে হইল সিদ্ধান্তের পাতী॥"

---

১. মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লিখিত বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায়, রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার আচার্য্য, রায়গণ হইতে ভূবৃত্তি লাভ করিয়া বাণীবহবাসী হন।

২. মাধবোজগদানন্দো গোপীরমণতঃ সুতৌ।
কুলপঞ্জিকা, কণ্ঠহার কত : পৃষ্ঠা।

এই স্থানটি ভীমনগরের পাক নক্সায় একটি বৃহৎ চক। এই নক্সাতেও উহা নিষ্কর লিখিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় সিদ্ধান্ত বংশ একেবারে জনহীন হইয়া পড়ায়, নানা জনে ইহা বেদখল করিয়া ভোগ করিতেছেন।

চন্দনা নদীর তীরস্থ আড়কান্দী গ্রামে নাওয়ার নৌকা প্রস্তুতের প্রধান কারখানা পাকার জন্য তথায় চৌধুরী মহাশয়গণের প্রধান কাছারি ছিল। নবাবী আমলের জলযুদ্ধের জন্য এই সকল যানের ব্যবহার হইত। পঞ্চমুখী গ্রাম বৈদ্যগণের প্রাচীন সাতাইশ সমাজের অন্তর্গত।

নবাব শাসন সময়ে যৎকালে সীতারাম রায় বিদ্রোহী হন, নাওযার বহু সম্পত্তি তিনি অধিকার করায়, চৌধুরীরা অবসন্ন হইয়া পড়েন। এই সময়ে অতি সামান্য সম্পত্তি মাত্র তাঁহাদের হস্তগত থাকে। দশসনা বন্দোবস্তকালে উহার কর ধার্য্য হয় ; কারণ ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের অধিকারকালে আর এই সকল জলযানের আবশ্যক ছিল না। কাজেই নাওয়ার জমি যাহারা ভোগ করিতেন, তাহাদিগকে কর দিতে বাধ্য হইতে হয়। এই নৌকা প্রস্তুত জন্য যে সকল সূত্রধর, কর্ম্মকার প্রভৃতির ভূমি নির্দ্দিষ্ট ছিল, এই কালে সেই সকল জমির করা ধার্য্য হয়। বর্ত্তমান সময়ে ঐ সকল সূতারের তালুক ও কামারের তালুক নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

বিভারিজ কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাসে নাওয়ার বিবরণে এই চৌধুরীবংশীয় উদয়নারায়ণের নাম উল্লেখ আছে। পরবর্ত্তী খণ্ডে নাওয়ার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছ। এই নাওয়ার ভূম্যধিকারী বংশের বিজয়কৃষ্ণ রায় এক্ষণে পূর্ণিয়া জেলার রায় লছমত সিংহ বাহাদুরের ম্যানেজার এবং তথাকার মিউনিসিপাল কমিসনর ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার রায় ফরিদপুরের জজকোর্টের উকীল এবং তত্রত্য মুনসেফকোর্টের গভর্ণমেন্ট প্লীডার ও গোয়ালন্দ বিভাগের লোকালবোর্ডের চেয়ারম্যান।

বর্ত্তমান সময়ে যাহারা এই গ্রামের মধ্যে বিশেষ অবস্থাপন্ন, সেই অরবিন্দ বংশপ্রভব মজুমদার বাবুগণের বিবরণ এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতেছে।

বৈদ্য কুলীন-বংশপত্রিকা (পাতরা) দৃষ্টে অবগত হওয়া যায়, অরবিন্দ যদুনাথ তলাপাত্রের বংশীয় নন্দকিশোর দাশ, বাণীবহ মাধববংশীয় রামনারায়ণ চৌধুরীর কন্যা এবং তৎপুত্র কৃষ্ণজীবন দাশ বাণীবহের মনোহর রায়ের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই সকল কার্য্যসূত্রে এই দাশবংশ সেনহাটী পরিত্যাগ করিয়া চৌধুরীগণের প্রদত্ত বৃত্তিভূমি প্রাপ্ত হইয়া বাণীবহ গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তাঁহারা বাণীবহ গ্রামের যে পাড়ায় বাস করেন, উহাই সেনহাটীপাড়া নামে খ্যাত। প্রায় দেড়শত বৎসর অতীত হইল এই দাশবংশীয়গণ এই গ্রামে স্থায়ী হইয়াছেন।

কৃষ্ণজীবন দাশের দুই পুত্র, বিনোদ রায় ও সদাশিব। এই বংশের শিবশঙ্কর স্বীয় প্রতিভাবলে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি গভর্ণর জেনারেলের শাসন সময়ে, নাটোর রাজ-সরকারের সরবরাহকার নিযুক্ত হইয়া অত্যন্ত দক্ষতা ও প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। তৎকালে বড় বড় জমিদারসরকার গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাধীনের অন্তর্গত হইলে, গভর্ণর জেনারেলের কাউনসেল হইতে তাহারা নিযুক্ত হইতেন। নাটোরের রাজস্টেট এই সময়ে নানারূপ গোলযোগ নিবন্ধন ঋণী এবং রাজস্ব প্রদানে শিথিল প্রযত্ন

হইলে, গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে শিবশঙ্কর এই কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া শিবশঙ্কর বহু সম্পত্তি অর্জ্জন করেন, এই সময় হইতে তাহার উপাধি মজুমদার হয়।

শিবশঙ্করের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ রামশঙ্কর ও কনিষ্ঠ জয়শঙ্কর। এই জয়শঙ্কর মজুমদার মহাশয় মুর্শিদাবাদের প্রভিন্সিয়াল কোর্টের মিরমুন্সী ছিলেন। বলা বাহুল্য এই সকল কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া মজুমদারগণ বহু সম্পত্তির অধিকারী এবং জমিদার বলিয়া পরিচিত হন।

এই মজুমদার বংশের গিরিজাশঙ্কর মজুমদার, কলিকাতা হাইকোর্টে বহুকাল সুখ্যাতির সহিত ওকালতি কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র প্রিয়শঙ্কর মজুমদার, হাইকোর্টের ওকালতি কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। কমলা ও বাণীর অনুগৃহীত এই বংশের লোক স্বদেশে ও স্বসমাজের সর্ব্বসাধারণের পরিচিত।

এই মজুমদার বংশীয় পার্ব্বতীশঙ্কর অপুত্রকাবস্থায় দুইটি কন্যা রাখিয়া লোকান্তরিত হন। প্রথমা কন্যার পুত্র বিপিনবিহারী সেন মুন্সী ও দ্বিতীয়া কন্যার পুত্র জ্ঞানদানন্দ ও সুখদানন্দ সেন মাতামহের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া সেনহাটী গ্রাম হইতে আসিয়া এই স্থানে বাস করিতেছেন।

বাণীবহের মজুমদার বাবুদের অর্থব্যয়ে রাজবাড়ী মহকুমাতে একটি উচ্চ ইংরেজী স্কুল সংস্থাপিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের ব্যয় তাঁহাদের সম্পত্তি হইতে প্রদত্ত হয়। বিদ্যালয়ের জন্য বহু ব্যয়ে সুরম্য ইষ্টকালয় ও ছাত্রনিবাস (বোর্ডিং) স্থাপিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন স্বগ্রামেও ইহাদের প্রতিষ্ঠিত একটি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় বহু কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

আমরা উপরে বাণীবহের নাওয়ার চৌধুরী এবং মজুমদার বংশের বিবরণ প্রদান করিলাম. এতদ্ভিন্ন এই গ্রামের মুন্সী পরিবারগণও এক সময়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইহারাও মাধববংশীয়। এই মুন্সীবংশের রাধাকান্ত মজুমদার লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময়ে একাউণ্টেন্ট জেনারেলের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। যৎকালে বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, তৎকালে রাধাকান্ত এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাণীবহ গ্রামে একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করান, উহার অধিকাংশ এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে এই মাধব বংশের শ্রীযুক্ত বারেশ্বর সেন একজন সুদক্ষ লেখক, তিনি বহুকাল পর্য্যন্ত পুলিস বিভাগে কার্য্য করিয়া পুলিসের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে নিযুক্ত ছিলেন, সম্প্রতি পেন্সন গ্রহণ করিয়াছেন। তদীয় পুত্র বসেরা যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগত প্রফুল্লচন্দ্র সেন, বি,এ, ডিপুটি কলেক্টর পদে মনোনীত হইয়াছেন। এই বংশের গোবিন্দপ্রসাদ সেন মুন্সী সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে তৎকালীন হায়দারাবাদের রেসিডেণ্ট, স্যার রিচার্ড টেম্পল ও নাগপুরের চিফ্ কমিশনার প্লাটডেনের অধীনে কার্য্য করিয়া বিশেষ যশ অর্জ্জন করিয়া ছিলেন। তৎপুত্রকবিরাজ শ্রীযুত প্রভাতচন্দ্র সেন কবিরঞ্জন, এক্ষণে সুখ্যাতির সহিত কলিকাতাতে চিকিৎসা কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন।

## লক্ষীকূল

নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর অধীনে কোন কার্য্য করিয়া, কায়স্থ গুহ বংশীয় প্রভুরাম রায় প্রভূত সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। রাজ সরকার হইতে কোনরূপ উপাধী না পাইলেও, স্বদেশীয়েরা ইহাদিগকে রাজা বলিয়াই সম্বোধন করিয়া থাকে। প্রভুরামের পুত্র গৌরীপ্রসাদ ও তৎপুত্র বিশ্বদিগীন্দ্রপ্রসাদ তৎপুত্র সূর্য্যকুমার। শেষোক্ত মহাত্মা রাজবাড়ী মহকুমায় একটি উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের পাকা বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত মহকুমার অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, এতদ্ভিন্ন ফরিদপুরের ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের ও রাজবাড়ীর লোকালবোর্ডের মেম্বর ছিলেন। গভর্ণমেন্ট সন্তুষ্ট হইয়া সূর্য্যকুমারকে রায় বাহাদুর উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর অতীত হইল সূর্য্যকুমার কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।

## কোড়কদি

এই স্থানটি বালীয়াকান্দী থানার অন্তর্গত। ঠাকুর রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মুর্শিদাবাদের অন্ত র্গত সাইকুল গ্রাম হইতে আসিয়া এই গ্রামে গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। ভট্টাচার্য্য সিদ্ধপুরুষ বলিয়া খ্যাত থাকায় প্রসিদ্ধ সংগ্রাম সাহ তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন এবং গুরুদেবকে কোড়কদি ও আরও অনেক স্থান ব্রহ্মোত্তর জমি প্রদান করেন। এই বংশে বহু পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান নৈয়ায়িক পণ্ডিত রামধন তর্কপঞ্চানন এই বংশের লোক ছিলেন।

ভট্টাচার্য্যদের স্থাপিত কুলীন সান্ন্যাল, ভাদুড়ী, লাহিড়ীগণ মধ্যে অনেকেই সম্পত্তিশালী ছিলেন, তন্মধ্যে মধুসূদন সান্ন্যাল বিখ্যাত ছিলেন। নীলকুঠীর আয়ের দ্বারা এই সান্ন্যাল মহাশয় কয়েকটি পরগণার মালিক হন। এই মহাত্মা কলিকাতা বাস করিতেন। যোড়াসাকোর রাস্তার পার যে ঘড়িসংযুক্ত বৃহৎ বাড়ী দৃষ্ট হয়, তথায় মধু বাস করিতেন। পরে ঋণদায়ে এই বাড়ী মল্লিকদের হস্তগত হয়। কোড়কদির সান্ন্যাল বাড়ীতে এক রাত্রিতে ১০১ খানা শ্যামাপূজা নির্ব্বাহ হইয়াছিল। এই গ্রামের পোষ্টেল ডিপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনারেল রাধিকাপ্রসাদ লাহিড়ী মহাশয় শেষ সময়ের বিখ্যাত লোক। মুনসেফ যতীন্দ্রনাথ লাহিড়ী ও অনঙ্গমোহন লাহিড়ীর বাসস্থানও এই গ্রামেই।

## বেলেকান্দী

রাজবাড়ী হইতে ১৩ মাইল দূরে। এই স্থানে বহু বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বাস করেন তন্মধ্যে চৌধুরী উপাধিধারী ব্যক্তিগণ প্রসিদ্ধ। পাইকপাড়ার রাজাদের মহিমসাহি পরগণার সদর কাছারি এই স্থানে সংস্থাপিত। এখানে একটা থানা ও হাট আছে। তত্রত্য মুনসেফ কানাই লাহিড়ীর নাম উল্লেখযোগ্য।

## দারৈখালা

বৈদিক আগমাচার্য্যের এক শাখা এই গ্রামে বাস করেন বহু পণ্ডিত এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। এই বংশের বর্ত্তমান শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় উপদেশ

দ্বারা বহু উশৃঙ্খল যুবককে হিন্দুধর্ম্মে পুনরানয়ন করিয়াছেন তিনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ও বাগ্মী। এই মহাত্মার পুত্র নৈয়ায়িক রাখালচন্দ্র তর্কতীর্থ কাশ্মীর রাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে অত্যল্প বয়সে ইনি পিতৃদেবকে ও দেশবাসীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অনন্তধামে গমন করিয়াছেন।

### উজিরপুর

কুমার নদ তীরে সাতোর পরগণার অন্তর্গত একটি প্রধান স্থান। আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে বৈদিক রামানন্দ ভট্টাচার্য্য নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। দেবীর আরাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করায় তাহাকে সকলে দেবীবর বলিয়া সম্বোধন করিত। তৎপ্রতিষ্ঠিত শিব ও পঞ্চ মুণ্ডের উপর সংস্থাপিত কালীমূর্ত্তি অদ্যাপি মন্দির মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। এই দেবদেবীর অর্চ্চনার জন্য নাটোরের ও চাচড়ার রাজগণ বহু ভূ-সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। চাচড়ার রাজদের দত্ত ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের তায়দাদ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ১৬৯১ শকে (১১৬৬ সালে) এই মন্দির নির্ম্মিত হয়। কুমার নদের পূর্ব্ব তীরে, উজীরপুর হাটের অব্যবহিত উত্তর দিকে দেবীবরের শ্মশানঘাট অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, জনগণ অদ্যাপি তথায় মানত ও মাল্য প্রদান করিয়া থাকে।

### মেঘচামী

প্রাচীন বঙ্গীয় বৈদ্য সমাজের মধ্যে যে ২৭টি স্থানের পরিচয় আছে, মেঘচামী উহার অন্যতম। মানিকগঞ্জের অন্তর্গত দাশড়া সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ভানুদত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতার বংশধরগণ দ্বারা কর্মচারী ও ভোগিলহট্টের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্থানের শ্রীমন্ত খাঁ ও বংশীবদন মৌলিক খ্যাত লোক ছিলেন। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বৈদ্যবংশীয় অযোধ্যারাম সেন কর্ত্তৃক স্থানীয় বিগ্রহ গোপালের মন্দির নির্ম্মিত হয়। স্থানটি বালীয়াকান্দী থানার অন্তর্গত।

### লনক্ষীর

থানা নাগরকান্দার অন্তর্গত এই স্থানে অনেক বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস করেন। কোটালীপাড়াতে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বাস করিতেন। ইহাদের ব্যবসায় রাজকর্তা, তন্মধ্যে অনেকের পাণ্ডিত্য খ্যাতি ছিল। এই স্থানে একটি প্রাচীন সুদৃশ্য মন্দির আছে। এই মন্দির কাহাদ্বারা কখন নির্ম্মিত হয় উহা অবগত হওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন, উজানীর জমিদার এই বৈদিকবংশের শিষ্যত্ব নিবন্ধন তাঁহারাই স্বীয় গুরুধামে এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

### কাজীটোলা বাফুলহার।

মুকসুদপুর থানার অধীন এই স্থানে কয়েক ঘর ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ তালুকদার বাস করিয়া থাকেন। এই স্থানে সুলতান দীঘিকা নামে একটী প্রকাণ্ড জলাশয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। উহার অনেক স্থান জমিতে এবং অপরাংশ জঙ্গল ও নানারূপ দাম ও শৈবালে পরিপূর্ণ।

স্থানের নাম এবং দীঘির নাম হইতে বুঝা যায়, এই স্থানে কোন প্রধান মুসলমান ব্যক্তি বাস করিতেন। তালুকদার চক্রবর্ত্তীগণের যাজনিক ব্যবসায়। খান্দারপাড়ার অধিকাংশ বৈদ্য ও ব্রাহ্মণের ইহারাই পুরোহিত।

## ভূষণার আচার্য্য বংশ

বঙ্গদেশের কয়েকটী জেলায় সরযুপারী গ্রহবিপ্রগণ বাস করেন। এই সমাজ পাণ্ডিত্য দ্বারা বহুকাল হইতে বিখ্যাত ছিলেন। এই সমাজস্থ গ্রহবিপ্রগণের মধ্যে যাহারা ফরিদপুর জেলায় বাস করেন, কেবল তাঁহাদের বিববণ এখানে লিপিবদ্ধ হইতেছে। ফরিদপুরের গোয়ালন্দ সবডিভিসনেই সরযপারী গ্রহবিপ্রগণের বাস। ইহারা তিনশত বৎসর পূর্ব্ব হইতে একশত বৎসরের পূর্ব্ব মধ্যে এই জেলায় আসিয়া বাস করিয়াছেন।

কাশ্যপ গোত্রীয় মধুসূদন উপাধ্যায় নামক এক বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিৎ পঞ্চকোটের রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি অনুমান সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শন করিয়া পঞ্চকোটে প্রত্যাগমন কালে ভূষণার রাজা মুকুন্দরাম রায়ের সভায় উপস্থিত হন। সঙ্গে যুবা পুত্র বিশ্বরূপ। মধুসূদন ও তৎপুত্র উভয়েই মহাপণ্ডিত ছিলেন। জ্যোতিঃশাস্ত্রে তাঁহাদের বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। রাজসভার পণ্ডিতগণের সহিত পিতাপুত্রের অনেক শাস্ত্রীয় বিচার হইল। তাহাদের পাণ্ডিত্য দেখিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। তাহার পর, মধুসূদন বলিলেন "ভূষণারাজের এত বড় সভায় ভাল জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত নাই। জ্যোতিষশাস্ত্র বেদের চক্ষু এবং প্রধান বেদাঙ্গ, কালজ্ঞান জ্যোতিষশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি সাপেক্ষ। অতএব কালজ্ঞান ব্যতীত বৈধ ক্রিয়া কোন প্রকারেই যথাবিধি সম্পন্ন হইতে পারে না"।* তখন রাজা মুকুন্দরাম রায় ও অন্যান্য সভাসদ্‌গণ পণ্ডিত মধুসূদনকে ভূষণার রাজপণ্ডিত হইতে অনুরোধ করেন। তিনি স্বয়ং ভূষণা রাজধানীতে না থাকিয়া তাঁহার সুপণ্ডিত পুত্র বিশ্বরূপকে সেখানে রাখিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। তাহার পর মধুসূদন উপাধ্যায় মহাশয় পঞ্চকোটে প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় আরাধ্য দেব বাসুদেব বিগ্রহ সহ পুত্র বিশ্বরূপকে ভূষণায় প্রেরণ করেন। ভূষণারাজ চন্দনী নদীর বামতীরে পাঁচ শত বিঘা ব্রহ্মত্রা ভূমিসহ বিশ্বরূপকে বাসস্থান প্রদান করেন। বিশ্বরূপ স্বীয় ইষ্টদেব বাসুদেব বিগ্রহের নামানুসারে চন্দনা নদীর চড়ভূমি-স্থিত স্থানকে বাসুদেবপুর নাম রাখেন। এই বাসুদেবপুর এখন "বাসপুর" নামে খ্যাত।

উক্ত মহাত্মা বিশ্বরূপ হইতে অধস্তন একাদশ পুরুষ পণ্ডিত মহাদেব আচার্য্য (ইনি মহাদেব ঠাকুর নামে বিখ্যাত ছিলেন)। মহাদেবের যথেষ্ট বিদ্যার খ্যাতি ছিল এবং তিনি একজন সাধক ছিলেন। তিনি তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষাধিষ্ঠিত পূণ্যস্থান বাসপুরের অধিকাংশ চন্দনার গর্ভস্থ হইলে কিছু দিনের জন্য বর্ত্তমান মরা পদ্মার পশ্চিম তীরস্থ মূলঘর গ্রামে বাস করেন। তৎকালে মধুমতীর তীরস্থ মহাম্মদপুবের অধিপতি সুপ্রসিদ্ধ রাজা সীতারাম রায় প্রবল পরাক্রান্ত ও গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি পরম সাধক পণ্ডিত মহাদেবকে আহ্বান করিয়া শিবত্রা ও ব্রাহ্মত্রা ভূমি পাঁচশত বিঘা দান করিয়া বাসপুরের সন্নিহিত চন্দনার অপর পারস্থিত বাগাট গ্রামে বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। সাধক প্রবর মহাদেবের বাটীর

* ভাস্করাচার্য কৃত সিদ্ধান্ত শিরোমণি কালসানাধ্যায় পাঠ করুন।

সম্মুখে শ্যামল তৃণমণ্ডিত বিস্তৃত ভূমি ও উহার প্রান্তদেশে নদীর উপরে রাজা সীতারাম রায়ের ব্যয়ে নির্মিত এক শিবমন্দির ছিল। অপরাহ্নে গ্রাম্য ভদ্রলোকেরা মন্দির সম্মুখস্থ বিস্তৃত ভূমিতে বসিয়া পণ্ডিতবর মহাদেবের মুখে শাস্ত্রীয় কথা শ্রবণ করিতেন। সাধক প্রবর মহাদেবের সে মনোহর পুষ্পোদ্যান এবং সুপারি নারিকেল আমকাঁঠালের সুবিস্তৃত বাগান এখন আর নাই। আর সেই ধনধান্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত-জীবন গ্রামবাসীর শাস্ত্রীর আলাপ শ্রবণে ঔৎসুক্য এবং পঞ্চানন তুল্য মহাদেবের সরস শাস্ত্রীয় কথা মনোরম গল্পও আর নাই, এখন সমস্তই কথা মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে।

মহাদেব ঠাকুরের এক পুত্র ও তিন কন্যা। পুত্র কালীপ্রসাদ ঠাকুরও পিতার ন্যায় সুপণ্ডিত ও সাধক ছিলেন। তাঁহার ধনতৃষ্ণা অধিক ছিল না, তিনি বাটী হইতে অন্য স্থানে যাইতেন না। ব্রহ্মত্রা ও শিবত্রা ভূমির আয় ও গ্রাম্য লোকে শাস্ত্রীয় ব্যবসায়ের জন্য যাহা প্রদান করিত, তদ্দ্বারা অতি শান্তিতে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার অধিক সময় শিবের সম্মুখে ধ্যানধারণায় অতিবাহিত হইত। মহাদেব ঠাকুর জীবিত থাকিতে তাঁহার তিন কন্যাকেই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই তিন কন্যার নাম সুলোচনা, সাবিত্রী ও অপর্ণা। ইহাদের মধ্যে সুলোচনা দেবী সংস্কৃত ব্যাকরণ, বাল্মীকি রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পিতার নিকট পাঠ করিয়াছিলেন, ইনি অতিশয় বুদ্ধিমতী ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। সুলোচনা দেবী স্বামী ও পুত্রগণের সহিত নৌকাযোগে কাশী যাত্রা করেন। ত্রিরাত্রি-বাসের পর স্বামী উমাকান্ত বিদ্যানিধি মহাশয় কাশী লাভ করিলে ইনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আর গৃহে ফিরিবেন না তাহার বিশ্বাস ছিল, স্বামী বিয়োগের পর এক বৎসরের মধ্যে দেহত্যাগ করিলে পুনরায় সেই স্বামীকে লাভ করা যায়। তজ্জন্য তিনি প্রত্যাগমন কালে নবদ্বীপে তাঁহার শ্বশুর কুলের জ্ঞাতিগণের গৃহে বাস করেন, অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার সজ্ঞানে গঙ্গা লাভ হয়। এই বিদুষী সুলোচনা দেবীই ৺পীতাম্বর বিদ্যানিধি মহাশয়ের জননী ও মহামহোপাধায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভুষণ এম,এ. পি.এইচ.ডি. মহাশয়ের পিতামহী। কালীপ্রসাদের পুত্র তারকনাথ আচার্য্য কিছুকাল বাগাটে বাস করেন। তাঁহার পরলোকগমনের পর তাঁহার দৌহিত্র বাসুদেব বিগ্রহ ও শিবের সেবা করিয়া আসিতেছিলেন। উপর্য্যুপরি তাঁহাদের দৈব বিপদ ঘটায় তাঁহারা ঐ স্থান পরিত্যাগ করেন এখন সেই সুখসমৃদ্ধিপূর্ণ বাগাট গ্রাম জনশূন্য দুই চারি ঘর মাত্র লোক বাস করে। পাঁচ সাত বৎসর পূর্ব্বেও সেই শ্বেত পাষাণের মহাদেব মুক্তি চন্দনা তীরস্থ প্রাচীন কালীবাড়ীর সম্মুখস্থ একটী অশ্বত্থ বৃক্ষমুলে দৃষ্ট হইত এবং বানলিঙ্গ শিব গৌরীপট হইতে এক হাত উচ্চ। মহাদেব ঠাকুরের অধস্তন বংশের দৌহিত্রকুলের মধ্যে মধুখালী বন্দরের সন্নিহিত আড়কান্দী নিবাসী শ্রীমোহন আচার্য্য ও আশুতোষ আচার্য্য রাজা সীতারামের ব্রহ্মত্রা শিবত্রা ভূমির নষ্টাবশের ভোগ করিতেছেন।

বাসুদেবপুর নদী গর্ভস্থ হইলে মধুসূদন উপাধ্যয়ের বংশের আর এক শাখা গোপীকৃষ্ণ আচার্য্য পাবনা জেলার আড়াই ক্রোশ পশ্চিমে প্রতাপপুর গ্রামে গিয়া বাস করেন। এই বংশের কোমকৌমুদী নামক প্রসিদ্ধ জ্যোতি গ্রন্থের প্রণেতা গঙ্গাগোবিন্দ আচার্য্য মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। গঙ্গাগোবিন্দ আচার্য্য মহাশয় সূর্য্যবিদ্ধান্ত অনুযায়ী একখানি করণ গ্রন্থ ও সূর্য্যসিদ্ধান্তের বঙ্গানুবাদ করেন। তাহার পৌত্র শ্রীযুক্ত

গিরিজাশঙ্কর আচার্য্য ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত পাংশা নিবাসী মাতুল মধুসূদন আচার্য্যের উত্তরাধিকারী হইয়া তাঁহার পৈতৃক ব্রহ্মত্র ভুমির কিয়দংশ ভোগ করিতেছেন। এই ব্রহ্মত্র ভুমি নাটোরের রাজা রামজীবন রায়ের প্রদত্ত।

রাজা শশাঙ্কানীত সরযুপারী গ্রহবিপ্রগণের আর একটী প্রসিদ্ধ বংশ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত খালকুলা গ্রামে বাস করেন। এই বংশের আদিপুরুষ মৌদ্গাল্য গোত্রীয় কমলাকর মিত্র। ইনি সাধারণের মধ্যে কমলাকর জ্যোতিষী নামে খ্যাত ছিলেন। কমলাকরের কৃত জ্যোতিষ গ্রন্থের টীকা আছে। এই কমলাকর মিশ্র এবং নদীয়ার মহারাজের পঞ্জিকাকার বংশের আদি পুরুষ গর্গগোত্রীয় হৃদয়ানন্দ বিদ্যার্ণব (ইঁহাদের কুলোপাধি দুবে বা দ্বিবেদী) পঞ্চ কোটের নিকটে বাস করিতেন। এখান হইতে নদীয়ার রাজবংশের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। নবদ্বীপে কমলা করের বিশেষ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। এই কমলা করের বংশে প্রসিদ্ধ রাজীবলোচন বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেন। রাজীবলোচন সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার বৃহৎ চতুস্পাঠীতে ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, স্মৃতি প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই অধ্যাপিত হইত। এই রাজীবলোচনের পৌত্র শতানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত চম্পকাদহ বিলের সন্নিহিত ধরমাঠী গ্রামে কিছু কালের জন্য আসিয়া বাস করেন। পূর্ব্ব যখন কলিকাতা মহানগরীর পত্তন হয় নাই। তখন ভূষণা নগরী বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। ভূষণার রাজা ও তৎপর ভূষণা প্রদেশের শাসনকর্ত্তা সংগ্রাম সাহা ও মহম্মদপুরের রাজা সীতারাম রায়, ইহারা সকলেই বিদ্যাবেদজ্ঞ ও গুণগ্রাহী ছিলেন। তজ্জন্য অনেক পণ্ডিত ও গুণী লোক ভূষণা সন্নিহিত স্থানে আসিয়া বাস করিয়া ছিলেন। বিশেষতঃ বহু সংখ্যক জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত ভূষণা ও তাহার নিকটে বাস করিতেন। পণ্ডিত শতানন্দ সিদ্ধান্ত বাগীশ মহাশয় ধরমাঠীতে বাস করায় এখানে সংস্কৃতচর্চার বিলক্ষণ অভ্যুদয় হইল, তাহার আর তিন চারি ভ্রাতা নবদ্বীপেই বাস করিতে লাগিলেন। সিদ্ধান্তবাগীশ স্থানীয় ভূম্যাধিকারাদের নিকট হইতে অনেক ব্রহ্মত্রা ভূমি ও স্বীয় পৈতৃক উপাস্য দেবতা রঘুনাথ, সুদর্শন, দধিবামন প্রভৃতি শালগ্রাম নারায়ণের দেবত্রা ভূমি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন দুই-তিনখানি গ্রামের তহশিলদারী নিজ তত্ত্বাবধানে কর্মচারী দ্বারা নির্ব্বাহ করিতেন। তাহার পরলোকগমনের পর জমিদারগণের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের পুত্রগণ কোন পক্ষ অবলম্বন করাই শ্রেয় মনে করেন নাই। তাঁহারা দেবত্রা ভূমি ব্যতীত অন্য সকল ভূমি হস্তান্তর করিয়া ঐ স্থানের উত্তর-পশ্চিমাংশে চন্দনা নদীর তীরে খালকূলা নামক একটী নতুন পল্লীতে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। চন্দনা নদী কঙ্কনের ন্যায় এই গ্রামটী পরিবেষ্টন করিয়া বেগবতী মধুমতী (গরাই) অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। চন্দনা নদীর ঠিক উত্তর তীরে শতানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের পাঁচ পুত্র উমাকান্ত বিদ্যানিধি প্রভৃতি আসিয়া বাস করেন। শ্রেণীবিদ্ধ সুপারি ও নারকেল তরু দ্বারা সুশোভিত ইহাদের বাসভবন অতি সুন্দর দেখাইত। এখন নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া কিঞ্চিৎ দূর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। উমাকান্ত বিদ্যানিধির চারি পুত্রের মধ্যে তৃতীয় পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। সাধারণের নিকটে তিনি বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া সম্মানিত ও পূজিত হইতেন। তিনি মুখ্যাধিকারী ও ধনীদের গৃহে বৎসরে

প্রায় ৩০/৪০টী গ্রহ স্বস্ত্যয়ন ও গ্রহযাগ করিতেন। (তাঁহার এমনই অসাধারণ দৈববল ছিল যে) তাঁহাদের সকলেরই সংকল্প সিদ্ধি হইত। তিনি যেমন শাস্ত্র ব্যবসায়ে আশাতিরিক্ত অর্থোপার্জ্জন করিতেন তেমনি মুক্তহস্ত ছিলেন। দোল দুর্গোৎসব ব্রত নিয়মাদি সমুদয় তিনি অতি নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিতেন বিদ্যাবাগীশ মহাশয় পরোপকারী ছিলেন। নানা প্রকারে পরোপকার করিতেন। বিশেষত অনেকের বিবাহ, মাতৃপিতৃশ্রাদ্ধে মহাজনেরা উপযুক্ত বন্ধক না পাওয়ায় টাকা ধার না দিতে চাহিলে তিনি প্রতিভূ হইয়া টাকা ধার লইয়া দিতেন।

এই বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের চারি পুত্র। জ্যেষ্ঠ ৺বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব গুপ্ত প্রেশ পঞ্জিকা ও গবর্ণমেন্ট পঞ্জিকার প্রণেতা ছিলেন। সমস্ত জীবন গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুশীলন করায় ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারী ইহার জন্য মাসিক পাঁচশত টাকা বৃত্তি দেওয়ার আদেশ করেন। অল্পদিন বৃত্তি ভোগ করিয়া জ্যোতিষার্ণব মহাশয় পরলোক গমণ করিয়াছেন। সম্প্রতিবৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব মহাশয়হ সর্ব্ব প্রথম "ষ্টেট্ পেনসন" প্রাপ্ত হন। মধ্যম পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী ও তৃতীয় মহামহোপাধ্যায় স্বগীয় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভুষণ এম,এ, পি,এচ,ডি, চতুর্থ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন আচার্য্য। ইহারা এখন খালকুলার বাটীতে বাস করেন না। পূর্ব্বপুরুষগণের অধ্যুষিত নবদ্বীপে বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কলিকাতায়ও ইঁহাদের বাটী আছে। ইহারা এখন অধিকাংশ সময় কলিকাতায় বাস করেন। ইঁহাদের জ্ঞাতিগণ খালকুলার বাস করেন।

গোয়ালন্দ মহকুমার সন্নিহিত মরা পদ্মার তীরে হমদমপুর নামে একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে উহার একাংশকে মূলঘর বলে। মূলঘরের সরযুপারী গ্রহ বিপ্রকুল সম্ভুত রামকান্ত আচার্য্য মহাশয়ের পূব্বপুরুষেরা স্ফটিক প্রস্তরের একটী সূর্যামূর্ত্তি ও দামোদর নামক এক নারায়ণ মূর্তির সেবা করিতেন। সূর্য্যমূর্ত্তি আকারে তত বড় নহে, গোলাকার। প্রতিদিন পূজার পূর্ব্বে স্নান করাইবার সময় চন্দন ধৌত হইলে ঐ মূর্ত্তি হইতে অপূর্ব্ব রশ্মি নির্গত হয়। আমরা স্ফটিক পাষাণ অনেক দেখিয়াছি কিন্তু এরূপ উজ্জ্বল স্বচ্ছ মূর্ত্তি আর কখনো দৃষ্টি গোচর করি নাই। কোন যুগে কোন দেশ হইতে এই মূর্ত্তি সংগ্রহ করা হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না। দামোদর প্রকাণ্ড শালগ্রাম নারায়ণ মূর্ত্তি– প্রতিদিন পূজার পূর্ব্বে স্নান করাইবার সময় হাতে করিলে অতিশয় ভার বোধ হয়। এই দুই বিগ্রহের জন্য পূর্ব্বকালে বাঙ্গালার প্রাচীন রাজারা যে সকল দেবত্রা ও ব্রহ্মত্রা ভুমি দান করিয়াছিলেন রামকান্ত আচার্য্যের পূর্ব্বপুরুষেরা তাহা ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। তদ্ভিন্ন রাজা সীতারাম রায়ের রাজ্যাবসানে নাটোরের রাজা রামজীবন ঐ প্রদেশ জমিদারী প্রাপ্ত হইলে তিনিও রামকান্ত আচার্য্যকে দামোদরের সেবার নিমিত্ত ২৫ বিঘা দেবত্র ভূমি তাম্রপত্রে লিখিয়া দান করেন। রামকান্তের বংশে অধস্তন পুরুষ পুত্রহীন হওয়ায়, মহুকুমার শিঙ্গ দ্বাদশী নিবাসী বিখ্যাত ভরদ্বাজগোত্রীর বাণীকণ্ঠ বৃহজ্জ্যোতিষীর চতুর্থ পুরুষ হরিপ্রসাদ বৃহজ্জ্যোতিষী ঐ বংশের একমাত্র কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার বংশধরগণ মূলঘরে বাস করিয়া এ ব্রহ্মত্রা ও দেবত্রা ভূমি ভোগ করিতেন। ইঁহাদের ভূমির পরিমাণ অনেক, সরিকগণ পরস্পর পরস্পরের ভার দেওয়ায় অনাস্থাবশতঃ অনেক ভূমি বেদখল হয়, যখন ফরিদপুর জেলা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ঐ সকল স্থান যশোর জেলার অধীন ছিল, তখন ঐ বংশের ৺গোলকচন্দ্র বিদ্যা বাচস্পতি উহার অনেকাংশ উদ্ধার করেন। এই

গ্রামটী অতি প্রাচীন। প্রাচীনতার চিহ্ন যে সকল বৃহৎ দীর্ঘিকা বিদ্যমান দেখা যায়; তাহার তরে যেমন নিবিড় অরণ্য, জলের উপর দামদল, তাহার উপর অসংখ্য বৃক্ষরাজি উৎপন্ন ঘন বন ঐ সকল গভীর জলাশয়ের জলে কুম্ভীর ও দামদলের অরণ্যের মধ্যে ব্যাঘ্র বাস করে। কোন কোন স্থানে ব্যাঘ্র ভল্লুক কি শৃগালেরা জলাশয়ের এক কোণে দামদলপানা ভেদ করিয়া জল পান করায় কিছু স্থানে জল দৃষ্ট হয়। ঐ সকল স্থানে দিবসে যাওয়াও বিপজ্জনক পূর্ব্বোক্ত আচার্য্য মহাশয়নের বাটীটি প্রায় দিঘীর উপর তাহার তিনদিকেই তদ্রূপ সকল সীমিত অনেক লোক পূর্বেই এই পুরাতন গ্রাম ত্যাগ পূর্ব্বক দূরে গিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে আচার্য্য মহাশয়েরা ভুমি ভিত্তি সুপারি নারিকেল ও আম কাঁঠালের বাগানের আশা ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাহার ফলে তাহাদের বংশ বিলুপ্ত প্রায় এক পণ্ডিত কাশীচন্দ্র আচার্য্য মহাশয় গ্রামের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। সম্প্রতি তিনি ও পরলোক গমন করিয়াছেন। যে স্থান পূর্ব্বে দুই তিনটি সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপক ও ছাত্রগণের শাস্ত্রালোচনায় সর্ব্বদা মুখর ছিল। তাহা এখন অরণ্য-সঙ্কুল এবং কয়েকটী বেধবা ও রোগা দুই একটী যুবা ও বালকের নীরব নিকেতন। এখনও সায়ংকালে গৃহে টমটিপ্ করিয়া আলোক জ্বলে, ইঁহার পর কি হইবে ভগবান সূর্যদেবই জানেন।

পূর্বোক্ত হমদমপুরের সন্নিহিত মরাপদ্মার ঠিক পশ্চিম তীরে পাঁচথুপি নামে একটি অতি প্রাচীন অরণ্য-পূর্ণ গ্রাম দেখা যায়। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রাম অতিশয় সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিল। এই গ্রামে বৈদ্য জাতীয় এক প্রাচীন জমিদার বংশ বাস করিতেন। সমগ্র নাওয়ারা পরগণাটি তাহাদের অধীন ছিল। তাঁহাদিগকে সচরাচর নাওয়ারার জমিদার বলে। নাওয়ারার জমিদার বংশ অতিশয় শাস্ত্রনিষ্ঠ ও অতি ধুমধামের সহিত নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিতেন। একসময় ঐ জমিদার বংশের কোন প্রধান ব্যক্তি পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার অন্তর্গত গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর সঙ্গমস্থল ত্রিবেণী তীর্থে গমন করেন। তিনি কয়েকদিন ত্রিবেণীতে বাস করেন। ত্রিবেণী বহু পূর্ব্ব হইতে পণ্ডিতপ্রধান স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেখানে অনেক পণ্ডিতের সহিত নাওয়ারার পরগণার অধিকারী রায় মহাশয়ের পরিচয় হয়, তন্মধ্যে পরাশর গোত্রীয় মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী নামক একজন সরযুপারী গ্রহবিপ্রের সহিত আলাপে তিনি পরম সন্তুষ্ট হন। মুকুন্দরাম যে শুধু জ্যোতিঃশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন, তাহা নহে ব্যাকরণ কাব্য অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রেও তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। রায় মহাশয় বিশেষ অনুরোধ করিয়া মুকুন্দরামকে পাঁচথুপীতে আনয়ন করেন এবং প্রচুর ব্রহ্মত্রা ভূমি প্রদান করিয়া ঐ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করেন। কালক্রমে মহামারীতে পাঁচথুপী শ্মশানে পরিণত হইলে রায় মহাশয়েরা ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া সন্নিহিত বাণীবহ গ্রামে গিয়া বাস করেন। মুকুন্দরামের বংশধরেরাও তাঁহাদের সহিত আগমন করেন মুকুন্দরামের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার বাণীবহ গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইহার পৌত্র দামরুদ্র অসাধারণ পণ্ডিত ও ক্ষমতাশালী ব্যাক্তি ছিলেন। তিনি তাঁহার বাটীর নিকটে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন।

## বেথুলিয়া

এই স্থানটী ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম কাজী উপাধিধারা বহু মোসলমান এই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কোন মোসলমান বাদশাহ কর্তৃক প্রদত্ত নিষ্কর

তালুক ইহারা ভোগ করিতেন কিন্তু দাতার নাম অবগত হওয়া যায় না। মোসলমান আইনের বিধান অনুসারে ৫২ জন লোক এই তালুকের মালীক হইয়া পড়েন। বর্ত্তমানে উহার মধ্যে ১৪ জনের বংশধর মাত্র উহা ভোগ করিতেছেন। অন্যান্য অংশীদারগণের কোন সন্তান সন্ততি বর্ত্তমান নাই। এই নিষ্কর তালুকের কর কি প্রকারে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল সেই প্রবাদটী বড়ই কৌতুহল জনক, উহা নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

কোন ঘটনা উপলক্ষে একজন সুবেদার বেথুলিয়া পরিদর্শনে উপস্থিত হন। কাজী তালুকদারগণ নিয়ম মত নজর দেওয়ার উদ্যোগী হইলেন। সুবেদার কিন্তু উহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। পাছে তালুকদারগণ অসন্তুষ্ট হয়, এই বিবেচনা করিয়া, ঐ টাকা গুলি সরকারে গ্রহণ করিয়া জমার কাগজে কর বাবদ লিখিয়া দেন। এই সুত্রে তাহাদের তালুকের কর ধার্য্য হয়। এই তালুকদার বংশীয় কাজী গোলাম সবদর মোগল প্রভাব সময়ে বিশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। কথিত আছে, তিনি ক্ষমতায় অপরাধী ব্যক্তিকে ফাঁসী বা শূলে দিতে পারিতেন। তৎকর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি প্রকান্ত অট্টালিকা ছিল। উহা বর্ত্তমান সময়ে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই বাটী অদ্যাপি কাজী বাড়ী নামে প্রসিদ্ধ।

বেথুলিয়াতে নীলের কুঠী ছিল, এখন পর্য্যন্ত উহার ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। এই গ্রামটি সমৃদ্ধিশালী ছিল, সংক্রামক রোগে অধিকাংশ লোক বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে উহা একটি জঙ্গলাকীর্ণ স্থান মধ্যে পরিগণিত। অধুনা এখানে কাজী আবদুল লতিফ ও মুন্সী আবদুল আলী এই দুই জনের অবস্থাই সমৃদ্ধিশালী।

## কুরসী, পদমদী, রাজধারাপুর

**বালিয়াকান্দি থানার অধীন–**

কুরসির মৌলবী আবদুল কাদের ও খোন্দকার উজীর আলীর বংশ প্রসিদ্ধ ও পুরাতন। পূর্ব্বোক্ত বংশের বর্ত্তমান গৌরব মাননীয় চৌধুরী মহাম্মদ এসমাইল খাঁ। ইঁহার পিতা বরিশাল চড়া-মন্দির চৌধুরী মহাম্মদ আসমত আলী খাঁ পরোপকারী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। কুরসির জমিদার বংশ দান ধ্যানের জন্য বিশেষ বিখ্যাত।

পদ্মানদীর মির সাহেবদের বংশ বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই বংশের মিরআলী আসরাফ সাহেব বৃহৎ জমিদারী প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি ইংরাজ রাজ সরকার হইতে খান বাহাদুর সম্মান উপাধি ভূষণে ভূষিত হন। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কতিপয় পুরুষ সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। খান বাহাদুর মিরআলী আশরাফ সাহেবের গুণধর পুত্রই নবাব মীর মহাম্মদ আলী সাহেব। দুঃখের বিষয় এই বংশের কোন সন্তান সন্ততি নাই। নবাব সাহেবের তিনটী ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিল, দুইটি বঙ্গের কৃতী সন্তান, বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের ঐকজিকিউটীভ কাউন্সিলের মেম্বর মাননীয় নবাব শামসোল হোদা এম,বি,এস, সাহেবের সহিত এবং কনিষ্ঠটী কুরসির জমিদার চৌধুরী মহাম্মদ এসমাইল খান সাহেবের সহিত বিবাহ হয়। কাহারই কোন সন্তান বিদ্যমান নাই। এইস্থানবাসী ভূতপূর্ব্ব ডিপুটী কলেক্টর নবাব আবদুল লতিফ বিখ্যাত লোক ছিলেন।

দক্ষিণ বাড়ীতে বিখ্যাত সাধক মনুমিয়া ও সমুমিয়ার আবাস বাটী ও সমাধি বিদ্যমান আছে। এখনও হিন্দু মুসলমানে স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত ইহাদের নামে মানত করিয়া থাকেন।

শেখ আড়ায় সাধক শাহ পাহলোয়ানের সমাধি আছে। ইনি জীবদ্দশায় অনেক অলৌকিক কার্য্য প্রদর্শন করাইয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দীর্ঘ করিয়া ইহার কবর দিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর পর মৌলবী সাহেবেরা ঐ প্রকার কবর দেওয়া মুসলমান ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বলিয়া প্রকাশ করায় চিরপ্রচলিত প্রথা মত উত্তর-দক্ষিণ লম্বভাবে সমাধি প্রদত্ত হয়। ভোরে উঠিয়া দেখা গেল যে সমাধি পূর্ব্ব-পশ্চিম দীর্ঘ হইয়া রহিয়াছে। এখনও এই সমাধি পূর্ব্বপশ্চিম লম্বভাবেই রহিয়াছে। ইঁহার খাদেম বা সেবাইত বংশ বিখ্যাত।

রাজধরপুরের মৌলবী বংশ প্রসিদ্ধ। এই বংশের স্থাপয়িতার অলৌকিক ক্ষমতা দর্শনে, তাঁহার সম্মানার্থে নবাব সরকার হইতে যে আয়মা প্রদত্ত হইয়াছিল তাহাই ফরিদপুরের কালেক্টরীর তৌজির বর্ত্তমান ২৫৩১ নং তালুক। দুঃখের বিষয় যে এই সম্পত্তি প্রায় তিন পুরুষ পূর্ব্বে এই বংশের হস্তচ্যুত হইয়াছে। এই বংশের বর্ত্তমান গৌরব মৌলবী আকছার উদ্দিন বিদ্বজন সমাজে বিশেষ পরিচিত এবং বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী ও সুবক্তা। ইনি দেশের কল্যাণে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। রাজধরপুরের বেগদের বংশ বিখ্যাত। এই বংশের মির্জ্জা কাজেম বেগ ও মির্জ্জানাজেম বেগ অনেক কায়স্থ বৈদ্য ও ব্রাহ্মণের শিক্ষাগুরু ছিলেন।

## কোমরপাড়া বাগমাড়া, কাজিকান্দা, বারৈজুরি ও বাওগাড়া

**রাজবাড়ী থানার অধীন–**

কোমরপাড়ার তাপস-কুল শ্রেষ্ঠ শাহ কামালের দরগা আছে। এই দরগার সেবাইতেরা উচ্চ বংশ বলিয়া পরিচিত।

বাগমারার ইনসপেক্টার মৌলবী দেরাজ তুল্যাব বংশ এতদঞ্চলে বিশেষ মাননীয়। এক্ষণে কাজি আবদুল লতিফ ও কাজী আবদুল গণি এই বংশ উজ্জ্বল করিতেছেন।

কাজি কান্দার কাজী ও রুমি বংশ বিখ্যাত ও মাননীয়। শেষোক্ত বংশ সম্ভূত মৌলবী সৈয়দ আবদুল কাদুম রুমী বিখ্যাত মৌলবী ও বক্তা। ইনি দেশের কল্যাণে আপন জীবন অর্পন করিযাছেন। ইহার প্রপিতামহ রুম দেশ হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া ইহারা রুমী নামে পরিচিত। পাংশা থানার অধীন শাহজিআড়া (শাহুয়ারা) গ্রামে তাহার সমাধি আছে সেই সমাধি রক্ষার নিমিত্ত তৎকালীন নওয়ারার চৌধুরীরা প্রায় ৫০০ বিঘা জমি নিষ্কর দিয়াছিলেন। এখনও তাহার কতকাংশ উহাদের দখলে আছে।

পাংশা থানার বারইজুড়ীতে বিখ্যাত তাপস শাহ গরিবের সমাধি আছে। ইনি মৃত মানুষ ও গবাদি পশু জীবিত করিয়া দিয়া স্বীয় অলৌকিকতার পরিচয় দিয়াছেন। কথিত আছে যে ইনি সাধনার প্রথমাবস্থায় একদা ভিক্ষার্থে বেলগাছির বিখ্যাত চৌধুরী বংশের কোন মহাত্মার নিকট উপস্থিত হইলে চৌধুরী সাহেব ইহাকে মজুরী করিতে বলেন।

পরদিন ইনি কার্য্যপ্রার্থী হইয়া পূর্ব্বোক্ত চৌধুরী সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলে চৌধুরী সাহেব ইহাকে স্বীয় কলাবাগানের কলাগাছ রোপণ করিতে বলেন। পরে দেখা গেল যে কালাগাছের মধ্যস্থল কর্ত্তন করতঃ মূল উর্দ্ধে দিয়া কর্ত্তিত স্থলটী মাটির মধ্যে পুতিয়াছেন। তদ্দৃষ্টে চৌধুরী সাহেব অনেক ভৎর্সনা করেন। পরদিন দেখিয়া সকলেই আশ্চান্বিত হইলেন যে গাছগুলি শিকড় হইতে উর্দ্ধদিকে পাতা ছাড়িয়া বৃদ্ধি পাইতেছে এবং মাটীতে পোতা কর্ত্তিত অংশে শিকড় বাহির হইয়াছে।

বাওগাড়ার মিঞা বংশ প্রসিদ্ধ। এক্ষণে হেরাজ তুল্যা মিঞার বংশে আকেল উদ্দিন মিঞা এবং মানউল্যা মিঞার বংশে আব্বাছ আলী বিদ্যমান আছেন।

## ঘৃতকান্দী ও ফুক্রা

ঘৃতকান্দী কায়স্থ প্রধান স্থান, মুকসুদপুর থানার অন্তর্গত। এই স্থানবাসী গিরিধর বসু বিখ্যাত লোক ছিলেন। বসু মহাশয় কলিকাতাবাসী বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও দাতা তারক পরামাণিকের অধীনে কার্য্য করিয়া পরে স্বয়ং স্বাধীনভাবে ব্যবসায় পরিচালনে স্বয়ং একজন ধনী মধ্যে পরিগণিত হন, নিমতলা গঙ্গাতটে তৎ নির্ম্মিত গঙ্গাযাত্রীর জন্য দ্বিতল রক্ষিতাগার ও গঙ্গাবক্ষের ইষ্টক নির্ম্মিত ঘাট তাহার কীর্ত্তি আজিও ঘোষণা করিতেছে। তাঁহার অধীনে কার্য্য করিয়া আত্মীয় ঘৃতকান্দী নিবাসী বেণীমাধব পালও ধনী মধ্যে পরিগণিত হন। এই মহাত্মাও সৎব্যয়ী। নিকটবর্ত্তী বহু ব্রাহ্মণ ও অপরাপর জাতির বাসস্থান ফুক্রা গ্রামে পালমহাশয় একটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া দিয়া সর্ব্ব সাধারণের বিদ্যা শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তিনি সাধারণের ধন্যবাদ পাত্র।

## খালকুলা

চন্দনানদীর তীরে সংস্থাপিত। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ তানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের পুত্রগণ ধরমাবা গ্রাম হইতে উঠিয়া এই গ্রামে বাস স্থাপন করেন। এই জ্যোতির্ব্বিদবংশ ভূষণার প্রধান প্রধান ভূম্যধিকারীগণ হইতে বহু বৃত্তি ব্রহ্মত্রা প্রাপ্ত হন। তৎপর বারেন্দ্র শ্রেণীর অনেক ব্রাহ্মণ আসিয়া এই স্থানে গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। তন্মধ্যে মৈত্রবংশীয় রমাকান্ত মৈত্র নাটোরাঞ্চল হইতে আসিয়া খালকুলায় বাস করেন। মোসলমান রাজত্বকালে নবাব সরকারে তহশীলদারী কার্য্য করিয়া তিনিই বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন ও মজুমদার উপাধি প্রাপ্ত হন। তদ্বংশীয় বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি,এল, বর্ত্তমান সময়ের একজন বিখ্যাত লোক। তৎকৃত ইংরাজী ভাষায় লিখিত শোণপুরের ইতিহাস বহুবিধ বাঙ্গালা গ্রন্থ ও সংস্কৃত গীতগোবিন্দের এবং লোরি গাথা ও উদানম নামে দুইখানা পালা গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রসিদ্ধ। ইহার একমাত্র কন্যা সুনীতিবালা দেবী বি,এ, জেলার শিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যে গণনীয়া।

## কারণ্যপুর

এই গ্রামটী তত বিখ্যাত না হইলেও ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত স্থান। তত্রত্য বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ কৌলীণ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে এইরূপ জানা যায় যে মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র গৌরীকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়, ইনি ২৪ পরগণায় বিবাহ করেন। তৎপুত্র দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই মহাত্মা তৎকালীন ডাক্তার শ্রেণীর মধ্যে একজন সুবিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। তৎপুত্র সুবিখ্যাত রাজ্ঞী ও বর্ত্তমান বঙ্গীয় মসনদের প্রধানমন্ত্রী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরেন্দ্রবাবু আজিও ফরিদপুর বিস্মৃত হন নাই।

*দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত*

## বিশেষ দ্রষ্টব্য

১৩১৪ সনের ঐতিহাসিক চিত্রে মহারাজ রাজবল্লভ প্রসঙ্গে আমিই প্রথমত পরগণাতিসনের বিষয় উল্লেখ করি, পরে ভারতবর্ষ পত্রিকার উহার আলোচনা করি। এতৎসম্বন্ধে পারসী ও বাঙ্গালা লিখিত একখানা দলিলও তৎসহ প্রকাশিত হয়। ঐ দলীলের প্রতিকৃতি এতৎসহ প্রকাশিত হইল। পরগণাতিসন সম্বন্ধীয় যে সকল দলীল বাহির হইয়াছে, উহার কোনখানাতেই উভয় ভাষায় লেখা দেখা যায় না। উভয় ভাষায় লিখিত দলীল বোধহয় এখানেই প্রথম।

ঢাকার ইতিহাস প্রণেতা শ্রীমান যতীন্দ্রমোহন রায় আমার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন, এজন্য এ স্থানে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করা সঙ্গত মনে করি। নানা কারণে গ্রন্থমধ্যে কতকগুলি অশুদ্ধ রহিয়া গিয়াছে, এবার প্রধান প্রধান কয়েকটি, তাহা অশুদ্ধ-শোধনপত্রে দেওয়া হইল পাঠকগণ উহা একবার করিয়া লইবেন। বারান্তরে সম্যক সংশোধনের চেষ্টা পাইব।

*গ্রন্থাকার।*

## আরো বিশেষ দ্রষ্টব্য

ইতিহাসবিদ আনন্দনাথ রায়-কৃত অশুদ্ধ-শোধনপত্র মোতাবেক সংশোধন করা হয়েছে বিধায় তা আর পুনর্মুদ্রণের আবশ্যক নেই।

*-সম্পাদক*

# দক্ষিণবিক্রমপুর-ইদিলপুর সাহিত্য-সম্মিলনীর অভিভাষণ

## শ্রীবিপিনচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় ও উপস্থিত সভ্যমহোদয়গণ,

দক্ষিণ-বিক্রমপুর ইদিলপুর সাহিত্য সম্মিলনীর পঞ্চদশ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে আজ আপনারা এস্থানে সমবেত হইয়া আমাদের আনন্দ ও গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন। আমি উত্তর ইদিলপুরের পক্ষ হইতে আপনাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করিতেছি। আমাদের আয়োজন অযোগ্য হইলেও আমাদের আন্তরিকতার অভাব নাই। দরিদ্রের আয়োজন লইয়া আপনাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উত্তর ইদিলপুরবাসী একজন দরিদ্রের উপরে এই গুরভার অর্পণ করিয়াছেন।

আপনারা কর্ত্তব্যের আহ্বানে নানাপ্রকার পথক্লেশ সহ্য করিয়া এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন,—ইহা আমাদের প্রকৃতই সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু এই দুর্নিবার পথক্লান্তি দূর করিবার জন্য আপনাদিগকে যে উপযুক্ত বিশ্রাম স্থান দিতে পারিব—এরূপ সংস্থান আমাদের নাই ; তবে মাত্র ভরসা,—আপনারা মহানুভব, আপনাদের নিকটে আমাদের সর্ব্বপ্রকার ত্রুটির জন্য ক্ষমা লাভের অধিকার আছে। আমার মনে হয়, ইহাই আমাদের চরম সম্বল।

উত্তর ইদিলপুরে অনেক সাহিত্যিক আছেন। সে হিসাবে কানাই ঠাকুরের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সংশয়ের কোন কারণ নাই। কানাই ঠাকুরের সন্তানে এবং তাঁহার শিষ্য সম্প্রদায়ে আজ ইদিলপুর পরিব্যাপ্ত। ইদিলপুরের বাহিরে বাঙ্গালার অতি দূরতর স্থানে ও কানাই ঠাকুরের পরিচয়-সূত্র বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

আমিও কানাই ঠাকুরের একটী দরিদ্র বংশধর বলিয়া গৌরব বোধ করি। কিন্তু আমার সেই গৌরব প্রকটিত করিবার নিমিত্ত তাঁহার নাম সসম্মানে উল্লিখিত হইয়াছে—আপনারা এইরূপ ধারণা করিলে ভ্রমে পতিত হইবেন। কানাই ঠাকুর ইদিলপুর সমাজের প্রতিষ্ঠাতাগণের মধ্যে একজন এবং কেন্দ্র স্থানীয় বলিয়াই তাঁহার নাম উল্লেখ করিতেছি। ইদিলপুর সমাজ ছাড়িয়া দিলেও ঢাকা, পাবনা, রাজসাহী, রঙ্গপুর ও কোচবেহার প্রভৃতি স্থানে কানাই ঠাকুরের বংশধরগণ পরিদৃষ্ট হইবে। বাঙ্গালার অন্যান্য স্থান ছাড়িয়া যদি ইদিলপুর সমাজেই কানাই ঠাকুরের শিষ্য সম্প্রদায় অনুসন্ধান করিয়া

* দক্ষিণবিক্রমপুর-ইদিলপুর সাহিত্য-সম্মিলনীর পঞ্চদশ বার্ষিক অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হয় ১৩ আশ্বিন ১৩৩২ সনে (১৯২৫), কনেশ্বরে। এটি তখন ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্ভুক্ত ছিল, এখন শরীয়তপুর জেলায় অবস্থিত। অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীবিপিনচন্দ্র বিদ্যাবিনোদনের পঠিত অভিভাষণ এক ফর্মার পুস্তিকারূপে প্রকাশিত হয়। এটি কলকাতার কমলা প্রেস (১৮, ফকিরচাঁদ মিত্রের স্ট্রিট) থেকে মুদ্রিত হয়। এর উপযোগিতা বিবেচনা করে 'ফরিদপুরের ইতিহাস' গ্রন্থে এটি সংযোজন আকারে পেশ করা হলো। –সম্পাদক

দেখেন— দেখিতে পাইবেন, ইদিলপুরের গৌরব-রত্ন চৌধুরীবংশ ও তাহাদের আনীত কুলীন-সম্প্রদায় মধ্যে অধিকাংশ তাঁহার শিষ্য। রাঢ়ী শ্রেণীর কুলীনের মধ্যে কনেশ্বরের চট্টোপাধ্যায়, রুদ্রকরের চক্রবর্ত্তী, শ্রোত্রিয়ের মধ্যে কনেশ্বর ও টেংরার চক্রবর্ত্তী, বংঙ্গজের মধ্যে পিয়কাঠীর বাড়রী, দিক্‌শূলের সিকদার, তিলের চক্রবর্ত্তী ও ঘটক, এড়িকাঠীর তপাদার, বৈদিক শ্রেণীর মধ্যে সামন্তসারের সমাজদ্বার, বেজনীসারের বশিষ্ঠ ও সাণ্ডিল্য এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা সমাজে বরেণ্য তাঁহারাই কানাই ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই শিষ্য-সম্প্রদায়ের এক বিশেষত্ব পরিদৃষ্ট হয়। গুরুর কৃপায় ইহারা সকলেই সমাজে, সম্পদে ও বিদ্যাচর্চ্চায় উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ইদিলপুরের মাজুল জমিদার চৌধুরী বংশের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এই বংশ সেনাপতির বংশ হইলেও ইহারা অসীম দান-শক্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইহাদের নিকট হইতে বৃত্তি, ব্রহ্মোত্তর ও তালুক প্রাপ্ত হন নাই এমন ব্রাহ্মণের সংখ্যা ইদিলপুরে বড় ছিল না। আমার নিকটে এই বংশের প্রদত্ত বহু উৎসর্গপত্র অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এই দানের পরিমাণ পর্য্যালোচনা করিলে একবারে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। দান করিয়া ইহাদের যে বিষয়সম্পদ অবশিষ্ট ছিল তাহা বিধির বিধানে হস্তান্তরিত ও রূপান্তরিত হইয়াছে।

এদেশ দরিদ্রের দেশ। বিধাতৃ-বিধানে বিক্রমপুর ও ইদিলপুর দরিদ্রদিগের বসবাসের স্থান। ইহা ভূপতিদিগের স্থায়ী বাসভূমি নহে। মহারাজ বল্লাল সেনের নাম ও সেন রাজবংশের নাম আপনাদের মনে আছে। বিশ্রুতকীর্ত্তি বার ভূঁইঞা চাঁদ রায় ও কেদারের কথা আপনারা বিস্মৃত হন নাই। বর্ত্তমানে ইহাদের বংশধরগণের অবস্থা আপনারা চিন্তা করুন, দেখিতে পাইবেন, ইঁহাদের প্রতি বিধাতৃ-বিধান কিভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইতিহাস-বিখ্যাত মহারাজ রাজ-বল্লভের কথা একবার মনে করুন, দেখিতে পাইবেন, ইহাদের কাহারও রাজত্ব স্থায়ী হয় নাই। ইহাদের অতুল বিভব কোন অকূল সিন্ধু-নীরে নিমজ্জিত হইল—তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য, সুতরাং বিধাতৃ-বিধান অতিক্রম করিয়া চৌধুরীবংশ অতি দীর্ঘ দিন অতুল বিভবের অধিকারী থাকিতে পারেন না ; তথাপি চৌধুরীবংশ আজ যে সম্পদের অধিকারী, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হয়। অদ্যাপি ঐ বংশে আমরা বিদ্যাবিভবাদি সমন্বিত বহু সজ্জন দেখিতে পাইতেছি। কনেশ্বরের চট্টোপাধ্যায় ও রুদ্রকরের চক্রবর্ত্তী তাহাদের সমাজে প্রধান পদবী লাভ করিয়াছেন। অর্থসম্পদ তাঁহাদের সমকক্ষ ব্যক্তি তাহাদের সমাজে আর নাই। বংশ সম্প্রদায়ে পিয়কাঠীর বাড়রী, নিক্‌শূলের সিকদার, তিলের চক্রবর্ত্তী ও এড়িকাঠীর তপাদার সামাজিক হিসাবে প্রধান পদবী লাভ করিয়াছেন ; ঐ সম্প্রদায়ে তাঁহাদের সমকক্ষ অতি বিরল। সামন্তসারের সমাজদ্বার, তাঁহাদের সমাজে সর্ব্বপ্রধান পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, ঐ সম্প্রদায়ে তাহাদের সমকক্ষ ব্যক্তি আর নাই। ইহারা তালুকদার, ইংরাজরাজের তালুকদার শ্রেণীর নামের তালিকায় ইহাদের পূর্ব্বপুরুষের নাম সংযোজিত আছে।

বিদ্যাগৌরবেও কানাই ঠাকুরের শিষ্যসম্প্রদায় ইদিলপুরে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত চন্দ্রমণি ন্যায়ভূষণ ও ব্যাকরণ শিরোমণি কাশীচন্দ্র

বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি অধ্যাপকগণ ইদিলপুরের শিরোভূষণ ছিলেন। বর্ত্তমানে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বিদ্যাভূষণ ও শ্রীমান্ অন্নদাচরণ তর্কবাগীশ প্রভৃতি অধ্যাপকগণ অদ্যাপি ইদিলপুর সমাজের গৌরবরক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

কানাই ঠাকুরের বংশধর মধ্যেও কৃতী সন্তানের অভাব ছিল না। তন্ত্রশাস্ত্র বিশারদ, ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উপাসনায় কঠোরতা অদ্যাপি ইদিলপুরবাসী বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। পণ্ডিতাগ্রগণ্য রামচন্দ্র তর্কচূড়ামণি মহাশয় ইদিলপুরে সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় সংস্কৃতচর্চ্চার পীঠস্থান নবদ্বীপে স্মৃতিশাস্ত্রের শেষ পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ইদিলপুরবাসীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে ও তিনি অন্যান্য পরীক্ষার সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ইদিলপুরের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন।

বিগত বর্ষে আমাদের সম্মিলনীর অধিবেশন দক্ষিণ ইদিলপুর টেংরা গ্রামে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে আমাদের সাদর আহ্বানে সম্মিলনীর শুভাধিবেশন উত্তর ইদিলপুরে সম্পন্ন হইতেছে। উত্তর ইদিলপুর দক্ষিণ ইদিলপুরের নিকটে হীনশ্রী নহে। কানাই ঠাকুর উত্তর ইদিলপুর বোড়াগাঁও গ্রামে বাস করিতেন, বর্ত্তমানে তাঁহার বংশধরগণ উত্তর ইদিলপুরেই বাস করিতেছেন। উত্তর ইদিলপুরে মাজুল জমিদার চৌধুরী বংশের সংখ্যাও কম নহে। চৌধুরী বংশের সংসৃষ্ট কুলিন সম্প্রদায় মধ্যে এড়িকাঠীর গুহবংশ উত্তর ইদিলপুরেই বাস করিতেছেন। দেশগুরু সিদ্ধপুরুষ বিল্বপুষ্করিণীর রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বহু বংশধরগণের বসতি স্থান উত্তর ইদিলপুরেই নির্দ্দিষ্ট আছে। পণ্ডিতাগ্রগণ্য নানা শাস্ত্রবিশারদ গঙ্গাচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় উত্তর ইদিলপুর রুদ্রকর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী ঘটকরাজ আনন্দমোহন উত্তর-ইদিলপুরে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। দানবীর, মাতৃভক্ত, এদেশবাসীর প্রাতঃস্মরণীয়, শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, গুরুচরণ, শশিভূষণ ও বৈকুণ্ঠচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়গণ উত্তর ইদিলপুরেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও চক্রবর্ত্তী মহাশয়গণ তাঁহাদের মাতৃশ্রাদ্ধে মাতৃভক্তির যে উজ্জ্বল পরিচয় দিয়াছিলেন আজও তাহা স্মৃতিপথে উদিত হয়। এদেশবাসী তাঁহাদের নিকটে প্রকৃত মাতৃভক্তি শিক্ষা করিয়াছে। পিতৃ-মাতৃ বিয়োগে সন্তানের কর্ত্তব্য পালনে অদ্যাপি এদেশবাসী উল্লিখিত মহানুভব গণের আচরিত পথ অনুসরণ করিয়া থাকে। ঐ সকল সদনুষ্ঠানে নানা দিগ্দেশ হইতে বহু সজ্জন ও বিদ্বজ্জনের সমাগম হইয়াছিল। স্বয়ং চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও চক্রবর্ত্তী মহাশয়গণ সৌজন্যের, বিনয়ের ও আতিথেয়তার অবতার স্বরূপ বিরাজ করিয়াছিলেন। এই সদনুষ্ঠানের বিবরণী চিরদিন ইদিলপুর সমাজে দৃষ্টান্ত স্থানীয় হইয়া থাকিবে।

আপনারা আজ যে গ্রামে সমবেত হইয়াছেন, ইহাকে ইদিলপুরের একটি প্রতিসৃষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। কুলঘাতিনী মেঘনা নদীর অত্যাচারে নবগ্রাম হইতে বহু রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এই গ্রামে আবাস গ্রহণ করিয়াছেন। এইস্থানে রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আবাস গ্রহণ করিয়াছেন। এইস্থানে রাঢ়ীশ্রেণীর কুলিন, বংশজ ও

শ্রোত্রিয় ; বারেন্দ্রশ্রেণীর কুলিন, কাপ ও শ্রোত্রিয় ; বৈদিক শ্রেণীর পঞ্চগোত্র ও ষষ্ঠগোত্র ইত্যাদি যজমান আছেন। এমন সর্ব্বশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ সমন্বিত গ্রাম বঙ্গদেশে দুষ্প্রাপ্য বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

এই গ্রামে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম নামে পরমহংসদেবের নামোল্লেখ একটি সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত আছে। আশ্রমের সেবকগণ ব্রহ্মচার্য্যের সূত্রাবলম্বনে নানা প্রকার সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ইহাদের যত্নে একটি ক্ষুদ্র পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে। ধর্ম্মসংহিতা পাঠ ও সৎগ্রন্থের আলোচনা দ্বারা ইহারা সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহার কর্ম্মিদিগের কার্য্যবিবরণী পর্য্যালোচনা করিলে এইস্থানে ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। ইহার কর্ম্মিগণ পরমহংসদেবের জন্মদিনে ভিক্ষালব্ধ অর্থ দ্বারা বহু লোকের আহার্য্য বিতরণ করেন। এই আশ্রমের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে ইহা দ্বারা প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে।

আমাদের উত্তর ইদিলপুরের সমাজ প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সমাজ বলিয়া উল্লেখ করিতেছি ; কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সমাজ বলিয়া বর্ত্তমানে আমাদের গৌরব করিবার কিছু নাই। কালস্রোতে এই গ্রামে সংস্কৃত চর্চ্চার গৌরব লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আপনারা যে স্থানে সমবেত হইয়াছেন, তাহারই অনতিদূরে গুরুনাথ শিরোমনি মহাশয়ের একটি উৎকৃষ্ট চতুষ্পাঠী ছিল। শিরোমণি মহাশয়ের মৃত্যু অন্তে ঐ চতুষ্পাঠী বন্ধ হইয়া যায়। ইহার পার্শ্ববর্ত্তী ধানকাঠী গ্রামে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চণ্ডীচরণ চূড়ামণি মহাশয়ের একটি চতুষ্পাঠী আছে ; ইহাতে স্মৃতি, সাহিত্য ও ব্যাকরণের চর্চ্চা হইতেছে। এদেশের সংস্কৃত-শিক্ষা পক্ষে ইহা প্রচুর নহে। দেশের প্রাচীন শিক্ষা, সংস্কার ও সভ্যতা যদি রক্ষিত হইয়া আসিয়া থাকে, তবে তাহা প্রধানতঃ সংস্কৃত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দ্বারাই হইয়া আসিয়াছে ; কিন্তু ইদিলপুর সমাজে সেই সংস্কৃত শিক্ষার বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা মনে করিলে সত্যসত্যই দুঃখানুভব করিতে হয়।

স্ত্রী-শিক্ষাব প্রতি এদেশবাসীর উপযুক্ত মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই। তবে এই অবস্থার পরিপোষক হেতু আছে। প্রথমতঃ, এই দেশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দেশ, সুতরাং রক্ষণশীল (conservatives), দ্বিতীয়তঃ, এদেশ দবিদ্রের দেশ, গৃহকর্ম্ম শিক্ষাই একমাত্র প্রয়োজনীয় শিক্ষা বলিয়া এদেশবাসীব সংস্কাব কিন্তু দেশময় স্ত্রী-শিক্ষার যুগে এই পূর্ব্বসংস্কার ক্রমশঃ লুপ্ত হইযা আসিতেছে। শিক্ষার সহিত যে গৃহকর্ম্মের অসামঞ্জস্য কিছুই নাই বরং সঙ্গতি আছে তাহা আমাদের নিকটে ক্রমশঃই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। গৃহস্থ জীবন সুখময় করিয়া লইতে হইলে স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের আশা আছে, আমাদের গ্রামের পুণ্যকীর্ত্তি জমিদার মহাশয়গণ অচিরেই দেশের এই অভাব দূর করিবেন।

এইস্থান পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচাবে পশ্চাৎপদ নহে। আমরা যেস্থানে সমবেত হইয়াছি, ইহাই একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এদেশবাসীর প্রাতঃস্মরণীয়, দানশৌণ্ড-মাতৃভক্ত শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তাঁহার উপযুক্ত বংশধরগণ এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বর্ত্তমান ভারত সম্রাটের পিতৃনাম

সহযোগে সেই পরমপূত শ্যামাচরণ নাম এদেশে প্রতিনিয়ত কীর্ত্তিত হইতেছে। এদেশে যতদিন এই বংশের অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন সর্ব্বত্র বিশেষত: এদেশবাসীর মুখে সেই পবিত্র শ্যামাচরণ নাম উচ্চারিত হইবে।

শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণকুমার গুহ মহাশয় প্রভৃতির ঐকান্তিক চেষ্টায় এদেশের রাস্তাঘাট সম্বন্ধীয় অভাব অনেকটা দূরীভূত হইয়াছে। স্বাস্থ্যোন্নতি সম্বন্ধে এদেশ বড়ই অবনত। কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর ও অন্যান্য ব্যাধির আক্রমণে এদেশবাসী বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেছেন। এই সকল উৎপাত নিবৃত্তির জন্য অবিলম্বে সমবেত শক্তি প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমানে এদেশবাসীর প্রধান কর্ত্তব্য—একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করা। উপযুক্ত চিকিৎসালয় অভাবে অনেক দরিদ্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। অনেক দরিদ্র কৃতীসন্তান যথাযোগ্য চিকিৎসার অভাবে অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছে। স্বাস্থ্যোন্নতির প্রতি এদেশবাসীর প্রকৃত মনোযোগ আকৃষ্ট না হইলে অচিরে এদেশবাসীর ঘোর দুর্দ্দিন আসিতেছে। এদেশে কৃতী সন্তানের অভাব নাই। স্থানীয় জমিদার মহাশয়গণ যে দেশের জননায়ক ; শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার গুহ ও শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ গুহ মহাশয় প্রভৃতি যে দেশের ভূষণস্বরূপে বিরাজ করিতেছেন— সে দেশে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করা অসম্ভব ব্যাপার নহে। দেশবাসী তাহাদের সুসময়ে নহে, তাহাদের উদরপূর্ত্তির জন্য নহে, তাহাদের ভোগবিলাসের জন্য নহে; তাহারা ঘোর দুর্দ্দিনে পতিত হইয়া উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে তাহাদের পুত্রকলত্রাদি বিসর্জ্জন দিতে বসিয়া, তাহাদের দেশের কৃতী সন্তানের নিকটে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় চাহিতেছে। ইহা তাহাদের ন্যায্য দাবী বলিয়া উল্লেখ করিতে তাহারা মাত্রও দ্বিধা করিতেছে না। দেশবাসী আশা করিতে পারে, অচিরেই এস্থানে জনসাধারণের হিতকল্পে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য দেশের কৃতীসন্তানগণের সমুচিত দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে।

সুহৃদ্গণ! আজ্ কর্ত্তব্যের প্রেরণায় দুইটি দুর্ঘটনার কথা উল্লেখ করিতে হইতেছে। জননায়কের আসনে উপবেশন করিয়া যিনি বাণীর একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন, আমাদের সেই চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্যের যে কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহা বলিয়া বা লিখিয়া প্রকাশ কার উপায় নাই। আমরা তাঁহারা শোক সামান্য মাত্রায় বিস্মৃত হইতে না হইতেই—আবার বঙ্গের আর একটি উজ্জলরত্ন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লোকান্তরিত হইয়াছেন। বঙ্গের এই দুইটি কৃতী সন্তানের অভাব বঙ্গবাসীর বিশেষতঃ বঙ্গ সাহিত্যিকদিগের পক্ষে একটি অসহনীয় শোক। আমরা অন্তরের সহিত তাঁহাদের পারত্রিক কল্যাণ কামনা করিতেছি।

বন্ধুগণ! আজ আপনারা সাহিত্যের আলোচনার জন্য এস্থানে সমুপস্থিত; কিন্তু সাহিত্যালোচনার উপযুক্ত শক্তি-সামর্থ্য আমাদের নাই। আপনাদেরই সংস্পর্শে আসিয়া, আপনাদেরই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া যদি আমরা সাহিত্যালোচনার দিকে অগ্রসর হইতে পারি, তাহা হইলে পরম সৌভাগ্য মনে করিব।

সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ আপনারা আলোচনা করিবেন। সাহিত্যে দেশের ও দেশবাসীর উন্নতি, সুতরাং আমার নিবেদন, আপনারা সাহিত্যের প্রসঙ্গে দেশের ও দেশবাসীর যাহাতে উন্নতি হইতে পারে, এমন বিষয় আলোচনায় বিরত হইবেন না। দেশ ও দেশের লোক বাঁচিলে, দেশ ও দেশের উন্নতি হইলেই, সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতি। আশা করি, আপনারা বঙ্গ-সাহিত্য কথার উদার অর্থটিই গ্রহণ করিবেন। সাহিত্য শব্দের—কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও জ্যোতিষ প্রভৃতি অর্থ লইয়া আপনারা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবেন। সাহিত্য কথার প্রাদেশিক কাব্য অর্থ লইয়া আপনাদের কার্য্যক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হওয়ায় সময় অতীত হইয়াছে, সুতরাং আমরা আশা করিতে পারি, আপনারা বঙ্গ-সাহিত্য কথার সার্ব্বভৌম অর্থই গ্রহণ করিবেন। আপনারা প্রাচীনযুগের সাহিত্যের কথা পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন তাৎকালিক সাহিত্যিক গণ মধ্যে রুচিগত বিভিন্ন মত থাকায় তাঁহাদের রচিত কাব্য ও ভিন্ন রূপ ধারণ্ করিয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যিক ভবভূতি ও অমর কবি কালিদাস প্রভৃতি একই সময়ে কাব্যালোচনায় যে ভাবে লেখনী গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা আপনাদের সুবিদিত। উভয়ের মধ্যে রুচিগত পার্থক্য থাকিলেও উভয়ের কাব্যই সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। একই মানুষের অবস্থার পরিবর্ত্তনে রুচিগত পার্থক্য উপস্থিত হয়। যেই রুচি দেশের ও সমাজের অহিতকর—তাদৃশ রুচি সর্ব্বথা ত্যাগার্হ। সাহিত্যের অলৌকিক শক্তি আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন আলঙ্কারিক বলিয়াছেন—সুপ্রযুক্ত একটী শব্দ সম্যক অবগত হইলে স্বর্গেও লোকে তাহা কামধুক্ হয়। সাধু কাব্যের আলোচনায় ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ রূপ চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ ঘটে; নীরস বেদাদির আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া সরল-মতি কাব্যালোচনায় প্রবৃত্ত হয়। বর্ত্তমান যুগে ও কাব্যালোচনায় প্রাচীন রীতি একবারে পরিত্যক্ত হয় নাই। সৎ সাহিত্যের আলোচনায় দেশ ও সমাজ যেমন উন্নত হয়, আবার অসৎ সাহিত্যের আলোচনায় দেশ ও সমাজ তেমনই অধঃপতিত হইতে থাকে; সুতরাং যাঁহারা সাহিত্যালোচনায় প্রবৃত্ত আছেন, তাঁহারা সাহিত্যের এই সদসৎ বিষয় বিচার করিয়া যেন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন্ বিদেশে নানাভাবে সাহিত্য বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। সঙ্গীতে, অভিনয়ে এবং অন্যান্য বহুবিধ জ্ঞানচর্চ্চায়-সর্ব্বত্র সাহিত্যের স্থান। সেই সাহিত্যালোচনা যদি দোষশূন্য না হয়, তবে দেশের ও সমাজের অকল্যাণ অনিবার্য্য।

প্রচলিত বঙ্গভাষা সম্বন্ধে আমার ২/১টী কথা বলিবার আছে। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্ত্তমান বঙ্গভাষার প্রধান স্রষ্টা বা প্রবর্ত্তক। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বঙ্গসাহিত্যিকগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। এক শ্রেণী তাঁহাদের রচিত পুস্তকে প্রধানতঃ প্রাদেশিক শব্দ ব্যবহার করিতেন ; অপর শ্রেণীর লেখক যথাসাধ্য দুর্ব্বোধ ও সংস্কৃতমূলক শব্দ প্রযোগ করিয়া বঙ্গভাষাকে অনুস্বার-বিসর্গ-বিহীন অভিনব সংস্কৃত ভাষায় পরিণত করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই উভয় সম্প্রদায়ের লেখকের রীতি পরিবর্ত্তন করিয়া বঙ্গভাষাকে নির্দ্দিষ্ট সীমায় আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক লেখকগণ তাঁহার রীতি অবলম্বনে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ঐ রীতির অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ইদানীং বঙ্গভাষার প্রাদেশিক শব্দের বহুল প্রয়োগ এবং অনেক স্থলে ভাব ও মাধুর্য্য বিহীন

রচনা বঙ্গভাষার অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিয়া তুলিয়াছে। এই অনুযোগ সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করার স্থান ইহা নহে ; তবে এই বিষয়ে আমাদিগকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনে কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে।

আমাদের সম্মিলনী আজ পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পন করিল। সে তাহার বাল্যাবস্থা ত্যাগ করিয়া যৌবনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এখন সুস্থ দেহে তাহার কার্য্য করার সময় উপস্থিত। আপনারা ইহাকে দিয়া যথাসম্ভব কার্য্য করাইয়া লওয়ার ব্যবস্থা করুন। সঙ্ঘ বদ্ধ হইয়া কার্য্য করা এদেশের নূতন প্রথা নহে—আবহমান কাল হইতে এই সঙ্ঘ বন্ধনের প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে। ঋষিগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতেন। এক সঙ্গে অনেক ঋষি একত্র বসিয়া জ্ঞান-চর্চ্চা করিতেন। অনেক স্থলে ঋষিদিগের পরস্পর মত বিরোধ উপস্থিত হইলে, তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বিরুদ্ধ বিষয়ের মীমাংসা করিয়া লইতেন। একজন বক্তা, অপর সকলে শ্রোতা হইতেন। সময়ে আচার্য্য সনৎ কুমার বক্তা হইতেন ; অন্যান্য ঋষি ও নৃপতিবৃন্দ শ্রোতার আসন গ্রহণ করিতেন। দেশে কোন প্রকারের বিপ্লব উপস্থিত হইলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তাহার প্রতিকার করিতেন। ধর্ম্ম সংক্রান্ত কোন প্রকার বিরোধ উপস্থিত হইলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বিরুদ্ধ ধর্ম্মবাদীর মত খণ্ডন করিতেন ; এভাবে সময়ের পরিবর্ত্তনে ধর্ম্ম ও সমাজ সংক্রান্ত নিয়মের পরিবর্ত্তন ঘটিত। বর্ত্তমান যুগে ঐ নিয়মই পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। সকল শ্রেণীর লোকই সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে শিক্ষা করিয়াছেন। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নিজ নিজ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছেন। এই সঙ্ঘ বন্ধনের প্রসার যত বৃদ্ধি পাইবে দেশ বা সমাজ ততই উন্নতির দিকে ধাবিত হইবে।

শুধু সঙ্ঘবদ্ধ হইলে চলিবে না; সঙ্ঘ বন্ধনের প্রয়োজন পর্য্যালোচনা করিলেও চলিবে না। প্রকৃত কার্য্য সিদ্ধির জন্য, প্রকৃত কার্য্যানুষ্ঠানের জন্য সঙ্ঘ বন্ধনকে সফল করা আবশ্যক। গত অধিবেশন হইতে আমাদের সম্মিলনীর কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে ; সুতরাং আমাদের প্রকৃত কর্ম্মানুষ্ঠানের সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই প্রদেশের (দক্ষিণ পারের) ভদ্র-বহুল-পল্লী সমূহ আমাদের সম্মিলনীর অধিকার ভুক্ত হইয়াছে। ঐ সকল পল্লীতে উচ্চ শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকায় আমরা ঐ সকল বিদ্যালয়ের সংমিশ্রণে আমাদের কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইতে পারি। কোন স্থানকে কেন্দ্ররূপে নির্দ্দেশ করিয়া ঐ স্থানে একটী স্থায়ী সমিতি গঠন ও বৎসরে অন্ততঃ চারিবার ঐসমিতির অধিবেশন হওয়া আবশ্যক।

বঙ্গ সাহিত্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষক স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষা পর্য্যন্ত বঙ্গ সাহিত্যের স্থান দিয়াছেন। বর্ত্তমানে বিশ্ব বিদ্যালয় গণিত ও ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় বঙ্গ ভাষার মধ্য দিয়া শিক্ষা দেওয়ার সাবস্থ করিতেছেন। বঙ্গের সজ্জনগণ বঙ্গভাষার উন্নতি কল্পে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন—সুতরাং এই সময়ে আমাদের নীরবে বসিয়া থাকিলে চলিবেনা। আমাদের প্রস্তাবিত কেন্দ্রস্থানীয় সমিতির তত্ত্বাবধানে আপাততঃ ত্রৈমাসিক একখানা সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ঐ পত্রিকা আমাদের সম্মিলনীর মুখপত্ররূপে ব্যবহৃত হইতে পারিবে।

এই প্রদেশের অনেক প্রতিভাবান্ সুলেখক অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টায় এই কার্য্যে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমি কবিবর সুলেখক শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী ঘটক কবিরঞ্জন মহাশয়ের নাম উল্লেখ করিতেছি। তিনি তাঁহার 'আর্য্যাবিভূতি নামক মাসিক পত্রিকায় তাঁহার যে অলৌকিক প্রতিভা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আপনাদের সুবিদিত। আশা করি ঘটক মহাশয় তাহার জীবনের শেষাংশ দেশের কল্যাণ কল্পে ব্যবহার করিবেন।

আমি আপনাদের কার্য্যারম্ভের আর বিলম্ব ঘটাইব না আপনাদের সংস্পর্শে আমরা ধন্য হইয়াছি। আমি পুনরায় আপনাদিগকে সমুচিত সমাদরে সম্বর্দ্ধিত করিতেছি। দরিদ্রের আয়োজন ও সেবার বহু ক্রটী বিচ্যুতি ঘটিবেই। অতএব আমার সানুনয় নিবেদন, আপনারা নিজ গুণে তাহা মার্জ্জনা করিবেন। আমাদের উদ্দেশ্য এক, লক্ষ্য এক, সাধনা এক।

ওঁ হরি ওঁ

# ফরিদপুরের কনকশর এস্টেট

## মূল : ড. নারিয়াকি নাকাজাতো
## অনুবাদ : ড. স্বরোচিষ সরকার

প্রাথমিক কেসস্টাডির জন্য যে এস্টেটটিকে গ্রহণ করা হয়েছে সেটি হলো ফরিদপুরের কনকশর স্টেট।[১] এই এস্টেটটি ছিলো চট্টোপাধ্যায়দের দখলে। এর বার্ষিক খাজনা ২০, ৩০৭ টাকা বিধায় একে মাঝারি আয়তনের এস্টেটরূপে গণ্য করা যেতে পারে।

কনকশর এস্টেটের প্রধান অংশ বিভিন্ন ধরনের মধ্যস্বত্বভোগীদের নিয়ে গঠিত, যে সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে। চট্টোপাধ্যায়দের জমিদার বা সাধারণ তালুকদারদের চেয়ে মধ্যস্বত্বভোগী প্রজাই বেশি ছিলো। যাই হোক, ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ এদের স্বত্বাধিকারী হিসাবে গণ্য করে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের আওতায় আনেন, কেননা কোনো কোনো স্বাধীন তালুকের অংশীদার হিসাবে তাদের মালিকানা স্বত্ব ছিলো। উনিশ শতকের শেষ দিকে পূর্ব বাংলায় ক্ষুদ্র স্বত্বাধিকারীদের মধ্যে অনুরূপ অবস্থা পর্যাপ্তভাবে পাওয়া যায়। বিপরীতভাবে এমনও দেখা যেত যে, সাধারণত বড় ভূস্বামীদের প্রচুর সংখ্যক মধ্যস্বত্বভোগী থাকতেন। তাই আমরা জমিদার ও বিভিন্ন ধরনের মধ্যস্বত্বভোগীদের মধ্যে কোনো চূড়ান্ত পার্থক্য নির্ণয় হতে বিরত থাকবো। তার পরিবর্তে অসংসক্তভাবে 'ভূস্বামী' শব্দটি ব্যবহার করবো। 'ভূস্বামী' শব্দ দ্বারা সে সকল জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের চিহ্নিত করা হবে যারা মালিকানাস্বত্বের অধিকারী। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই শেষোক্ত শ্রেণী মধ্যস্বত্বভোগীদের ওপরের স্তরের সাথে অনুরূপতা বজায় রাখে।

দক্ষিণ ফরিদপুরের মাদারীপুর মহকুমার পালং থানার মধ্যে কনকশর এস্টেটটি অবস্থিত (মানচিত্র দ্রষ্টব্য। পরগণার বিচারে এটি ইদিলপুর পরগনার মধ্যে পড়ে। ইদিলপুর পরগনার ১৬ আনার মালিক ছিলেন কলকাতার কালিকৃষ্ণ ঠাকুর,[২] এবং এই জমিদারি ক্রমে পালং থানা থেকে বাকেরগঞ্জের উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে প্রসারিত, সর্বোপরি, এটি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ[৩] শ্রেণীর দ্বারা ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা হিসাবে বিখ্যাত বিক্রমপুর অঞ্চলের অংশরূপে পরিগণিত হয়েছিলো। এদের মধ্যে চট্টোপাধ্যায়রা ছিলেন সমাজের শীর্ষস্থানীয় কুলীন ব্রাহ্মণ।

---

* জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অব ওরিয়েন্টাল কালচারে সাউথ এশিয়ান হিস্ট্রির অধ্যাপক নারিয়াকি নাকাজাতো ভারতেব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'Agrarian System in Eeastern Bengal c 1870-1910' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ লিখে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। এটি ১৯৯৪ সালে কলকাতা থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ২০০৪ সালে এটি বাংলায় অনুবাদ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েব ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ-এর অধ্যাপক ড. স্বরোচিষ সরকার। অনুবাদ সম্পাদনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসেব অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম ও ড. রতনলাল চক্রবর্তী। গ্রন্থটি ইউপিএল থেক প্রকাশিত। জমিদারি প্রথার কার্যক্রম বিশ্লেষণের জন্য ড. নারিয়াকি নাকাজাতো কেসস্টাডি হিসেবে ফরিদপুরের কনকশর এস্টেটকে বেছে নেন। এটি বর্তমানে শরীয়তপুর জেলার অন্তর্গত। 'কনকশর' উচ্চারণভেদে 'কনেশ্বর'। আমরা এই গ্রন্থের উপযোগী বিবেচনা করে এই অংশ গ্রহণ করেছি।– সম্পাদক

১. [ইংরেজিতে] এই এস্টেটের নাম কখনো Kanakshar, কখনো Kaneswar (যেমন মানচিত্রে), Kanakeswar বা কনকেশ্বর লেখা হয়েছে।

২. দর্পণনারায়ণের প্রপৌত্র কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ছিলেন ঠাকুর বংশের জ্যৈষ্ঠ শাখার সদস্য। যতীন্দ্রমোহন, সৌরীন্দ্রমোহন এবং দেবেন্দ্রনাথের মতো তিনিও ছিলেন জয়রামের পঞ্চম প্রজন্ম। (Blair B. Kling, Partner in Empire: Dwarkanath Tagore and the Age of Enterprise in Eastern India [Berkeley, 1976], P.14)।

৩. উদাহরণস্বরূপ, Faridpur SSR, par 50.

## ১. এস্টেটের উৎপত্তি ও বিকাশ

কনকশর এস্টেট খুব পুরানো নয়। বরং এটি ছিলো একটি নতুন এস্টেট। ওয়ার্ডের পিতামহ জগবন্ধু চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। সেটেলমেন্ট রিপোর্টে নিম্নলিখিতভাবে কনকশরের ইতিহাস প্রদান করা হয়েছে;

> কনকশর এস্টেটটি কনকশর গ্রামের প্রয়াত বাবু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পত্তি, এই গ্রামটি ছিল এই এস্টেটের অন্তর্ভুক্ত; এই এস্টেটের অধিকাংশ ছিলো তাঁর পিতা প্রয়াত বাবু জগবন্ধু চট্টোপাধ্যায়ের স্বোপার্জিত, বাবু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় সামান্য কিছু ক্ষুদ্র ভূমিস্বত্ব এবং ক্ষুদ্র এস্টেটের অংশ নিজে কিনেছিলেন। ১৮৯০ সালে বিধবা স্ত্রী, ৩ জন পুত্রসন্তান ও ৬ জন কন্যাসন্তান রেখে তিনি (শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়) পরলোক গমন করেন।[৪]

শ্যামাচরণ যখন মারা যান, তখন তাঁর বয়স কত ছিলো, তা জানা যায় না। কিন্তু যদি ধরে নেওয়া হয় যে, তিনি এই এস্টেটটিকে এক পুরুষ সময়কাল (৩০ বছর) পর্যন্ত পরিচালনা করেছিলেন, তাহলে অনুমান করা যেতে পারে যে, মোটামুটিভাবে ১৮৩০ দশক থেকে ১৮৫০ দশক পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তার পিতা জগবন্ধুর কর্মতৎপরতা বিস্তৃত ছিলো, এবং উক্ত সময়ের মধ্যেই এস্টেটটি আকার লাভ করে। কিন্তু কিভাবে তিনি জমি খরিদ করেছিলেন? এ প্রসঙ্গে বাংলা ভাষায় লেখা একটি জেলার ইতিহাসে ক্ষীণ ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যেখানে বলা হয়েছে; 'এই স্থানে (কনকশরের) অধিবাসী জগবন্ধু চট্টোপাধ্যায় হুদাভুলুয়ারের (hudabhuluyar) কাজ করিয়া প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন।'[৫] হুদাভুলুয়ার আসলে কোন ধরনের পেশার নাম, সে সম্পর্কে জানা যায় না। তবে এমন অনুমান অসঙ্গত নয় যে, তা হয়তো রাজস্ব সংক্রান্ত সরকারি অফিসের কোনো নিম্নপদস্থ কর্মচারীকেই বুঝিয়ে থাকবে। কেননা, কনকশর এস্টেটের নিকটবর্তী বাকেরগঞ্জের শাহবাজপুর পরগনায় কানুনগো অর্থে 'হুদা' শব্দের ব্যবহার করা হতো।[৬] হুদাভুলুয়ারের ক্ষমতায় থেকে জগবন্ধু যে অর্থ উপার্জন করেছিলেন, অবশ্যই তা তিনি জমি কেনার কাজে ব্যয় করে থাকবেন।

জগবন্ধুর সময়ে ইদিলপুর পরগনায় এমন বিশেষ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিলো, যা কনকশর এস্টেট পত্তনের অনুকূল ছিলো। এটা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত যে, ভূমিমালিকানার গঠনে বিশেষভাবে জমিদারদের উপরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব পূর্ব বাংলায় ছিলো খুবই সামান্য, পশ্চিম বাংলায় অতিরিক্ত রাজস্ব চাহিদার ফলে বহুসংখ্যক বৃহৎ জমিদারের পতন ঘটে।[৭] তপন রায়চৌধুরী মন্তব্য করেছেন: 'বাকেরগঞ্জ জেলায় ... পারিবারিক

---

৪ Settlet Officer Kanakshar to Cllr Far., 16 Feb.1903 (অতঃপর Kanakshar SSR 1903' নামে উল্লেখ করা হবে), DCO, LR Dept., File 33 of 1902-03 (NAB, Rev. Bundle 29, File 395).

৫. আনন্দনাথ রায়, ফরিদপুরের ইতিহাস, ২ খণ্ড (জোপসা [ফরিদপুর], ১৩২৮ বঙ্গাব্দ), ২য় খণ্ড পৃ. ১০৫।

৬. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত, বঙ্গীয় শব্দকোষ, ২ খণ্ড, ২য় সং (নতুন দিল্লি, ১৯৭৮), ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৭৪। 'হুদা' বলতে 'তহশিলের বিভাগবিশেষ' বুঝায় (শশিশেখর ঘোষ, জমিদারী দর্পণ, ৬ষ্ঠ সং [কলকাতা, ১৯২৩], পরিশিষ্ট, পৃ. ২১), অথবা 'নিলামে বিক্রয় করা এস্টেটের বিবরণও বুঝায়' (H. H. wilson, A Glossary of Judicial and Revenue Terms, etc. of British India [London, 1855; reprint ed., Delhi. 1968], p. 211).

৭. Siraju! Islam, The Permanent Settlement in Bengal · A Study of its Operation, 1790-1819 (Dhaka, 1979), p. 190; Raychaudhuri, 'Permanent Settlement,' p. 166.

ঐতিহ্যের দৃষ্টান্ত [তাঁর নিজের] এবং সরকারি রেকর্ড থেকে মনে হয় "উচ্চতর ভূমিস্বত্ব" ধারাবাহিকভাবে চালু ছিলো।'[৮] কিন্তু ইদিলপুর পরগনার ক্ষেত্রে এই অবস্থা ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্নরকম। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে পরগনাটি কায়স্থ জাতের চৌধুরীদের দখলে ছিলো, কিন্তু তারা রাজস্ব পরিশোধে বারংবার ব্যর্থ হওয়ায় ১৮১২ সালে এটি নিলামে চড়ানো হয়। দর্পনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র কলকাতার মোহিনীমোহন ঠাকুর ছিলেন এর ক্রেতা। এর ফলে মোহিনীমোহন এবং চৌধুরীদের মধ্যে ভয়ানক বিবাদের সৃষ্টি হয়, যা ১৮১৫ সালে হিংস্র সংঘর্ষে রূপ নিয়েছিলো।[৯] এভাবে ইদিলপুর পরগনার মালিকানা স্বত্ব নাটকীয়তা ও সংঘর্ষের মাধ্যমে স্থানীয় কায়স্থ চৌধুরীর হাত থেকে অনুপস্থিত ব্রাহ্মণ ঠাকুরদের হাতে চলে যায়। এই ঘটনা অবশ্যই যুগপৎভাবে পরগনার অর্থনৈতিক ও ক্ষমতার কাঠামোতে আকস্মিক নাড়া দিয়েছিলো। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, এই ধরনের কাঠামোগত পরিবর্তন জগবন্ধুর উত্থানের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

জগবন্ধু অনেক ভূসম্পত্তি কিনেছিলেন, যার মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ ছিলো ইদিলপুরের পত্তনি-তালুক, ১১,২৮৯ টাকার মফস্বল খাজনাসহ যার আয়তন ছিলো ৩,৩৭৬ একর।[১০] কিন্তু তাঁর ঝুঁকি নিয়ে জমি কেনা সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায় না। বরং তাঁর ছেলে শ্যামাচরণ যেসব জমি কিনেছিলেন, সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়।

উপরে উদ্ধৃত কনকশর সেটেলমেন্ট রিপোর্টে যদিও উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্যামাচরণ তাঁর পিতার সম্পত্তির সঙ্গে সামান্য কিছু ক্ষুদ্র ভোগস্বত্ব যুক্ত করেছিলেন মাত্র, কিন্তু বাস্তবে শ্যামাচরণ বেশ কিছু ভূসম্পত্তি কিনেছিলেন। যতটা নির্ণয় করা গেছে, তাতে দেখা যায়, শ্যামাচরণ কমপক্ষে ২১ খণ্ড (lot) জমি কিনেছিলেন যার আনুমানিক খাজনা ছিলো ৪,২০০ টাকা এবং জমির পরিমাণ ছিলো, ১,২০০ একরের (৩,৬০০ বিঘার) কাছাকাছি। এর অর্থ হলো, খাজনার দিক দিয়ে শ্যামাচরণ কনকশর এস্টেটের এক-চতুর্থাংশ অর্জন করেছিলেন (সারণি নং ১)। তাঁর কেনা ভূমিস্বত্বের মধ্যে প্রধানত যেসব তথাকথিত মধ্যস্বত্ব ছিলো, সেগুলো হলো: তালুক, ওসাত তালুক, পত্তনি, হাওলা, এস্তে কালি হাওলা এবং দর-ইজারা। এগুলোর মধ্যে অপেক্ষাকৃত বড় ছিলো একটি তালুক (খাজনা ১,৬৪৫ টাকা; আয়তন ১,১৪০ বিঘা), একটি ওসাত তালুক (৬৮৩ টাকা; ৪৬৯ বিঘা), অন্য একটি ওসাত তালুক (২৬৯ টাকা; ৪৬৯ বিঘা), একটি পত্তনি (৫৬৬ টাকা; ৮৯১ বিঘা), দ্বিতীয় একটি পত্তনি (১৯৮ টাকা; ২২৯ বিঘা), তৃতীয় একটি পত্তনি (১৯২ টাকা; ২৬২ বিঘা) ইত্যাদি। যাঁদের নিকট থেকে তিনি জমি কিনেছিলেন, তাঁদের নাম ছিলো: কালীপ্রসন্ন ও জগবন্ধু রায়, দ্বারকানাথ রায়, শ্যামাসুন্দরী চৌধুরাণী, কে কে

৮. Ibid.

৯. H. Beveridge, The District of Bakarganj: Its History and Statistics (London, 1876), pp. 125-30; রায়, ফরিদপুরের ইতিহাস, পৃ. ১২-১৭; রোহিণী কুমার সেন, বাকলা (বাখেরগঞ্জের প্রত্নতত্ত্ব ও আধুনিক ইতিহাস) (বরিশাল, ১৯১৫), পৃ. ২৮৯-৯২; Loke Nath Ghose, The Modern Histroy of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars, &c., Part II : The Native Aristocracy and Gentry (Calcutta, 1880), pp. 213-14

১০. Genl. Manager, Kanakshar to Cllr. Far., 30 May 1893, par. 4, BR, LR Dept., WAE Br., File 225 of 1893 (RRBR).

ভট্টাচার্য প্রমুখ। এঁদের মধ্যে একজনমাত্র মুসলমান ছিলেন। আলী খান নামের ঐ ব্যক্তি একটি হাওলা বিক্রয় করেছিলেন।[১১]

**সারনি ১: কনকশর এস্টেটের জগবন্ধু ও শ্যামাচরণের ক্রয় করা জমির হিসাব**

| | আয়তন | | খাজনা | |
|---|---|---|---|---|
| | টাকা | % | টাকা | % |
| জগবন্ধু কর্তৃক | ১২,৭৬৪ | ৭৮ | ১৪,১৫৫ | ৭৭ |
| শ্যামাচরণ কর্তৃক | ৩,৬০৩ | ২২ | ৪,১৭৮ | ২৩ |
| মোট | ১৬,৩৬৭ | ১০০ | ১৮,৩৩৩ | ১০০ |

উৎস: 'Appendix III: A Statement Showing the Class of Tenants, their Number, and Areas Held, and the Rent Paid by them, of Certain Estates and Tenures of the Kanakshar Estare,' appended to 'Kanakshar SSR 1903' (অতঃপর 'Appendix III' নামে উল্লেখ করা হবে); Genl. Manager, Kanakshar to Cllr. Far., 30 May 1893, BR, LR Dept., WAE Br., File 225 of 1893 (RRBR).

শ্যামাচরণের ভূমি ক্রয়ের বৈশিষ্ট্য ছিলো এই যে রায়তদের সাথে সক্রিয় লেনদেন[১২] থাকা সত্ত্বেও তিনি কোনো রায়তি জোতজমি কিনেছেন বলে মনে হয় না। পরে দেখা যাবে যে তিনি যখন মহাজনী ব্যবসার সাথে এস্টেট ব্যবস্থাপনা সংযুক্ত করেছেন, তখন তিনি রায়তদের জোতজমি বন্ধক রেখে টাকা ধার দিয়ে প্রচুর রায়তি জোতজমি জমাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। বরং তিনি তাঁর এস্টেটে রায়তি জোতজমির হস্তান্তর নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন।[১৩] বস্তুত, কনকশর এস্টেটের ভূসম্পত্তির দীর্ঘ তালিকায় কোনো রায়তি জোতজমির উল্লেখ নাই।[১৪] এতে মনে হয়, মধ্যস্বত্ব কেনাবেচা এবং রায়তি জোতজমির কেনাবেচাকে তিনি পুরোপুরি আলাদা করে ভাবতেন, এবং এই দু'টির প্রতি পুরোপুরি বিরুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ করতেন।[১৫] বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো, তাঁর এ নীতি বিশ শতকের প্রথম দিককার মধ্যস্বত্বভোগীদের সাথে সম্পূর্ণভাবে বৈসাদৃশ্য স্থাপন করে। জে. সি. জ্যাক নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে এই ধরনের ভূস্বামীগণ রায়তদের তাদের অধীনে বর্গাদারে পরিণত করার জন্য রায়তি জোতজমি কিনতে শুরু করে।[১৬]

---

১১. 'Village Notes' appended to 'Kanakshar SSR 1903.'

১২. কৃষকের ভূমিবাজারের জন্য পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৩. 'রায়তদের শর্ত অনুযায়ী [রায়তি] জোতজমির হস্তান্তর খুবই সীমিত এবং স্থানীয় প্রচলনে তা নিষিদ্ধ।' (Settlt. Officer Kanakshar to Cllr. Far, No. 443, 17/29 Nov. 1897 [অতঃপর 'Kanakshar SSR 1897' নামে উল্লেখ হবে], DCO, LR Dept., File 8 of 1898-99 and 7 of 1899-1900 [NAB, Rev. Bundle 7, File-44].

১৪. ৯.২ নং সারণি দ্রষ্টব্য।

১৫. এই তথ্যের সঙ্গে ঢাকা বিভাগে দখলি জোতজমির ক্রেতাদের গঠন সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যাদির সাদৃশ্য বিদ্যমান।

১৬. Faridpur SSR, pars. 75, 181, Bakarganj SSR, pars. 180, 332.

শ্যামাচরণের জমিক্রয়কে গভীরভাবে পরীক্ষা করে তাঁর জমিক্রয়ের দুটি পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়, যা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ: একটি অনুভূমিক, এবং অন্যটি উলম্ব। অনুভূমিক পদ্ধতিটি ছিলো খুব সাধারণ পদ্ধতি, অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় সম্প্রসারণের জন্য অন্য কোনো ভূস্বামীর দখলের বাইরের জমি ক্রয়। শ্যামাচরণের ক্রয় করা জমির অধিকাংশই ছিলো এই ধরনের। তবে কখনো কখনো প্রভাব বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে তিনি তাঁর অধিকারভুক্ত মধ্যস্বত্বকেও কিনেছেন, যাকে বলা যেতে পারে জমি ক্রয়ের উলম্ব পদ্ধতি। দৃষ্টান্ত হিসাবে আলতাকুরি মৌজায় তাঁর জমি ক্রয় পদ্ধতিকে ধরা যাক। এই মৌজার ভিলেজ নোটে দেখা যায়:

সেটেলমেন্ট অনুযায়ী এই গ্রামে ৮টি এস্টেট রয়েছে:

১) তালুক ধর্ম নারায়ণ রায়, নং ৩৯৩৪: এই এস্টেটে অপ্রাপ্তবয়স্কদের প্রাপ্ত পত্তনিস্বত্ব ১৩.২৫ গণ্ডা এবং ১ ক্রান্তি যা তাদের প্রয়াত পিতা শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় দ্বারকানাথ রায়ের নিকট থেকে পান;

২) খারিজা জায়গির নেসারত (?) কোটি...(?) হিস্যা কীর্তিনারায়ণ রায় নং ৫০২০: এই এস্টেটে অপ্রাপ্তবয়স্কদের প্রাপ্ত মালিকানাস্বত্ব ১৩.২৫ গণ্ডা এবং ১ ক্রান্তি।

৩) একই এস্টেটে অপ্রাপ্তবয়স্কদের প্রাপ্ত পত্তনিস্বত্ব ৫ আনা ১২.৫ গণ্ডা, যা তাদের প্রয়াত পিতা শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় কিনেছিলেন কালীপ্রসন্ন ও জগবন্ধু রায়ের নিকট থেকে;

৪) একই এস্টেটে অপ্রাপ্তবয়স্কদের প্রাপ্ত পত্তনিস্বত্ব ১ আনা ৬.৫ গণ্ডা এবং ২ ক্রান্তি, যা তাদের প্রয়াত পিতা শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় ক্রয় করেন শ্যামাসুন্দরী চৌধুরাণীর নিকট থেকে;

৫) তালুক... নং ৫২৩৬... মালিকানাস্বত্ব ১ আনা ৬.৫ গণ্ডা এবং ২ ক্রান্তি;

৬) একই এস্টেটে অপ্রাপ্তবয়স্কদের প্রাপ্ত পত্তনিস্বত্ব ৯ আনা, যা তাদের প্রয়াত পিতা শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় কিনেছিলেন কালীপ্রসন্ন ও জগবন্ধু রায়ের নিকট থেকে;

৭) একই এস্টেটে অপ্রাপ্তবয়স্কদের প্রাপ্ত পত্তনিস্বত্ব ১ আনা ১.২৫ গণ্ডা এবং ১ ক্রান্তি, যা তাদের প্রয়াত পিতা শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় কিনেছিলেন শ্যামাসুন্দরীর নিকট থেকে;

৮) তালুক নং ৫০২০: এই এস্টেটের অধীন...(?)... নাবালক রামকৃষ্ণের নামে উৎসর্গিত জমি (?), অপ্রাপ্তবয়স্করা সম্পূর্ণ সম্পত্তির লাখেরাজস্বত্ব পেয়েছিলো।[১৭]

এই ভিলেজ-নোট থেকে জানা যায় যে, শ্যামাচরণ ৫০২০ এবং ৫২৩৬ নং তালুকের অধীনস্থ পত্তনিস্বত্ব ও লাখেরাজস্বত্ব কেনেন, যা তাঁর পিতা জগবন্ধুও কিনেছিলেন। ১ নং চিত্রে কনকশর এস্টেটের সঙ্গে যতখানি সম্পর্কিত ৫০২০ নং

১৭. 'Village Note No. 2 (Altakuri),' in 'Kanakshar SSR 1903.'

তালুকের মধ্যস্বত্ব কাঠামো প্রদর্শিত হয়েছে। পিতা জগবন্ধুর কেনা মূল সম্পত্তির সঙ্গে শ্যামাচরণ পত্তনি ও একটি লাখেরাজস্বত্ব যোগ করেছিলেন, যা এই চিত্রের মধ্যস্বত্ব প্রদর্শিত হয়েছে।

এই চিত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ভগ্নরেখা দ্বারা আবৃত চিত্রের দুটি অংশ একেবারে অভিন্ন। এটি শুধু একটি সমাপতন ছিলো না, কেননা কনকশর এস্টেটে অনুরূপ বেশ কয়েকটি ঘটনার সন্ধান মেলে।[১৮] বরং এটা ইঙ্গিতবহ যে উল্লেখিত চিত্রে প্রদত্ত ৫০২০-এর এক অংশের মালিক হিসাবে কনকশর এস্টেট ২১ টাকা আদায় করে, কিন্তু শ্যামাচরণ এই তালুকের অধীনস্থ একটি পত্তনি ক্রয়ের মাধ্যমে এদের নিকট ১৯৮ টাকার দাবি তুলতে সমর্থ হন।[১৯] একই সময়ে তিনি তাঁর এস্টেটের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার পরিমাণ ২৬ বিঘা থেকে ২৩০ বিঘায় উন্নীত করেন। বাংলার ভূমিব্যবস্থায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মাত্রাতিরিক্ত মধ্যস্বত্বায়নে ভূস্বামীদের এই উলম্ব পদ্ধতির ভূমি ক্রয় ছিলো একটি পাল্টা ব্যবস্থা। এতে মনে হয় যে, আলোচ্য পর্বের ভূস্বামীরা উল্লিখিত অনুভূমিক পদ্ধতির সঙ্গে উলম্ব পদ্ধতির নিখুঁত সমন্বয় সাধন করে নানা ধরনের ভূসম্পত্তির সুগ্রন্থিত জাল বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন।

কনকশর এস্টেটের প্রতিষ্ঠাতা জগবন্ধুর মৃত্যুর পরেও শ্যামাচরণের তত্ত্বাবধানে এস্টেটটির বিস্তার অব্যাহত থাকে, যদিও তখন জমি পুঞ্জীভূতকরণের প্রক্রিয়া কিছুটা হ্রাস পেয়েছিলো। কিন্তু শ্যামাচরণ কি ধরনের জীবন যাপন করতেন, তা স্পষ্ট নয়। তাঁর উইল থেকে জানা যায়, তা তৈরি করা হয়েছিলো 'এই সম্ভাব্য বিন্যাস অনুযায়ী যে, আমার মৃত্যুর পর স্থিত বা ভবিষ্যতে অর্জিত আমার নিজ নামের বা বেনামী [অন্য কারো নামে] নিজস্ব বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত আমার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, তেজারতি [ব্যবসা-বাণিজ্য] এবং মহাজনি [কুসীদজীবী] কারবারের উপর আমার উত্তরাধিকারী ও পোষ্যগণের কোনো বিতর্ক থাকবে না...।'[২০] অতএব বোঝা যায় যে, তিনি শুধু ভূস্বামীই ছিলেন না, পাশাপাশি মহাজনও ছিলেন। ফরিদপুরের ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে:

> তৎপুত্র শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন। পিতা ইদিলপুর পরগনার মধ্যে কতকগুলি পত্তনী গ্রহণ করিয়া যান, উহার আয় দ্বারা তিনি মহা সমারোহে মাতৃশ্রাদ্ধ ও মহাভারত পাঠ উদযাপন করেন।[২১]

এই অপ্রতুল তথ্যাবলিকে একত্র করে শ্যামাচরণের জীবনযাত্রা ও পেশা সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভ করা যায়। পিতার মতো প্রতিবেশী ভূস্বামীদের সঙ্গে লড়াই করার

১৮. Taluk No. 5236, Taluk No. 5326, Jagir No. 5020, Taluk No 5550 and Taluk No. 5225.

১৯. বিষয়টি এই সম্ভাব্যতাকে নির্দেশ করে যে, চাষী রায়ত ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যস্বত্বভোগীদের নিয়ে গঠিত ক্ষুদ্র সামাজিক গোষ্ঠীর উপর নির্ভর করে মধ্যস্বত্বায়নের প্রক্রিয়া এগিয়ে যাচ্ছিলো। অন্যভাবে বলা যায় যে সম্ভবত প্রকৃত উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত সামাজিক কাঠামো মধ্যস্বত্বায়নকে হয়তো কিছুটা পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করেছিলো।

২০. 'Shyama Charan Chatterjee's Will, dated 29 Jaist 1297 B.S.m' appended to Cllr. Far. to Cmmr. Dac., No 259/VIII-1, 5 May 1891, BR, LR Dept., WAE Br, File 21 of 1891 (KPBR).

২১. রায়, ফরিদপুরের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৫।

মতো বলিষ্ঠ ব্যক্তি তিনি ছিলেন না,[২২] তাই তিনি আদর্শ হিন্দুর মতো ধর্মীয় জীবন যাপন করেছেন। অন্যের অধীনে চাকরি গ্রহণ না করে ভূসম্পত্তির আয় ও মহাজনি ব্যবসা থেকে তিনি জীবিকা নির্বাহ করেছেন। তাছাড়া তিনি তাঁর জীবনযাত্রায় ততোটা অপব্যয়ী ছিলেন না, যাতে তাঁর সম্পূর্ণ আয় নিঃশেষিত হতে পারতো। বরং উদ্বৃত্ত অর্থের অংশ বিনিয়োগ করে তিনি তাঁর পৈত্রিক সম্পত্তির বিস্তার ঘটিয়ে পরিমাণদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাই সহজেই বলা যেতে পারে যে, শ্যামাচরণের তত্ত্বাবধানে চট্টোপাধ্যায়গণ ছোট ধরনের আদর্শ ভূস্বামী-মহাজনে পরিণত হয়েছিলেন। সর্বোপরি, বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, শ্যামাচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র কামাখ্যানাথ ১৯০১-০২ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ব্যবস্থাপনার সময়ে তিনি বি.এ. পর্যন্ত পড়েছিলেন।[২৩] প্রত্যন্ত গ্রামের হুদাভুলুয়ার পেশার বদৌলতে যাবতীয় ভদ্রলোকি বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে চট্টোপাধ্যায়গণ অতঃপর তিন পুরুষের মধ্যেই ভদ্রলোক পরিবারে রূপান্তরিত হয়।

## ২. ভূসম্পদ

দুই প্রজন্ম ধরে অর্জিত ১৬,৩৭৬ বিঘায় বিস্তীর্ণ কনকশর এস্টেটের ভূসম্পত্তি ৭৩টি অংশে বিভক্ত ছিলো, যার বার্ষিক খাজনার পরিমাণ ছিলো ১৮,৪৩৩ টাকা।[২৪] বর্তমান অংশে উক্ত ভূসম্পত্তি গঠন বিচার করে দেখা যেতে পারে। প্রথমত, ২ নং সারণিতে মধ্যস্বত্বের বিন্যাস দেখানো হয়েছে। কনকশর এস্টেটে কম করে হলেও ১৫ ধরনের মধ্যস্বত্ব ছিলো, এবং ৭৩টি মধ্যস্বত্ব ও এস্টেটের মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ ছিলো তালুক, পত্তনি, হাওলা বা তাদের শাখা-প্রশাখা, যা নদীমাতৃক পূর্ব বাংলার ভূমিব্যবস্তার বৈশিষ্ট্যকে প্রতিফলিত করে। একাদশ অধ্যায়ে আলোচনায় দেখা যাবে, ভূসম্পত্তির এই বহুধা গঠন ছিলো ঢাকা বিভাগের এস্টেটগুলোর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

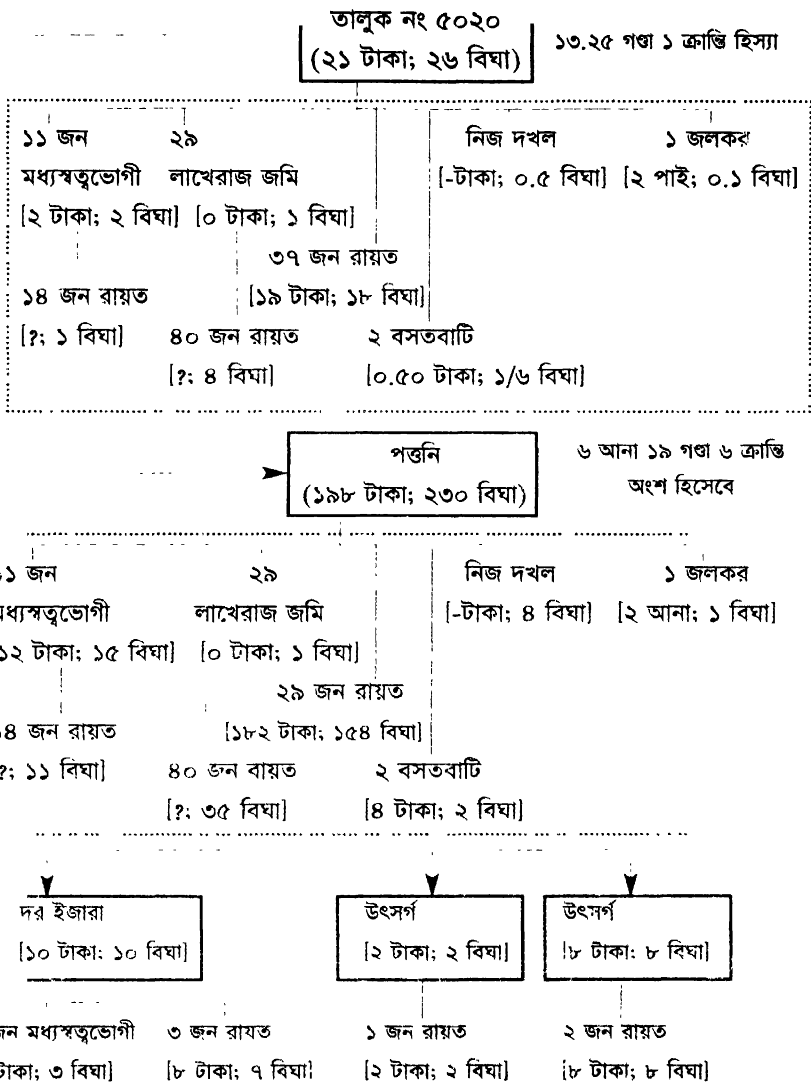
---

২২. রায়, ফরিদপুরের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৫।

২৩ RWAE, 1901-02, par. 21; 1903-04, par. 21; Cllr Far to Cmmr Dac., No. 53W, 8 Feb. 1907 (অতঃপর Final Report' নামে উল্লেখ করা হবে), DCO, MR Dept., File IXW 8 of 1906-07 (NAB, Unclassfied Court of Wards Filles) অবশ্য তার নাম প্রেসিডেন্সি কলেজের রেজিষ্টারে পাওয়া যায়নি। দ্রষ্টব্য, S C. Majumdar and G.N. Dhar, Comps., Presidency College Register (Calcutta, 1927).

২৪. 'Appendix III' to 'Kanakshar SSR 1903,; Genl. Manager, Kanakshar to Cllr. 30 May 1893, BR, LR Dept., WAE Br., File 225 of 1893 (RRBR). অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যে সামান্য কিছু হেরফের লক্ষ্য করা যায়।

চিত্র ১: কনকশরের ৫০২০ নং তালুকের মধ্যস্বত্বের কাঠামো




উৎস : Appendix II to 'Kanakshar SSR 1903'.

টীকা: ১. সরলরেখায় চিহ্নিত ভোগস্বত্ব কনকশর এস্টেটের। তৃতীয় বন্ধনীতে এস্টেটের আদায়কৃত বার্ষিক খাজনা ও জমির আয়তন নির্দেশ করা হয়েছে। ২. চতুর্ভুজের মধ্যে দেখানো হয়েছে প্রতিটি শ্রেণীর রায়তদের প্রদত্ত খাজনা এবং প্রত্যক্ষভাবে দখলকৃত ভূমির আয়তন। ৩. জলকর হলো মৎস্যজীবীদের।

ভূস্বামীর প্রত্যক্ষভাবে নিজস্ব দখলি জমির নাম নিজ দখল। উৎসর্গ খাজনা-বিহীন দান।

দ্বিতীয়ত, ৩ নং সারণিতে ভূসম্পত্তির আয়তন দেখানো হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, এর অধিকাংশ খুব ছোট আকারের। যেগুলোর আয়তন ১০ বিঘার কম, তা একটিমাত্র রায়ত পরিবারের টিকে থাকার জন্য যথেষ্ট ছিলো না। এরাই ছিলো এক-তৃতীয়াংশের অধিক। অন্যদিকে ভূস্বামী জাতীয় বৃহৎ মধ্যস্বত্বের সংখ্যা ছিলো খুবই কম। কিন্তু এই অল্পসংখ্যক বড় মধ্যস্বত্বই প্রায় সম্পূর্ণ এলাকার মালিক ছিলো। ভূসম্পত্তির শতকরা ৭৩.৬ ভাগ ছিলো ৫০ বিঘার কম আয়তনের, যা ছিলো মোট এলাকার শতকরা ৪.৯ ভাগ। ৪ নং সারণিতে প্রদর্শিত খাজনার হিসাবেও অভিন্ন প্রবণতা লক্ষণীয়।

একথা সত্য যে কনকশর এস্টেটের ভূসম্পত্তির অধিকারের গঠন ছিলো বহুসংখ্যক ও বহুধা বিভক্ত, কিন্তু এও উপেক্ষা করা উচিত হবে না যে এখানে বেশ কয়েকটি বিস্তর্ণ ভূসম্পত্তির অধিকারী ছিলো এবং এই এস্টেটের প্রধান অংশ। এর বৃহত্তম আটটির তালিকা ২ নং সারণিতে প্রদান করা হলো। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও বিস্তীর্ণ ছিলো পত্তনি-দরপত্তনির সমন্বয়ে গঠিত ৩৮৭২ নং ভূসম্পত্তি, যা ছিলো ঐ এস্টেটের কেন্দ্রবিন্দু। প্রকৃতপক্ষে ৩৮৭২ নং এস্টেটটি ছিলো কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের ইদিলপুর পরগণার তৌজি নিবন্ধন সংখ্যা। ৫ নং সারণিতে এ দুটির মধ্যকার সম্পর্ক নির্দেশিত হয়েছে। দৃশ্যত চট্টোপাধ্যায়রা ছিলেন কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের পত্তনিদার।

অতঃপর কনকশরের ৭৩টি এস্টেট ও ভূমি অধিকারের ভৌগোলিক বিভাজনের সমস্যা আলোচনা করা যেতে পারে। এগুলো কমপক্ষে ৭০টি গ্রামের মধ্যে ছড়ানো ছিলো। উদাহরণ হিসাবে ছাতিয়ানি মৌজার উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে কনকশর এস্টেটের তিনটি এস্টেট রয়েছে যার মোট জমির পরিমাণ মাত্র ৩১,২৮৬ একর।[২৫] অবশ্যই গ্রামভেদে এলাকার পরিবর্তন ঘটে থাকে, কিন্তু যেভাবেই হোক না কেন, এই এস্টেট প্রতিটি গ্রামের কিছু অংশ জুড়ে ছিলো। এসব ভৌগোলিক বিভাজন যতটা সম্ভব নির্ণয় করে ৬ নং সারণিতে দেখানো হলো। কনকশর এস্টেটের অধিকারভুক্ত গ্রামগুলোর অধিকাংশ পাঁচটি ইউনিয়নের প্রত্যেকটির মধ্যে অবস্থিত। এগুলো হলো সামন্তেশ্বর, কানেশ্বর, সিধালকুরা, ছায়াগাঁও ও মহিশ্বর। এবং এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো কানেশ্বর। এই গ্রামগুলো অবস্থিত ছিলো ছোট একটি অঞ্চলের দক্ষিণার্ধ, যা উত্তর-দক্ষিণে ৩৫ কিলোমিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে ২০ কিলোমিটার বিস্তৃত। অঞ্চলটিকে ঘিরে ছিলো ছোটবড় অনেকগুলো নদী, যেগুলোর নাম-পালং, মেঘনা, কাইলারা, নয়া ভাঙি, আড়িয়াল খাঁ, ইত্যাদি। এটা উল্লেখযোগ্য যে, কনকশর এস্টেট এই প্রাকৃতিক সীমানাকে কখনো অতিক্রম করেনি, শুধু বাকেরগঞ্জ জেলার উত্তর প্রান্তে কিছুটা প্রবেশ করেছিলো, যেখানে ইদিলপুর পরগনার কিছুটা অংশ সম্প্রসারিত। ভৌগোলিক দিক দিয়ে এস্টেটটি সংহত ছিলো, ছড়িয়ে—ছিটিয়ে ছিলো না। তবে এটি সম্প্রসারিত হয়েছিলো ৭০টির বেশি গ্রামের মধ্যে আবার কনকশর মৌজা, যেখানে চট্টোপাধ্যায়গণ বসবাস করতেন

২৫. 'Village Note No. 22 (Chhatiani)' appended to 'Kanakshar SSR 1903'. ১৯৭২ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এই গ্রামের আয়তন ৩৬১ একর। (Government of People's Republic of Bangladesh, Population Census of Bangladesh 1974, District Census Report : Faridpur (অতঃপর Bangladesh Census, 1974, Faridpur নামে উল্লেখ করা হবে), [Dacca, 1979], p. 59).

এবং তাদের এস্টেটটির নামকরণ করা হয়, সে স্থানকে এই এস্টেটের ভরকেন্দ্র বলা যায়, কেননা, এখান থেকেই তাঁরা ১৯টি ভূমিস্বত্বের উপর দৃঢ় কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিলেন (৭ নং সারণি দ্রষ্টব্য)।

**সারণি ২ : কনকশর এস্টেটের বিন্যাসঃ (১) ভূসম্পত্তির অধিকারের গঠন**

| ভোগস্বত্বের নাম | | সংখ্যা |
|---|---|---|
| এস্টেট | | |
| | খারিজা তালুক[ক] | ২২ |
| মধ্যস্বত্ব | | |
| | তালুক | ১ |
| | ওসাত তালুক | ৩ |
| | পত্তনি | ১৪ |
| | দরপত্তনি | ১ |
| | হাওলা | ৮ |
| | কায়েমি[খ] হাওলা | ৫ |
| | এস্তেকালি[গ] কায়েমি হাওলা | ১ |
| | মিরাশ | ১ |
| | দরমিরাশ ইজারা | ১ |
| | দরইজারা | ৩ |
| | জায়গির | ১ |
| | মূসাক্কশি[ঘ] | ১ |
| | Parinit খরিদ[ঙ] | ৭ |
| লাখেরাজ ভোগস্বত্ব | | |
| | উৎসর্গ[চ] | ৪ |
| | মোট | ৭৩ |

উৎস: 'Appendix III' to 'Kanakshar SSR 1903', Genl. Manager, Kanakshar to Cltr. Far, 30 May 1893, BR, LR Dept., WAE Pr, 225 of 1893 (RRBR)

টীকা : ক স্বাধীন তালুক

খ কায়েমি অর্থ 'স্থায়ী' বা 'স্বাধীন'। বাকেরগঞ্জ ও ফরিদপুরে এই শব্দের অর্থ হলো খাজনার স্থায়িত্ব, যা চিরস্থায়ী প্রজাস্বত্বের স্থিতিকালের বিরোধী (GB, Guide and Glossary to Survey and Settlement Records in Bengal, 1917 [Calcutta, 1918], p. 32)।

গ Wilson-এর Glossary- তে এর সংজ্ঞা লেখা হয়েছেঃ 'এক ব্যক্তি থেকে অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হস্তান্তরিত জমিদারি বা রাজস্ব সম্পত্তি (পৃ. ২১৯)। অন্যদিকে একটি বাংলা-ইংরেজি অভিধানে এর মানে লেখা হয়েছে, 'জীবিত অবস্থায় রচিত এবং মৃত্যুর পরে কার্যকর সম্পত্তি হস্তান্তরের দলিল'।

ঘ অধীনস্থ প্রজা, যে তার মালিককে সম্পূর্ণ জমির জন্য নির্দিষ্ট হারের বার্ষিক খাজনা পরিশোধ করে (Wilson, Glossary, pp. 357-58)।

ঙ আংশিক ক্রেতা ভোগস্বত্ব।

চ কারো উদ্দেশে প্রদত্ত।

## সারণি ৩: কনকশর এস্টেটের বিন্যাস: (২) আয়তন অনুসারে ভূসম্পত্তির বণ্টন

| আয়তন-শ্রেণী | ভূসম্পত্তির সংখ্যা | শতকরা হার | আয়তন (বিঘায়) | শতকরা হার |
|---|---|---|---|---|
| ১০০০ বিঘা ও তদূর্ধ | ২ | ২.৮ | ১১,২৬৮ | ৬৯.০ |
| ১০০০-৫০০ | ২ | ২.৮ | ১,৭২৮ | ১০.৬ |
| ৫০০-২০০ | ৪ | ৫.৬ | ১,৩৩৮ | ৮.২ |
| ২০০-১০০ | ৭ | ৯.৭ | ৮৭৬ | ৫.৪ |
| ১০০-৫০ | ৪ | ৫.৬ | ৩২২ | ২.০ |
| ৫০-২০ | ১৭ | ২৩.৬ | ৫৭১ | ৩.৫ |
| ২০-১০ | ১১ | ১৫.৩ | ১৫৭ | ১.০ |
| ১০-০ | ২৫ | ৩৪.৭ | ৭০ | ০.৪ |
| মোট | ৭২ | ১০০.১ | ১৬,৩৩০ | ১০০.১ |

উৎস. ৯.২ নং সারণির অনুরূপ।

টীকা: পত্তনি ও দরপত্তনি–দু'টি ভূমিস্বত্ব হলেও এদের একটি এবং একই প্রকারের ভূমিস্বত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এই বিবেচনায় যে এই ভূমিস্বত্ব একই ভূমি পরিব্যাপ্ত, কেবলমাত্র এদের পার্থক্য নামে।

## সারণি ৪: কনকশর এস্টেটের বিন্যাস: (৩) খাজনা অনুসারে ভূসম্পত্তির বণ্টন

| শ্রেণী | ভূসম্পত্তির সংখ্যা | শতকরা হার | খাজনা (টাকায়) | শতকরা হার |
|---|---|---|---|---|
| ১০০০ টাকা ও তদূর্ধ | ২ | ২.৮ | ১২,৯৩৪ | ৭০.৭ |
| ১০০০-৫০০ | ৪ | ৫.৬ | ২,৬৫৬ | ১৪.৫ |
| ৫০০-২০০ | ২ | ২.৮ | ৪৭৬ | ২.৬ |
| ২০০-১০০ | ৭ | ৯.৭ | ১,১৪৭ | ৬.৩ |
| ১০০-৫০ | ৫ | ৬.৯ | ৩২২ | ১.৮ |
| ৫০-২০ | ১৫ | ২০.৮ | ৫০৬ | ২.৮ |
| ২০-১০ | ১১ | ১৫.৩ | ১৭১ | ০.৯ |
| ১০-০ | ২৬ | ৩৬.১ | ৯১ | ০.৫ |
| মোট | ৭২ | ১০০.০ | ১৮,৩০৩ | ১০০.১ |

উৎস: ২ নং সারণির অনুরূপ।

টীকা: ৩ নং সারণির অনুরূপ।

**সারণি ৫: কনকশর এস্টেটের বৃহত্তর আটটি ভূসম্পত্তি**

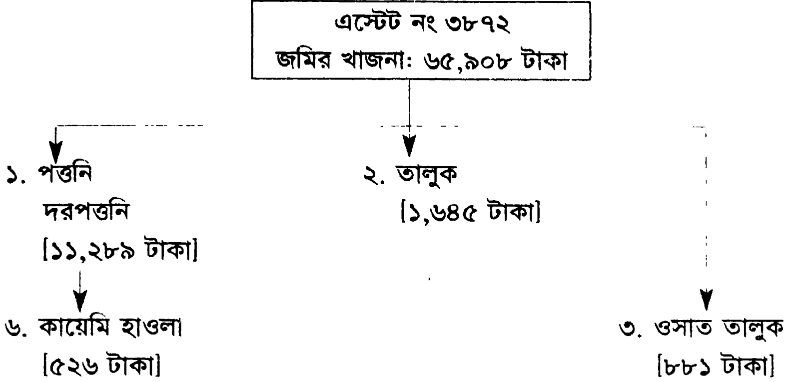
| | ভূসম্পত্তির পরিচিতি | প্রজাসংখ্যা | আয়তন বিঘা | খাজনা টাকা | সদর জমা টাকা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৩৮৭২ নং এস্টটে পত্তনি তালুক জগবন্ধু চট্টোপাধ্যায় ৩৮৭২নং এস্টটে দরপত্তনি তালুক জগবন্ধু চট্টোপাধ্যায় | ৬০৪ | ১০,১২৮ | ১১,২৮৯ | ২,০১২ |
| ২ | ৩৮৭২নং এস্টেটে তালুক শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় | ১১১ | ১,১৪০ | ১,৬৪৫ | ১,১১৯ |
| ৩ | ৫৩৭২ নং তালুক রামকিশোর বাড়রী | ১০৭ | ৮৩৭ | ৮৮১ | পাওয়া যায়নি |
| ৪ | ৩৮৭২নং এস্টেটের সঙ্গে যুক্ত ওসাত তালুক, হিস্যা(অংশীদার) ৮ আনা | ২৯ | ৪৬৯ | ৬৮৩ | পাওয়া যায়নি |
| ৫ | বাকেরগঞ্জ কালক্টরেটের অধীন হলেও ফরিদপুরে অবস্থিত ৩১৯৭ নং এস্টেটের পত্তনি শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় | ৭২ | ৮৯১ | ৫৬৬ | ৪৮৮ |
| ৬ | কায়েমি হাওলা জগবন্ধু চট্টোপাধ্যায় | ১০৭ | ৩৭৮ | ৫২৬ | ১০০ |
| ৭ | ৫৩৫৮ নং এস্টেটের সঙ্গে যুক্ত ওসাত তালুক, হিস্যা ১৬ আনা | ৩৩ | ১৩২ | ২৬৯ | পাওয়া যায়নি |
| ৮ | ৫০৪৮ নং তালুক রাধানাথ গুহ | ১৭ | ৬৯ | ২০৭ | পাওয়া যায়নি |
| | মোট | ১,০৮০ | ১৪,০৪৪ | ১৬,০৬৬ | - |

উৎস: ২ নং সারণিব অনুরূপ।

টীকা: এখানে 'সদর জমা' বলতে ঊর্ধ্বতন ভূস্বামীকে প্রদত্ত কনকশর এস্টেটেব খাজনাকে বুঝানে হয়েছে।

প্রাথমিক দৃষ্টিতে কনকশর এস্টেটকে বহুবিধ ভূমি অধিকারের বিশৃঙ্খল মিশ্রণ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আকারের দৃষ্টিকোণ হতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে এটি ছিলো বরং সুকৌশলী কর্তৃত্ব পরিচালনার জন্য যথেষ্ট সুসঙ্গত ও সুবিন্যস্ত ভূসম্পত্তি। এই ধরনের এস্টেটের মালিককে উপরি স্তরের রায়তদের অনুকম্পায় সৃষ্ট 'অনুপস্থিত ভূস্বামী' (absentee landlord) বলা মুশকিল।

চিত্র ২ : ৩৮৭২ নং এস্টেটের সঙ্গে কনকশর এস্টেটের সম্পর্ক




টীকা: চিত্রে নির্দেশিত সংখ্যার মাধ্যমে পূর্ববর্তী ৫ নং সারণির ক্রমিক সংখ্যা বোঝানো হয়েছে। বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখিত অঙ্ক কনকশর এস্টেট কর্তৃক আদায়কৃত খাজনার পরিমাণ নির্দেশ করা হয়েছে।

শেষত, চট্টোপাধ্যায়ের দখলে কৃষিজমি ছাড়াও যে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় জমি ছিলো তা অগ্রাহ্য করার মতো নয়। কোর্ট অব ওয়ার্ডস কর্তৃক পরিচালিত প্রাথমিক জরিপ ও বন্দোবস্তে দেখা যায়, ছাতিয়ান মৌজায় তাদের একটি সাপ্তাহিক হাট ছিলো; একটি বড় আকারের খাস জমি (১৫৬ বিঘা আয়তনবিশিষ্ট) ছিলো, যাতে প্রচুর পরিমাণ শণ হতো; এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, তাঁরা একজন নাপিতকে ০.২৯ একর জমির চাকরান স্বত্ব দান করেছিলেন।[২৬] দ্বিতীয় জরিপ ও বন্দোবস্ত অনুযায়ী প্রাথমিক জরিপে ২,০৬৪ বিঘা জমিকে ধরা হয়নি, কনকশর এস্টেটের এই অংশে ছিলো ২৩টি জলকর; ৯৮টি রায়তি বসতবাটি, এবং ৩৩টি নিজজোত [ভূস্বামীদের নিজস্ব ভোগ জমি]।[২৭] ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে, এই ধরনের ভূসম্পত্তির অস্তিত্বের ফলে জমিদারিপ্রথায় ভূস্বামী-রায়ত সম্পর্ক শুধু খাজনা আদায় ও পরিশোধের মধ্যেই সীমিত থাকেনি, তা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়েছিলো; আংশিকভাবে হলেও রায়তদের দৈনন্দিন কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় এইসব বিষয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ ছিলো ভূস্বামীদের ক্ষমতার ভিত্তি।

২৬. 'Kanakshar SSR 1897,' pars. 8,9,31.

২৭. 'Appendix III' to Kanakshar SSR 1903.'

## সারণি ৬ : কনকশর এস্টেটের ভৌগোলিক অবস্থান

| প্রশাসনিক একক | মৌজার সংখ্যা | কনকশর এস্টেটের ভূসম্পত্তি আছে এমন মৌজার সংখ্যা |
|---|---|---|
| **ফরিদপুর জেলা** | | |
| মাদীরপুর মহকুমা | | |
| গৌসাইরহাট থানা | | |
| নলমুনি ইউনিয়ন | ৭ | ১ |
| ইদিলপুর ইউনিয়ন | ২৫ | ১ |
| গৌসাইরহাট ইউনিয়ন | ১৫ | ৩ |
| গরিবের চর ইউনিয়ন | ৩ | ০ |
| কোদালপুর ইউনিয়ন | ২ | ০ |
| সামন্তেশ্বর ইউনিয়ন | ৭ | ৩ |
| নাগেরপাড়া ইউনিয়ন | ২১ | ৪ |
| থানার মোট | ৮০ | ১২ |
| ডামুড্যা থানা | | |
| দুরাল আমান (২) ইউনিয়ন | ৭ | ০ |
| কনকশর ইউনিয়ন | ২২ | ১৬ |
| ধানুকাটি ইউনিয়ন | ১১ | ১ |
| সিধালকুরা ইউনিয়ন | ৫ | ৩ |
| ডামুড্যা ইউনিয়ন | ১৮ | ১ |
| থানার মোট | ৬৩ | ২১ |
| ভেদরগঞ্জ থানা | | |
| ছায়াগাঁও ইউনিয়ন | ১৫ | ৭ |
| মহীশার ইউনিয়ন | | ৯ ৫ |
| নারায়ণপুর ইউনিয়ন | ৫ | ১ |
| অন্যান্য আটটি ইউনিয়ন | ৫৩ | ০ |
| থানার মোট | ৮২ | ১৩ |
| পালং থানা | | |
| অঙ্গারিয়া ইউনিয়ন | ১০ | ১ |
| রুদ্রকর ইউনিয়ন | ১০ | ৩ |
| পালং ইউনিয়ন | ২০ | ৩ |

(ক্রমশ)

(সারণি ৬-এর পরবর্তী অংশ)

| প্রশাসনিক একক | মৌজার সংখ্যা | কনকশর এস্টেটের ভূসম্পত্তি আছে এমন মৌজার সংখ্যা |
|---|---|---|
| চন্দ্রপুর ইউনিয়ন | ৯ | ১ |
| অন্য ছয়টি ইউনিয়ন | ৫৫ | ০ |
| থানার মোট | ১০৪ | ৮ |
| নড়িয়া থানা | ১৩৮ | ১ |
| | বাকেরগঞ্জ জেলা | |
| মেহেন্দীগঞ্জ থানা | ১১১ | ৯ |

উৎস: 'Kanakshar SSR, 1897 & 1903'; Bangladesh Census 1974, Faridpur.

টীকা: ১৯৭৪ সালের প্রশাসনিক বিভাজন এখানে গ্রহণ করা হয়েছে।

**সারণি ৭: কনকশর মৌজার চট্টোপাধ্যায়দের ভূসম্পত্তি**

| | |
|---|---|
| খারিজা তালুক | ৩ |
| পত্তনি | ১ |
| কায়েমি হাওলা | ৭ |
| নিম হাওলা | ১ |
| ক্রীত ভোগস্বত্বের অংশ | ৪ |
| দান (লাখেরাজ) | ৩ |
| মোট | ১৯ |

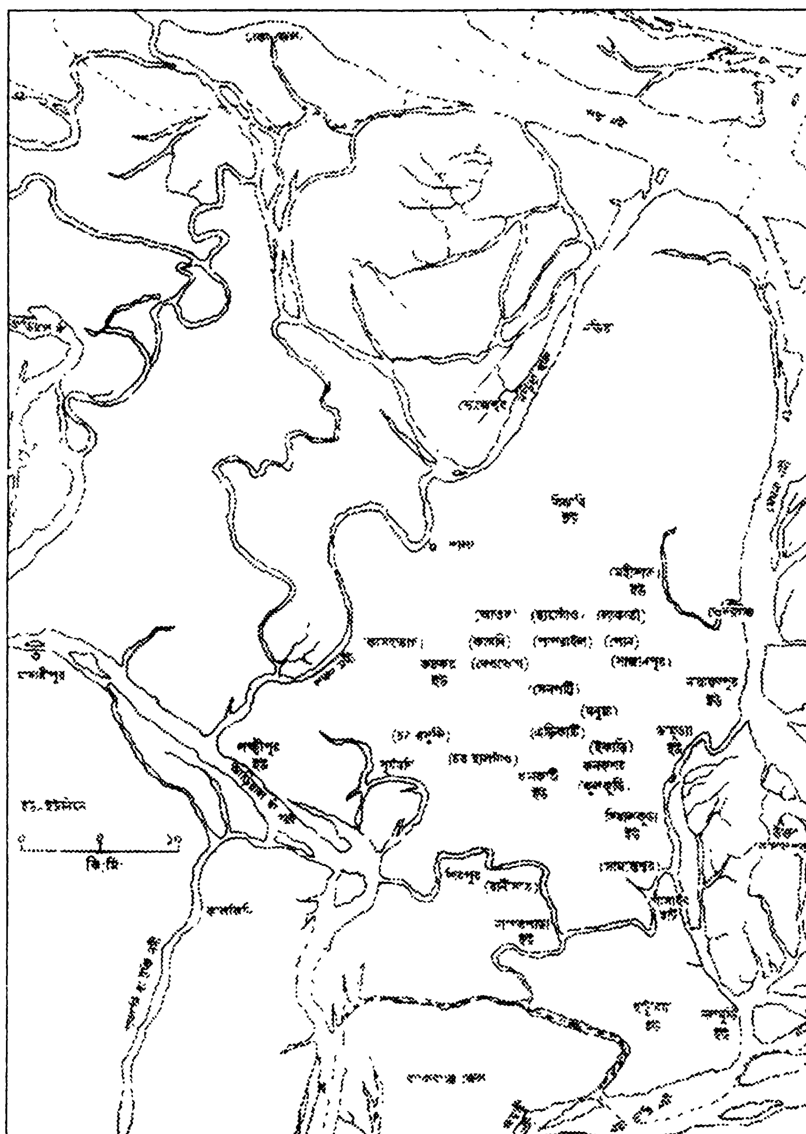
উৎস: Village Note No. 7 (Kanakshar)' ; Annexure C to Cllr. Far. to Cmmr. Dac., No. 259/VIII-1 G, 5 May 1891, in BR, LR Dept, WAE BR., File No 21 of 1891.

টীকা: উপরে সারণিতে সংখ্যার জন্য যেসব উৎস ব্যবহৃত হয়েছে তা ৯.২ নং সারণিতে ব্যবহৃত উৎস থেকে আলাদা।

**৩. সংস্থাপন, রায়ত ও খাজনা**

কনকশর এস্টেটের পুরোটাই খাস নিয়ন্ত্রণে ছিলো, অর্থাৎ চট্টোপাধ্যায়রা নিজেরাই খাজনার ব্যবস্থাপনা দেখাশোনা করতেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে জগবন্ধু বা শ্যামাচরণের সময়কার সংস্থাপন সংক্রান্ত বিশদ বিবরণের কোনো রেকর্ড পাওয়া যায় না। তা সত্ত্বেও ১৮৯১ সালে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনস্থ হওয়ার সময়ে উক্ত এস্টেটে কর্তব্যরত কর্মচারীদের তালিকা ৯.৮ নং সারণিতে পুনরায় প্রদান করা হয়েছে। আনুমানিক ২০,০০০ টাকা খাজনা আদায় করার জন্য ১৩ জন কর্মচারী ছিলো। তাদের মধ্যে যারা

মানচিত্র : কনকশর এস্টেটের অবস্থান



টীকা : যেসব গ্রাম কনকশর এস্টেটের ভূসম্পত্তি রয়েছে বন্ধনী দিয়ে তা চিহ্নিত করা হয়েছে।

খাজনা আদায়ের কাজে সরাসরি জড়িত ছিলো তাদের মোট সংখ্যা নয় জন: ম্যানেজার, মুহুরি, তহশিলদার, ২ জন সার্কেল তহশিলদার এবং ৪ জন পিয়ন। এমন একটি গঠনকে বৈশিষ্ট্যমূলক তহশিল সংস্থাপন হিসাবে আখ্যা দেয়া যেতে পারে, যা দ্বাদশ অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। কিন্তু যেহেতু তাদের নাম রেকর্ডে উল্লেখিত হয়নি, সেজন্য তাদের সামাজিক অবস্থান জানা অসম্ভব। এই তালিকায় লাঠিয়াল ও বরকন্দাজের মতো দৈহিক শক্তি প্রয়োগকারী বাহিনীরও উল্লেখ করা হয়নি। তবে এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, তহশিলদারের অধীনস্থ পিয়ন ৪ জন প্রয়োজনের সময়ে সে কাজ চালিয়ে যেতো। সর্বোপরি, জগবন্ধু ও শ্যামাচরণের সময়ে এস্টেট পরিচালনার কাজে তাঁরা এভাবে বা অন্য কোনোভাবে কিছু দৈহিক শক্তিধর লোকজন রাখতেন। এইসব কর্মচারীদের অতিরিক্ত কনকশর এস্টেট মহকুমা সদরে একজন উকিল রেখেছিলো, যাকে বছরে প্রায় ১০০ টাকা করে দেওয়া হতো, এবং মামলা পরিচালনার জন্য প্রচুর টাকা ব্যয় করা হতো।[২৮]

**সারণি ৮: ১৮৯১ সালে কনকশর এস্টেটের সংস্থাপনা**

| কর্মচারীদের পবিচয় | সংখ্যা | বার্ষিক বেতন (টাকা) |
|---|---|---|
| ম্যানেজার | ১ | ৬০০ |
| প্রধান তহশিলদার, যিনি সার্কেল তহশিলদারদের নিকট থেকে হিসাব গ্রহণ করেন এবং মাঝেমধ্যে খাজনা আদায় করেন | ১ | ১৮০ |
| দেশীয় ভাষার মুহুরি | ১ | ১২০ |
| ইংরেজি জানা কেরানি | ১ | ১৮০ |
| পিয়ন | ১ | ৬০ |
| সার্কেল তহশিলদার | ২ | ৩৬০ |
| তহশিলদারদের অধীনস্থ পিয়ন | ৪ | ২৪০ |
| মহকুমা সদরের পিয়ন, যারা ম্যানেজারের নিকট চিঠিপত্র আদান-প্রদানের কাজে নিয়োজিত ছিলো, মাঝেমধ্যে এরা খাজনা আদায়ের কাজে তহশিলদারদের অধীনেও কাজ করতো | ২ | ৯৬ |
| মোট | ১৩ | ১৮৩৬ |

উৎস: Cllr. Far. to Cmmr. Dac., No. 259/VIII-1 G, 5 May 1891, BR, LR Dept., WAE Br., File 21 of 1891 (RRBR).

28. 'Return No. XXXI of the Kanakshar Estate for 1904-05,' DCO, MR Dept., File XIW ⁰ of 1905-06 (NAB, Rev. Bundle 40, File 605).

**সারণি ৯: ১৮৯৭ ও ১৯০৩ সালের জরিপে ও বন্দোবস্তে নিগাত কনকশর এস্টেটের প্রজাদের পদমর্যাদা ও খাজনা**

| | প্রজাদের শ্রেণী | আয়ত্তি নং | শ্রেণীপ্রতি জমি | খাজনা[ক] | প্রতি বিঘার গড় খাজনা |
|---|---|---|---|---|---|
| | ১৮৯৭ সালের জরিপ ও বন্দোবস্তের অধীনস্থ এলাকায় | | | | টাকা- আনা-পাই |
| ১ | মালিকের সির (Sir) | - | - | - | - |
| ২ | আসলে সিরে নেই তবে মালিকের দখলে | - | ১৫৬ | - | - |
| ৩ | ভোগস্বত্বাধিকারী চাষের অধীনে | ৭৮ | ১,৮৪২ | ১,২৭৫ | ০-১১-১ |
| ৪ | নির্দিষ্ট হার বা নির্দিষ্ট খাজনার রায়ত | ২ | ৩ | ২ | ০-১০-৮ |
| ৫ | স্থায়ী রায়ত | ১,২৩৮ | ৮,১৭৫ | ১২,৪৫০ | ১-৮-৪ |
| ৬ | দখলি রায়ত | ৭ | ১২ | ৩২ | ২-১০-৮ |
| ৭ | দখলহীন রায়ত | ১১১ | ২৪০ | ৫৪৩ | ২-৪-২ |
| ৮ | লাখেরাজ প্রজা | ৯৯ | ৪৭৭ | - | - |
| | মোট | ১,৫৩৫ | ১০,৯০৫ | ১৪,৩০৪ | - |
| | ১৯০৩ সালের জরিপ ও বন্দোবস্তের অধীনস্থ এলাকায় | | | | |
| ১ | মালিকের সির | - | - | - | |
| ২ | আসলে সিরে নেই তবে মালিকের দখলে | - | ১১২ | - | - |
| ৩ | ভোগস্বত্বাধিকারীদের চাষের অধীনে | ২৩১ | ১১২[খ] | ১৫৬ | ১-৬-৩ |
| ৪ | নির্দিষ্ট হার বা নির্দিষ্ট খাজনার রায়ত | ৩ | ৫ | ২ | ০-৬-৫ |
| ৫ | স্থায়ী রায়ত | ৭১২ | ২,০৭৩ | ২,৮০০ | ১-৫-৭ |
| ৬ | দখলি রায়ত | - | - | - | - |
| ৭ | দখলহীন রায়ত | ৭৪ | ৮২ | ১২৫ | ১-৮-৫ |
| ৮ | লাখেরাজ প্রজা | ২০৬ | ১৩৯[গ] | - | - |
| | মোট | ১,২২৬ | ২,৫২৩ | ৩,০৮৩ | - |

উৎস: 'Appendix B' to 'Kanakshar SSR 1897'; 'Appendix III' to 'Kanakshar SSR 1903'.

টীকা: ক এই কলামে ১৮৯৭ সালের জরিপ ও বন্দোবস্তে জরিপকৃত যাবতীয় জমির খাজনা দেখানো হয়েছে।

খ উপরোক্ত ভূমি অধিকারীদের অধীনস্থ ৪৮৪ জন রায়তের ৪১৩ বিঘা জমির মধ্যে এই ১১২ বিঘা অন্তর্ভুক্ত হয়নি,

গ ১৩৯ বিঘা জমির মধ্যে ১০৮ বিঘা লাখেরাজ জমির অধীনস্থ ২৬৮ জন রায়তের দখলে ছিলো।

**সারণি ১০: প্রজাবিলির তুলনা: কনকশর, পালং এবং ফরিদপুর**

| প্রজার শ্রেণী | সংখ্যা | | | এলাকা | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ক | পা | ফ | ক | পা | ফ |
| | % | % | % | % | % | % |
| ১ মালিকের সির | - | ২.০ | ১.৮ | - | ৪.৮ | ২.৯ |
| ২ আসলে সিরে নেই তবে মালিকের দখলে | ০.০ | - | - | ১.৪ | - | - |
| ৩ ভোগস্বত্বাধিকারীদের চাষের অধীনে | ৫.১ | ১৬.২ | ১৪.১ | ১৬.৯ | ৫.৮ | ৮.২ |
| ৪ নিদিষ্ট হার বা নির্দিষ্ট খাজনার রায়ত | ০.১ | ১.২ | ৩.২ | ০.০ | ০.৫ | ০.৫ |
| ৫ স্থায়ী রায়ত | ৮০.৭ | ৬৪.৫ | ৫৭.০ | ৭৫.০ | ৭১.৪ | ৬৯.৫ |
| ৬ দখলি রায়ত | ০.৫ | ০.১ | ০.৫ | ০.১ | ০.১ | ৪.৮ |
| ৭ দখলহীন রায়ত | ৭.২ | ৫.৮ | ২.৪ | ২.২ | ১৩.৯ | ০.৬ |
| ৮ লাখেরাজ প্রজা | ৬.৪ | ৩.২ | ২.৮ | ৪.৪ | ০.৩ | ৪.২ |
| ৯ নিম্নরায়ত | - | ৭.০ | ১৮.৩ | - | ৩.২ | ৯.৩ |
| ১০ ফসলে-খাজনা | - | ২.৪ | ১১.২ | - | ১.৩ | ৬.৩ |

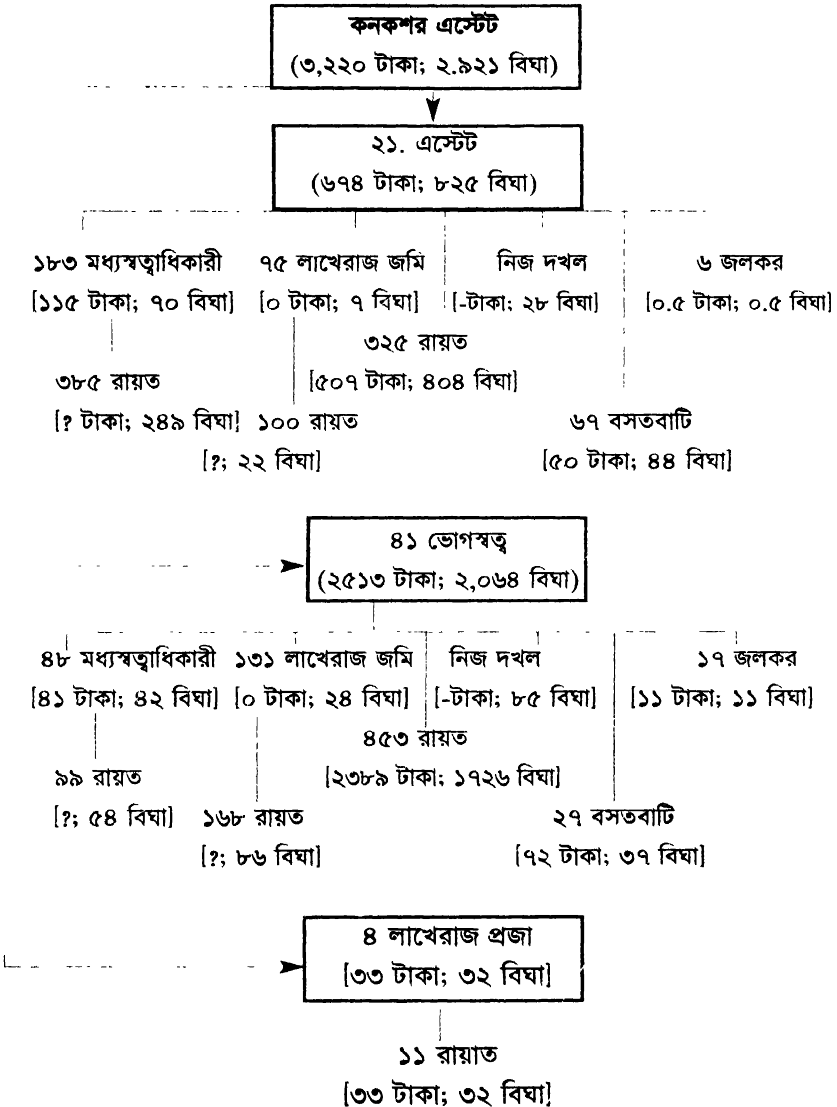
উৎস: 'Appendix B' to 'Kanakshar SSR 1897', Faridpur SSR pp. vi-vii.

টীকা: শুধু ১৮৯৭ সালের জরিপ ও বন্দোবস্ত অনুযায়ী কনকশর এস্টেটের হিসাব। ক, পা, এবং ফ যথাক্রমে কনকশর, পালং এবং ফরিদপুর।

৯ নং সারণিতে উল্লিখিত বহুসংখ্যক ভোগস্বত্ব ও কমবেশি ১৩,০০০ বিঘা ভূসম্পত্তি নিয়ন্ত্রণের কাজে এই ধরনের সংস্থাপনা ছিলো; এছাড়া, ১০ নং সারণিতে ফরিদপুর জেলা ও পালং থানার ভোগস্বত্বের তুলনা করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, সংখ্যা ও আয়তনের দিক দিয়ে ফরিদপর ও পালংয়ের চেয়ে কনকশর এস্টেটের স্থায়ী রায়ত ও লাখেরাজ প্রজার সংখ্যা বেশি ছিলো; এবং সংখ্যার দিক দিয়ে ক্ষুদ্রতম হওয়া সত্ত্বেও পালং ও ফরিদপুরের চেয়ে কনকশর এস্টেটে প্রজাদের দখলাধীন জমির আয়তন বৃহত্তর ছিলো। ভোগস্বত্ব ও লাখেরাজ জমির মালিকদের আপেক্ষিক শক্তিশালী অবস্থান খুব সম্ভবত এই এলাকার সামাজিক চরিত্রকে প্রতিফলিত করে, যে এলাকা ছিলো উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের দ্বারা ঘনবসতিপূর্ণ। বস্তুত, ১৯০৩ সালের কনকশর এস্টেটের জরিপ ও বন্দোবস্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে: 'মধ্যস্বত্বভোগীদের অধিকাংশ তাদের ভূস্বামীর [অর্থাৎ চট্টোপাধ্যায়দের] মতো অভিন্ন শ্রেণীর ও অভিন্ন সামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন হিন্দু।'[২৯] এই ধরনের সামাজিক পরিস্থিতিতেই হয়তো চট্টোপাধ্যায়গণ তাদের প্রতি নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

২৯. 'Kanakshar SSR 1903', par. 1.

চিত্র ৩: প্রজাদের সঙ্গে কনকশর এস্টেটের সম্পর্ক




উৎস: 'Appendix III' to 'Kanakshar SSR 1903.'

টীকা: ৯.১ নং চিত্রের টীকা দ্রষ্টব্য। এছাড়া এখানে রায়ত বলতে সব ধরনের রায়তকে বুঝানো হচ্ছে, যেমন, নির্দিষ্ট হার ও খাজনা রায়ত, স্থায়ী রায়ত, দখলি রায়ত ও অস্থায়ী রায়ত।

সর্বোপরি, সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, কনকশরে বর্গাদার এবং নিম্নায়তদের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি। কনকশর এস্টেনের জরিপ ও বন্দোবস্ত কার্যক্রম নিয়মানুগ যথাযথ পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়েছিলো কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, এই এস্টেটে স্থায়ী রায়তের উচ্চ শতকরা হারের রেকর্ড খুব সম্ভবত জরিপ পদ্ধতির অসম্পূর্ণতাকেই নির্দেশ করে। তা সত্ত্বেও সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, কনকশরে এমন কোনো কৃষক ছিলো না, যারা চট্টোপাধ্যায়দের সরাসরি ফসলে-খাজনা প্রদান করতো, কেননা, সেটেলমেন্ট রিপোর্টে সুস্পস্টভাবে বলা হয়েছিলোঃ 'কোনো ফসলে-খাজনা গ্রহণ করা যায় না।'[৩০] (ধনী রায়তদের অধীনে বর্গাদার গ্রহণ করার যথেষ্ট সম্ভাবনা তাতে অবশ্যই বাধাগ্রস্ত হয় না)। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বর্গাদারদের এই অনুপস্থিতি ছিলো চট্টোপাধ্যায়দের এস্টেটের ব্যবস্থাপনা নীতিতে রায়তি জমি হস্তান্তর এবং তার অংশ ক্রয় করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞারই স্বাভাবিক পরিণতি।[৩১]

**সারণি ১১: কনকশর, পালং এবং ফরিদপুরে খাজনার হার**

| রায়তদের শ্রেণী | কনকশর<br>টাকা-আনা-পাই | পালং<br>টাকা-আনা-পাই | ফরিদপুর<br>টাকা-আনা-পাই |
|---|---|---|---|
| নির্দিষ্ট হার ও নির্দিষ্ট খাজনার রায়ত | ২-১-৩ | ৩-৯-৫ | ২-৬-৭ |
| স্থায়ী রায়ত | ৪-৯-১ | ৩-১৩-১ | ২-৯-২ |
| দখলি রায়ত | ৮-২-৪ | ৪-০-৮ | ২-১০-৬ |
| অস্থায়ী রায়ত | ৪-১-১০ | ৩-৭-০ | ১-১২-৩ |

উৎস: 'Appendix B' to Kanakshar SSR 1897; Faridpur SSR, p.x.

এরপর, খাজনা আদায়ের দিক থেকে চট্টোপাধ্যায়দের সঙ্গে প্রজাদের, বিশেষভাবে রায়তদের সঙ্গে সম্পর্ক কেমন ছিলো তা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। ১৯০৩ সালের জরিপ ও বন্দোবস্তের উপর নির্ভর করে ৩ নং চিত্র তৈরি করা হয়েছে, যে জরিপে এস্টেটের ৬ ভগের ১ ভাগ মাত্র সম্পন্ন হয়। এতে দেখা যায় যে, এস্টেটের এই অংশের ১,৫৪১ জন রায়তের মধ্যে ৭৮৯ জন বা শতকরা ৫১ জন রায়ত স্বত্বাধিকারীর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে ছিলো। আয়তনের দিক দিয়ে ২,৯২১ বিঘার মধ্যে ২,২৭২ বিঘা বা শতকরা ৭৮ ভাগ জমি এই ধরনের রায়তের অধীনে ছিলো।[৩২] তা সত্ত্বেও যে মধ্যস্বত্বায়ন প্রক্রিয়া ভূস্বামীদের নিকট থেকে রায়তকে আইনগতভাবে অধিকতর দূরে সরিয়ে রাখে,

৩০. 'Kanakshar SSR 1897', par. 23.

৩১. জমিদারি প্রথায় কৃষকের সামাজিক অস্তিত্ব উপাদানের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই বিষয় পরবর্তী পঞ্চদশ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

৩২. বন্দোবস্তের সময় কিছু রায়তকে দুইবার এমনকি তিনবারও গণনা করা হয়েছে, তবে ৩ নং চিত্রে তা বিবেচনার মধ্যে আনা হয়নি।

চট্টোপাধ্যায়গণ তা অতিক্রম করতে পেরেছিলেন রায়ত এবং জমির সঙ্গে কল্পনাতীত অসাধারণ মাত্রায় সরাসরি যোগাযোগ সৃষ্টি করে।[৩৩] (এ প্রসঙ্গে একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

কনকশরের ভূমিব্যবস্থাপনায় খাজনার হার ছিলো অত্যন্ত বেশি। কতোটা বেশি ছিলো তা ১১ নং সারণিতে দেখানো হয়েছে। জানা যায়, ফরিদপুর জেলার মধ্যে পালং থানার খাজনার হার ছিলো সর্বাধিক, কনকশরের খাজনা ছিলো তার চেয়েও বেশি। ফরিদপুর জেলার গড় খাজনার তুলনায় কনকশরের স্থায়ী রায়তদের খাজনার হার শতকরা ৭৮ ভাগ বেশি ছিলো। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে কনকশরে কোনো ফসলে-খাজনা ছিলো না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা করে কনকশর এস্টেটের পক্ষ হতে রায়তদের বিদ্রোহী করে তোলার ঝুঁকি নেবার প্রয়োজন খুব কমই ছিলো, কেননা ইতোমধ্যে তাঁরা অতি উচ্চ হারে টাকার খাজনা আদায়ে সফলকাম হয়েছিলেন। সম্ভবত তিনটি উপাদান মিলিত হয়ে এই অস্বাভাবিক উচ্চ খাজনা বৃদ্ধি সম্ভব করে তুলেছিলো। প্রথমত, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, খাজনা প্রদানকারী রায়তদের সঙ্গে চট্টোপাধ্যায়গণ গভীরভাবে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, অধিকন্তু তাদের এস্টেটটি গঠিত ছিলো একই স্থানে কেন্দ্রীভূত ভূস্বামীদের সুগ্রন্থিত কর্ম প্রক্রিয়ায়। এর ফলে তারা রায়তদের উপর ব্যাপক কর্তৃত্ব করতে পারতেন এবং একইভাবে তাদের সঙ্গে ধীর-স্থির আচরণ করতে পারতেন। দ্বিতীয়ত, পালং থানার ভূস্বামীরা একটি শক্তিশালী সঙ্ঘ গঠনে সক্ষম হয়েছিলো, যার মধ্যে কনকশর এস্টেটও ছিলো। বস্তুত, জে. সি. জ্যাক (J. C. Jack) লিখেছিলেন: 'পালং হচ্ছে একটিমাত্র থানা যেখানকার ভূস্বামীরা মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে খাজনার হার বাড়িয়েছে।'[৩৪] সর্বোপরি, ইদিলপুর পরগনার মালিক কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ছিলেন সবচেয়ে সেয়ানা ও হিসাবি জমিদার, ভূসম্পত্তি দেখাশোনার কাজে যিনি তার অধিকাংশ সময় ব্যয় করতেন।[৩৫] এই শক্তিশালী সঙ্ঘের সদস্যরূপে চট্টোপাধ্যায়রাও খাজনা বাড়ানোর পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। শেষত, রায়তদের মধ্যে ক্ষুদ্র পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের উন্নয়ন খাজনা বৃদ্ধির জন্য অনুকূল অবস্থা সৃষ্টিতে সহায়ক হয়। জানা যায়, কনকশরের রায়তরা ছিলো বিত্তবান, এবং যদি তারা সত্যি সত্যিই বিত্ত সঞ্চয় করতে সমর্থ হয়ে থাকে, তাহলে তা বাজারের জন্য পাট ও আখ উৎপাদন ছাড়া আর কোনোভাবে সম্ভব ছিলো না। কনকশরের সেটেলমেন্ট অফিসার এর প্রতিটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে লেখেন:

> ব্যাপকভাবে পাটের চাষ করা হয় এবং তা রপ্তানি করা হয়, যা প্রধানত ও সম্ভবত একমাত্র বাণিজ্যিক পণ্য।
>
> আখ, যার থেকে গুড় তৈরি করে নিকটবর্তী বাজার, এমনকি, মাদারীপুরে বিক্রির জন্য পাঠানো হয়।[৩৬]

---

৩৩. এম এম ইসলামও এ ব্যাপারে অভিন্ন মত পোষণ করেছেন (M M Islam, 'Subinfeudation,' p. 209)। অপিচ দ্রষ্টব্য, N. Mukherjee. A Bengal Zamindar, p. 95

৩৪. Faridpur SSR, par. 74.

৩৫. Ghose, Indian Chiefs, part 2, p. 214

৩৬. 'Kanakshar SSR 1903,' par. 1.

রায়তদের উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য এ অঞ্চলের ছোট নদীতীরে অবস্থিত বহুসংখ্যক গঞ্জে বাজারজাত করা হতো এবং এদের মধ্যে মাদারীপুর, ভোজেশ্বর, ডামুড্যা, হাটুরিয়া প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য (মানচিত্র দ্রষ্টব্য)।[৩৭] নিজস্ব ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে রায়তদের অর্জিত এই বিত্তের উপর শক্তিশালী ভূস্বামী শ্রেণী হস্তক্ষেপ করার ফলে সাধারণভাবে খাজনা বৃদ্ধির পথ প্রস্তুত হয়েছিলো।

কনকশর এস্টেটে খাজনা আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে:

> ওয়ার্ডস্ এস্টেটে একই গ্রামের প্রজারা অভিন্ন হারে খাজনা পরিশোধ করে না; কেউ বেশি হারে খাজনা দেয়, কেউ কম হারে খাজনা দেয়, যদিও উভয়েই অভিন্ন মানের জমি ভোগ করে থাকে।...রায়তদের জোতজমির হিসাব করতে গিয়ে দেখা যায়, ওয়ার্ডস্ এস্টেট এবং অন্যান্য জমিদারের এস্টেটের জমির কোনো শ্রেণীকরণ করা হয়নি। সমস্ত জমিই প্রজার জোতজমি, যার মধ্যে রয়েছে বসতবাটি, বাগানবাড়ি, প্রথম শ্রেণীর নাল, যার খাজনা ভূস্বামী কর্তৃক থোক হিসাবে নির্ণীত, তবে যে সব প্রজার বড় ধরনের বসতবাটি বা বাগানবাড়ি রয়েছে, তারাই অধিক হারে খাজনা পরিশোধ করে।[৩৮]

সমগ্র এলাকায় জমির কর নিরূপণের জন্য কোনো নিয়মানুগ প্রয়াস গ্রহণ করা হয়নি, বলা যায় কনকশর এস্টেটে এ ব্যবস্থা ছিলোই না, কিন্তু মোট ধরে খাজনা আদায় করা হতো। তবে অনুরূপভাবে কোথাও কিস্তি [নিয়মিত ব্যবধানে খাজনা পরিশোধ] চালু ছিলো না। ভিলেজ নোটে অকপটে বলা হয়েছে: 'কিস্তি অনুসারে খাজনা আদায় করার কোনো রীতি নেই...রায়তদের খুশিমতো বা রায়ত যখন পারে, তখন খাজনা পরিশোধ করে।'[৩৯] তাই এটা খুবই স্বাভাবিক যে, যখন কোর্ট অব ওয়ার্ডস এস্টেটের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলো তখন 'সম্পত্তির কোনো পদ্ধতিগত হিসাব ছিলো না এবং ভূস্বামী ও প্রজার সম্পর্কও সন্তোষজনক ছিলো না।'[৪০] এস্টেটের খাজনার ব্যাপারে নিয়মতান্ত্রিকতার পরিবর্তে যথেচ্ছাচার লক্ষ করা যায়, এবং পূর্বে উল্লেখিত খাজনার বৃদ্ধিতে ভূস্বামীদের ক্ষমতার অযৌক্তিক দাবিই কার্যকর হতো। এভাবে কনকশর এস্টেটে প্রজার অসন্তোষ ভূস্বামী-প্রজা সম্পর্কে গুপ্তভাবে থাকে।[৪১]

এতক্ষণ বৈধ খাজনা আদায় সম্পর্কে বলা হলো। কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ব্যবস্থাপনায় আবওয়াব বা বেআইনি কর আদায়ের রীতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। ভিলেজ নোটে লেখা হয়েছিলো:

> শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের আমলেও আবওয়াব চালু ছিলো:
>
> (১) আউখ চর্চা [ইক্ষু প্রক্রিয়াকরণ], তথা
> প্রতি কারখানা থেকে ১ মণ গুড়
>
> (২) কালী পূজা খরচ

৩৭. Faridpur SSR, pars. 32, 36; 'Kanakshar SSR 1903,' par. 1.

৩৮. Sub-Deputy, Cllr. Kalkini to Cllr. Far., No 92W, 25 July 1894, BR, LR Dept., WAE Br., File 225 of 1893 (RRBR).

৩৯. 'Village Note No. 22 (Chhatiani) appended to 'Kanakshar SSR 1903.'

৪০. 'Final Report 1907', par. 5.

৪১. চতুর্দশ পরিচ্ছেদে খাজনা আদায় সমস্যা সম্পর্কে আরো আলোচনা করা হবে।

রায়তদের পরিস্থিতি অনুযায়ী

(৩) পুণ্যাহ নজর
প্রতি রায়তে জমায় ১ টাকা, যাদের বার্ষিক জমা ১০ টাকার বেশি।

(৪) রাজধুতি [জমিদারের কটিবস্ত্র]
জমিদারের পরিবারে অনুষ্ঠিত বিয়ে উপলক্ষে ধার্যকৃত আবওয়াব

(৫) দুর্গা ভেট [দুর্গা পূজার উপহার]
দুর্গা পূজা উপলক্ষে।[৪২]

এই তালিকায় উল্লেখিত সব ধরনের আবওয়াব অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ধরে নিলে, এইসব আবওয়াবে টাকার পরিমাণ যে খুব বেশি হতো, না নয়। বরং এইসব আবওয়াব ভূস্বামী ও রায়তদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক এবং কিছু মাত্রায় অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রতিফলনের দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ছিলো। এই অঞ্চলের পর্যাপ্ত গুড় কারখানার উপর একটি আবওয়াব ধার্য করার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক দিকের প্রতিফলন ঘটে। এই হস্তক্ষেপ অবশ্যই গ্রামীণ আখ শিল্পের বিকাশকে ব্যাহত করেছিলো। জমিদারিপ্রথায় ভূস্বামী ও রায়তের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্যান্য আবওয়াবগুলো সামন্ততান্ত্রিক ও গোষ্ঠীপতি শাসিত চরিত্রের প্রকাশ করে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

**সারণি ১২: কনকশর এস্টেটের মোট আয় ও ব্যয়**

(৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১ থেকে ১ সেপ্টেম্বর ১৯০৬ পর্যন্ত)

| | আয় | টাকা | % |
|---|---|---|---|
| ১ | এস্টেট থেকে আদায়কৃত খাজনা ও কর | ৩,১৯,৫৪৯ | ৯০.২ |
| ২ | অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সরকারি ঋণপত্রের সুদ, ঋণ আদায়, ইত্যাদি | ১৩,০৬৬ | ৩.৭ |
| ৩ | অনির্ধাবিত হিসাব | ২১,৬৫৩ | ৬.১ |
| | মোট আয় | ৩,৫৪,২৬৮ | ১০০.০ |

| | ব্যয় | | |
|---|---|---|---|
| ১ | এস্টেটের জন্য সরকারকে প্রদত্ত রাজস্ব ও কর | ৮,৪৪০ | ২.৪ |
| ২ | ট্যাক্স, যেমন– পৌরকর, আয়কর, চৌকিদারি ট্যাক্স, ইত্যাদি[ক] | ১.২৫১ | ০.৪ |
| ৩ | এস্টেটের নিকট প্রাপ্য ঊর্ধ্বতন ভূস্বামীকে প্রদত্ত খাজনা ও কর | ১,৪৩,২৯২ | ৪০.৪ |
| | মোট (ক) | ১,৫২,৯৮৩ | ৪৩.২ |
| ৪ | ব্যবস্থাপনার আবর্তক ব্যয়, যেমন–ম্যানেজারের বেতন, সংস্থাপন, কাছারি ঘর নির্মাণ ও মেরামত, মামলার ব্যয়, পারিতোষিক[খ], ইত্যাদি | ৫৫,২২৬ | ১৫.৬ |

৪২. 'Village Note No 22 (Chhatiani)' appended to 'Kanakshar SSR 1903'.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৫ | জারপ, বন্দোবস্ত, পারমাপ ও বাটোয়ারা | ৭,৩৩৩ | ২.১ |
| | মোট (খ) | ৬২,৫৫৯ | ১৭.৭ |
| ৬ | ভূস্বামীর সাংসারিক ব্যয়, যার মধ্যে রয়েছে মালিক ও পরিবারের ভাতা, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান, ডাক্তারের ফি, ঔষধ, শিক্ষা ইত্যাদি | ৫৮,৮৭৩ | ১৬.৬ |
| | মোট (গ) | ৫৮.৮৭৩ | ১৬.৬ |
| ৭ | বিবিধ | ২,৫২১ | ০.৭ |
| ৮ | অনির্ধারিত হিসাব | ২৩,৬৭০ | ৬.৭ |
| | মোট (ঘ) | ২৬,১৯১ | ৭.৪ |
| ৯ | ঋণ পরিশোধ | ৭,৪১৭ | ২.১ |
| ১০ | বিনিয়োগ | ১৩,০৩৪ | ৩.৭ |
| ১১ | এস্টেট, দালানকোঠা ও অস্থাবর সম্পত্তির যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ[গ] | ২৫,৭৬১ | ৭.৩ |
| ১২ | স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয়ে দান, ভূসম্পত্তির উন্নয়ন প্রভৃতি | ৭,৪৫০ | ২.১ |
| | মোট (ঙ) | ৫৩,৬৬২ | ১৫.১ |
| | মোট ব্যয় | ৩,৫৪,২৬৮ | ১০০ |
| এক | মোট আয়- মোট (ক)= সর্বমোট খাজনা আয় | ২,০১,২৮৫ | ৫৬.৮ |
| দুই | এক - মোট (খ) = অবশিষ্ট খাজনা আয় | ১,৩৮,৭২৬ | ৩৯.২ |
| তিন | দুই- (গ) ও (ঘ) = উদ্বৃত্ত | ৫৩,৬৬২ | ১৫.১ |

উৎস: 'Table VI, Return No. XXXI,' appended to 'Final Report 1907.'

টীকা: ক মোট ৪,৩৯৪ টাকা কর এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

খ পারিতোষিক সম্পর্কে পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

গ চট্টোপাধ্যায়দের বসতবাটির উন্নয়ন ও জেলা শহরে একটি ভূসম্পত্তি কেনার জন্য এই অর্থ খরচ করা হয়েছিলো।

## ৪. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড

এস্টেটের আর্থিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনার জন্য দরকার ভূস্বামীদের নিজস্ব জমাখরচের খাতাকে গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করা, কারণ এ ব্যাপারে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের রেকর্ড ততোটা উপযোগী নয়। পরিশিষ্টে যেমন আলোচনা করা হয়েছে যে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের আর্থিক ব্যবস্থাপনার হালচাল স্বাধীন ভূস্বামীদের চেয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পৃথক ছিলো, যেমন— উচ্চ হারে খাজনা আদায়, উচ্চ হারের ব্যবস্থাপনা ব্যয়, উদ্বৃত্ত অর্থ কাজে লাগাতে কঠোর নীতি গ্রহণ, এবং বিবিধ খাতে প্রচুর

৪৩. পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। [পূর্ববাংলার ভূমি ব্যবস্থাপনা' গ্রন্থের পরিশিষ্ট কোর্ট অব ওয়ার্ডসের রেকর্ড সম্পর্কিত টাকা দেওয়া হয়েছে। পৃ: ২৫৭। – সম্পাদক।

পরিমাণ অর্থের সংস্থান।[৪৩] যেহেতু ব্যক্তিগত হিসাবের খাতাপত্র পাওয়া খুব কঠিন, সেহেতু কোর্ট অব ওয়ার্ডস প্রণীত বিভিন্ন আর্থিক প্রতিবেদনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ৩১ নং রিটার্নকে বিশ্লেষণের জন্য গ্রহণ করা যেতে পারে। এই প্রয়াসের উদ্দেশ্য একটি এস্টেটের আর্থিক বিষয়সমূহ সম্পাদন সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা প্রদান এবং এভাবে ভবিষ্যৎ গবেষণার স্থান চিহ্নিতকরণ ব্যতীত বেশি কিছু নয়।[৪৪]

৩১ নং রিটার্ন একটি আর্থিক প্রতিবেদন, কোর্ট অব ওয়ার্ডস যা রাজস্ব বোর্ডকে প্রতি বছর প্রদান করতো। কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ব্যবস্থাপনার অধীনে থাকার সময়ে কনকশর এস্টেটের যাবতীয় আর্থিক লেনদেনের পরিচয় সংবলিত ৩১ নং চূড়ান্ত রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে ১২ নং সারণিটি তৈরি করা হয়েছে।

আয়ের দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে কনকশর এস্টেটের শতকরা ৯০ ভাগ আয় ছিলো খাজনা থেকে। বাকি আয়ের অধিকাংশই অনির্ধারিত হিসাবের, যেখানে সরকারি জামিনের সুদ ছিলো মাত্র ২,৪০৬ টাকা। তাছাড়া খাজনা সম্পর্কিত আয়ের হিসাব-নিকাশ ৯.১৩ নং সারণিতে দেখানো হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, অধিকাংশ খাজনা-আয় প্রজাদের নিকট থেকে আসতো। লাভের হিসাবে সব ধরনের ভোগস্বত্বের চেয়ে রাজস্ব প্রদেয় ও লাখেরাজ ভূসম্পত্তির শতকরা ১৬ ভাগ বেশি ছিলো। তবে সামগ্রিক লাভের বিচারে পরের অংশ ছিলো খুবই সামান্য। অধিকন্তু, খাজনার চলতি দাবির মোট আদায়ের শতকরা হার মফস্বল খাজনার মোট বাৎসরিক আয়ের সাথে প্রায়ই সাদৃশ্যপূর্ণ, যা বেশি হলে ১০৪.০% দাঁড়ায়। এই হার শতকরা একশ' খাজনা হিসাবে ১৯,৬২৭ টাকা মোট খাজনা আদায়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো। খাজনা আদায়ের এই উচ্চ হার স্বাভাবিকভাবে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কঠোরতাকেই নির্দেশ করে।

ব্যয়ের হিসাবে উল্লেখযোগ্য হলো, কনকশর এস্টেটের শতকরা ৪৭.৫ ভাগ আদায়কৃত খাজনার টাকা সরকারকে ভূমিরাজস্ব হিসাবে এবং উর্ধতন ভূস্বামীদের খাজনা হিসাবে প্রদান করা হতো।[৪৫] এটাও মনে রাখা যেতে পারে যে, ট্যাক্স পরিশোধের বাধ্যবাধকতা তেমন কঠোর ছিলো না। ১২ নং সারণিতে প্রদর্শিত ট্যাক্সের হিসাবের সঙ্গে অন্যান্য করের পরিমাণ (৪,৩৯৪ টাকা) যোগ করা হলে, মোট ট্যাক্সের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫,৬৪৫ টাকা। এমনকি ভূমিরাজস্বকে যদি এক ধরনের ট্যাক্স হিসাবে গণ্য করা যায় তাহলে এখানে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায় না, তখন এই হিসাবে মোট ট্যাক্স হয় ১৪,০৮৫ টাকা, যা মোট আয়ের শতকরা ৪.০ ভাগ। খাজনা আয়ের উপর সামান্য ট্যাক্স নির্ধারণ ভূস্বামীদের প্রতি ঔপনিবেশিক শাসকদের গৃহীত নীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অতঃপর ১২ নং সারণির (ক)- তে উল্লেখিত মোট খাজনা আয়ের সঙ্গে মোট আয়ের হিসাবের তফাত কতটা, তা দেখা যেতে পারে। তাতে দেখা যায়, মোট খাজনা আয় মোট আয়ের শতকরা ৫৬.৮ ভাগ।

৪৪. পরবর্তী অধ্যায়সমূহ (১) খাজনার অভিহিত মূল্য, (২) উচ্চতর ভূস্বামীদের ভূমিরাজস্ব ও খাজনা প্রদান, এবং (৩) বকেয়া খাজনা ছাড়া অন্য কোনো আর্থিক অঙ্কের ব্যাখ্যা প্রদান করা থেকে আমরা বিরত থাকবো। [মূল গ্রন্থের জন্য প্রযোজ্য –সম্পাদক]

৪৫. অন্যান্য ভূস্বামীদের বেলাতেও এ ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত আলোচনার জন্য একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। [মূল গ্রন্থের জন্য প্রযোজ্য –সম্পাদক]

ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় (১২ সারণির ক্রমিক ৪ ও ৫) এই হার শতকরা ১৭.৭ উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে। কনকশর এস্টেট সম্পূর্ণভাবে খাস ব্যবস্থাপনায় ছিলো যা এই অবস্থার জন্য দায়ী। যাই হোক, অগ্রাহ্য করা যায় না যে খাস ব্যবস্থাপনা প্রাথমিক দৃষ্টিতে ব্যয়বহুল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এক্ষেত্রে বহুবিধ ক্ষতিপূরণ সুবিধাসমূহ ছিলো। খাস তত্ত্বাবধানে থাকলে ভূস্বামীদের পক্ষে সম্ভাব্য সর্বাধিক পরিমাণে খাজনার হার বাড়ানো সম্ভব হয়, এবং রায়তদের উপর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য মধ্যস্বত্বভোগীদের সমূলে উৎপাটন করা যায়। আমরা যদি মোট খাজনার আয়ের সাথে ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের পার্থক্য লক্ষ করি তাহলে দেখা যাবে যে বাদসাদ দিয়ে খাজনার আয় মোট আয়ের শতকরা ৩৯.২ ভাগ।

**সারণি ১৩: কনকশর এস্টেটের খাজনার আয়**

| | আদায় (ক) | পরিশোধ[ক] (খ) | অবশিষ্ট[গ/ক] (গ) | × ১০০ (ঘ) |
|---|---|---|---|---|
| রাজস্ব প্রদেয় ও লাখেরাজ ভূসম্পত্তি থেকে | ২৫,৫১৯ | ৮,৪৪০ | ১৭,০৭৯ | ৬৬.৯ |
| সব ধরনের ভোগস্বত্ব থেকে | ২,৯২,৭০৮ | ১,৪৩,২৯২ | ১,৪৯,৪১৬ | ৫১.০ |
| বাড়ি ভাড়া থেকে | ১,৩২২ | ০ | ১,৩২২ | ১০০.০ |
| মোট | ৩,১৯,৫৪৯ | ১,৫১,৭৩২ | ১,৬৬,৪৯৫ | ৫২.১ |

উৎস: 'Table 1, Return No. XXXI,' appended to 'Final Report 1907.'
টীকা: ক সরকার ও উর্ধতন ভূস্বামীদের প্রাপ্য।

তৃতীয়ত, ভূস্বামীদের সাংসারিক ব্যয়-এর মধ্যে রয়েছে ৩০ সদস্যবিশিষ্ট চট্টোপাধ্যায় পরিবারের ভরণপোষণ; তিনটি নাবালক সন্তানের লেখাপড়ার খরচ; দুইজন পাচক, দুইজন চাকর ও একজন চাকরাণীর বেতন; এবং শ্রাদ্ধ, বিবাহ, উপনয়ন, দুর্গা পূজা ইত্যাদি সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির ব্যয়।[৪৬] নিট খাজনা আয়ের শতকরা ৪২.২ ভাগ এতে খরচ হয়। চট্টোপাধ্যায়ের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে থাকলে এই খরচের হার হয়তো আরো বাড়তে পারতো।

অবশিষ্ট খাজনা আয় থেকে ১২ নং সারণির ৬, ৭ এবং ৮ ক্রমিকের অঙ্ককে বিয়োগ করে যা বাকি থাকে তাকে বলা যেতে পারে এস্টেট পরিচালনার উদ্বৃত্ত আয় বা লাভ। এ অঙ্ক মোট আয়ের শতকরা ১৫.২ ভাগ এবং খাজনা আয়ের শতকরা ৩৮.৭ ভাগ। কনকশর এস্টেট ছিলো বেশ আকর্ষণীয় একটি ভূসম্পত্তি, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

৪৬. Cllr. Far. to Cmmr. Dac., No 259/VIII-IG, 5 May 1891, BR, LR Dept., WAE Br., File 21 of 1891 (RRBR).

একই সারণির ৯ থেকে ১২ ক্রমিকসমূহে দেখানো হয়েছে কিভাবে এই উদ্বৃত্ত ৫৩,৬৬২ টাকা কাজে লাগানো হয়েছিলো। বিনিয়োগকৃত প্রায় ১৩,০০০ টাকার মধ্যে ১০,০০০ টাকা দিয়ে সরকারি ঋণপত্র ক্রয় করা হয়, যার সুদের পরিমাণ ছিলো ৮ বছরে ২,৪০৬ টাকা। অবশিষ্ট টাকা দিয়ে কিছু সম্পত্তি কেনা হয়, যথা—ফরিদপুর শহরে একখণ্ড জমি এবং ছোট একটা তালুক।[৪৭] ক্রমিক ১১-তে উল্লেখিত ২৫,৭৬১ টাকার মধ্যে ১৫,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছিলো ফরিদপুরের উল্লিখিত জমির উপর একটি পাকা বাড়ি নির্মাণের জন্য, যা বার্ষিক ১,০০০ টাকায় ভাড়া দেওয়া হয় এবং ৮০০ টাকা খরচ হয়েছিলো চট্টোপাধ্যায়দের বসতবাড়িতে একটি বৈঠকখানা নির্মাণ করতে।[৪৮] দান ও সম্পদ উন্নয়নের ব্যয় (ক্রমিক ১২) ছিলো খুব সামান্য। শ্যামাচরণের ধার করা কিছু টাকাও (৭,৪৭১ টাকা) এই উদ্বৃত্ত অর্থ থেকে পরিশোধ করা হয়। কনকশর এস্টেট এভাবে মোট পাঁচভাগে তার উদ্বৃত্ত খরচ করেছিলো: ঋণ পরিশোধ করে, সরকারি ঋণপত্র কিনে, ভূসম্পত্তির বিস্তারে শহরে অস্থাবর সম্পত্তির জন্য বিনিয়োগ করে, এবং নির্মাণ কাজে। এটি একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য যে, এই উদ্বৃত্ত টাকার অংশ কোনো উৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করা হয়নি। যাই হোক, বাংলার ভূস্বামীদের তুলনায় কনকশর এস্টেটের উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যবহারের বিষয়টি একটি নমুনা হিসাবে গ্রহণ করা যায় কি না তা ভবিষ্যৎ গবেষণার উপর নির্ভর করছে।

### ৫. সারসংক্ষেপ

কনকশর এস্টেটের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে উল্লিখিত প্রাথমিক বিশ্লেষণের উপসংহারে পৌঁছানো যেতে পারে

প্রাথমিক বিবেচনার বিষয়, এস্টেটটির উৎস ও গঠনপ্রক্রিয়া। চট্টোপাধ্যায়রা ছিলেন ভূস্বামী হিসাবে একটি নতুন প্রজন্ম। খুব সম্ভবত এর প্রতিষ্ঠাতা জগবন্ধু ছিলেন রাজস্ব বিভাগের অধস্তন কর্মচারি যিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন এবং তা জমি ক্রয়ে বিনিয়োগ করেন। খাজনা আয় ও মহাজনি ব্যবসায়ের মাধ্যমে তাঁর পুত্র শ্যামাচরণ পিতৃসম্পত্তির সঙ্গে কয়েকটি ক্ষুদ্র সম্পত্তি যুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন তাঁদের ভূসম্পত্তি বিস্তারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো এ রকম যে, তাঁরা কখনো রায়তি জোমজমি কেনেননি। অন্যভাবে বলা যায় যে, এটা পূর্বেই মেনে নেয়া যায় না যে রায়তি জোতজমির অবাধ হস্তান্তর অথবা তথাকথিত কৃষকদের পৃথকীভবনের সাথে চট্টোপাধ্যায়দের উত্থান জড়িয়ে ছিলো। অপরপক্ষে তাঁরা নিজেরাই তাঁদের এস্টেটে ঐ ধরনের হস্তান্তরকে নিষিদ্ধ করে তা রোধ করার চেষ্টা করেছিলেন। ভূস্বামী হিসাবে তাঁদের উদ্ভবের পটভূমি ছিলো খুবই সাধারণ: প্রথমত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের লৌহকাঠামোর অধীনে সুরক্ষিত ক্রমবর্ধিষ্ণু

৪৭. 'Final Report 1907,' parts. 10, 11l Cllr Far to Cmmr. D , No 43W, 28 Dec. 1903, BB LR Dept., WAE Br., File 855 of 1903 (RRBR).

৪৮. 'Final Report 1907', parts 11, 12

মধ্যস্বত্বায়ন; এবং দ্বিতীয়ত পণ্যসামগ্রীর মতো নানা ধরনের ভূসম্পত্তি নিয়ে গঠিত ভূমিবাজার। যে সময়ে বড় ধরনের ভূসম্পত্তি সুবিন্যস্তভাবে বৃত্তাবদ্ধ হয়ে গেছে, সেই বৃত্ত না ভেঙে বা রায়ত পর্যায়ের সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ না করেও চট্টোপাধ্যায়গণ নিজেদেরকে ভূস্বামীর মর্যাদায় উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এইসব বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে তাত্ত্বিকভাবে তাদেরকে জোতদার শ্রেণীর আধাসামন্তবাদী ভূস্বামীরূপে চিহ্নিত করা যায়।

পরবর্তী আলোচ্য বিষয় রায়তদের উপর কর্তৃত্ব করার জন্য চট্টোপাধ্যায়দের ক্ষমতার উৎস। সামন্ত প্রভুদের মতো চট্টোপাধ্যায়গণ প্রকাশ্যভাবে সশস্ত্র ছিলেন না। মেনে নেয়া যায় যে পিয়ন,কুলি ইত্যাদির ছদ্মবেশে তাঁরা কিছু শক্তিধর লোক পুষতেন, কিন্তু এদের সংখ্যা খুব একটা বেশি ছিলো না। আবার আধুনিক জাপানের আধাসামন্ত বাদী ভূস্বামীদের মতো জমি কিনে নিয়ে কৃষকদের আয়ত্তে রাখার ক্ষমতাও তাঁদের ছিলো না। এটা সত্য যে তাঁদের মহাজনি ব্যবসা ছিলো। এটিকে তাঁরা বৃহত্তর পরিমাপে রায়তি জোতজমি হস্তগত করার কৌশলরূপে ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু তা তাঁরা করেননি। তাঁরা হয়তো রায়তদের উপর তাঁদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য ঋণ প্রদান করতে পারতেন, কিন্তু তা দিয়ে তাঁর রায়তদের জোতজমি কিনে ফেলার পর্যায়ে যাননি।

এ থেকে মনে হয় না যে চট্টোপাধ্যায়দের কোনো ভিত্তি ছিলো না। তাঁদের কমপক্ষে তিনটি প্রধান ভিত্তি ছিলো যা রায়তদের উপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সমর্থন যুগিয়েছিলো। সর্বপ্রথম, চট্টোপাধ্যায়গণ অধিকাংশ রায়তদের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন, অধিক ছড়ানো ও হিসাবহীন ভূসম্পত্তির চেয়ে তাঁদের ছিলো সুসংগঠিত ও নিয়তাকার ভূসম্পত্তি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, পত্তনি রেগুলেশন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ঔপনিবেশিক ভূসম্পত্তি সম্পর্ক ভূস্বামীদের কর্তৃক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি দৃঢ় ভিত্তি হতে পারতো যদি ভূস্বামীগণ অতি নিপুণতার সাথে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেন। দ্বিতীয়ত, উচ্চবর্ণীয় হিন্দু হিসাবে রায়তদের উপর চট্টোপাধ্যায়দের সামাজিক, ধর্মীয় ও ব্যক্তিগত অধিকার ছিলো। বস্তুত, কালীপূজা খরচ, দুর্গা ভেট, রাজধুতি প্রভৃতি আবওয়াব আদায়ের সাফল্য তারই ইতিবাচক প্রমাণ। তদতিরিক্তি স্থানীয় সমাজ তাঁদের কর্তৃত্বকে শক্তিশালী করেছিলো। এলাকাটি ছিলো উচ্চ বর্ণের হিন্দু অধ্যুষিত, যার শীর্ষে ছিলেন কোলকাতার শক্তিশালী জমিদার কালীকৃষ্ণ ঠাকুর। খুব সম্ভবত এই সমাজিক স্তরবিন্যাসের ছত্রছায়ায় চট্টোপাধ্যায়দের মতো ক্ষুদ্র ভূস্বামীরা প্রজাদের উপর কর্তৃত্ব করতে পারতেন। তৃতীয়ত, এটা খুবই উল্লেখযোগ্য যে, আবাদি জমি ব্যতীত হাট, জলকর ও পতিত জমির মতো কিছু উপযোগী জমি চট্টোপাধ্যায়দের দখলে ছিলো। এই জমিগুলো রায়তদের নিয়ন্ত্রণ করার চাবিকাঠি হিসাবে ব্যবহৃত হতো।

তৃতীয়ত আলোচ্য বিষয় হলো, গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে চট্টোপাধ্যায়দের ভূমিকা অথবা আরো স্পষ্টভাবে বললে বলতে হয়, আলোচ্য পর্বে রায়তদের ক্ষুদ্র পণ্যের

উৎপাদনের প্রতি তাঁদের মনোভাব। ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁদের উদ্বৃত্ত অর্থের মাধ্যমে তাঁরা এর প্রতি কোনো রকম সহায়তা দান করেননি। বিপরীতভাবে তাঁরা গুড় উৎপাদনের উপর এক ধরনের কর (আউখ চর্চা) আরোপ করেছিলেন, যা অবশ্যই এর বিকাশের জন্য বাধাস্বরূপ ছিলো। উৎপাদনশক্তির উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা কেবলমাত্র শোষণই ছিলো না—বাধাস্বরূপও ছিলো।

শেষ পর্যন্ত আমরা দেখতে পেলাম, যুগপৎ অর্থনৈতিক ও ভূসম্পত্তি-সম্পর্কের দিক থেকে কনকশর এস্টেট ছিলো চমৎকার এবং নির্ঝঞ্ঝাট প্রকৃতির। এটা মনে রাখা ভালো যে, জমিদারিপ্রথা সব সময় বিশৃঙ্খল এস্টেট নিয়ে গঠিত হতো না, কনকশর এস্টেটের মতো ভালো উপাদানও তাতে থাকতো।

সূত্র : নারিয়াকি নাকাজাতো, 'পূর্ব বাংলার ভূমি ব্যবস্থা' (১৮৭০-১৯১০) [ড. স্বরোচিষ সরকার অনূদিত], ইউপিএল, ঢাকা, ২০০৪

**সংযোজন ৩***

# আন্দোলন সংগ্রামে ফরিদপুর

## আ.ন.ম আবদুস সোবহান

**ফারায়েজী আন্দোলন : হাজী শরিয়তুল্লাহ্**

বঙ্গের ফারায়েজী আন্দোলনের প্রবর্তক ফরিদপুরের হাজী শরিয়তুল্লাহ। তিনি ওহাবী মতে দীক্ষিত হয়ে বঙ্গে ফারায়েজী জামাত সৃষ্টি করে ওহাবী আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনই বঙ্গদেশে ফারায়েজী আন্দোলন নামে পরিচিতি লাভ করে।

ফারায়েজী আরবী শব্দ অর্থ অবশ্য পালনীয়। ইসলাম ধর্ম অনুসারে কোরান ও হাদিসের নির্দেশাবলী সমাজে প্রতিষ্ঠা করা মুসলমানদের অবশ্যই কর্তব্য। তিনি ইসলাম বিরোধী রীতি নীতি পরিত্যাগ করে মুসলমানদের প্রকৃত মুসলমান হতে উপদেশ দেন।

ইউলিয়াম হান্টার দি ইন্ডিয়ান মুসলমান গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন "বাংলা ব-দ্বীপের ধর্মান্ধ মুসলমানেরা ফারায়েজী নামে চিহ্নিত, ওহাবী নামে নয়। ... তারা নিজেদের বলে নও-মুসলমান এবং পূর্বদিকস্থ জেলাগুলিতে তাদের সংখ্যা অত্যাধিক।"

হাজী শরিয়তুল্লাহ ১৮২৮ সালে ঢাকায় নিজের মতবাদ প্রচার শুরু করেন। এই আন্দোলনের সূত্রপাত সৈয়দ নিসার আলী তিতুমীরের মুজাহিদ আন্দোলনেরও পূর্বে। হাজী শরিয়তুল্লাহ ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের অংশ হিসেবে এই আন্দোলনের শুরু করলেও এই আন্দোলন ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। তিনি শুধু ধর্মীয় সমাজ সংস্কারের ভূমিকায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেননি– ইংরেজ অধিকৃত এই উপমহাদেশকে দারুল হরব ঘোষণা দেন। তিনি বিধর্মী অধিকৃত দেশে মুসলমানদের জুমা ও ঈদের জামাত (ঈদুল ফেতর ও ঈদুল আজহা) জায়েজ নয় ফতোয়া দেন। ফলে তাঁকে ইংরেজ রাজশক্তির রোষানলে পড়তে হয়। তিনি প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেননি; কিন্তু তাঁর তৎকালীন 'দারুল হরব' বক্তব্য জনসাধারণের মধ্যে ইংরেজ বিরোধ জেহাদী মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সময়ে বৃটিশ শাসিত দেশকে সর্বপ্রথম দারুল হরব বলে ঘোষণা দিয়ে তিনি যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা ইতিহাসে অবিস্মরণীয়।

হাজী শরিয়তুল্লাহ প্রথমে তৎকালীন মুসলমান সমাজকে বেদাত থেকে মুক্ত করার জন্য সামাজিক সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। প্রতিবেশী হিন্দুদের দেখাদেখি মুসলমানেরা সেদিন পীর পূজা, মনসা পূজা, কবর পূজা, শীতলা পূজা ইত্যাদি করত। এসব শরিয়ত বিরোধী কাজ থেকে মুসলমান সমাজকে ইসলামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্যে হাজী শরিয়তুল্লাহ ধর্মীয় আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি

* ফরিদপুরের শিক্ষাবিদ-সাহিত্যিক, সরকারি রাজেন্দ্র কলেজের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক এবং বঙ্গবন্ধু সরকারি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ আ.ন.ম. আবদুস সোবহান 'ফরিদপুরের ইতিহাস' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। এতে বৃহত্তর ফরিদপুরের তথ্য সন্নিবেশনের দাবি করা হলেও মূল ফরিদপুরই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। তখন সকল রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কেন্দ্র ফরিদপুর ছিল বলে ওই গ্রন্থের প্রয়োজনীয় অংশ সংকলন করে 'আন্দোলন সংগ্রামে ফরিদপুর' নামে সংযুক্ত হল। –সম্পাদক

বিপুল সংখ্যক মুসলমানকে তাঁর নেতৃত্বে সংগঠিত করতে সমর্থন হন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি তাঁর নেতৃত্বে গঠিত ফারায়েজী জামাতকে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছিলেন। 'দারুল হরব' প্রশ্নে হাজী শরিয়তুল্লাহর সঙ্গে এদেশের আলেম সমাজের এক অংশের যে বিতর্কের সৃষ্টি হয় তা বঙ্গের মুসলিম সমাজে ধর্মীয় আন্দোলনে বেশ জটিলতার সৃষ্টি করে।

হাজী শরিয়তুল্লাহ প্রথমে নিজের জেলা ফরিদপুরে তার ধর্মীয় আন্দোলনের কাজ শুরু করেন। পরে তিনি তাঁর কর্মকেন্দ্র ঢাকা জেলার নয়াবাড়ী নামক স্থানে স্থানান্তরিত করেন। হাজী শরিয়তুল্লাহ রাজনৈতিক আন্দোলনে অবতীর্ণ না হলেও বৃটিশ ভারতের পূর্বাঞ্চলে তিনিই জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্র তৈরি করে গেছেন। ইংরেজ শাসিত দেশকে দারুল হরব ঘোষণা করে তিনি সেদিন প্রকৃত পক্ষে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে দরিদ্র চাষিদের মধ্যে বিপ্লবের আগুনই জ্বালিয়েছিলেন।

হাজী শরিয়তুল্লাহ মাদারীপুর জেলার শিবচর থানার বাহাদুর পুরের শামাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আব্দুল জলিল তালুকদার। আঠারো বছর বয়সে তিনি মক্কায় যান। সেখানে তিনি বিশ বছর অবস্থান করে ইসলাম বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। অতঃপর ১৮০৩ সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন। ওহাবী মতে দীক্ষালাভ করে দেশে ফিরে এসে তিনি তাঁর ফারায়েজী আন্দোলন শুরু করেন। অত্যল্প সময়ে বহু সংখ্যক দরিদ্র চাষি মুসলমান তাঁর ফারায়েজী জামাতভুক্ত হয়। বাংলাদেশ থেকে আসাম প্রদেশ পর্যন্ত ফারায়েজী আন্দোলনের প্রসার ঘটে। পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর, বাখরগঞ্জের দু'ভাগের একভাগ এবং ঢাকার এক তৃতীয়াংশ মুসলমান তার অনুসারি ছিলেন। ১৮৪০ সালে এই মহান ব্যক্তিত্বের জীবনাবসান ঘটে। হাজী শরিয়তুল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র মহসীন উদ্দিন আহমেদ দুদু মিঞা ফারায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

## ফারায়েজী আন্দোলনে পীর দুদু মিয়া

হাজী শরিয়তুল্লাহ পুত্র মহসীন উদ্দিন আহমেদ ইতিহাসে পীর দুদু মিয়া নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। পিতার মৃত্যুর পরে পীর দুদু মিয়া ফারায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৮১৯ সালে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। অল্প বয়সে তিনি মক্কা যান। মক্কা থেকে ফিরে এসে তিনি পিতার প্রতিষ্ঠিত ফারায়েজী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন এবং নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি গোটা পূর্ববঙ্গকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করে প্রতি অঞ্চলে একজন করে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন।

তিনি হাজী শরিয়তুল্লাহর ফারায়েজী আন্দোলনকে ধর্মীয় আন্দোলন থেকে একটি রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত করেন। তিনি পিতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই দেশকে দারুল হরব বলে ঘোষণা করেন এবং ইংরেজ শক্তির উৎখাতের উদ্দেশ্যে জেহাদ ঘোষণা করেন। তিনি জনসাধারণকে বৃটিশ সরকারের আদালত বয়কট করতে উদ্বুদ্ধ করেন এবং গণআদালত প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জমিদার ও নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তিনি ঘোষণা করেন জমির মালিক আল্লাহ– অতএব খাজনা নেয়ার অধিকার কারো নেই। এই ঘোষণার ফলে কৃষক প্রজারা দলে দলে পীর দুদু মিয়ার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর নেতৃত্বে ইংরেজ সরকার, নীলকর সাহেব ও হিন্দু-মুসলিম সামন্ত শ্রেণীর

বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। এই অবস্থায় ইংরেজ সরকার এবং তার বশংবদ শক্তি সমূহ পীর দুদু মিয়াকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। পীর দুদু মিয়ার জেহাদের ডাকে বঙ্গদেশের ঢাকা, ময়মনসিংহ, বাখরগঞ্জ, পাবনা ও আসাম প্রদেশের সিলেট জেলার দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে বিক্ষোভের আগুন জ্বলতে শুরু করে।

১৮৪০ সালের দিকে পীর দুদু মিয়ার নেতৃত্বে ফারায়েজী আন্দোলন প্রচণ্ড রূপ লাভ করে। এ সময়ে গ্রামাঞ্চলে পীর দুদু মিয়ার এক একজন প্রচারকের পেছনে প্রায় আশি হাজার অনুসারি থাকত। "১৮৪০ সালে সম্প্রদায়টি এমন দুর্দান্ত স্বভাবের হয়ে ওঠে যে, সরকার কর্তৃক বিশেষ তদন্তের দরকার হয়ে পড়ে।"

১৮৫৭ সালে পীর দুদু মিয়ার ফারায়েজী আন্দোলন বৃহত্তর মুজাহিদীন আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ প্রসঙ্গে উইলিয়াম হান্টার বলেন, "শেষের দিকে খলীফারা বিশেষত ইয়াহ্ ইয়া আলী নিম্ন বঙ্গের ফারায়েজীদেরকে উত্তর ভারতের ওহাবীদের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছিলেন। আর গত তের বৎসর ধরে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত হিসাবে এবং বিচার লাভের কাঠগড়ায় আসামী হিসাবে তাদেরকে সমানভাবে থাকতে দেখা গেছে।"

পীর দুদু মিয়া ইংরেজ শক্তির সমর্থক নীলকর সাহেব ও ধণিক জমিদার শ্রেণীর সাথে কয়েকটি সংঘর্ষে লিপ্ত হন। প্রজাদের মধ্যে ভীতি সঞ্চয়ের জন্যে জমিদার শ্রেণী কৃষক দলপতিদের নামে একটির পরে একটি মিথ্যে মামলা দায়ের করতে থাকে। পীর দুদু মিয়ার নামেও নানা অপরাধের অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করা হয়। এক সূত্রে জানা যায়, পীর দুদু মিয়ার নামে ১৮৩৮, ১৮৪২, ১৮৪৪, ১৮৪৬ সালে ক্রমান্বয়ে মামলা দায়ের করা হয়। এসব মামলায় পীর দুদু মিয়া সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে বেকসুর খালাস হয়ে যান। কারণ ইংরেজ সরকার তার বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো সাক্ষ্য দিতে সমর্থ হননি। পীর দুদু মিয়ার 'দারুল হরব' প্রশ্নের মুসলমান আলেম সমাজের মধ্যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়। প্রখ্যাত মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরীর সঙ্গে পীর দুদুমিয়ার মতভেদ দেখা দেয়। মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী জীবনী গ্রন্থে বলা হয় ১২৭২ হিজরিতে বরিশালে লাজুমাদের পীর দুদু মিয়ার দলিল দিতে অক্ষম হয়ে জুমা পড়তে অস্বীকার করে পালিয়ে যান। হাজী শরিয়তুল্লাহর খলিফা আবদুল জব্বার মাদারীপুরে জুমা বিষয়ে তর্কে অবতীর্ণ হতে চেয়েও পলায়ন করে। ১২৮২ হিজরিতে বরিশাল শহরের আবদুল জব্বার বাংলাদেশে জুমা জায়েজ বলে স্বীকার করে পরে জুমা না পড়ে পালিয়ে যান। পীর দুদু মিয়াও তাঁর অনুসারীরা জুমার বিষয়ে খুব কঠিন মনোভাব পোষণ করতেন। ফলে ক্ষেত্র বিশেষে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তবে একথা বলা যায় এই সব বাহাছের ফলে পীর দুদু মিয়ার মূল রাজনৈতিক আন্দোলন বাধা প্রাপ্ত হয়েছিল।

পীর দুদু মিয়া এদেশকে দারুল হরব বলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন। ধর্মীয় সংস্কারের মধ্যে আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ না রেখে আন্দোলনকে একটি রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত করেন। তিনি ছিলেন স্বাধীনতাকামী একজন বিপ্লবী নেতা স্বাধীনতার প্রশ্নে তিনি 'দারুল হরব' তত্ত্বকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। পক্ষান্তরে মওলানা কেরামত আলী ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক পীর। তিনি তবলিগের মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে হেদায়েত করতে চেয়েছিলেন। মওলানা কেরামত আলী ফারায়েজীদের খারেজী বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। এই দ্বন্দ্বের ফলে

ইংরেজ সরকারের যে সুবিধা হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। ১৩৩৯ হিজরিতে মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরীর নিম্ন বর্ণিত খলিফারা ফরিদপুরে তবলিগের কাজে যুক্ত ছিলেন-তাঁরা হচ্ছেন মওলবী আবদুল আজিজ (কেরামত আলীর উর্দু গ্রন্থসমূহের বঙ্গানুবাদ ও প্রচার করতেন-রুহুল মুফছেদীন, দরবেশ নামা, আদুরারুচ্ছালাৎ প্রভৃতি তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ), শাহ ওয়াজেদ আলী (মসজিদের ইমাম), মুন্সী আজিজুর রহমান, মুন্সী হাজী রহিম উদ্দিন প্রমুখ।

অন্যদিকে পীর দুদু মিয়ার পক্ষে মৌলবী আবদুল জব্বার, মৌলবী ইসমাইল খান, পরাধীন দেশে জুমা জায়েজ না এই মতবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ধর্মীয় বিতর্কে অংশ গ্রহণ করতেন। এঁরা দু'জনেই উর্দু ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন গেছেন।

১৮৫৭ সালে ইংরেজ সরকার পীর দুদু মিয়াকে গ্রেফতার করে আলীপুর জেলে বন্দি করে রাখেন। ১৮৬০ সালে বন্দিদশায় স্বাধীনতাকামী এই বিপ্লবী বীরের মৃত্যু হয়।

পীর দুদু মিয়ার গ্রেপ্তার ও মৃত্যুর মধ্যদিয়ে ফারায়েজী আন্দোলনের রাজনৈতিক চরিত্রের বিলুপ্তি ঘটে। পীর সাহেবের পুত্র মওলানা ছায়িদ উদ্দিন আহমদ (৩য় গদিনসীন) ধর্মীয় সংস্কারের মধ্য দিয়ে ফারায়েজী আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। মওলানা সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র খালেদ রশিদ উদ্দিন বাদশা মিয়া গদ্দীনশীন (৪র্থ) হন। তিনি পীর বাদশা মিয়া নামে পরিচিত ছিলেন।

তিনি অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে ইংরেজ সরকারের বিরোধিতা করেন। এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে তিনি কারাবরণও করেন। তিনি রাজনৈতিক মহলে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি মুসলিমলীগে যোগদান করেন এবং পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। পীর সাহেব আঞ্জুমানে রশিদুল ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শেরেবাংলা এ, কে, ফজলুল হক প্রতিষ্ঠিত কৃষক প্রজা পার্টির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পীর বাদশাহ মিয়া দু'বার হজ্বব্রত পালন করেন। ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন।

এই বংশের পঞ্চম গদিনশীন হচ্ছেন পীর মোহসীন উদ্দীন আহমদ দুদু মিয়া। হাজী শরিয়তুল্লাহ পীর প্রথার প্রবর্তন না করলেও তাঁর পুত্র দুদু মিয়া পীর প্রথার প্রবর্তন করেন। সেই থেকে ফারায়েজী আন্দোলন একটি আস্তানা বা খানকায় পরিণত হয়েছে। পীর দুদু মিয়া (দ্বিতীয় দুদু মিয়া) ইসলাম ধর্মের প্রচারের সঙ্গে রাজনৈতিক তৎপরতার পরিচয় দিয়ে সুধী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হন।

১৮৭০ সালে ২৩ শে নভেম্বর ফরিদপুরের রাজাপুরের নবাব আবদুল লতিফ মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। নবাব আবদুল লতিফ ছিলেন একজন আপোষকামী নেতা। তিনি ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করে বঙ্গের মুসলিম সমাজের কল্যাণে আগ্রহী ছিলেন। উক্ত সোসাইটি থেকে ভারত বর্ষকে দারুল ইসলাম বলে ঘোষণা করা হয়।

ফরিদপুরের নবাব আবদুল লতিফ ও উত্তর ভারতের স্যার সৈয়দ আহমদ একই সময়ে একই ধরণের আন্দোলন শুরু করেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নবাব আবদুল লতিফ স্যার সৈয়দ আহমেদের ও পূর্বগামী ছিলেন। স্যার সৈয়দ আহমেদ যে আন্দোলন করেন উত্তর ভারতে নবাব আবদুল লতিফ অনুরূপ আন্দোলন করেন বঙ্গদেশে। নবাব

আবদুল লতিফের উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে পশ্চাতপদ মুসলিম সমাজকে অগ্রসর করা ও ইংরেজদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করা। এভাবেই তিনি বঙ্গের মুসলমানদের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেন।

**নীল বিদ্রোহ**

প্রাচীন ভারতে নীল তৈরি করে নানা দেশে রপ্তানি করা হতো। বঙ্গদেশে ১৭৭৭ সালে লুই বান্নো নামে একজন ফরাসি প্রথম আধুনিক প্রণালীতে তৈরি শুরু করে।

ইংরেজদের মধ্যে কারোল ব্লুম ১৭৭৮ সালে বঙ্গদেশে প্রথম নীলকুঠি স্থাপন করেন। ১৭৭৯ সালে কোম্পানির সরকার সাধারণ ভাবে প্রত্যেক ইউরোপীয়কেই বঙ্গ ও বিহারে নীলচাষের অধিকার দেয়। বঙ্গে নীলচাষের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে নীলচাষিদের ওপর নীলকরদের অত্যাচার শুরু হয়।

১৮৩৩ সালের সনদে ইউরোপীয়রা বঙ্গদেশে জমি কিনে জমিদার রূপে বসবাস করবার অধিকার অর্জন করে। ফরিদপুরের গড়াই, মধুমতি, বারাসিয়া, চন্দনা, কুমার প্রভৃতি নদীর তীরবর্তী জমিতে নীল চাষ শুরু হয়। ইংরেজ নীলকুঠি সাহেব ও অনেক স্থানীয় জমিদার জেলার নানা স্থানে উৎসাহের সঙ্গে বহু নীল কুঠি স্থাপন করেন। এসব নীল করেরা ছিলেন কাণ্ডজ্ঞান বর্জিত অত্যাচারী। প্রথম যুগে এদের চরিত্র সম্পর্কে অনেকেরই স্পষ্ট ধারণা ছিল না।

১৮২৯ সালে রাজা রামমোহন রায় এবং ১৮৩০ সালে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর নীলকরদের অত্যাচারকে আকস্মিক ঘটনা বলে ধরে নিয়েছিলেন। নীলকরদের এলাকায় লোকে সুখে শান্তিতে বাস করছে। এভাবে নীল চাষের প্রথম যুগে হিন্দু সমাজের প্রধানদের নীল কুঠিয়ালদের সমর্থন করতে দেখা যায়।

নীল কুঠিয়ালদের মধ্যে ইংরেজরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ– বাকী ছিলেন হিন্দু জমিদার শ্রেণীর লোক।

নীল ব্যবসায় ছিল এক প্রকার জমিদারি। উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে বঙ্গে প্রায় পাঁচ লক্ষ একর জমিতে নীল চাষ হতো। নীলকর সাহেব ও জমিদারদের অত্যাচারের ফলে বঙ্গদেশে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে, নীলচাষিরা নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

রামগোপাল ঘোষের পুস্তিকায় নীলকরদের অমানুষিক অত্যাচারের কথা বিবৃত হয়েছে। তিনি লিখেছেন :

> "আমি বাংলাদেশের প্রায় সকল জেলায়ই গিয়াছি। প্রায় প্রত্যেক জায়গায়ই দেখিয়াছি– যেখানে প্রজারা শান্তিপুর্ণভাবে কাজ-কর্ম করিতে সম্মত সেখানেও নীলকরগণ গায়ের জোরে সব কাজ হাসিল করিতে উদ্যত। জোর পূর্বক শস্যাদি কাটিয়া লইবার অভিযোগ প্রায়ই আমার কর্ণগোচর হইয়াছে আবার লাঠিয়ালদের সাহায্যে গরীব চাষীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও জমি চাষ করাইবার কথাও শুনিয়াছি। নিরা-পরাধ চাষীদের সপরিবারে ধরিয়া লইয়া গিয়া আটক রাখার এবং মারপিট করিয়া কাহারও কাহারও মৃত্যু ঘটাইবার সংবাদ ও পাইয়াছি। ঘর-বাড়ী ধূলিসাৎ করা, গ্রামকে গ্রাম পুড়াইয়া দেওয়া, বন্দুকের গুলিতে নিরীহ প্রজাদের জীবন লওয়া– এ সকলও শুনিতে পাই"।

এই নীল করদের অত্যাচার সম্পর্কে উপলব্ধি করা যায় ইংরেজের ভাষ্যে। তিনি ১৮৪৮ সালে ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন– নাম জেলাতুর সাহেব। তিনি নীল কমিশনের সাক্ষ্যে উল্লেখ করেন যে "এমন একটি নীলের বাক্স ইংল্যান্ডে গিয়া পৌঁছায় না যা বাংলার কৃষকদের রক্তে রঞ্জিত।"

১৮৬০ সালের দিকে নীল কুঠিয়ালদের অত্যাচার আরও চরমে ওঠে। নীলকরদের মধ্যে বহু ধনী লোক ছিলেন। স্যার জেমস ওয়ারলিপ সাহেব তার মধ্যে একজন। তিনি ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গায়, মীরগঞ্জ গ্রামে প্রধান কুঠি স্থাপন করেন। এ জেলার ৫২টি নীলকুঠি এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রধান ম্যানেজার ছিল ডানলফ সাহেব। তিনি ১৮১২ থেকে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত ম্যানেজারি করেন। তিনি প্রজাদের ভীষণ অত্যাচার ও উৎপীড়ন করতেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে নীল কুঠিয়ালদের অত্যাচার নানাভাবে প্রকাশ পেতে থাকে।

ফরিদপুরের নবাব আবদুল লতিফ ছিলেন খুলনার সাতক্ষীরা মহকুমার হাকিম। তিনি ইংরেজদের সমর্থক একজন আমলা হয়েও নীলকরদের অত্যাচারে নীরব থাকতে পারেননি। তিনি নীল কুঠীয়ালদের অত্যাচার উৎপীড়নের বিষয় বৃটিশ সরকারকে অবগত করান এবং অনতিবিলম্বে প্রতিকার দাবি করেন। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' ১৮৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। নবাব আবদুল লতিফ এর ছ' সাত বছর পূর্বে ১৮৫৩ সালে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে নীলচাষীদের অবস্থা গোচরীভূত করেন। ফরিদপুরের মীর মোশাররফ হোসেন ১৮৯০ সালে লেখা উদাসীন পথিকের মনের কথায়' নীল আন্দোলনের উল্লেখ করেছেন। বাংলা লাট গ্রান্ট সাহেব ফরিদপুরের গড়াই কুমার নদী দিয়ে স্টিমারে গমন কালে প্রায় দু লক্ষ প্রজা তার কাছে নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করে।

তিনি আশ্বাস দেন যে, নীলকরদের হাত থেকে প্রজাদের রক্ষা করার ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ প্রসঙ্গে মিশির কুমার লিখেছেন ঃ-

> "নীল বিদ্রোহের সময় মুসলমান প্রজারা কী সাহস ধৈর্য ও অধ্যবসায়ই দেখায়। সেবার অবিচলিত চিত্তে তাহারা কী-না সহ্য করেন। গড়াই নদীর এখন অত্যন্ত দুর্দশা। যখন নীলের গোলমাল হয় তখন গড়াই পদ্মার ন্যায় বেগবতী ছিল। লে গবর্ণর গ্রান্ট এই গড়াই নদীর মধ্যে দিয়ে ষ্টিমারযোগে গমন করিতেছেন। নদীর দুই ধারে সহস্র সহস্র প্রজারা হাতে দরখাস্ত লইয়া ক্যাপ্টেনকে জাহাজ লাগাইতে বলিতে লাগিল। লে. কোনমতে জাহাজ নদীর তীরে লাগাইলেন না শত শত প্রজা নদীতে লম্ফ প্রদান করিল। গড়াইর মহাবেগ গণ্য করিল না। তখন তাহারা নীলের অত্যাচার হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে সংকল্প করিয়াছে, তাহার নিমিত্ত তাহাদের প্রাণ সংকল্প। প্রজাদিগকে নদীতে লম্ফ প্রদান করিতে দেখিয়া লে. গবর্ণর জাহাজ লাগাইতে বাধ্য হইলেন। প্রজারা জাহাজ ঘিরিয়া ফেলিল এবং গ্রান্ড সাহেবকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইল যে, তিনি তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন।"

১৮৫৮ সালে সিপাহী অভ্যুত্থানের পরে নীলকরদের অত্যাচার বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রজা সাধারণেব ধৈর্যচ্যুতি ঘটে এবং তারা সংঘবদ্ধভাবে নীলকরদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ১৮৫৮ সালে লক্ষ লক্ষ নীলচাষি বঙ্গদেশে ধর্মঘট করে। নীল প্রধান অঞ্চলে যেমন

যশোর, নদীয়া, ফরিদপুর, পাবনা, রাজশাহীতে এই ধর্মঘট[৬] সর্বাত্মক রূপলাভ করেছিল। নীল কুঠিয়ালদের অত্যাচার ও প্রজাদের প্রতিরোধ আন্দোলন পরবর্তী দুবছর ধরে অব্যাহত ছিল।

১৮৫৯ সালের মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন মাসে এই বিদ্রোহ নদীয়া, যশোর, পাবনা, রাজশাহী ও ফরিদপুরে আরও ব্যাপক ও মারাত্মক রূপ ধারণ করে। এই আন্দোলন ১৮৬০ সাল পর্যন্ত চলতে থাকে। এই ঘটনাই ইতিহাসে নীল বিদ্রোহ নামে উল্লেখ্য। এই নীল বিদ্রোহেই এদেশের হিন্দু মুসলমান প্রজা সাধারণ সর্বপ্রথম রাজনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে বঙ্গদেশে কোম্পানির শাসনকালে নীলবিদ্রোহ হচ্ছে প্রথম গণআন্দোলন।

ফরিদপুরের হাজী শরিয়তুল্লাহর পুত্র পীর দুদু মিয়া শুধু পিতার ফারায়েজী আন্দোলনেই নেতৃত্ব দেননি– তিনি নীলকর সাহেব ও জমিদারদের বিরুদ্ধে চাষিদের পক্ষে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। বস্তুতপক্ষে হাজী শরিয়তুল্লাহর সংস্কারমূলক ফারায়েজী আন্দোলন পীর দুদু মিয়ার হাতে রাজনৈতিক চরিত্র লাভ করেছিল। তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে, কুঠিয়াল সাহেব ও জমিদারদের বিরুদ্ধে দুর্দশাগ্রস্থ চাষিদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাদের ভীষণভাবে ক্ষেপিয়ে তোলেন। পীর দুদু মিয়ার সাংগঠনিক শক্তি ছিল প্রবল। তিনি সমগ্র পূর্ববঙ্গকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করে প্রতি অঞ্চলে একজন করে প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। পীর দুদু মিয়া পরিচালিত জমিদার নীলকরদের বিরোধী আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের রূপান্তরিত হয়। পীর দুদু মিয়া তার শিষ্যদের মধ্যে সাম্যবাদের আদর্শ প্রচার করেছিলেন। তিনি জমিদারদের খাজনা দাবীর বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। তিনি ঘোষণা করেন সমুদয় জমির মালিক আল্লাহ। সুতরাং খাজনা পাবার অধিকার কারো নেই। এই ঘোষণায় জমিদার নীলকরেরা দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেও হৃত সর্বস্ব রায়তদের সমর্থন তিনি পেয়েছিলেন। ১৮৬৮ সালের ৩রা সেপ্টেম্বরের 'অমৃত বাজার' পত্রিকার সাহায্যে দুদু মিয়ার শক্তি সম্পর্কে জানা যায়। এই পত্রিকায় লেখা হয় : "কালে তার প্রভাব এতদূর বৃদ্ধি হয় যে, তিনি মনে করিলে ৫০ (পঞ্চাশ) সহস্র লোক সংগ্রহ করিতে পারিতেন।"

এ কারণে ১৮৪৬ সালে জমিদার ও নীলকুঠিয়ালরা সংঘবদ্ধ হয়ে সুযোগ বুঝে দুদু মিয়ার বাড়ি লুট করে। এতেই তারা ক্ষান্ত হয়নি। দুদু মিয়ার নামে একাধিক মিথ্যে মামলা দায়ের করে। সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কিছু না বললেও দুদু মিয়ার কর্মকাণ্ড ছিল ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে। গভর্ণমেন্ট তাঁকে ভয় করতেন। তাই সুযোগ পেয়ে ১৮৪৭ সালে তাঁকে সেসন আদালতে দণ্ডিত করা হয়। ১৮৮৫ সালে সিপাহী বিপ্লবের সময় গভর্ণমেন্ট দুদু মিয়াকে আলীপুরের জেলে বন্দি করে রাখেন। এখানেই বন্দিদশায় ১৮৬০ সালে এই বিপ্লবীর মৃত্যু ঘটে। পীর দুদু মিয়ার আন্দোলন পিতা প্রবর্তিত ফরায়েজী আন্দোলন ছিল না– তাঁর আন্দোলন ইংরেজ কুঠীয়াল, নীলকর জমিদার ও সামন্তবাদীদের বিরুদ্ধে প্রবাহিত হয়েছিল। এক কথায় ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে একটা মারাত্মক চ্যালেঞ্জ ছিলেন ফরিদপুরের পীর দুদু মিয়া।

পীর সাহেবের সমর্থকেরা ফরিদপুরের বহু স্থানে নীলকুঠি আক্রমণ করেছিল এবং জমিদারদের কাছারি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল। পীর সাহেবের সমর্থকদের সঙ্গে

ফরিদপুরসহ অন্যান্য জেলায় স্থানীয়ভাবে বহু সংঘর্ষ নীলকর জমিদারদের ঘটেছিল।

ফরিদপুরে বহু নীলকুঠি স্থাপিত হয়েছিল। এসব নীলকুঠি সাহেবদের সঙ্গে নীলচাষিদের স্থানীয়ভাবে বহু সংঘর্ষ হয়েছে। কাশিয়ানী থানা পাথরঘাটার মহিম চন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে লোহাগড়ার মকিমপুরের নীল কুঠীতে নীলচাষিরা আক্রমণ করেছিল। এই দাঙ্গার প্রজাদের তিনজন বন্দুকের গুলিতে নিহত হয় মহিমচন্দ্র ও তার সঙ্গীদের কারাদণ্ড হয়।

ফরিদপুরের বালিয়াকান্দীর সোনাপুরের শত শত চাষি নীল আন্দোলনে এক সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেছিল। এই আন্দোলনের প্রধান ছিলেন সোনাপুরের চাষি হাশেম আলী।

ফরিদপুরের নড়াইলের জমিদার রামরতন বহু নীল কুঠি স্থাপন করেন। এ সময় নীলকুঠীতে বহু দাঙ্গা হাঙ্গামা সংঘটিত হয়। ফরিদপুরের বহুস্থানে নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি বিদ্যমান। এই সেদিন পর্যন্ত ফরিদপুরের জেলা প্রশাসকের বাংলার সন্নিকটে নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ দৃশ্যমান হতো।

নীলচাষিদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের কারণে বৃটিশ সরকার শেষ পর্যন্ত নীল কমিশন বসান। কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হলে সরকার রিপোর্টের আলোকে কোনো রূপে আইন প্রণয়ন না করলেও নীলচাষ স্বেচ্ছাধীন বলে মোটামুটি স্বীকৃত হলো।

**সন্ত্রাস-বিপ্লব অনুশীলন-যুগান্তর ও কমিউনিস্ট পার্টি (১৯০৬-১৯৪৭)**

দ্বিতীয় লর্ড মিন্টো (১৯০৫-১০) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন রোধ করার উদ্দেশ্যে দমন নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। ফলে প্রকাশ্য পথ পরিত্যাগ করে আন্দোলন পরিচালিত হয় গুপ্ত পথে। বৃটিশ ভারতের এইভাবে সন্ত্রাস ও বিপ্লববাদের শুরু। বস্তুত কংগ্রেসের ইংরেজদের সঙ্গে আপোষকামী মনোভাবে বীতশ্রদ্ধ হয়ে এবং এই আবেদন নিবেদনের রাজনীতিতে ভারতের স্বাধীনতা সুদূর পরাহত মনে করে সন্ত্রাসবাদের অনেকে আগ্রহী হয়ে উঠে।

১৯০৬ সালে কলকাতায় ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্রের উদ্যোগে বাংলায় প্রথম গোপন বিপ্লবী দল অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতির সভাপতি, সহসভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ হন যথাক্রমে প্রমথ নাথ মিত্র, চিত্তরঞ্জন দাশ ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সমিতির লক্ষ্য ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা। অনুশীলন সমিতির সদস্যদের প্রকাশ্যভাবে লাঠিখেলা, অসিখেলা, কুস্তি, মুষ্ঠিযুদ্ধ ইত্যাদি এবং চরিত্র গঠনের শিক্ষা দেয়া হতো। একটি অংশকে নির্বাচিত করে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্যে প্রস্তুত করা হতো। এই সমিতির সঙ্গে ক্রমে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ যুক্ত হন। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম শুধু বিদ্রোহাত্মক কবিতা গান রচনা করেননি। বিদ্রোহীদের প্রতি তাঁর ছিল শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে অনুশীলন দলভুক্ত একদল বিপ্লবী দেশবাসীকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে 'যুগান্তর' নামের একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলার গোপন বিপ্লবীদের অন্যতম যুগান্তর দল গড়ে ওঠে। অতঃপর পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব বাংলায়

ক্রমে ক্রমে অনুশীলন ও যুগান্তর দলের শাখা বৃদ্ধি পেতে থাকে। যুগান্তর আর অনুশীলন এই দু'টি বিপ্লবী দলেরই আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীন ভারতের প্রতিষ্ঠা করা। অনুশীলন সমিতির পূর্ব বাংলার কার্যভার মাদারীপুর লোনসিং গ্রামের ডেপুটি বাড়ির পুলিনবিহারী দাসের ওপর ন্যস্ত করা হয়। পরবর্তীকালে এই পূর্ববঙ্গ কেন্দ্রের কর্মতৎপরতাই সমগ্র ভারতের এবং ব্রহ্মদেশে বিস্তার লাভ করে।

অনুশীলন সমিতির ফরিদপুর শাখায় পুরান মাদারীপুর মহকুমার বিলাসখান গ্রামের আশুতোষ কাহেলী, জীবন ঠাকুরতা, নলিনী ভট্টাচার্য, চিত্ত কাহেলী, ধীরেন আতর্থী, সুবোধ রায়, কোঁয়ারপুরের কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত, ফতেজংপুরের ধীরেন চট্টোপাধ্যায়, শলেদাহের দীনেশ বিশ্বাস, আশু চক্রবর্তী, ভুবন বসু, পালং এর শচীন কর, প্রমথ গুহ, প্রমথ সরকার, ফরিদপুর শহরের নিবারণ পাল, রমেশ দাশগুপ্ত, যাদু পাল, তারাপদ লাহিড়ী, দীনেশ দাশগুপ্ত প্রধান ছিলেন। অনুশীলন সমিতির পি মিত্র ও পুলিন দাস গঠনমূলক কাজের প্রতি বেশি জোর দেওয়ায় বারীন্দ্র ঘোষের সঙ্গে তাদের মতবিরোধ হয় এবং বারীন্দ্র ঘোষ চরমপন্থীদের একত্র করে যুগান্তর দল গঠন করেন। এই যুগান্তর দলই অনুশীলন দল অপেক্ষা বোমা তৈরী এবং হিংসাত্মক কর্মকাণ্ডে অধিক মনোনিবেশ করে। পরবর্তীকালে এই দল থেকেই উগ্র বিপ্লবপন্থী বি,ভি, অর্থাৎ বেঙ্গল ভলান্টিয়ার দল গঠিত হয়। ফরিদপুরে এই যুগান্তর দলের পৃষ্ঠপোষক ও প্রধান ছিলেন ইশবপুরের খ্যাতনামা পূর্ণচন্দ্র দাস। পূর্ণচন্দ্র দাসের দলে খালিয়ার কালী ব্যানার্জী, কোটালীপাড়ার বিজয় চক্রবর্তী, মাদারীপুরের পঞ্চানন চক্রবর্তী, বিজয়ানন্দ দত্ত, প্রফুল্ল চট্টোপাধ্যায়, ফণীভূষণ মজুমদার, অমলেন্দু দাশগুপ্ত, নলিনী গুহ, ডা. হরিপদ চক্রবর্তী, কেন্দুয়ার সন্তোষ দত্ত, প্রতাপ গুহরায়, সরমঙ্গলের হরিপদ দাস ও সুফী জোনাব আলী, ভাঙ্গার যতীন ভট্টাচার্য, সতীশ বিশ্বাস, রমেশ রায়চৌধুরী, দীনেশ রায়চৌধুরী, প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজরাখাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি প্রধান ছিলেন।

অনুশীলন সমিতির পুলিন দাসকে ১৯০৮ সালে ১৮১৮ সালের আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯০৯ সালে ফরিদপুরে অনুশীলন সমিতির শাখা 'ব্রতী সমিতি' বে-আইনি বলে ঘোষণা করা হয়। ১৯১০ সালে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র মামলার পুলিন দাস এবং ফরিদপুরের কার্তিকপুরের রজনীকান্ত দাস ভিন্ন ভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত হন।

বিপ্লবীদের প্রথম গোপন ট্রাইবুনাল গঠিত হয়েছিল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ ও রাজা সুবোধ মল্লিককে নিয়ে। এই ট্রাইবুনাল মজঃফরপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিংস ফোর্ডের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দেয়। এই দণ্ডাজ্ঞা প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী। বিহারের মজঃফরপুরে কিংস ফোর্ডকে বোমা মারতে গিয়ে ভুল করেন এবং তা পড়ে মিসেস ও মিস কেনেডির গাড়িতে। প্রফুল্ল চাকী নিজের রিভলভরের গুলি দিয়ে মৃত্যুবরণ করেন আর ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। ক্ষুদিরামের আদি পৈতৃক বাসস্থান ছিল ফরিদপুরের মাদারীপুরের সখীপুর গ্রামে। ক্ষুদিরামের পিতা ত্রৈলোক্যনাথ বসু মেদিনীপুরের অন্তর্গত নাড়াজোল রাজ এস্টেটে চাকরি পেয়ে চলে যান এবং মেদিনীপুরেই ক্ষুদিরামের জন্ম হয়। ১৯১১ সালে পূর্ববঙ্গে যুগান্তর পার্টির চারটি বিশেষ শাখা গড়ে উঠেছিল। হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য ময়মনসিংহে, হেমঘোষ ঢাকায়, পূর্ণদাস ফরিদপুরের এবং সতীশ মুখার্জী (স্বামী প্রজ্ঞানন্দ) বরিশালে এই শাখা গঠনের

(শংকর মঠ) নেতৃত্ব দেন। শংকর মঠের বিপ্লবীদের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ্য ছিলেন মনোরঞ্জন গুপ্ত, অরুণ গুহ, নোয়াখালীর নরেন ঘোষচৌধুরী, ফরিদপুরের সতীন্দ্রনাথ সেন, নিশিকান্ত গাঙ্গুলী, মোহিনী মুখার্জী, ফরিদপুরের ভূপেন দত্ত, খুলনার কিরণ মুখার্জী, মাদারীপুরের জিতেন কুশারী ও নগেন চক্রবর্তী।

পূর্ণ দাস প্রতিষ্ঠিত মাদারীপুরের 'শান্তিসেনা' নামক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৎকালীন সরকারি কর্মচারীদের কিরূপ ভীতি ও আতঙ্ক সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল একটি ঘটনা থেকেই তা জানা যায়। মাদারীপুর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট ডোনাভান পূর্ণদাসের গ্রেফতারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। পূর্ণদাস স্বীয় দলের সদস্যগণের বৃহত্তম স্বার্থে আত্মসমর্পণ করে ডোনাভান সাহেবের এজলাসে নিজেকে ফেরারি পূর্ণ দাস বলে পরিচয় দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ডোনাভান সাহেব চেয়ার থেকে পড়ে গেলেন। এই শান্তিসেনা ও সেনানায়ককে কবি নজরুল ইসলাম তাঁর 'সন্ধ্যা' কবিতাগ্রন্থটি উৎসর্গ করেন ১৩৩৬ সালে। বাংলার গেরিলা পদ্ধতিতে বিপ্লবীরা প্রথম যুদ্ধ করেন ১৯১৫ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি উড়িষ্যার বালেশ্বরের কাছে সমুদ্রের বালুচরে। তখন প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৯) চলছে। বিপ্লবী নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী (বাঘা যতীন) এবং তার সহকর্মী ফরিদপুরের মনোরঞ্জন, চিত্তপ্রিয়, নীরেন্দ্র ও কলকাতার জ্যোতিষকে নিয়ে জার্মানির সঙ্গে এক চুক্তি করেন। ইংরেজরা তখন জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত– যতীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন এই সময় অস্ত্র সংগ্রহ করে গেরিলা পদ্ধতিতে যদি ভারতে আন্দোলন করা যায়, তাহলে স্বাধীনতা আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে। পূর্বে উল্লেখিত তারিখে যতীন মুখার্জী তাঁর সহকর্মী চারজন বিপ্লবীকে নিয়ে বালেশ্বরের ময়ূরভঞ্জের জঙ্গলে জার্মানির অস্ত্রের জন্যে অপেক্ষা করছেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কলকাতা স্পেশাল পুলিশ সুপার টেগার্ট তিনশত পুলিশ নিয়ে অকুস্থলে উপস্থিত হয়। বিপ্লবীরা যতীন মুখার্জীর নেতৃত্বে টেগারেট বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে। যতীন মুখার্জীর দলে মাত্র পাঁচজন— সরকারি সেপাই তিনশতেরও বেশি। তাই যতীনের দল বালির মধ্যে পরিখা কেটে যুদ্ধ করতে থাকে। হঠাৎ একটি গুলিতে বাঘা যতীনের অন্যতম সহকর্মী ফরিদপুরের মাদারীপুরের সন্তান চিত্তপ্রিয়ের বক্ষ ভেদ করে এবং সেখানেই তিনি শহীদ হন।

পুলিশের হাতে বাঘা যতীন ও তাঁর সাথীরা আহত অবস্থায় ধরা পড়েন। কটক হাসপাতালে আহত যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর মৃত্যু হয়। যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর সহকর্মী মাদারীপুরের নীরেন ও মনোরঞ্জনের ফাঁসি হয়। বিপ্লবীদের কার্যকলাপ দমনের জন্যে সি.আই.ডি বিভাগ যথেষ্ট তৎপর হয়ে উঠলো। ১৯১৩ সালে কলকাতার সি.আই.ডি ইন্সপেক্টর মুসলমান পাড়া লেনে বোমা নিক্ষেপে হত্যা করার চেষ্টার অভিযোগে রাজা বাজার বোমার মামলা বলে খ্যাত মামলায় ফরিদপুরের দীনেশ দাশগুপ্ত এবং সারদাচরণ গুহ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

সমসাময়িককালে ভারতের বাইরে থেকে দেশকে স্বাধীন করার প্রচেষ্টায় যে সমস্ত দেশকর্মী প্রচেষ্টা চালান, ফরিদপুরের যোগপাট্টা নিবাসী সুরেন কর তাদের অন্যতম। একই সময়ে ফরিদপুর শহরের হরেন্দ্র গুহ এবং ইদিলপুরের গুহরায় শিবপুর ডাকাতি মামলায় আন্দামানে প্রেরিত হন। অগ্নিযুগের বিপ্লবী সতীন্দ্রনাথ সেন ছিলেন যুগান্তর দলের প্রথম শ্রেণীর নেতা। বাংলা ১৩০১ সালের ২রা বৈশাখে ফরিদপুর জেলার

গোপালগঞ্জের বাগান উত্তরপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পটুয়াখালীতে আইন ব্যবসায়ী নবীন চন্দ্র সেনের পুত্র সতীন্দ্রনাথ সেন ১৩ বছর বয়সে স্বদেশী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হন। ১৯১২ সালে প্রবেশিকা পাশ করে বিপ্লবী যুগান্তর দলের নিয়মিত সদস্য হন। ১৯১৪ সালে কলকাতায় গিয়ে ভর্তি হন। রিপন কলেজে এবং বাঘা যতীন পরিচালিত সংগঠনের মাধ্যমে দলীয় কাজে নিযুক্ত হন। ১৯১৫ সালে নদীয়া জেলায় সংঘটিত সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব এবং দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়ে গ্রেপ্তার হন বারাসাতে। কৃষ্ণনগর ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামীরা এক বছর কারাবাসের পর অভিযোগের উপযুক্ত প্রমাণাভাবে মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু মুক্তি লাভের সঙ্গে সঙ্গেই ভারত রক্ষা আইনে গ্রেফতার হয়ে তিনি পুনরায় চার বছর অন্তরীণ থাকেন। সংগ্রামী জীবনে সতীন্দ্রনাথ ভারতের সাতাশটি জেলখানা ও বন্দিনিবাসে ছাব্বিশ বছরেরও অধিককাল বন্দিজীবন অতিবাহিত করেছেন। বিভিন্ন জেলে তিনি অনশন করেছেন ৩২২ দিন। তার মধ্যে ১৯২১ সালে বরিশাল জেলে এককালীন অনশন করেছেন ১৫৩ দিন। ১৯১৬ সালে ফরিদপুরের বিপ্লবী ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত কলকাতায় একটা মেস করেন। এই মেসটিতে একদল বিপ্লবী বাস করতেন। এই মেসে ফরিদপুরের বিপ্লবী অমৃত গুপ্ত বাস করতেন। এই সময় কলকাতায় ও মফঃস্বলে ব্যাপকভাবে বিপ্লবী কর্মীদের বন্দি করা হয়। কলকাতায় বসন্ত চ্যাটার্জীকে হত্যা করা হয় ১৯১৬ সালের ৩০শে জুন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়। ফরিদপুরের অমৃত গুপ্ত ধরা পড়েন এবং পরে যক্ষ্মা রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। ফরিদপুরের বিপ্লবী ইন্দু সরকার কলকাতায় এক মেস করেন। এই মেসেও বিপ্লবীদের একটি ঘাঁটি ছিল। বাংলাদেশের চারটি জেল রাজবন্দিদের প্রতি খারাপ ব্যবহারের জন্যে খ্যাতি অর্জন করেছিল। এগুলো হচ্ছে প্রেসিডেন্সি, রাজশাহী, ফরিদপুর ও হুগলী জেল। এই দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে রাজবন্দিরা বিক্ষোভ অনশন করতেন— কখনো কখনো জেলারকে ঘেরাও করে মারধর করতেন। ১৯১৪ সালে ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় বিপ্লবী পূর্ণদাস তার দলবল নিয়ে ফরিদপুর জেলে বিচারাধীন বন্দি। এই সময়ে বাঘা যতীনের সহকর্মী মাদারীপুরের চিত্তপ্রিয়ের বারো বছরের ভাই কান্তিপ্রিয়ের সাথে জেলার দুর্ব্যবহার করলে পূর্ণ দাস, সন্তোষ দত্ত ও আর দু'একজন জেলারকে মার দেবার পরিকল্পনা করে। জেলার উপেন মুখার্জী রাতের অন্ধকারে এই আলোচনা দরজার বাইরে থেকে শুনে ফেলে। পরদিন থেকে ফরিদপুর জেলের রাজনৈতিক বন্দিদের অবস্থা ফিরে গেল। উপেন মুখার্জীও রক্ষা পেলেন রাজবন্দিদের হাত থেকে। জেল কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহার ও বিনা বিচারে আটক রাখার প্রতিবাদে আলীপুর, রাজশাহী, মেদেনীপুর ইত্যাদি জেলে রাজবন্দিরা একবার অনশন করেন। পূর্ণ দাস, মেদিনীপুর জেলে অনশন শুরু করেন। মেদেনীপুর জেল থেকে তাঁকে রাজশাহী জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। এই জেলের জেলার তখন ছিলেন উপেন মুখার্জী। এর সঙ্গে পূর্ণ দাসের ফরিদপুর জেলেই পরিচয় হয়েছিল। অসহযোগ আন্দোলনকালে পূর্ণ দাস কংগ্রেসের রাজনীতিতে সক্রিয় হয় পড়েন। ১৯২০ সালে রাজশাহী জেলের স্টেট প্রিজনারদের মধ্যে ফরিদপুরের শরৎ গুহ ও নরেন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। নরেন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অনুশীলন দলভুক্ত। জেল জীবনে অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে নরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্রে দেখা দেয় এক সর্বব্যাপী ঔদাসীন্য। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে

এই অর্ধসন্ন্যাসী পাবনার সৎসঙে যোগ দিয়ে পাকা সন্ন্যাসীই হয়ে যান।

১৯২০ সালে ফরিদপুরের কোনকদিতে শ্যামল ভট্টাচার্য্য ও তারাপদ লাহিড়ী পালং এ হরিদাস বন্দোপাধ্যায়, প্রভাত চক্রবর্তী, ভোজেশ্বরের মাখনকর ও ভাঙ্গায় যতীন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে অনুশীলন বিপ্লবী দলের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। রাজবাড়ীতে নিরোদ দাস, কালুখালীতে নিরোদ সেন, পাংশায় সুরেন ঘোষ, কার্তিকপুরের জীবন ধুপী ও মাদারীপুরের শান্তি সেনের নেতৃত্বে যুগান্তর বিপ্লবীরা আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯২১ সালে মাদারীপুরের বিলসখান গ্রামের আশুতোষ কাহিলী, জীবন গুহঠাকুরতা প্রভৃতি অনুশীলনের নেতৃবৃন্দ একটি শিক্ষাশ্রম প্রতিষ্ঠা করে জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রচার ও প্রসার করতে প্রয়াস পান। ১৯২৫ সালে পূর্ণ স্বাধীনতাকামী বাঙালি যুবকদের প্রচেষ্টায় রেঙ্গুনে একটি গোপন সংগঠন গঠিত হয়। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র সংগ্রামে বার্মা প্রদেশ থেকে ইংরেজকে বিতাড়িত করে বর্মা তথা সারা উপমহাদেশের স্বাধীনতা অর্জন। এই দলে ১৯২৬ সালে জ্যোতি যোগদান করেন। বাংলাদেশে হিজলী ক্যাম্পের গুলির প্রতিশোধের উদ্দেশ্য যে দল বার্মা থেকে প্রেরিত হয়েছিল, তারমধ্যে জ্যোতি ও ছিল। ফরিদপুরের আংগারিয়ার ডাক লুটের সময় গ্রামের লোকের লেজার কোপে ছিপছিপে গড়নের ফুটফুটে ফরসা রঙের এই যুবক আহত হয়। লেজা তার পেট ভেদ করে বের হয়ে যায়। আহত জ্যোতিকে মাদারীপুর হাসপাতালে নেয়া হয়। এখানেই তাঁর জীবনের অবসান ঘটে। ফরিদপুরের সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২০ সালের মাঝামাঝি বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৩০ সনে তিনি কারাবরণ করেন। ১৯৩৭-৩৮ সালে জেল থেকে মুক্তি লাভ করেই তিনি পুনরায় আন্দোলন শুরু করেন। অল্পকাল পরে পুনরায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

ফরিদপুরের আশু ভরদ্বাজ ১৯২০ শতকে বিপ্লবী আন্দোলনে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৩০ সালে তিনি গ্রেফতার হয়ে বিনা বিচারে জেলে ও বন্দি শিবিরে আটক ছিলেন। এই জেলার অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের মধ্যে সত্য মৈত্র, সমর সিংহ, শান্তি সেন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। পাকিস্তান আমলে আশু ভরদ্বাজ, সন্তোষ বন্দোপাধ্যায়, সত্য মৈত্র, সমর সিংহ, শান্তি সেন বাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যখন স্বায়ত্বশাসনের ভাগ নিয়ে ব্যস্ত ফরিদপুরের বিপ্লবী কর্মীগণ তখন এদেশের অভ্যন্তরে এবং ভারতের বাইরে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অভিযানে রত। ফরিদপুরের অনুশীলন সমিতির প্রফুল্ল সেন (স্বামী সত্যনন্দপুরী) বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসু এবং গিয়ানী প্রিতম সিং-এর সহযোগিতায় ব্যাংকক থেকে পূর্বএশিয়ার ভারতীয়দিগকে সংঘবদ্ধ করে ভারতে স্বাধীনতার চেষ্টা করেছিলেন। রাসবিহারী বসু চন্দননগরের বিপ্লবী মতিলাল রায়ের অনুপ্রেরণায় কলকাতার বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। তিনি বিপ্লবী দলভুক্ত হয়ে একাধিক সন্ত্রাসবাদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ সময়ে কলকাতায় অবস্থানরত বিপ্লবী ও তাঁদের বলিষ্ঠ সমর্থকদের মধ্যে ফরিদপুর জেলার মাদারীপুরের শান্তিসেনা দলের পূর্ণচন্দ্র দাস, যতীন ভট্টাচার্য. বরিশালের হেমেন ঘোষ প্রমুখ ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু সংখ্যক বিপ্লবী নেতা ও কর্মীকে নিবর্তনমূলক আটক আইনে ও ভারত রক্ষা আইনে আটক করা হয়েছিল। রাস বিহারী বসুকে গ্রেফতার করার জন্য পুলিশের চেষ্টার অন্ত ছিল না। তিনি কলকাতা থেকে উত্তর

ভারতে চলে যান এবং সেখানে বিপ্লবের বাণী প্রচার করতে থাকেন। সুভাষ চন্দ্র বসু দেশত্যাগ করার পরই ফরওয়ার্ড ব্লকভুক্ত বিপ্লবী দলসমূহ বিভি অর্থাৎ বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স, শ্রীসঙ্গ, আরএস.পি আইর ফরওয়ার্ড ব্লক অংশ ফরিদপুরের শান্তিসেনা ইত্যাদি দল-উপদলের মধ্যে একটি চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। এই কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কলকাতায় কয়েকদফা গোপন বৈঠক হয়। এসব বৈঠকের আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় যে, চট্টগ্রাম আরাকান সীমান্ত পথে আজাদ হিন্দ ফৌজের আক্রমণ শুরু হওয়ার পূর্বেই একটা ক্ষেত্র প্রস্তুতি তৎপরতার প্রয়োজন। এ তৎপরতা চালাতে গিয়ে মাদারীপুরের বিশিষ্ট বিপ্লবীকর্মী বিজয় দত্ত-সহ বেশ কিছু বিপ্লবী গ্রেপ্তার হন।

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অবতীর্ণ হলে রাস বিহারী বসু ভারতবর্ষ উদ্ধারের একটা ব্যাপক পরিকল্পনা করে কাজ শুরু করেন। ১৯৪২ সালে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বৃটিশের পতন ঘটলে জাপানের হাতে বন্দি ভারতীয় ক্যাপ্টেন মোহন সিংহের নেতৃত্বে বন্দি ভারতীয় সৈন্যদের জাপান মিলিটারি অনুমোদনে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হয়। মার্চ মাসে জাপানের রাজধানীতে প্রথম মহা সমরকালীন ভারতের অন্যতম বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে দক্ষিণ পূর্বএশিয়ার নেতৃস্থানীয় ভারতীয়গণের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জুন মাসে ব্যাঙ্ককে আর একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ জন্মলাভ করে এবং রাসবিহারী বসু সভাপতি নির্বাচিত হন। এই স্বাধীনতা সংঘ আজাদ হিন্দ বাহিনীকে স্বীকৃতি দেয়। এ সময়ে ফরিদপুরের অনুশীলন সমিতির প্রফুল্ল সেন (স্বামী সত্যানন্দপুরী) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি স্বাধীনতা সংঘ গঠনে রাসবিহারী বসুকে সাহায্য করেন।

এ সময়ে জাপানের সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারতের স্বাধীনতা প্রশ্নে মত-বিরোধ সৃষ্টি হলে আজাদ হিন্দ প্রতিষ্ঠাতা মোহন সিংহ জাপানিদের হাতে বন্দি হবার সময় আজাদ হিন্দ ফৌজ ভেঙে দেন। রাসবিহারী বসু আজাদ হিন্দুকে রক্ষা করার শেষ চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এ সময়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠাতা সুভাষচন্দ্র বসু ইউরোপ থেকে সুমাত্রা দ্বীপে পৌছেন। তিনি জাপানের সঙ্গে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্নটি চূড়ান্ত ভাবে মীমাংসা করেন ১৯৪২ সালের ২রা জুলাই সিঙ্গাপুরে পৌছান। এর দুদিন পর সিঙ্গাপুরে ভারতীয়দের এক বিরাট সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় রাসবিহারী বসু স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন এবং সুভাষচন্দ্র বসু ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের সভাপতি পদ লাভ করেন। তিনি উক্ত সভায় ঘোষণা করেন ইংরেজদের হাত থেকে ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামে জাপান সরকার আজাদ হিন্দ ফৌজকে সর্বপ্রকার সাহায্য দেবে এবং এই সাহায্যের বিনিময়ে ভারতের ওপর তারা কোনো দাবী দাওয়া করবেন না। ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। সুভাষচন্দ্র বসু হন এই সরকারের প্রেসিডেন্ট। আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযান শুরু হলো—প্রথমে এ অভিযান সাফল্য লাভ করলেও পরে বর্ষা পরিস্থিতিতে অসুবিধে দেখা দেয়। স্থির হলো বর্ষার পরে নতুন ভাবে আক্রমণ শুরু করা হবে। এদিকে জাপান পশ্চাদপসরণ করতে বাধা হলো– জাপান সম্রাট- সৈন্যদের

আত্মসমর্পণ করতে নির্দেশ দিলেন। এমতাবস্থায় নেতাজী সুভাষ চন্দ্রকে ঐতিহাসিক অবস্থার শিকার হতে হলো।

বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদ ও বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হয়েছিল একটা উন্মাদনা নিয়ে। ইংরেজকে তাড়ানো হবে এই আবেগই বিপ্লবীদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এই আন্দোলন কোন পথে চালাতে হবে– এই আন্দোলন আদৌ সম্ভব কিনা– সম্ভব হলে স্বাধীন দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থার রূপ কি হবে এইসব বিচার বিশ্লেষণ প্রথমে বিপ্লবীরা করে নাই। কংগ্রেসের আপোষকামী মনোভাব– ইংরেজদের দমননীতির প্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক কর্মীদের একাংশ এই নয়া পদ্ধতির শুরু করে।

১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লব সংঘটিত হয়। পৃথিবীতে প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ প্রতিষ্ঠিত হলো। পৃথিবীর বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাধারায় সৃষ্টি করল একটা আলোড়ন। ভারতের বুকেও এই ঢেউ লাগতে দেরি হলো না। ১৯২১ সালের শেষ দিকে কমরেড মুজাফফর আহমেদ কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং পরে নিখিল ভারত কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময়ে বাংলার বিপ্লবীদের এক অংশ মার্কসবাদে আগ্রহী হয়ে ওঠে। একদল বিপ্লবী আবার কম্যুনিজম বিরোধীরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই কারণে বিপ্লবীদের একটি অংশ মার্কসবাদে প্রভাবিত হয়েও অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে গান্ধীজীব নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেয়। অনেকে কংগ্রেস পার্টিতে যোগদান করে সশস্ত্র রাজনীতি থেকে শান্তিপূর্ণ রাজনীতির পথে প্রত্যাবর্তন করেন। আর একটি অংশ বাম রাজনীতি অর্থাৎ মার্কসবাদকে মুক্তির পন্থা হিসেবে গ্রহণ করে। এই অবস্থার মধ্যে কম্যুনিজমের মতাদর্শ প্রচারিত হতে থাকে ভারতের বুকে শুরু হয় কমিউনিস্টদের তৎপরতা। ১৯৩৮ সাল থেকে কমিউনিস্টদের গুপ্ত পথে আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে। এই আন্দোলনে ফরিদপুরের বাগল প্রসন্ন গুহ, অনুকূল চ্যাটার্জী, জীবন দে, গোপাল দাস, দরবেশ আলী যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফরিদপুরের রাজবাড়ির কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য কর্মতৎপরতার পরিচয় দেয়। এই আন্দোলনে ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা অংশগ্রহণ করে। ফরিদপুরে অল বেঙ্গল স্টুডেন্ট এ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে দিতেন শ্যামেন ভট্টাচার্য ও সত্যগুপ্ত। এছাড়া বেঙ্গল প্রাদেশিক স্টুডেন্ট এ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে ছিলেন নগরকান্দার ব্রজরাখাল ব্যানার্জী, রাজবাড়ীর সমর সিং ও নৃপেন রায়। ১৯৩৪ সালে কোরকদিতে স্টুডেন্টস ফেডারেশন স্থাপিত হলে নেতৃত্বের ভার নেন সত্য মৈত্র, আশু ভরদ্বাজ, অমূল্য অধিকারী, গোপাল নাথ প্রমুখ। ১৯৩৮ সালে মাদারীপুরের অনুকূল চ্যাটার্জী, যোগেশ চ্যাটার্জী, প্রফুল্ল স্যানাল ডাক লুটের অভিযোগে আন্দামানে নির্বাসিত হন। এদের মুক্তির দাবীতে মাদারীপুরে এক আন্দোলন গড়ে উঠে। ১৯৪২ সালে গোপালগঞ্জ মহকুমার বান্ধাবাড়ীর ধীরেন বিশ্বাসের নেতৃত্বে রাজবাড়ীর অন্তর্গত দাদসী রেলস্টেশন পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং কোটালীপাড়ার সেটেলমেন্ট অফিস ভস্মীভূত করা হয়। ধীরেন বিশ্বাস পুলিশের হাতে ধৃত হন এবং জেলের মধ্যেই তাকে স্লো পয়জনে হত্যা করা হয়। ফরিদপুরের সন্তোষ ব্যানার্জী, আশুভরদ্বাজ, সত্য মৈত্র, সমর সিং, শান্তি সেন, মৃণাল বারুরী প্রমুখ এ জেলার মার্কসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

১৯৪২ সালে আগস্ট বিপ্লবে ফরিদপুরের বিপ্লবীদের হাতে ভাঙ্গা হাই স্কুল প্রাঙ্গণে ভাঙ্গা থানার দারোগা রোহিনীকুমার ঘোষ নিহত হন।

## কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭)

কংগ্রেসের ইতিহাসের সঙ্গে ফরিদপুরের অম্বিকাচরণ মজুমদারের নাম বিশেষভাবে যুক্ত। কংগ্রেসের জন্মের চার বছর পূর্বে ১৮৮১ সালে মাদারীপুরের অন্তর্গত সেনদিয়া গ্রামের অম্বিকাচরণ মজুমদার ফরিদপুর পিপলস এসোসিয়েশন স্থাপন করেন এবং এটিই ছিল পূর্ববঙ্গের সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। তিনি ১৮৫৭ সালে জেনারেল এসেম্বেলিজ ইন্সটিটিউশন থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম এ পাস করেন। এরপরে বিএল পাস করে নিজের জেলা ফরিদপুরে আইন ব্যবসা শুরু করেন। কংগ্রেসের জন্মকালের পূর্ব থেকেই অম্বিকাচরণের রাজনৈতিক জীবন শুরু।

১৮৮৩ সালে বঙ্গদেশে প্রথম জাতীয় রাজনৈতিক সম্মেলন হয় এবং তারই পরিণতি স্বরূপ ইংরেজ সাহেব হিউমের প্রচেষ্টায় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের সম্মেলনে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। অম্বিকাচরণ মজুমদার ১৮৮৩ ও ১৮৮৫ সালে উভয় সম্মেলনেই যোগদান করেছিলেন। ১৮৮৫ থেকে কংগ্রেসের নেতৃত্ব ছিল নরমপন্থী ইংরেজদের প্রতি আপোষকামীদের হাতে। কংগ্রেসের এই নীতি ১৮৮৫ থেক ১৯১৬ সাল পর্যন্ত কার্যকরী ছিল। অম্বিকাচরণ মজুমদার নরমপন্থী দলভুক্ত ছিলেন। কংগ্রেস রাজনীতিতে তাঁর গুরু ছিলেন প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা সুরেন্দ্রনাথ।

১৯০৪ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা প্রস্তাব প্রকাশ পায়। ১৯০৫ সালে ১৬ই অক্টোবর তা কার্যকর হয়। মুসলমান সমাজের একাংশ এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করলেও অধিকাংশই তা মেনে নেয়। শাসন কার্য পরিচালনার জন্যে বাংলাদেশের সীমা বেশি বড় বলে সরকারি মহলে ধারণা ছিল। প্রথম দিকে প্রস্তাব ছিল চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলাকে আসাম প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। কিন্তু পরে দেখা গেল ঐ তিন জেলার সঙ্গে ঢাকা, ময়মনসিংহ. ফরিদপুর, বরিশাল এবং উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোও নতুন প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়া হয়েছে। শিক্ষিত হিন্দু সমাজের আপত্তি অগ্রাহ্য করে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হয়ে গেল। মুসলমান সমাজে এর প্রতিক্রিয়া একরকম ছিল না। মুসলমান সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিলেন বঙ্গভঙ্গের পক্ষে। কারণ ১৮৬০ সালের পর থেকে শাসক শ্রেণীর সঙ্গে মুসলমানদের সুসম্পর্ক স্থাপনের যে প্রয়াস বাংলাদেশে ফরিদপুরের নবাব আবদুল লতিফের উদ্যোগে আর সারা ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল তা নিস্ফল হয়নি। অনেকেই মনে করেন যে, ১৮৭০ সালের পর থেকে ইংরেজ সরকার মুসলমানদের আনুকুল্য প্রদর্শন করেন। অবশ্য এ আনুকূল্যের কার্যত কোনো প্রকাশ দেখা যায় না।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দুরা প্রবল আপত্তি জানান। কংগ্রেস সমর্থন করে আন্দোলন শুরু করে। অম্বিকাচরণ মজুমদারের সভাপতিত্বে ১৯০৫ সালে জানুয়ারি মাসে ফরিদপুরে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং মথুরানাথ মিত্র, পূর্ণ মিত্র, জগবন্ধু মৈত্র, সতীশ মজুমদার, উমাচরণ আচার্য এবং পাংশার আসাদুজ্জামানের সমন্বয়ে ফরিদপুরে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ সংসদ গঠিত হয়েছিল। প্রবোধ কুমার সান্ন্যালের সভাপতিত্বে

অম্বিকাচরণ মজুমদার এবং পূর্ণ মৈত্রের প্রস্তাবে বঙ্গভঙ্গর বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ফরিদপুরে যে কয়েকজন মুসলিম নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন তাঁরা হলেন মাদারীপুরের হবিগঞ্জের জমিদার গোলাম মওলা চৌধুরী, পাংশার আসাদুজ্জামান, কোহিনূর সম্পাদক রওশন আলী চৌধুরী এবং মজিবর রহমান আই সি এস-এর পিতা মৌলবী আবদুর রহমান দুদু মিঞা উকিল।

ফরিদপুরে যদুনাথ পাল এবং ব্রহ্ম ঘোষের ওপর আন্দোলন পরিচালনার ভার অর্পিত হয়। এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনই স্বদেশী আন্দোলন নামে খ্যাত। এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। অম্বিকাচরণ মজুমদার, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি ছিলেন তাঁর অন্যতম সহকারী। ১৯০৫ খ্রি. ১৬ই অক্টোবর সূর্যোদয়ের সাথে হিন্দু যুবকের দল খণ্ডিত বাংলাকে অস্বীকার করে রাখীবন্ধন উৎসবে মত্ত হন। অপরাহ্নে ফেডারেশন হলের ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে বিরাট জনসমাগম হয়েছিল। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির আগমন হয়েছিল। সভা ভঙ্গ হতেই সুরেন্দ্রনাথ, অম্বিকাচরণ, আশুতোষ চৌধুরী প্রভৃতি নেতৃবর্গ কলকাতার রাজপথে জনপ্রবাহের অগ্রভাগে নগ্নপদে চলতে লাগলেন।

কংগ্রেসের জন্মকাল থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের নীতি ও কর্মপ্রয়াস আবেদন নিবেদন এবং সহযোগিতার পথ বেয়ে চলছিল। এই দীর্ঘকাল কংগ্রেস নরমপন্থীগণের দ্বারাই পরিচালিত হতে থাকে। গুরু সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় আম্বিকাচরণও নরমপন্থী দলভুক্ত ছিলেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যে স্বাধীন ভারতেব কল্পনা তখন তাদের মাথায় ছিল না। ১৯০৫ সালে কাশীর কংগ্রেস অধিবেশনে বলে কৃষ্ণ গোখেল প্রথমবার আমলাতন্ত্রের সঙ্গে সহযোগিতা করে লাভ নেই বলে অভিমত পেশ করেন। স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯০৬ সালে বরিশালে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে অম্বিকাচরণ স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ১৯০৬ সালে কলকাতা কংগ্রেস সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে স্বদেশী বয়কট প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯০৭ সালে এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সুরাট কংগ্রেসের অধিবেশনে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যেকার বিরোধ তীব্রতর হয়ে উঠে। কার্যত কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে।

চরমপন্থী দলে ছিলেন বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন পাল প্রভৃতি এবং নরমপন্থী দলে সুরেন্দ্রনাথ, রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি ছিলেন। বাংলাদেশের একদল প্রতিনিধি চরমপন্থীদের ব্যবহারে ক্ষোভ প্রকাশ করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই দলে ফরিদপুরের পক্ষ থেকে অম্বিকাচরণ মজুমদার, মণীন্দ্রকুমার মজুমদার ও কৃষ্ণদাস রায় ছিলেন।

১৯০৭ খ্রি. স্বদেশী আন্দোলনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে ফরিদপুরে অম্বিকাচরণ মজুমদারকে সভাপতি এবং আবদুর রহমানকে সম্পাদক নিযুক্ত করে ফরিদপুর জেলা সমিতি সংগঠিত হয়। স্বদেশী আন্দোলন পূর্ববঙ্গে ব্যাপকতা লাভ করে বিশেষ করে বরিশাল ও ফরিদপুরে এই আন্দোলন উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক রূপ লাভ করে।

ফরিদপুর জেলাতেই অন্যূন এক হাজার সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফরিদপুরে অম্বিকাচরণ মজুমদারের উৎসাহে এক কর্মী সম্মেলন হয়। এই কর্মীদের প্রধান ছিলেন ব্রহ্ম ঘোষ।

ফরিদপুরের সমগ্র জেলাব্যাপী আন্দোলন পরিচালনার ভার তাঁকে দেয়া হয়েছিল। যদুনাথ পালকে মাদারীপুরের পালং অতুল মৈত্রকে ফরিদপুর শহরে আন্দোলনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। সতীশ মজুমদার, যোগেশ চক্রবর্তী প্রমুখ স্বদেশী আন্দোলনে অম্বিকাচরণ মজুমদারকে সহযোগিতা করতেন। অম্বিকাচরণ মজুমদারের নেতৃত্বে ফরিদপুরের উকিল ও মোক্তারগণ স্বদেশী আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন।

১৯০৬ সালের ২৮ শে জানুয়ারি মাদারীপুরের হবিগঞ্জে গোলাম মওলা চৌধুরীর বাসভবনে শশধর তর্কচূড়ামণির সভাপতিত্বে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই সভায় অনুমান সাত হাজার লোক যোগদান করে। এর মধ্যে প্রায় পাঁচ হাজারের মতো মুসলমান ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময় পাক্ষিক 'ফরিদপুর হিতৈষিণী' স্বদেশী আন্দোলনের মুখপত্রের ভূমিকা পালন করে। এই পত্রিকায় স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে ফরিদপুরের খবরাখবর পরিবেশিত হতো। এই পত্রিকা সূত্রে বলা যায় যে, বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার ন্যায় ফরিদপুরে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে 'বঙ্গভঙ্গ'-বিরোধী প্রস্তাব উত্থাপন করেন অনাথবন্ধু গুহ। প্রস্তাব সমর্থন করেন জে.এম. সেনগুপ্ত, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, মৌলবী আবুল কাশেম প্রমুখ। সম্মেলনে সভাপতি পদে মনোনীত হয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এ. চৌধুরী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, জে. চৌধুরী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, হেমচন্দ্র জাতা, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু প্রভৃতি। ফরিদপুর থেকে প্রতিনিধি ছিলেন অম্বিকাচরণ মজুমদার, রওশন আলী চৌধুরী (পাংশা), যদুনাথ পাল, পূর্ণচন্দ্র কর্মকার, হেম মুখার্জী, হেমন্ত মুখার্জী, অমরনাথ রায়, রাজকুমার চৌধুরী, সতীশচন্দ্র মজুমদার, কালীপ্রসন্ন সরকার, কামিনীকুমার রায়, নলিনীকান্ত সেন, দীনেশচন্দ্র সেন, পূর্ণচন্দ্র মৈত্র, চারুচন্দ্র মজুমদার, অক্ষয়কুমার সেন, দেবেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক প্রমুখ।

১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌতে অম্বিকাচরণ মজুমদারের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের এক ঐতিহাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে অম্বিকাচরণ মজুমদারের প্রচেষ্টায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে এই প্রথমবার একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। ইতিহাসে এই চুক্তি 'লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট' নামে প্রসিদ্ধ। অম্বিকাচারণ মজুমদারের উদ্যোগেই এই সময়ে কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থীগণের মধ্যে পুনর্মিলন সম্ভব হয়েছিল। অম্বিকাচরণ মজুমদারের সভাপতিত্বে লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট গৃহীত হওয়ায় জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে ফরিদপুর বিশেষ অধ্যায়ের সূচনা করে। ১৯১৭ সালে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নরম ও চরমপন্থীদের মতভেদ হয় এবং নানা স্থানে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। কংগ্রেস চরমপন্থী দলীয় অন্যতম নেতা ফরিদপুরের সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ফরিদপুরে একটি সভা আহূত হয় কিন্তু অম্বিকাচরণ মজুমদার ঐ সভায় যোগদান করলেন না।

১৯১৭ সালে অম্বিকাচরণ মজুমদার এবং তাঁর রাজনৈতিক গুরু সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নবম পন্থীদের হাত থেকে কংগ্রেসের কর্তৃত্বভার চরমপন্থীগণ গ্রহণ করেন। ফলে কংগ্রেসের রাজনীতিতে নরমপন্থীদের বিপর্যয় শুরু হয়। অম্বিকাচরণ মজুমদারের রাজনৈতিক জীবনের শেষ অধ্যায় তখন। অম্বিকাচরণ মজুমদারকে কংগ্রেসের গ্র্যান্ড ওল্ডম্যান বলা হতো। তিনি কংগ্রেসের প্রথম শ্রেণীর নেতা ছিলেন তাঁরই প্রচেষ্টায় ফরিদপুরে কংগ্রেস আন্দোলন ব্যাপক রূপ ধারণ করেছিল। তিনি নিখিল ভারত

কংগ্রেসের ৩১তম অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৮৯৯ এবং ১৯১০ সালে দু'বার বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন তাঁরই সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি কংগ্রেসের উদ্ভব ও অগ্রগতি সম্পর্কে ইংরেজিতে "Indian National Evolution (A brief survey of the origin and progress of Indian National Congress)" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

ফরিদপুরে স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপকতা লাভ সম্ভব হয়েছিল অম্বিকাচরণ মজুমদারের প্রচেষ্টা ও রাজনৈতিক তৎপরতার ফলে। এই আন্দোলনের প্রভাবেই সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেতাকে এই জেলা জন্ম দিয়েছিল।

১৯২০ সালে দেশব্যাপী অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলন শুরু হয়। হিন্দু মুসলমান একযোগে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। এ আন্দোলন আঞ্চলিক ভিত্তিতে ফরিদপুর শহরে নেতৃত্ব দান করেন অম্বিকাচরণ মজুমদার, নিবারণ পাল, দুর্গাশংকর বসু, তমিজ উদ্দিন খান, পূর্ণ কর্মকার, যদুনাথ পাল, আলহাজ্ব গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী, চরভদ্রাসনের শরৎচন্দ্র ঠিকাদার, ভাঙ্গার যতীন ভট্টাচার্য, আলফাডাঙ্গার ভূপেন দত্ত, মাদারীপুরের পীর বাদশা মিয়া, প্রতাপ গুহরায়, পূর্ণ দাস, সুরেশ দাস, সুরেশ ব্যানার্জী গোপালগঞ্জের ধীরেন বিশ্বাস। সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ও অন্যান্যদের সহযোগিতায় নড়িয়া থানায় এক তাঁতের কারখানা স্থাপন করা হয়। চরকার সাহায্যে বহু লোক কাপড় বোনা শুরু করে। বিলাতী বর্জনের এই নীতি জেলার বিভিন্ন স্থানে পূর্ণতা লাভ করে। এই সময় ফরিদপুরে মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী (লাল মিয়া), মৌলবী তমিজ উদ্দিন খান, বাহাদুরপুরের পীর বাদশা মিঞা, মাদারীপুরের হাজী নয়ান শরীফ সরকার, শরমঙ্গলের মোজাহার মিঞা, বোয়ালমারীর চাঁদ মিয়া, কফিল উদ্দিন মিঞা, বিলনালিয়ার মোজাহার চোকদার, ভাঙ্গার গোলাম গফুর চৌধুরী প্রমুখ বহু মুসলমান নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯২১ সালের ২১ নভেম্বর ইংল্যান্ডের যুবরাজ ভারত সফরে এলে হরতাল পালন করা হয়। ফলে গ্রেফতার করা হয় নেতৃবৃন্দকে ফরিদপুরের নিবারণ পাল, যদু পাল, ভূপেন দত্ত, পূর্ণ দাস, প্রতাপ চন্দ্র গুহরায়, সুরেশ দাস, সুরেশ ব্যানার্জী, তমিজ উদ্দীন খান, পীর বাদশা মিঞা, লাল মিঞা, হাজী নয়ান শরীফ, অম্বিকাচরণ মজুমদার, সরকার দুর্গাশংকর বসু, যতীন ভট্টাচার্য, গোলাম গফুর চৌধুরী, শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রমুখকে গ্রেফতার করা হয়। অসহযোগ আন্দোলনের সময় বহু বিপ্লবী নেতাকর্মী কংগ্রেসে যোগদান করেন। ফরিদপুরের ডা. প্রতাপচন্দ্র গুহরায়, যদুনাথ পাল, প্রমথ গুই প্রমুখ তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ১৯২১ খ্রি. অম্বিকা মজুমদার ফরিদপুরে National Liberal Association প্রতিষ্ঠা করে খিলাফত ও কংগ্রেসের মিলিত অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ২৯ শে ডিসেম্বর কংগ্রেসের এই প্রখ্যাত নেতা অম্বিকাচরণ মজুমদার মৃত্যুবরণ করেন।

১৯২১ সালে ভাঙ্গার উকিল শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী, মাদারীপুরের সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, প্রমথ গুহ, সতীশ মজুমদার, তমিজ উদ্দিন খান, যদু পাল এবং লাল মিয়া ফরিদপুরে কংগ্রেসের নেতৃত্ব দেন। ১৯২৪ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সভাপতিত্বে ফরিদপুরের টেপাখোলায় কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধী, সরোজিনী নাইডু, সুভাষচন্দ্র বসু, মৌলানা আবুল কালাম

আজাদ কংগ্রেসের প্রায় নেতৃবৃন্দই যোগদান করেন। সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ফরিদপুরের মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী লাল মিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন।

১৯২৬ সালে মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে স্টুডেন্টস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এই কনফারেন্সের সভাপতি ছিলেন প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা ঠাকুর পেয়ারে লাল সিং এবং সম্পাদক ছিলেন ফরিদপুরের প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা হিন্দি কবি ডা. কাজী আশরাফ হোসেন মাহমুদ। ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি কর্মস্থলেই প্রবাসী জীবন যাপন করেন। তাঁর পুত্র অধ্যাপক আবদুস সাত্তার মাহমুদ এবং কন্যা ডাক্তার জোহরা বেগম কাজী ঢাকাতে বাস করতেন। উক্ত সম্মেলনে কবি নজরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

কংগ্রেসের অখণ্ড ভারতে এক জাতীয়তাবাদের স্বপ্ন এবং স্বার্থপরতা মুসলমানদের মনে স্বাতন্ত্র্যবোধের সৃষ্টি করে। ফরিদপুরের কংগ্রেসী মুসলমান নেতৃবৃন্দ ভেতরে ভেতরে অস্বস্তিবোধ করলেও কংগ্রেসের মধ্যে থেকে প্রতিকারের চেষ্টা করতে লাগলেন। এই সময়ে ১৯২৮ সালে সুভাষ বসুর সভাপতিত্বে ফরিদপুরে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং কংগ্রেসের তৎকালীন নীতির বিরুদ্ধে মনোভাব সুভাষ বসুর ভাষণে প্রকাশ পায়। মাদারীপুরের ফণীভূষণ মজুমদার সুভাষ বসুর প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন।

১৯২৯ সালে কংগ্রেসের লাহোর সম্মেলনে স্বাধীনতার সংকল্প গৃহীত হয়। কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংকল্পের পর ফরিদপুরের কয়েকজন বিপ্লবী নেতা কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই আন্দোলনে ফরিদপুরে প্রায় দু'হাজার লোক কারাবরণ করেন। আন্দোলনে পিকেটিং এর সময় নেতৃস্থানীয়দের প্রায় সকলেই কম বেশি পুলিশী নির্যাতন ভোগ করেন। আন্দোলনের পুরোধায় ছিলেন ফরিদপুরের চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন লাল মিয়া। এছাড়া রাজবাড়ীর মিসেস চারু প্রভা সেন, সোনাপুরের নরেশ ঘোষ, প্রভাষ ঘোষ, কোড়কদির অনিল লাহিড়ী, অমল সান্যাল, শ্যামল ভট্টাচার্য ও মাদারীপুরের শান্তি সেন। ফরিদপুরে বহু কংগ্রেসী নেতৃবর্গের সঙ্গে পীর বাদশা মিয়া, হাজী নয়ান শরীফ সরকার, লাল মিয়া প্রমুখ মুসলিম সদস্যও কারাবরণ করেন।

১৯৩১ সালে মহাত্মা গান্ধী আহূত নিখিল ভারত নেতৃবৃন্দ সম্মেলনে ডাঃ প্রতাপ চন্দ্র গুহরায়, চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন লালমিয়া ফরিদপুরের প্রতিনিধিত্ব করেন। চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন লাল মিয়া ১৯৩৬ সালে ফরিদপুর জেলা থেকে একজন কংগ্রেস কর্মী হিসেবে বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য পদ লাভ করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি ফরিদপুরে সর্বপ্রথম বিরাট আকারে এক কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। ১৯৩৬ সালেও পুনরায় তিনি কৃষি শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। ১৯৪০ সালে তিনি পুনরায় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪২ সালে কংগ্রেসের বোম্বে অধিবেশনে 'Quite India' বা 'ভারত ছাড়' নীতি গৃহীত হয়। বৃটিশ সরকার দেশব্যাপী কংগ্রেসের বহু নেতাকে কারারুদ্ধ করে। ফলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'আগস্ট বিপ্লব' শুরু হলো। এই সময়ে ফরিদপুরের ডা. প্রতাপচন্দ্র গুহরায়, প্রমথ গুহ, দীনেশ চৌধুরী, নুটু মজুমদার প্রমুখ বহু কংগ্রেসী কর্মী কারারুদ্ধ হন। চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন লাল মিয়া ১৯৪৩ সালে

কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ফরিদপুরের তমিজউদ্দীন খান ফরিদপুরের কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন। ১৯২১ সালে তিনি আন্দোলন করার জন্যে কারাবরণ করেন। ১৯২৬ সালে এবং ১৯২৭ সালে তিনি দু'বার বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩০ সালে তিনি কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেন। ফরিদপুরের মওলানা আবদুল আলী কংগ্রেসের সঙ্গে অত্যল্প সময়ের জন্য যুক্ত ছিলেন। ভাঙ্গার সিরাজ উদ্দিন আহমদ (সাংবাদিক), রাতৈলের 'রাজমুকুট' গ্রন্থ প্রণেতা ডা. সাইদ উদ্দীন সিদ্দিকী, পালং-এর নলিনীরঞ্জন সেন কংগ্রেসের সাথে যুক্ত ছিলেন।

১৯৩৫ খ্রি. বৃটিশ সরকার দেশবাসীর নিকট অভ্যন্তরীণ শাসনের কিছু অংশ ন্যস্ত করেন কিন্তু 'ভারত বিধান' অনুযায়ী দেশকে প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন লাভ করে তাতে মূল সমস্যার সমাধান না হয়েও বরঞ্চ তিক্ততার সৃষ্টি হয়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ব্যবধান ক্রমশঃই প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর হতে থাকে। মোহাম্মদ আলী জিন্নার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলিম লীগের কোনো আপোষ হলো না। অবশেষে ১৯৪০ খ্রি. লাহোরে মুসলিম লীগের সম্মেলনে আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে যে প্রস্তাব গৃহীত হলো পরবর্তীকালে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা তারই পরিণতি। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর আহ্বানে ফরিদপুরের কংগ্রেসী ও অকংগ্রেসী প্রায় সকল মুসলিম নেতৃবৃন্দই একে একে মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৫-৪৬ সালে ফরিদপুরের কবি হুমায়ুন কবীর জাতীয় কংগ্রেস দলের তৎকালীন সভাপতি মওলানা আবুল কালাম আজাদের সেক্রেটারি হিসেবে বৃটিশ ক্যাবিনেট মিশনের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। হুমায়ুন কবিরের রাজনৈতিক চিন্তাধারা গঠনে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের প্রভাব ছিল অতীব গভীর। তিনি এককালে নিখিল ভারত ছাত্র কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। ফরিদপুরের সতীন্দ্রনাথ সেন বরিশালে কংগ্রেসের নেতৃত্ব প্রদান করেন। তিনি প্রথম জীবনে বিপ্লবী যুগান্তর দলের সদস্য ছিলেন। ১৯২০ সালের পরে তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯২০ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি বরিশালে কংগ্রেসের নেতৃত্ব প্রদান এবং বৃটিশ বিরোধী বিবিধ আন্দোলনে বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেন।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিজ দেশ ইংল্যান্ডে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দরুন আর্থিক বিপর্যয় অপরদিকে রাশিয়ার শক্তি সঞ্চয় ও ভারতে কমিউনিজমের প্রচার, বিপ্লবীদের শক্তি সঞ্চয়, অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা, বিপ্লবীদের হাতে ক্ষমতা গেলে পণ্যের বাজার বিনষ্ট হবে আশংকায় সুচতুর ইংরেজ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব করে। কংগ্রেসের দাবি অখণ্ড ভারত-মুসলিম লীগের দাবি পাকিস্তান। অবশেষে পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে এই বিষয় স্থির হবে সাব্যস্ত হলো। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় ফরিদপুরের মুসলমানগণের মধ্যে বিপুল সাড়া পড়ে যায়। মুসলমান নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগের পক্ষে এবং হিন্দু নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের পক্ষে প্রচার কার্য শুরু করে। এই নির্বাচনের ফলে ভারত ও পাকিস্তানের উদ্ভব।

### মুসলিম লীগ (১৯০৬–১৯৪৭)

কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত হিন্দুদের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। প্রথমদিকে মুসলমানরা

কংগ্রেসের রাজনীতিতে সক্রিয় ছিল। এই কারণে কংগ্রেস হিন্দু মুসলমান সকলের প্রতিনিধিত্ব দাবি করত। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে প্রমাণ হলো যে, কংগ্রেস হিন্দু জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্যই গঠিত হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানরা একটা স্বতন্ত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। ইতিপূর্বে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবোধ থেকে স্যার সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে আলীগড় আন্দোলন, ফরিদপুরের নবাব আবদুল লতিফের নেতৃত্বে মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি, ফরিদপুরের নবাব মীর মোহাম্মদ আলী প্রমুখের উদ্যোগে সেন্ট্রাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকার শাহবাগে মুসলিম নেতাদের এক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে মুসলিম লীগ স্থাপিত হয়। এই সম্মেলনে ফরিদপুরের কৈজুরী নিবাসী খানসাহেব ওয়াহিদুন নবী ত্রিশ বৎসর ফরিদপুর কোর্টের অবৈতনিক বিচারক এবং বিশ বৎসর কৈজুরী বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৬৪ সালে ৮৯ বৎসর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

এই সম্মেলনে মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার রক্ষা এবং বৃটিশ সরকার ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষা মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনে গুরুত্ব আরোপ করেন। হিন্দুগণ মুসলিম লীগের এই নীতির কঠোর সমালোচনা করেন।

১৯১৩ সালে মুসলিম লীগের পুনর্গঠনের চেষ্টা করা হয়। এই প্রচেষ্টার প্রধান ছিলেন মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯১৩ সালের শেষভাগে তিনি কংগ্রেস থেকে মুসলিম লীগে যোগ দেন। ইতিপূর্বে ১৯০৬ থেকে তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মুহম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে এই উপমহাদেশের মুসলমানরা মুসলিম লীগের পতাকাতলে সংঘবদ্ধ হতে থাকে।

বাংলার মুসলমানরা মুসলিম লীগের পতাকাতলে সংগঠিত হয় দেরিতে। অনেক দিন পর্যন্ত বাংলার মুসলমানরা কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন অথবা সংস্কারমূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভাগ্যোন্নয়নে সচেষ্ট থাকেন। ১৯২৯ সালে কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী মুসলমানের একাংশের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা সমিতি গঠিত হয়েছিল। বাংলার রাজনীতির প্রধান ধারা কৃষক আন্দোলন হওয়ায় এবং এ,কে ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী, মওলানা আকরাম খাঁ, তমিজ উদ্দিন খাঁর মতো বিশিষ্ট নেতারা কৃষক প্রজা সমিতির সঙ্গে যুক্ত থাকায় প্রথমদিকে মুসলিম লীগের সংগঠন এতদাঞ্চলে ফলপ্রসূ হয়নি।

১৯৩৬ সালের পূর্বে শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে মুসলিম লীগে পাওয়া সম্ভব হয়নি। এ,কে, ফজলুল হক একই সঙ্গে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ করতেন। ১৯২৯ সালের দিকে এ,কে ফজলুল হক মুসলিম লীগ পুনর্গঠনে তৎপর হলেও প্রধানত তিনি কৃষক প্রজা সমিতির নেতা হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। ১৯৩০ সালেও তাই এ,কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে পটুয়াখালীর বরগুনা থানায় কৃষক প্রজা সম্মেলনী হতে দেখা যায়। ১৯৩৫ সালে এ,কে ফজলুল হক মুসলিম লীগের সামন্তবাদী বুর্জোয়াদের অসৌজন্যমূলক ব্যবহারে কৃষক প্রজা সমিতির সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৭ সালে রাজনৈতিক স্বার্থে মুসলিম লীগের সঙ্গে ফজলুল হক যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৯৩৭ সালে এ.কে. ফজলুল হক কৃষকপ্রজা সমিতিকে বিস্মৃত হয়ে মুসলিম লীগ সংগঠনে পুনরায়

আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর সমর্থক কৃষক প্রজা সমিতির সদস্যরাও মুসলিম লীগে দলে দলে যোগদান করেন। লাহোর প্রস্তাবে অব্যবহিত পরে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ফজলুল হককে মুসলিম লীগ থেকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বহিষ্কারের ব্যবস্থা করেন।

আসাম প্রদেশে মুসলিম লীগের নেতৃত্ব দেন মওলানা ভাসানী। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তাকেও পছন্দ করতেন না। মওলানা ভাসানী প্রথমে কংগ্রেসে (১৯১৯ সনে) যুক্ত ছিলেন। তিনি কৃষক রাজনীতির সূত্রপাত ঘটান ১৯২৬ সালে। ১৯৩০ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করার পর মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯৩১ খৃ. মহাত্মা গান্ধীর আহূত নিখিল ভারত নেত্রী সম্মেলনে ডা. প্রতাপচন্দ্র গুহরায় এবং মোয়াজ্জেম হোসেন লাল মিয়া ফরিদপুরের প্রতিনিধি হিসেবে সম্মেলনে যোগদান করেন। এই সময় কংগ্রেসী মুসলিম সদস্যগণ কংগ্রেসের মুসলিম স্বার্থরক্ষার বিষয়ে সন্দিহান হলেও কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করে মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে স্বচেষ্ট হন। এ সময়ে লক্ষ্ণৌতে মাহমুদাবাদের রাজা সাহেবের উদ্যোগে স্যার আলী ইমামের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত জাতীয়তাবাদী মুসলিম সম্মেলন আহুত হয়। এই সম্মেলনে ফরিদপুরের চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন লাল মিয়া, গোলাম গফুর প্রমুখ চৌধুরী যোগদান করেন। সম্মেলনের পর পরই ফরিদপুরে ডা. আনসারীর সভাপতিত্বে বাংলার জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের এক সম্মেলন হয়। সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন লাল মিয়া এবং সম্পাদক ছিলেন গোলাম গফুর চৌধুরী। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ সরকার দেশবাসীর নিকট আভ্যন্তরীণ শাসনের কিছু অংশ ন্যস্ত করেন 'ভারত বিধান' অনুযায়ী দেশ যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করল তাতে মূল সমস্যার সমাধান না হয়ে তিক্ততারই সৃষ্টি করে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ব্যবধান ক্রমশই প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর হতে থাকে এবং বৃটিশ প্রদত্ত ক্ষমতার সুযোগ-সুবিধাকে কতটুকু ভোগ করবে তারই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অনুযায়ী নির্বাচনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ অবতীর্ণ হয়।

১৯৩৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা সমিতির মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। নির্বাচনে মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা সমিতি আধা-আধি আসন অর্জন করে। কোনো দলের পক্ষেই একক মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব ছিল না। আলাপ আলোচনা শেষে কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এ,কে ফজলুল হক প্রধানমন্ত্রী হলেন। পুনরায় মুসলিম লীগে যোগদান করে কৃষক প্রজা পার্টি সংগঠনের কাজ বাদ দিয়ে মুসলিম লীগের কাজ শুরু করেন। তিনি নিজেই হলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি। ফরিদপুরের ইউসুফ আলী চৌধুরী মোহন মিয়া ফরিদপুরে মুসলিম লীগের প্রধান সংগঠক ছিলেন। ১৯৩৩-৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি ফরিদপুরে আঞ্জুমান রশিদুল ইসলামের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩৭ সালে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ঐ বছরই তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪০ সালে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কার্যকরী পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৪০ সালে তিনি ফরিদপুর মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। মুসলিম লীগের অন্যতম সংগঠক ইউসুফ আলী চৌধুরী মোহন মিয়া পাকিস্তানের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'কিং মেকার রূপে' পরিচিত। সমগ্র ফরিদপুরের ওপর তাঁর প্রভাব দীর্ঘদিন অটুট

ছিল। প্রাদেশিক লীগ সংগঠন এবং লীগ সমর্থিত উদ্যোগ ও আন্দোলনে স্বাবলম্বী মোহন মিয়ার আর্থিক সাহায্যের পরিমান ছিল উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে প্রথম তিনটি নামের মধ্যে ইউসুফ আলী মোহন মিয়ার নামটি ছিল দ্বিতীয় স্থানে। অপর দু'জন হচ্ছেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও চট্টগ্রামের সুলতান আহমদ। ফরিদপুরের আবদুস সালাম খান উকিল ছিলেন মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক। ফরিদপুরে ঐ সময়ে মুসলিম লীগের অন্য নেতৃবৃন্দ ছিলেন খান বাহাদুর মুহম্মদ ইসমাইল উকিল, ইউসুফ হোসেন চৌধুরী (বেলগাছি) শামসুদ্দিন খন্দকার, আলিমুদ্দিন আহমদ, আহমদ আলী মৃধা, মওলানা আবদুল আলী, আবদুর রহমান হাওলাদার, আবদুল জলিল, আবদুল হামিদ চৌধুরী, কাজী রোকনউদ্দিন, আবদুর রাজ্জাক মোক্তার, আবদুল হামিদ মল্লিক আবদুল মজিদ। ফরিদপুরের নগর সুন্দরদীর 'কোরানে'র অনুবাদক আবদুল হাকিম ১৯৪০ সালে বাংলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সহসম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের পার্লামেন্টারি বোর্ড ও জেনারেল কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৫৭ সালে স্বাধীনতার অল্প আগে তিনি নীতিগত কারণে মুসলিম লীগ থেকে বের হয়ে আসেন এবং রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ফরিদপুরের তমিজ উদ্দিন খান ১৯৩০ সালে কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৪২ সালে খাজা নাজিম উদ্দিনের নেতৃত্বে গঠিত মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভায় তিনি শিক্ষামন্ত্রীর পদে মনোনীত হন। অতঃপর তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৫-৪৬ সালে ইন্ডিয়ান লেজিস লেটিভ এ্যাসেম্বলির সদস্য ও ইন্ডিয়ান কন্সটিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলির সদস্য নির্বাচিত হন। মুসলিম স্বার্থরক্ষায় কংগ্রেসের অনমনীয় মনোভাবে মুসলিম নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের জন্যে ভারতে স্বতন্ত্র আবাসভূমির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ১৯৪০ সালের ২৩ শে মার্চ লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নির্দেশে এ.কে. ফজলুল হক ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হলে অনেক মুসলিম নেতৃবৃন্দের মতো ফরিদপুরের মোয়াজ্জেম হোসেন লাল মিয়ার রাজনৈতিক মতবাদেরও পরিবর্তন ঘটে এবং ১৯৪৩ সালে তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিখিল ভারত মুসলিম লীগে যোগদান করেন।

১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতদের সাহায্যের জন্য মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী লাল মিঞাকে সেক্রেটারি করে মুসলিম লীগের পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন। পাকিস্তান ইস্যুর ওপর দেশব্যাপী যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে তিনি জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করেন। ফরিদপুরের কংগ্রেসকর্মী গোলাম গফুর চৌধুরীও ইতিমধ্যে মুসলিম লীগে যোগদান করেন।

১৯৪১ সালের ৩০ শে ডিসেম্বর মওলানা আকরাম খাঁ প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনদিন পর মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ প্রদেশব্যাপী এক দীর্ঘ সফর শুরু করেন। স্যার নাজিম উদ্দীন, সোহরাওয়ার্দী, তমিজ উদ্দিন খান, মোয়াজ্জেম হোসেন, ফজলুল কাদির, আবদুল ওয়াসেক সফরের উদ্দেশ্যে কলকাতা ত্যাগ করেন। উল্লেখিত নেতৃবন্দ নোয়াখালি, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তৃতা করেন। এ সময়ে ফরিদপুরের

জনসভায় আপত্তিকর বক্তৃতাদানের অভিযোগে কুমিল্লার পথে চাঁদপুরে গ্রেফতার করে পুলিশ বিচারের জন্য ফজলুল কাদির চৌধুরীকে ফরিদপুরে প্রেরণ করেন। এই সংবাদে ভৈরব থেকে সোহরাওয়ার্দী তার যোগে ফরিদপুরে ফজলুল কাদির চৌধুরীকে দলের অভিনন্দন জানান এবং ফরিদপুর জেলা মুসলিম লীগকে আদালতে তাঁকে সমর্থনের ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেন। ১৯৪২ সালে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন মুহম্মদ আলী জিন্নাহ। তিনি ভাষণে বলেন, মন্ত্রিত্ব মুসলিম লীগের লক্ষ্য নয়– লক্ষ্য হচ্ছে লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়ন। এই কনফারেন্সের স্থান নির্বাচনে ফরিদপুরের নাম উল্লেখিত হয়েছিল। সিরাজগঞ্জ কনফারেন্সে ফরিদপুর থেকে প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। ওয়াহিদুজ্জামান ১৯৪২ সালে বেঙ্গল লেজিস লেটিভ এস্মেবলীর সদস্য ও অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ কাউন্সিলার নির্বাচিত হন। ১৯৪২ সালের মাঝামাঝি সময় এ.আর.পি (এয়ার রেইড প্রিকশেন) নাম দিয়ে বাংলায় একটি বিভাগ খোলা হয়। এই বিভাগের জন্যে হাজার হাজার লোক সংগ্রহের সময় দেখা যায় মুসলমানরা শতকরা কুড়িটিও চাকুরি পায় নাই। ফলে মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। মন্ত্রীসভার এই কার্যের প্রতিবাদে ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ফরিদপুরে একটি সম্মেলনে এ, কে ফজলুল হকের সমর্থকদের সমালোচনা করা হয়। ফরিদপুরের সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে ফরিদপুরের ইউসুফ আলী চৌধুরী মোহন মিয়া ব্যক্তিগত তহবিল থেকে বিশ সহস্রাধিক টাকা ব্যয় করেন।

১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ফরিদপুর মুসলিম লীগ বেসামরিক প্রতিরক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (Civil defence training center) সংগঠিত হয়। পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহ থেকে মুসলিম লীগের কর্মীরা সমবেত হয়েছিল। ইউসুফ আলী চৌধুরী মোহন মিয়া এবং আবদুস সালাম খান তখন ছিলেন ফরিদপুর মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারি। মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাসিম ফরিদপুর আসেন এবং এক সপ্তাহ অবস্থান করেন। রেলষ্টেশনে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন জেলা বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট। ইউসুফ আলী চৌধুরী মোহন মিয়া ও আবদুস সালাম খান মুসলিম লীগের খাজাদের দলভুক্ত ছিলেন।

১৯৪৩ সালে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানী বড়পেটায় এক সম্মেলনের আয়োজন করেন। এই সম্মেলনে ফরিদপুর থেকে চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন (লালমিয়া) অংশগ্রহণ করেন।

সর্বভারতীয় লীগের নির্দেশে বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগ কাউন্সিল ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, নুরুল আমিন, স্যার নাজিম উদ্দিন, ফজলুর রহমান, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন লাল মিয়া, আহমদ হোসেন ও রাগিব আহসানের সমন্বয়ে প্রাদেশিক লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন করে। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে লীগ প্রার্থী মনোনয়নের দায়িত্ব এই বোর্ডের ওপর অর্পিত হয়। এই বোর্ডের উর্ধ্বতন ছিল সর্বভারতীয় লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড।

প্রাদেশিক পরিষদের একশত উনিশটি মুসলিম আসনের জন্য প্রার্থী বাছাই ছিল এক দুরূহ ব্যাপার। প্রার্থী সংখ্যা ছিল অনেক। ফলে নবগঠিত পার্লামেন্টারি বোর্ড সরেজমিনে জনমত সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরের প্রথম দিকে সদস্যরা

সফরে বের হয়। এই পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্যদের সঙ্গে ইউসুফ আলী চৌধুরী মোহান মিয়া রাজবাড়ী স্টেশন পর্যন্ত দলভুক্ত ছিলেন। এখানে রাজবাড়ী স্টেশনে তৎকালীন ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে প্রায় পাঁচ হাজার লোকের এক জনতা নেতৃবর্গের সংবর্ধনার জন্য উপস্থিত হয়। গোয়ালন্দ ঘাটেও অনুরূপ তিন হাজার ছাত্র জনসাধারণ নেতৃবৃন্দকে সংবর্ধিত করেন।

ফরিদপুরের খানখানাপুরের তমিজ উদ্দিন খানের ১২০২৪টি ভোটের বিরুদ্ধে স্যার গজনভী পান মাত্র ৭৭০টি ভোট। এই পরাজয়ের পরে তার দীর্ঘ এবং বিচিত্র রাজনৈতিক জীবনের অবসান ঘটে।

কেন্দ্রীয় পরিষদে বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট ছয়টি আসনেই লীগ মনোনীত প্রার্থীগণ বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেন। এঁরা ছিলেন আবদুর রহমান সিদ্দিকী, স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দী, তমিজ উদ্দিন খান, হাজী ইসমাইল খান চৌধুরী, শেখ রফিউদ্দিন সিদ্দিকী ও আবদুল হামিদ শাহ।

মুসলিম লীগ নির্বাচনী অভিযানে ফরিদপুরের চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন লালমিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রংপুরের কুড়িগ্রামের একটি জনসভায় লাল মিয়া ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতা প্রসঙ্গে মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ্ যুগ বিচিত্রা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। 'বক্তৃতাটি শ্রোতাদের খুব ভালো লেগেছিল বলিয়াই বোধ হয় তাহারা ঘনঘন পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি দিতেছিল। মঞ্চের অদূরে উপবিষ্ট অনুমান পঁচাত্তর বৎসর বয়স্ক একজন বৃদ্ধলোক গলার স্বরচড়া করিয়া প্রত্যেকবার জিন্দাবাদ ধ্বনি করিতেছিলেন। হঠাৎ তাহার উপর আমার নজর পড়ে। শীতে কাঁপিতেছিলেন, কিন্তু উৎসাহের আতিশয্যে সেদিকে তাহার ভ্রুক্ষেপ ছিল না। লালমিয়ার বক্তৃতা শেষে এই বৃদ্ধ লোকটি এত জোরে জিন্দাবাদ ধ্বনি দিতে থাকেন যে, সমবেত লোকদের কণ্ঠধ্বনি তাহাতে তলাইয়া যায়। কৌতূহলবশত স্থানীয় একজন লীগ কর্মীকে লইয়া আমি তাহার নিকট যাই। এত জোরে জিন্দাবাদ ধ্বনি দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন, আমার বরাত মন্দ। পাকিস্তান দেখে যেতে পারলাম না সাহেব। শুধু নাম নিয়ে যাই।"

গাইবান্ধার সভাটিও বেশ জমেছিল। এই সভায় লালমিয়া বক্তৃতা করেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে গাইবান্ধা ছিল উল্লেখযোগ্য। কংগ্রেসকর্মী হিসেবে চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন লাল মিয়া এই এলাকায় বেশ সুপরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় কংগ্রেস ত্যাগের কারণ বর্ণনা করেন। স্থানীয় মুসলমানদের ওপর কংগ্রেসের প্রভাব ছিল। লালমিয়ার বক্তৃতায় তারা সন্তোষ প্রকাশ করেন।

১৯৪৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর শহর গোপালগঞ্জে মুসলিম লীগের এক সম্মেলনের আয়োজন করেন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। সম্মেলনে মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় নেতা আবুল হাশিম, কলকাতা পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি কমিশনার শামসুদ্দোহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলন প্রসঙ্গে আবুল হাশিম স্মৃতিকথায় লিখেছেন "ডাকবাংলোর ধারে নদীতে গ্রিনবোটে শামসুদ্দোহাকে দেখতে পেলাম।... সকালে নদীতে যখন আমি গোছল করছি দেখলাম দ্রুতগামী দেশীয় নৌকায় চড়ে রামদা নিয়ে কতগুলি যুবক এগিয়ে আসছে। ... জিজ্ঞাসা

করায় জানতে পারলাম এরা গ্রীনবোটের বৃদ্ধলোকটির দলের লোকজন। অর্থাৎ এরা শামসুদ্দোহার লোকজন। ... ফরিদপুর জেলায় আমি কখনো শান্তিপূর্ণভাবে বক্তৃতা দিতে পারিনি। ফরিদপুরের নেতারা যখন যেমন প্রয়োজন পড়তো শক্তি ও বল প্রয়োগে নিজেদের নিয়োজিত রাখতেন।

জনসভায় দেখতে পেলাম বেশ কিছু সংখ্যক লোক রামদা নিয়ে সজ্জিত রয়েছে। মঞ্চে চারটি চেয়ার রাখা ছিল। একটি সোহরাওয়ার্দীর জন্য অন্য তিনটি আমাদের জন্য। সোহরাওয়ার্দীর ডান পাশে শামসুদ্দোহা বসেছিলেন। মঞ্চের কাছে সশস্ত্র পুলিশেরও উপস্থিতি ছিল। মঞ্চের সম্মুখভাগে দুই সারি বেঞ্চ রাখা ছিল। একটি সোহরাওয়ার্দীর জন্য অন্য তিনটি আমাদের জন্য। সোহরাওয়ার্দীর ডান পাশে শামসুদ্দোহা বসেছিলেন। ডান পাশে বসেছিলেন আবদুস সালাম খানের সমর্থক কতকগুলো যুবক এবং বামপাশে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে। দুইদলের মধ্যে কিছু বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হলো এবং পরবর্তীকালে রামদা সুসজ্জিত দুইদলের লোকজনদের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হলো। শামসুদ্দোহা তাঁর পকেট থেকে একটি টোটা ভর্তি রিভলবার বের করলেন। সোহরাওয়ার্দী মঞ্চ থেকে নেমে সোজা জনতার ভীড়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলেন। গণ্ডগোল থেমে গেল এবং লোকজন শান্তভাবে মাঠে উপবেশন করলো। সম্মেলন শান্ত ভাবে শেষ হলো। শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বাড়িতে আমাদেরকে নিয়ে গেলেন এবং বিকালে সেখানে চা-চক্রে আমাদের আপ্যায়িত করলেন।"

১৯৪৬ সালের আসন্ন নির্বাচনে লীগ মনোনীত প্রার্থী ফরিদপুরের তমিজউদ্দিন খানের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন স্যার আবদুল হালিম গজনভী। মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ তমিজউদ্দিনের নির্বাচন অভিযান উপলক্ষে একটি কবিতা প্রচার করেন। তমিজউদ্দিন খান কবিতাটি মুদ্রিত করে নির্বাচকমণ্ডলীতে বিলি করেন। কবিতাটি ছিল নিম্নরূপ :

বরিশালের হক সাহেব,
দিলদুয়ারের গজনভী,
রতনপুরের নওয়াব সাহেব
করছেন ভোটের দাবী
জানি মোরা ওঁরা সব
কংগ্রেসীদের দলে
সুযোগ পেলে ছুরি দেবেন
মুসলমানদের গলে।
হাকিয়ে তাঁদেরে তাই
মুসলিম লীগের নামে
বারণ করে দে-আর কভু
আসেন না এ গ্রামে
খোদা তমিজখানের
পুরাও মনের সাধ
মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ
কায়দে আজম জিন্দাবাদ।

স্যার আবদুল হালিম গজনভীর সমর্থনে এ. কে. ফজলুল হক, নবাব হাবিবুল্লাহ, নওয়াব কে. জি. এম. ফারুখী এবং এলাকার হিন্দু জমিদারগণ প্রচারকার্য চালিয়েছিলেন। স্যার গজনভী প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ কেন্দ্রীয় পরিষদে এই এলাকায় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করে আসছিলেন। নয়াদিল্লির সরকারি মহলে তাঁর দারুণ প্রভাব ছিল। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থী তমিজ উদ্দিন খান ছিলেন এই এলাকায় প্রায় অপরিচিত। ১৯৪৫ সালের ১০ থেকে ১১ই ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ, লালমিয়া, তমিজউদ্দিন খানের বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'তমিজউদ্দিন খানের বক্তৃতা শুনিলে মনে হইত নোয়াখালীর কোন মডার্ন মওলবী সাহেব মিলাদ পাঠ করিতেছেন। চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন (লালমিয়া) ভালো বক্তৃতা করিতেন। লালমিয়া প্রায় বিশ বৎসর কংগ্রেসের সহিত জড়িত থাকিয়া জনসাধারণের নাড়ীনক্ষত্র সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছিলেন। সভার হাবভাব বুঝিয়া তিনি বক্তৃতা করিতেন এবং শ্রোতাদের নিকট হইতে প্রচুর বাহবা লাভ করিতেন।"

প্রাদেশিক পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্যগণের দীর্ঘ নির্বাচনী সফরে এবং মুসলিম লীগের হাজার হাজার ছাত্র এবং যুবকর্মীকে দুটি এলাকা ছাড়া আর কোথাও উল্লেখযোগ্য কোনো বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হয়নি। এই এলাকা দুটো হচ্ছে গফরগাঁও ও পটুয়াখালী। এই দুটোর মধ্যে গফরগাঁওকে নানা কারণে লীগ বিরোধী দলের সুদৃঢ় দুর্গরূপে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ময়মনসিংহ জেলার লীগ নেতৃবর্গের বিশেষ অনুরোধে প্রাদেশিক লীগ কর্তৃপক্ষ ১৯৪৬ সালের ১২ই জানুয়ারি গফরগাঁয়ে ময়মনসিংহ জেলা লীগের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠানের অনুমতি প্রদান করে লিয়াকত আলী খানকে সভাপতিত্ব করতে অনুরোধ জানান। অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন নুরুল আমিন। প্রাদেশিক লীগ নেতৃবর্গ সমভিব্যাহারে লিয়াকত আলী খান ১২ই জানুয়ারি দ্বিপ্রহরে গফরগাঁও পৌঁছলে দু'হাজার লোক লাঠি, বল্লম, তলোয়ার ইত্যাদি হাতে সভামণ্ডপ থেকে বেশ খানিকটা দূরে হৈ চৈ করতে থাকে। সভার চল্লিশ হাজার লোকের চোখেমুখে বিরক্তিতে ভীত হয়ে তিনি পশ্চাদপসরণ করেন। এইসব লোক মওলানা শামসুল হুদা নামক স্থানীয় একজন আলেমের অনুচর ছিলেন। সম্মেলনে শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আজাদ সোবহানী, আবুল হাশিম, তমিজউদ্দিন খান, আবুল মুনসুর আহমদ, লালমিয়া ও হাবিবুল্লাহ বাহার বক্তৃতা করেন। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট সংগ্রাম দিবস উদযাপনের জন্যে মুসলমানদের প্রতি লীগ ওয়ার্কিং কমিটি আহবান জানায়। বাংলা ও সিন্ধু প্রদেশ ছাড়া অপর কোনো প্রদেশে সেই সময় লীগ সমর্থক মন্ত্রীসভা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল না। কিন্তু সিন্ধুর মন্ত্রিসভা এবং লীগ নেতৃবর্গ সম্পর্কে নিন্দা করে কিছু বলারও উপায় ছিল না। ফলে সমস্ত চাপ পড়ে বাংলায়। হিন্দুরা মনে করল সংগ্রামটা পরিচালিত হবে তাদেরই বিরুদ্ধে। পক্ষান্তরে নিখিল ভারত লীগ ওয়ার্কিং কমিটির ন্যায় প্রাদেশিক লীগ কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত ছিলেন ১৯৩৯ সালের নাজাত দিবসের ন্যায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসও নির্বিঘ্নে উদযাপিত হতে পারবে। প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী উৎসাহের আতিশয্যে ঘোষণা করলেন ১৬ই আগস্ট অফিস আদালত বন্ধ থাকবে। কোনো রাজনৈতিক সংস্থার কোনো নির্দেশ পালনের জন্য ইতিপূর্বে অফিস আদালতে ছুটি ঘোষণা হতে দেখা যায়নি। ফলে হিন্দুদের সন্দেহ আরও দৃঢ়তর হয়।

সুতরাং, আক্রান্ত হওয়ার পরিবর্তে আক্রমণ করার জন্যে তারা সম্ভাব্য সর্বপ্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসকে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হয়। এই দাঙ্গায় বিশ সহস্র নিরপরাধ মুসলমান নরনারী মৃত্যুবরণ করে। এই দাঙ্গায় কলকাতার মুসলমানরা অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ তিন বীর হৃদয়ের কাছে। এই তিনজন হলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, কুষ্টিয়ার শামসুদ্দিন আহমদ ও ফরিদপুরের চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন লালমিয়া। ভারতের বিহারের দুটো জেলায় নৃশংসভাবে অর্ধলক্ষ মুসলমানকে হত্যা করা হয়। এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে ভারতের অবস্থা ক্রমশ জটিল রূপ ধারণ করে হিন্দু মুসলিম সম্পর্কে চরম অবনতি ঘটে। ফলে বিলেতের প্রধানমন্ত্রী এটলী ১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি বিলেতের কমন্স সভায় ভারতবাসীর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করেন। অতঃপর ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান ও ভারতের সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের পশ্চিমাংশ গঠিত হলো—সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব এবং পূর্ববঙ্গ (কলকাতা বাদে) ও আসামের কিয়দংশ লয়ে গঠিত হলো পূর্ব পাকিস্তান। হিন্দু মুসলিম বুর্জোয়া নেতৃত্বে আপোষের পথে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্য দিয়ে ভারত পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল। এই আন্দোলন ছিল সামন্তবাদী বুর্জোয়াদের শ্রেণী স্বার্থের আন্দোলন। হিন্দু পুঁজিপতি সামন্তবাদীদের সঙ্গে মুসলিম পুঁজিপতি সামন্তবাদীদের দ্বন্দ্বের ফল ভারতের এই ভাগ বাটোয়ারা—জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের কথা তাই উচ্চারিত হলেও স্বাধীন পাকিস্তানে এদেশের জনগণ হলো উপেক্ষিত– শুরু হলো মুসলিম লীগের বিরোধী রাজনীতি– আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম—সর্বোপরি পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের দ্বন্দ্ব।

১৯৪৭ থেকে ৭১ পর্যন্ত মুসলিম লীগের নেতৃত্বের মধ্যে ছিলেন আবদুল হামিদ মল্লিক, মওলানা সামসুল হক, ওসমান খাঁ, মনসুর আহমেদ খা. খোন্দকার মুহম্মদ হোসেন, তকি মোল্লা, সামসুদ্দিন চৌধুরী, ডা. আসজাদ, কাজী হারুন অর রশিদ, খন্দকার আবুল হোসেন, আবদুল জলিল মিঞা, আদেল উদ্দিন হাওলাদার, লুৎফর রহমান, জাহাঙ্গীর হোসেন, পীর বাদশা মিঞা, ইউসুফ হোসেন চৌধুরী, দারকানাথ, আলিমুজ্জামান, মোসলেম উদ্দিন মৃধা, ফায়েকুজ্জামান, মোহসেন উদ্দিন দুদুমিয়া, ভবানী শংকর বিশ্বাস, আবদুর রাজ্জাক মিয়া, আবদুর রাজ্জাক শিকদাব, আবদুর রহমান বাকাউল, আবদুস সোবহান মোল্লা, ছরওয়ার জান মিয়া, আবদুল বারী মিয়া, মকিম উদ্দিন শিকদার, নুরুউদ্দিন আহমেদ, আফসার উদ্দিন আহমদ প্রমুখ।

**খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন**

ইংরেজ শাসক মুসলমানদের হাত থেকেই ভারতের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিল। এই কারণে ইংরেজ বিরোধী মনোভাব মুসলমানদের মনে কম বেশি ছিল। হিন্দুরা যেখানে ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে সুবিধা গ্রহণ করেছিল মুসলমানেরা সেখানে আত্মাভিমানে দূরে সরে দাঁড়িয়েছিল।

যুদ্ধে (১৯১২) মুসলমানদের ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব নতুন রূপে দেখা যায়। তুরস্কের সুলতান ভারতের অধিকাংশ মুসলমানের ধর্মনেতা হিসেবে বিবেচিত হতেন। এই কারণে একটি মুসলিম প্রধান ইসলামী রাষ্ট্রের সঙ্গে পাশ্চাত্য শক্তির দ্বন্দ্বে মুসলমানরা

তুরস্কের পক্ষ অবলম্বন করেন। তুরস্কের পক্ষে জনমত গঠনে মওলানা মুহম্মদ আলী ও মওলানা শওকত আলী ভ্রাতৃদ্বয় এক দুর্বার আন্দোলন শুরু করেন। এইভাবে ভারতে ইংরেজ বিরোধী খেলাফত আন্দোলন শুরু হয়।

১৯১৫ সালে আলী ভ্রাতৃদ্বয়কে ইংরেজ সরকার বন্দি করে। ১৯১৬ সালে ইংরেজরা মওলানা আবুল কালাম আযাদকে প্রথমে কলকাতা থেকে বহিষ্কারের পরে গৃহে অন্তরীণ করে। ১৯২০ সালে আহসান মঞ্জিলে খেলাফত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নবাব খাজা হাবিবুল্লাহ্ অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন। সম্মেলনে আলী ভ্রাতৃদ্বয়, মওলানা আবুল কালাম আযাদ, মওলানা আযাদ সোবহানী, মওলানা ইসলামাবাদী, মওলানা আকরাম খা, মৌ মজিবর রহমান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন।

এই সময় মহাত্মাগান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস নূতন শক্তি ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে। তিনি অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। ১৯২০ সালে সারাদেশ ব্যাপী খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন এক দুর্বার গণআন্দোলনে পরিণত হয়। হিন্দু মুসলমান এক সংগে আন্দোলন করতে থাকে। মহাত্মাগান্ধী ও আলী ভ্রাতৃদ্বয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। দেশবন্ধু সিআর দাস আন্দোলনে যোগ দেন। অচিরেই খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন এক শক্তিশালী গণআন্দোলনে পরিণত হয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূলে আঘাত হানে। আলী ভ্রাতৃদ্বয় মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মতিলাল নেহেরু প্রভৃতি নেতাগণের কারাদণ্ড হয়। এই সময়ে ফরিদপুরের মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী লালমিয়া, মৌলবী তমিজ উদ্দিন খান, বাহাদুরপুরের পীর বাদশা মিঞা, মাদারীপুরের হাজী নয়ান শরীফ সরকার, শরমঙ্গলের মোজাহার মিঞা, বোয়ালমারীর চাঁদমিঞা, কফিল উদ্দিন মিঞা, বিলনালিয়ার মোজাহার চোকদার, ভাঙ্গার গোলাম গফুর চৌধুরী প্রভৃতি মুসলিম নেতৃবৃন্দ ফরিদপুরে অসহযোগ খেলাফত আন্দোলনকে শক্তিশালী করেন। এ আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্য পীর বাদশা মিঞা, লালমিয়া, হাজী নয়ান শরীফ সরকার, গোলাম গফুর চৌধুরী, শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী, ডা. সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১৯২১ সালে কারাবরণ করতে হয়। অসহযোগ আন্দোলনের সময় ফরিদপুরের বিপ্লবীদের মধ্যে একাংশ কংগ্রেসে যোগদান করেন। এর মধ্যে প্রতাপচন্দ্র গুহরায়, যদুনাথ পাল, প্রমথ গুহ প্রমুখ অন্যতম। ফরিদপুরের কংগ্রেসের প্রখ্যাত নেতা অম্বিকাচরণ মজুমদার ১৯২১ সালে National Liberal Association প্রতিষ্ঠা করে এক সঙ্গে খেলাফত অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। এই খেলাফত অসহযোগ আন্দোলনে ফরিদপুরের মোহাম্মদ ইব্রাহিম, মাদারীপুরের ফণীভূষণ মজুমদার রাজবাড়ীর মিসেস চারুপ্রভা সেন, সোনাপুরের নরেশ ঘোষ, কোরকদির অনিল লাহিড়ী, অমল সান্যাল, শ্যামল ভট্টাচার্য, মাদারীপুরের শান্তি সেন, রাতৈলের ডা. সাইদউদ্দিন সিদ্দিকী, পাংশার রওশন আলী চৌধুরী, এয়াকুব আলী চৌধুরী, তমিজউদ্দিন খান, লাল মিয়া ও আবদুল আজিজ খন্দকার অংশগ্রহণ করেন।

ফরিদপুরের নড়িয়ার অধিবাসী কংগ্রেসের প্রখ্যাত নেতা ডা. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম নেতা। তিনি এই আন্দোলন করে গ্রেফতার হন। তিনি ছিলেন সমাজহিতৈষী চিরকুমার ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি কুমিল্লায় 'অভয় আশ্রম' নামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি হিন্দু মহাসভা, কংগ্রেস, কৃষক প্রজা, মজদুর পার্টি ইত্যাদির সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে যুক্ত ছিলেন। তমিজউদ্দিন খান ১৯২০ সালে আইন ব্যবসা ত্যাগ করেন এবং অসহযোগ খেলাফত আন্দোলনে শরিক হন। তিনি ফরিদপুর কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক এবং ফরিদপুর খেলাফত কমিটির সহ-সভাপতির পদ লাভ করেন। ১৯২১ সালে তিনি খেলাফত অসহযোগ আন্দোলনের জন্যে কারাবরণ করেন।

পাংশার সাহিত্যিক ইয়াকুব আলী চৌধুরী ১৯২০ সালে শিক্ষকতা পরিত্যাগ করে খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি কংগ্রেসের কর্মী ছিলেন। আন্দোলন করার জন্যে তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। ফরিদপুরের সতীন্দ্রনাথ সেন পটুয়াখালীতে অসহযোগ খেলাফত আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

## কৃষক প্রজা সমিতি (১৯২৯-১৯৪৭)

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ছিল মূলত মধ্যবিত্ত হিন্দু ও মুসলমানদের সংগঠন। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলে ভারত বর্ষে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু বিশ শতকের গোড়া থেকেই হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যে নানা জটিলতা সৃষ্টি করে। কংগ্রেসের অসাম্প্রদায়িক ঘোষণা সত্ত্বেও তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রভাব এবং কৃষকদের শ্রেণী শত্রুদের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। কংগ্রেসের অখণ্ড ভারতে এক জাতীয়তাবাদের স্বপ্ন এবং স্বার্থপরতা মুসলমানদের মধ্যে স্বাতন্ত্রবোধের সৃষ্টি করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯০৬ সালে প্রথমে মুসলমান সামন্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের জন্ম হয় এবং পরে কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী মুসলমানের একাংশের নেতৃত্বে ১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি এই সমিতির ঘোষণায় অসাম্প্রদায়িক বক্তব্য থাকলেও হিন্দু মুসলিম প্রশ্নে বিশেষ করে জমিদার মহাজন বনাম কৃষক খাতক এবং সামন্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বের কারণে কৃষক প্রজা সমিতি একটি সাম্প্রদায়িক দলে রূপ নেয়।

স্বাধীনতা আন্দোলনের ডাকে সর্ব শ্রেণীর জনসাধারণ কংগ্রেস মুসলিম লীগে শরীক হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতার সঙ্গে অর্থনৈতিক মুক্তির কোনো সুস্পষ্ট কার্যক্রম কংগ্রেস বা মুসলিম লীগের ছিলনা।

অথচ স্বাধীনতার সঙ্গে জনসাধারণের অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্নও রয়েছে। কবি নজরুলের ভাষায় 'ক্ষুধার শিশু চায়না স্বরাজ, চায় দুটোভাত একটু নুন।'

কৃষক প্রজা সমিতিতে সাধারণ জনগণের সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক কোনো কার্যক্রম ছিলনা সত্য, তবে কৃষক প্রজা সমিতির প্রকৃতি চরিত্রে কৃষক আন্দোলনের অল্প পরিমার্ণ অবস্থা ছিল। তাই কৃষক প্রজা সমিতির আন্দোলন জনপ্রিয়তা অর্জনে সমর্থ হয়েছিল। অর্থনৈতিক সুস্পষ্ট কার্যক্রম না থাকলে বৃটিশ রাজত্বের মূল স্তম্ভ জমিদার মহাজনের বিরুদ্ধে কৃষক খাতক সংঘবদ্ধ হয়েছিল একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের আশায়।

বাংলার কৃষকদের আন্দোলনের ঐতিহ্য ছিল কিন্তু বুর্জোয়া নেতৃত্ব ও হিন্দু মুসলিম প্রশ্নে তা সম্ভব হয়নি।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন কর্তা লর্ড কর্ণওয়ালিসের ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এদেশে জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল—সৃষ্টি হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী

বৃটিশের আজ্ঞাবহ খয়ের খাঁ সামন্ত শ্রেণীর। এদের অত্যাচার ব্যাভিচার উৎপীড়নের শিকার হলো কৃষকরা। এই জমিদার জোতদার সামন্ত প্রভুদের অকল্পনীয় অত্যাচার থেকে মুক্তির আশায় কৃষক সম্প্রদায় সংঘবদ্ধ হতে থাকে। অঞ্চল ভিত্তিক জমিদার বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে। এই জমিদার বিরোধী আন্দোলন ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে রূপ লাভ করে। একদিকে জমিদার জোতদার মহাজন ও ইংরেজ অন্যদিকে কৃষক প্রজার দল। ইংরেজ সৃষ্ট জমিদার বিরোধী আন্দোলনই বাংলার প্রধান আন্দোলনের ধারা। এই শ্রেণীদ্বন্দ্ব থেকেই বাংলার ফরিদপুরের হাজী শরীয়তুল্লাহ—পীর দুদুমিয়ার নেতৃত্বে ফরায়েজী আন্দোলন, তীতুমীরের নেতৃত্বে বাঁশের কেল্লা আন্দোলন ইত্যাদি সংঘটিত হয়েছিল। বাংলার কৃষকদের এই আন্দোলন শ্রেণী সচেতনতার প্রথম অবস্থা সংঘাতের মধ্যে সংঘবদ্ধ হবার ঐকান্তিক প্রয়াস ছিল। নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতিকে তাই এদেশের প্রথম শ্রেণী সংগঠন বলা চলে। এই সংগঠন সৃষ্টিতে রাজনৈতিক সচেতনতার চেয়ে সমাজবিকাশের প্রাধান্যই ছিল বেশি। এই সময়ে কৃষকদের সংগঠনের মূলে বিদ্যমান ছিল প্রধানত দুটো কারণ।

(ক) প্রথমত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে শরীক হওয়ার ফলে কৃষকদের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি (খ) দ্বিতীয়ত উনিশশো বিশের দিক থেকে কৃষকদের অবস্থার ক্রমশ দ্রুত অবনতি।

সাম্রাজ্যবাদ বৃটিশের ধারক সামন্তবাদী জমিদার শ্রেণী ছিল কৃষক প্রজা সমিতির শত্রু। পূর্ব বঙ্গের জমিদারেরা প্রধানত ছিলেন হিন্দু-কংগ্রেসের সমর্থক। কংগ্রেসের নীতি নির্ধারণ ও পরিচালনা করতেন অভিজাত সম্প্রদায় বিশেষ করে সামান্ততান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন আইনজীবীরা। বাংলার জমিদার মহাজনরা প্রধানত ছিলেন হিন্দু-প্রজা খাতকরা মুসলমান। তাই প্রজা সমিতির সদস্যরা ছিলেন কংগ্রেস বিরোধী। এই জমিদার মহাজনের সঙ্গে প্রজা খাতকের দ্বন্দ্ব হিন্দু মুসলিম সম্পর্কে সাম্প্রদায়িকতার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। এই অবস্থার মূলে ছিল হিন্দু মুসলমানের অসম অর্থনৈতিক অবস্থা এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্ব।

১৯২৮ সালে প্রজাসত্ত্ব আইন সংশোধনের বিতর্কে দেখা যায় আইন সভা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং অধিকাংশ হিন্দু সদস্যেরা জমিদারের পক্ষে এবং মুসলমানরা প্রজার পক্ষে ভোট দেয়। এই ভাবে প্রজাসত্ত্বের প্রশ্নের সাথে সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন জড়িয়ে পড়ে– যেহেতু বাংলাদেশের শ্রেণী বিরোধের ক্ষেত্রে জমিদার (হিন্দু)ও কৃষক (মুসলমান), মহাজন (হিন্দু) ও খাতক (মুসলমান)।

প্রজা আন্দোলন কৃষক শ্রেণীর আন্দোলন হলেও– এই আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রধানত দিয়েছিলেন সামন্ত চেতনায় আচ্ছন্ন স্যার খান বাহাদুর জাতীয় মুসলিম নেতারা। আন্দোলনের সঙ্গে সমাজবাদী বামপন্থী অল্প সংখ্যক কর্মী জড়িত ছিলেন। কিন্তু তারা নেতৃত্ব অর্জন করতে পারেননি। ফলে এই আন্দোলন সত্যিকার কৃষক আন্দোলনে রূপ লাভ করতে পারেনি। কংগ্রেস মুসলিম লীগের আন্দোলনের অনুরূপ না হলেও কৃষক আন্দোলন কৃষক স্বার্থের চেয়ে কৃষক প্রজা সমিতির প্রতিষ্ঠাতাদের রাজনৈতিক শ্রেণী স্বার্থে ব্যবহৃত হয়েছে বেশী– আন্দোলনের মধ্যে ক্ষমতার মোহে সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবেশ ঘটান হয়েছে।

একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে মুসলিম রাজনৈতিক নেতারা কৃষকদের নির্বাচনের

মাধ্যমে ব্যবহার করে নিজেদের শ্রেণী স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যেই প্রথমে প্রজা সমিতি প্রতিষ্ঠা এবং পরে নির্বাচনের মুখে তার নাম পরিবর্তন করে কৃষকপ্রজা সমিতি নামে নব রূপে গঠন করেন।

কৃষক আন্দোলনের প্রথম দিকে কমিউনিস্টদের প্রভাব ছিল অত্যন্ত কম। অধিকন্তু এ রাজনীতি ছিল সম্পূর্ণভাবে সামন্তশ্রেণীর আওতাধীন। এ জন্যেই দেখা যায় বিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত কৃষক সম্মেলনগুলোতে এ,কে ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী এবং অল্প সংখ্যক কমিউনিস্ট উপস্থিত থাকলেও তাতে সামন্তবাদী নেতারাই ছিলেন সংখ্যায় বেশি। এসব সত্ত্বেও বাংলাদেশে কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট প্রভাবাধীন কৃষক সমাজের এক ব্যাপক অংশকে শ্রেণীগতভাবে সংগঠিত করতে পেরেছিলেন। কৃষক সভার নেতারা নির্বাচনে জয়ের উদ্দেশ্যে কৃষক রাজনীতি করেননি।

একে ফজলুল হকের কৃষকদের প্রতি দরদ থাকলে কার্যত তাঁর দ্বারা কৃষকদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা ছাড়া কোনো বৃহত্তর মঙ্গল সাধন করা সম্ভব হয়নি। ১৯১৭ সালের নির্বাচনে একে ফজলুল হক কৃষকদের কাছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উচ্ছেদের প্রতিজ্ঞা করে নির্বাচিত হয়ে মন্ত্রিত্ব গঠন করেন। পরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উচ্ছেদ সম্পর্কে পদক্ষেপ গ্রহণে বিরত থাকেন। এছাড়া বহু নির্বাচনী প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন। কৃষক প্রজা পার্টির কিছু সংখ্যক নেতা ও কর্মীর চাপের মুখে তিনি মহাজনী আইন সংশোধনে বাধ্য হয়ে তৎপর হয়েছিলেন।

মওলানা ভাসানী এদিক দিয়ে ব্যতিক্রম। তিনি নির্বাচনী স্বার্থে কৃষকদের কোনোদিন ব্যবহার করেননি। তিনি বরাবরই ব্যক্তি প্রভাবে কৃষক স্বার্থকে আন্তরিকভাবে এগিয়ে নিতে চেষ্টা করেছেন। মওলানা ভাসানী ১৯৩২ সালে সিরাজগঞ্জে একাই একটি প্রজা সম্মিলনী আহবান করেন। এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের ভিত্তিতে পরবর্তীকালে ১৯৩৬ সালে বঙ্গীয় কৃষিখাতক আইন এবং ১৯৩৭ সালে সালিশী বোর্ড স্থাপিত হয়েছিল।

১৯২৯ সালে মওলানা আকরাম খাঁর নেতৃত্বে নিখিলবঙ্গ প্রজা সমিতি গঠিত হয়। এ সংগঠনের সভাপতি ও সেক্রেটারি ছিলেন স্যার আবদুর রহিম ও মওলানা আকরাম খাঁ। ফরিদপুরের মৌঃ তমিজউদ্দিন খান জয়েন্ট সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির প্রাথমিক গঠনকারীদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন কংগ্রেস কর্মী। কংগ্রেস বর্জন করে এই মুসলিম নেতৃবৃন্দ নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি গঠন করেন। ফরিদপুরের মকসুদপুর থানার মওলবী আবদুল হাকিম কৃষক প্রজা সমিতির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি একে ফজলুল হকের উৎসাহে রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। ১৯৩০ সালে তিনি নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা সমিতির কার্যকরী সংসদে নির্বাচিত হন।

১৯৩২ সালের ডিসেম্বরে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সিরাজগঞ্জে এক সম্মেলন আহবান করেন। এই সম্মেলন নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির উদ্যোগে হয় নাই। মওলানা ভাসানী নিজেই ডাকেন। এই সম্মেলনে ফরিদপুর থেকে অনেক কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

১৯৩৪ সালের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সাধারণ নির্বাচনে প্রজা সমিতির সভাপতি স্যার আবদুর রহিম কলকাতা এবং সমিতির সহ-সভাপতি মৌঃ একে ফজলুল হক বরিশাল ফরিদপুর নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত হন। ১৯৩৫ সালে ময়মনসিংহের

প্রজা সম্মেলনে এ.কে. ফজলুল হক নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। ফরিদপুরের ভাঙ্গা থানার সিরাজউদ্দিন আহমদ কৃষক প্রজা সমিতির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৩৫ সালে ফরিদপুর শহর থেকে কৃষকদের মুখপত্র ল্যাঙল নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। ১৯৩৭ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক কৃষকের সহ-সম্পাদক ও সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন ও পরে সম্পাদক হিসেবে সাপ্তাহিক কৃষক এ যোগ দেন। ফরিদপুরের সতীন্দ্রনাথ সেন বরিশালে কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯২৪ সালে তিনি ফরিদপুরের পীর বাদশা মিয়ার সঙ্গে কৃষক সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৪ সালের প্রথম দিকে পটুয়াখালীতে ফরিদপুরের পীর বাদশা মিয়ার সভাপতিত্বে কৃষক সম্মেলন হয়েছিল।

আউলিয়াপুর ইউনিয়নে মুসলমান প্রজাদের ওপর হিন্দু জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সতীন্দ্রনাথ রুখে দাঁড়ান এবং এক তীব্র কৃষক আন্দোলন শুরু করেন।

ফরিদপুরের সমাজকর্মী এ,কে,এম আবদুল হাকিম, এ.কে. ফজলুল হক ও ফরিদপুরের হুমায়ুন কবীরের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা সমিতিতে যোগদান করেন। এ.কে.এম আবদুল হাকিম দীর্ঘকাল ফরিদপুর পৌরসভার কমিশনার ছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনি পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন অনুসারে প্রাদেশিক আইন পরিষদের সাধারণ নির্বাচন ছিল আসন্ন। এই নির্বাচন উপলক্ষে কৃষক প্রজা সমিতি ও ইউনাইটেড মুসলিম পার্টির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি আপোস বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কৃষক প্রজা সমিতির পক্ষ থেকে ফরিদপুরের তমিজউদ্দিন খান, ময়মনসিংহ-এর আবুল মনসুর আহমদ, মৌঃ সামসুদ্দীন আহমদ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এই আলোচনা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। নবাব হাবিবুল্লাহর নেতৃত্বে কলকাতায় ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি গঠন করা হয়। শহীদ সোহরাওয়ার্দী এই পার্টিতে যোগদান করেন।

১৯৩৫ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিম লীগ পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি মুসলিম লীগের পতাকাতলে ভারতের মুসলমানদের একতাবদ্ধ করার জন্য সচেষ্ট হন। এই উদ্দেশ্যে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে কৃষক প্রজা সমিতির আলাপ আলোচনা হয়। এই আলোচনা সভায় কৃষক প্রজা সমিতির পক্ষ থেকে ছিলেন মৌঃ সামসুদ্দিন, নবাবজাদা হাসান আলী, ফরিদপুরের অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর। এই আলোচনা বৈঠক ফলপ্রসূ হয়নি।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনী অভিযান ও কৃষক প্রজা সমিতির সাংগঠনিক কাজে এ,কে ফজলুল হকের সঙ্গে খান বাহাদুর আবদুল মোমেন, জে.এল ব্যানার্জী, সৈয়দ বদরুদ্দোজা, ফরিদপুরের হুমায়ুন কবীর প্রমুখ যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। কলকাতা হলো আন্দোলনের কেন্দ্র-ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, যশোহর, ফরিদপুর, পাবনা, রংপুর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম সব জেলাতেই একে একে কৃষক প্রজা সমিতির সংগঠন গড়ে উঠলো।

ফরিদপুরে কৃষক প্রজা সমিতির নেতৃত্ব দিতেন পীর বাদশা মিয়া, অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর, জাহাঙ্গীর কবীর, এ. কে. এম.আবদুল হাকিম প্রমুখ। ১৯৩৭ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো– নির্বাচনের পরে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস উভয় দলই কৃষক প্রজা সমিতির সঙ্গে আপোষ করে মন্ত্রীসভা গঠন করতে প্রস্তাব করে। কংগ্রেস ও কৃষক প্রজা সমিতির কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। এ. কে. ফজলুল হক প্রধানমন্ত্রী হন। এই মন্ত্রিসভায়

হুমায়ুন কবীর ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১৯৩৮ সালে রাজনৈতিক কারণে ফরিদপুরের মৌঃ তমিজউদ্দিন খানের নেতৃত্বে একদল সদস্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রজা পার্টি নামে দল করে কোয়ালিশন পার্টি থেকে বের হয়ে আসেন। মৌঃ সামসুদ্দিন ও মৌঃ তমিজউদ্দিন খান উভয়কে মন্ত্রী করে কৃষক প্রজা পার্টি ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রজা পার্টি উভয় দলের সঙ্গে আপোষের প্রস্তাব দেয়। ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসে মৌঃ তমিজউদ্দিন খান মন্ত্রীসভায় কৃষি শিল্প স্বাস্থ্য শ্রম বাণিজ্য পদে প্রবেশ করেন। ১৯৪৫-৪৬ সালে ইন্ডিয়ান লেজিস-লেটিভ এসেম্বলির সদস্য এবং ইন্ডিয়ান কনসটিটিউশন এসেম্বলির সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৪০ সালে হক সাহেবের লাহোর মুসলিম লীগ অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় মুসলমানদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা নতুন দিকে ধাবিত হয়। প্রত্যেক মুসলমানই জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগের পতাকাতলে সংঘবদ্ধ হতে থাকে-কংগ্রেস, কৃষক প্রজা পার্টি থেকে মুসলিম নেতা কর্মীরা দলে দলে মুসলিম লীগে অধিক মনোনিবেশ করেন। ফলে কৃষক প্রজা পার্টির সমর্থকরা মুসলিম লীগে যোগদান করে পাকিস্তান আন্দোলন শুরু করে। হক মন্ত্রী সভা এ সময় কার্যত মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভায় পরিণত হয়েছিল। হক সাহেব একই সঙ্গে কৃষক প্রজা ও মুসলিম লীগের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং শেষ পর্যায়ে কৃষক পার্টির সাংগঠনিক কাজ বাদ দিয়ে মুসলিম লীগে অধিক মনোনিবেশ করেন। ফলে কৃষকপ্রজা পার্টির সমর্থকরা মুসলিম লীগে সামিল হয়ে যায়। কৃষক প্রজা সমিতির এই অবস্থায় কোনো কোনো নেতৃবৃন্দ প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচিয়ে রাখার চিন্তাভাবনা করেন। এদের মধ্যে আবুল মনসুর আহমদ, নবাবজাদা হাসান আলী ও অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর। এঁরা বামপন্থী কংগ্রেস, বিধান সভা ও কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

কৃষক প্রজা পার্টি শ্রেণী সংগঠন হলেও শ্রেণী সংগঠনের সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যের অনুপস্থিতি, নেতাদের কমিউনিস্ট মতবাদে আস্থার অভাব এবং সর্বোপরি মুসলিম জাতীয়তাবাদের সুতীব্র আন্দোলনের ফলে এরূপ প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। স্থানীয় পর্যায়ে কৃষক প্রজা পার্টিতে যারা ছিলেন তারা হচ্ছেন শাহ সুফী জোনাব আলী, মোজাহারুল হক চোকদার, গোলাম আলী খান, মোতাহার হোসেন খান. এ, কে এম আবদুল হাকিম, আবদুল ওয়াজেদ মিয়া, এম, এ ওয়াহেদ, জীবন মোল্লা, সাঈদ আহমদ (ধূলদি), আলাউদ্দিন আহমেদ ও আলাউদ্দিন আহমেদ (নওপাড়া)।

## আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা

১৯৪৯ সালে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। প্রাদেশিক গভর্ণর উপ নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করেন এবং ১৯৫০ সাল পর্যন্ত মওলানা ভাসানী কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না বলে জানান।

১৯৪৯ সালে প্রাদেশিক সরকার নতুন করে নির্বাচনের ব্যবস্থা করে। খন্দকার মোশতাক আহমদ, শওকত আলী, কামরুদ্দিন আহমদ ক্ষমতাসীন মুসলিমলীগের বিরুদ্ধে তরুণ নেতা শামসুল হককে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করানোর চিন্তা করেন। অন্যদিকে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি খুররম খান পন্নীকে মনোনয়ন দেন। নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিমলীগ সভাপতি মওলানা আকরাম খান, সম্পাদক ইউসুফ

আলী চৌধুরী (ফরিদপুর), ও প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমীন ভোটদাতাদের উদ্দেশ্য একটা প্রচারপত্র প্রকাশ করেন। প্রচারপত্রে উল্লেখ করা হয়, "পাকিস্তান রাষ্ট্রকে রক্ষা করিতে হইলে- মজবুত করিতে হইলে— আপনাদের কর্তব্য হইবে এক বাক্যে মুসলিম লীগের মার্কা বাক্সে ভোট দেওয়ার। মুসলিমলীগ ও মুসলিম জামাতে ভাঙ্গন ধরাইবার জন্য পাকিস্তান লাভের আগে যেমন চেষ্টা হইয়াছে এখনও সেইরকম চেষ্টা হইতেছে। নির্বাচনে শামসুল হক বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। নির্বাচন শেষ হওয়ার পর পরই একটি ঘটনায় ইউসুফ আলী চৌধুরী মোহন মিয়া (ফরিদপুর), শাহ আজিজুর রহমান, সোলায়মান ও আলাউদ্দীনের সাথে জড়িত হয়ে পড়ার জন্যে শামসুল হক, মোস্তাক আহমদ এবং টাঙ্গাইলের একজন স্থানীয় ব্যক্তি বদিউজ্জামানকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের জামিন না পাবার সম্ভাবনা দেখা দিলে শামসুল হকের পক্ষ থেকে পাল্টা মামলা দায়ের করা হয়। ফলে ইউসুফ আলী মোহন মিয়াদেরও গ্রেফতার করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। মহকুমা হাকিম ইউসুফ আলী মোহন মিয়াদের জামিন দিতে নির্দেশ দিলে জনৈক তরুণ পুলিশ অফিসার তাঁকে জানান যে, অন্যদেরকে একই ধরণের মামলায় জামিন না দেওয়ার নির্দেশ আছে। এরপর মহকুমা হাকিম সকলকেই জামিন দেওয়ার নির্দেশ দেন। এই মামলা কয়েক বছর ধরে চলে এবং শেষ পর্যন্ত মামলাটির নিস্পত্তি ঘটে। মওলানা ভাসানী স্বাক্ষরিত একটা নির্বাচনী ইস্তেহারকে কেন্দ্র করে টাঙ্গাইল নির্বাচনে শামসুল হকের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়। এটি ১৯৫০ সাল পর্যন্ত চলে। শহীদ সোহরাওয়ার্দী শামসুল হকের পক্ষে ঢাকা এলে প্রাদেশিক সরকারের নির্দেশে ১৯৫০ সালের ১৯শে জুলাই স্বরাষ্ট্র সেক্রেটারি তাঁকে জানান যে, ঢাকায় অবস্থানকালে তাঁকে নিজের কার্যাবলী ইলেকশন ট্রাইবুনালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে এবং ২৮শে জুলাই এর মধ্যে তাঁকে পূর্ব বাংলা পরিত্যাগ করতে হবে। অন্যথায় তাঁকে গ্রেফতার করা যেতে পারে। টাঙ্গাইল উপ-নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থীর শোচনীয় পরাজয়ে পূর্ববাংলার বহু এলাকায় উপ নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলেও ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে নূরুল আমিন সরকার পরাজয়ের ভয়ে কোনো এলাকাতেই উপ-নির্বাচনের আয়োজন করেননি। টাঙ্গাইল উপ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মুসলিম লীগের মধ্যে উপদলীয় কলহ বৃদ্ধি পায়। অবস্থা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ আলী চৌধুরী (ফরিদপুর) সংবাদপত্রে ১৮ ও ১৯ শে জুন পাকিস্তান মুসলিম লীগ কাউন্সিলের এক সভা আহবান করেন। এদিকে লীগ কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত হবার কয়েকদিন পূর্বে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সভাপতি মওলানা আকরাম খাঁ পদত্যাগ করেন। অধিবেশনে ইউসুফ আলী চৌধুরী মোহন মিয়া সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ করেন। প্রাদেশিক লীগ সম্পাদক রিপোর্টে স্পষ্টত দেখা যায় যে, মুসলিম লীগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বিশৃংখলা ও বাক-বিতণ্ডার মধ্য দিয়ে তিন দিনব্যাপী প্রাদেশিক কাউন্সিলের অধিবেশন চলে। মুসলিম লীগের অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের ফলে দলের কর্মীদের মুসলিম লীগ বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় মুসলিম লীগকে একটি পকেট সংগঠনে পরিণত করার প্রয়াস চলে। পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগকে ভেঙ্গে দিয়ে অনুগতদের দিয়ে এডহক কমিটি গঠন করা হয়। মুসলিম লীগের প্রাথমিক সদস্যভূক্তির পথ রুদ্ধ করা হয়। মুসলিম লীগের সদস্য হওয়ার বিষয়টা নিয়ে মওলানা আকরাম খানের সঙ্গে আতাউর রহমান খান,

আবদুস সালাম খান (ফরিদপুর) প্রমুখ দেখা করেন। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। তিনি মন্তব্য করেন সারা রাজ্যের 'ছাগল' 'পাঁঠা' জড় করে প্রতিষ্ঠান করা চলবে না।

এই অবস্থায় সেদিন ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ দলের বিরুদ্ধে নতুন কোনো সংগঠন করা ছিল অত্যন্ত কঠিন ও দুঃসাহসের কাজ। এদিকে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের প্রয়োজনে দেশবাসীর স্বার্থে বিশেষ করে পূর্ব বাংলার স্বার্থে নতুন পার্টি বিরোধী দল গঠন অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। এই জরুরি কাজটি সমাধা করার জন্যে এগিয়ে এলেন পাকিস্তান সংগ্রামের অকুতোভয় অন্যতম প্রধান নেতা ও আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।

মুসলিম লীগ কর্মীরা মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে প্রথমে নারায়ণগঞ্জে ও পরে টাঙ্গাইলে কর্মী সম্মেলন করে তৎকালীন মুসলিম লীগ নেতাদের কর্মকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং মুসলিম লীগকে পকেট সংগঠনে পরিণত করা থেকে বিরত রাখার জন্য আহবান জানান। নেতারা কর্ণপাত না করায় ১৯৪৯ সালে আর একটি মুসলিম লীগ গঠন করেন। সরকারী মুসলিম লীগ থেকে আলাদা দেখাবার জন্যে প্রতিষ্ঠানের নাম রাখেন আওয়ামী (জনগণের) মুসলিম লীগ। প্রথমে মওলানা ভাসানী এই দল গঠন করেন। পরে সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য মুসলিম লীগের বিরোধী নেতারা এই দলে যোগদান করেন। পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার জনগণ ভেবেছিল এদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক অব্যবস্থায় জনগণ হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। এক শ্রেণীর শোষক ও অত্যাচারীর বদলে নতুন আর এক শ্রেণীর আবির্ভাব হয়েছে বলে প্রতীয়মান হলো। এরকম মনোভাব দেশের সচেতন জনগণের একাংশের মধ্যে বিরাজমান ছিল বলেই মুসলিম লীগের বিরোধীদের পক্ষে একটা বিরোধী দল গঠন করা সম্ভব হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পর থেকেই শাসক চক্র পূর্ব বাংলাকে শোষণের প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করে কাজ শুরু করে। এই পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল পূর্ব বাংলার একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী ও বিভ্রান্ত নেতারা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে জিন্নাহ্ সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তনে প্রতিশ্রুত হলেও পরে স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্তা বনে যান। জিন্নাহ সরকার পাকিস্তানের গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য কোনো নতুন রাজনৈতিক দল গড়ে উঠুক চাইতেন না। ১৯৪৮ সালে ঢাকা সফরকালে রেসকোর্স এবং ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সমাবর্তন উৎসবে তিনি বলেন, "ব্যাঙের ছাতার মতো যে সমস্ত পার্টিগুলি গজিয়ে উঠেছে সেগুলিকে সন্দেহের চোখে দেখতে হবে।" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন উৎসবে জিন্নাহ্ ঘোষণা করেন, "পাকিস্তানের রাস্ট্রভাষা হবে উর্দু, অন্য কোনো ভাষা নয়।" রাজনৈতিক দল প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "ব্যাঙের ছাতার মতো নতুন পার্টি গঠন না করে মুসলিম লীগকে সমর্থন এবং তাতে যোগদান করতে হবে।" এছাড়া জিন্নাহ ঐ দুটি ভাষণে পূর্ব বাংলার উদীয়মান নতুন রাজনৈতিক শক্তিকে পঞ্চমবাহিনী, কমিউনিস্ট, ভারতের দালাল, দেশের দুশমন ইত্যাদি বলেও গালিগালাজ করেন। বস্তুতঃ ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত সময়টা ছিল মুসলিম লীগ সরকারের নিরবিচ্ছিন্ন নির্যাতনের কাল। নির্যাতনকে উপেক্ষা করে এই সময় পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি কৃষক বিদ্রোহ এবং পূর্ব বাংলাব্যাপী ভাষা আন্দোলন (প্রথম পর্যায়ে) হয়। এই অবস্থারই ফলশ্রুতি মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন। মওলানা ভাসানীর

সঙ্গে মুসলিমলীগের সুবিধাবাদী চক্রের বিরোধীতা ছিল পূর্ব থেকেই। আসাম প্রদেশ মুসলিম লীগের সভাপতি থাকাকালীন সময় তাঁর সঙ্গে উক্ত প্রদেশের গভর্ণর সাদুল্লাহর ছিল দ্বন্দ্ব। জিন্নাহ মওলানাকে পছন্দ করতেন না পূর্ব থেকেই।

১৯৪৯ সালের ৩রা জুন মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে ঢাকার রোজ গার্ডেনে এক কর্মী সম্মেলনে (প্রাদেশিক মুসলিম লীগের) আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। মওলানা ভাসানী সভাপতি, আতাউর রহমান খান, আবদুস সালাম খান ও আবুল মনসুর আহমদ সহ-সভাপতি, শামসুল হক সাধারণ সম্পাদক এবং শেখ মুজিবুর রহমান, রফিকুল হোসেন ও খন্দকার মোস্তাক আহমদ সহ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

এভাবেই মওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগে সহকারী সম্পাদক হয়েছিলেন ফরিদপুরের গোপালগঞ্জের শেখ মুজিবুর রহমান এবং ফরিদপুরের গোপালগঞ্জের আইনজীবী আবদুস সালাম খান হয়েছিলেন সহ-সভাপতি। আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠাকালে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন জেলে-মওলানা ভাসানী তাকে মনোনয়ন দিয়েছিলেন। মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে ২৪শে জুন আরমানীটোলা ময়দানে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সর্বপ্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় আনুমানিক চার হাজার লোকের সমাবেশ ঘটে। অত্যল্প সময়ের মধ্যে মওলানা ভাসানী শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে অন্যান্য যারা যুক্ত ছিলেন তাঁরা আবদুর রশিদ সরকার, কাজী রোকনউদ্দিন, আবদুর রহমান বকাউল, ডা. আবুল কাসেম. গাজী আবদুল হাকিম, আছমত আলী খান, ফণী ভূষণ মজুমদার, মোল্লা জালালউদ্দিন, আদেল উদ্দিন আহমেদ, আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী, নগেন্দ্র নাথ তালুকদার, এবিএম নূরুল ইসলাম, আদেল উদ্দিন হাওলাদার, মোসলেম উদ্দিন মৃধা, শেখ মোশাররফ হোসেন. রমেশ দত্ত, সামসুদ্দিন মোল্লা, কে, এম ওবায়দুর রহমান, আবদুর রাজ্জাক, ব্যারিস্টার কামরুল ইসলাম সালাউদ্দিন, কাজী খলিলুর রহমান, কাজী আবদুর রশিদ, এ. ওয়াই আমিনুদ্দীন আহমেদ, ডা. এম. এ. মালেক, কাজী হেদায়েদ হোসেন, ফকির আবদুর জব্বার, ডা. আফতাব উদ্দীন আহম্মদ, ইমামউদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ হায়দার হোসেন, মোশাররফ হোসেন, লিয়াকত হোসেন, দেলোয়ার হোসেন, ফিরোজার রহমান, মজিবর রহমান খান, আবদুস সালাম, ইলিয়াস আহমেদ চৌধুরী, আবেদুর রেজা খান, নূরুননবী, শেখ শহিদুল ইসলাম, শেখ ফজলুল করিম সেলিম, শেখ ফজলুল হক মনি, মো. আবদুর রউফ মিয়া, সাজেদা চৌধুরী, গৌরচন্দ্র বালা, কর্ণেল (অব.) শওকত আলী, আবদুল হাই ও সোলায়মান আলী, মোঃ শফিউদ্দিন প্রামাণিক।

### একুশের ইতিহাস

পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ১৯৪৬ সালের ঘোষণাপত্রে বাংলা ভাষাকে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার প্রতিশ্রুতি ছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অল্প আগে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহম্মদ হিন্দীকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার অনুকরণে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে অভিমত

পেশ করলে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ একটি প্রবন্ধে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। অধিকন্তু তিনি বাংলা ভাষাকে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করার দাবি জানান।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে 'তমদ্দুন মজলিস' নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান থেকে রাষ্ট্র ভাষার প্রশ্নটি সরাসরি উত্থাপন করা হয়। রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দেবার দাবিতে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। এই পুস্তিকায় ভাষা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক আবুল কাসেম, আবুল মনসুর আহমদ, কাজী মোতাহার হোসেন (ফরিদপুর) প্রমুখ। এই প্রতিষ্ঠান থেকে অক্টোবর মাসে ভাষা সম্পর্কে একটি আলোচনা সভাও করা হয়। এই সভায় ফরিদপুরের কাজী মোতাহার হোসেন ও কবি জসীমউদ্দীন বাংলা ভাষার পক্ষে বক্তৃতা করেন।

পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই ভাষার প্রশ্ন উত্থাপনের মূলে ছিল উনিশ শতক থেকে ভাষা সম্পর্কে সচেতনতা এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্যে বাঙ্গালিরা যে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের স্বপ্ন দেখেছিল—তারই বাস্তব রূপায়নের প্রথম পদক্ষেপ।

বাঙালিরা ভাষার প্রশ্ন উত্থাপন করলে পাক-শাসক গোষ্ঠীর স্বরূপ প্রকাশ পেল—পাকিস্তান আন্দোলনে বাঙ্গালিরা যাদের মনে করেছিল আপনজন তারা বিশ্বাস হন্তারূপে আত্মপ্রকাশ করলো। অধিকন্তু বাংলা ভাষার প্রশ্ন উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে শাসক গোষ্ঠী বাংলা ভাষা সঙ্কোচন নীতির মাধ্যমে বাঙ্গালি জাতিকে নিস্তব্ধ করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। এমতাবস্থায় "তমদ্দুন মজলিসের" উদ্যোগে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নূরুল হক ভূইয়া এই পরিষদের আহবায়ক নিযুক্ত হন। ১৯৪৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর অধ্যাপক আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষকগণের এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে ছাত্ররা পূর্ব বাঙলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হয়। এই অধিবেশনে কংগ্রেস সদস্য ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত উর্দু এবং ইংরেজীর সাথে বাংলাকে গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসাবে ব্যবহারের দাবি উত্থাপন করেন। পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন প্রস্তাবটির বিরোধিতা করে বলেন—পূর্ব বাংলার জনসাধারণ উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করার পক্ষপাতি। এর প্রেক্ষিতে ২৬শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার ছাত্র সমাজ ধর্মঘট পালন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং "তমদ্দুন মজলিসের" আহবায়ক সম্পাদক আবুল কাসেম সভাপতিত্ব করেন। ১১ই মার্চ ঢাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়। এই পরিষদ ১৯৪৮ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ধর্মঘট ও ১১ই মার্চ সাধারণ ধর্মঘট আহবান করেন। ১১ই মার্চ ঢাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়। এইদিন পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং বহু ছাত্রকে গ্রেফতার করে। এই গ্রেফতারকৃত ছাত্ররা হলেন শওকত আলী, কাজী গোলাম মাহবুব, আবুল বরকত, শামসুল হক, শেখ মজিবুর রহমান ও অলি আহাদ।

১১ই মার্চের ছাত্র নির্যাতনের প্রতিবাদে ১২ই মার্চে জগন্নাথ কলেজে প্রতিবাদ সভা হয় ও ১৩ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে পূর্ণ ধর্মঘট পালিত

হয়। এই আন্দোলন শুধু ঢাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পূর্ব বাংলার প্রায় সর্বত্রই ছাত্রেরা ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে। চট্টগ্রাম, রাজশাহী, কুমিল্লা, খুলনা, বরিশাল, যশোর, ফরিদপুর ইত্যাদি জেলায় আন্দোলন জঙ্গীরূপ ধারণ করে। ফরিদপুরে জেলা তমদ্দুন মজলিসের সম্পাদক জেলা সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক নির্বাচিত হন। এখানে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন সৈয়দ মাহবুব আলী, মোশারফ হোসেন, মতিন উদ্দিন আহমদ প্রমুখ।

১৬ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ছাত্ররা সন্ধ্যা পর্যন্ত পরিষদ ভবন ঘেরাও করে রাখে। পরে পুলিশ লাঠি চার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ করে ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করে। এই ঘটনায় উনিশ জন আহত হন। এর প্রেক্ষিতে ১৭ই মার্চ ঢাকায় সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে নঈমুদ্দীন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক প্রতিবাদ সভায় শামসুল হক বক্তৃতা করেন।

এর কয়েকদিন পরে জিন্না ঢাকায় আসেন। তিনি ২১শে মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ও ২৪শে মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন উৎসবে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে বক্তৃতা দেন। প্রতিবাদ করেন ছাত্ররা। এই দিন সন্ধ্যায় জিন্নাহর সঙ্গে সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধিদের বৈঠক হয়। এই বৈঠকে ছাত্র প্রতিনিধি মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ প্রমুখের সঙ্গে জিন্নাহর তর্ক-বিতর্ক হয়। এই আন্দোলনের ফলে ১৯৪৮ সনের ৬ই এপ্রিল পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক সভায় প্রাদেশিক সরকারের কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে গ্রহণের সুপারিশ অগ্রাহ্য হয়। পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ ৪৮ থেকে ৫২ সালের মধ্যে (ভাষা নিয়ে) আর কোনো আন্দোলন হয় নাই।

১৯৪৮ সালের ৬ই এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে গৃহীত প্রস্তাব ছিল সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে খাজা নাজিমুদ্দিনের চুক্তি ভঙ্গেরই নামান্তর। এতদসত্ত্বেও পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক সরকারের কাজে বাংলা ভাষাকে গ্রহণের সিদ্ধান্তের ফলে ভাষা আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়।

এ সময় থেকে সরকারি পর্যায়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভাবে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে তৎপরতা চলতে থাকে। আন্দোলনে একটা মন্দাভাব পরিলক্ষিত হলেও দেশের সচেতন মহল ভাষার প্রশ্নে কোনো সময়েই আত্ম বিস্মৃত হয়নি। তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ফজলুর রহমান আরবী হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব করলে ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড ও বর্ণমালা বিবেচনা বিশেষজ্ঞ কমিটির কাছে তীব্র প্রতিবাদ করে একটি স্মারক লিপি পেশ করে। ঢাকায় অনুষ্ঠিত একাধিক ছাত্র সভায় আরবী হরফে বাংলা প্রবর্তনের বিরোধিতা করে প্রস্তাব নেয়া হয়। এ প্রেক্ষিতে পূর্ব বাঙলা সরকার এক প্রেস নোট জারী করে এগুলোকে মিথ্যে গুজব বলে ঘোষণা করেন। অথচ শিক্ষা উপদেষ্টা সভায় বলা হয় যে, যদি কোনো ছাত্র তার মাতৃভাষার হরফে লিখিত পুস্তকাদি পাঠে আপত্তি করে তাহলে তা বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে। ১৯৫০ সালের ১৮ই এপ্রিল থেকে কেন্দ্রীয় শিক্ষা দফতর ২০টি কেন্দ্রে আরবী হরফে বাংলা ভাষার মাধ্যমে বয়স্কদের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার কাজ শুরু করে। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মওলানা আকরাম খাঁ প্রমুখ এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার ধীরে চল নীতিতে সুচতুর ভাবে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে

ষড়যন্ত্র অব্যাহত রাখে।

৩১শে জানুয়ারি ঢাকা বার লাইব্রেরি হলে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষার দাবিতে প্রদেশের সর্বত্র সভা সমিতি শুরু হয়। সংগ্রাম পরিষদ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ২১শে ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী ধর্মঘটের আহবান জানান। প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী পদে তখন আসীন ছিলেন নূরুল আমীন। স্বীয় দলে তাঁর প্রাধান্য অক্ষুন্ন থাকলেও তার দলের মধ্যে থেকেই ইউসুফ আলী চৌধুরী মোহন মিঞা (ফরিদপুর) চরম ভাবে নূরুল আমীনকে বিরোধিতা করেন। পরিষদের কংগ্রেস দলীয় সদস্য ছাড়াও নব-গঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কয়েকজন সদস্য ছিলেন। ফলে ছাত্র শক্তির কাছে শেষ পর্যন্ত নূরুল আমীনকে পরাভূত হতে হয়। ইউসুফ আলী মোহন মিঞার দৈনিক মিল্লাত পত্রিকা ছাত্র জনতার চাপে লেখনীর ধারা পরিবর্তনে বাধ্য হন। সরকার ছাত্র সমাজের কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করে ২০শে ফেব্রুয়ারি রাত্রি থেকে সারা শহরে এক মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারী করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে খণ্ড খণ্ড ভাবে ছাত্র-ছাত্রী এসে সমবেত হতে শুরু করে। সারা ঢাকা শহর ধর্মঘটে ব্যাপকভাবে সাড়া দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে সংগ্রাম পরিষদের সভা শুরু হয়। সভার শুরুতে বক্তৃতা করেন সংগ্রাম পরিষদের কাজী গোলাম মাহবুব ও সামসুল হক। নেতারা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে অভিমত দেওয়া সত্ত্বেও বিক্ষুব্ধ ছাত্র সমাজ ১৪৪ ধারাকে ও পুলিশকে উপেক্ষা করে রাজপথে নেমে পড়েন। প্রথমে কৌশলগত কারণে ছাত্রীদের একটি দল বের করা হয়। এঁদের মধ্যে ছিলেন সুফিয়া ইব্রাহীম (ফরিদপুর) সফিয়া খাতুন, রওশন আরা প্রমুখ। অতঃপর শুরু হলো মিছিলের পর মিছিল। একটার পর একটা দল মিছিল করে এগিয়ে যাচ্ছে পুলিশ বাহিনীর বেষ্টনী উপেক্ষা করে। পুলিশ লাঠি চার্জ করে। পরে গুলী বর্ষণ করে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে করে। মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের কাছে নিহত হন বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ছাত্র আবুল বরকত। এই আন্দোলনে অন্যান্যের মধ্যে আবদুল জব্বার, আব্দুর রফিক, আব্দুস সালাম প্রমুখ শহীদ হন। শহীদ আবুল বরকতের দেহ যে দু'জন ছাত্র বহন করে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়েছিলেন তাদের একজন হচ্ছেন ফরিদপুরের তৎকালীন একজন ছাত্রনেতা মিয়া মোহন (এ্যাডভোকেট সামসুল বারী) ফরিদপুরের মাদারীপুর নিবাসী ডাঃ গোলাম মওলা তখন মেডিকেল কলেজ ছাত্র সমিতির সহ-সভাপতি ছিলেন। ফরিদপুরের ডাঃ মোহাম্মদ জাহেদ তার পরই সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। এরা দু'জনেই '৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এছাড়া তৎকালীন ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র ফরিদপুরের ডাঃ ননী গোপাল সাহাও আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ফরিদপুরের উল্লেখযোগ্য নেতা হচ্ছেন শেখ মুজিবুর রহমান, সাপ্তাহিক সৈনিক পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক আবদুল গফুর। ডা. মো. জাহেদ ফেব্রুয়ারিতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদেব সদস্য না থাকলেও মার্চ মাসে মেডিকেল কলেজের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হলে পদাধিকার বলে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্য হন। একজন সচেতন ছাত্র হিসাবে তিনি প্রথম থেকেই ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সরকার ছাত্র শিক্ষক রাজনৈতিক কর্মী ও নিরীহ মানুষকে গ্রেফতার করে আন্দোলনকে নস্যাৎ করতে প্রয়াস পায়। ফরিদপুরেও ভাষা আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগে। এখানেও ছাত্রদের উদ্যোগে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এখানে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন

আদেল উদ্দিন আহমদ, রওশন জামাল খান, ইমামউদ্দিন, মহিউদ্দিন আহম্মদ, লিয়াকত হোসেন, মনোয়ার হোসেন প্রমুখ। সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক ছিলেন মনোয়ার হোসেন। রাজবাড়ী, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে প্রফুল্ল সান্যাল, শান্তিসেন, সমর সিংহ, শ্যামেন ভট্টাচার্য, আশুভরদ্বাজকে নিয়ে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলো। ঢাকায় ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ফরিদপুরে ধর্মঘট ও নগ্নপদ শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। বিক্ষুব্ধ ছাত্র সমাজ তৎকালীন জেলা মুসলিম লীগ সভাপতি খান বাহাদুর মোহাম্মদ ইসমাইলকে শোভাযাত্রার পুরোভাগে নামিয়ে আনতে বাধ্য করে। উক্ত খান বাহাদুর মোহাম্মদ ইসমাইলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিরাট জনসভায় নূরুল আমীন সরকারের পদ ত্যাগ দাবি করে প্রস্তাব পাশ করা হয়।

ফরিদপুরে ভাষা আন্দোলনে শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে ঐ সময়েই স্থানীয় অম্বিকা ময়দানে একটি শহীদ মিনার প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটিই ছিল ফরিদপুরে প্রথম ও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার। বর্তমানে সেই শহীদ মিনারটি নেই। ফরিদপুরের শিল্পী আব্দুস শুকুর মিঞা এই শহীদ মিনারটির নকশা অংকন করেছিলেন।

স্বাধীনতা উত্তর ১৯৭১ সালে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আলীর উপস্থিতিতে একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপন উপলক্ষে এক সভায় শহীদ মিনারটি নতুন করে করার প্রস্তাব উঠে এবং পরে তা কার্যকর হয়। সরকারী রাজেন্দ্র কলেজের শহীদ মিনারটিতে একুশে ফেব্রুয়ারিতে সর্বস্তরের ছাত্র জনতা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে থাকে। এটি ১৯৭৫-৭৬ সালে রাজেন্দ্র কলেজের তৎকালীন ছাত্র সংসদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠা করা হয়। ছাত্র নেতা মাজেদুর রহমান তখন রাজেন্দ্র কলেজ ছাত্র-ছাত্রী সংসদের সহ-সভাপতি।

প্রথম পর্যায়ে যে আন্দোলন অল্প সংখ্যক বুদ্ধিজীবী ও সচেতন ছাত্র-কর্মীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল দ্বিতীয় পর্যায়ে তা জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে এক দুর্বার গণ আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে সে আন্দোলনে জঙ্গী রূপ ধারণ করে।

পুলিশের গুলী চালনার ফলে ভাষা আন্দোলন দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে– দেশবাসী রুখে দাঁড়ালো মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলার ছাত্র জনতা ঐক্য বদ্ধ হয়েছিল পশ্চিমা শাসক শক্তির বিরুদ্ধে। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন, মুসলিম লীগের যুক্ত ফ্রন্টের কাছে নির্বাচনে চরম পরাজয়, ভাষা আন্দোলনেরই ফল। ১৯৫২ সালে ভাষার দাবিতে যে রক্তাক্ত সংগ্রাম শুরু হয় ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতায় সে সংগ্রাম আরও তাৎপর্যপূর্ণ ও পূর্ণতর হয়ে উঠে। অদ্যাবধি ২১ শে ফেব্রুয়ারি আমাদের প্রেরণা দিয়ে যাচ্ছে জাতির সার্বিক মুক্তির জন্য প্রতিটি সংগ্রামে। একুশ একটি চেতনা একুশ আমাদের ভবিষ্যৎ নির্মাণে সাহস যোগাচ্ছে প্রতিনিয়ত। একুশ আমাদের শিখিয়েছে অন্যায়কে উপেক্ষা করে এগিয়ে যেতে।

*[সূত্র : আ ন ম আবদুস সোবহান, 'ফরিদপুরের ইতিহাস', সূর্যমুখী প্রকাশনী, ফরিদপুর, ১৯৯৪]*

# গোপালগঞ্জের আদিকথা

## মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

আমরা জানি স্রষ্টা অনাদি-অনন্ত। তাইতো কবি বিদ্যাপতি (১৪শ' শতাব্দী) স্রষ্টা সম্বন্ধে বলেছেন 'নতুয়া আদি অবসানা'— তোমার আদি অন্ত নাই। সুতরাং সে থাক। মানুষ জানতে চেষ্টা করছে তাঁর সৃষ্টির রহস্য আর সৃষ্টিব ব্যাপকতার কথা, বৈজ্ঞানিক উপায়ে। কিন্তু কতটুকু হবে কি জানি? আমরা এখানে বলতে চেষ্টা করব গোপালগঞ্জের আদিকথা। যতটুকু জানি, তার সাক্ষ্য-প্রমাণ, ইতিহাস-কিংবদন্তী দিয়ে।

'ভলগাসে গঙ্গা'— ভলগা থেকে গঙ্গা লিখেছেন রাহুল সাংকৃত্যায়ন। ভলগা ইউরোপে। গঙ্গা এই ভারতীয় উপমহাদেশে অনেক দূর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সে হিমের আলয় হিমালয় পর্বতে গঙ্গোত্রী নামক হিমবাহ হতে উৎপন্ন। গঙ্গা আবার জাহ্নবী বা ভাগীরথী নাম ধারণ করেছে। সূর্য বংশীয় রাজা ভগীরথের নাম অনুসারে। কথিত আছে, ভগীরথের পূর্ব পুরুষগণ, যারা সাংখ্যদর্শনকার মহর্ষি কপিলের শাপে ভস্মীভূত হয়েছিল, তাদের উদ্ধারের জন্য। ভগীরথের তপস্যায় এল মর্তে গঙ্গা। 'আগে আগে চলেন ভগীরথী শঙ্খ বাজাইয়া, পিছে পিছে চলেন মা গঙ্গা দুকূল ভাসাইয়া।' এমনি করে চলতে চলতে আমাদের এই বাংলাদেশের রাজশাহীর কাছে এল। তখনই ঘটল নবতর ঘটনা।

পদ্মমুণি এক মুণি পূর্বমুখে যায়।
ভগীরথ বলি গঙ্গা পশ্চাৎ গোড়ায়॥ —রামায়ণ

আসলে সে ক্ষণিকের জন্য চোখের আড়ালে পড়েছিল। হঠাৎ তা বুঝতে পেরে ফিরে ভগীরথের দিকে সোজা দক্ষিণে চলল। যেখানে কপিলের আশ্রম ছিল সেখানে সাগর সঙ্গমে মিলিত হয়েছিলেন গঙ্গা। ফলে গঙ্গার সংস্পর্শে মকর সংক্রান্তিতে সগর রাজার ভস্মীভূত পুত্রগণ (ভগীরথেব পিতৃপুরুষগণ) উদ্ধার হয়ে স্বর্গবাসী হলেন। মহর্ষি কপিলের বরে। ঐ সগর রাজার নাম থেকে সাগর -মহাসাগর বলি সমুদ্রকে।

কিন্তু পদ্ম মুণির দিকে গেলেন বলে গঙ্গার নাম হলো পদ্মা। ঐ যে মরমী কবি গায়ক নজরুল গেয়েছেন, 'পদ্মার ঢেউরে, মোর শূন্য হৃদয় পদ্ম নিয়ে যা, যা-রে।' কোথায় নিয়ে গেল তা তো জানি না। তবে যা জানি তা হলো, পদ্মার ঢেউ সোজা পুব তার পর দক্ষিণে চাঁদপুরের কাছে ছুটল। তারপর সেই পদ্মা কালো মেঘের বরণ ও বিশাল আকৃতি ধারণ করে মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পড়ল। এই সেই গঙ্গা ধারা।

পদ্মার উদ্ভব হওয়ায় প্রায় সাথে সাথে পদ্মার কিছু জল গড়িয়ে পড়ল গড়াই নদীতে। ওতো মা গৌরী। কুষ্টিয়াতে জন্ম নিয়ে গড়াই পূর্ব পাড়ে ফরিদপুর আর পশ্চিম পাড়ে যশ হরণকারী যশোহর বা যশোর জেলায় এসে নাম ধারণ করল মধুমতি। ঐ যে ভাটিয়ালী

* মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাস সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক। তিনি স্থানীয় ইতিহাস ও লোকঐতিহ্য বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেন। 'চলিষ্ণু' নামে তাঁর একটি প্রবন্ধগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রবন্ধে গোপালগঞ্জের আদিপর্বের কথা রয়েছে। –সম্পাদক

সুরেলা কণ্ঠে ভাবুক কবি গান গেয়ে চলছে—

ও ঢেউ ঢেউ নদীরে, ও মধুমতীরে,
তোর কাছে মন যদি যায়–

দুই তীরে দুই ভাগ। হলো স্ফটিক বর্ণের জলের আশ্রয় মধুক্ষরা মধুমতী। মধুমতী গাঙ্গের দুই পাড়ে পলি পড়ে বাড়ল পল্লী। বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার শেষ দক্ষিণ-পূর্ব সীমানায় একটি পল্লীগ্রাম খাটরা। তার দক্ষিণ দিকে খুলনা জেলা। এই গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ সব নমঃশূদ্র। কিংবদন্তি– এরা এসেছিল প্রথম পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকের এই নদী-নালা, খাল-বিল-ঝিল, হাওর-বাওরময় দুর্গম নিচু এলাকায়। যেখানে ভদ্র মানুষরা বাস করতে আসত না প্রায়ই। জিজ্ঞাসা, এখানে তাদের আসার কারণ কি ছিল? নমগণ তখনকার বঙ্গদেশে এবং এখনকার এই বাংলাদেশেও হিন্দুদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। কিন্তু কোনো শাস্ত্র বা কুলজীগ্রন্থে তাদের নাম নেই। তাই তারা অভিহিত ব্রাত্য অন্ত্যজ চণ্ডাল বলে। হিন্দুদের মধ্যে কৌলিণ্যপ্রথার প্রবর্তক নবদ্বীপ অধিপতি ব্রহ্মক্ষত্রিয় রাজা বল্লাল সেন (রাজত্বকাল ১১০৮-১১৭৯ খ্রি.) 'নমঃশূদ্র' এই নাম চালু করেছিলেন আত্মপক্ষ সমর্থনে। তিনি অধিক বয়সে পদ্মিনী নাম্নী এক অতীব সুন্দরী ডোম কন্যার প্রেমাকৃষ্ট হয়ে তাকে বিয়ে করেছিলেন। ফলে দেশের মধ্যে রাজার ভীষণ দুর্ণাম ও কলঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ('বল্লাল চরিত'– আনন্দ ভট্টকৃত)। তা ঘুচাবার জন্য তিনি এক বিরাট ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন ('ভারতবর্ষের ইতিহাস'–নলিনীকান্ত ভট্টশালীকৃত)। এই সভায় আর সবাই যোগ দিয়েছিলেন কেবল নম (নমস্‌ মুনির সঞ্জাত) ও পারশর ভৃগুরা ব্যতীত। তাই ক্রুদ্ধ হয়ে বল্লাল সেন রাজাজ্ঞায় তাদের পৈতা জোর করে ছিড়ে ঐ দুই বর্ণকে এক নামে যুক্ত করে নমঃশূদ্র বলে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তাই তাদের এরূপ স্থানে আসা। অশিক্ষা-কুশিক্ষায় এরা দু'এক পুরুষের মধ্যে হয়ে গেল বর্বর, অশিক্ষিত, অচ্ছুৎ; তথাকথিত নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, সুস্পৃশ্য ভদ্রলোকদের নিকট অস্পৃশ্য! শুধু খাটরা গ্রামেই নয়, নমঃশূদ্ররা যেখানে গিয়েছিলেন সেখানেরই এই অবস্থা।

খাটরা ছিল ঠাকুর শুকদেব ব্রহ্মচারী (১৯০৯-১৯৯৪ খ্রিঃ) এবং তাঁর শিষ্য সেবাইত জ্যোতির্ময় ব্রহ্মচারী চন্দর গোসাঁই (১৯১৫-১৯৭৫ খ্রি.) দু'জনের কীর্তিস্থল আশ্রম। খাটরা এবং তৎপার্শ্ববর্তী বেদগ্রাম, গোলাবাড়িয়া, দূর্গাপুর (বিখ্যাত কবিয়াল আনন্দ-মনোহর-হরিবর সরকারের জন্মস্থান; সকলে এই শতাব্দীর প্রথমার্ধেই গতায়ু), মালিবাতা, কাটরবাড়ী, রঘুনাথপুর, সিলনা, গুয়াধানা, বোড়াশি, পাঁচুড়িয়া [গোঁসাই রাইচরণ ঠাকুর (১৮৮৪-১৯৪৫ খ্রিঃ)-এর কীর্তিস্থল আশ্রম] গোবরা প্রভৃতি গ্রামে নমঃশূদ্ররাই ছিল প্রধান। মধুমতীর তীরে যারা মাছ ধরে বিক্রি করত তারা হলো জেলে-মালো-ধীবর-কৈবর্ত ইত্যাদি সম্প্রদায়। ভদ্রলোকেরা বাস করতেন প্রায় ছয় মাইল উত্তরে, উলপুরে– প্রধানত কায়স্থরা। গোপালগঞ্জের সর্বউত্তরে মুকসুদপুরের খান্দারপাড়ায় জন্ম নিয়েছিলেন বৈদ্যকুলোদ্ভব বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য। তাঁর বিখ্যাত উক্তি 'I am the R. C. Mazumder' (অবসর ১৯৪৪ খ্রি.)।* মধুমতীর তীরে উত্তরে কাশিয়ানী থানার রামদিয়ায় কায়স্থকুলে জন্মেছিলেন অকৃতদার বিখ্যাত সমাজসেবক চন্দ্রনাথ বসু

* এই উক্তিটি এই রমেশচন্দ্রের নয় বলে জানা যায়। –সম্পাদক

(অশীতিপর বয়সে মৃত্যু ১৯৮৬ খ্রি.)। তিনি রামদিয়া শ্রীকৃষ্ণ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা (১৯৪২ খ্রি. বর্তমানে সরকারি)। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁকে বলেছেন 'ফরিদপুরের গান্ধী'। সেই নামেই তিনি সুপরিচিতি। প্রায় দশ মাইল দূরে পুবে বাস করতেন ব্রাহ্মণগণ। কোটালীপাড়ায় উণশিয়া গ্রামে। 'বারশ বামুন তেরশ আড়া' তাতেই বলি কাশ্যপপাড়া। প্রবাদটি অনেকাংশে সত্য। সংস্কৃতবিদ্যা শিখবার জন্য এ স্থানটির খুব খ্যাতি ছিল। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ প্রাক-বিভাগ যুগে ভারত বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, টীকা ও গ্রন্থকার ছিলেন। এ যুগের বাংলার শোষিত-বঞ্চিতদের বিপ্লবী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের (১৯২৮-১৯৪৭ খ্রি.) পৈত্রিক ভিটা এখনও আছে উনশিয়ায়। ফরিদপুর জেলার কোটালী পাড়ার বিল অঞ্চলে যে খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ নগরী, দূর্গ ও বন্দর ছিল, প্রাচীন লিপিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ('বাংলাদেশের ইতিহাস—প্রাচীন যুগ : ড. মজুমদার)। মাঝে দুই চার ঘর কায়স্থ-বৈদ্য ছিল কাজুলিয়া বাজুনিয়ায়। 'বৃহদ্ধর্ম পুরাণ' এবং 'ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ' (এ দুটি খ্রি. ১৩শ শতাব্দীতে রচিত) অনুসারে ড. মজুমদার উক্ত গ্রন্থে এও লিখেছেন যে, 'বাংলাদেশের ব্রাহ্মণেতর সমুদয় লোককে ৩৬টি শূদ্র জাতিতে বিভক্ত করা হইয়াছে।' গোপালগঞ্জের কিছু খ্রিস্টান, আর সব নমঃশূদ্র ও মুসলমান।

নমঃশূদ্ররা যদিও মানুষ তথাপি ভদ্রলোকদের নিকট অমানুষ, অসভ্য, চণ্ডাল ছিল তারা। তারা তাচ্ছিল্যভরা এই 'চণ্ডাল' আখ্যা অস্বীকার করত। ভদ্রলোকদের মতো যদি জাতিভেদ প্রথা না থাকত সমাজে। সবার প্রতি থাকত সবার সমান দৃষ্টি। বৈদিক যুগের শেষে যদিও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হয়েছিল বৃহত্তর স্বার্থে। বিবাহাদি হতো এক বর্ণের সাথে অন্য বর্ণের। ক্রমশ তা লোপ পায়। জাতিভেদ প্রথা দৃঢ় হয়ে বংশগত হল। তবে এ প্রথার লংঘন হয়েছিল বৌদ্ধ ধর্মের প্লাবনে। এরূপ চল অনেক দিন। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মেও যখন আবিলতা এল তখন হিন্দু এল। এসে হলো যথাপূর্বং তথা পরং।

তারপর এল এদেশে ইসলাম। মহম্মদ ঘোরী এসে দিল্লির সর্বশেষ হিন্দু রাজা পৃথ্বিরাজকে ১১৯২ সালের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করলেন। ব্রাহ্মণ্যবাদের চাপে যারা নির্যাতিত-নিপীড়িত হচ্ছিলেন তারা দলে দলে জাতিভেদহীন ইসলাম ধর্ম কবুল করলেন। কিছু উচ্চ বর্ণের লোকেরাও ইসলাম গ্রহণ করলেন। পাঠান-মোঘল বাদশা ও সুলতানরা ছয়-সাতশ বছর রাজত্ব করলেন। অতঃপর এল ইংরেজ। 'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী/রাজদণ্ডরূপে' (—রবীন্দ্রনাথ)। ফলে কিছু খ্রিস্টান হলো। তারপর স্বাধীনতা পেল হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সকলে। ১৯৪৭ সালের আগস্টে। কিন্তু হিন্দুদের সেই জাত-পাত দুর্লংঘ্য জাতিভেদ প্রথা এখনো গেল না।

হিন্দুরা যে বৈদিক বা আর্যধর্ম পালন করত নমঃশূদ্ররাও সেই ধর্ম পালন করত। বিবাহ, শ্রাদ্ধ, হিন্দু শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপ যথাবিহিত পালিত হতো। তারা পরিচয় দিত কাশ্যপ গোত্র বলে। দশাশৌচ পালন করত ব্রাহ্মণদের মতো এগারো দিনে। ছিল নিজস্ব সম্প্রদায়গত পুরোহিত, নাপিত প্রভৃতি। নমঃশূদ্রের কৌলিক উপাধিগুলোও সামগ্রিক জীবনচর্চায় একান্ত অনুকূল, পরনির্ভরশীলতাহীন সার্থক।

খুলনা জেলা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে। এইসময় জীবন জোদ্দার নামে একজন পরোপকারী ধনাঢ্য ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নিজ ব্যয়ে সরকার পরিকল্পিত দৌলতপুর থেকে সাতক্ষীরাগামী রাস্তার একটি অংশ নির্মাণ করে দেন (১৮৮৭ খ্রি.)। সেই অংশটুকু

জীবনবাবুর রাস্তা নামে খ্যাত। এইজন্য খুলনার ডেভেলপমেন্ট কমিটিতে স্থান দিয়ে প্রেসিডেন্সি কমিশনার সাহেব তাকে সম্মানিত করেন। এতে উচ্চ বর্ণের হিন্দু লোকেরা এইরূপ নামগোত্রহীন চণ্ডাল লোকের সাথে একসঙ্গে বসতে অস্বীকার করেন। জীবনবাবু 'চণ্ডাল নয়' এই কথা পরবর্তী সভায় জানাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। যশোর, খুলনা, বরিশাল ও ফরিদপুর জেলার জ্ঞানী-গুণী স্ববর্ণের লোকদের তিনি দ্বারস্থ হলেন। এই খাটরার নদের চাঁদ বিশ্বাস এবং হরিচরণ রায়, হরিদাসপুরের হরমোহন টিকাদার তাদের মধ্যে ছিলেন। খাটরার উত্তর পশ্চিম পার্শ্বে প্রায় ১৪/১৫ মাইল দূরে ছিল 'মতুয়া' বৈদিক উপধর্মের প্রবর্তক, গোপালগঞ্জ ও ওড়াকান্দির মহোন্নত মহাপুরুষ নমঃশূদ্র শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর (১৮১১-১৮৭৭)। তাঁরই যোগ্যতম পুত্র নির্যাতিত-নিপীড়িত-শোষিতদের উদ্ধারকর্তা শ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুরের (১৮৪৬-১৯৩৬ খ্রি.) কৃপায় এবং নির্দেশে তারা আনলেন ফরিদপুর মল্লিকপুর নিবাসী সুবিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্যামাচরণ তর্কালংকার প্রদত্ত জীর্ণ পুস্তক 'শক্তিসঙ্গমতন্ত্র'-এর প্রয়োজনীয় বঙ্গানুবাদ। তাতে নমঃশূদ্রগণ 'চণ্ডাল' নয়, ব্রাহ্মণ এই কথা লেখা আছে। ছয় মাস পরে পরবর্তী সভায় জীবনবাবু তার সমর্থকদের সহায়তায় ঐ বঙ্গানুবাদ পাঠে তার প্রতিশ্রুতি সাফল্যজনক ভাবে পূরণ করলেন। অতঃপর গুরুচাঁদ ঠাকুর অষ্ট্রেলীয় খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারক সি. এস. ডি সাহেবের সাহায্যে নমঃশূদ্রদের 'চণ্ডালত্ব' মোচন করালেন। 'The Namasudra must be written ...' Sd. W. C. Mo- pherson. 9.9.1895 Asstt. Commissioner, Sylhet. তারপর আদম শুমারিতে নমঃশূদ্র লেখা হলো।

যাতায়াতের সুবিধার জন্য হাটবাজার প্রায়ই নদীর পাড়ে বসে, ক্বচিৎ খাল পাড়ে বসে। তাই মধুমতী পাড়ে ছিল তাদের বাজার। তার নাম ছিল রাজগঞ্জ বাজার। এই রাজগঞ্জ বাজারের একটি ইতিহাস আছে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে আমাদের এই ভারতীয় উপমহাদেশে যে সিপাহী বিদ্রোহ হয় তাতে রাণী রাসমণি (মৃত্যু ১৮৬১ খ্রি.) একজন উচ্চ পদস্থ বৃটিশ অফিসারকে নির্ঘাত মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছিলেন। তদ্‌পরিবর্তে সে বৃটিশ অফিসার কৈবর্ত বা জেলে সম্প্রদায়ের রাণী রাসমণিকে এই খাটরার মকিমপুর পরগণা উপহার স্বরূপ পাইয়ে দিলেন। বেদগ্রাম, দূর্গাপুর, গোবরা প্রভৃতি নদীর পাড়ের গ্রাম'লি ছিল জেলেপাড়া। তাই জেলে সম্প্রদায়ের রাণী এই স্থানটি পেয়ে খুশি হয়েছিলেন। তারপর সে কালে রাসমণির এক নাতী হলো, নাম রাখা হল নবগোপাল। যখন এ সুসংবাদ পেল গুণগ্রাহী প্রজাগণ তখন তারা তাদের রাজগঞ্জ বাজারের নাম কিছুটা পালটিয়ে রাণীর নাতীর নাম জুড়িয়ে রাখল গোপালগঞ্জ।

খাটরা গোপালগঞ্জের পশ্চিম পাশে আছে হরিদাসপুর। যে হরিদাসপুর দিয়ে মধুমতীর বামতীর হতে ইংরেজ রাজত্বের আমলে 'বিলরুট ক্যানেল' খনিত হয়। এই ক্যানেল এখন পর্যন্ত মধুমতীর চেয়ে বেগবতী আছে। এই বিল রুট ক্যানেলের পাশে ক্রমে ক্রমে ভেড়ার হাট, বৌলতলীর হাট, সাতপাড়ের হাট, জলিরপাড়ের হাট হয়ে টেকের হাট। ২৫/৩০ মাইল ধরে দুই পাড়ে পাঁচ-ছয়টি গ্রামে মুসলমান, আর সবাই নমঃশূদ্র। এই কাটা খাল মধুমতী নদীকে যোগ করেছে মাদারীপুরের আড়িয়াল খাঁ নদীর সাথে। মাদারীপুর মহকুমার সাথে একটা থানা ছিল এই গোপালগঞ্জ। কোর্ট ছিল ভাঙ্গা।

এই গোপালগঞ্জের চর্তুপার্শ্বে ক্রমে ক্রমে হিন্দু নমঃশূদ্র, কিছু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ থেকে

মুসলমান হতে লাগল ব্যাপকভাবে। প্রধানত জাতিভেদ ও ছুৎমার্গ প্রভৃতি কারণে। বিশেষত কোটালীপাড়ার পশ্চিম পাড়ে কুশলার মুসলমান চৌধুরীদের উদাহরণ। তারা ছিল ব্রাহ্মণ চৌধুরী। জনৈক হিন্দু চৌধুরীর সাথে নিকটস্থ মুসলমান এক ব্যক্তির বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। একদিন ঐ ব্রাহ্মণ চৌধুরী মুসলমান বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল। হঠাৎ সুস্বাদু গন্ধ পেয়ে সচকিত হয়ে উঠলেন তিনি। জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কিসের গন্ধ?' মুসলমান বন্ধুটি বললেন, 'গোমাংস রন্ধন করা হচ্ছে, তার খোসবু'। শোনামাত্র বিমর্ষ হয়ে তিনি বললেন, 'হায় হায়! ঘ্রাণেন চ অর্ধ ভোজনম্। গোমাংস খেয়েছি, আমার জাত গেছে'। সেই থেকে চৌধুরীরা হলেন মুসলমান। গোপালগঞ্জের সন্নিকটস্থ গোবরা প্রভৃতি গ্রামের চৌধুরীরা মুসলমান।

তাছাড়া আমাদের স্বাধীন সার্বভৌম বর্তমান বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে জন্ম দিয়েছে এই গোপালগঞ্জ। শহরের ১০/১২ মাইল দূরে টুঙ্গিপাড়ায় (১৯২০-১৯৭৫ খ্রি.)। তারই পাশে গহর ডাঙ্গায় জন্ম নিয়েছেন কামিল পীর হজরত মৌলানা শামছুল হক—সদর সাহেব (১৮৯৫-১৯৬৯ খ্রি.)। তার অপূর্ব কীর্তি গহর ডাঙ্গার ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্র মাদ্রাসা।

১৮৭৪ সালে গোপালগঞ্জ (খাটরায়) এলেন একজন সেন্ট অর্থাৎ সাধুপুরুষ। নাম তাঁর মথুরানাথ বোস (১৮৪৩-১৯০১ খ্রি.)। যশোরে সাগরদাঁড়ি গ্রামের মাইকেল মধুসুদন দত্তের মতো প্রথমে তিনি ছিলেন হিন্দু, কায়স্থ। বাড়ি ছিল যশোর জেলার চাঁদপুর। ১৮৬০ সালে বি.এ এবং ১৮৬১ সালে বি.এল পাশ করেন। তিনি খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হলেন ১৮৬৬ সালে। তিনি ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ওয়েলসের কাছ থেকে ফরিদপুরের সর্ব দক্ষিণে খাটরা প্রভৃতি অঞ্চলে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের অনুরোধ পেলেন। তিনি অত্যন্ত উদগ্রীব হয়ে আনন্দের সাথে এই অনুরোধ পালন করতে এখানে এলেন। রেভা. বোস কলকাতা থেকে নৌকা করে পনের দিনের মাথায় এসে উঠলেন গোপালগঞ্জ থানায়। তখন কলকাতা থেকে রেল লাইন ছিল না খুলনা পর্যন্ত। অথবা খুলনা থেকে বরিশাল পর্যন্ত স্টিমার সার্ভিস চাল হয় নি। এখানে এসে খাটরা গ্রামের নমঃশূদ্র ব্রাত্যহিন্দু, যাদের চণ্ডাল বলে চিনতো সবাই তাদের সংগে মিলিত হলেন। গভীর বিল অঞ্চলে মধুমতী নদীর বাম প্রান্তে একটু উঁচু জায়গায় তাদের ন্যায় তার বাসগৃহ নির্মাণ করলেন। তালপাতা আর খড়কুটো দিয়ে ছাওয়া একটা ছোট্ট কুটির।

গোপালগঞ্জ সামগ্রিকভাবে ছিল এক বৃহৎ জলাভূমি বিলাঞ্চল। এখানে প্রধানত খাটরা গ্রামগুলির নমঃশূদ্ররা বসবাস করত। তারা ১২/২০ ফুট উঁচু করে বসতবাড়ি নির্মাণ করত। কারণ, বছরের বেশির ভাগ সময় তা জলমগ্ন থাকত। মধুমতীর পাড়ে কোনো কোনো জায়গায় কেবল মাত্র একটু উঁচু ছিল। এখানে এসে তিনি লাঞ্ছনা গঞ্জনা এমনকি শত্রুতাও সহ্য করে খ্রিস্টধর্ম প্রচার এবং সংগে সংগে শিক্ষা বিস্তার করতে লাগলেন। এখানে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি যেতে হলে নৌকা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। নৌকায় শিক্ষা বিস্তার কল্পে একদিন সকালে খেয়ে দেয়ে প্রায় সমস্ত দিন ঘুরেও লেখার জন্য কোন বাড়ি কালি কলম পেলেন না। দূরের উচ্চ বর্ণের হিন্দু লোকেরা তাদের ঘৃণা করত। ব্রাহ্মণ কায়স্থরা তাদের শিক্ষিত করবার তাগিদ পেতেন না। নিরক্ষর হলেও তারা বড় সত্যবাদী ছিলেন। তাই রেভা. বোস বুদ্ধিমান সমাজপতিদের সাথে দেখা করলেন।

তারপর তাদের ছেলেদের নিজ ব্যয়ে কালি-কলম, কাগজ ও শ্লেট দিতে লাগলেন। এমনকি ছাত্রদের নিজেই পড়াতেন। পড়তে স্বভাবত আসতে চাইত না নমঃশূদ্ররা। বলত, লেখাপড়া শিখে কী হবে? চাকরি-বাকরি তো পাবো না। বিশেষত লালপাগড়ি অর্থাৎ পুলিশ দেখলে ভয়ে তারা গ্রাম ছাড়া হতো। হাতে পেলে পুলিশ তাদের যৎপরোনাস্তি মারধোর করত। রেভা. মধুরানাথ বাবুর আগ্রহাতিশয্যে পুলিশের দৌরাত্ম্য কমলো। নানাভাবে ছেলেদের পাঠশালায় আনতে তিনি চেষ্টা করলেন। কোনরূপ অপমানবোধ করতেন না। অসুখ-বিসুখে বিনা পয়সায় তিনি তাদের মধ্যে ওষুধপত্র বিতবণ করতে লাগলেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে এবং পড়াশুনায় আগ্রহ জন্মাতে চেষ্টা করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে এখানে সৃষ্ট বেঞ্চ কোর্টের তিনি প্রাক্তন অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হলেন। সুতরাং সে হিসাবে এবং ধর্ম প্রচারক হিসাবে মানুষকে সেবা করতে অধিকতর সময় এবং সুযোগ পেলেন। লেখাপড়া শিখাতে সর্বৈব সচেষ্ট হলেন।

তিনি প্রথমে এক একটি পাঠশালা খুললেন পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে। খাটরা গ্রামে নদীর পাড়ে একটি প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করলেন। প্রথমে ছাত্র দু-চারজন করে বাড়তে বাড়তে ছাত্র বৃদ্ধি পেতে লাগল। সেই স্কুল পরিশেষে মিশন স্কুল নামে হাইস্কুলে রূপান্তরিত হলো। শুধু কি তাই? তিনি নিজ ব্যয়ে মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করতে একটি মিশন মহিলা স্কুল স্থাপন করলেন। দুঃস্থদের জন্য একটি দাতব্য চিকিৎসালয় খুললেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় পোষ্ট অফিস, হাসপাতাল ও কৃষি ব্যাংক স্থাপিত হয়।

খ্রিস্টান সাধু মথুরানাথ যখনই কোনো বিপদে পড়তেন তিনি তখনই ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করতেন। একবার জনগণ বলতে লাগল, তিনি খ্রিস্টান মতে আমাদের গাং অর্থাৎ গঙ্গাকে অপবিত্র করছেন। সুতরাং তাঁর রোষানল মথুরানাথের সব বিদ্যালয়সহ বাসস্থান ডুবিয়ে দেবে। আসলে তখন নব যৌবনা মধুমতী দুকুল প্লাবিত করে চলছিল। তাঁর বাস্থানাদি বোধ হয় ভেঙে চুরে মধুমতীর অতল গহবরে তলিয়ে যাবে। তখন সাধু মথুরানাথ সাঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে হাটু গেড়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে বসলেন। দেখা গেল, দিন পনেরোর মধ্যেই মধুমতী ধীরে ধীরে মাইল খানেক দূরে দক্ষিণে বয়ে যেতে লাগল। তাঁর বাসগৃহাদি রক্ষা পেল। তিনি এখানে এসেই একটা উপাসনালয় স্থাপন করেছিলেন। প্রথমে সে উপাসনালয় বন-খড় দিয়ে ছাওয়া ছিল। ক্রমে ক্রমে তার উন্নতি হয়ে হয়ে এখন পাকা হয়েছে। অনেক ব্যক্তি, পুরুষ-নারী এমন কি শিশুরা পর্যন্ত ব্যাপটিস্ট খ্রিষ্টান হলেন। শুধু তাঁরই সাধনা এবং সৎ গুণাবলীর ফলে। শহরে খ্রিস্টানপাড়া নামে একটা পাড়া বিদ্যমান আছে। গোপালগঞ্জ জেলায় যথেষ্ট লোক খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে।

১৯০১ সালে ২রা সেপ্টেম্বর রেভা. বোস মৃত্যু বরণ করলেন। তারপর তাঁর পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্রনাথ বোস ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই মিশনের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তাঁর সময় এই মিশন হাইস্কুল মথুরানাথ ইনস্টিটিউশন নামে ১৯০৪ সালে প্রতিষ্টিত হলো। তারপর ১৯১০ সালে মহকুমা অফিসারের অধীন বেঞ্চ কোর্ট উন্নীত হলো ক্রিমিনাল অর্থাৎ ফৌজদারি কোর্টে। ১৯২৫ সালে সিভিল কোর্ট চালু হলো। ১৯২৬ সালে দুটি কোর্টই জাঁকজমকপূর্ণ রীতিতে পাকা করে তৈরি হয়।

এক কথায় গোপালগঞ্জের আদিতে যে উন্নতি সাধিত হলো তা ঐ রেভা. বোস আর পুত্রদের চেষ্টার ফলশ্রুতিতে। এরপরে আর একটি বয়েজ হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হলো। তার

নাম সীতানাথ একাডেমী ১৯১৯ সালে। সীতানাথ দাস কলকাতার রানী রাসমণিরই সম্প্রদায়ভুক্ত তাঁর নিকট আত্মীয়। তিনি মকিমপুর পরগণার জমিদার ছিলেন। 'সীতানাথ হল' নামে আখ্যায়িত একটি হলঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সীতানাথ মণ্ডল মহাশয় বাগেরহাটের হুকুরা নিবাসী একজন দানশীল নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মহাশয় ব্যক্তি। তারই বদান্যতায় এটি নির্মিত। জেলা শহর হিসাবে দ্রুত বর্ধনশীল আজকের এই গোপালগঞ্জ। এরই আদিতে খাটরা পল্লী। এর জমা-জমির পরিমাণ এখনও খাটরা মৌজায় হিসেবে বিধৃত আছে।

যখন মথুরানাথ মিশন স্কুল ১৯৫০ সালে কায়েদে আজম মেমোরিয়াল কলেজে (সদ্য স্বাধীনতা-উত্তর যার নাম বঙ্গবন্ধু মহাবিদ্যালয়) রূপান্তরিত হলো তখনো গুণগ্রাহী গোপালগঞ্জবাসী সাধু মথুরানাথের নাম বিস্মৃত হয়নি। সীতানাথ একাডেমির সাথে মিলিত হয়ে এর প্রথম অক্ষর 'এস' এবং মথুরানাথের প্রথম অক্ষর 'এম' যুক্ত হয়ে এস.এম. মডেল হাইস্কুল (বর্তমানে সরকারি) হয়েছে। সাধু মথুরানাথকে কেউ কখনো ভুলতে পারে না। তাঁর সাধুতা, মহানুভবতা, সততা, নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও গোপালগঞ্জকে আদর্শ করে গড়বার জন্য তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ প্রভৃতি গুণের জন্য। তাই বর্তমান সরকারি বঙ্গবন্ধু মহাবিদ্যালয়টি করে রেখেছেন গুণগ্রাহী গোপালগঞ্জবাসী, স্বর্গীয় মথুরানাথ বসুর উদ্দেশ্যে :

**-ঃ স্মৃতি-মঙ্গল ঃ-**

তোমার তরণী প্রথম যেদিন আসিল গোপালগঞ্জে
উষার সুষমা উঠিল ফুটিয়া প্রকৃতির প্রতি রঞ্জে।
কত বরষের অঙ্গনতম কাটিল তোমার স্পর্শে
নয়ন বাঁধন টুটিল সবার দীপ্ত আনন হর্ষে॥....
করি প্রণিপাত হে মথুরানাথ, নির্ভীক তুমি কর্মে।
বিশ্বপ্রেমিক, হে মহান সাধক, নিরপেক্ষ তুমি ধর্মে।

—শ্রী সুরেশচন্দ্র সেন
সাব ডিভিশনাল অফিসার, গোপালগঞ্জ,
৪ঠা কার্তিক, ১৩২৮ সাল

**সহায়ক গ্রন্থ :**

Early History of Gopalgonj-Rev. J.L. Sircor, B.A. Gopalgonj;
জাতিতত্ত্ব সংগ্রহ-শ্রী গৌরপ্রিয় সরকার;
শ্রীশ্রী হরিগুরু চাঁদ চরিত্র সুধা-শ্রীমৎ বিচরণ পাগল বিরচিত;
বাংলাদেশের ইতিহাস—ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার।

রচনাকাল: ১৩৭১-৭২, কিউ.এ.এম. কলেজ বার্ষিকী
[সূত্র: মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, 'চলিষ্ণু', জামালপুর, ১৯৯৯]

# গোপালগঞ্জ : ইতিহাসের আলোকে

ড. তপন বাগচী

## পটভূমি

জাতীয় জীবনের আন্দোলন-সংগ্রামের সকল ঢেউ-ই একটি পর্বে এসে আছড়ে পড়ে প্রতিটি জেলায়, প্রতিটি থানায়, প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি মানুষের মনে। ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালির যে রাজনৈতিক জাগরণ, ১৯৭১ সালে তা রূপ নেয় বাঙালির স্বাধীনতা-আন্দোলনে। এর আগেও বাঙালি সফল হয় ভাষা-আন্দোলন (১৯৪৮-১৯৫২) ও গণঅভ্যুত্থান (১৯৬৯)-এর মতো দুইটি ব্যাপক সংগ্রামে।

বাংলাদেশের প্রতিটি আন্দোলনের সুতিকাগার আমাদের রাজধানী শহর ঢাকা। এখান থেকেই আন্দোলনের আগুন ছড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে। ১৯৭১-এর স্বাধীনতা-যুদ্ধে পাকিস্তানিদের প্রথম আক্রমণ হয় ঢাকাতে। আর মুহূর্তের মধ্যে এই খবর সারাদেশে ছড়িয়ে পড়লে জেলায় জেলায় গড়ে ওঠে সশস্ত্র প্রতিরোধ। প্রতিটি জেলা-ই হয়ে ওঠে এক-একটি স্বতন্ত্র যুদ্ধক্ষেত্র। তৎকালীন ফরিদপুরের অংশ বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলা-ভূখণ্ডও এর ব্যতিক্রম নয়। দেশের অন্যান্য জেলার মতো সাধারণ একটি জেলা হয়েও এর ঘটনা ও ইতিহাসের প্রতি মানুষের ভিন্ন আগ্রহ রয়েছে।

প্রথমত এই জেলা হচ্ছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মভূমি। তাঁর আহ্বানে বাঙালি জাতি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে। তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

## ক. গোপালগঞ্জ জেলার ভৌগোলিক বিবরণ

অবস্থান : ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত ১৭টি জেলার একটির নাম গোপালগঞ্জ। ১৯৭১ সালে এটি ছিল ফরিদপুর জেলাধীন একটি মহকুমা। এই জেলা ২৩°৩৬′ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৯°৫১′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। তবে শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসুর 'বাংলা বিশ্বকোষ' গ্রন্থে গোপালগঞ্জ সম্পর্কে লেখা হয়েছে—

বঙ্গের ফরিদপুর জেলার একটি নগর। অক্ষাংশ ২৩° ২২′ উত্তর এবং দ্রাঘিমাংশ ৮৯°৫২′ পূর্ব। মধুমতীনদীতীরে অবস্থিত। ধান, লবণ, পাট, দধি, শীতলপাটির ব্যবসায়ের জন্যে এই স্থান প্রসিদ্ধ।[১]

ভৌগোলিক অবস্থান ঈষৎ পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমানে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর গড় উচ্চতা ৪৬ ফুট। গোপালগঞ্জ জেলার পূর্বে মাদারীপুর ও বরিশাল জেলা, দক্ষিণে পিরোজপুর, বাগেরহাট ও খুলনা জেলা, পশ্চিমে নড়াইল ও মাগুরা জেলা এবং উত্তরে ফরিদপুর জেলা অবস্থিত।

* বাংলা একাডেমী পরিচালিত 'মুক্তিযুদ্ধের দলিল ও ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ প্রকল্পে গোপালগঞ্জ জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত গবেষক হিসেবে তপন বাগচী যে পাণ্ডুলিপি রচনা করেন, এটি তার অন্তর্গত। –সম্পাদক

**প্রথম লোকবসতি :** মধুমতী নদীর পাড়ে অবস্থিত এই শহর গোপালগঞ্জের ইতিহাস খুব বেশি আগের নয়। তবে জনবসতির ইতিহাস বেশ পুরনো। গোপালগঞ্জ জেলার দক্ষিণ-পূর্ব সীমানায় খাটরা গ্রামের অধিবাসী নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের হিন্দুরাই এই অঞ্চলে প্রথমে বসতি স্থাপন করে। ধারণা করা হয়, এটি রাজা বল্লাল সেনের আমলের (১১০৮-১১৭৯ খ্রিস্টাব্দ) ঘটনা। কারণ 'নমঃশূদ্র' শব্দটি তিনিই চালু করেছিলেন। এ-ব্যাপারে অনুসন্ধান করেছেন গোপালগঞ্জের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক, অধ্যাপক, প্রাবন্ধিক মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। আনন্দ ভট্ট-কৃত 'বল্লালচরিত' এবং নলিনীকান্ত ভট্টশালী-কৃত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' গ্রন্থের উদ্ধৃতি ব্যবহার করে 'গোপালগঞ্জের আদিকথা' নামে এক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—

> রাজা বল্লাল সেন তাঁর প্রৌঢ় বয়সে পদ্মিনী নামের সুন্দরী এক ডোমকন্যাকে বিয়ে করেন। রাজার এই কলঙ্ক ঘুচাতে ভোজসভার আয়োজন হয়। ঐ ভোজসভায় নমস্ মুণির বংশজাত নমঃ এবং পরাশর মুণির বংশজাত ভৃগুরা অংশ নেয়নি বলে রাজা ক্রুদ্ধ হন। এঁদের ডেকে এনে তিনি পৈতে ছিঁড়ে ব্রাহ্মণত্ব মোচন করেন। 'নমঃশূদ্র' বলে গালি দিয়ে তাড়িয়ে দেন। তাঁরা এসে আশ্রয় নেন যশোর, খুলনা ও ফরিদপুরের এই দুর্গম অঞ্চলে। অশিক্ষা-কুশিক্ষায় দু-এক পুরুষের মধ্যে এঁরা অশিক্ষিত ও বর্বর হয়ে ওঠেন। তথাকথিত ভদ্রলোকের নিকট হয়ে ওঠেন অস্পৃশ্য।[২]

এই খাটরা গ্রামের আশেপাশে বেদগ্রাম, গোলাবাড়িয়া, দুর্গাপুর, মালিবাতা, কাটরবাড়ি, রঘুনাথপুর, সিলনা, গুয়াধানা, বোড়াশি, পাঁচুড়িয়া প্রভৃতি গ্রামের নমঃশূদ্র হিন্দুদের অধিকাংশেরই পেশা ছিল কৃষি ও মাছ ধরা। তারা মধুমতীর মাছ ধরে ও বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করত। তাদের মাছ ক্রয়-বিক্রয়ের জন্যে একটি বাজার গড়ে ওঠে মধুমতীর পাড়ে রাজগঞ্জ নামক জায়গায়। একসময় এই রাজগঞ্জের পাঁচ-ছয় মাইল উত্তরে উলপুর গ্রামে মধুমতীর তীরে কয়েকঘর উচ্চবর্ণের কায়স্থ এসে বসতি স্থাপন করে। এরাই তখন এই এলাকার তথাকথিত ভদ্রজন।

**গোপালগঞ্জের নামকরণ :** ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের সময়ে একজন উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্মকর্তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন রাণী রাসমণি (*-১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ)। এই মহৎ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি লাভ করেন মকিমপুর পরগণার জমিদারি। রাণী রাসমণি জেলে সম্প্রদায়ের মেয়ে। জেলে-বসতি সম্পন্ন এই এলাকার জমিদারি পেয়ে তিনি খুব খুশি হন। তিনি থাকতেন কোলকাতার করপোরেশন স্ট্রিটে। জমিদারি তদারকি করতেন তাঁর নায়েব শ্রীরজনীকান্ত ঘোষ। খাটরা এলাকার জনগণ রাণী রাসমণিকে নিজেদের লোক মনে করে খুব শ্রদ্ধা করতেন। জমিদারি পাবার কিছুদিন পরে রাণীর একটি নাতির জন্ম হলে তার নাম রাখা হয় নবগোপাল। খাটরা এলাকার লোকজন রাণী রাসমণির প্রতি শ্রদ্ধাবশত মকিমপুর পরগণার খাটরা মৌজায় অবস্থিত রাজগঞ্জ বাজারের নাম বদল করে তাঁর নাতি নবগোপালের নামানুসারে রাখতে চান। নবগোপালের 'গোপাল' আর রাজগঞ্জের 'গঞ্জ' মিলে নতুন নাম হলো 'গোপালগঞ্জ'।

**প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন :** খাটরা মৌজা অর্থাৎ গোপালগঞ্জ এলাকা অনুন্নত থাকলেও

এর ২০/২১ মাইল পূর্বে কোটালীপাড়া (বর্তমানে থানা) অঞ্চলের সভ্যতা অনেক পুরনো। সম্রাট অশোকের (খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩ অব্দ) সময়ে ফরিদপুরের দক্ষিণ অঞ্চলে বহু বৌদ্ধ সংঘারাম প্রতিষ্ঠিত হয়। কোটালীপাড়া থেকে অনেকগুলো প্রাচীন বৌদ্ধমূর্তি আবিস্কৃত হয়েছে। ষষ্ঠ শতাব্দীর শিলালিপিতে কোটালীপাড়ায় চন্দ্র বর্মা ফোর্ট স্থাপনের উল্লেখ রয়েছে। রাজা সিংহ বর্মা ও তাঁর পুত্র চন্দ্র বর্মার রাজধানী এখানে ছিল বলে ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গেছে। চতুর্থ শতাব্দীতে স্থাপিত এই সুরম্য দুর্গটি পূর্ববঙ্গের সর্বাপেক্ষা বড় দুর্গ হিসেবে পরিচিত। ধারণা করা হয় যে, তখন কোটালীপাড়া একটি উন্নত শহর ছিল।

চন্দ্র বর্মাকে পরাজিত করে গুপ্তযুগের সূচনা হয়। গুপ্তযুগের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা স্কন্ধ গুপ্তের (৪৫৫-৪৬৭) অনেক স্বর্ণমুদ্রা কোটালীপাড়ার এক কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্বে গুয়াখোলা গ্রামের একটি মঠে[৩] পাওয়া গেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এ এলাকায় চারটি তাম্রলিপি পাওয়া যায়। এতে তিনজন রাজার নাম রয়েছে। ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচার দেব। এ তিনজন ছিলেন গৌড়ের স্বাধীন রাজা। চতুর্থ তামালিপিটি পাওয়া যায় কোটালীপাড়ার পশ্চিম দিকে প্রবাহিত ঘাঘরনদের পাড়ে পিঞ্জুরী গ্রামের ঘাঘরগাতি নামক স্থানে। এতে সমাচার দেবের নাম ছিল। অবশ্য ইতিহাসবিদ ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী মনে করেছেন যে, সমাচার দেব সপ্তম শতাব্দীর রাজা ছিলেন।

অষ্টম শতকের মধ্যভাগে পাল বংশের রাজত্ব শুরু হয়। এই বংশের প্রথম রাজা ছিলেন গোপাল। পাল আমলে ফরিদপুরের সমতট প্রদেশটি বেশ গুরুত্ব অর্জন করে।

পাল বংশের পরে আসে সেন বংশ। দক্ষিণবঙ্গের আধীশ্বর হন বিজয় সেন (১০৯৭-১১৫৯)। এরপর বল্লাল সেন (১১৫৯-১১৮৫)। এই বল্লাল সেনের আমলেই কৌলিন্য প্রথা শুরু হয় এবং নমস মুণির বংশধরের নমঃশূদ্র নামে এই অঞ্চলে বসতি গড়ে। সেন বংশের শেষ প্রতিনিধি লক্ষণ সেন নদীয়া থেকে পালিয়ে ফরিদপুরের জঙ্গলভূমিতে এসে আশ্রয় নেয়। আর এ সময় বখতিয়ার খিলজি অনায়াসে বঙ্গ বিজয় (১২০৪ খ্রিস্টাব্দ) করেন। কিন্তু সমগ্র বঙ্গ তাঁর দখলে ছিলো না। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ইতিহাসবেত্তা, প্রাবন্ধিক, অধ্যাপক আ ন ম আবদুস সোবহান বলেন–

গৌড়ের রাজা লক্ষণ সেন তদপুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন প্রায় অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ (ফরিদপুর-খুলনা) শাসন করেন। বখতিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয় (১২০৪) থেকে শুরু করে ইলিয়াস শাহি বংশের অভ্যুত্থানের (১৩৪১) পূর্বপর্যন্ত পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ (ফরিদপুর-খুলনা) পুরোপুরিভাবে মুসলিম অধিকারে আসে নাই। ঐতিহাসিকগণের এ সিদ্ধান্ত যথার্থই যে, মুসলিম শক্তির ক্রমবিস্তৃতি সত্ত্বেও গৌড়বঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চল মুসলমানদের শাসন বহির্ভূত ছিল। ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ ও খুলনা ইত্যাদি গৌড়বঙ্গের দক্ষিণাঞ্চল চতুর্দশ শতকের মুসলিম অধিকারে আসার কোনো প্রমাণ নেই।[৪]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় (১৭৯৩) গোপালগঞ্জ জেলায় মুকসুদপুর ছিল যশোর জেলার অন্তর্গত আর বাকি অংশ ছিল ঢাকা-জালালপুর জেলার মধ্যে। ১৮০৬ সালে গৌরনদী থানা ঢাকা-জালালপুর জেলা থেকে বাকেরগঞ্জ জেলায় অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮০৭

সালে ঢাকা-জালালপুর জেলার প্রধান কার্যালয় ফরিদপুরে স্থানান্তরিত হয়। এ সময় মুকসুদপুর থানা যশোর থেকে ফরিদপুরের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ১৮১২ সালে চন্দনা ও মধুমতীই যশোর ও ফরিদপুর জেলার মধ্যেকার বিভক্তি রেখা হিসেবে পরিণত হয়।

গোপালগঞ্জ-মাদারীপুরে এলাকা ছিল বিশাল জলাভূমি। এখানো তার অস্তিত্ব রয়েছে। এ এলাকায় নৌ-ডাকাতির প্রকোপ ছিল বেশি। তাই ১৮৫৪ সালে মাদারীপুরে একটি মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আগে মাদারীপুর অঞ্চল ছিল বাকেরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত। ১৮৭০ সালে মাদারীপুর মহকুমায় গোপালগঞ্জ নামে একটি থানা গঠিত হয়। ১৮৭৩ সালে মাদারীপুর মহকুমাকে বাকেরগঞ্জ জেলা থেকে ফরিদপুর জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

১৯০৫ সালে ফরিদপুর জেলা ছিল বাংলার আসাম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এই বিভাগের বিলুপ্তি ঘটলে ১৯১২ সালে এটি অবিভক্ত বাংলা পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।[৫] ১৯০৯ সালে মাদারীপুর মহকুমাকে ভেঙ্গে গোপালগঞ্জ মহকুমা গঠন করা হয়। গোপালগঞ্জ, কাশিয়ানী এবং কোটালীপাড়া থানার সঙ্গে ফরিদপুর মহকুমার মুকসুদপুর থানাও নবগঠিত গোপালগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত হয়। প্রথম মহকুমা প্রশাসক ছিলেন সুরেশচন্দ্র সেন। ১৯১০ সালে মহকুমা অফিসারের বেঞ্চ কোর্ট উন্নীত হলো ফৌজদারি কোর্টে। ১৯২৫ সালে সিভিল কোর্ট চালু হয়।[৬]

**অগ্রদূত:** গোপালগঞ্জ মহকুমা সৃষ্টির পেছনে যাঁর ব্যাপক অবদান রয়েছে তাঁর নাম সেন্ট রেভারেন্ড মথুরানাথ বোস । এই অঞ্চলের শিক্ষাবিস্তারে এবং সার্বিক উন্নয়নে এই মনীষীর ভূমিকাই ছিল অগ্রণী। মথুরানাথের বাড়ি ছিল জেলার (তৎকালীন যশোর) কোর্ট চাঁদপুর গ্রামে (বর্তমানে থানা সদর)। জন্মসূত্রে তিনি কায়স্থ হিন্দু। কোলকাতার ডাফ থেকে ১৮৬০ সালে বিএ এবং ১৮৬১ সালে বিএল পাশ করেন। এরপর ওকালতি পেশায় যোগ দেন। এ পেশায় মনোযোগ দিয়ে তিনি ১৮৬৫ সালে কোলকাতার ভবানী-পুরে লন্ডন মিশন হাইস্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৮৬৬ সালে তিনি খ্রিস্টানধর্মে দীক্ষিত হন। ঐ স্কুলে তিনি প্রায় নয় বছর শিক্ষকতা করেন। বিশিষ্ট কবি, সাংবাদিক ও গবেষক রবীন্দ্রনাথ অধিকারী জানিয়েছেন-

> গোপালগঞ্জ শহরটি মূলত মধুমতী নদীর তীরে খাটরা মৌজার উপর অবস্থিত। এর পূর্ব নাম ছিল রাজগঞ্জ। তৎকালে এই অঞ্চলটি ছিল একেবারেই জলাভূমি ও প্লাবন এলাকা। অধিবাসীদের প্রায় সকলেই ছিল পশ্চাদপদ শূদ্র সম্প্রদায়ের লোক। সকলেই গরিব, অশিক্ষিত ও নিরক্ষর। দশ গ্রামের মধ্যে স্বাক্ষরকারী কাউকে পাওয়া যেত না। অতি দরিদ্র, অনুন্নত ও অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে মুক্তির বার্তা পৌছে দিতে সে সময়ে ফরিদপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. ওয়ালসে কোলকাতা মিশন কর্তৃপক্ষের নিকট ঐ এলাকায় একজন মিশ-নারি পাঠানোর জন্যে আবেদন জানান। কিন্তু কেউ-ই প্রথমে এখানে আসতে রাজি হননি। অবশেষে মথুরানাথ বোস এই গণ্ডগ্রামে আসতে মন ঠিক করলেন।[৭]

রেভারেন্ড মথুরানাথ বোস ১৮৭৪ সালে গোপালগঞ্জে পদার্পণ করেন। গোপালগঞ্জের উন্নয়নে তাঁর অবদান সম্পর্কে আরেক গবেষক আবুল হোসেন ভূঁইয়া বলেন—

> বাবু মথুরানাথ বোসই অত্রাঞ্চলে শিক্ষার আলো-বঞ্চিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে জ্ঞানের অনির্বাণ শিখা প্রজ্জ্বলিত করার মানসে কতিপয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উদ্যোগী

হন। এ ছাড়া তাঁরই প্রচেষ্টায় এখানে বেঞ্চকোর্ট স্থাপিত হয় এবং তিনিই উক্ত কোর্টের প্রথম হাকিম নিযুক্ত হন। তাঁর প্রচেষ্টায় এখানে পোস্ট অফিস, হাসপাতাল ও কৃষিব্যাংক স্থাপিত হয়।[৮]

**গোপালগঞ্জের প্রথম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান:** রেভারেন্ড মথুরানাথ বোস গোপালগঞ্জ শহরে রেভারেন্ড জে এল সরকারের বাসভবনের নিকট ১৮৭৫ সালে একটি পাঠশালা স্থাপন করেন। ১৮৮০ সালে ওড়াকান্দিতে পাঠশালা স্থাপিত হয় আস্তে আস্তে খাটরার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতেও তিনি একটি করে পাঠশালা গড়ে তোলেন। জে এল সরকারের বাসভবনের নিকটের পাঠশালাটি অল্প সময়ের মধ্যেই উচ্চ প্রাইমারি ও পরে মিশন হাইস্কুলে উন্নীত হয়। ১৯০১ সালে তাঁর মৃত্যুর পরে ১৯০৪ সালে এই স্কুলের নাম রাখা হয় মথুরানাথ ইনস্টিটিউশন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই মিশন স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ১৯৪২ সালে তিনি এখান থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। এটি ১৯৫০ সালে কায়েদে আজম মেমোরিয়াল কলেজে রূপান্তরিত হয়। আর স্কুলটি সীতানাথ একাডেমীর সঙ্গে জুড়ে সীতানাথ মথুরানাথ (এসএম) মডেল হাইস্কুল হিসেবে নতুন রূপ পায়। স্বাধীনতার পরে কায়েদে আজম মেমোরিয়াল কলেজের নাম পরিবর্তন করে বঙ্গবন্ধু কলেজ রাখা হয়।

**প্রাশাসনিক ইতিহাস:** ১৯০৯ সালে মহকুমা হওয়ার পরে গোপালগঞ্জের আয়তনের কোনো পরিবর্তন হয়নি। তবে ১৯৭৪ সালে গোপালগঞ্জ সদর থানাকে ভেঙে টুঙ্গিপাড়া নামে নতুন একটি থানা গঠিত হয়। ১৯৮৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে গোপালগঞ্জ মহকুমা তার ৫টি থানা নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ জেলা হিসাবে মর্যাদা পায়। গোপালগঞ্জ সদর থানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৭০ সালে। কিন্তু এটি শহরের মানে উন্নীত হয় ১৯২১ সালে। আদম শুমারি অনুযায়ী এ সময় গোপালগঞ্জ শহরের লোকসংখ্যা ছিল ৩৪৭৮ (তিন হাজার চারশত আটাত্তর) জন মাত্র। গবেষক আবুল হোসেন ভূঁইয়া জানিয়েছেন, সে সময়ে শহরে কোনো মুসলমানের বাস ছিল না। তবে ১৯২৫ সাল থেকে শহরে কিছু মুসলমান চাকরিজীবী, আইনজীবী ও ব্যবসায়ীদের আগমন শুরু হয়। দেশবিভাগের পূর্ব পর্যন্ত শহরের জনসংখ্যার দিক থেকে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। এর পরের স্থানে ছিল বর্ণহিন্দু সম্প্রদায় এবং তৃতীয় স্থানে ছিল হাতে গোনা কয়েকটি মুসলিম পরিবার।[৯] তবে এ সময়ে শহরে ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান ছিল কয়েক ঘর।

গোপালগঞ্জ মহকুমার প্রথম প্রশাসক সুরেশচন্দ্র সেনের পরে ব্রিটিশ আমলে আর যাঁরা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁরা হলেন এ জেড খান, লর্ড সিংহ, কে এন ব্যানার্জি, কে পি সেন, কে এন মিত্র, কাজী গোলাম আহাদ, ইয়াকুব আলি খান, এসএম আলি প্রমুখ। স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় গোপালগঞ্জের এসডিও ছিলেন ইফতিখার হোসেন (১২/১০/১৯৭০-১৭/১২১/১৯৭১)। স্বাধীনতার পরে প্রথম এসডিও হয়ে আসেন কে সি দাস (২৮/১২/১৯৭১-২৯/০২/১৯৭২)।

**কয়েকটি সাধারণ তথ্য:** ১৯৮৪ সালে জেলায় রূপান্তরিত হলে ডিসি হয়ে প্রথমে আসেন এ এফ এ এহিয়া চৌধুরী (০৪/০৩/১৯৮৪-১৪/০৮/১৯৮৬)। ২০০০ সালে গোপালগঞ্জ জেলার ডিসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ইকবাল মাহমুদ। তাঁর দেয়া তথ্য অনুযায়ী, গোপালগঞ্জ জেলার বর্তমানে আয়তন একহাজার চারশত চুরাশি

(১,৪৮৪) বর্গকিলোমিটার। লোকসংখ্যা ১২,৬০,৭৯১ জন। পাঁচটি থানায় পৌরসভা ৩ টি এবং ইউনিয়ন ৬৯টি। সর্বমোট গ্রামের সংখ্যা ৭৭৯টি। এ জেলায় ১৭৬.৪৪ কিমি পাকা রাস্তা, ১৫৫ কিমি আধা-পাকা রাস্তা, ১৩৫৭ কিমি কাঁচা রাস্তা রয়েছে এবং ১২ কিমি রেলপথ রয়েছে।

এ জেলায় মোট ৭৫৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২৫টি নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয, ৪ টি সরকারি বিদ্যালয়, ১৫৩ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৭ টি মহাবিদ্যালয়, ২৯ টি মাদ্রাসা ও একটি বিশ্ববিদ্যালয় (সদ্য ঘোষিত) রয়েছে। জেলার শিক্ষিতের হার ৩৮.২% এর মধ্যে মহিলা ৩১.৬% এবং পুরুষ ৪৪.৭%। গোপালগঞ্জে মোট জমির পরিমাণ ১,৪৮,৬৪৮ হেক্টর। এর মধ্যে আবাদযোগ্য হচ্ছে ১,১০,৯৫১ হেক্টর। এক ফসলি, দুই ফসলি ও তিন ফসলি মিলিয়ে ফসলি জমির মোট পরিমাণ ১,৯৫,৩১২ হেক্টর।

**ক. ১. গোপালগঞ্জ জেলার নদনদী**

জেলার নদীর সংখ্যা ৬টি। এগুলো হলো মধুমতী, কুমার, ঘাঘর, মাদারীপুর, বিলরুট, বাইগার ও বারাশিয়া।

**মধুমতী:** মধুমতী এ জেলার সবচেয়ে বড় নদী। এটি পদ্মার প্রধান শাখানদী হিসেবে পরিচিত। হার্ডিঞ্জ ব্রিজের ১৯ কিলোমিটার ভাটিতে কুষ্টিয়া জেলার তালিবাড়িয়া থেকে পদ্মার শাখা হিসেবে গড়াইনদীর উৎপত্তি। এই গড়াইনদী গড়িয়ে গড়িয়ে ঝিনাইদহ জেলায় প্রবেশ করে আবার ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া সীমানা বরাবর প্রবাহিত হয়ে রাজবাড়ি জেলায় পড়েছে। তারপর মাগুরা-ফরিদপুর জেলার সীমানা দিয়ে দক্ষিণ দিকে বহমান। মাগুরা জেলার মোহাম্মদপুর পর্যন্ত এর নাম গড়াই। এরপর মধুমতী নামে গোপালগঞ্জ জেলায় প্রবেশ করেছে। মধুমতীর তীরেই গড়ে উঠেছে কাশিয়ানী, ভাটিয়াপাড়া ও গোপালগঞ্জ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য স্থান। মিষ্টি (মধু) পানি ধারণ করার জন্যে এর নাম মধুমতী। গবেষক মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের ভাষায় 'স্ফটিক বর্ণের জলের আশ্রয় মধুক্ষরা মধুমতী'।[১০] মধুমতীনদী টুঙ্গিপাড়া থানা হয়ে বাগেরহাটে প্রবেশ করেছে। কচুয়া থানায় পৌঁছে এর নাম হয়ে যায় বলেশ্বর। মধুমতী নদীর দৈর্ঘ্য ১৩৭ কিলোমিটার।[১১]

**কুমার:** কুমারনদের বড় ভূমিকা রয়েছে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে। কুমারনদের উৎপত্তিও পদ্মানদী থেকে। ফরিদপুর জেলা শহরের কাছে চরমাবদি গ্রামের ভেতর দিয়ে পশ্চিমদিকে অম্বিকাপুরে এই নদ দুইভাগে বিভক্ত হয়েছে। একটি অংশ ফরিদপুর শহরের মধ্য দিয়ে ভাঙ্গা থানা সদর পর্যন্ত প্রবাহিত। অপর অংশটি ফরিদপুর সদর থানার ভেতর দিয়ে বোয়ালমারী ও গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর হয়ে ভাঙ্গা থানায় এসে প্রথম অংশের সঙ্গে মিলিত হয়। তারপর ফতেহপুর হয়ে মাদারীপুর বিলরুট ক্যানালে গিয়ে পড়েছে। প্রথম অংশটি গোপালগঞ্জ জেলার সীমানা স্পর্শ করেনি। ভাঙ্গা পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য ৮০ কিলোমিটার। দ্বিতীয় অংশের দৈর্ঘ্য ১১২ কিলোমিটার। ভাঙ্গা থেকে পুনর্মিলিত অংশের দৈর্ঘ্য ৪০ কিলোমিটার।[১২] মুকসুদপুর উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ পাশ দিয়ে একাধিক কুমার নদ প্রবাহিত। পশ্চিম সীমানায় মধুমাত নদী। মুকসুদপুর সাবরেজিস্ট্রি অফিসের সামনে থেকে কুমারের একটি শাখা গোপ্তরগাতী ও উজানী হয়ে মুকসুদপুর সীমানা অতিক্রম করেছে। বনগ্রাম বাজার থেকে কুমারের অন্য একটি শাখা উজানী হয়ে কাশিয়ানী সীমানা অতিক্রম করেছে। তৃতীয় শাখাটি বাটিকামারীর

পশ্চিমপাড়ে হয়ে দিকনগরের সঙ্গে মিলিত হয়ে টেকেরহাটের দক্ষিণে কুমারনদে পড়েছে। বাটিকামারী শাখাটি প্রখ্যাত সমাজসেবক ও বিদ্যোৎসাহী চন্দ্রকান্ত বোস কর্তৃক খননকৃত বলে একে 'চন্দর বোসের খাল' ও বলা হয়।

**মাদারীপুর বিলরুট :** এটি আসলে নদী নয়, খাল। মানুষের হাতেই এর জন্ম। কুমারনদের সঙ্গে মধুমতীনদীর সংযোগ ঘটিয়ে খুলনা-ঢাকার নৌযোগাযোগ সহজতর করার জন্য এই খাল কাটা হয়। এতে তাই মাদারীপুর বিলরুট ক্যানাল-ও বলা হয়ে থাকে। মাদারীপুর জেলার টেকেরহাটের কাছ থেকে শুরু হয়ে চান্দার বিলের মধ্য দিয়ে এই খাল গোপালগঞ্জ জেলার হরিদাসপুরে গিয়ে মধুমতীর সঙ্গে মিশেছে। ১৮৯৯ সালে এই সংযোগ খাল খননের প্রস্তাব করেন স্যার আর বি বাকলে। প্রস্তাব অনুযায়ী ১৮৯৯ থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে মাটি কাটার কাজ সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯০৪ সালের ১৫ জুন এটি উদ্বোধন করা হয় এবং জুলাই মাস থেকে নৌকা ও স্টিমার চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হয়। ৩৮ কিলোমিটার এই খালটি ১৫০ ফুট প্রশস্ত করে খনন করা হয়। এর খরচ পড়ে ৩১,৬৬,৮৭৬.০০ টাকা। এটি এখন প্রায় ৪০০ ফুট প্রশস্ত এবং ৭ থেকে ৩০ ফুট পর্যন্ত গভীর হয়ে প্রবাহিত। খাল হয়েও কার্যত এটি এখন জেলার প্রধান নদী হিসেবেই পরিগণিত। এর তীরে গড়ে উঠেছে টেকেরহাট, জলিরপাড়, বানিয়াচর, সাতপাড়, বৌলতলী, ভেড়ারহাট, হরিদাসপুর, উলপুর ও মানিকদাহ নামক প্রসিদ্ধ স্থান। নৌ-চলাচলের জন্য এর জন্ম হলেও বর্তমানে এই নদীর পূর্বপাড় ঘেঁষে নির্মিত সড়ক ঢাকা থেকে সরাসরি গোপালগঞ্জ হয়ে খুলনা, বাগেরহাট ও পিরোজপুর পর্যন্ত যোগাযোগের ব্যস্ত পথ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একাত্তরে এটি ছিল মূলত নৌপথ। এই পথেই খুলনা হয়ে লঞ্চযোগে হানাদার বাহিনী গোপালগঞ্জে প্রবেশ করে।

**ঘাঘর:** এই নদ কোটালীপাড়ার নিকট দিয়ে প্রবাহিত। এর পূর্বনাম ঘরঘরা। মাদারীপুর জেলার রাজৈর থানার নিম্নকুমারনদের থেকে একটি খাল বাঘিয়ার বিল হয়ে কালীগঞ্জ, রাধাগঞ্জ হয়ে কোটালীপাড়ার ঘাঘব বাজার হয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। ঘাঘরের কাছে একে নদ বলে মনে করা হয়। গোপালগঞ্জ থেকে কোটালীপাড়া যেতে হলে এই নদটি পার হতে হয়। এই নদে এবং এর সংলগ্ন খালে হেমায়েত উদ্দিনের বাহিনী অনেক সফল অপারেশন পরিচালনা করেছে।

**বাইগার:** এই নদী টুঙ্গিপাড়া থানার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। বর্ণি বাওড়ের মধ্য দিয়ে এসে টুঙ্গিপাড়ার বঙ্গবন্ধুর বাড়ির পূর্বপাশ দিয়ে এটি মধুমতী নদীতে গিয়ে পড়েছে। এটি মূলত মধুমতীর উপনদী। এই নদীর বর্ণনা পাওয়া যায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিন-ার স্মৃতিকথায়—

> গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামখানি একসময় মধুমতী নদীর তীরে ছিল। বর্তমানে মধুমতী বেশ দূরে সরে গেছে। তারই শাখা হিসেবে পরিচিত বাইগারনদী এখন গ্রামের পাশ দিয়ে কুলকুল ছন্দে ঢেউ তুলে বয়ে চলেছে। রোদ ছড়ালে বা জ্যোৎস্না ঝরলে সে নদীর পানি রুপোর মতো ঝিকমিক করে।[১৩]

এটি মধুমতীর শাখানদী নয়, উপনদী। এই নদী বেয়েই পাকবাহিনী খুলনা থেকে পাটগাতী ও টুঙ্গিপাড়ায় প্রবেশ করে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় চলাচলের জন্যে এই নদীটিরও গুরুত্ব রয়েছে।

**বারাশিয়া :** এটি মধুমতীর একটি শাখানদী। মধুমতী থেকেই উৎপন্ন হয়ে এটি আবার মধুমতীর সঙ্গেই মিলিত হয়েছে। মাঝখানে কাশিয়ানী থানার অংশ বিশেষ ছুঁয়ে গেছে। এর তীরেই ঐতিহাসিক ভাটিয়াপাড়া যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

### ক. ২. গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থান

স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় গোপালগঞ্জ জেলায় কোনো পাকা রাস্তা ছিল না। নৌকা এবং লঞ্চই ছিল এ- জেলার একমাত্র বাহন। মানুষ পায়ে হেঁটেই চলাচল করত। এখন অবশ্য প্রতিটি থানার সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ তৈরি হয়েছে।

গোপালগঞ্জ সদর ছাড়াও এ জেলার কোটালীপাড়া, রামশীল, মানিকদাহ, উলপুর, হরিদাসপুর, সাতপাড়, বৌলতলী, কোটালীপাড়া, রামশীল, ভাঙ্গারহাট, কালীগঞ্জ, রাধাগঞ্জ, সিকিরবাজার, উনাশিয়া, টুঙ্গিপাড়া, পাটগাতী, বর্ণি, কাশিয়ানী, ওড়াকান্দি, ভাটিয়াপাড়া, রামদিয়া, ফুকরা, মুকসুদপুর, খান্দারপাড়, জলিরপাড়, বানিয়াচর, ননীক্ষীর, সিন্দিয়াঘাট, দিগনগর প্রভৃতি স্থান মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে গুরুত্ব অর্জন করেছে।

গোপালগঞ্জ জেলাটি বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে অবস্থিত। শতাব্দীর শুরুতে এ এলাকার বর্ণনা পাওয়া যায় J. C. Jack পরিচালিত একটি সমাজতাত্ত্বিক জরিপে। ১৯০৬-১৯১০ সালে পরিচালিত এ-জরিপের লিখিত প্রতিবেদন The Economic Life of A Bengal District গ্রন্থে তিনি লিখেছেন—

> জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের পুরো এলাকাটি বিরাট বিল; তবু বিরাট ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ধরে রাখতে সক্ষম। স্বাভাবিক নিয়মে জমি সম্ভবত বহু যুগ আগেই বড় নদীগুলোর পলি থেকে জেগে উঠেছিল কিন্তু তাদের পথের অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে নদীগুলো এসব জায়গা পরিত্যাগ করে এবং ফলে কয়েকটি ছোট ছোট ভূখণ্ড ছাড়া অন্য বিস্তর ভূমি জেগে উঠেনি। কেবল গত শতাব্দীতেই লোকজন এ-অববাহিকায় দল বেঁধে চলে আসে। অন্ধকারময় জলাভূমিটি এখন প্রতি বর্গমাইল ৮০০ লোক ধারণ করে। বছরের আট মাস ৭০০ বর্গমাইল এলাকাটি হ্রদের মতো থাকে: বাকি চার মাস বেশির ভাগ অংশ শুকনো থাকে এবং তার উপর ফসল ফলে। কিন্তু মাঝখানটা যা নদী থেকে দূরে, এখনও জলাশয় এবং চাষের উপযোগী; জেলার এ সব অংশে ছোট গ্রামগুলোতে দীঘি বা বড় পুকুব রয়েছে। গ্রামটি যখন স্থাপিত হল তখন দীঘি খনন করা হয় এবং পুকুরপাড়গুলো যতক্ষণ পর্যন্ত না জলাশয় স্তরের উপর উঠলো ততক্ষণ পর্যন্ত মাটি তুলে স্তূপ করা হলো। পুকুরপাড়ে তখন বাড়ি তৈরি হলো। বছরের শুকনো মৌসুমে, যখন বিলে পানি খুব কম থাকে বা মাটির ভেতর ঢুকে যায়, তখন এ গ্রামগুলো আগ্নেয়গিরির মুখের মতো একটি এবড়ো-থেবড়ো জায়গার মতো জেগে ওঠে। বর্ষার সময় অনেক দূর থেকে দেখা যায়; বন্যার উচ্চতায় এগুলোকে হ্রদের উপর দ্বীপ ভাসছে বলে মনে হয়। ইংল্যান্ডের মতো ব-দ্বীপে কোনো গ্রামীণ রাস্তা নেই, দুই বা তিনটি দোকান, গ্রামের গির্জা, পান্থশালা, হল বা বিনোদন ঘরসহ দুইধারে পাথর অথবা ইটের তৈরি বাড়িঘরের সারি বা জোড়া এখানে নেই। প্রকৃত পক্ষে গ্রাম বলতে ইংরেজিতে যা বুঝায় এরূপ গ্রাম এখানে নেই। যদিও জেলার কয়েকটি অংশে গ্রামবাসীদের বাড়িঘরগুলো একত্রে সারিবদ্ধভাবে আছে। উত্তরদিকের পুরনো এলাকায় বাড়িঘরগুলো ছোট ছোট নদীর

পাড়ে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। এগুলো ফলের বাগান অথবা কমপক্ষে কয়েকটি গাছ দ্বারা বেষ্টিত। নিচু জায়গায় ছোট গ্রামগুলোও গড়ে উঠেছে এ-ধরনের অনিয়মিত সারিতে কিন্তু বাড়িগুলো কাছাকাছি এবং প্রত্যেকটির পৃথক দেয়াল রয়েছে। এগুলো সাধারণত কয়েকটি ফলের গাছের ছায়া আবৃত। দক্ষিণ-পশ্চিম জলাশয়গুলোর দিকে বাড়িঘরের লম্বা সারি খুব কমই আছে, যদিও অনেক বাগানসহ এ-রকম বাড়িঘর নদীগুলোর পাশে সব সময়ই দেখা যায়; কিন্তু কোথাও কোথাও দীঘির চারদিকে এর গঠন হয় গোলাকার, বাড়িঘরও অপেক্ষাকৃত কম থাকে এবং খুব কাছাকাছি হয়, বৃক্ষরাজিও কম থাকে। পলিগঠিত দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অতি সম্প্রতি জমি গড়ে উঠেছে এবং তা খুব সহজেই ভেঙে যায়। যার কারণে যে সকল বৃক্ষরাজি আস্তে আস্তে জন্মে তা আবার সেখানে করা হয়। কিন্তু এখানে সাধারণ বাড়ির সারি দেখা যায়। যদিও প্রত্যেক কৃষক কর্তৃক তাদের নিজ জমির তৈরি বিচ্ছিন্ন বাড়িঘরের সংখ্যা কম নয়। তথাপি স্বতন্ত্র বাড়িঘরের সাধারণ সারিও মাঝে মাঝে দেখা যায়। তবে প্রত্যেক চাষি কর্তৃক তার নিজের জমিতে বিচ্ছিন্নভাবে বাড়িঘর করা সাধারণ ব্যাপার।[১৪]

**গোপালগঞ্জ :** এখন বর্ধিষ্ণু শহর। ১৯২১ সাল থেকে এটি শহরের মর্যাদা পেয়েছে। মধুমতী নদীর তীরে এর জন্ম। কিন্তু এখন মধুমতী সরে গেছে প্রায় ছয় কিলোমিটার পশ্চিমে। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসহ তিনটি কলেজ রয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট নামের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানও এখানে চালু করার কথা। গোপালগঞ্জ একটি থানা ও জেলা সদর ছাড়াও ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ। খুলনা, বাগেরহাট ও পিরোজপুর জেলার সঙ্গে যোগাযোগের কারণেও গোপালগঞ্জের গুরুত্ব বেড়ে গেছে। গোপালগঞ্জের অদূরে টুঙ্গিপাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মস্থান হিসেবে সারা বিশ্বে পরিচিত হয়ে উঠেছে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বাড়ি এ জেলায় অবস্থিত।

**উলপুর :** গোপালগঞ্জ সদর থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার উত্তরের একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এখানে স্টিমারঘাট ছিল। তথাকথিত উচ্চবর্ণের কায়স্থরা এখানে বাস করতো। সিপাহি বিদ্রোহের আগে এরা এসে এখানে বসতি স্থাপন করে। ধারণা করা হয়, এরা ঢাকা থেকে আসে মুসলমানদের নিগ্রহ এড়াতে।[১৫] অন্য একটি সূত্রে জানা যায়, মোগল আমলে একজন হিন্দু রাজকর্মচারীকে তাঁর ভালো কাজের জন্যে উপহারস্বরূপ তালুক হিসেবে এই গ্রামটি দেয়। যা-ই হোক শিক্ষা-দীক্ষায় এই গ্রামটি বেশ উন্নত ছিল। ১৮৭৬ সালে এই গ্রাম থেকে প্রকাশিত হতো 'চিত্রকর' নামের একটি মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক ছিলেন প্রতাপচন্দ্র রায়চৌধুরী।[১৬] এ-থেকেও বোঝা যায় এ-গ্রামের সাংস্কৃতিক মান কতটা উঁচুতে ছিল।

**গোপীনাথপুর :** এ জেলার একটি গ্রাম। এটি মেরি- গোপীনাথপুর নামেও পরিচিত। এ গ্রামে একটি উচ্চ বিদ্যালয়, একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি মাদ্রাসা, হাসপাতাল ও ডাকঘর রয়েছে। গোপালগঞ্জ শহর থেকে প্রায় পনের কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে এর অবস্থান। এর উত্তর দিকে এবং পূর্ব দিকে কাশিয়ানী থানার সীমানা।

**সাতপাড় :** টেকেরহাট-গোপালগঞ্জ মহাসড়কের মাঝামাঝি স্থানে মাদারীপুর বিলরুট ক্যানালের পূর্বপাড়ে সাতপাড় ইউনিয়ন অবস্থিত। এখানে প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ

বীরেন্দ্রনাথ বিষয়ক সরকারি নজরুল মহাবিদ্যালয়, দীননাথ গয়ালীচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৩৯) ভেল্লাবাড়ী সম্মিলিত একটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রভৃতি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। যোগাযোগ-ব্যবস্থা এখন উন্নত। মুক্তিযুদ্ধে এই এলাকার ভূমিকা রয়েছে। স্বাধীনতার পর জলিলপাড় ইউনিয়নের কিছু অংশ ও বৌলতলা ইউনিয়নের কিছু অংশ নিয়ে বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের তত্ত্বাবধানে ইউনিয়নটির পত্তন হয়।

**কাশিয়ানী :** এককালের একটি বিখ্যাত গ্রাম। এখন গোপালগঞ্জ জেলার একটি থানা। এটি ২৩°১৪′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°১২′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। কাশিয়ানী-ভাটিয়াপাড়া রেলপথ এই থানার যোগাযোগের একটি বড় মাধ্যম। মধুমতী নদী এবং বারাশিয়া নদীও এই থানার মুখ্য নৌপথ। নওয়াব আলিবর্দি খাঁর আমলে এই গ্রামের জমিদার ছিলেন বাবু দর্পনারায়ণ সেন। নিজ গ্রামে তিনি স্থাপন করেছিলেন কাশীনাথ দেবের পাঁচটি মূর্তিসহ পাঁচটি সুদৃশ্য মন্দির। কাশীনাথ দেবের নামানুসারে দর্পনারায়ণ সেনের গ্রামটির নাম হয়ে যায় কাশিয়ানী। এই গ্রামে প্রায় সকল বর্ণ ও গোত্রের হিন্দুরা বাস করতো। ব্রিটিশ আমলের প্রখ্যাত জজ বৈদ্যনাথ সেন, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী কবিরাজ কৈলাসচন্দ্র সেন ছিলেন এই গ্রামের অধিবাসী। ১৯০২ সালে তৎকালীন জমিদার গিরীশচন্দ্র সেন কাশিয়ানীতে একটি স্কুল স্থাপন করেন। তাঁর নামানুসারে এই স্কুলের নাম হয় জে সি হাইস্কুল। গোপালগঞ্জ জেলায় আসার আগে এটি একসময় যশোর জেলার অন্তর্গত ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় কাশিয়ানীতে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি অপারেশন পরিচালিত হয়।

**ওড়াকান্দি :** কাশিয়ানী থানাব একটি ইউনিয়ন ২৩°২১′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°৪৯′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে এর অবস্থান। ওড়াকান্দি মিড হাই স্কুল (১৯০৮) এ-অঞ্চলের প্রাচীন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ডাক্তার মিড নামের একজন খ্রিস্টান মিশনারি। ১৮৮০ সালে গুরুচাঁদ ঠাকুর এখানে যে পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেন তাই পরবর্তীতে হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয়। নমঃশূদ্রসহ নিম্নবর্গের উত্থানের কেন্দ্রীয় চরিত্র লাভ করে। এই গ্রামের ভীষ্মদেব দাস নিম্নবর্গের প্রতিনিধি হিসাবে প্রথম বাংলার আইন পরিষদে প্রবেশ করেন নমঃশূদ্র সমাজের প্রথম দুই ব্যারিস্টার পি. আর. ঠাকুর ও সুরেশ বিশ্বাস (কবি) এই গ্রামের সন্তান। ড. ভগবতী প্রসন্ন ঠাকুর বিলেতে পি.এইচডি করেন। অমূল্য দাশ বিলেত ফেরত ইঞ্জিনিয়ার। এখানে অস্ট্রেলিয়ান ব্যাপ্টিস্ট মিশন আছে। ব্যাপক সংখ্যক শিক্ষিত নমঃশূদ্র হিন্দু এই ইউনিয়নে বাস করে। শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের লীলাক্ষেত্র এবং মতুয়া সম্প্রদায়ের মহাতীর্থ হিসেবে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে এটি পবিত্র স্থান। প্রায় দুইশত বছর আগে ১২১৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে ওড়াকান্দির পার্শ্ববর্তী সাফলিডাঙ্গা গ্রামে শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। ডাক্তার মিড মিশনারি ছেড়ে হরিচাঁদ ঠাকুরের পুত্র দেব ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং শ্রীধাম ওড়াকান্দি প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল ধর্মের লোক এই মতুয়া ধর্মালোন্দলনে শরিক হন। মুক্তিযুদ্ধের সময় দক্ষিণাঞ্চলের শরণার্থীরা এখানে এসে আশ্রয় নিত। বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার মুক্তাঞ্চলের হেডকোয়ার্টার ছিল এই ওড়াকান্দি গ্রামে। এখানে একটি ট্রেনিংক্যাম্প ছিল, যাঁর নেতৃত্বে ছিলেন নূব মুহম্মদ ক্যাপ্টেন বাবুল (ফরিদপুর)।

**রামদিয়া :** বেথুড়ি ইউনিয়নের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। ১৯৪২ সালে এখানে

বৃহত্তর ফরিদপুর জোর দ্বিতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। চন্দ্রকান্ত বসু (চন্দর বোস) প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ কলেজ এখন জাতীয়কৃত। এলাকার শিক্ষাবিস্তারে এই কলেজের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে।

**সাজাইল :** কাশিয়ানী থানার একটি গ্রাম ও ইউনিয়ন। ১৯৩০ সালে এখানে স্থাপিত হয় গোপীমোহন উচ্চবিদ্যালয়। শিক্ষাদীক্ষায় এ অঞ্চল তাই যথেষ্ট উন্নত।

**সিঙ্গা :** কৈলাসচন্দ্র চকমোহন উচ্চ বিদ্যালয় ১৯৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

নড়াইলের জমিদারের নায়েবকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়।

**কোটালীপাড়া :** গোপালগঞ্জ জেলার একটি থানা। এটির অবস্থান ঘাঘরনদের তীরে। ২২°৫৯′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°০০′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ জুড়ে কোটালীপাড়া অবস্থিত। এখানে যে ফোর্ট-এর ভগ্নাবশেষ এখনো দেখা যায়, তার দেয়াল ৩০ ফুট উঁচু এবং দুই থেকে আড়াই মাইল লম্বা। এই ফোর্ট বা কোর্ট থেকেই এর নাম কোটালীপাড়া হয়েছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের পৈতৃক ভিটা রয়েছে থানা সদরের পাশে ঊনাশিয়া গ্রামে। ষোড়শ শতকের কবি কৃষ্ণনাথ সার্বভৌম, সংস্কৃত কবি হরিদাস সিদ্ধান্ত মহাবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধান্ত পঞ্চানন, ড. কালীপদ তর্কাচার্য, কথাসাহিত্যিক রমেশচন্দ্র সেন প্রমুখ খ্যাতিমানদের বাস এই কোটালীপাড়ায়। কোটালীপাড়া ফোর্টের পার্শ্বেই দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্ত এবং স্কন্ধ গুপ্তের শাসনামলের স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে। গুপ্ত আমলের কিছু তাম্রফলকও এখানকার ঐতিহাসিক নিদর্শন। কবি ও সাংবাদিক দীপঙ্কর গৌতম জানান যে,

> 'এই গোপালগঞ্জেরই কোটালীপাড়া একসময় বঙ্গের রাজধানী ছিলো। এ কারণে শিল্প-সংস্কৃতির প্রসার সেখানেই সম্ভবত বেশি ঘটেছিল। ষোড়শ শতকের কবি ও সংস্কৃত সাহিত্যের কবিদের অন্যতম এবং সেবা কাব্যগ্রন্থ ললিত লবঙ্গলতা কাব্যের কবি কৃষ্ণনাথ সার্বভৌম এখানেই জন্মেছিলেন। উক্ত কাব্যের একটি কপি এখনো লন্ডন মিউজিয়ামে সংরক্ষিত অবস্থায় আছে। তিনি বিয়ে করেছিলেন সংস্কৃতভাষার অন্যতম মহিলা কবি সরস্বতী দেবীকে। এখানেই জন্মেছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যের মহাকবিদের একজন কবি হরিদাস সিদ্ধান্ত মহাবাগীশ। তিনি মহাকবি কালিদাসের অসমাপ্ত কাব্যগ্রন্থগুলো সমাপ্ত করেছিলেন।'[১৭]

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসুর 'বাংলা বিশ্বকোষ' গ্রন্থ থেকে জানা যায়–

বাঙ্গালাবিভাগের ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। ইহার মধ্যে ৭২টি গ্রাম ৭৪টী কিস্মত আছে। দশশালা বন্দোবস্তকালে ইহার সদরজমা ২২০০ টাকা ধার্য্য করা হয় পাশ্চাত্য বৈদিকগণের চৌদ্দটী সমাজের মধ্যে একটী এখানে। ইহার মধ্যে ঘর্ঘরনদ নামে একটী নদ প্রবাহিত। ইহার ভূতত্ত্ব পর্যালোচনা করিলে বোধ হয়, ৫/৬ শতবর্ষ পূর্বে এই স্থান নদীময় ছিল। মনসামঙ্গরের বিজয় গুপ্তের বাটীর বর্ণনায় আছে—

পশ্চিমে ঘর্ঘরনদ পূর্বে ঘন্টেশ্বর
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিতনগর॥

সম্প্রতি কোটালীপাড়ের পশ্চিমাংশে ঘর্ঘরনদের রেখামাত্র আছে। ঘর্ঘরনদের পাড় হইতে ফুল্লশ্রী গ্রাম প্রায় ৪॥ ক্রোশ পূর্বে। ইহাতে অনুমিত হয়, তৎকালে কোটালীপাড়া ঘর্ঘরনদের গর্ভাশয়ী ছিল। মহাবিষুবসংক্রান্তি দিনে ইহার পাড়ে একটী মেলা হয়। অনেক স্ত্রীলোক আসিয়া স্নান করে। প্রচার আছে, এক সন্ন্যাসী

বর দিয়েছেন যে, অপুত্রক স্ত্রী হইলে মহাবিষুবসংক্রান্তি দিনে এইখানে স্নান করিলে ও গঙ্গাপূজা করিলে তাহার সন্তান হইবে।[১৮]

গোপালগঞ্জ সদর থেকে ২৪ কিলোমিটার পূর্বে এই থানা সদর অবস্থিত। আগে নৌকাই ছিল একমাত্র বাহন। এখন গোপালগঞ্জ থেকে সরাসরি এবং মাদারীপুর জেলার রাজৈর থানা সদর থেকে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। গোটা কোটালীপাড়া এখনো বিল অঞ্চল। কান্দির বিল, রাড়ির বিল, বাঘিয়ার বিল এ-থানার বিখ্যাত বিল। অত্যন্ত অনুন্নত এ-এলাকায় বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হাটের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য চলে। সপ্তাহে দু-বার বসা এই হাটগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঘাঘর, সিকির বাজার, রাধাগঞ্জ, ডুমুরিয়া, পিঞ্জুরী, কালীগঞ্জ ও ভাঙ্গারহাট। এ থানায় বর্তমানে পাঁচটি কলেজ— শেখ লুৎফর রহমান সরকারি কলেজ (কোটালীপাড়া), কাজী মন্টু ডিগ্রি কলেজ (ভাঙ্গার হাট), রামশীল ইউনিয়ন কলেজ (রামশীল ধারাবাসাইল শেখ হাসিনা কলেজ ও শেখ রাসেল কলেজ (কলাবাড়ি)। কোটালীপাড়া অঞ্চলেই গড়ে উঠেছিল বিখ্যাত 'হেমায়েত বাহিনী'। এই অঞ্চলকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত করার সাহস ও সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে হেমায়েত বাহিনীর অধিনায়ক হেমায়েত উদ্দীন 'বীরবিক্রম' খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন।

**কুশলা :** কোটালীপাড়া থানার একটি ঐতিহাসিক গ্রাম। কোটালীপাড়ার কোতোয়াল সাবি খাঁ এসে এই গ্রামে পত্তনি গড়েন। এই গ্রামের জন্মগ্রহণকারী বিশিষ্ট সংস্কৃতিকর্মী, ফরিদপুর সাহিত্য ও সংস্কৃতি উন্নয়ন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক আবু সুফিয়ান চৌধুরী কুশল এলাকায় প্রচলিত জনশ্রুতি থেকে জানান যে, এ এলাকায় ছিল তথাকথিত বর্ণহিন্দুর বসবাস। লোকনাথ পণ্ডিত নামে সাবি খাঁর এক বন্ধু এই বাড়িতে এসে গোমাংস রন্ধনের ঘ্রাণ পাওয়ায় তিনি জাত হারিয়েছেন বলে মনে করেন এবং স্বেচ্ছায় ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। এই লোকনাথ পণ্ডিতের বংশধররাই সম্ভবত এই এলাকার অধিকাংশ মুসলিম। অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাস জানান, কুশলা এবং গোবরার মুসলমান চৌধুরীরা ব্রাহ্মণ ছিল।[১৯] নদীয়ার 'কুশ' নামক গ্রাম থেকে লোকনাথ পণ্ডিত এসেছিলেন বলে এই গ্রামের নাম হয়েছে কুশলা। সাবি খাঁ-র দূর্গের ভগ্নাবশেষ এখনো এই গ্রামে রয়েছে। এই গ্রামে মুক্তিযুদ্ধের একটি ক্যাম্প ছিল।

**রামশীল :** কোটালীপাড়ার একটি ইউনিয়নের নাম। হেমায়েত বাহিনীর সবচেয়ে বড় সম্মুখযুদ্ধ এই গ্রামের বালাবাড়িতে সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধে হেমায়েত আহত হন। তাঁর চোয়ালে গুলির আঘাতের ক্ষত এখনো বিদ্যমান।

**মুকসুদপুর :** এটি একটি থানাসদর। গোপালগঞ্জ জেলার এই থানা সদরটি টেংরাখোলা ইউনিয়নে অবস্থিত। ২৩°১৯' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°৫২' পূর্ব দ্রাঘিমাংশে এর অবস্থান। থানা পরিষদ হিসেবে মুকসুদপুর নামটি স্বীকৃতি হলেও এর অবস্থান টেংরাখোলা বাজারে। ১৯১৪ সালে ১৬ সেপ্টেম্বর টেংরাখোলা মৌজায় আজকের স্থানে মুকসুদপুর থানাকে স্থাপনের জন্য তারকাটার বাউন্ডারি করা হয়। তারপর ১৯২২-২৪ অর্থবৎসরে মুকসুদপুর থানা ভবন ও নির্মিত হয়। পরবর্তীতে টেংরাখোলায় হাসপাতাল, ডাকঘর, সাবরেজিষ্ট্রি অফিস নির্মিত হয়। পার্শ্ববর্তী চণ্ডিবর্দী ও গোপীনাথপুরে অন্যান্য অফিস-আদালত ভবন নির্মিত হয়। মুকসুদপুর থানা একসময় যশোর জেলার অন্তর্গত ছিল। মুকসুদপুর ভেঙেই কাশিয়ানীর জন্ম।

মুকসুদপুর থানা সদর থেকে তিন কিলোমিটার পশ্চিমে কদমপুর মৌজার তৎকালীন নড়াইলের জমিদার বাবু রতনকুমার একটি পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করেন তাঁর কাচারি বাড়িতে। ব্রিটিশ রাজত্বে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ ও ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যাওয়ায় জমিদার রতন বাবু তাঁর কাচারি বাড়ির পুলিশ ক্যাম্পকে পূর্ণাঙ্গ থানায় পরিণত করবার জন্য কলকাতার সচিবালয় বা লাটভবন রাইটার্স বিল্ডিং-এর উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী জনাব মোকসেদ আলী সাহেবের সার্বিক সহযোগিতা পান। বিনিময়ে জমিদার তার কদমপুর পুলিশ ক্যাম্পকে নতুন নামকরণ করেন মোকসেদপুর থানা। যার সংশোধিত এবং বিবর্তিত রূপ মুকসুদপুর থানা। আজও অনেক জায়গায় মোকসেদপুর নামটি ব্যবহার করা হয়। মুকসুদপুরের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে কুমারনদ। পলি জমে এটি এখন অনাব্য এবং মৃতপ্রায়। ব্রিটিশ আমলে এ এলাকায় নীলচাষ হতো।

বর্তমানে মুকসুদপুর ১৭টি ইউনিয়ন সমন্বয়ে গঠিত। এখানে ২৭০টি গ্রামের মোট জনসংখ্যা ২,৬৯,৪৮৯ জন। এলাকার অধিকাংশ লোকই হিন্দু নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের। জলিরপাড় ইউনিয়নে বেশ কয়েকটি খ্রিস্টান মিশন রয়েছে। বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা, 'হিস্টরি অব বেঙ্গল'-এর রচয়িতা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার এ-থানার খান্দারপাড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বিশিষ্ট ইতিহাসবেত্তা অধ্যাপক এ এফ সালাউদ্দিন আহমদের বাড়ি এই থানায়। বিশিষ্ট রাজনীতিক পূর্ববঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের পূর্ত ও যোগাযোগ মন্ত্রী (১৯৫৫-১৮৫৬) আবদুস সালাম খান (১৯০৬-১৯৭২) এ-থানার বেজড়া গ্রামে জন্ম নেন। মুক্তিযুদ্ধের এখানকার ভূমিকাও ছিল উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে দিগনগর ব্রিজ অপারেশন, সিন্দিয়াঘাট অপারেশন এখানকার ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে পরিগণিত। পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ভবানীশংকর বিশ্বাসের বাড়ি এই থানার মাঝিগাতি গ্রামে।

**দিগনগর :** দিগনগর ইউনিয়নের উপর দিয়েই গেছে ঢাকা-গোপালগঞ্জ সড়ক। এটি মুকসুদপুর থানার অন্তর্গত। ভাঙ্গা থানাসদর থেকে দশ কিলোমিটার দক্ষিণে এর অবস্থান। কুমাবনদের উপর দিয়ে যেতে সড়কপথে একটি সেতু আছে যা দিগনগর সেতু হিসেবে পরিচিত। এখানে একটি হাইস্কুল, বাজার, ডাকঘর ও পুলিশ ক্যাম্প আছে। এই দিগনগরের রাজাকার ও পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে তিনদিনব্যাপী এক যুদ্ধ হয়।

**জলিরপাড় :** জলিরপাড় হচ্ছে একসময়ের বিখ্যাত নৌবন্দর। মাদারীপুর বিলরুট ক্যানেলের উত্তরপাড়ে অবস্থিত। টেকেরহাট থেকে ছয় কিলোমিটার পশ্চিমে যেখানে এসে এই কাটাখাল দক্ষিণদিকে মোড় নিয়েছে, তার উত্তরেই জলিরপাড় বন্দর ও বাজার। এখানে একটি স্কুল আছে 'জলিরপাড় কলিগ্রাম মুকুন্দবিহারী মল্লিক উচ্চবিদ্যালয়' (১৯৩৯) নামে নমঃশূদ্র সমাজের প্রথম মন্ত্রী তৎকালীন মন্ত্রী মুকুন্দবিহারী মল্লিকের নামে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্প্রতি একটি কলেজ স্থাপিত হয়েছে 'বঙ্গরত্ন ডিগ্রি কলেজ' নামে। কলেজটির অবস্থান কলিগ্রামে। খালের দক্ষিণপাড়েও রয়েছে বর্ধিষ্ণু গ্রাম এবং কুটিরশিল্পের জন্যে বিখ্যাত স্থান। এখানে গহনাশিল্পের উৎপাদন ও বিপণনের জন্য 'ব্রোঞ্জপট্টি' নামে একটি বাজার সৃষ্টি হয়েছে। দেশে উৎপাদিত নকল গহনার (ইমিটেশন) একটি বড় অংশ উৎপাদিত হয় এখানে। জলিরপাড়ের চান্দার বিলে পিট কয়লা পাওয়া যায়।

**বানিয়ারচর:** জলিরপাড় ইউনিয়নের মধ্যে জলিরপাড় বন্দরের দক্ষিণপাড়ে,

ব্রোঞ্জপট্টির পশ্চিমপার্শ্বে এর অবস্থান। বানিয়ারচর গ্রামটি খ্রিস্টান-অধ্যুষিত। এখানে দুইটি বৃহৎ গির্জা রয়েছে। কেলগ মুখার্জি মেমোরিয়াল সেমিনারির অবস্থান এখানেই। ঐতিহ্যবাহী খ্রিস্টানধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্যে বানিয়ারচর দেশের বাইরেও পরিচিতি অর্জন করেছে। মিশনের মধ্যে একটি স্কুল ও একটি উন্নত হাসপাতাল রয়েছে। এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করা হতো। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই খ্রিস্টান মিশন পাকবাহিনীর আক্রমণের শিকার হয়।

**ননীক্ষীর:** মুকসুদপুর জেলাব একটি ইউনিয়ন। বনগ্রাম, গোয়ারগ্রাম, ভাটরা, মহিতলী, নওখণ্ডা, পাথরঘাটা ও ননীক্ষীর গ্রাম নিয়ে এই ইউনিয়ন গঠিত। ননীক্ষীর গ্রামে একটি প্রাচীন মন্দির রয়েছে। মন্দিরের অভ্যন্তরে পোড়ামাটির মূর্তি পাওয়া গেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে এসব মূর্তি মূল্যবান। এলাকাবাসীর ধারণা যে, এই মন্দির ও মূর্তির বয়স প্রায় পাঁচশত বছর।

**টুঙ্গিপাড়া:** এটি পাটগাতী ইউনিয়নের অন্তগর্ত একটি গ্রাম। বর্তমানে টুঙ্গিপাড়া একটি থানাসদর। ১৯৪৬ সালে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় গিমাডাঙ্গা টুঙ্গিপাড়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়। ১৯৬৬ সালে গিমাডাঙ্গা আইডিয়াল জুনিয়র হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষাবিস্তারে এ স্কুলদুটিব ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। বর্তমানে এখানে একটি কলেজ রয়েছে, যার নাম শেখ মুজিবুর রহমান মহাবিদ্যালয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৫ এর পনেরই আগস্ট সপরিবারে হত্যা করে খুনীরাই তাঁর মরদেহ এখানে সমাহিত করে। তাঁর জন্মদিনে (১৭ মার্চ) এই স্থান উৎসবে পরিণত হয়। তাঁর মহাপ্রয়াণ দিনে জাতীর শোকদিবসের মূল অনুষ্ঠান এখানে পালিত হয়। এটি এখন বাঙালির তীর্থস্থানে পরিণত। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (১৯৪৫) এবং প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শেখ ফজলুল করিম সেলিমের স্থায়ী বসবাস এই টুঙ্গিপাড়াতেই। টুঙ্গিপাড়ার পাশেই বিখ্যাত পাটগাতী বন্দর। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-র এক স্মৃতিমূলক রচনায় টুঙ্গিপাড়ার চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়—

> নদীব (বাইগার) পাড় ঘেঁষে কাশবন, ধান-পাট-আখ ক্ষেত, সারিসারি খেজুর, তাল-নারকেল-আমলকি গাছ, বাঁশ-কলাগাছের ঝাড়, বুনো লতা-পাতার জংলা, সবুজ ঘন ঘাসেব চিকন লম্বা সতেজ ডগা। শালিক-চড়ুই পাখিদের কলকাকলি, ক্লান্ত দুপুরে ঘুঘুর ডাক। সব মিলিয়ে ভীষণ বকম ভালোলাগার একটুকরো ছবি যেন! আশ্বিনের এক সোনালি রোদ্দুব ছড়ানো দুপুরে এই টুঙ্গিপাড়া গ্রামে আমার জন্ম। গ্রামের ছায়ায় ঘেরা, মায়ায় ভরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও শান্ত নিরিবিলি পরিবেশ এবং সরল-সাধারণ জীবনের মাধুর্যের মধ্য দিয়ে আমি বড় হয়ে উঠি।
>
> আমাদেব বসতি প্রায় দুশো বছরেব বেশি হবে। সিপাহি বিপ্লবের আগে তৈরি করা দালান-কোঠা এখনও রয়েছে। আমাদেব আত্মীয়-স্বজনরা সেখানে বসবাস করেন। তবে বেশিব ভাগ ভেঙে পড়েছে, সেখানে সাপের আখড়া। নীলকব সাহেবদের সঙ্গে আমাদের পূর্বপুরুষদের অনেক গোলমাল হতো। মামলা-মোকদ্দমা হয়েছে। ইংবেজ সাহেবদের সঙ্গেও গণ্ডগোল লেগেই থাকতো। একবার এক মামলায় এক ইংরেজ সাহেবকে হাবিয়ে জরিমানা পর্যন্ত কবা হয়েছিল। ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হয়ে সেই ভাঙা দালান এখনও বিধ্বস্ত অবস্থায় রয়েছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকসেনাবাহিনী ঐ দালানের ওপর হামলা চালিয়েছিলো। আমার দাদা-দাদীকে রাস্তায় বসিয়ে রেখে আগুন

জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিলো।

*　　　　*　　　　*

আমার দাদার একটি বড় নৌকা ছিলো, যার ভেতরে দুটো ঘর ছিলো। জানালাও ছিলো বড় বড়। নৌকার পেছনে হাল, সামনে দুই দাঁড় ঘেরা গ্রাম দেখতে আমার বড় ভালো লাগতো। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় সেই নৌকা ভেঙে নষ্ট হয়ে যায়। শৈশবের ফেলে আসা সেই গ্রাম আমার কাছে এখনও যেন সুভাষিত ছবির মতো। আমার বাবার জন্মস্থানও টুঙ্গিপাড়ায়। তিনি এখন ঐ গ্রামের মাটিতেই ছায়াশীতল পরিবেশে ঘুমিয়ে আছেন। তার পাশেই আমার দাদা-দাদীর কবর। যারা আমার জীবনকে অফুরন্ত স্নেহমমতা দিয়ে ভরিয়ে তুলেছিলেন, আজ আমার গ্রামের মাটিতেই তারা মিশে আছে। ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট ঘাতকের নির্মম বুলেটে আমার মা, বাবা, ভাই ও আত্মীয়-পরিজন অনেককে হারাই। দেশ ও জাতি হারায় তাদেব বেঁচে থাকার সকল সম্ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বাধীন সত্তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। ঘাতকের দল বাংলার প্রাণকেন্দ্র ঢাকা থেকে সরিয়ে সেই মহাপুরুষকে নিভৃতে পল্লীর মাটিতেই কবর দিয়েছে। ইতিহাসের পাতা থেকে তাঁকে মুছে ফেলার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছে— কিন্তু পেয়েছে কি?[২০]

**বর্ণি :** টুঙ্গিপাড়া থানার একটি গ্রাম ও ইউনিয়ন। এই গ্রামে ষাট দশকের অন্যতম কবি আবুল হাসানের (১৯৪৭-১৯৭৫) জন্ম। এটি তাঁর মাতুলালয়। বর্ণি বিখ্যাত তার বিশাল বিল বা বাওড়ের জন্যে। বর্ণিত বাওড় দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে বড় বাওড় হিসেবে স্বীকৃত। মুক্তিযুদ্ধের সময় আশেপাশের মানুষের আশ্রয়স্থল ছিল এই বর্ণি বাওড়।

**খ. ১৯৪৭-পূর্ব প্রতিরোধের ঐতিহ্য :**

জেলা হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে গোপালগঞ্জ ১৯৮৪ সালে। এর আগে মাদারীপুর মহকুমা ও তার আগে ফরিদপুর মহকুমা ও জেলার অন্তর্গত ছিল। ফরিদপুর জেলাভিত্তিক আন্দোলন-সংগ্রামে ও প্রতিবাদ-প্রতিরোধে বর্তমান গোপালগঞ্জ ভূখণ্ডের রাজনীতিবিদ ও সাধারণ মানুষের সময়োপযোগী ভূমিকা বরাবরই ছিল গৌরবজনক। এ-জেলার কোটালীপাড়ার সভ্যতা অনেক প্রাচীন। এটি ছিল দুর্গনগরী। একসময়ে বঙ্গের রাজধানী ছিল এই কোটালীপাড়ায়। ভৌগোলিক পরিবেশগত দিক থেকে এই জেলা ছিল জঙ্গলাকীর্ণ জলাভূমি। এই প্রতিকূল প্রতিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করেই এখানে বসতি স্থাপন করে নমঃশূদ্র হিন্দুরা। ফরিদপুরের ইতিহাসবেত্তা অধ্যাপক আ ন ম আবদুস সোবহান জানিয়েছেন—

> 'পুণ্ড্র' নামে এক অনার্য জাতি আর্যাধিকারের পূর্বে সমুদ্রকূলবর্তী বঙ্গের অধিবাসী ছিল। এই পুণ্ড্রদের অধঃস্তন পুরুষ হচ্ছে বর্তমানকালের নমঃশূদ্র সমাজ। মি. ফকস পৌণ্ড্র, ক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্রদিগকে আদিম জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। এই প্রাচীন জাতি এখনো ফরিদপুরে বসবাস করে আসছে। গোপালগঞ্জ জেলায় এদের আধিক্য দেখা যায়।[২১]

এই হিন্দুরাই জঙ্গল কেটে এ-অঞ্চলকে বাসযোগ্য করে তোলে। কৃষিকাজ এবং মাছধরার মাধ্যমেই এরা জীবিকা নির্বাহের পথ খুঁজে নেয়। রাজনৈতিক প্রতিরোধ, প্রতিবাদ ও সংগ্রামের পাশাপাশি এই অঞ্চলের মানুষের নিরন্তর প্রতিরোধ তাই প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধেও। ১৮৭৩ সালে তথাকথিত উচ্চ বর্ণের বিরুদ্ধে নমঃশূদ্রদের

বয়কট আন্দোলন এই গোপালগঞ্জেই সবচাইতে জঙ্গীরূপ ধারণ করেছিল।

**জেলার প্রথম প্রতিরোধ :** এই অঞ্চলে প্রথম রাজনৈতিক প্রতিরোধের ঘটনা সম্রাট নসরৎ শাহের আমলে। আলাউদ্দিন হোসেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নাসিরউদ্দীন নসরৎ শাহ বাংলার সিংহাসন আরোহণ করেন। মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের সঙ্গে নসরৎ শাহের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বাবরের সন্ধিপ্রস্তাব নসরৎ শাহ মেনে নিলে যুদ্ধ থেমে যায়। কিন্তু বাবর প্রশংসা করেন বাঙালিদের কামান চালনার। গঙ্গানদী ও ঘর্ঘরানদের তীরে এই যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। ঘর্ঘরানদই বর্তমানে কোটালীপাড়ার পশ্চিমপাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ঘাঘরনদ। নসরৎ শাহের আমলে দক্ষিণাঞ্চলে পর্তুগিজদের আক্রমণ ও লুটতরাজ বৃদ্ধি পায়। গোপালগঞ্জের গণমানুষকে সঙ্গে নিয়ে নসরৎ শাহ পর্তুগিজদের অত্যাচার মোকাবেলা করেছিলেন।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের অধীনে ১৭৪০ সালে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন আলিবর্দি খান। তিনি সাবি খাঁ নামে এক ব্যক্তিকে কোতোয়াল হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। অনেকের ধারণা, এই কোতোয়াল শব্দ থেকেই কোটালীপাড়ার নামকরণ। কিন্তু কোটালীপাড়ার নামকরণ হয়েছে আরো প্রায় হাজার বছর আগে থেকেই। তাই এই অনুমান ধোপে টেকে না।

ব্রিটিশ আমলের শুরুতেই এই অঞ্চলে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ও ফকির বিদ্রোহ দানা বেঁধে ওঠে। মাদারীপুর মহকুমা ও গোয়ালন্দ মহকুমায় সন্ন্যাসী ও ফকিরদের কিছু আখড়া ছিল। মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত কোটালীপাড়া ও গোপালগঞ্জ অঞ্চলেও কিছু আখড়া ছিল বলে অনুমান করা যায়। ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম সরব প্রতিবাদ করেন সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর (১৭৮২-১৮১১)। ফরিদপুর জেলায় তিতুমীরের অনেক শিষ্য ও অনুসারী ছিল।

**ফরায়েজি আন্দোলন :** এই জেলায় সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী আন্দোলন হলো ফরায়েজি আন্দোলন। হাজি শরীয়তুল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০) ছিলেন ওহাবি মন্ত্রে দীক্ষিত। তাঁর ওহাবি আন্দোলন রূপ নেয় ফরায়েজি আন্দোলনে। শরীয়তুল্লাহর নীতি ছিল, ইসলাম ধর্ম অনুসারে কোরান ও হাদিসের নির্দেশাবলি সমাজে প্রতিষ্ঠা করা। ইসলাম-বিরোধী রীতিনীতি পরিহার করে ফরজ আদায়ের মাধ্যমে প্রকৃত মুসলমান গড়ার আন্দোলন-ই ফরায়েজি আন্দোলন। তখনকার মুসলিমরা অধিকাংশই ছিলেন নও-মুসলিম। শরীয়তুল্লাহর আন্দোলন ধর্মীয় গণ্ডি পেরিয়ে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়। এটি কার্যত ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। শরীয়তুল্লাহর বাড়ি মাদারীপুর মহকুমার শামাইল (শিবচর থানা) গ্রামে। তাঁব পিতার নাম আব্দুল জলিল তালুকদার। শরীয়তুল্লাহকে অসংখ্যবার গ্রেফতার করা হয়। শরীয়তুল্লাহর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র মহসিন উদ্দিন আহমেদ ওরফে দুদুমিয়া (১৮১৯-১৯৬০) এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে চলেন। ১৮৪১ সালে ফরিদপুররের কানাইপুরে এবং ১৮ ৪২ সালে ফরিদপুরে জমিদারদের সঙ্গে ফরায়েজিদের যুদ্ধ হয়। এই ঘটনায় দুদুমিয়া-সহ ১১৭ জন গ্রেফতার হন। ইংরেজ আদালতে ২২ জনের সাতবছর করে জেল হয় এবং দুদুমিয়া ও বাকিরা মুক্ত হন। দুদুমিয়ার নেতৃত্বে হাজার হাজার লোক ফরায়েজি আন্দোলনে সামিল হয়।

**নীলবিদ্রোহ :** নীলচাষ-বিরোধী আন্দোলনের ঐতিহ্য রয়েছে গোপালগঞ্জবাসীরও।

এ অঞ্চলে নীলবিদ্রোহ শুরু হয়েছিল দুদুমিয়ার নেতৃত্বে। ১৮৪৬ সালে দুদুমিয়ার অনুচর কাদের বক্সের নেতৃত্বে মাদারীপুরের পাঁচচরে নীলকুঠিতে আক্রমণ ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। নীলকুঠির কর্ণধর মি. ডানলপ পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের সময় দুদুমিয়া গ্রেফতার হন এবং আলিপুর জেলে থেকে ১৮৫৯ সালে মুক্তি পেয়ে ঢাকা চলে আসেন। ১৮৬০ সালে ব্রিটিশ-বিরোধী এ নেতা মৃত্যুবরণ করেন।

ফরিদপুর জেলার ৫২টি নীলকুঠির প্রায় প্রত্যেকটিতেই স্থানীয় চাষীরা আক্রমণ করে। তাঁর সমর্থকরা পাঁচচর ছাড়াও বহু নীলকুঠিতে আক্রমণ করে। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কাশিয়ানীর ঘটনা। কাশিয়ানী থানার পাথরঘাটার মহিমচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে লোহাগড়ার মকিমপুর নীলকুঠি আক্রমণ হলে বন্দুকের গুলিতে তিনজন চাষি নিহত হয়। বিচারে মহিমচন্দ্র ও তাঁর সঙ্গীরা কারাভোগ করেন। এ-ধরনের আন্দোলনের ফলেই নীলচাষ স্বেচ্ছাধীন বলে স্বীকৃতি পেয়েছিল।

**ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন:** ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের ধারায় (১৯০৬-১৯৪৭) যুগান্তর ও অনুশীলন পার্টির কর্মকাণ্ডেও এ জেলার অবদান ছিল। মাদারীপুর মহকুমায় (গোপালগঞ্জ-সহ) অনুশীলন সমিতির নেতা ছিলেন আশুতোষ কাহেলী, জীবন গুহঠাকুরতা, নলিনী ভট্টাচার্য, চিত্ত কাহেলী, ধীরেন আতর্থী ও সুবোধ রায়। ফরিদপুরের যুগান্তর দলের প্রধান ছিলেন ইশিবপুরের পূর্ণচন্দ্র দাস। এর সঙ্গে ছিলেন খালিয়ার (রাজৈর, মাদারীপুর) কালী ব্যানার্জি, কোটালীপাড়ার বিজয় চক্রবর্তী, পঞ্চানন চক্রবর্তী, বিজয়ানন্দ দত্ত, প্রফুল্ল চট্টোপাধ্যায়, দ্বারিকানাথ বারুরী, ফণিভূষণ মজুমদার (১৯০১-১৯৮১), অমলেন্দু দাসগুপ্ত, মুকুন্দলাল সরকার (১৯০৩-১৯৮০), ড. হারিপদ চক্রবর্তী, নলিনী গুহ, কেন্দুয়ার সন্তোষ দত্ত, প্রতাপচন্দ্র গুহরায়, সরমঙ্গলের হরিপদ দাস ও সুফী জোনাব আলী প্রমুখ বিপ্লবী।

মাত্র ১৮ বছর বয়সে ফাঁসির আদেশ বরণকারী বিপ্লবী নেতা ক্ষুদিরাম বসুর (১৯৮৯-১৯০৮) পৈতৃক বাড়ি মাদারীপুর মহকুমার (বর্তমান শরীয়তপুর) সখীপুর গ্রামে। তাঁর পিতার নাম ছিল ত্রৈলোক্যনাথ বসু। চাকরিসূত্রে তিনি মেদিনীপুরের বাসিন্দা। বাঘা যতীনের (যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৮৮০-১৯১৫) সহকর্মী ছিলেন ফরিদপুরেব মনোরঞ্জন, চিত্তপ্রিয় ও নীরেন্দ্র। বাঘা যতীনের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী চিত্ত প্রিয় বলেশ্বরের ময়ূরভঞ্জের জঙ্গলে পুলিশের গুলিতে নিহত হন। অগ্নিযুগের বিপ্লবী সতীন্দ্রনাথ সেন ছিলেন যুগান্তর দলের প্রথম সারির নেতা। তাঁর বাড়ি কোটালীপাড়া থানার বাগান উত্তরপাড়া গ্রামে।

১৯১৪ সালে ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার হয়ে ফরিদপুর জেলে আটকা পড়েন মাদারীপুরের বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র দাস। এসময় বিপ্লবী বাঘা যতীনের সহকর্মী মাদারীপুরের শহীদ চিত্ত প্রিয়ের ভাই কান্তি প্রিয়ের জেল-কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের অজুহাত ধরে জেলারকে পিটানোর পরিকল্পনা করেন বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র দাস, সন্তোষ দত্ত ও তাঁদের সহকর্মীরা। জেলার উপেন মুখার্জি এই পরিকল্পনা শুনতে পেয়ে তাঁদের উপর সকল নির্যাতন বন্ধ করেন।

১৯২০ সালের দিকে অনুশীলন বিপ্লবী দলের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। তখন ফরিদপুরের শ্যামল ভট্টাচার্য ও তারাপদ লাহিড়ী, পালং-এ (শরীয়তপুর) হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রভাত চক্রবর্তী, ভোজেশ্বরের (শরীয়তপুর) মাখনলাল কর, ভাঙ্গায়

(ফরিদপুর) যতীন ভট্টাচার্য, রাজবাড়িতে নিরোধ দাস, পাংশায় সুরেন ঘোষ, কালুখালির নিরোদ সেন, কার্তিকপুরের জীবন ধোপা ও মাদারীপুরের শান্তি সেন ছিলেন সকল আন্দোলনের নেতৃত্বে। ১৯২১ সালে মাদারীপুরে অনুশীলন শিক্ষাশ্রম প্রতিষ্ঠা করে বাঙালি জাতীয়তাবাদী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধকরণের উদ্যোগ নিয়েছেন বিলাসখান গ্রামের আশুতোষ কাহেলী, জীবন গুহঠাকুরতা প্রমুখ নেতা। ১৯২০ সালের মাঝামাঝি সময়ে মাদারীপুরে সন্তোষ ব্যানার্জি পিতার জমিদারি ছেড়ে যোগ দেন বিপ্লবী আন্দোলনে। ১৯৩০ সালে তিনি প্রথম কারারুদ্ধ হন। প্রায় আট বছর জেল খেটে মুক্তিলাভ করেন। কিছুদিন পরে আবার গ্রেফতার হন। সারা জীবনে প্রায় ত্রিশ বছর জেলে কাটানো এই বিপ্লবী বীর প্রতিটি জাতীয় আন্দোলনে সামনের কাতারে থাকেন। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) নেতা হিসেবে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। একই সময়ে আরো যাঁরা বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নেন, তাঁরা হলেন আশু ভরদ্বাজ, সত্য মৈত্র, সমর সিংহ, শান্তি সেন প্রমুখ। পাকিস্তান আমলে এঁরা সবাই বামপন্থী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর দেশত্যাগের পর ফরওয়ার্ড ব্লকের বিপ্লবী দল বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স, শ্রীসঙ্ঘ, আরএসপিআই প্রভৃতি সংগঠনের সঙ্গে মাদারীপুরের পূর্ণচন্দ্র দাস ও যতীন ভট্টাচার্যের শান্তিসেনাও সক্রিয় হয়ে ওঠে। এ-সময় এলাকার বিপ্লবী কর্মী বিজয় দত্ত ও শান্তিসেনার বেশ কিছু সদস্য গ্রেফতার হন।

**জেলার প্রথম শহীদ :** ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে শরীয়তপুরে আংগারিয়ায় ডাকলুটের সিদ্ধান্ত হয়। এ সময় ল্যাজাবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন জ্যোতি নামের এক বিপ্লবী। ১৯৩৮ সালে ডাকলুটের অভিযোগে আন্দামানে নির্বাসিত হন মাদারীপুরের অনুকূল চ্যাটার্জি, যোগেশ চ্যাটার্জি, প্রফুল্ল চ্যাটার্জি প্রমুখ বিপ্লবী এঁদের মুক্তির দাবিতে বৃহত্তর ফরিদপুর এলাকা জুড়ে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। এবং এই দাবিতেই রাজবাড়ি দাদসী রেলস্টেশন এবং কোটালীপাড়ার সেটেলমেন্ট অফিস পুড়িয়ে দেয়া হয়। দুটি ঘটনার নেতৃত্বে ছিলেন কোটালীপাড়া থানার বান্ধাবাড়ি গ্রামের ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস-ই গোপালগঞ্জ জেলার প্রথম শহীদ।

**বামপন্থী আন্দোলন :** ১৯৪২ সালের পর থেকে এ অঞ্চলে মার্কসবাদী আন্দোলন বেশ চাঙ্গা হয়ে ওঠে। এ এলাকায় সন্তোষ ব্যানার্জি, আশু ভরদ্বাজ, সত্য মৈত্র, সমর সিংহ, শান্তি সেন, অরুণা সেন, উপেন সেন, কার্তিক বেদজ্ঞ, মিয়া মোহন, মৃণালকান্তি বারুরী, সত্যেন বারুরী, ওয়ালিউর রহমান লেবু মিয়া, কমলেশ বেদজ্ঞ, মোখলেছুর রহমান, আতিয়াব রহমান, চিত্ত ঘোষ, শওকত চৌধুরী, ডা রমানাথ বিশ্বাস, কানাইলাল গৌতম, নবেশচন্দ্র বিশ্বাস, আবু হোসেন, নীহার বিশ্বাস, শেখ মোহাম্মদ ইলিয়াস, ইঞ্জিনিয়ার আবুল কাশেম অসিতবরণ রায় প্রমুখ বিভিন্ন সময়ে এ-আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন।

**পূর্ববঙ্গের প্রথম রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা :** পূর্ববঙ্গের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম মাদারীপুর মহকুমায়। গোপালগঞ্জ তখন মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত। তাই এ-কৃতিত্বের অংশীদার বর্তমান গোপালগঞ্জ ভূখণ্ডের আধিবাসীরাও। মাদারীপুর জেলার অন্তর্গত রাজৈর থানার খালিয়া ইউনিয়নের সেনদিয়া গ্রামের অম্বিকাচরণ মজুমদার (১৮৫১-১৯২২) প্রতিষ্ঠিত এই রাজনৈতিক দলের নাম 'ফরিদপুর পিপল্‌স এসোসিয়েশন'। মূলত আঞ্চলিক সমস্যাব সমাধান ও দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ১৮৮১

সালে এই দল আত্মপ্রকাশ করে উপমহাদেশের বড় রাজনৈতিক দল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার (১৮৮৫) চার বছর আগেই পরে এই দল 'ভারতসভা'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। তিনি ভারতসভার প্রাদেশিক সম্মেলনের বর্ধমান অধিবেশনের সভাপতি (১৮৯৯), কলকাতা অধিবেশনের সভাপতি (১৯১০) হিসেবে মনোনীত হন। ১৯১৩ থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত ভারতসভার সভাপতি ছিলেন। লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি সভাপতি মনোনীত হন। তাঁর উদ্যোগে ১৯১৮ সালে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ স্থাপিত হয়। অম্বিকাবাবু ফরিদপুর মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম চেয়ারম্যান।

**বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন :** ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধেও এ-জেলার মানুষ প্রতিবাদ করেছিল। জানুয়ারি মাসেই প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে। অম্বিকাচরণ মজুমদারের সভাপতিত্বে এ সভায় বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ সংসদ গঠিত হয়, যাঁর সদস্য ছিলেন, মথুরানাথ মৈত্র, পূর্ণ মৈত্র, কালু মজুমদার, জগদ্বন্ধু মৈত্র, সতীশ মজুমদার, উমাচরণ আচার্য এবং আসাদুজ্জামান। সাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যালের সভাপতিত্বে এক সভায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে ফরিদপুর-কেন্দ্রিক মুসলিম নেতাদের মধ্যে ছিলেন পাংশার আসাদুজ্জামান, প্রখ্যাত সাময়িকপত্র 'কোহিনুর' সম্পাদক রওশন আলী চৌধুরী এবং মৌলভী আবদুর রহমান দুদুমিঞা উকিল ছিলেন অগ্রণী ভূমিকায়।

**স্বদেশী আন্দোলন ও কংগ্রেস:** বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনই রূপ পায় স্বদেশী আন্দোলনে। ১৯০৭ সালে স্বদেশী আন্দোলন পরিচালনার জন্য অম্বিকাচরণ মজুমদারকে সভাপতি এবং মৌলভী আবদুর রহমান দুদুমিঞা উকিলকে সম্পাদক করে ফরিদপুর জেলা কমিটি গঠন করা হয়। বৃহত্তর ফরিদপুর এবং পাশের জেলা বরিশালেও এই আন্দোলন উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক রূপ লাভ করে।[২২] এই আন্দোলনে ফরিদপুরের অঞ্চলের মূল দায়িত্বে ছিলেন অম্বিকাচরণ মজুমদার। হিন্দু ও মুসলমান একযোগে এই আন্দোলনে শরিক হয়। গোপালগঞ্জের নেতৃত্বে ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। ১৯২১ সালে অম্বিকাচরণ মজুমদার ফরিদপুরে ন্যাশনাল লিবারেল এসোসিয়েশন গঠন করে খিলাফত ও কংগ্রেসের যৌথ অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। ১৯২২ সালে অম্বিকাচরণের মৃত্যু হলে কংগ্রেসের নেতৃত্বে আসেন শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী (ভাঙ্গা), সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি (শরীয়তপুর), তজিমউদ্দিন খান, প্রমথ গুহ, সতীশ মজুমদার যদুনাথ পাল, মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী লালমিয়া (ফরিদপুর) প্রমুখ।

এ সময় কংগ্রেসের কাজে যুক্ত হন অম্বিকাচরণ মজুমদারের পারিবারিক উত্তরসূরী ফণিভূষণ মজুমদার (১৯০১-১৯৮১)। ১৯২০ সালে তিনি 'বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি'র সেবাদলের সঙ্গে যুক্ত হন। কিন্তু বিপ্লবী পরিচয় গোপন রেখেই কংগ্রেসের কাজে সক্রিয় হন।[২৩] ১৯২৮ সালে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের এক সম্মেলন হয় ফরিদপুরে। তখন তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন ফণিভূষণ মজুমদার। ১৯২৯ সালে কংগ্রেসের লাহোর সম্মেলনে স্বাধীনতার সংকল্প গৃহীত হলে ফরিদপুরের কয়েকজন বিপ্লবী কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ফরিদপুরের প্রায় দুহাজার লোক কারাবরণ করেন। আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন ফরিদপুরের চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী লালমিয়া, রাজবাড়ির চারুপ্রভা সেন, নরেশ ঘোষ, প্রভাষ ঘোষ, অনিল লাহিড়ী, অমল সান্যাল, সৌমেন ভট্টাচার্য ও মাদারীপুরের শান্তি সেন। এ-

সময় কংগ্রেসের আরো নেতাদের মধ্যে সাংবাদিক সিরাজউদ্দিন আহমদ (ভাঙ্গা), 'রাজমুকুট' গ্রন্থের লেখক ডা. সাইদ উদ্দিন সিদ্দিকী (কাশিয়ানী), নলিনীরঞ্জন সেন (পালং) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

**মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান আন্দোলন :** ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকার শাহবাগে পূর্ববঙ্গের মুসলিম নেতাদের এক অধিবেশনে মুসলিম লীগ গঠিত হয়। এতে ফরিদপুর জেলার প্রতিনিধিত্ব করেন কৈজুরী গ্রাম নিবাসী খান সাহেব ওয়াহিদুন নবী। ১৯২৯ সালে এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী মুসলিমরা 'কৃষক প্রজা সমিতি' গঠন করেন। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, সাংবাদিক মওলানা আকরাম খা প্রমুখ এই নতুন দলে যোগ দেন। ফলে এ অঞ্চলে মুসলিম লীগের বিকাশ লাভে দেরি হয়। কংগ্রেস থেকে তমিজউদ্দিন খান এবং ১৯৪০ সালে চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন লালমিয়া মুসলিম লীগে যোগদান করেন।

গোপালগঞ্জ জেলার রাজনীতিবিদদের মধ্যে মুসলিম লীগের নেতা ছিলেন ওয়াহিদুজ্জামান ঠাণ্ডা মিয়া (১৯১২-১৯৭৬)। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের কাউন্সিলার (১৯৪০-১৯৪৩) নির্বাচিত হয়েছিলেন। তফশিলী ফেডারেশনের নেতা ছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন দ্বারিকানাথ বারুরী (মাদারীপুর) এবং ভবানীশংকর বিশ্বাস (গোপালগঞ্জ) প্রমুখ তফশিলী নেতা মুসলিম লীগকে সমর্থন করেন।

**বঙ্গবন্ধুর উত্থানপর্ব :** গোপালগঞ্জের শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) ছাত্রজীবন থেকেই সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ নিয়ে 'জাতির জনক' এবং 'বঙ্গবন্ধু' হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক (১৯৪১) পাস করে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হয়ে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দির সংস্পর্শে রাজনীতিতে ব্যাপকভাবে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর একজন ঘনিষ্ঠ অনুসারী হিসেবে কলকাতার মুসলিম ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত হন। আইএ (১৯৪৪) এবং বিএ (১৯৪৬) পাস করার পর তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের বামপন্থী গ্রুপের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন। ১৯৪৬-এ তিনি ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) নির্বাচিত হন। তিনি নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন, নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কাউন্সিলার এবং গোপালগঞ্জ মহকুমা মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৫ সালে গোপালগঞ্জ মহকুমা মুসলিম লীগের সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি। সম্মেলনে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতা আবুল হাশিম (১৯০৫-১৯৭৪) এবং কলকাতা পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি কমিশনার শামসুদ্দোহা এসেছিলেন।

১৯৩৭ সালের এমএলএ নির্বাচনে ফরিদপুর থেকে তফসীলি কোটায় নির্বাচিত হয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, প্রমথরঞ্জন ঠাকুর (পিআর ঠাকুর) এবং বিরাটচন্দ্র মণ্ডল মুসলিম কোটায় বিজয়ী হন খন্দকার শামসুদ্দিন আহমদ (গোপালগঞ্জ), আহমদ আলী মৃধা (গোয়ালন্দ), তমিজউদ্দিন খান (ফরিদপুর-পশ্চিম), চৌধুরী ইউসুফ আলী মোহন মিয়া (ফরিদপুর-পূর্ব), মোহম্মদ আবুল ফজল (মাদারীপুর-পশ্চিম), গিয়াসউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী (মাদারীপুর-পূর্ব)। এঁরাই সে সময়ে এ-এলাকার রাজনৈতিক সংগ্রামে প্রথম কাতারে ছিলেন। খুলনা থেকে তফশীলি কোটায় নির্বাচিত সদস্য, সমবায় ঋণ ও

পল্লীউন্নয়ন মন্ত্রী মুকুন্দবিহারী মল্লিক এলাকার শিক্ষাবিস্তারে ভূমিকা রাখেন। তিনি জলির পাড়ে যে স্কুলটি প্রতিষ্ঠায় (১৯৩৮) অবদান রাখেন, সেই স্কুলটি তাঁর নামেই স্বীকৃত।

১৯৪৬-৪৭ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে গোপালগঞ্জ থেকে খন্দকার শামসুদ্দিন আহমদ নির্বাচিত হন। তফশীল কোটায় মাদারীপুর থেকে নির্বাচিত হন দ্বারিকানাথ বারুরী এবং গোপালগঞ্জ থেকে নির্বাচিত হন প্রমথরঞ্জন ঠাকুর। এলাকার রাজনীতিতে এঁদের অবদানই ছিল মুখ্য।

**ভারত-ছাড়ো আন্দোলন :** ১৯৪২ সালের ভারত-ছাড়ো আন্দোলনে ফরিদপুরে ১২৯ জন গ্রেফতার বরণ করেন। এঁদের মধ্যে ১৪ জনের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা হয়। এর প্রতিবাদে বৃহত্তর জেলা জুড়ে ব্যাপক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ১৭ সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জে জনসভা হয়। জনসভার পরে একটি মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে। ১৮ সেপ্টেম্বর হরিণাহাটিতে, ২০ সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জ জেলার প্রথম শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের গ্রাম বান্ধাবাড়িতে এবং ৩০ সেপ্টেম্বর সুয়াগ্রামে জনসভা হয়। ২০ আগস্ট গোপালগঞ্জ মহকুমায় ধর্মঘটের ডাক দেয়া হয়। এই আন্দোলনের অংশ হিসেবে কোটালীপাড়ার রাধাগঞ্জ এটেস্টেশন অফিস আক্রমণ করেন দলিলপত্র ধ্বংস করা হয়। এই এলাকার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন শরীয়তপুর জেলার পালং গ্রামের ড. সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি, বালুচর গ্রামের রাইচরণ সেন (পিতা প্যারীমোহন সেন), গোসাইরহাট থানার টেংরা গ্রামের বিনয়কুমার রায়চৌধুরী (পিতা ভূপেশচন্দ্র রায়চৌধুরী), গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর থানার ননীগোপাল ভট্টাচার্য (পিতা সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য) প্রমুখ। ২৫ অগাস্ট ননীগোপাল ভট্টাচার্যকে ও রাইচরণ সেনকে, ৯ সেপ্টেম্বর ড. সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জিকে এবং ২৬ অক্টোবর বিনয়কুমার রায়চৌধুরীকে গ্রেফতার করা হয়।[২৪]

**তফশিলী জাতি ফেডারেশন :** ১৯৪২ সালে সারা ভারত তফশিলী জাতি ফেডারেশন গঠিত হয় মহারাষ্ট্রের নাগপুরে ড. বি আর আম্বেদ করের নেতৃত্বে। ১৯৪৩ সালে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের নেতৃত্বে বাংলা প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হয়। ১৯৪৫ সালে গোপালগঞ্জ শহরে অনুষ্ঠিত হয় এর প্রথম প্রাদেশিক সম্মেলন। সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন ভীষ্মদেব বিশ্বাস। সম্মেলনের মূল সংগঠক কামিনীপ্রসন্ন মজুমদার সর্বসম্মতিক্রমে প্রাদেশিক সাধারণ সম্পাদক এবং যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল সভাপতি নির্বাচিত হন।

তফশিলী জাতি ফেডারেশন বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে নেয়। এরা শরৎ বসু ও আবুল হাশিমের নেতৃত্বে অবিভক্ত বাংলার আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়। তবে দলের প্রাদেশিক সভাপতি যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল এবং দ্বারিকানাথ বারুরী মুসলিম লীগ সরকারের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করায় এই দাবির স্বীকৃতি আদায় করা যায় নি। তফশিলী জাতি ফেডারেশনের নেতা ছিলেন যজ্ঞেশ্বর মণ্ডল, মুকুন্দলাল সরকার, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, বৃন্দাবন বিশ্বাস, বিরাটচন্দ্র মণ্ডল, দ্বারিকানাথ বারুরী, ভবানীশঙ্কর বিশ্বাস প্রমুখ।

১৯৬৯ সালে গোপালগঞ্জের বিশিষ্ট শিক্ষক ও সমাজকর্মী বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের উদ্যোগে ঢাকা বার কাউন্সিল ভবনে সংখ্যালঘু কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এই কনফারেন্সে নিরোদ নাগ, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মনোরঞ্জন ধর, চিত্তরঞ্জন সূতার, মনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রাধিকামোহন গোস্বামী, ধীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, কার্তিক চন্দ্র ঠাকুর প্রমুখ উপস্থিত হন। তবে সভার এক পর্যায়ে ভবানীশঙ্কর বিশ্বাস লাঞ্ছিত হন। তিনি আইয়ুব খানের মন্ত্রিসভায়

অংশ নেয়ায় সংখ্যালঘু নেতারা তার ওপর ক্ষুব্ধ ছিল। এই সভা সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

সংখ্যালঘু কনফারেন্সে সিদ্ধান্ত হয় যে, পরবর্তী নির্বাচনে গণপরিষদে (এমএনএ) সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব দাবি করা হয়। আওয়ামী লীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগের দায়িত্ব দেয়া হয় গোপালগঞ্জের চারজন সংখ্যালঘু নেতাকে। এঁরা হলেন— মুকুন্দলাল সরকার, ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, কার্তিক চন্দ্র ঠাকুর এবং অনিলকৃষ্ণ রায়। এঁরা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ১৬০ টি এমএনএ আসনের মধ্যে ১০টি আসন সংখ্যালঘুদের মধ্যে বরাদ্দ প্রদানের দাবি জানান। বঙ্গবন্ধু তাঁদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বলেন— 'প্রাদেশিক নির্বাচনে (এমপিএ) যত আসন চাস দিতে পারব কিন্তু গণপরিষদে' (এমএনএ) একটিও দেয়া যাবে না। সংখ্যালঘু নেতারা প্রাদেশিক আসনে নয়, গণপরিষদে আসনে সংরক্ষিত কোটার দাবি পুনর্ব্যক্ত করলে বঙ্গবন্ধু অস্বীকৃতি জানান এবং এক পর্যায়ে বলেন যে, 'পারিস তো আলাদা দল করে নির্বাচন কর'।

গোপালগঞ্জের সংখ্যালঘু নেতারা তাঁদের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে পরের দিন ঢাকার লালকুঠিতে সম্মেলন আহ্বান করে জাতীয় গণমুক্তি দল গঠন করেন। এই দলের সভাপতি নির্বাচিত হন চট্টগ্রামের মনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন বরিশালের কালিদাস বৈদ্য। নবগঠিত এই রাজনৈতিক দলের সহসভাপতি হন প্রফুল্লকুমার মণ্ডল (খুলনা), চিত্তরঞ্জন সূতার (বরিশাল), অতুলেন্দ্রনাথ দাস (খুলনা), মনোরঞ্জন দাস (খুলনা), যুগ্মসম্পাদক হন বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (গোপালগঞ্জ), সাংগঠনিক সম্পাদক হন কার্তিক চন্দ্র ঠাকুর (গোপালগঞ্জ)। জাতীয় গণমুক্তি দলের প্রথম প্রকাশ্য সমাবেশ হয় ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে গোপালগঞ্জের সাতপাড়ে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় গণমুক্তি দল অংশ নেয়। প্রাদেশিক আসনে গোপালগঞ্জে বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও কার্তিকচন্দ্র ঠাকুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। আওয়ামী লীগ প্রার্থী বিজয়ী হলেও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে অবস্থান নেয় জাতীয় গণমুক্তি দলের প্রার্থীরা। কেন্দ্রীয় পরিষদে প্রার্থী হন অনিল কৃষ্ণ রায়। গোপালগঞ্জের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই দলের নাম তাই উল্লেখযোগ্য। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পরে বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস নিরাপত্তার অভাব বোধ করে ভারত চলে যান। সেখানে তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন। অনিলকৃষ্ণ রায় শিক্ষাবিদ হিসেবে এলাকায় সম্মানিত। তিনিও আর বেঁচে নেই। কার্তিকচন্দ্র ঠাকুর জাতীয়তাবাদী তফশিল সেলের নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

**১৯৪৭ সালের দেশভাগ :** ১৯৪৭ সালে দেশ-বিভাগের ক্ষেত্রেও মুসলিম লীগের ভূমিকা ছিল। বিশেষ করে মাদারীপুর- গোপালগঞ্জ এলাকার লোকজন মনে করে পাকিস্তান তথা পূর্বপাকিস্তান সৃষ্টির জন্যে মাদারীপুরের তফশিলী নেতা দ্বারকানাথ বারুরীরাই দায়ী। এ সম্পর্কে এ-এলাকায় প্রচলিত একটি ছড়ায় পরিবেশিত তথ্য থেকেও ঘটনা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়—

আল্লায় বানাইছে সাধের
হিন্দু-মুসলমান
দ্বারিকবাবু সৃষ্টি করছে
পূর্ব পাকিস্তান।

১৯৪৬ সালে কংগ্রেস থেকে দ্বারিকানাথ বারুরীকে বহিষ্কার করা হলে তিনি তফশীল

ফেডারেশনে যোগ দেন। তিনি ১৯৪৬-৪৭ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এসময় গোপালগঞ্জ থেকে প্রমথরঞ্জন ঠাকুর (পিআর ঠাকুর), এবং ফরিদপুর থেকে প্রতাপচন্দ্র গুহরায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। কংগ্রেস টিকিটে নির্বাচিত হবার পর ফেডারেশনে যোগ দেন। মুসলিম লীগের নেতৃত্বে গঠিত সরকারের মন্ত্রিত্বও গ্রহণ করেছেন। তিনি সোহরাওয়ার্দির মন্ত্রিসভায় পূর্ত ও গৃহনির্মাণ মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৮৬ সালে মাদারীপুর শহরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অথচ তাঁর পুত্র মৃণালকান্তি বারুরী ছিলেন এই এলাকার কৃষক ও ক্ষেতমজুর আন্দোলনের ত্যাগী নেতা।

১৯৪৭ এর দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশবিভাগের পর মানুষ আবার মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামে। শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে গঠিত হয় পূর্বপাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ (৪ জানুয়ারি ১৯৪৮)। মুসলিম লীগের প্রাদেশিক কর্মিসম্মেলনে ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। শেখ মুজিব তখন জেলে। তিনি জেলে থেকেও এ দলের যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই দলের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং পরবর্তীকালে সহ-সভাপতি (১৯৫৩-১৯৫৫) গোপালগঞ্জের আরেক জননেতা আবদুস সালাম খান (১৯০৪-১৯৭২)। তিনি ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নে গোপালগঞ্জ মহকুমা থেকে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং পূর্ত ও যোগাযোগ মন্ত্রী নিযুক্ত হন।

**গ. গোপালগঞ্জ জেলার সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক ইতিহাস :**

জিন্নাহ-বিরোধী আন্দোলন : ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের পরে ১৯৪৮ সাল থেকে শুরু হয় ভাষা আন্দোলন। এর প্রায় প্রতিটি কর্মসূচি এখানে পালিত হয়। ১৯৪৯ সালে খাজা নাজিম উদ্দিন গোপালগঞ্জে এসেছিলেন কোর্ট মসজিদ ও পাকিস্তান মিনার উদ্বোধনের জন্যে। এ উপলক্ষে মহকুমার প্রায় পৌনে ছয় লাখ লোকের মাথাপিছু এক টাকা করে চাঁদা ধরা হয়। মসজিদ ও মিনারের কাজে ৪০ হাজার, কোর্টের পশ্চিম পার্শ্বের রাস্তা সংস্কারের কাজে ৩০ হাজার এবং বাকি লাখ পাঁচেক টাকা 'জিন্নাহ রিলিফ ফান্ডে'র জন্য নাজিম উদ্দিনের হাতে জমা দেয়ার চেষ্টা করা হয়। এই খবর পেয়ে শেখ মুজিব ঢাকা থেকে গোপালগঞ্জে চলে আসেন। এমএলএ খন্দকার শামসুদ্দিন আহমেদের বাসায় অনুষ্ঠিত নাজিম উদ্দিনের অভ্যর্থনা কমিটির সভায় হাজির হয়ে শেখ মুজিব এই অর্থ প্রদানের বিরোধিতা করেন। তাঁর এই প্রস্তাব গৃহীত না হলে তিনি রাতেই শহরে মিছিল বের করেন। ঐ মিছিলে শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ অনুসারী সরদার রহমত জাহানও ছিলেন। এক সাক্ষাৎকারে সরদার রহমত জাহান জানান যে, পুলিশ মিছিলটি ছত্রভঙ্গ করে দেয়। মুজিবের নেতৃত্বে পরের দিন কয়েক হাজার লোক শহর প্রদক্ষিণ করে। পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়। নাজিম উদ্দিন ছিলেন আর পি সাহার গ্রিন বোটে। শেখ মুজিব, রহমত জাহান-সহ কয়েকজন পুলিশ কর্ডন ভেদ করে গ্রিন বোটের কাছে পৌঁছে যান এবং শ্লোগান দেন 'নাজিম উদ্দিন ফিরে যাও'। মিছিলের সামনে শেখ মুজিবকে দেখে নাজিম উদ্দিন পুলিশ সুপারের মাধ্যমে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন। রহমত জাহান ও আরো ৩/৪ জনকে নিয়ে শেখ মুজিব নাজিম উদ্দিনের সঙ্গে দেখা করেন। শেখ মুজিব জিন্নাহর ফান্ডে টাকা দেয়ার বিপক্ষে তাঁর যুক্তি দেখান এবং এর বদলে গোপালগঞ্জ একটি কলেজ স্থাপনের দাবি জানান। নাজিম উদ্দিন এই দাবি মেনে নেন।

তাঁর নির্ধারিত জনসভায় কায়দে আযম মেমোরিয়াল কলেজ স্থাপন এবং দুই লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়ার ঘোষণা দেন। এটিই এখন বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ।

কলেজ প্রতিষ্ঠায় মুজিবের এই অবদানের জন্যে তাঁকে এক গণসংবর্ধনা দেয়ার আয়োজন করা হয়। কিন্তু মুসলিম লীগ সরকার ঐ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বাধার সৃষ্টি করে। সংবর্ধনাস্থলে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। চারিদিকে পুলিশ দিয়ে ঘেরাও করে রাখা হয়। কিন্তু শেখ মুজিব তখন মিলাদ মাহফিল আয়োজনের কথা বলে অনুমতি নিয়ে সভার কাজ শুরু করে দেন। পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করতে চাইলে তিনি শর্ত দেন যে, গ্রেফতারের আগে উপস্থিত জনতার উদ্দেশে কিছু কথা বলতে দিতে হবে। মহকুমা প্রশাসক কিউ এ আহাদ এই শর্ত মেনে নিলে মসজিদ প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে তিনি শুরু করে দেন নির্ধারিত বক্তৃতা। তিনি এক ঘণ্টার বেশি সময় ধরে বক্তৃতা চালিয়ে যান। এদিকে বক্তৃতা শেষ না হলে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতারও করতে পারেন না। বক্তৃতা শেষে শর্ত মোতাবেক শেখ মুজিব গ্রেফতার বরণ করলেও উপস্থিত জনতার প্রতিরোধের মুখে এসডিও তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন।

**ভাষা আন্দোলন :** ভাষা আন্দোলনের ঢেউ এসে গোপালগঞ্জেও লাগে। শেখ মুজিব তখন জেলে। তাঁর মুক্তির দাবিতে গোপালগঞ্জে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। তিনি ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনের সমর্থনে কারাগারে অনশন ধর্মঘট পালন করেন ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে। ২১শে ফেব্রুয়ারি গুলিবর্ষণের সংবাদ গোপালগঞ্জ এসে পৌছায় দুইদিন পরে। সঙ্গে সঙ্গে এখানে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। গঠিত হয় 'ভাষা আন্দোলন গোপালগঞ্জ মহকুমা কমিটি'। এর আহ্বায়ক নির্বাচিত হন তৎকালীন কায়দে আযম মেমোরিয়াল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র সাইদ আলী খান। আর যুগ্ম-আহবায়ক নির্বাচিত হন হেলেনা খান।

ভাষা আন্দোলনে আরো যাঁরা নেতৃত্বে, তাঁরা হলেন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল লতিফ, মুখলেছুর রহমান, সরদার রহমত জাহান, জহুরুল হক ভুঁইয়া, ইমান উদ্দিন সরদার, আমিরুল ইসলাম টুকু, ফজলুর রহমান, শেখ লুৎফর রহমান লুথু ও আবুল হোসেন ভুঁইয়া।[২৫] এঁরা সবাই গোপালগঞ্জের ছাত্রনেতা। ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব সম্পর্কে স্থানীয় ছাত্র-জনতাকে সচেতন করার ক্ষেত্রে এঁদের ভূমিকা অপরিসীম। ঢাকায় ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে সভা-সমাবেশ, মিছিল, কালোব্যাজ ধারণ, ক্লাশবর্জন প্রভৃতি কর্মসূচি পালনে গোপালগঞ্জের ছাত্রনেতৃবৃন্দ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ছাত্রদের এই আন্দোলনে সাধারণ জনগণ এবং পেশাজীবীরা সম্পৃক্ত হয়।

ঢাকায় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে গোপালগঞ্জ জেলাসদরের পাশাপাশি মুকসুদপুর থানাসদরে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। ২৪ ফেব্রুয়ারি মুকসুদপুরে হরতাল আহ্বান করা হয়। যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন একটি গ্রামীণ জনপদে এ-ধরনের ঘটনা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। দৈনিক আজাদ-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়—

> মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ, ২৪ ফেব্রুয়ারি—ঢাকায় ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে গত ২৪শে ফেব্রুয়ারি স্থানীয় হাইস্কুলের ছাত্রগণ শান্তিপূর্ণ হরতাল পালন করে। প্রায় তিনহাজার ছাত্রছাত্রীর বিরাট শোকমিছিল বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে করিতে বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিণ করে। অতঃপর বেলা ৪ ঘটিকায় স্থানীয় স্কুলমাঠে এক বিরাট ছাত্রসভা হয়। সভায় নিহতদের রুহের মাগফেরাতের জন্যে মোনাজাত করা হয় ও তাহাদের শোকাকুল

পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ ও গুলিবর্ষণ সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।[২৬]

গোপালগঞ্জ মহকুমা বারের আইনজীবীরাও এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। জেলে থেকেও ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন গোপালগঞ্জের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। আন্দোলনের কারণে শেখ মুজিবুর রহমান, মহিউদ্দিন আহমদ-সহ অনেক নেতাই তখন কারাবন্দি। জেলে থেকেই শেখ মুজিব সদ্যগঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্মসম্পাদক মনোনীত হন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা এবং রাজবন্দিদের মুক্তি দেয়ার দাবিতে মহিউদ্দিন আহমেদ ও শেখ মুজিবুর রহমান জেল খানায় অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। পরিস্থিতি খারাপের দিকে যেতে থাকলে তাঁদেরকে কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ফরিদপুর কারাগারে স্থানান্তর করা হয়। মওলানা ভাসানীর আহ্বানেও তাঁরা অনশন কর্মসূচি প্রত্যাহার করেননি। ২৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে তাঁদেরকে ফরিদপুর জেলা কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয়। গণদাবির মুখে মুক্তির পর তিনি গোপালগঞ্জ এলে এলাকার আন্দোলন আরো চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

গোপালগঞ্জের ভাষা-আন্দোলনের পক্ষে ব্যাপক জনমত থাকলেও এর ভিন্নচিত্রও রয়েছে। মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতা, পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী ওয়াহিদুজ্জামান খান ঠাণ্ডামিয়া এই আন্দোলনের প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেন। আন্দোলনকারীদের বিপক্ষে অবস্থান নেয়াই শুধু নয়, আন্দোলন দমন করতে ভয়ভীতি ও হুমকি প্রদর্শন কবতেন। এ-কাজে তিনি সরকারি পুলিশ বাহিনীকে কাজে লাগিয়েছেন।

**গোপালগঞ্জে প্রথম শহীদ মিনার :** জেলার প্রথম শহীদ মিনার নির্মিত হয় ১৯৫৪ সালে। বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথ অধিকারী জানান, শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যাংকপাড়াস্থ বাড়ির সামনে অস্থায়ী শহীদ মিনার নির্মাণ করে ১৯৫৪ সালে গোপালগঞ্জে শহীদ দিবস পালনের সূচনা হয়।[২৭] পরে এই শহীদ মিনার স্থানীয় পৌরপার্কে পুনঃস্থাপিত হয়। স্বাধীনতার পরে পৌরপার্কের উত্তরপাশে স্থায়ী শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়।

**যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন :** ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রথমবারের মতো পূর্ববঙ্গে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী অঙ্গীকার এবং গোপালগঞ্জের যুবনেতা শেখ মুজিবের সাংগঠনিক তৎপরতা এবং উদাত্ত ভাষণ ছিল যুক্তফ্রন্টের আসল শক্তির উৎস। গোপালগঞ্জে এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানা যায় আবুল বাশার তালুকদারের একটি স্মৃতিকথা থেকে—

> শেখ মুজিবকে তাঁর নিজস্ব এলাকা গোপালগঞ্জ থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। অপর দিকে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ তদানীন্তন পূর্ববাঙ্গলার অন্যতম ধনাঢ্য ব্যক্তি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় চোরাকারবার ও অন্যান্য উপায়ে অর্থ উপার্জনকারী ওয়াহিদুজ্জামান ঠাণ্ডা মিয়াকে মনোনয়ন প্রদান করেন। তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল অর্থবল, কূটকৌশলের মাধ্যমে ঠাণ্ডা মিয়ার পক্ষে নির্বাচনী এলাকার জনসাধারণ তথা ভোটারদের বশ করা সম্ভব হবে। শেখ মুজিব মধ্যবিত্তের সন্তান। তাঁর সম্বল সততা, আপোষহীন সংগ্রামী ঐতিহ্য আর সাধারণ মানুষের ভালোবাসা। নির্বাচনী এলাকায় জোর প্রচারনা শুরু করে দেন ঠাণ্ডা মিয়া। কয়েকখানি লঞ্চ ভাড়া করা হয়। অর্থবলে ভাড়া করা কুখ্যাত মাস্তানদের সাথে নিয়ে আসা

হয়। যাতে এলাকার জনসাধারণ শেখ মুজিবের পক্ষে টু শব্দটি করতে না পারে। বিধি বাম। এতদিনে তথাকথিত '৪৭-এর স্বাধীনতার মোহভঙ্গ হয়েছে। অন্নবস্ত্রের অভাব, কেরোসিন তেলের উচ্চ মূল্য। অভাব অভিযোগের কথা আলোচনা করলে কমিউনিস্ট আখ্যা দিয়ে ধরপাকড় গ্রামেও লেগে থাকতো, তাই জনসাধারণও মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচনে রায় দেবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল।

ওয়াহিদুজ্জামান ঠাণ্ডা মিয়া ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি নির্বাচনী এলাকা সফরে বেরিয়েছেন বড় ধরনের মটরলঞ্চ, সাথে তথাকথিত কর্মিবাহিনী মাইকে মুহুর্মুহু 'ওয়াহিদুজ্জামান জিন্দাবাদ' ধ্বনি।

মধুমতী অতিক্রম করে বাঁশবাড়িয়ার প্রকাণ্ড খালে লঞ্চ ঢুকে পড়েছে। পাকুতিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে জসনভা। একি! খালের দুপাড়ে অসংখ্য জনতা। কালো পতাকা হাতে। গগনবিদারী কণ্ঠস্বর, 'ঠাণ্ডা মিয়া যদি বাঁচতে চাও ঘরের ছেলে ঘরে যাও'। নেতৃত্বে পুরোভাগে শেখ মুজিবের অনুসারী আব্দুস সামাদ তালুকদার, লায়েক আলী তালুকদার (উভয়ে প্রয়াত)। লঞ্চ থেকে জনতাকে প্রথমত অনুরোধ ও উপরোধ আসছিল কিন্তু এই অশান্ত জনতা গগনবিদারী শ্লোগানে সোচ্চার। পরে রাইফেল হাতে পুলিশ বাহিনী আর আনসারদের লেলিয়ে দেওয়া হল। পুলিশ সুযোগ বুঝে অতর্কিতে নেমে পড়ে বেধড়ক লাঠিপেটা করলো। জনতাও গর্জে উঠলো এলোপাথাড়ি ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হতে লাগলো। কয়েক ঘণ্টা চললো সংঘর্ষ।

ভগ্নমনে গোপালগঞ্জ ফিরে গেলেন ঠাণ্ডা মিয়া। দু'দিন পরের ঘটনা। আকস্মিক গভীর রাতে বাড়ি ঘেরাও দিয়ে গ্রেফতার করা হয় আব্দুস সামাদ তালুকদার আর লায়েক আলী তালুকদারকে। তাঁদের বিরুদ্ধে দায়ের করা হল ফৌজদারি মামলা। গোপালগঞ্জে নিয়ে যাওয়া হল। হাজতে চললো পুলিশী অত্যাচার।

শেখ মুজিব সে সময় ব্যস্ত ছিলেন পূর্ববাঙ্গলায়, অন্যান্য নির্বাচনী এলাকায়। খবর পৌছে গেল তাঁর কাছে। ত্বরিত চলে এলেন বাঁশবাড়িয়া গ্রামে।

সে দিনের শেখ মুজিব ছিমছাম, লম্বা, পাতলা চেহারা। চোখে চশমা, টগবগে উজ্জ্বল। এসেই চাচা খান সাহেব শেখ মোশাররফ হোসেনসহ চলে গেলেন দুই পরিবারের সদস্যদের কাছে, জানালেন সহানুভূতি আর সমবেদনা, আশ্বাস দিলেন অবিলম্বে ছাড়িয়ে আনবেন তাঁদের।

বিকালে বাঁশবাড়িয়া হাটের পশ্চিমপাশের মাঠে বিরাট জনসভা। বাধভাঙা স্রোতের মতো মানুষ আসছে। কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ, কৃষক, মাঠের গতরখাটা শ্রমিক। শেখ মুজিব গর্জে উঠলেন। মুহূর্তে মুখরিত আকাশ-বাতাস। 'শেখ মুজিবর জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে প্রকম্পিত এলাকা। সেই জনসভায় গ্রামবাসী শেখ মুজিবকে ১ হাজার ১ টাকা দিয়ে মালা গেঁথে পরিয়ে দিলেন ভালোবাসার মালা। নির্বাচনী খরচার জন্যে। আজকের দিনে তার মুদ্রামান অনেক। ১৪ দিন পর নির্বাচনের আগেই ছাড়া পেলেন জনাব আবদুস সামাদ তালুকদার, লায়েক আলী তালুকদার প্রমুখ। ঘরে ঘরে আনন্দের বন্যা।[২৮]

সে দিনের শেখ মুজিবের সাংগঠনিক তৎপরতায় আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ১৪৩ জনই বিজয়ী হয়েছিল। ২৩৭ আসনে যুক্তফ্রন্ট পেল ২১৫ টি। অন্য স্বতন্ত্র বিজয়ী প্রার্থী মোট ৯ জন ফ্রন্টে যোগ দিলেন। মুসলিম লীগের ভরাডুবি হলো।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের আগে শেখ মুজিবের পক্ষের মূল ছাত্রনেতা সরদার রহমত

জাহান, শহীদ আলী খান এবং খন্দকার শামসুদ্দিন হক বাসুমিয়াকে গ্রেফতার করা হয়। নির্বাচনের পরে এঁরা ছাড়া পান। নির্বাচনে শেখ মুজিব বিজয়ী হন।

**ফাতেমা জিন্নাহর নির্বাচন :** ১৯৬৫ সালে আইয়ুব খান বনাম ফাতেমা জিন্নাহর নির্বাচনে ফাতেমা জিন্নাহ হেরে গেলেও তিনি বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলে আইয়ুব খানের চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছিলেন। এই সময়ে শেখ মুজিব গোপালগঞ্জ এলে সুহৃদকুমার রায়চৌধুরী (সাহেব বাবু) সঙ্গে দেখা করতেন। গোপালগঞ্জ শহরের বাড়িটি এই সাহেব বাবুর কাছ থেকে কেনা হয়েছিল। সাহেব বাবু মুজিবের চেয়ে ৭/৮ বছরের বড় হলেও দুজনার সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ ছিল। রাজনীতিমনস্ক সাহেব বাবুর মাধ্যমেই শেখ মুজিবের রাজনীতিতে আগমন। তবে এই সাহেব বাবু ১৯৬৫ সালেই দেশ ছেড়ে চলে যান। গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা, সাহেববাবুর ভায়রাভাই সুধন্যকুমার রায়চৌধুরী জানিয়েছেন, 'সাহেব বাবু বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের অনুপ্রেরণাকারী। নির্বাচন প্রস্তুতির জন্যে তিনি শেখ মুজিবকে ছয়-সাত হাজার টাকা দিয়েছিলেন। তিনি অবশ্য এই টাকা শোধ করে দিয়েছিলেন। টাকা দেয়ার খবর জেনে ওয়াহিদুজ্জামান ঠাণ্ডা মিয়ার চ্যালাচামুণ্ডারা এসে সাহেব বাবুর কাছে চাঁদা চাইল। তাদের দাবি হলো যেহেতু শেখ মুজিবকে টাকা দেয়া হয়েছে, তাই তাদেরকেও দিতে হবে। সাহেব বাবু তাদেরকে টাকা দিতে না চাওয়ায় তারা অপমান করে। এই অপমান সহ্য করতে না পেরে সাহেব বাবু দেশ ছেড়ে চলে যান। শেখ মুজিবকে তাঁকে ফিরিয়ে আনার অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তিনি আর ফেরেন নি। তাঁর গোপালগঞ্জ শহরেব ৫২ শতক জমিসহ ঘরবাড়ি ও পুকুর শেখ মুজিবের নামে লিখে দেন। শেখ মুজিব সম্পত্তির মূল্য যথাযথভাবে পরিশোধ করে দেন।'

**আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন:** ১৯৬৬ সালে আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন গোপালগঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে। তখনকার বিবেচনায় জলিরপাড় ছিল একটি গণ্ড গ্রাম। অথচ সেই জলিরপাড়ে ঘটে এক বিপ্লবী কাণ্ড। আইয়ুব-বিরোধী সমাবেশ রাস্তায় নেমে আসে জে কে এম বি মল্লিক উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা। নেতৃত্বে ছিলেন কমিউনিস্ট নেতা সত্যেন বারুরী। তিনি এই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। স্কুল থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরের সিন্দিয়াঘাট ফাঁড়ির পুলিশ এসে সেই মিছিলে গুলি চালায়। শহীদ হন স্কুলছাত্র মহানন্দ। গোপালগঞ্জের পৌরপার্কের নাম রাখা হয় মহানন্দা পার্ক।

ওয়ালিউর রহমান লেবু মিয়ার একান্ত প্রচেষ্টায় গোপালগঞ্জ জেলায় বামপন্থী রাজনীতি প্রসার লাভ করে এবং গোপালগঞ্জ জেলায় বামপন্থী শক্তিশালী ঘাঁটিতে রূপান্তরিত হয়। তাঁর উদ্যোগে কোটালীপাড়ার প্রত্যন্ত গ্রামেও লেনিনের জন্মবার্ষিকী পালনের মতো অনুষ্ঠানও হয়। কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত করার কাজেও তাঁর অবদান রয়েছে। এ সময় তাঁর সহযোগী ছিলেন মোবারক হাজারী, গফুর শেখ, কানাইলাল গৌতম, জটিলেশ্বর দে, কমলকুমার পাল, নারায়ণ বোস, কমলেশ বেদজ্ঞ, শওকত চৌধুরী, মোখলেসুর রহমান প্রমুখ নেতা। ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানেব সময় গোপালগঞ্জের গণচেতনা-সৃষ্টিতেও ওয়ালিউর রহমান লেবু মিয়ার প্রত্যক্ষ অবদান রয়েছে।

## ঘ. ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও তার প্রতিক্রিয়া

১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইস্তেহারের অন্যতম প্রণেতা ছিলেন শেখ ফজলুল মণি। তিনি গোপালগঞ্জের বাসিন্দা বলে এই কৃতিত্ব অবশ্যই গোপালগঞ্জবাসীর।

সত্তরের নির্বাচনে গোপালগঞ্জ থেকে এমএনএ নির্বাচিত হয়েছিলেন মোল্লা জালাল উদ্দিন বীরেন্দ ও এম এ খায়ের কার্তিক। আর এমপিএ নির্বচিত হয়েছিলেন শেখ মোশাররফ হোসেন, সতীশ হালদার, আখতারুদ্দিন মোল্লা ও কাজী আবদুর রশীদ। সত্তরের নির্বাচনে মুসলিম লীগের সঙ্গে আওয়ামী লীগের সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। ১৯৭০ সালে ওয়ালিউর রহমান লেবু কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। তাঁর নেতৃত্বে এই এলাকায় কমিউনিস্ট পার্টি সক্রিয় থাকলেও কোনো প্রার্থী না থাকায় আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে সমর্থন দেয় এবং নির্বাচনী প্রচারাভিযানে অংশ নেয়। কোটালীপাড়া-সহ বিভিন্ন স্থানে বামপন্থীদেরকে তিনি আওয়ামী প্রার্থীকে ভোট দেয়ার আহবান জানান। তিনি সতীশ হালদারের সঙ্গে নির্বাচনী সভায় অংশ নেন এবং বক্তৃতা করেন। এসময় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব ওয়াহিদুজ্জামান তাঁকে রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চাকরি নিয়ে ইতালি যাওয়ার প্রস্তাব করেন কিন্তু জনদরদী মহৎ প্রাণ ব্যক্তিটি এ প্রস্তাব ঘৃণা ভরে প্রত্যাখান করেন।[২৯] সত্তরের নির্বাচন সম্পর্কিত কিছু ঘটনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় গোপালগঞ্জের তৎকালীন ছাত্রনেতা ননীগোপাল সজ্জনের স্মৃতিকথায়–

> ম্যাট্রিক পাশ করে গোপালগঞ্জে কায়েদ-ই-আযম কলেজে ভর্তি হলাম। যে কলেজ এখন বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ নামে পরিচিত। ভর্তি হয়েই ছাত্র আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লাম। মনে বামপন্থী চিন্তা থাকলেও মধ্যপন্থী আন্দোলনে গোটা পাকিস্তান তখন কাঁপছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কথা বললেই আন্দোলন। জনসাধারণকে কীভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন ভাবা যায় না। ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনে আমরা ছাত্ররা ঝাঁপিয়ে পড়লাম। এমন এক সময় ছিল আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ করতে ছাত্ররা ভয় পেত। পাকিস্তান ছাত্র শক্তি নামে এক সংগঠন শাসক শ্রেণীর ভাড়া করা গুণ্ডা ও পয়সা দিয়ে সাধারণ ছাত্রদের উপর অত্যাচার করত। কলেজে পড়াকালীন ছাত্র শক্তির রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে একবার আমরা ১০-১৫ জন ছাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনি আমাদের সবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বলেছিলেন– তোমরা কাজ কর, ওরা আর আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না।
>
> ১৯৭০ সাল। সাধারণ নির্বাচন পাকিস্তানে। আমরা ছাত্ররা কোটালীপাড়ায় ফিরে এলাম। তখন ভোটের দামামা বেজে উঠেছে। আমবা কোটালীপাড়ায় বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে জনসাধারণকে বোঝাতে লাগলাম—এবারের ভোট অস্তিত্ব রক্ষার ভোট। বাঙালি জাতি থাকবে কি থাকবে না—এবারের ভোটেই তা নির্ভর করেছে। আমরা ছাত্ররা নিজেদের পয়সা খরচা করে ভোটের প্রচার করতে লাগলাম। দেখলাম আমাদের প্রচারের আগে থেকেই জনসাধারণ ভীষণ ভাবে সচেতন। তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে ১৬৫টি আসনের মধ্যে ১৬৩ টি আসন জিতল আওয়ামী লীগ।[৩০]

সত্তরের নির্বাচন এলাকায় তেমন কোন ঘটনার জন্ম দেয়নি। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়েছে আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা। বিজয়ের পরে বেশ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে প্রতিটি

নির্বাচনী এলাকায় বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনের আগে ওয়াহিদুজ্জামান ঠাণ্ডা মিয়া ঘোষণা দেন যে নির্বাচনে যদি বঙ্গবন্ধু জিততে পারেন তাহলে তিনি হাতে মেয়েদের মতো চুড়ি পরবেন। বঙ্গবন্ধু এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন হাসতে হাসতে। ফরিদপুরের এক জনসভায় বলেন যে, ঠাণ্ডা মিয়ার সঙ্গে নির্বাচনে জেতার জন্য আমার দরকার নেই, আমার মোল্লা জালালই যথেষ্ট। মোল্লা জালালের সঙ্গে জিততে পারলেই বুঝবো যে, আমার সঙ্গেই জিতেছে। উল্লেখ্য ঐ নির্বাচনে মোল্লা জালাল ব্যাপক ব্যবধানে ওয়াহিদুজ্জামান ঠাণ্ডা মিয়াকে হারিয়ে দেন। আর মুকসুদপুর এলাকায় প্রাক্তন মন্ত্রী আবদুস সালাম খানকে হারিয়ে এমএনএ নির্বাচিত হন এম এ খায়ের। জাতীয় গণমুক্তি দলের প্রার্থী বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও কার্তিক ঠাকুর এম.এন.এ নির্বাচনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

**তথ্য নির্দেশ :**


১. শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, **বাংলা বিশ্বকোষ** পঞ্চম খণ্ড, বিআর পাবলিশিং করপোরেশন, দিল্লি, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ৫২৭।

২. মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, গোপালগঞ্জের আদিকথা, **চলিষ্ণু**, জামালপুর, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৩২।

৩. **ফরিদপুর জেলা গেজেটিয়ার**, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ৩৪।

৪. আ.ন.ম. আবদুস সোহবান, **ফরিদপুরের ইতিহাস**, সূর্যমুখী প্রকাশনী, ফরিদপুর, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ৩১

৫. **ডিস্ট্রিক্ট সেনসাস রিপোর্ট ফরিদপুর**, করাচি, ১৯৬১, পৃষ্ঠা আই-৬

৬. মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৬

৭. রবীন্দ্রনাথ অধিকারী, সেন্ট মথুরানাথ: ইতিহাসের এক অমর নাম, **আজকের কাগজ**, ঢাকা, ২৯ জানুয়ারি ১৯৯৯

৮. আবুল হোসেন ভূঁইয়া, **গোপালগঞ্জ শহরের ইতিকথা**, গোপালগঞ্জ, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৩

৯. আবুল হোসেন ভূঁইয়া, প্রাগুক্ত

১০. মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, **চলিষ্ণু**, পৃষ্ঠা ৩১

১১. আব্দুল ওয়াজেদ, **বাংলাদেশের নদীমালা**, লাবণী, ঢাকা, পৃষ্ঠা ২২

১২. আব্দুল ওয়াজেদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৬

১৩. শেখ হাসিনা, স্মৃতির দখিন দুয়ার, **ওরা টোকাই কেন**, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৯

১৪. জেসি জ্যাক, **বাংলার একটি জেলার অর্থনৈতিক জীবন**, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব লোকাল গভর্নমেন্ট, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ১৮-১৯

১৫. ফরিদপুর জেলা গেজেটিয়ার, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ৩৬৯

১৬. তপন বাগচী, **তৃণমূল সাংবাদিকতার উন্মেষ ও বিকাশ**, ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৫৩

১৭. দীপঙ্কর গৌতম, **গোপালগঞ্জের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি**, মধুমতী, স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস স্মরণিকা ১৯৯৩

১৮. শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, **বাংলা বিশ্বকোষ** চতুর্থ খণ্ড, বিআর পাবলিসিং করপোরেশন, দিল্লি, প্রথম পুনর্মদ্রণ ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ৫৩৯-৫৪০

১৯. মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৪
২০. শেখ হাসিনা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০-১২
২১. আ ন ম আবদুস সোবহান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৫
২২. আ ন ম অবদুস সোবহান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭৫
২৩. **বাংলা একাডেমী চারিতাভিধান**, পৃষ্ঠা ২৩৬
২৪. Dr. Ladli Mohan Raychoudhury (Ed.), **The Quit India Movement 1942** (2nd enlarge Edition), Vol1, Govt of West Bengal, Calcutta, 1994, page No 47
২৫. সাংবাদিক মোজ্জাম্মেল হোসেন মুন্না, ভাষা আন্দোলনে গোপালগঞ্জ, অপ্রকাশিত রচনা
২৬. দৈনিক আজাদ, ঢাকা, ৫ মার্চ ১৯৫২
২৭. রবীন্দ্রনাথ অধিকারী, গবেষকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার
২৮. আবুল বাশার তালুকদার, স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধু: এক হাজার এক টাকার মালা, **মুজিব তুমি স্বাধীনতা**, গোপালগঞ্জ জেলা সমিতি, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ৪৬
২৯. বামন ধর, চার প্রমিথিউসকে যেমন দেখেছি, **প্রমিথিউস**, ১০ মার্চ স্মরণ সংখ্যা ১৯৯৭
৩০. ননীগোপাল সজ্জন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে **কোটালীপাড়া সম্মিলনী ৭২ তম বিজয়া সম্মেলন স্মরণিকা**, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ১৬-১৮।

[উৎস : ড. তপন বাগচী, 'মুক্তিযুদ্ধে গোপালগঞ্জ', ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭।]

# মাদারীপুর : ঐতিহ্যের অতীত অন্বেষায়

মু. মতিয়ার রহমান

বৈতালিক পাখির জাগরণী গানে এখনো ঘুম ভাঙে। তবে আর কতদিন এ নিরেট উষর সর্বগ্রাসী উদর দেহের দেশে গাইবে গান জানে না কোন গুণীজনে। জাগরণের সে সোনালী প্রভাতে বৈতালিক পাখির গানের সাথে প্রায় ঘরে সেতার এস্রাজের টুংটাং বায়া তবলার চাটি এবং কণ্ঠ সংগীতের রেওয়াজে ভাঙত ঘুম এ শহরের জনপদে। ঘুম ভাঙানিয়া গান গাইত মধুর মধুর সুরে বৈষ্টমী পাড়ার শ্বেতবসনা ললাটে বাহুতে চন্দনের ফোঁটা তিলক আঁকা হাতে পিতলের স্বর্ণকান্তি ঘণ্টা এবং ফুলের ডালি সাজিয়ে বোষ্টমীরা। উচ্চকিত হোত "জাগ জাগ নগরবাসী জাগিয়ালহ্ গুরুর নামহে এখন শান্ত শোভন সাংস্কৃতিক মণ্ডলের সুপ্রভাত ছিল মাদারীপুরে।

শারদীয় প্রাতে শিশুরা ফুলের ডালা নিয়ে তুলতে যেত শিউলী, বকুল শীতে সোঁদা গন্ধের গাঁদা গ্রীষ্মে গন্ধরাজ গোলাপ চাঁপা। প্রায় প্রতিটি বাড়ির আঙিনায় সৌন্দর্য পিয়াসী মাদারীপুরবাসীর ফুলের বাগান ছিল প্রাত্যহিক প্রভাতী বাসনায় সে সুন্দর সংস্কৃতমনা মনের শিশুরা মরে গেছে। মারা গেছে সুকুমার ললিত উদগ্র ক্ষুধার রাজ্যে গদ্যময় পরিবেশে। পয়সার প্রাবল্যে অত্যাধুনিক যান্ত্রিক প্রচণ্ড বিকট শব্দে সংগীতের নামে অপসংস্কৃতির রব এবং রোল ধ্বনিত। বিত্তের বেসাতিতে অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্মীয় সংস্কৃতি। মাইকের সুতীব্র শব্দ স্বরে ভীত বৈতালিক পাখি। ইষ্টক ধাতব সম্ভারের প্রসারে ওরা উড়ে যাচ্ছে উড়ে যাচ্ছে।

আজ ঐতিহ্য অবসিত মাদারীপুর। তার গৌরবময় ইতিহাস আছে কিন্তু অস্তিত্ব নেই। আউলিয়া খাঁর করাল গ্রাসে দু'দুটি সদর শহর বিলুপ্ত হয়েছে। বর্তমানটি তিন নম্বর শকুনী মৌজার শকুনী নামক একটি নিম্নাঞ্চলে মাদারীপুরের নাম ফলক পিঠে এঁটে এখন দাঁড়িয়ে। '৩৯ থেকে ৪৪ সন পর্যন্ত সময় লেগেছে এর নির্মাণে। শুধু নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ার জন্য নয়; সাম্প্রদায়িক ছুরিতে বিভাজিত ভারত ভূতুড়ে করে দিয়েছিল মাদারীপুর। সে কর্তনে জনশূন্য জনগণের দগদগে ঘা মুছে গেলেও পরিবেশ প্রভাবে অভাব এবং শূন্যতা রয়ে গেছে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে। মানুষ গড়া দেশ গড়া এবং সভ্যতা কৃষ্টির সৃষ্টি সৃজনে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারায় যে ঐতিহ্য তাকে বহু ঘাম-শ্রম সময়-অর্থে হয় রচিত। কালপ্রবাহে রচিত হয় ইতিহাস।

রাজনৈতিক আর্থ সামাজিক দিক থেকে ভারতবর্ষের পটভূমিতে মাদারীপুর অনন্য আয়তনেও। ১৮৫৪ তে বরিশালের মহকুমা রূপ যার জন্ম এবং ৭৩ সনে ফরিদপুরের

* সরকারি নাজিমউদ্দিন কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক মু. মতিয়ার রহমান 'অপভ্রংশ শামান্দার অপভ্রষ্ট' নামে মাদারীপুর জেলার ইতিহাস বিষয়ক একটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। অর্থাভাবে এটি এখনো প্রকাশিত হয়নি। এটি ওই পাণ্ডুলিপির লেখককৃত সংক্ষেপিত রূপ। – সম্পাদক

সাথে সংযোজন সময়ে মাদারীপুরের সীমানা ছিল যে কোনো জেলার চাইতে বিস্তৃত। রাজনৈতিক কারণে মাদারীপুর ভারতবর্ষে পরিচিত ছিল "চিতোর অব বেঙ্গল" নামে। পাট ব্যবসার কারণে ইংরেজ রাজত্বকালে ভারতের কোলকাতা পরিচিত ছিল ডান্ডি নাম আর বাংলার ডান্ডি ছিল মাদারীপুর। তখন নারায়ণগঞ্জ তেমন পরিচিত নয় আর দৌলতপুর তো মংলা সমুদ্রবন্দরে রূপান্তরের পরে সেদিনের। '৭৫ সনে মাদারীপুর মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিষ্ঠাকালে কুলপদী মাদারীপুর চরমুগরিয়া পাটব্যবসায় প্রখ্যাত বন্দর তিনটি প্রসিদ্ধ ছিল। এককালের ভারতবিখ্যাত মাড়োয়ারী পাটব্যবসায়ী নগরমল সুরুজমলের গদী এবং গুদাম ছিল পুরান বাজার জুড়ে। তার পিছনেই ছিল স্টিমারের প্রথম স্টেশন। সেদিন ও স্টিমার স্টেশনের টিকেট ঘর, যাত্রীছাউনী, ঘন্টি ঘরে লোহার থামে ঝুলানো বিরাট ঘন্টি স্টিমারের প্লাটফরম সোনাইকে বেঁধে রাখার বিরাট শিকলের অপর প্রান্ত অদৃশ্য ছিল বালুচরে কেরানীদের বাসগৃহ ছিল স্টেশনের রাস্তার অপর পাড়ে। আজ সে স্টেশনের পথে বিক্রয় হয় শাকসব্জীর চারা। কীটনাশকের দোকান ও গুদাম জুড়ে আছে স্টেশনের ঐতিহ্যবাহী স্থান। মাছ বাজারের টোল ঘরটাও অবস্থিত ওখানে। টিকেট ঘরের বিরাট বিরাট ক'টা অশত্থ গাছ ছিল সেখানে মাড়োয়ারীরা তার ছায়ায় খাটিয়া বিছিয়ে বিশ্রাম নিত গ্রীষ্মে। হনুমানজীর একটা আখড়াও ছিল এখানে লাল ফরগা উড়িয়ে। আখড়া শেষে ছিল ২২ টা পাটগুদাম, চারটা করে লম্বা ঢেউ খেলানো ঘরের সারি সারি দিয়ে। একটা জৈন মন্দির ছিল স্থাপত্যের শিল্পনিদর্শন সমন্বিত। মন্দিরটার মেঝেতে চৌবাচ্চার মতো আয়তাকারের নিম্ন প্রকোষ্ঠে নিকষ কালো কষ্টিপাথরের হনুমানজীর মূর্তি তার উন্মোচিত রক্তাক্ত বক্ষের দু'পাশে ছিল সীতারাম। মূর্তিটার মূল্য কোটি টাকা হওয়া বিচিত্র ছিল না। মন্দিরটা নেই।

চরমুগরিয়ায় ছিল তিনটি বিদেশি পাট কোম্পানি। কুমারনদের ওপারে ল্যাঞ্জেন ক্লার্ক এবং আর পিন। এপারে লুইড্রে ফাস, পরে এসেছিল র‍্যালি কোম্পানি। স্টিমার কোম্পানির সাব এজেন্ট ইংরেজ সাহেবের একটা বাংলো ছিল ওপারে পাটাতন করা দেখার মত বাংলো বিদেশি ফুলের এবং গাছে ভরা কম্পাউন্ড কাঁটা তারের বেড়া ঘেরা। ইংরেজ সাহেব মেমদের একটা ক্লাব ও ছিল এপারে যার ফ্যান চলত কেরোসিনে।

ভারত বিখ্যাত আরো কিছু পাট ব্যবসায়ী যেমন তুলারাম বস্রাজ একটা হাড্রোলিক প্রেস ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখন তার খাঁচাটা মাত্র আছে। বাঙালি পাটব্যবসায়ীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল আর এম সাহা, যুধিষ্টির সাহা, সাধু সাহা এবং মিঠাপুরের সিকদারেরা। এসব দেশি বিদেশি পাট ব্যবসায়ীদের পাট রপ্তানির জন্যই স্টিমার কোম্পানির একমাত্র সাব-এজেন্ট অফিস ছিল চরমুগরিয়ায়। আইজিএনআরএসএন কোম্পানির তিনটি মেইল একটা মিক্সড স্টীমার প্রত্যহ যাতায়াত করত তারপাশা বরিশাল খুলনার পথে। মিক্সড স্টিমারটা সুরেশ্বর যেত কীর্তিনাশা দিয়ে। সে সময়ের সব চাইতে বড় স্টীমার নাগা সাইলু, লিপচা, ফ্লামিংগো সিন্ধু, অস্ট্রিচ মিকি কিউই-র মত নামী স্টিমারগুলো এ লাইন দিয়েই চলত। এসব স্টিমার এবং টাগ টেনে নিয়ে যেত বার্জ এবং পৌঁছে দিতো কোলকাতায় পাট। মিউনিসিপালিটির পূর্বপ্রান্তে কুলপদ্বী। তাও ছিল পাট ব্যবসাকেন্দ্র।

উদয়াচল থেকে অস্তাচলে এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রসারিত প্রধান রাস্তা দু'টি ছেদ

করেছিল যে বিন্দুতে তার সাথে কাঠের পুল দিয়ে সংকুচিত ছিল আরো দু'টি পায়ে চলা পথ। এ কেন্দ্র বিন্দুটি ছিল শহরের হৃদপিণ্ডের মতো। ধমনীর মতো রাস্তা দু'টিতে ছিল জীবনপ্রবাহ শহর জনপদের। এ কেন্দ্র কিছু থেকে উত্তরপথের প্রথমে হাতের বাঁয়ে পাবলিক লাইব্রেরি, উকিল বার মোক্তার লাইব্রেরি, রিজার্ভ ট্যাংক। রাস্তার ডানে জেলখানার পুকুর তার পূর্ব পাড়ে জেলখানা। তার উত্তরে ঢাকাইয়া পট্টি পিছনে মেথর পাড়া ঢাকাইয়া পট্টিতে ছিল বিক্রমপুর প্রবাসী চার আমলা অধিকাংশ আর্দালী চাপরাশি, দু'ঘর ফল তামাক বিক্রেতা একজন আচকান পাজামা পাঞ্জাবি তৈরির খলিফা। একটা মসজিদ ও ছিল উত্তর পাড়ে। জেলখানার পুকুর এবং রিজার্ভ ট্যাংকের মধ্যবর্তী রাস্তা শেষে ডানে পোস্টাফিস। তারপর পৌরসভা এবং ১৮৮৫ সনে প্রতিষ্ঠিত বহুল পরিচিত প্রশংসিত মাদারীপুর হাইস্কুল। পোস্ট অফিসের উল্টো দিকে ট্রেজারি পরে লাল দালানের কোর্ট কাচারি তার সামান্য পরে স্বল্প উচ্চ প্রাচীর ঘেরা এস.ডিও-র একতলা সাদা ভবন। রাস্তা ঘেঁষে তিন নম্বর স্টেশন এবং নৌকা ঘাট।

এ কেন্দ্র বিন্দু থেকে অস্তাচলের দিকে যে পথ তার বাঁয়ে মিউনিসিপ্যালিটির বাজার। ডানে মাড়োয়ারীদের মুদী দোকান। বাজার শেষে পুকুর। দক্ষিণ পাড়ে পলেস্তরাহীন ডনোভান স্কুলের ছাত্রীবাস। পুকুরের পাড়ে রাস্তা সংলগ্ন ডনোভান উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় টিনের দেয়াল ঘেরা। দেখার মতো স্কুলের পরিবেশ। স্কুল ছাড়িয়ে ডানের পথে এগিয়ে গেলে হাতের বাঁয়ে ইউনিয়ন বোর্ড এসোসিয়েশন হল। চারদিকে বারান্দায় ঢালাই লোহার রঙ করা রেলিং রঙিন কাচের কারুকার্যময় জানালা কপাট। অদ্বিতীয় সুন্দর চৌচালাবৃহৎ টিনের ঘর পথের শেষে মিউনিসিপ্যালিটির একমাত্র প্রাইমারি স্কুল অনেক নামী। স্কুলের এ পথ এড়িয়ে গেলেই লক্ষ্মী সর্বত্র। এখানে পথ দ্বিধাবিভক্ত। বাঁয়ের শাখা চরমুগরিয়ার তিন নম্বর পথ। ডান শাখা প্রসারিত ছিল চরমুগরিয়া পর্যন্ত। এ লক্ষ্মীগঞ্জের প্রবেশমুখেই বিখ্যাত বণিকবাড়ি। এ বাড়ির নাটমন্দিরের সামনের মঞ্চে এক কবি গানের আসরে কালো পেড়ে সাদা শাড়ি পরা নারী কবিয়াল গেয়েছিল গান কবির লড়াইয়ে। এ রাস্তার মাঝামাঝি ছিল লোন অফিস একটা দ্বিতল দালানে। তার পর ডা. কিরণ সাহার বাড়ি। যিনি বহুদিন এক নাগাড়ে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তারপর মনোমোহন সাহা উকিলের বাসা। যিনি ছিলেন প্রথম চেয়ারম্যান। দ্বিতীয় স্টিমার স্টেশন ছিল এ বাসার পরে যেখানে ১৯৩৪ সনে মহাত্মা গান্ধী স্টিমার থেকে নেমে লং মার্চে হেঁটে গিয়েছিলেন চরমুগরিয়া।

উদয়াচলের পথের প্রথমে দু'পাশে বিপণী বিতান। এগিয়ে গেলে হাতের বাঁয়ে আদালত পাড়ার পথ। উল্টোদিকে পুল পেরিয়ে লোকাল বোর্ডের লাল দালান। পশু হাসপাতাল টাউন ক্লাব। লাশকাটা ঘর, আদালত পাড়ার প্রবেশ মুখে ঐতিহ্যবাহী কালীবাড়ী এবং তার বিরাট আটচালা নাট্যমন্দির। এটাই ছিল মাদারীপুরের সংস্কৃতির পাদপীঠ। এখানে বছরভর যাত্রা থিয়েটার কবি গান কথকতা মেজিক আরো কত কী হোত। ভারতের বিখ্যাত যাদুকর গণপতি বাবু এবং পিসি সরকার যাদু দেখিয়েছেন এখানে। শেরে বাংলা একে ফজলুল হক ও সে জাদু দেখেছেন। কালীবাড়ী ছাড়িয়ে গেলে রাস্তার বাঁয়ে ফৌজদারীপাড়া। এটাই ছিল শহরের সব চাইতে অভিজাত পাড়া। এ পাড়ার প্রবেশ পথের উল্টো দিকে পুল দিয়ে সংযোজিত ছিল শ্রীনাথ লেন। শ্রীনাথ

সরকারের নামে এ এলাকা ছিল নামকরা। উদয়াচলের এ রাস্তার নাম পুরান বাজারের পথ। ফৌজদারী পাড়া ছাড়িয়ে গেলেই একটা শক্ত প্রশস্ত কাঠের পুলের পাদদেশ থেকে উত্তর মুখোপথ ঐতিহাসিক ইটের পুল পর্যন্ত। এ রাস্তার সমান্তরালে ছিল আর একটা পথ। এ দু'টো পথ সংযুক্ত ছিল দু'টি ছোট্ট পথ দিয়ে। সে পথ কটির প্রথমটি জেলে পাড়ার দ্বিতীয়টি জৈন মন্দিরের, তৃতীয়টি চট্‌কি পট্টি ও কাপুড়িয়া পট্টির। চতুর্থটি টলঘর পেরিয়ে গুড়হাটা ছাড়িয়ে পাটির গুদামগুলোর শেষ পর্যন্ত। টল ঘরের রাস্তা এবং গুড়হাটার সংযোগ স্থলে প্রতি বছর ২৬শে জানুয়ারি বহু মানুষের বেষ্টনীর মধ্যে পুলিশের গতিরুদ্ধ করে উঁচু মঞ্চে উড়ানো হোত স্বাধীনতা দিবসের পতাকা। গুদামগুলোর দক্ষিণ পাশেই ছিল পতিতালয় স্বল্প পরিসরে গ্রামীণ পরিবেশে। পঞ্চম পথটি কাসার পট্টি এবং গুড়হাটার। সবকটি ইটের পুলের পাদদেশ থেকে পুরান বাজারের পথে। এ দু'টিতে পথের অস্তিত্ব এখনো বিরাজমান। মাদারীপুরের হাটখোলা নামে এ অংশ পরিচিত। এখনকার মত তখনো শনি মঙ্গলবার হাট বসত এখানে।

লক্ষ্মীগঞ্জ, আদালতপাড়া, ফৌজদারীপাড়া শ্রীনাথ লেন ছিল শ্যামল শীতল ছায়া সুনিবিড় পরিবেশ মণ্ডিত প্রকৃতি সৌন্দর্যপূর্ণ। এ প্রাকৃতিক পরিবেশে বৈতালিক পাখির গানে প্রভাতী সূর্যের টানে যন্ত্র সংগীত এবং কণ্ঠ সংগীতের সাধনায় অপূর্ব মূর্ছনায় মুখরিত হয়ে উঠত সংস্কৃতি সমুজ্জ্বল মাদারীপুর জাগরণীর প্রবর্তনায়। প্রতি বছর টাউন হলে সপ্তাহব্যাপী প্রতিযোগিতা চলত নানা সংগীতের এবং যন্ত্রসংগীতের। এদের মধ্যে অনেক প্রতিভাবান শিল্পী ছিল। শুধু মিডিয়ার অভাবেই পরিত্যক্ত থেকে গেছে সেসব প্রতিভাধর শিল্পী। ইদিলপুর পরগণার জমিদার রায় পরিবারের আই,সি,এস এস, এন রায়ের সহোদর ধীরেন রায় বিসিএস এর কন্যা গীতা রায় (গীতা দত্ত) শুধু একা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন অনন্যা কণ্ঠশিল্পী হিসেবে। আর পালং-এর সেন বাড়ীর রাজা রাজবল্লভ সেনের উত্তর বংশধর শোভা সেন খ্যাতি লাভ করেছেন চলচ্চিত্র অভিনেত্রী রূপে।

মাদারীপুর মহকুমা জুড়ে ছিল অনেক অভিজাত হিন্দু পরিবার এদের ঘরে ঘরে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির সাধনা ছিল। ছিল শিক্ষাদীক্ষার প্রতি গভীর আকর্ষণ। অনেক জ্ঞানী ও গুণী ছিল যাদের পরিচয় ও স্বল্প পরিসরে তুলে ধরা সম্ভব নয়। যে ফুল সৌন্দর্যের প্রতীক তার পরিচর্যায় ছিল সকাল বিকাল প্রাত্যহিক কর্মসূচিতে।

সমগ্র মহকুমায় চৈত্র সংক্রান্তির দিন থেকে বৈশাখ মাস ভর বসত বৈশাখী মেলা। যাকে গ্রামীণ ভাষায় 'গলেয়া' বলত। গ্রামীণ শিল্প সম্ভার বিশেষ করে শিশুদের মনোরঞ্জনে মৃৎ শিল্পের বহু মাত্রিক রূপ দেখা যেত মেলায়। আনন্দ বিনোদনে রাধাচক্কর ঘোড়াচক্কর এবং বাঁশীর শব্দে প্রকাশ থাকত প্রাণপ্রাচুর্যের পল্লীসংস্কৃতি। বিকালে খেলাগুলো ছিল অতুলনীয়। পূজার শেষ দিন। দশমী এবং বাদদশহরার মেলা বসত। এ মেলায় বিসর্জনের বেদনা মুছে দিতে মেলা প্রাঙ্গণে হাজারো মিছিলের সাথে আসর জমত। সার্কাস ম্যাজিক পুতুল নাচের। সেকালের নৌকা বাইচ হোত বাদদশহরার দিনে। যা এ যুগে এ দেশের এবং সে আনন্দ মেলা এ যুগে অকল্পনীয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরি হোত এ সব মেলায়। নানা উৎপাদিত স্থানীয় পণ্যে মেলা সয়লাব হয়ে যেত। সে অনির্বচনীয় আনন্দ উৎসব এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল এখন

অবর্ণনীয় ভাষায়।

উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত অভিজাত পরিবারের সন্তানেরা ইংরেজের গোলামী করেনি। গোল্ড মেডেল পাওয়া ছাত্ররাও শিক্ষকতা করেছে গ্রামের স্কুলে। এ জন্যেই শিক্ষাঙ্গনগুলো ছিল জ্ঞানের আকর– উচ্চ শিক্ষা সহজ লভ্য ছিল না বলে স্বশিক্ষিত এবং সুশিক্ষিত হয়ে উঠত শিক্ষার্থীরা। মাদারীপুরে বহু কৃতী শিক্ষার্থী ছিল। এদের মধ্যে এ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ শুভাশিস ধর। যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলে রেকর্ড ভঙ্গকারী। ন'টি থানার স্কুলগুলোর মধ্যে শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্বের সেদিন যে স্কুলগুলো শিরোপা লাভ করেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে তার নাম পণ্ডিতসার পঞ্চপল্লী, লোনসিং উপাদী, ডোমসার, পালং তুলাসার রুদ্রকর, মহিমার কনেকশ্বর, ডামুড্যা ইদিলপুর কীর্তিনাশার ওপারে। আর এপারে বহরমগঞ্জ খালিয়া, বাজিতপুর, বীর মোহন এবং সদরের মাদারীপুর হাই স্কুল ও ডানোভান গার্লস স্কুল বিশেষভাবে উল্লেখ্য। অনেক স্বনামধন্য প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষিকা ছিলেন এসব স্কুলে।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বোধহয় মোগল আগ্রাসনে যে অঞ্চলে পালিয়ে আসা কোন পাঠান (কেননা দূরে কাছে মুসলমান বসতি ছিল না) কূলপদ্মী (পদ্মার কূলে) এবং কুমারনদের সঙ্গমে শাহ মাজারের কোন ভক্ত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শাহমাজারে দরগা, সময়টা নির্দেশ করছে ইটের অবয়ব এবং নির্মাণ স্থাপত্যে। এ দরগার কাছাকাছি কোনো অখ্যাত গ্রামে মাদারীপুর সদর এবং মহকুমার নামকরণ করা হয়েছে মাদারীপুর। কীর্তি নাশার দ্বারা দ্বিধাবিভক্ত মাদারীপুর। পাঁচটি থানা নিয়ে পূর্ব এবং চারটি থানা নিয়ে পশ্চিম মাদারীপুর। পশ্চিমাঞ্চল ছিল জালালপুর পরগণার অন্তর্গত। পূর্ব মাদারীপুর দীর্ঘদিন বিক্রমপুর পরগণার অধীন এবং পাঠান মোগলের অবস্থান ওখানে থাকায় ওদের ভাষা সংস্কৃতির প্রভাব এখনো বর্তমান। কোর্তা, পিরন, পয়দার, তখন, দস্তর খান, বর্তন, রেকাবী, কৈরাবাটি বৈয়ম, বদনা, চিলমচি ভাবর উরখি ইছারী চেরাগ কেতন আর্শী এখনি নানা শব্দ এবং রান্না ভিন্নতর এখানে উচ্চারণগত প্রভেদ লক্ষণীয়। মাদারীপুর মহকুমার নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি নেই। মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, খুলনা, যশোর, বরিশাল, নোয়াখালী, কুমিল্লার ভাষার সংমিশ্রণে একটা জগাখিচুড়ির ভাষা চলছে মহকুমার সীমান্ত অঞ্চলে।

মাদারীপুর মহকুমা শিক্ষা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে বিরাট অবদান রয়েছে। যার বর্ণনা এখানে অসম্ভব তবু ও সংক্ষেপে প্রথমেই যার নাম উল্লেখ করতে হয় তিনি ধানুকার আচার্য পরিবার কন্যা জয়ন্তী। বাংলার প্রথম সংস্কৃত মহিলা কবি। বিয়ে হয়েছিল যে কোটালীপাড়ার আচার্য পরিবারে ধানুকার এ আচার্য পরিবার ময়ুর ভট্টের উত্তর পুরুষ বলে কথিত। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে মালখা নগরের বসুরা এবং ইদিলপুরের রায়েরা তালের কুল পুরোহিত করে এনেছিল গোপীনাথ কণ্ঠাবরণকে। যিনি ময়ুর ভট্টের বংশধর (বিশ্বকোষ ইন্ডিকা মতে তবে প্রশ্নও আছে) ভারতীয় প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পমণ্ডিত এবং টেরাকোটা কাজ সম্বলিত তিনটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করে উত্তর ভারতের ভাস্কর্যঋদ্ধ তিনটি বিগ্রহ স্থাপন করে দিয়েছিলেন। উত্তর ভিটার মন্দিরটার বিগ্রহের পাদদেশে শ্বেত পাথরের ফলকের চার চরণের শ্লোকের বাংলা হরফ প্রাচীন বাংলা হরফের নিদর্শন। এ বাড়িতে এখনো তালপাতায় এবং তুলট কাগজে হস্তলিখিত পুঁথি আছে যা অমূল্য

সম্পদ।

জয়ন্তীর কবিতা সম্ভারের ক'টি অনূদিত চরণ উদ্ধৃত হোল—

যেন হ্রদসম নাভ থেকে উঠে এসে
কালনাগ ভ্রমণে গিরিপাদদেশে
অকস্মাৎ ধরা পড়ল তার চোখে
বর্ষাস্নাত যুগল স্বর্ণচূড় নগ বুকে
তা দর্শনে অবাক বিস্ময়ে হতবাক
আকর্ণ বিস্তৃত চোখ তার স্ফীত নাক।।

যাঁর নাম বাংলা গানের ইতিহাসে অক্ষয় স্বর্ণাক্ষরে তিনি– অতুল প্রসাদ সেন (১২৭৮-১৩৪১) তার জন্মভূমি নড়িয়ার মগর হোলেও কর্মজীবন কেটেছে লক্ষ্ণৌতে ব্যারিস্টারী পেশায়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তার স্বদেশী গান সেদিন আবেদন এনেছিল দ্রোহের তার অন্যতম গান 'বল বল বল সবে', 'হও দরমেতে বীর হও করমেতে বীর' এবং আ মরি বাংলা ভাষা'।

মাদারীপুর মহকুমার তখনকার একমাত্র বিজ্ঞান বিষয়ক এবং পোকামাকড় নিয়ে গবেষণা প্রবন্ধ ও সাহিত্য রচয়িতা ছিলেন গোপাল ভট্টাচার্য (১৮৯৫)। নড়িয়ার লোলসিং গ্রামে জন্মে ছিলেন। কথাসাহিত্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন সদর থানার খৈয়রভাঙ্গার অমলেন্দু দাশগুপ্ত। শহীদ নীরেন্দ্র দাশগুপ্তের বড় ভাই। তিনি ও বিপ্লবী ছিলেন। বন্দিজীবন কাটিয়েছেন মাদারীপুরের বহু বিপ্লবীর সাথে বকসা ক্যাম্পে। তাঁর দু'খানি গ্রন্থ বকসা ক্যাম্প এবং ডেটে নিউ উল্লেখযোগ্য। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য পেশায় সাংবাদিক হলেও তার সাহিত্যকর্ম তীর ও তরঙ্গ; অন্ত্যেষ্টি, তথাপি উল্লেখ্য। তার জন্ম পালং।

মাদারীপুর প্রবাসী দু'জন ভারতবর্ষের বিখ্যাত লেখকের প্রথম পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য যিনি দীর্ঘদিন মাদারীপুর হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন। এখানে অবস্থানকালে কার্টুন পতিতা 'ধরিত্রী' এবং 'বিবস্ত্র মানব' উপন্যাস লিখে বাংলা সাহিত্যে যশস্বী হয়েছেন। অপরজন পালং হাইস্কুলের প্রথিতযশা শিক্ষক হেম সেন তনয় ড. সুবোধ সেন যিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসবেত্তাই নন অথরিটি। তাঁর রচিত ইতিহাস এবং সমালোচনা গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য।

মুসলমান লেখকদের মধ্যে কৃতী বাংলা একাডেমী পুরস্কার প্রাপ্ত আবু ইসাহাক যিনি নড়িয়ার সিরঙ্গলে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁর সূর্যদীঘল বাড়ী বহু প্রশংসিত, তার অন্যান্য গ্রন্থ 'হারেম', 'মহাপতঙ্গ' এবং 'পদ্মার পলিদ্বীপ'। জ্ঞানীগুণী শিল্পীসাহিত্যিক ছিলেন, মাদারীপুর জুড়ে। পূর্ব মাদারীপুর এদিক থেকে অগ্রণী। এঁদের অধিকাংশ হিন্দু এদের মধ্যে চারজন বিশিষ্ট মুসলমান শিক্ষাবিদের নাম উল্লেখ করা না হলে অবিচার করা হবে। মর্মপীড়ারও কারণ হবে। এদের অন্যতম আবদুর রহমান খাঁ (১৮৯০-৬৪), জন্ম শিবচরের ভাণ্ডারী কান্দী। সুদীর্ঘ কাল তিনি শিক্ষা বিভাগে দায়িত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ এবং রেক্টরের দায়িত্ব পালন করেন। শুধু মাদারীপুরের নন তিনি সমগ্র বাংলার কৃতী পুরুষ। তিনি একাই নন তাঁর পরিবারের আছে বেশ ক'জন শিক্ষাবিদ। তার পুত্র এফ আর খান পৃথিবী

জুড়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন স্থাপত্য শিল্পে।

আবদুর রশিদ বি,এ বিটি ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন লীডস জন্মে ছিলেন জাজিরায়। তিনি দীর্ঘকাল শিক্ষা বিভাগে কর্মরত ছিলেন। এককালে তাঁর রচিত ভূগোল এবং বাংলা বই পাঠ্য ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে হাইস্কুলে। শিক্ষা বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করে ৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জাজিরা পালং আসনে এমপিএ নির্বাচিত হয়েছিলেন।

আবদুল হক ফরিদী ১৯০৩ সনে নড়িয়ার পাইকপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এ মহকুমায় শিক্ষাবিদ সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর প্রখ্যাতি বিদ্যমান। তিনি ডিপি আই এবং কেন্দ্রীয় কর্ম কমিশনের সদস্য ছিলেন তাঁর কৃতী সন্তান বতমানে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে সচিব আতাউল হক।

প্রবীন শিক্ষাবিদ হিসেবে বিশেষ পরিচিত ছিলেন ডামুড্যার নারায়ণপুর ইউনিয়নের আবদুলগনি মাস্টার, তিনি দারুল আমান হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক। নারায়নপুর ইউনিয়ন বোর্ডের নাম পরিবর্তন করে দারুল আমান ইউনিয়ন বোর্ড নামকরণ করেন এবং ইউনিয়ন বোর্ডের বহুকাল প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি। তিনি ফরিদপুর ডিস্ট্রিকট বোর্ডের ও সদস্য ছিলেন।

ডামুড্যার রত্নকুণ্ডলীর পি.কে.দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে রসায়ন বিভাগীয় প্রধান ছিলেন।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মাদারীপুরের ইতিবৃত্ত ঐতিহ্য মণ্ডিত। বর্ধিষ্ণু হিন্দু গ্রামগুলোতে ছিল সৌখিন নাট্য দল যাত্রা দল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল শিবচরের উমেদপুরের ভোলানাথ অপেরা পার্টি। বাংলাব অদ্বিতীয় ছিল এ যাত্রাদল। দু'জন ইংরেজ নাট্যকর্মী ছিল এ যাত্রা দলে। যারা বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন।

সংস্কৃতির চর্চা ছিল স্কুলগুলোতে। প্রতি বছর এ সব স্কুলের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে যে সব অনুষ্ঠান তা এ যুগে অভাবনীয়। মাদারীপুর হাই স্কুলের এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মঞ্চস্থ হয়ে ছিল কোনান ডয়েলের লর্ড অব সেটোনায়ারের ইংরেজী নাট্যরূপ। রবীন্দ্রনাথের নৃত্য গীতিনাট্য শ্যামা এবং পূজারিণী বহুবার পরিবেশিত হয়েছে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ডনোভান গার্লস স্কুল মঞ্চে। একবার হাইস্কুলের মঞ্চে নেচে ছিল শান্তিনিকেতন নৃত্যশিল্পী হাইস্কুলেরই প্রাক্তন ছাত্র ফৌজদারীপাড়ার, যার নাম মনে পড়ছে না। তিনি প্রখ্যাত মোক্তার খান্দু বাবুর পুত্র।

স্কুলে স্কুলে ছিল পাঠাগার। ছিল বর্ধিষ্ণু গ্রামগুলোতে। পারিবারিক পাঠাগার ও ছিল অভিজাত পরিবারে। তুলসার গুরুদাস উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশে পলেস্তরাহীন জীর্ণ ধ্বংস প্রায় একতলা দালানটা শচীনাথ পাঠাগার ছিল এককালে, যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঐ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতাদের দ্বারা। মাদারীপুর শহরের পাড়ায় পাড়ায় ছিল পাঠাগার। পাবলিক লাইব্রেরিটা নতুন শহরে আর প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ওটা কোথায় গেল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ডামাডোলে কে জানে। তার একটা ওভাল আকৃতির বিরাট আয়তনের টেবিল আছে নাজিমউদ্দিন কলেজ। শিক্ষক মিলনায়তনে আছে তার দু'সেট এনসাইক্লোপিডিয়া কলেজ পাঠাগারে। অন্য আরো কিছু বইও আছে।

বর্তমান হাফিজ মেমোরিয়াল পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হবার আগে ওখানকার লম্বা টিনের ঘরটা ছিল টাউন ক্লাবের। ওখানে প্রথমে শুধু তাস খেলা হোত এবং বিকেলে

ব্যায়াম চলত টাউন ক্লাবের উপকরণে। একজন সাবরেজিস্টার ঐ ক্লাবঘরে পাঠাগারের ব্যবস্থা করেন। নাম করা হয় পাবলিক লাইব্রেরি। এ শহরে যে চারটে পাঠাগার ছিল উল্লেখযোগ্য তার প্রথমটা দরগা খোলায় নাম হরিপদ পাঠাগার। ফৌজদারীপাড়ায় ছিল ছুটির পড়া সমিতি। ওখানে কমিউনিস্ট পার্টি অফিসে যে পাঠাগার ছিল তার নাম ছিল অনুশীলন পাঠাগার। চতুর্থটা ছিল শ্রীনাথ লেনে নিতাই স্মৃতি পাঠাগার নামে। মুসলমান ছাত্রদের জন্য তিন কিশোর প্রথম যে পাঠাগারটি '৪৬ সনে গোসাইবাড়ি রোডে প্রতিষ্ঠা করেন তার নাম ছিল 'ইকবাল পাঠাগার।' তা রূপান্তরিত হয় 'নজরুল পাঠাগার' নামে তারপর অস্তিত্বহীন।

ঐতিহ্যের পরিচয় ছিল মৃৎশিল্পে। বহুদূর প্রসারিত হিললাম কোটাপাড়ার চারা (টালি) শিল্পের বিরাট মটকা যার মধ্যে শতেক মন ধান চাল সংকুলান হোত তা তৈরি হতো খড়িসারে। হাড়িপাতিল তথা মৃৎ পাত্রের প্রখ্যাতি ছিল নারায়ণ পুরের কাইলাহার। অবশ্য মাদারীপুরের দরগা খোলা ঘটমাঝিরও কম খ্যাতি ছিল না মৃৎ পাত্র তৈরিতে।

তামা পাতিল কাঁসার তৈজসপত্র শিল্পে খ্যাতি ছিল ভাগ্য কুলের পরই মাদারীপুরের পালং-এর সমগ্র বাংলায়। নড়িয়ার কলেজের বানিয়াতি কারবার ছিল ভারত জুড়ে। এ থানার মনোহারী দোকানীরাও একচেটিয়া ব্যবসা করত দক্ষিণবঙ্গে। মধ্যপাড়ার সাজিরা কোলকাতাব সমতুল্য বিক্রি করত হরেক রকম মাল। চাঁদপুরের সুদী মহাজনেরা তখনও প্রসার জমিয়ে উঠতে পারেনি।

মাদারীপুর সদর ছিল যেন একটা আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী কেন্দ্র। শহরের কেন্দ্রবিন্দু যাকে হৃদপিণ্ড আখ্যায়িত করা হয়েছে। সেখানে পাঠান আফগান ইরানীরা বসত সালাজুত সালেস মিস্ত্রী, শুকনো ফল পোস্তা বাদাম, কিসমিস, জিন্নাহ কায়ুমী ক্যাপ ছুরি কাঁচি হরেক জিনিস নিয়ে। চীনারা সিল্কের কাপড় বিক্রি করত। বিরাট কারো ট্রাঙ্ক ভর্তি মটকার চাদর পরে মুগা সুতার কাজ করা ও আসাম সিল্কের এন্ডি চাদর পাঁচ সাত টাকা জোড়া বিক্রি হতো নিলামে। চাদর তখন আভিজাত্যের অলংকার ছিল। এখানে কার মাস ব্রুক বন্ড লিপটন কোম্পানি রকসিনের পোস্ট চা পানের উপকারিতার ছবি দেখিয়ে বিনে পয়সায় চাপান করাত সাধারনে। গোল হয়ে বসে চা পান প্রত্যাশীরা চায়ের উপকারিতা সম্পর্কে কথা শুনত। এক পয়সায় এক প্যাকেট চা কিনলে পাঁচ কাপ চা মিলত বিনে পয়সায়। বিরাট টেবিলে পিতলের ঝকঝকে টেপ লাগানো বড় পাত্রে তৈরি চা থাকত। চা তৈরির পদ্ধতি শিখিয়ে তৈরি সে চা কাপে কাপে সরবরাহ করা হোত। বড়ই সুগন্ধী সুস্বাদু লালচে রঙের সে চা সুনাম ছিল। পয়সা দিয়েও সে চা দুষ্প্রাপ্য আজ। ইলিশের মৌসুমে ইলিশ ধরা নৌকায় ছেয়ে থাকত নদী মনে হতো হেঁটেই মাছের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল মাদারীপুর গোপালগঞ্জের বিল যা দিয়ে খুলনা মেইল চলত তা ছিল মাছের খনি। আধামনি রুই কাতলা, মৃগেল, সেরেক ওজনের সরপুঁটি আড়ের বাচ্চাসহ টেংরা লাল ঠোঁটের পাবদা ছিল বোয়াল বাচ্চা সম। শোল গজাল শিং মাগুর ছিল দেখার মত। নদী থেকে আসত পাঙ্গাশ, ডান, বোয়াল, আড়, ছাটা চিংড়ি অকল্পনীয় আকারের। গরুর মাংস শুটকী ছিল না বাজারে তাজা মাছের প্রাবল্যে। ডান মাছ অবলুপ্ত হয়ে গেছে। ওটাই ছিল সবচাইতে অভিজাত মাছ অভিজাত মানুষের জন্য। পাঙ্গাশ তেমন খেত না।

সমগ্র বাংলার সবচাইতে বেশি উৎপন্ন হোত বিশুদ্ধ দুধ এখানে। সেজন্যে ছানার

মিষ্টি দই মাখন ঘি ছিল প্রসিদ্ধ, চিরন্দীর পাতক্ষীরের প্রখ্যাতি ছিল প্রদেশ জুড়ে।

মাদারীপুরের ললেন গুড় সোনার বরণের ছিল অকল্পনীয়। স্বাদের এবং আকর্ষণে। পয়সায় যে কাজ হোত না নলেন গুড়ে সহজেই তা সমাধা হোত। এখানকার চিড়াও ছিল ফতুল্লার মতো। প্রবাদের মতো একটা কথা চলিত ছিল— 'চইলা যাও মাদারীপুর খাইয়া আস চিড়া গুড়, সখ এবং সুরুচি সংস্কৃতমনার পরিচায়ক। পুজার সময় তার পরিচায়কদাতা যেত। পুজামণ্ডপের সামনে যে আলপনা আঁকা হোত তা ছিল শিল্পকর্ম পাওয়া। প্রতিমা বরণ করত সোনার বরণী মেয়েরা সোনার মতো কাঁসার থালায় প্রদীপ সাজিয়ে যা ছিল নৃত্যশিল্পের অঙ্গীভূত।

সংস্কৃতিচর্চার অন্য অঙ্গন খেলার মাঠ যা জাতীয় জীবনের বেঁচে থাকার পরিমাপক বা মিটার। জাতীয় প্রাণচাঞ্চল্য প্রাণ প্রাচুর্যের পরিচয় ছিল মাঠে তখন হা-ডু-ডু খেলা ছিল গ্রামের মানুষের নিষ্কলুষ আনন্দের প্রধান বিষয়। হা-ডু-ডু খেলার পূর্ব মাদারীপুরের খুবই নাম ডাক। সোনামুখী গ্রামের আপমনতা চিকসান্দির কিরণ সোম এবং দাসের জঙ্গলের ঠাকুর ছিল খুবই নাম করা খেলোয়াড়। মাঠের অভাবে ফুটবল খেলাটা ছিল সীমাবদ্ধ। তবুও তার জনপ্রিয়তা ছিল অপরিসীম। যেখানে খেলার মাঠ সেখানেই ফুটবল প্রতি যোগিতার তুলকালাম কাণ্ড। ফুটবল খেলার নামডাক ছিল পণ্ডিত সার, উপাসি ডোমসার পালং ধানুকাণ্ড মধ্যপাড়ার মাঠের। এসব মাঠে প্রতি বছর ফুটবল প্রতিযোগিতা ছিল। পশ্চিম মাদারীপুরে শিবচর, সাতপাড়া, রাজৈর বাজিতপুর ফুটবল আসর বসতো জমজমাট। মাদারীপুর সহরের টিমগুলোর মধ্যে টাউন ক্লাব, ওয়াইএমএ, ইউনাইটেড ক্লাব, মডেল ক্লাব, সিএফসি ডায়মন্ড পাইলট। বুলেট হাইস্কুল এবং ইসলামিয়া হাই স্কুল টিমের মধ্যে মৌসুমে লীগ নক আউট খেলা হতো। ওয়াইএম এর কেষ্টা, হেরা টাউন ক্লাবের শ্যামা গাঙ্গুলি, নীরদ গাঙ্গুলী, নীরদ গুহ জ্যোৎস্না মিত্র স্বরাজ সেন পিয়া 'কুণ্ডু' (যে মা কালী নামে পরিচিত) ছিল খুবই নামকরা খেলোয়াড়। কোলকাতার এ ডিভিসনের খেলোয়াড়রা নিয়মিত অংশগ্রহণ করত মাদারীপুর লীগ নক আউট খেলায়। মাদারীপুরের অনেক খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করত কোলকাতার খেলায়। মাদারীপুরের নক আউট খেলায় দত্তপাড়ার এবং চরআত্রার ফুটবল টিমও অংশগ্রহণ করত। মাতবরের চরের হাকিম গনি খুবই ভাল খেলোয়ার ছিল। জুম্মা খাঁ যেমন বিখ্যাত ব্যাক ছিল মোহামেডানের তেমনি বিখ্যাত ছিল পালং এর গোষ্ঠ পালের নাম মোহনবাগানের ব্যাক হিসেবে। তুলাসারের কেসি সাহা ও গোলকীপার ছিল মোহনবাগানের ইদিলপুরের মোহিনী বানার্জী ছিল ইস্ট বেঙ্গলের সেন্টার হাফ। ফৌজদারী পাড়ার হোক্কা যার ভাল নাম মনে নেই, সেও ফুলব্যাক ছিল মোহন বাগানের।

বলী হিসেবে ভারত খ্যাত শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। তার জন্ম নড়িয়ায়। টাউন ক্লাবে শরীর চর্চা করত অনেকে। প্রতি বছর প্রদর্শনী হোত। মনে হয় অলৌকিক শক্তিধর ছিল মনাদেত্ত কুমড়াখালীর শ্যামা সাহা এলাকার মনসা সাহা, অমূল্য সেন, বলাই বণিক প্রমুখ নানা আধুনিক কসরত দেখাত। এদের কাউকে বড় বড় তারকাঁটা মারা তক্তা বা ভাঙ্গা কাচের উপর চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে পাঁচমনী লোহার পাথর বুকে চাপিয়েছেন হাতুড়ী দিয়ে কাটা হাত লোহার পাত। ৫/৬ সূতী লোহার রড গলায় ঠেকিয়ে বাঁকা করত অনায়াসে। পায়ে পিঠে লোহার শিকল ছিঁড়ে ফেলত। বিরাট রামদার উপর সটান উবুর

হয়ে শুয়ে থাকত কেউ। বুকের উপর দিয়ে টেনে নেয়া হোত ৪০/৫০ মন ইট বোঝাই ঠেলা গাড়ি, কেউ মাজায় রশি বেঁধে টেনে রাখত মোটর গাড়ি।

নানা স্থানে পেশীর নানা রূপ দেখাত পেশীধরেরা। এ্যাক্রোবেটেরা প্যারালাল বার হরাইজেন্টাল বার ক্রসবার রিং বারে নানা কসরৎ দেখাত। ডন বৈঠক মুগুর ভাজার প্রতিযোগিতা হোত প্রদর্শনীতে। সে সব দিনগুলো আর ফিরে আসবে না এ কূপমন্ডুক মানুষের মাঝে। বিনে পয়সায় নিষ্কলুষ আনন্দ দানে বড়ই কৃপণ এ দেশ এখন। সব কিছুতে টিকেট। তখন কোন কিছুতেই টিকেট ছিল না।

আন্তঃস্কুল বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার যে রেকর্ড ছিল তা জাতীয় পর্যায়েও আছে কীনা সন্দেহ। চরমুগারিয়া স্কুলের মইন্যা সাহার মত দৌড় লাফে রেকর্ডধারী কেউ কি আছে বিশ্ববিদ্যালয়েও?

শুরুতেই ভারতের পটভূমিতে মাদারীপুরের রাজনৈতিক ইতিহাসের ঐতিহ্যের কথায় উল্লেখ করা হয়েছে—"চিতোর অব বেঙ্গল" মাদারীপুরের নামের কথা। তার বর্ণনা সম্ভব নয় এবং শোভন নয় অতি সংক্ষিপ্ত এ সংস্কৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে। তবু ও দু'একজন ঐতিহাসিক প্রাতঃস্মরণীয় নাম লিখে রাখাই ঐতিহ্যের ধারারক্ষীদের প্রয়োজনে। ওহাবী ফরায়েজী আন্দোলনের প্রাণপুরুষ হাজী শরীয়তউল্লাহ জন্মেছিলেন শিবচরের বাহাদুরপুরে। তাঁর এবং তাঁর উত্তরপুরুষের ইতিহাস জানা প্রয়োজন ধর্ম সংস্থাপনার স্বার্থে বিখ্যাত ১৯০৬ সনে প্রতিষ্ঠিত অনুশীলন পার্টির স্রষ্টা ভারতবিখ্যাত লাঠিয়াল পুলিনবিহারী দাসের কথাও জানা উচিত রাজনৈতিক শিক্ষার্থীদের। অনুশীলন পার্টিই রূপান্তরিত হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টিতে। পুলিনবিহারী দাসের জন্ম নড়িয়ার লোন সিং-এ ভারতবর্ষে টেরোরিস্ট পার্টির অগ্রনায়ক পূর্ণ চন্দ্র দাস জন্মে ছিলেন রাজৈর সমাজ ইসবপুরে। ৩৯ সনে ত্রিপুরা কংগ্রেসে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হচ্ছিল যখন তাঁর শান্তিসেনা গার্ড অব অনার জানাচ্ছিল গান্ধীজীকে তখন করজোড়ে নমস্কারের ভঙ্গিতে গান্ধীজী নাকি বলেছিলেন যে 'আমাকে নয় তোমাকেই প্রণাম করা উচিত ভারতবাসীর'। এরপর কী আর বলার থাকে তাঁর সম্পর্কে? আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে বিপ্লবী রাধাচরণ প্রামাণিক রাজনৈতিক বন্দিদের প্রতি নির্যাতন এবং নিম্নমানের খাবার পরিবেশনের প্রতিবাদে অনশন করে আত্মবলি দিয়েছিলেন। তিনিই মাদারীপুরের প্রথম শহীদ যিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন পালং এবং আত্মাহুতি দিয়েছেন সেন্ট্রোল জেলে ১৯১৩ সনে। উড়িষ্যার বালেশ্বরে বুড়ীবালাম নদীর তীরে কস্তিদায় ইংরেজ সৈন্যদের সাথে সম্মুখ সমরে নিহত বাঘা যতীনের সহচর ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলেছিলেন তারা দু'জন নীরেন্দ্র দাশগুপ্ত ও মনোরঞ্জন সেন।

খৈয়ারভাঙ্গার এবং জমিদার-তনয় চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী খালিয়ার। মাদারীপুরের সিন্দিয়ার অম্বিকা মজুমদারের পরিচিতি ছিল সমগ্র ভারতে ১৯১৬ সনে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেছিলেন। নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে। ফরিদপুরের আধুনিকায়নে তাঁর অবদানের চিহ্ন সর্বত্র। রাজৈর বাজিতপুরের ভারত সেবাসংঘ আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজী যিনি বিনোদ সাধু নামে বিশেষ পরিচিত। যার আশ্রম শাখা রয়েছে ভারত জুড়ে, তার একটি শাখা আছে এ শহরে। যেখানে আত্মগোপন করে থাকত সাধু সন্ন্যাসী বেশে বহু বিপ্লবী। অস্ত্রচালনা লাঠিখেলা জুডো কেরাৎ ও শিক্ষা দেয়া

হোত রং রুটদের। স্বামীজী গেরুয়ার আবরণে বিপ্লবী ছিলেন। এমন সাধু ভারতে বিরল।

শেষ করার আগে উচ্চারিত হোক তিন ব্রাত্যের পরিচয়। প্রথমেই জীবনকৃষ্ণ বৈরাগী। বৌষ্টমীদের সন্তান পরিচয় থাকে না। কিন্তু প্রতিভাধর এ বৈরাগীকে শ্রদ্ধা জানাই। তিনি ওপার বাংলায় উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী ছিলেন। স্মরণ করি লাশকাটা ঘরের ডোম যদুকে যার বাঁশের বাঁশীর সুরে তন্ময় হয়ে যেত বণিকবাড়ির পথ। মনে পড়ে অনেকেরই মেথরবাড়ির নকুলকে। যার গান শুনে বোঝা দায় হোত হিন্দি সিনেমার প্লেব্যাক গায়ক মোহাম্মদ রফিই গাইছেন কীনা সে গান। এদের নাম লিখা থাকবে না মাদারীপুরের শিক্ষাসংস্কৃতির অঙ্গনে তা কি হয়? ভুলতে কি পারবে মাদারীপুরের সংগীত প্রেমীরা সানাইবাদক অশিক্ষিত তালুতে স্বল্প চুলের বাবরীওয়ালা কালো নাদুস নুদুস ফেদুকে। গাইড এবং মিডিয়ার অভাবে কত প্রতিভাই না অজ্ঞাত থেকে গেছে।

ঐতিহ্যের অতীত অন্বেষণে সুযোগ নেই এ যুগের কথা বলা তবুও বর্তমান তো একদিন ভূত হবে। তখনই তা হবে ইতিহাসের অঙ্গীভূত। তাই অগ্রিম দু'একজনের কথা বলা হলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ওরাও ইতিহাস হয়ে ভেবো এ সামান্য গৌরচন্দ্রিকা ওপার বাংলার কথাসাহিত্যিক এপার বাংলার মাইচ পাড়াগ্রামের সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে। কথাশিল্পী তার পরিচয় ভারত জুড়ে যাব গৌরবে. উত্তরাধিকার এদেশেরও।

অন্যজন এপার বাংলার এ মাদারীপুরের বহুল পরিচিত কথাসাহিত্যিক আজিজুর রহমান আজিজ। তাঁর বহুমাত্রিক প্রতিভার পরিচয় এখনো আবৃত নবীনের আবরণে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব ছাড়া কোনো জাতির রাজনীতি সজীব থাকে না জাতীয় পরিচয় হয় না আন্তর্জাতিক। আত্ম সংস্কৃতিবান শিল্পনদী-র সাধনায় শুদ্ধ সংস্কৃত হোক আত্মা। বিকশিত হোক মানবিক গুণাবলী উদয়াচলের পথ ধরে অস্তাচলের দিকে যে রাস্তাটির কথা প্রাগুক্ত আজ সেই অস্তাচলের পথ ধরে উদয়াচলের দিকে ধেয়ে আসছে অপসংস্কৃতি। সে পথেই আসা বিত্ত বিলীন করছে ইতিহাস ঐতিহ্য। আগ্রাসনে ধর্ম সংস্কৃতি অনুষ্ঠান সর্বস্ব। এখন আর বৈতালিক পাখির সেতার এস্রাজ কণ্ঠ রেওয়াজে গানে ফুলের সৌরভে ঘুম ভাঙে না। আজানের নামে মাইকের কর্ণবিদারী ধ্বনি ঘুম ভাঙে কিন্তু জাগরণীর বাণী মর্মরিত নয়।

# রাজবাড়ি জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য

## মতিয়র রহমান

### জেলা গঠনের ইতিহাস

বিনোদপুর, লক্ষ্মীকোল, ভবানীপুর, চককেষ্টপুর, বলুয়ার চর, কুমোরপাড়া (কাজীকান্দা), গঙ্গাপ্রসাদপুর– প্রাচীন গ্রামসমষ্টি নিয়ে রাজবাড়ির পরিচয়। রাজবাড়ির নাম বহু পূর্ব থেকে প্রচলিত থাকলেও লিখিত হিসেবে রাজবাড়ি নামটি এসেছে অনেক পরে, বিশেষ করে রেল স্টেশনকে ধরে। বাজবাড়ি তখন জেলা, মহকুমা এমনকি থানাও নয়। ১৮৭২ সালে ফরিদপুর জেলার যে আদমশুমারী হয়, তাতে গোয়ালন্দ মহকুমার ৩টি থানার নাম পাওয়া যায়, যেমন— গোয়ালন্দ সদর থানা, বেলগাছি থানা ও পাংশা থানা (ফরিদপুরে ইসলাম, আব্দুস ছাত্তার, পৃষ্ঠা ১৪)। বাংলাদেশে বর্তমানে ৬৪টি জেলা। পুরাতন ১৯টি জেলার মহকুমা শহরই বর্তমান জেলায় রূপান্তরিত হয়েছে। পুরাতন জেলাগুলির গঠনও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফল। মধ্যযুগে সুলতানি আমলে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে শাসন ও রাজস্ব আদা..র ক্ষেত্রে ইকলিম, আরছা, পরগনা, চকলার সৃষ্টি হয়। সুলতানি, নবাব ও মোগল শাসনামলে এলাকাভিত্তিক শাসন ও রাজস্ব সংগ্রহ দিওয়ান ও ফৌজদারের দ্বারা করা হত। তাছাড়া জমিদার, চাকলাদার, পরগনা মালিক নাওয়ারা শাসন ও রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট থাকতেন। রাজবাড়ি ষোড়শ শতকের শেষে ভূষণা পরগনার অন্তর্ভুক্ত, বার ভূঁইয়াদের অন্যতম জমিদার মুকুন্দ রামের অধীনে ছিল। তৎকালীন ফতেহবাদের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে ভূষণা চাকলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভূষণা বর্তমান বোয়ালমারী। অতঃপর রাজবাড়ি যশোহর রাজ প্রতাপাদিত্যের অধিকারভুক্ত হয়। সমসাময়িককালে সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে রাজবাড়ি নাওয়ারা প্রধান রাজা সংগ্রাম শাহের দ্বারা শাসিত হত (বাংলায় রেল ভ্রমণ এল. এন. মিশ্র পৃষ্ঠা ১০৯)। সংগ্রাম শাহের পর এতদ্বাঞ্চল রাজা সীতারামের শাসনভুক্ত হয়।

মোগল শাসনামলেই বাংলায় প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে ওঠে। প্রদেশের সকল শাসন ব্যবস্থার কর্মকর্তা ছিলেন সুবাদার বা নবাব। সুবাদার প্রদেশের জন্য দিওয়ান নিযুক্ত করতেন, প্রদেশের রাজস্ব বিভাগের দায়িত্ব তার উপর ন্যাস্ত থাকত। রাজস্ব আদায় ও প্রশাসনের জন্য একজন সদর কানুনগো থাকত। তার যথেষ্ট ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল। মুর্শিদকুলী খান ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন এবং তিনি সরকার গুলোকে ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করেন। ঢাকা চাকলার অন্তর্ভুক্ত ছিল সোনার গাঁ, বাকলা (বাকেরগঞ্জ), বাজুহা, ফতেহবাদ, উদয়পুর (ত্রিপুরা)। এই বিস্তীর্ণ এলাকা কিছু সংখ্যক জমিদারিতে উপ-বিভক্ত করে জালালপুরের অধীনে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। ঘোড়াঘাট ও যশোহরের পার্শ্ববর্তী এলাকাও জালালপুরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উল্লেখ্য

* মতিয়র রহমান রাজবাড়ি সরকারী কলেজের অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক। 'রাজবাড়ি জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য' নামে তাঁর একটি গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি এই গ্রন্থের অংশবিশেষ।

পরবর্তীকালে এই ঢাকা জালালপুরের অংশ বিশেষ নিয়ে ফরিদপুর জেলা গঠিত হয় (জেমস টেলর, টপগ্রাফি অব ঢাকা)। ১৭৬৫ সালে কোম্পানি বাংলার দেওয়ানা লাভ করায় ভূমি রাজস্বের কর্তৃত্বের অধিকারী হয়। ক্লাইভের দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় নবাবের দায়িত্ব ছিল শাসন ও বিচার কাজ পরিচালনা এবং কোম্পানীর দায়িত্ব ছিল রাজস্ব আদায় ও দেশ রক্ষা। বাংলার জন্য সৈয়দ মোহাম্মদ রেজা খানকে নায়েবে নাজিম (ডেপুটি নওয়াব) হিসেবে ঢাকায় নিযুক্ত করা হয়। লর্ড কর্ণওয়ালিশ ভূমি রাজস্বের ব্যাপারে কালেকটরদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন। ১৭৬৫ সালে কোম্পানির পক্ষে দেওয়ানির বন্দোবস্তের পর ঢাকা কিছু কালের জন্য রেজা খানের নিয়ন্ত্রণাধীন পরে তা কালেকটরদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৭৯৭ সালে ঢাকা কয়েকটি কালেকটরেটে ভাগ হয়। বিভিন্ন কালেকটরেটে ভাগ করে রাজস্ব আদায়ের এ বিষয়টি থেকেই District বা জেলার উদ্ভব হয়েছে। ডেপুটি কালেকটরগণ রাজস্ব আদায় করতেন। District মূলত এরিয়া বা রিজিয়ন বা অঞ্চল। তৎকালীন সময়ে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে যে ভাবে অঞ্চল বিভক্ত করে ডেপুটি কালেকটর নিযুক্ত করা হত ঐ অঞ্চল বা এরিয়া জেলার আকার পায়। পরবর্তীকালে রাজস্ব আদায় ছাড়াও সিভিল প্রশাসন তাদের উপর ন্যাস্ত করা হয়। রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে এ সময় ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোহর, নদীয়া, পূর্নিয়া, বর্ধমান জেলা প্রতিষ্ঠিত করা হয়। পরবর্তীতে বৃহৎ জেলাগুলিকে ভেঙ্গে নতুন নতুন জেলার সৃষ্টি হয়। জেলাকে আবার উপবিভাগ করে (সাব-ডিভিশন) মহকুমার সৃষ্টি হয়।

যে এলাকা নিয়ে বর্তমান রাজবাড়ি জেলা এর গোয়ালন্দ, বালিয়াকান্দি, পাংশা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জেলার সাথে সংযুক্ত ছিল। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বর্তমান রাজবাড়ি জেলার সাবেক মহকুমা, গোয়ালন্দ ঘাট মহকুমা হিসাবে যশোহর জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। একসময় গোয়ালন্দ মহকুমার পাংশা এবং বালিয়াকান্দি থানা পাবনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৫০ সালে লর্ড ডালহৌসির সময়ে ঢাকা জালালপুর ভেঙে ফরিদপুর জেলা গঠিত হলে গোয়ালন্দ ফরিদপুরের অন্তর্ভুক্ত হয়। বালিয়াকান্দি, পাংশা, খোসা, কুমারখালী নিয়ে কুমারখালী মহকুমা প্রতিষ্ঠা হলে পাংশা, বালিয়াকান্দি থানা পাবনার সাথে সংযুক্ত হয়। ১৮৭১ সালে পাংশার কিছু অংশ নদীয়ার সাথে সংযুক্ত ছিল। ১৮৭৫ সালে গোয়ালন্দ মহকুমায় পরিণত হলে বালিয়াকান্দি ও পাংশা গোয়ালন্দের অন্তর্ভুক্ত হয়। ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, চট্টগ্রাম, বরিশাল, খুলনা, যশোহর, পাবনা, রাজশাহী, দিনাজপুর ১৭৯০ থেকে ১৮৬০ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠা পায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে পাকিস্তান সৃষ্টির (১৯৪৭) পর পুরাতন অনেক জেলা ভেঙে নতুন জেলার সৃষ্টি হয়। এভাবে ১৯৭২ এ জেলার সংখ্যা দাড়ায় ১৯। এসব জেলার মধ্যে দু'একটি বাদে জেলাসমূহ মহকুমায় বিভক্ত ছিল। গোয়ালন্দ ১৮৭৫ সালের পর থেকে জেলা গঠনের পূর্ব পর্যন্ত ফরিদপুর জেলার মহকুমা হিসেবে ছিল। ১৯৭৫ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় তৎকালীন মহকুমাগুলিকে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণে জেলা গভর্নর ঘোষণা করলে রাজবাড়িতে আব্দুল ওয়াজেদ চৌধুরীকে জেলা গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। পরবর্তীকালে সে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হয় না। ১৯৮৩ সালে সরকার প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণে প্রতিটি থানাকে মানউন্নীত থানায় রূপান্তরিত করলে রাজবাড়িকে মানউন্নীত থানায় উন্নীত করা হয়। ১৯৮৩ সালের ১৮ই জুলাই থেকে সরকারি অধ্যাদেশ বলে মানউন্নীত থানাকে উপজেলায় রূপান্তরিত করলে রাজবাড়ি উপজেলা হয়। ১৯৮৪

সালের ১লা মার্চ সকল মহকুমা জেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এ সময় গোয়ালন্দ মহকুমার গোয়ালন্দ প্রথমে জেলার নামকরণের অপেক্ষায় থাকে। তবে গোয়ালন্দ মহকুমার অফিস আদালত রাজবাড়িতে থাকায় রাজবাড়ি গোয়ালন্দ মহকুমার সদর উপজেলা হিসেবে রাজবাড়িকে ১৯৮৪ সালের ১লা মার্চ জেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সেই থেকেই রাজবাড়ি জেলা। রাজবাড়ি জেলার প্রথম জেলা প্রশাসক শহীদ উদ্দীন আহমেদ। বর্তমান জেলা প্রশাসক এ.এস.এম. হানিফ উদ্দিন সরকার।

**ভৌগলিক অবস্থান**

এক সময়ের Gate Way of Bengal বাংলার দ্বারপথ বলে পরিচিত গোয়ালন্দ মহকুমার সদর দপ্তর বর্তমান রাজবাড়ি জেলা ২৩°-৪৫ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°-০৯ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ এবং উত্তর-দক্ষিণে প্রশস্ত এ জেলার মোট আয়তন ১২০৪ বর্গকিলোমিটার। রাজবাড়ি সদর, পাংশা, গোয়ালন্দ, বালিয়াকান্দি এই চারটি থানার সমন্বয়ে রাজবাড়ি জেলার পৌরসভা ২টি (রাজবাড়ি সদর, পাংশা), মোট ইউনিয়ন ৪২, মৌজা ৮৩৮। বর্তমান এই জেলার মোট জনসংখ্যা ১০ লক্ষাধিক।

রাজবাড়ি জেলার উত্তরে প্রমত্ত পদ্মা পশ্চিম হতে পূর্বে প্রবাহিত। পদ্মা হাবাসপুর সেনগ্রাম হুঁয়ে ধাওয়াপাড়া ঘাট পর্যন্ত সরলভাবে এসে রাজবাড়ি শহরের সামান্য পশ্চিম হতে উত্তরে বাঁক নিয়েছে। এরপর দৌলতদিয়া হয়ে পূর্বদিকে প্রবাহিত। বর্তমান পদ্মা ও যমুনার সঙ্গমস্থল দৌলতদিয়ার কিছু উত্তরে আরিচার ভাটিতে। পদ্মার অপর পাড়ে পাবনা ও মানিকগঞ্জ জেলা। দক্ষিণে পদ্মার শাখা গড়াই নদী উত্তর পশ্চিম হতে পাংশা ও বালিয়াকান্দি থানার দক্ষিণ দিয়ে দক্ষিণ পূর্বে প্রবাহিত। গড়াইয়ের ওপারে ঝিনাইদহ ও মাগুরা জেলা। জেলার পূর্বে ফরিদপুর ও পশ্চিমে কুষ্টিয়া জেলার সীমানা। পশ্চিমে পাংশা থানার শেষ প্রান্ত গফুগ্রাম থেকে ১৫ কি.মি. দূরে কবিগুরুর কুঠিবাড়ি কুষ্টিয়ার শিলাইদহ, জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত প্রাচীন– নদী হড়াই ও চন্দনা মৃত প্রায়।

**প্রাকৃতিক পরিবেশ**

পদ্মা, হড়াই, গড়াই, চন্দনা আর চতড়ার পলিবাহিত রাজবাড়ি জেলা উর্বর পলল মাটির সমতল ভুমি। এই জেলার অধিকাংশ মাটি দোঁ-আশ ও বেলে প্রকৃতির। বিল অঞ্চলে এঁটেল মাটি। এখানে শীত ও গরম উভয়ই ঢাকার তুলনায় সামান্য বেশি। শীতকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৯.১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই জেলার বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৩৮৬.২৫ মি. মি., বাতাসের আর্দ্রতা গড়ে শতকরা ৭৫ ভাগ। জেলার উত্তরাঞ্চল থেকে দক্ষিণাঞ্চল অপেক্ষাকৃত উঁচু। চন্দনা নদী জেলাকে পূর্ব ও পশ্চিমে বিভক্ত করেছে। পাট, ধান, আখ, পিঁয়াজ, রসুন, শাকসবজি, সরিষা, তিল এ অঞ্চলের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। পাট ও আখ উৎপাদনে এ অঞ্চল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এক সময় গোয়ালন্দের তরমুজ বিখ্যাত ছিল। রাজবাড়ি জেলায় উর্বর মাটি বর্তমানে মেহগিনি, শিশু, কড়াই, জাম, আম, কাঁঠাল গাছ উৎপাদনে উপযোগী বিধায় এলাকার মানুষ বিপুল উদ্যোগে বৃক্ষরোপন ও ব্যক্তিগত বনায়ন সৃষ্টি করে জেলাটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। এক সময় জেলার সহরপুর, সোনাপুর, বাগদুল অঞ্চলে বন্যশূকর ও বাঘের বসবাস ছিল। তেঢালা, গজারিয়া, পাকুরিয়া, কাছমিয়া এ জেলার বিখ্যাত বিল।

**রাজবাড়ি নামের উৎপত্তি**

রাজবাড়ির বাইরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আমার বাড়ি রাজবাড়ি একথা বলতে অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন এ রাজবাড়ি কি নাটোরের বাজবাড়ি? অথবা কোন্ রাজার বাড়ি? গোয়ালন্দ মহকুমার সদর দপ্তর অফিস আদালত অনেক পূর্ব থেকেই রাজবাড়িতে থাকলেও কাগজে কলমে নাম ছিল গোয়ালন্দ। রাজবাড়ি যে রাজার বাড়ি বা রাজার নামের বাড়ি এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবু রাজবাড়ি কোন রাজার বাড়ির নামে এ বিষয়ে ঐতিহাসিক আলোচনার প্রয়োজন। রাজা অভিধাটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি দেশের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার যিনি অধিকারী তিনি রাজা (king), আবার মূলরাজার বশ্যতা স্বীকার করে কোন অঞ্চলের ক্ষমতার যিনি অধিকারী তিনিও রাজা। বার ভুঁইয়ারাও রাজা বলে পরিচিত ছিল। মোগল ও ব্রিটিশ যুগে কোন এলাকার রাজস্ব আদায়ের কারনে যারা বিপুল পরিমান ভূমির মালিক হতেন তারাও রাজা এবং ব্রিটিশ যুগে অনেক জমিদার বা ব্যক্তি জনহিতকর কাজের জন্য রাজা উপাধি প্রাপ্ত হতেন। যেভাবেই রাজা অভিধাটি ব্যবহৃত হোক না কেন, যে কোন রাজার বাড়ি সাধারণ্যে রাজবাড়ি বলে পরিচিত। রাজবাড়ি শহর নিশ্চয়ই কোন রাজার নামে। তবে রাজবাড়ি কখন থেকে ও কোন রাজার নাম অনুসারে রাজবাড়ি তা আলোচনার অপেক্ষা রাখে। রাজবাড়ি নামটি লিখিতভাবে কোন দলিল, মৌজা, পরগনা, খতিয়ান, নকশা এ জাতীয় প্রাচীন কোন কাগজপত্রে পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় তা বিনোদপুর, গঙ্গাপ্রসাদপুর, লক্ষীকোল, ভবানীপুর, সজ্জনকান্দা, চককেষ্টপুর, কাশিমনগর ইত্যাদি। রাজবাড়ির দলিল দস্তাবেজ গোয়ালন্দ বলেই পরিচিত ছিল। এ থেকে মনে করা যায় রাজবাড়ি নামটি কোন রাজার বাড়ি হিসাবে লোকমুখে প্রচলিত ছিল। বাংলায় রেলভ্রমণ পুস্তকে (এল.এন. মিশ্র প্রকাশিত ইস্ট বেঙ্গল রেলওয়ে ক্যালকাটা ১৯৩৫) ১০৯ পৃষ্ঠায় রাজবাড়ি সম্বন্ধে যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে নবাব শায়েস্তা খান ঢাকায় সুবাদার নিযুক্ত হয়ে আসেন। এ সময় এ অঞ্চলে পর্তুগীজ জলদস্যু দমনের জন্য তিনি সংগ্রাম শাহকে নওয়ারা প্রধান করে পাঠান। তিনি বানিয়াহতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন এবং লালগোলা নামক দুর্গ নির্মাণ করেন। এই লালগোলা দুর্গ রাজবাড়ির কয়েক কিলোমিটার উত্তরে বর্তমান লালগোলা গ্রাম। নাওয়ারা মহলের খাজনা সংগ্রহের প্রধান কেন্দ্র ছিল দুর্গাপুর যার অনেকটাই এখন পদ্মাগর্ভে। তৎকালীন সময়ে পদ্মা নদী মানিকগঞ্জের কাছাকাছি দিয়ে ইছামতি হয়ে প্রবাহিত হত। নাওয়ারা মহলের কর্তৃত্ব ছিল রাজা সংগ্রাম শাহের উপর। রাজা সংগ্রাম শাহ স্থায়ীভাবে এখানেই থেকে যান। পরে তারা বানিয়াবহের নাওয়ারা চৌধুরী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে বানিয়াবহের চৌধুরীদের বংশধর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে গেছে। ১৭০২ খ্রিস্টাব্দে নওয়ারা চৌধুরীদের নাওয়ারা মহল রাজা সীতারাম দখল করে নেন। এল. এন. মিশ্র উক্ত পুস্তকে ১১১ পৃষ্ঠায় বানিয়াবহকে ভিন্নভাবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি রাজা সংগ্রাম শাহের রাজ কারবার বা রাজকাচারী ও প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী অফিস বর্তমান রাজবাড়ি এলাকাকে রাজবাড়ি লিখেছেন যা মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। ঐ পুস্তকের শেষের পাতায় রাজবাড়ি স্টেশন হিসেবে রাজবাড়ি নামটি লিখিত দেখা যায়। উল্লেখ রাজবাড়ি স্টেশন ১৮৯০ সালে স্থাপিত। মতান্তরে রাজা সূর্য্যকুমারের নামানুসারে রাজবাড়ি নামকরণ হয়। রাজা সূর্য্যকুমারের পিতামহ প্রভুরাম নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার রাজকর্মচারী থাকাকালীন

কোন কারণে ইংরেজদের বিরাগভাজন হলে পলাশীর যুদ্ধের পর লক্ষ্মীকোল এসে আত্মগোপন করেন। পরে তার পুত্র দিগেন্দ্র প্রসাদ এ অঞ্চলে জমিদারি গড়ে তোলেন। তার পুত্র রাজা সূর্য্যকুমার ১৮৮৫ সালে জনহিতকর কাজের জন্য রাজা উপাধিপ্রাপ্ত হন। রাজবাড়ি স্টেশনের নামকরণ রাজবাড়ি স্টেশন হয় ১৮৯০ সালে। বিভিন্ন তথ্য ও লোকমুখে যা শোনা যায় তাতে রাজবাড়ি স্টেশনটি রাজা সূর্য্যকুমারের নামানুসারে হওয়ার দাবি তোলা হলে বানিয়াবহের জমিদারগণ তার প্রতিবাদ তোলেন। উল্লেখ্য বর্তমানের যে স্থানটিতে রাজবাড়ি রেলষ্টেশন উক্ত জমির মালিকানা ছিল বানিয়াবহের জমিদারদের। তারা ষ্টেশনের নাম সূর্য্যকুমার রাখার প্রতিবাদের মুখে তা রাজবাড়ি স্টেশন রাখা হয়। উল্লেখ্য এর পরপরই রাজা সূর্য্যকুমারের নিজ জমিদারিতে তার নাম অনুসারে সূর্য্যনগর স্টেশন স্থাপিত হয়। এ সকল বিশ্লেষণ থেকে ধারণা করা যায় রাজবাড়ি নামটি বহু পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল। যে কারনে সূর্য্যকুমারের নামে না হয়ে তা শুধুই রাজবাড়ি হয়। তবে রাজা সূর্য্যকুমারের পিতা প্রপিতা সাধারণ্যে রাজা বলে পরিচিত ছিলেন এবং লক্ষীকোলে তাদের ২০০ বৎসরের ঐতিহ্যবাহী বাড়িড়ি রাজারবাড়ি বলে আজও পরিচিত যদিও বর্তমানে বাড়িটির তেমন স্মৃতি চিহ্ন নাই। উপরোক্ত আলোচনা থেকে ধারণা করা যায় বহুপূর্ব থেকেই এ এলাকার নাওয়ারা প্রধান, জমিদার, প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি সাধারণ্যে রাজা বলে অভিহিত হতেন। তবে রাজা সূর্য্যকুমারের পূর্ব পুরুষ এবং তাদের লক্ষ্মীকোলের ঐতিহ্যবাহী বাড়িটি লোকমুখে পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য ধরে রাজারবাড়ি বলেই অধিক পরিচিত ছিল। এভাবেই আজকের রাজবাড়ি।

**ভূ-উত্থান ও ভূ-বিন্যাস**

বর্তমান সীমানায় রাজবাড়ি জেলা তথা অত্র এলাকার অতীত অস্তিত্বের স্বরূপ নির্ণয় দূরহ বিষয়। তবুও তা ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। ১২০৪ বর্গকিলোমিটারের জনবহুল উর্বর, বর্ধিষ্ণু রাজবাড়ি জেলার অতীত ভূ-উত্থান বাস্তব বিষয়। বাংলাদেশ গাঙ্গেয় বদ্বীপ এ বিষয়টি সত্য ধরে বলতে হয় এ বদ্বীপ একদিনের ভূ-আলোড়নের ফল নয়। এটা ধীরে ধীরে সাগরবক্ষে নদীবাহিত পলি দ্বারা গঠিত অসংখ্য দ্বীপসমূহের একত্র ভূ-সমষ্টি।

প্রায় ১০ লক্ষ বৎসর পূর্বে হিমালয়ের শেষ পর্বের উত্থান হয়েছিল বলে ভূ-তাত্ত্বিকগণ মনে করেন। মায়োসিন যুগে এই উত্থানের ফলে বাংলাদেশের কিছু অঞ্চল উত্থিত হয়েছিল। হিমালয়ের ২য় বার উত্থানের ফলে আসাম উপসাগরের তলানী তরঙ্গায়িত ভাজে পরিণত হয়ে গঠিত হয় বর্তমান আসামের প্রাকৃতিক আকার। এইরূপে মায়োসিন যুগের শেষে আসাম উপসাগরের পশ্চিমাংশে ময়মনসিংহ ও ঢাকার উত্তরাঞ্চল সৃষ্টি হয়। এ সময় চট্টগ্রাম ও সিলেট জেলার কতকাংশ সমন্বয়ে হ্রদের সৃষ্টি হয়। ভারত মহাসাগর ও হ্রদের মাঝখানে বিরাজ করত এক বিরাট বাঁধ। প্লায়েসটোসিন যুগে এই হ্রদ ও এর মধ্যবর্তী অংশটি অপসারিত হয়ে যায়। সমুদ্র তখন গঙ্গা নদীর গতিপথ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। এ সময় গঙ্গা নদী ভারতীয় উপদ্বীপ ও মধ্যভারতের এক গভীর খাতের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হত। গঙ্গানদী তখন সপ্ত ধারায় প্রবাহিত। সুচক্ষু, সীতা ও সিন্ধু পশ্চিমগামী ধারা, নলিনী হলদিনী, পাবনী ছিল পূর্বগামী ধারা (যশোর জেলার ইতিহাস)।

মধ্যভাগে ছিল ভাগিরথী বা গঙ্গার মূল ধারা। পূর্বগামী এ সব ধারা পূর্বগামী স্রোতের সঙ্গমস্থল সুগন্ধা নামে পরিচিতি লাভ করে। পূর্বগামী শাখাসহ আসাম উপসাগর থেকে ভেসে আসা নদ-নদীর পলি দ্বারা গঠিত হয় অসংখ্য দ্বীপ। সাগর তখন এ অঞ্চলের কাছাকাছি। সাগর ধীরে ধীরে ভূ-উত্থানের ফলে দক্ষিণে সরে গিয়েছে। ফরিদপুরের পূর্বে ঢোল সাগর আজও সে চিহ্ন বহন করছে। গঙ্গা নদীর ধারায় যে সমস্ত দ্বীপ গড়ে ওঠে এর মধ্যে চক্রদ্বীপ, এড়োদা, অঙ্গদ্বীপ, বৃদ্ধদ্বীপ, সুবর্ণ দ্বীপ নিয়ে গড়ে ওঠে মুমূর্ষু সমতটীয় বদ্বীপ অঞ্চল। যার বর্তমান অবস্থান ঢাকার মুন্সীগঞ্জ ও ময়মনসিংহের দক্ষিণ অঞ্চল, রাজবাড়ি, ফরিদপুর, মাদারীপুর, যশোহর ও খুলনার উত্তরাংশ। নব্যকাশিকা দ্বীপ, চন্দ্রদ্বীপ ও স্ত্রীকর দ্বীপ নিয়ে গড়ে ওঠে কর্মঠ সমতটীয় অঞ্চল। যার বর্তমান অবস্থান বরিশাল ও পিরোজপুর। সমতটীয় অঞ্চলে প্রাচীন উত্থান সম্বন্ধে এ ধরনের আলোচনা মূলত ভূ-তত্ত্বীয় আলোচনা, ইতিহাসের উপাদান থেকে নয়। তবে অত্র অঞ্চলে ভূ-খণ্ডিয় পরিবর্তন ও ভূ-উত্থান, গাঙ্গেয় বদ্বীপ এর সমষ্টিরূপ। এ বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ একমত হবেন। বর্তমানে চন্দ্রদ্বীপ নিয়ে বরিশাল। স্ত্রীকর দ্বীপ নিয়ে পিরোজপুর। নব্যকাশিকা দ্বীপ কোটালীপাড়া এ বিষয়গুলি ইতিহাসের উপাদান। বর্তমানে বিভিন্ন জেলার ইতিহাস রচিত হচ্ছে যা বাংলাদেশের ইতিহাসের বিশেষায়িত খণ্ডরূপ। ঐতিহাসিকগণ যে সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করতে পারেন নাই, বিভিন্ন জেলার ইতিহাস রচিত হলে সে শূন্যস্থান পূরণ হতে পারে। এর ভিত্তিতেই আ.ন.ম. আবদুস সোবহান রচিত 'ফরিদপুরের ইতিহাস', সতীশ চন্দ্র রচিত 'যশোর খুলনার ইতিহাস', 'মানিকগঞ্জের ইতিহাস', 'পাবনার ইতিহাস', জেলা প্রবাহ বরিশাল, এ ইতিহাসের ভিত্তি। এল,এন, মিশ্র রচিত বাংলার রেল ভ্রমণ পুস্তকে পাবনা সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন পাবনা নামটি গঙ্গার স্রোতধারা পাবনী থেকে এসেছে। ড: নীহাররঞ্জন রায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কপিল ভট্টাচার্য প্রভৃতি প্রথিতযশা ঐতিহাসিকগণ এবং ফ্যানডেক ব্রক, রেনেলের নকশা অনুসরণে দেখা যায় নদ-নদীর প্রবাহ অনেককাল পরে। শুধু গঙ্গার প্রাচীনত্ব খ্রিস্টপূর্ব প্রথম দ্বিতীয় শতকের খবরে পাওয়া যায়। টলেমীর বর্ণনা থেকে জানা যায়, খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দে গঙ্গা নদী ভাঙ্গাগড়ার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হত। গঙ্গা ও তার শাখা প্রশাখা এ অঞ্চলে যে চর দ্বীপের সৃষ্টি করে তা থেকেই অত্র অঞ্চলের ভূ-উত্থান। রাঢ়, পুণ্ড্র ও প্রাচীন বঙ্গের উত্থান আর্যপর্বে (খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ) সংগঠিত হয়ে থাকবে আবার অনেকের ধারণা প্রায় ১০/১২ হাজার বৎসর পূর্বে প্রাচীন বঙ্গের উত্থান হয়ে থাকবে। ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাব্দী থেকে গঙ্গার ধারা পদ্মা ও তার শাখা কুমার, মাথাভাঙ্গা, গড়াই, হড়াই, চন্দনা, জলঙ্গী ও উত্তর হতে প্রবাহিত করতোয়ার প্রত্যক্ষ পলিতে সৃষ্ট উর্বর পললভূমি অত্র অঞ্চল। পানির ভূ-গর্ভ স্তরের উপর ভিত্তি করে 'টিউবওয়েলের নলপুতার অভিজ্ঞতায় যে বিভিন্নতা দেখা যায় তা থেকে রাজবাড়ির বিভিন্ন অংশের ভূ-উত্থান ব্যাখ্যা করা সম্ভব। প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে গাঙ্গেয় বদ্বীপের উত্তর অঞ্চল থেকে দক্ষিণ অঞ্চল পরে উত্থিত হয়েছে। সে হিসেবে উত্তরে প্রাচীন পুণ্ড্র, বরেন্দ্র থেকে দক্ষিণের বঙ্গ পরে উত্থিত। ভৌগলিক অবস্থানে রাজবাড়ি বরেন্দ্র ও দক্ষিণ বঙ্গের মাঝামাঝি হওয়ায় বঙ্গের উত্থানের প্রাথমিক ধাপে রাজবাড়ির উত্থান ধারণা করা যায়। তবে রাজবাড়ির ভূ-উত্থানে পদ্মা, গড়াই, হড়াই, চন্দনার প্রভাবে প্রচুর ভাঙ্গাগড়ার খেলা রয়েছে। ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরকে ভিত্তি ধরে বলা যায় বর্তমান গোয়ালন্দ,

খানখানাপুর, রাজবাড়ি, বেলগাছি, কালুখালি ও পাংশা থানার উত্তরাঞ্চল চরদ্বীপ যা বহরপুর, বালিয়াকান্দি, পদমদি, সোনাপুর, বাগদুলি থেকে অপেক্ষাকৃত নবীন। সমাধীনগর, নাড়ুয়া, মৃগী, কসবামাজাইল, পদ্মার অন্য শাখা গড়াইয়ের প্রভাবে গঠিত অঞ্চল। চন্দনা নদী এক সময়ে খুবই প্রবল ছিল এবং এ নদীর তীরে আড়কান্দি, বালিয়াকান্দি, কান্দা অর্থাৎ কিনারে অবস্থিত বলেই কান্দি হয়েছে।

টলেমি গঙ্গা নদীর যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে দেখা যায় প্রাচীন গঙ্গা নদী প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্বে বর্তমান গোয়ালন্দ থেকে অনেক উত্তরে ঢাকার ভাওয়ালের পাশে এ্যান্টিবোল হয়ে প্রবাহিত হতো। তখন ঐ অঞ্চলকে এ্যান্টিবোল সাগর বলে এর পরিচিতি রয়েছে (জেমস টেলর)। তৎকালীন সময়ে গঙ্গার উত্তর হতে সরাসরি দক্ষিণে করতোয়ার দক্ষিণাংশ এ অঞ্চলের হড়াই নদী বলে পরিচিত ছিল। এ নদী তৎকালীন সময়ে খুবই বেগবান ছিল। বর্তমানে এটি বানিয়াবহের দক্ষিণ দিয়ে প্রবাহিত মৃত নদী। রাজবাড়ি জেলার ভূ-উত্থান উল্লেখিত বিশ্লেষনের আলোকে বলা যায় এর কিছু কিছু অঞ্চল অনেক পুরাতন উত্থিত দ্বীপসমূহ। এ অঞ্চলটি বর্তমান রাজবাড়ি জেলার মধ্যবর্তী অঞ্চল বালিয়াকান্দি, জামালপুর, বহরপুর, সোনাপুর হয়ে পাংশা পর্যন্ত। এর উত্তরাঞ্চল গঙ্গাবাহিত বর্তমান পদ্মার ভাঙ্গাগড়ার এবং দক্ষিণাঞ্চল গড়াইয়ের ভাঙ্গা গড়ায় উত্থিত। এর প্রাচীন ভূমির উত্থান প্রায় ৫০০০ বৎসর পূর্বে ধারণা করা যায়।

**প্রাচীন জনপ্রবাহ**

রাজবাড়ি অঞ্চলে কবে কখন থেকে কোথায় প্রথম জনবসতি গড়ে উঠেছে তা নির্ণয় করা অসম্ভব। তবে বঙ্গে জনপ্রবাহের আলোকে রাজবাড়িতে জনপ্রবাহের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা সম্ভব। বর্তমানে রাজবাড়িতে ১০ লক্ষাধিক লোকের বাস। এই জনপ্রবাহের পূর্বপুরুষরা কখনও এ অঞ্চলে বসবাস শুরু করে থাকবে। মানুষের ইতিহাস বহু বৎসর পর্যন্ত প্রাগুনবে (Hominids) ইতিহাস। চীন, জাভায়, টাঙ্গানিকায়, পূর্ব জার্মানিতে এদের করোটির ও নানাবিধ চিহ্ন পাওয়া গেলেও বাংলায় এর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। প্রাচীন প্রস্তর থেকে নব্য প্রস্তর তা থেকে ক্রমে ক্রমে ব্রোঞ্জ ও ইস্পাতের যুগ এসেছে। এর অতিক্রমন কাল প্রায় ২ লাখ বৎসব। ভারতে প্রাচীন বা নব্য প্রস্তর যুগের তেমন নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে বর্ধমান জেলার অজয় নদীর তীরে ১৯৬৩-৬৪ সালে পাণ্ডু রাজার ঢিবি আবিস্কৃত হয়। যেখানে নব্য প্রস্তর যুগের সন্ধান মিলে। এ সভ্যতা খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের তাম্র সভ্যতার যুগ।

বাংলার বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের শারিরীক গঠন বিশ্লেষণ করে পণ্ডিতগণ বাংলায় যে সমস্ত জাতিকে বর্তমান বাঙালিদের পূর্বপুরুষ বলে মনে করেন তারা নিগ্রোবটু, আদি অষ্ট্রালয়েড, আদি নরডিক, আদি ভোটচীন গোষ্ঠীর মানুষ। নিম্নবর্ণের বাঙালি এবং আদিম অধিবাসীদের যে জনের প্রভাব বেশি নরতত্ত্ববিদগণ তাদের আদি অষ্ট্রালয়েড বলে নামকরণ করেছেন। পণ্ডিতগণ মনে করেন এই জন এক সময় মধ্যভারত হতে আরম্ভ করে দক্ষিণ ভারত ও সিংহল হয়ে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ ছাড়া আলপেনীয় নিগ্রোবটু ভোটচীন দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষও প্রাচীন বাংলাব আদিবাসি। আদিমতম স্তরে আদি অস্ট্রেলীয় তারপর দীর্ঘমুন্ডু ভূ-মধ্য নরগোষ্ঠী, গোলমুণ্ড আলপেনীয়, দীনারীয় নরগোষ্ঠী এবং সর্বশেষ উত্তর ভারতের আদি নরডিক বা আর্যজাতীর ধারার মিলনে

গাঙ্গেয় প্রদেশের এই বাংলায় খ্রিস্টপূর্ব ৭ম ও ৬ষ্ঠ থেকে ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রবাহ প্রবাহিত হতে থাকে। খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ শতক থেকে ভারতে আর্য আগমন ঘটলেও আদি অস্ট্রেলিয় নিগ্রোবটু, দ্রাবিড় গোষ্ঠির কৌম সমাজের মানুষেরা বসবাস করত এরও পূর্বে।

প্রাচীন বাংলার জনপ্রবাহের তেমন কোন নিদর্শন নাই। তবে জনপ্রবাহের কিছু সংবাদ পাওয়া যায় বেদপুরাণ, মহাভারত গ্রন্থ, আলেকজাণ্ডার, টলোমির বর্ণনা এবং বিভিন্ন লিপি ও পট্টলী সংবাদ থেকে। 'ঐতরিয় আরণ্যক' গ্রন্থে সর্বপ্রথম বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। বোধায়ন ধর্ম সূত্রে বঙ্গের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। পুরানে দেশসমূহের তালিকায় অঙ্গ, বিদেহ, পুণ্ড্র ইত্যাদি সঙ্গে বঙ্গ যোগ করা হয়েছে। মহাভারতেও বঙ্গের উল্লেখ আছে। বঙ্গ কথাটি অনেকের মতে বঙ্গ থেকে এসেছে। বঙ্গ কৌম অর্থে বঙ্গাজনা। এভাবে বঙ্গ, রাঢী, গৌড়া অর্থাৎ বঙ্গাজনা, রাঢ়াজনা, গৌড়াজনা উপরোক্ত সূত্রগুলিতে বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া গেলেও এর ভৌগলিক অবস্থান সম্বন্ধে কোন সম্যক ধারণা পাওয়া যায় না। মহাভারতে বেশ কয়েকটি রাজ্যের বা ভূ-ভাগের নাম দেওয়া আছে তা থেকে মনে হয় বঙ্গ একটি পূর্বাঞ্চলীয় দেশ যার অবস্থিতি ছিল অঙ্গ, সুহ্ম, তাম্রলিপ্ত, মগধ এবং পুণ্ড্রের কাছাকাছি। কালিদাসের রঘুবংশে রঘুর দিগ্বীজয়ের কথায় 'গঙ্গাস্রোত হন্তারেষু'। তার ব্যাখ্যায় সকলে স্বীকার করেন যে, এর অর্থ গঙ্গাস্রোত অন্তর্বর্তী ভূ-ভাগ অর্থাৎ ভাগিরথীর পূর্বে এবং পদ্মার দক্ষিণে ফরিদপুর, যশোর, খুরনা, নদিয়া অঞ্চল নিয়েই প্রাচীন বঙ্গ। আলেকজাণ্ডার ও খ্রিস্টীয় প্রথম দ্বিতীয় শতকের টর্লেমির বর্ণনায় যে গঙ্গারিডি জাতি ও রাষ্ট্রের উল্লেখ পাওয়া যায় তা এই গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলকেই বুঝায়। এ জাতির ছিল ৬ হাজার রণহস্তী এবং জাতিটি ছিল পরাক্রমশালী। বিভিন্ন লিপি পট্টলী প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার ও ঐতিহাসিক যুক্তি প্রমাণে বারক মণ্ডল, কুমার তালক মণ্ডল ও নব্য কাশিকার সভ্যতার স্পষ্ট প্রমাণাদি পঞ্চম শতক থেকে আরম্ভ হয়েছে। ঢাকার আশ্রাফপুর, বরিশালের ইদিলপুর, নব্যকাশিকা বা কোটালীপাড়া, বারক মণ্ডল, পদ্যাসাতট কুমার তালকমণ্ডলে জনপ্রবাহের সৃষ্টি হয়েছিল। ঐতিহাসিকদের মতে ভারতে আর্যীকরণ আরম্ভ হয় খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে। আর্যীকরণের প্রক্রিয়ায় অস্ট্রালয়েড, দ্রাবিড়, নিগ্রোবটু আদিম গোষ্ঠীর মানুষ ধীরে ধীরে নবউত্থিত বঙ্গের দিকে সরে আসে এবং ইতর জীবন যাপন করে। এরা বিভিন্ন কৌমভুক্ত জাতি। মহাভারতে বাংলার বিভিন্ন কৌমভুক্ত জাতিকে মেলেচ্ছ বলা হয়েছে। 'বোধায়নে' পুন্ড্র (উত্তর বঙ্গ) বঙ্গ পূর্ববঙ্গ প্রভৃতি কৌমদের অবস্থিতি নির্দেশ করা হয়েছে। আর্যবর্হিভূত প্রান্তসীমায় বৌদ্ধ আর্যমুঞ্জুলিকা গ্রন্থে গৌড় সমতট ও হরিকেলের ভাষাকে অসুর ভাষা বলা হয়েছে। আর্যরা এদের দস্যু, পাপ, মেলেচ্ছ প্রভৃতি উন্নাসিকতায় চিহ্নিত করেছে। প্রাচীন বাংলার এ অঞ্চলে আদি অস্ট্রলয়েড, দ্রাবিড় গোষ্টির বসবাস খ্রিস্টপূর্ব থেকে শুরু হতে পারে। পুণ্ড্রের উত্থান অপেক্ষাকৃত বঙ্গের সমতটীয় অঞ্চলের অনেক পূর্বে হওয়ায় তাদের আগমন ঐ অঞ্চলে পূর্বে শুরু হয়। রাজবাড়ি অঞ্চল সমতটীয় অঞ্চল হলেও ভৌগোলিক কারণেই এর উত্থান দক্ষিণাঞ্চলের পূর্বে যে কারণে এ অঞ্চলে প্রাচীন গোষ্টির কৌম সমাজের বিস্তার ঘটতে পারে। আর্যীকরনের পর বর্ণভেদের উদ্ভব হয় আর বর্ণাশ্রমের বাইরে তৎকালীন কৌম সমাজের মানুষের পরিচয় হয় চণ্ডাল, চাড়াল, বাউরি, ঘট্টজীহী, ঢোলবাহী, মালো, হাড্ডি, বাগদি। প্রাচীন নিগ্রোবটু ও অষ্ট্রিকজাতির সমকালে কিছু দ্রাবিড় জাতির আগমন ঘটে এবং সভ্যতা উন্নত বলে অস্ট্রিকজাতিকে গ্রাস করে।

রাজবাড়ি জেলার দক্ষিণে বালিয়াকান্দি থানার জঙ্গল ইউনিয়নে অধিবাসীদের প্রায় ৯৮% শূদ্রপর্যায়ের। এদের শরীরের রঙ তামাটে পীতবর্ণ। আচার আচরণে হিন্দুদের অন্যান্য বর্ণ থেকে আলাদা। এদের মুখমণ্ডল প্রশস্ত হলেও ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে নাক কিছুটা দাবা। রাজবাড়ির সার্বিক জনপ্রবাহে প্রশ্ন আসে তাদের সংখ্যা এখানে এত বেশি কেন? অনেকের ধারণা পালশাসনের সময়ে কৈবর্ত বিদ্রোহে যে বিপুল সংখ্যক কৈবর্তের এ অঞ্চলে আগমন ঘটে এরা তাদেরই একটি অংশ। এরা প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন নিগ্রোবটু ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোক। সোনাপুর, বহরপুর, বালিয়াকান্দি, সোনাইকুড়ী, আড়কান্দি, বাগদুল অঞ্চলের শুদ্রদের থেকে এরা আলাদা। রাজবাড়ি জেলার কালুখালীর উত্তরে বর্তমানে পদ্মার পাড় এলাকায় প্রকীর্থ বলে একটি গ্রাম আছে। উক্ত গ্রামে ২০/২৫ টি প্রাচীন জাতিগোষ্টির লোক বাস করে। এদের চেহারা সম্পূর্ণ পীতবর্ণ এবং আচরণ সাঁওতাল জাতীয়। ধারণা করা যায় এরা আদি অষ্টীক গোষ্ঠীর লোক।

দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা বিশ্লেষণে দেখা যায় এদের মধ্যে পুর, উর, দিয়া, দির ব্যবহার ছিল। পুর, পুরপাল বা নগরপাল। পুরের অর্থ জনসমাবেশ। যে সমস্ত গ্রামের শেষে পুর রয়েছে তা অপেক্ষাকৃত পুরাতন জনের বাসস্থান। রাজবাড়ির পুর দিয়ে গ্রাম বিনোদপুর, ভবানীপুর, গঙ্গাপ্রসাদপুর, সজ্জনকান্দা, বেড়াডাঙ্গা থেকে বেশি পুরাতন। রাজবাড়ি জেলার সোনাপুর, বহরপুর, চণ্ডিপুর, মদুপুর, নিশ্চিন্তপুর, তারাপুর, মদাপুর কালিকাপুর এরূপ অসংখ্য পুরের গ্রাম রয়েছে। এ পুরের বেশির ভাগ গ্রামই অনেক পুরাতন। ধারণা করা যায় এক সময় এ অঞ্চলে প্রাচীন দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ব্যবহৃত পুর থেকে এত পুরের ব্যবহার এসেছে। তা ছাড়া পদমদি, রতনদিয়া দি, দিয়া দ্রাবিড় ব্যবহৃত শব্দ। রাজবাড়ি জেলার পশ্চিমে বাগদি পাড়া ছিল। এ ছাড়া জেলার অন্যান্য স্থানে বাগদি ডোলবাহী, মুচি, চণ্ডাল, চাড়ালের আধিক্য রয়েছে। প্রকৃত অর্থেই এরা আদি কৌমজনের উত্তরসূরী এবং আদি গোষ্ঠীর জন।

রাজবাড়ি এ অঞ্চলে কোম কথাটি বহুল প্রচলিত। প্রাচীন কৌম জনা বা বিভিন্ন কৌমভুক্ত মানুষের প্রাচীন ব্যবহৃত এ কথাটি এ অঞ্চলের মানুষের পরিচয় বহন করে। বিভিন্ন লিপি ও পট্টলী থেকে পাওয়া সংবাদে এ অঞ্চলে সপ্তম, অষ্টম শতকের জনপ্রবাহের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

প্রাচীনকালে ভূমি ব্যবস্থা সম্পার্কত যেসব পট্টলী বাংলায় পাওয়া গেছে ঐগুলির দু'একটি থেকেও রাজবাড়ি জেলার জনসংবাদ পাওয়া যেতে পারে। খ্রিষ্টোত্তর পঞ্চম হতে অষ্টম শতক পর্যন্ত পট্টলীগুলি ভূমিদান বিক্রয়রীতির বিষয়। এর মধ্যে পাহাড়পুর পট্টলী, গুনাইঘর পট্টলী, আশ্রাফপুর পট্টলী, ইদিলপুর পট্টলী, ধনাইদহ পট্টলী, দামোদর পট্টলী, বিক্রমপুর পট্টলী, নব্যকাশিকা পট্টলী, ব্রাহ্মণকে বা দেবতার উদ্দেশ্যে ভূমিদানরীতি তাম্র পাট্টাস বা ফলকে লেখা। ভূমিদানের বিষয়ে অত্র অঞ্চলে পট্টলী চালু ছিল তা বুঝা যায় এসব পট্টলীতে ব্যবহৃত ভূমির মাপ, প্রকারভেদ, ভূমির মূল্য নিরূপণ থেকে। ভূমির ব্যবহারের ক্ষেত্রে নল ব্যবহার হত। নল আজও রাজবাড়ি ফরিদপুর অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। বাস্তুভিটায় এবং কর্ষণযোগ্য ভূমি নাল, খিল এখনও ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া জোলা, জোলক, ভালক, পাঠক খাল বিল এখনও এ অঞ্চলে প্রচুর ব্যবহৃত দ্রাবিড় শব্দ। ডা. নীহাররঞ্জন রায়ের কথায় 'পদ্মার খাড়িতে ফরিদপুর অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া ভাগিরথীর তীরে ডায়মণ্ড হারবারের সাগর সঙ্গম পর্যন্ত বাকেরগঞ্জ,

ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল, চব্বিশ পরগনার নিম্নভূমি ঐতিহাসিক কালে কখনও সমৃদ্ধ জনপদ, কখন গভীর অরণ্য, কখনও নদীগর্ভে বিলীন আবার কখনো খাঁড়ি খাঁড়িকা অন্ত নির্হিত হইয়া নতুন স্থল ভূমির সৃষ্টি। ফরিদপুর জেলার কোটালীপাড়া অঞ্চল ষষ্ঠ শতকের তাম্র পট্টলীতে নব্যকাশিকা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ষষ্ঠ শতকে নব্যকাশিকা (কোটালিপাড়া) সমৃদ্ধ জনপদ এবং এ অঞ্চলে নৌ-বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র। কোটালীপাড়া সমুদ্রতটীয় তাই এ অঞ্চলকে সমতটীয় অঞ্চল বলা হইয়াছে। হিউয়েন সাং সপ্তম শতকে সমতটে এসেছিলেন। তার বর্ণনায় সমতট সমুদ্র তীরবর্তী দেশ। হিউয়েন সাং এর সমতট বর্তমানে রাজবাড়ি, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, মাগুরা, যশোর ও খুলনার পূর্ব অঞ্চল। সমতটের দক্ষিণ অঞ্চল থেকে রাজবাড়ি সাগর থেকে অনেক উত্তরে গঙ্গার মুখে থাকায় এ অঞ্চলে দ্বীপ বা ভূ-উত্থান অপেক্ষাকৃত প্রাচীন যাকে পুরাতন সমতটীয় অঞ্চল বলা যেতে পারে। এ পুরাতন সমতটীয় অঞ্চলে প্রাচীন গোষ্ঠীর মানুষের বসবাস শুরু হয়ে থাকবে যা নবম দশম শতকে পূর্ণরূপ গ্রহণ করেছে।

**অঞ্চলের প্রাচীন চিহ্নিত জনপদ***

প্রাচীন রাষ্ট্রযন্ত্রের বিন্যাসে ভুক্তি, বিষয়, মণ্ডল, বীথি ও গ্রামের উল্লেখ আছে। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বিভাগের নাম ভুক্তি যা কয়েকটি বিষয় নিয়ে গঠিত হত। বিষয় গঠিত হত কয়েকটি মণ্ডল নিয়ে এবং মণ্ডল গঠিত হত কয়েকটি বীথি আর বীথি গঠিত হত কয়েকটি গ্রাম নিয়ে। এতে বোঝা যায় বিষয়ের আয়তন প্রদেশ প্রায় এবং মণ্ডল জেলা প্রায়। নবম দশম শতকে এ অঞ্চলটি সমতট পদ্মাবতী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল যার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে কেশব সেনের ইদিলপুর লিপি বা পট্টলীতে। দশম শতকের শেষে চন্দ্র বংশীয় রাজারা বিক্রমপুর, চন্দ্রদ্বীপ, হরিকেল অর্থাৎ পূর্ব দক্ষিণ অংশ জুড়ে রাজত্ব করতেন। এবং বংশের মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্র তার ইদিলপুর লিপি বর্তমানে (শরীয়তপুর বা বরিশাল) দ্বারা স্মাতট পদ্মাবতী বিষয়ের অন্তর্গত কুমার তালক মণ্ডলে জনৈক ব্রাহ্মনকে একখণ্ড ভূমি দান করেন। তৎকালীন সময়ে ব্রাহ্মণকে পুনর্বাসনের জন্য ভূমি দান করা হত। স্মাতট পদ্মাবতী বিষয় পদ্মানদীর দুই তীরবর্তী প্রদেশকে বুঝায় তাতে সন্দেহ নাই। এ থেকে বোঝা যায় এ অঞ্চল তখন পদ্মাবতী বিষয়ের অন্তর্গত ছিল। কুমার তালক মণ্ডলের উল্লেখ আরো লক্ষ্যণীয়। "কুমার তালক এবং বর্তমান গড়াই নদীর অদূরে ফরিদপুরের অন্তর্গত কুমারখালী দুই-ই কুমার নদীর ইঙ্গিত বহন করে। বর্তমান কুমার বা কুমারখালী পদ্মা উৎসারিত মাথাভাঙ্গা নদী থেকে বের হয়ে বর্তমানে গড়াইয়ের সঙ্গে মিলিত হয়েছে"। (নীহাররঞ্জন বাঙালির ইতিহাস আদিপর্ব পৃষ্ঠা ৮১)। মূলত মাথাভাঙ্গা নদীয়া জেলার উত্তরে জলাঙ্গীর উৎপত্তির প্রায় ১০ মাইল পূর্ব দিকে পদ্মা হতে বের হয়ে আলমডাঙ্গা স্টেশনের প্রায় ৫ মাইল পশ্চিমে এসে দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে। কুমার নামে শাখাটি পূর্বমুখে গিয়ে আলমডাঙ্গা স্টেশনের কিছুটা উত্তরে রেল লাইনের নীচ দিয়ে নদীয়া, যশোর ও খুলনা জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। কুমারের পূর্বগামী আর একটি শাখা শৈলকুপা, শ্রীপুর, মাগুরা হয়ে গড়াইয়ে মিলেছে। কুমার আবার মধুখালীর পাঁচমোহনী হয়ে বর্তমান ফরিদপুরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত। অনেক সময় গড়াই ও

* ড. নীহাররঞ্জনের 'বাঙালির ইতিহাস আদিপর্ব' এবং 'বাংলায় রেল ভ্রমণ' পুস্তক ও অন্যান্য সংগৃহীত তথ্য থেকে এ নিবন্ধ রচিত। –লেখক

কুমারকে অভিন্ন মনে করা হয়েছে। কুমার প্রাচীন নদী এবং এর প্রবাহ ব্যাপক। অনুমান করা যায় ফরিদপুরের পশ্চিমাঞ্চল, যশোরের উত্তরাঞ্চল এবং কুষ্টিয়া সমতট পদ্মাবতী বিষয়। সেই হিসেবে রাজবাড়ি সমতট পদ্মাবতী বিষয়ের অন্তর্গত। অন্যদিকে কুমার তালক বা কুমারের তল বা নিম্নভূমি নিয়ে সমতট পদ্মাবতীর যে মণ্ডল তা কুমার তালক মণ্ডল। সেই হিসেবে গড়াই আর কুমার যদি অভিন্ন হয় তাহলে অবশ্যই বর্তমান রাজবাড়ি কুমার তালক মণ্ডল ছিল। কুমার তালক মণ্ডলের সীমানা নির্ধারণ দুরূহ। ইতিপূর্বে কুমারখালীর কথা বলা হয়েছে। প্রতীয়মান হয় কুমার থেকেই কুমারখালী এসেছে এবং গড়াইকে এক সময় কুমার বলা হতো। গড়াই এর আলোচনা থেকে বলা যায় গড়াইয়ের উৎস মুখ কখনও খনন করা হয়ে থাকবে বলে উৎস মুখে তা গৌড়ী এবং খননের পরে তা হয়েছে গড়াই। এ হিসেবে রাজবাড়ির বেশির ভাগ অঞ্চল বিশেষ করে পূর্বাংশে সামান্য বাদ দিয়ে এটা কুমার তালক মণ্ডল আর বিষয় হিসেবে সমতট পদ্মাবতী।

**অঞ্চলের রাষ্ট্রীয় সংবাদ**

খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দে দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার এর ইতিহাস পর্যালোচনায় অত্র অঞ্চলে গঙ্গারিডি জাতি বলে এক পরাক্রমশালী জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে গ্রিক লেখকগণের বর্ণনায় তা আরো স্পষ্ট হয়। দিওদোরসের লেখনীতে গঙ্গারিডি জাতির বিপুল সেনাবাহিনী ও ৬ হাজার রণহস্তীর উল্লেখ আছে। খ্রিস্টীয় ১ম ও ২য় শতকে পেরিপ্লাস গ্রন্থে টলেমীর বিবরণ হতে জানা যায় এই সময়ে স্বাধীন গঙ্গারিডি রাষ্ট্র বেশ প্রবল ছিল। গঙ্গা রাষ্ট্রের বাইরে সমসাময়িক বাংলায় আর যে সব রাজা ও রাষ্ট্র বিদ্যমান ছিল তাদের সঙ্গে গঙ্গার রাষ্ট্রের কি সম্বন্ধ তা জানার উপায় নাই। তবে মহাভারত ও সিংহলী পুরানের কাহিনী থেকে কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। রাষ্ট্র বিন্যাসের একটি আভাস পাওয়া যায় খ্রিস্টীয় ২য় শতকে মহাস্থানের শিলাখণ্ড লিপিটি থেকে। মৌর্য আমলে উত্তরবঙ্গ মৌর্য শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। উত্তরবঙ্গে মৌর্য শাসনের কেন্দ্র ছিল পুডনগল বা পুণ্ড্রনগর বর্তমান বগুড়া জেলার ৫ মাইল দূরে মহাস্থান গড়ে। টলেমির বর্ণনায় দেখা যায় গঙ্গারিডি রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল গঙ্গাবন্দর। এই গঙ্গা বন্দরের অবস্থিতি ছিল তাম্রলিপ্তি বন্দরের আরো দক্ষিণপূর্বে ক্যামবেরীখন নদী (Kamberikhon) বা কুমার নদীব মোহনায়। কুমার নদীর তল ধরেই কুমার তালক মণ্ডল। গঙ্গা বন্দরে অতি সুক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র উৎপন্ন হত এবং নিকটে কোথাও সোনার খনি ছিল বলে নীহাররঞ্জনের উদ্ধৃতিতে পাওয়া যায়। পেরিপ্লাস গ্রন্থে নিম্নগাঙ্গেয় ভূমিতে ক্যালটিস নামক এক প্রকার সুবর্ণ মুদ্রার ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে। গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া অঞ্চলে প্রাপ্ত ৬ষ্ঠ শতকের একটি লিপিতে সুবর্ণবীথির উল্লেখ আছে। ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জের সুবর্ণগ্রাম, মুন্সিগঞ্জের সোনারঙ্গ, রাজবাড়ির সোনাপুর, সোনাকান্দা বাংলার পশ্চিম প্রান্তে সুবর্ণরেখা নদী একথা স্মরণ করে দেয়। রাজবাড়ি অঞ্চলে সোনার টাকাভরা গুপ্তধনের গল্পকাহিনী প্রচলিত আছে। সোনাপুর রাজবাড়ির গ্রাম হিসেবে অতি পুরাতন। সোনাপুর এটা ইঙ্গিতবহ হতে পারে। নলিয়া, আড়কান্দি, বহরপুর, সোনাপুর, বালিয়াকান্দি অত্র অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা উঁচু ভূমি। এর উত্থান এবং প্রাচীন বসতি অনেক পূর্ব থেকে। অত্র অঞ্চল সন্ধান করলে গুপ্তধন না হোক খনিজ সম্পদ পাওয়ার সম্ভাবনা

রয়েছে। গঙ্গা নদী প্রাচীনকালে কুমার তালক মণ্ডলে এর মোহনা থাকা স্বাভাবিক সে মোহনায় গঙ্গা বন্দর প্রাচীন কুমার তালক মণ্ডল হতে পারে। রাজবাড়ি কুমার তালক মণ্ডলের বীথি হতে পারে। এ সবই প্রাচীন গঙ্গা রাষ্ট্রের অঙ্গ বা এলাকা হতে পারে।

**প্রাচীন জনপদে রাজবাড়ির অবস্থান**

প্রাচীন কৌম সমাজে বঙ্গ বা বঙ্গাজনার উল্লেখ রয়েছে। 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে মহাভারতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। এতে বোঝা যায় বঙ্গ একটি প্রাচীন দেশ। এদেশটি গঙ্গার নিম্ন অববাহিকার ভাটির দেশ যাদের বঙ্গাল বলা হয়। 'ভাটি হতে আইল বঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি।' 'মহাভারতে' সমুদ্র তীরবাসী বঙ্গদের ম্লেচ্ছ বলা হয়েছে। বাঙ্গালা বা বাঙলা সাধারণ ভাবে সমস্ত বাংলার নাম। মোগল আমলে এই দেশ সুবা বাঙলা নামে পরিচিত ছিল। আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে বাঙলা বা বাঙ্গালা নামের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বঙ্গা শব্দের অর্থ আল। শুধু আইল নয় ছোট বড় বাঁধ যুক্ত হয়ে বঙ্গাল নামের উৎপত্তি। প্রাচীন বাংলায় বঙ্গ বঙ্গাল বলতে যে দেশ খণ্ড বুঝাত তা বর্তমান বাংলার সমর্থক নয়। প্রাচীন বাংলাদেশ যে সব জনপদে বিভক্ত ছিল বর্তমান বঙ্গ তার একটি বিভাগ মাত্র যা বর্তমান বাংলাদেশের দক্ষিণ বঙ্গকে বোঝায়। প্রাচীন বাংলায় বঙ্গা, রাঢ়া, পুণ্ড্রা, গৌড়া, কৌম জনের (Tribe) বাসস্থান থেকে বঙ্গ, রাঢ়, গৌড়, পুণ্ড্র জনপদের সৃষ্টি হয়। আনুমানিক ষোড়শ সপ্তদশ শতকে দিগ্বিজয় প্রকাশ নামক গ্রন্থে উপবঙ্গের উল্লেখ আছে। উপবঙ্গ যশোর ও তৎসংলগ্ন এলাকা ছিল (উপবঙ্গে যশোরাদ্যা:)। প্রবঙ্গ নামেও একটি জনপদের উল্লেখ আছে। সমাচার দেবের ঘুগ্রাঘাটি লিপিতে সুবর্ণবীথির উল্লেখ আছে। এই সুবর্ণবীথি নব্যকাশিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুবর্ণবীথির অন্তর্ভুক্ত ছিল বারক মণ্ডল, ধ্রুবিলাটি। বারক মণ্ডল ছিল প্রায় সমুদ্রাশ্রয়ী। ফরিদপুরের ধ্রুবিলাটি রাজবাড়ি হতে পূর্বে এবং ফরিদপুর হতে পশ্চিমে ফরিদপুর শহরের কাছাকাছি ধুলট যা বর্তমানে ধুলদি গেট।

বর্তমান রাজবাড়ি অতীত ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত। ৬ষ্ঠ ৭ম শতকে এ অঞ্চল বারক মণ্ডল এবং ৯ম ১০ম শতকে কুমার তালক মণ্ডল। এ অঞ্চলের মানুষ আদি বঙ্গজনা বাঙ্গালজাতি। আজও বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের কাছে ফরিদপুরের মানুষ বাঙ্গাল বলে পরিচিত। কথায় বলে ফরিদপুরের বাঙ্গাল। তবে রাজবাড়ির পশ্চিমাংশ এবং গড়াইয়ের তীরবর্তী এলাকা যশোরের প্রভাবিত ছিল। সে হিসেবে উপবঙ্গের যশোরাদ্যা: এর প্রভাব রয়েছে। অনেকে এ অঞ্চলকে সমুদ্র তটাশ্রয়ী বলে সমতটীয় মনে করেন। আসলে এর কোন ভিত্তি নেই। সমুদ্র গুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে (চতুর্থ শতক) সমতট নামে একটি জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। যার অবস্থান কামরূপের দক্ষিণে। হিউয়েন সাং-এর বিবরণী থেকেও পন্ডিতগণ মনে করেন যা বাংলার কিছু অংশ ছিল সমতট। তবে এ সমতট বলতে কুমিল্লা ত্রিপুরাকে বুঝিয়েছেন। চতুর্থ শতকের শেষে ইৎসিং সমতটে রাজভট নামে রাজার উল্লেখ করেছেন। সপ্তম শতকে আশ্রাফপুর পট্টলীতেও তা পাওয়া যায়। রাজভটের অন্যতম রাজধানী ছিল ত্রিপরা (বর্তমান কুমিল্লা) জেলার বড়কামতা। তবে প্রাচীনতম ঐতিহাসিক কাল হতে খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ ৭ম পর্যন্ত বাংলাদেশ পুন্ড্র, বঙ্গ, গৌড়, রাঢ়, সুম্ম তাম্রলিপ্ত, সমতট প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত ছিল।

শশাংকের পর ৮ম শতক থেকে বাংলাদেশ পুণ্ড্র বা পুন্ড্রবর্ধন, গৌড় ও বঙ্গ এ তিনটি

জনপদেই সমগ্র বাংলার রূপ নেয় এবং নতুন করে বিভাগীয় নামের উদ্ভব হয়। যেমন- পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলা অঞ্চলে দণ্ডভুক্তি। পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ, সমতট। চন্দ্রদ্বীপ বরিশাল অঞ্চল। হরিকেল (নোয়াখালী ও কুমিল্লা অংশবিশেষ) বাদ দিলে দক্ষিণ বাংলার ফরিদপুর যশোর বঙ্গালদেশের মধ্যে পড়ে প্রাচীন সমতটের নাম বদলে যায়। ৮ম ৯ম শতকের পর এ অঞ্চল সাগরতটীয় বলে সমতটীয় নামকরণ হলেও এ অঞ্চলে মূলত বঙ্গ, বঙ্গাল, বাঙলা। অন্যদিকে বাংলা বিভিন্ন নামে উপবিভক্ত হলেও তিনটি জনপদ বঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্রের প্রধান অস্তিত থাকে। যার মধ্যে গৌড়ের প্রভাব বেশি। পাল ও সেনরাজাদের লক্ষ্য ও আদর্শ ছিল গৌড়েশ্বর হিসেবে পরিচিত হওয়া। লক্ষণসেন যে মুহূর্তে গৌড় অধিকার করলেন তখন তিনি গৌড়েশ্বর। আওরঙ্গজেবের আমলে সুবা বাংলার যে অংশ নবাব শায়েস্তাখানের শাসনাধীন ছিল তাকে বলা হতো গৌড়মণ্ডল। তবে সমগ্র বাংলাকে গৌড়ীয় করার প্রচেষ্ট সার্থক হয় নাই। আসলে তা শেষে বঙ্গ নামই গ্রহন করেছে। সুলতানি আমলে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ সমগ্র বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ করলেও সম্রাট আকবরের আমলে সমগ্র বাংলাদেশ পূর্ব বাংলার পরিচিতি পায়। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দেও দেখা যায় বাংলার অধিপতি নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা। ব্রিটিশ আমলে বাংলার নাম পূর্ণ পরিচিতি পায়। ১৯০৫ সালের বঙ্গ ভঙ্গ থেকে ১৯৪৭-এর দেশবিভাগ সবই বাংলার ঐতিহাসিক অস্তিত্ব প্রমাণ করে। দেশবিভাগের পর পূর্ববাংলা পূর্বপাকিস্তান আর ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পর তা স্বাধীন বাংলাদেশ। যা আজও প্রাচীন বঙ্গ, বঙ্গালা, বাংলার নামে চেনা যায়।

### দেশ বিভাগ ও ১৯৪৭ এর অভিবাসন

রাজবাড়ি পূর্ব থেকেই হিন্দুপ্রধান এবং হিন্দু এলাকা বলে পরিচিত। ধীরে ধীরে তা বর্তমানে মুসলিম আধিক্যে পরিণত হয়েছে। দেশবিভাগের পূর্ব পর্যন্ত হিন্দু আধিক্যের এ অঞ্চল থেকে ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান সৃষ্টির লগ্নে রাজবাড়ি থেকে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের পশ্চিম বাংলায় ব্যাপক প্রস্থান ঘটে। অন্যদিকে পশ্চিম বাংলা, বিহার অঞ্চল থেকে ব্যাপক পরিমাণ মুসলমানদের রাজবাড়িতে আগমন ঘটে। এ সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে যারা অবাঙালি তারা সাধারণভাবে বিহারী বলে পরিচিত ছিল। বাজবাড়ি শহরের উত্তর-পশ্চিম দিকে বিহারী কলোনি গড়ে ওঠে। এ সমস্ত বিহারীদের জীবনমান ছিল নিম্নমানের। হুগলি, মুর্শিদাবাদ, কলকাতা থেকে বহু বাঙালি মুসলমানদেরও অভিবাসন ঘটে। এরা উচ্চ শ্রেণীর মুসলমান। রাজবাড়িতে এসে তারা বিভিন্ন চাকরিতে নিয়োজিত হয়।

রাজবাড়ি অঞ্চলে মুসলমান অভিবাসনের আরেকটি পর্যায় বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়। রাজবাড়ির বিভিন্ন অঞ্চলে জনবসতি কম ছিল এবং এলাকা বনজঙ্গলে অনাবাদি থাকায় নোয়াখালী, কুমিল্লা থেকে অনেক পরিবার রাজবাড়িতে এসে স্থায়ী বসবাস শুরু করে।

### ফতেহবাদ, খলিফাতাবাদ : আঞ্চলিক শাসনে রাজবাড়ি

স্বাধীন সুলতানি আমলে ফতেহবাদ, মোবারকবাদ, মোয়াজামাবাদ, খলিফাতাবাদ, হোসেনাবাদ, বারবকাবাদ, আশ্রবপুর (ঢাকা), নবগ্রাম (পাবনা), দেওতলা প্রভৃতি স্থান

থেকে শিলালিপি পাওয়া গেছে এবং বিভিন্ন স্থান থেকে মুদ্রা উৎকীর্ণ হয়েছে। বলা যায় এগুলি জেলা ভিত্তিতে স্থানীয় শাসনকেন্দ্র। এর মধ্যে ফতেহবাদ, খলিফাতাবাদ দক্ষিণ বঙ্গের শাসনকেন্দ্র ছিল। ফতেহবাদ ফরিদপুর তা আজ ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত যদিও চট্টগ্রামের ৮ মাইল উত্তরে অন্য একটি ফতেহবাদের উল্লেখ ইতিহাসে রয়েছে। ফতেহবাদ সম্বন্ধে ড. আব্দুল করিম 'বাংলার ইতিহাস সুলতানি আমল' পুস্তকে ২৪৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন 'জালাল উদ্দীন ফতেহাবাদ ও রোতসপুর হতে মুদ্রা উৎকীর্ণ করেন। ফতেহবাদ এবং আধুনিক ফরিদপুর অভিন্ন। চট্টগ্রামেও একটা ফতেহবাদ নাম পাওয়া যায়। এই স্থানটি চট্টগ্রাম শহর হতে ৮ মাইল উত্তরে'। ইতিপূর্বে ফরিদপুর এলাকা মুসলমানদের অধীনে ছিল না। সুতরাং ফতেহবাদ হইতে মুদ্রা উৎকীর্ণ করায় আমরা বলতে পারি যে, জালাল উদ্দীন ফরিদপুর জয় করেন এবং দক্ষিণবঙ্গের দিকে রাজ্য বিস্তার করেন। সেই অঞ্চলে এতদিন পর্যন্ত ছোট ছোট হিন্দু রাজারা রাজত্ব করতেন। মধ্যযুগের কবি বিজয় গুপ্ত ১৪৯৪-৯৫ সালের মধ্যে মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ কাব্য রচনা করেন। কবি তার আত্মপরিচয়ে বলেন :

"মুল্লুক ফতেহবাদ বঙ্গজোড়া একলীম,
পশ্চিমে ঘাঘড়া নদী পূর্বে ঘন্টেশ্বর"

ফতেহবাদ মুল্লুকে (বর্তমান ফরিদপুর এলাকা) ঘাঘড়া ও ঘন্টেশ্বরী নদীর মধ্যবর্তী স্থানে ফুল্লেশ্রী গ্রামে কবির জন্ম। ফুল্লেশ্রী বর্তমানে বরিশালের গৈলাগ্রামের একটি পল্লী। এ থেকে প্রমাণ হয় ফতেহবাদ বর্তমান ফরিদপুরের বৃহৎ অঞ্চল। রাজবাড়ির একাংশ এক সময় ফতেহবাদেব অর্ন্তভুক্ত ছিল।

**খলিফাতাবাদ**

সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদের রাজত্বকালের মুদ্রা ভাগলপুর সাতগাঁও বাগেরহাট হতে উৎকীর্ণ হয়েছে এবং তার শাসনামলের শিলালিপি পাওয়া গেছে। ১৪৫৯ সালে তিনি যশোহর, খুলনা পুনরুদ্ধারের জন্য খাঁ জাহান আলী নামে এক সেনাপতিকে পাঠান। তিনি এ অঞ্চল জয় করে খলিফাতাবাদ শহর এবং প্রশাসনিক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। সুলতানি আমলে দক্ষিণবঙ্গে ফতেহবাদ ও খলিফাতাবাদ প্রশাসনিক বিভাগ বা ইকলিম হিসেবে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। রাজবাড়ি জেলার ভৌগোলিক অবস্থানের বিশেষত্ব এই যে বর্তমান জেলাটি পুরাতন ফরিদপুর ও যশোর জেলার সংলগ্ন। আবার উত্তরে পাবনার সাথেও এর সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। তবে রাজবাড়ি জেলার অংশবিশেষ বেশির ভাগ সময় ফরিদপুর ও যশোর জেলার সাথে সংযুক্ত দেখা যায়। ১৮৯৩ সালে জেলাটির কিছু অংশ ঘাট গোয়ালন্দ হিসেবে যশোরের সাথে সংযুক্ত ছিল। কাজেই রাজবাড়ি তৎকালীন সময়ে ফতেহবাদ ও খলিফাতাবাদের সাথে সংযুক্ত থাকাই স্বাভাবিক এবং রাজবাড়ির পূর্বাংশ বাদ দিয়ে বাকি অংশ খলিফাতাবাদ প্রশাসনিক অঞ্চলের সাথে যুক্ত ছিল।

**কসবা, খিতা, শিক**

প্রশাসনিক ইকলিমকে আবার কসবা, খিতা, শিক এভাবে ক্ষুদ্র শাসনে বিভক্ত করা হত। রাজবাড়ি জেলার পাংশা থানার কসবা মাঝাইল গ্রাম, শিকজান গ্রাম রাজবাড়ি জেলার অতি পুরাতন গ্রাম। কসবা মাঝাইল গড়াই নদীর ধারে বর্তমান বুনিয়াদি গ্রাম।

কসবা মাঝাইলের অদূরে একটি পুরাতন মাজার রয়েছে। এই গ্রামে অনেক বুনিয়াদি পরিবার রয়েছেন। গড়াই নদীর ধারে সুলতানি আমলে কসবা মাঝাইল প্রশাসনিক কসবা বা থানা ছিল বলে প্রতীয়মান হয়।

শিকজান গ্রামটি মৃগী ইউনিয়নে অবস্থিত। এই গ্রামটি অতি পুরাতন এবং এখানেও একটি পুরাতন মাজার রয়েছে। মাজারটি তৎকালীন মুসলমান ধর্ম প্রচারকদের কবর। শিকজান গ্রামটি রাজবাড়ি জেলার ভূ-উত্থানগত দিক দিয়েও প্রাচীন। সুলতানি আমলে এই গ্রাম একটি শিক বা প্রশাসনিক ইউনিট ছিল।

**কল্যাণ দীঘি**

রাজবাড়ি শহর থেকে ছয় সাত মাইল পশ্চিমে নবাবপুর ইউনিয়নে রাজধারপুর গ্রাম। রাজধারপুর গ্রামের পাশে কল্যাণ দীঘি। বিরাট আকারের এই দীঘি বর্তমানে সমতল বিরাট বিলে পরিনত হলেও দীঘির সীমানা নির্ধারন কষ্টকর হয় না। অনেকের মতে দীঘিটি ১৬ খাদা জমি নিয়ে (১৬ পাখিতে ১ খাদা এবং ১ পাখি .২৫ শতাংশ) এর অবস্থান ছিল। এত বড় দীঘি এ অঞ্চলে দৃষ্ট হয় না। ... প্রথমে রাজা সীতারামের খনন কাজ। এক সময়ে এ অঞ্চল রাজা সীতারামের করতলগত হয়। রাজা সীতারাম তার রাজধানী মুহম্মদপুরে (মাগুরা) অনেক দীঘি খনন করেন। 'রাম সাগর', 'সুখ সাগর', 'কৃষ্ণ সাগর' নামক দীঘি তার কীর্তি। কথিত আছে সীতারামের খানজাহান আলীর মত একদল বেলদার সৈন্য ছিল। সংখ্যায় ২২০০। তারা যুদ্ধের সময় ছাড়া অন্য সময় জলাশয় খনন করে লোকের জলকষ্ট দূর করত। কথিত আছে সীতারাম প্রতিদিন নব খননকৃত জলাশয়ের জলে স্নান করতেন। বেলগাছিতে রাজা সীতারামের খননকৃত একটি পুকুর আছে। মতান্তরে 'কল্যাণ দীঘি' খান জাহান আলীর কীর্তি। খানজাহান আলী ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দে যশোর, খুলনা জয় করে খলিফাতাবাদ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। খানজাহান আলী ধর্মপ্রচার ও জনহিতকর কাজের জন্য বহু দীঘি খনন করেন। বাগেরহাটের খানজাহান আলী দীঘি তার খননকৃত অন্যতম দীঘি। খানজাহান আলী পরে পীর হিসেবে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে একদল ধর্ম প্রচারককে উত্তর পূর্বাঞ্চলে পাঠান। তার সময়ে এ দীঘি খননকৃত এ ধারণাও বিচিত্র নয়। খানজাহান আলী ও রাজা সীতারামের খনন কাজের কিছু পার্থক্য দেখা যায়। মুহাম্মদপুরে রাজা সীতারামের খননকৃত দীঘি সকল বাগেরহাটে খানজাহান আলীর খননকৃত দীঘি সকল থেকে আকার আয়তনে ছোট। কল্যাণদীঘির আকার আয়তন অনেক বড় যা খানজাহান আলীর খননকৃত দীঘির মত। দীঘি খননের সময়কাল ধরলে দেখা যায় খানজাহান আলীর খননকৃত হলে তা হবে প্রায় ৬০০ শত বৎসর পূর্বে আর সীতারামের খননকৃত হলে হবে ৪০০ শত বৎসর পূর্বে। যে কোন দীঘি যত্নাভাবে বা অন্য কোন কারণে তা বসে যেতে পারে। কাজেই ৬০০ শত বা ৪০০ শত বৎসর বিবেচনায় রেখে খানজাহান বা সীতারামের খনন কিনা তা বলা যাবে না। তবে সুলতানি আমলে কল্যাণ দীঘির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলটি বর্ধিষ্ণু অঞ্চল হিসেবে পরিচিতি পায়। এ অঞ্চলের সেকআরা গ্রামে ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে সাহ পাহলোয়ান ও সাহ সাদুল্লার মতো জবরদস্ত পীর আউলিয়ার আগমন ঘটে। জায়গাটি সুলতানি আমলেই মুসলিম প্রাধান্য লাভ করে যার কারণে পীর আউলিয়াদের আগমন ঘটে। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে খানজাহান আলীর খলিফাতাবাদ রাজ্যে জনসাধারণের

কল্যাণার্থে এ দীঘি খনন হতে পারে।

### গ্রাম খালকুলা জ্যোতির্বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র

প্রাচীনকাল থেকে এ দেশে জ্যোতির্বিদ্যাচর্চা হয়ে আসছে। মধ্যযুগে মাদারীপুরের/শরিয়তপুরের ভোজেশ্বরের অপর পাড়ে নড়িয়া খালের পশ্চিম কুলে মাসুরা গ্রামের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে প্রসিদ্ধ গ্রাম ফতেহজঙ্গপুরা। সুলতানি ধরে সেখানকার জ্যোতিষীগণ পঞ্জিকা প্রকাশ করতেন। অনুরূপ আর একটি কেন্দ্র ছিল রাজবাড়ি জেলার ইসলামপুর ইউনিয়নের বর্তমান খালকুলা গ্রাম। রামদিয়া স্টেশন থেকে পূর্বদিকে অবস্থিত শতানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের বংশীয় এ গ্রামের জ্যোতির্বিদগণ খুব প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁরা পঞ্জিকা প্রকাশ করতেন।

### বেলগাছিতে চাঁদ সওদাগরের ঢিবি

ইতিপূর্বে হড়াই নদীর বর্ণনাতে বেলগাছির নিকট হড়াই নদীতে চাঁদ সওদাগরের ঢিবির কথা বলা হয়েছে। চাঁদ সওদাগর, ধনপতি, শ্রীমন্ত সওদাগর চতুর্দশ শতকের ঐতিহাসিক বিষয়। মঙ্গলকাব্যসমূহে যে সওদাগরদের কাহিনী রয়েছে তার রচনাকাল পঞ্চদশ শতক সুলতানি আমলে। বগুড়ায় চাঁদ সওদাগর এবং খুলনায় ধনপতি সওদাগরের ঐতিহাসিক উপাদান রয়েছে। বগুড়ায় কালিদহ আজও বিদ্যমান। খুলনা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হয় ধনপতি সওদাগরের পত্নী খুল্লনার নামানুসারে খুলনার নামকরণ হয়েছে। "খুলনার তালিবপুর গ্রামে ধনপতি সওদাগরের প্রতিষ্ঠিত বলে কথিত খুল্লেনেশ্বরী কালী আজও পুজিত হচ্ছে।" (পূর্ববঙ্গ রেলপথে বাংলাদেশ পৃষ্ঠা-২১৩)। বিজয়গুপ্ত রচিত 'মনসামঙ্গল কাব্য' ১৪৮৪ সালে রচিত হয়। তার রচনা মতে দেখা যায় সওদাগরের বিভিন্ন দ্রব্যের সাথে পাটের তৈরি শাড়ি, ধুতি বিদেশে নিয়ে যেত। ইবনে বর্তুতা, মাহুয়ান, বার্থেমা, বারবোসা, ব্যারস সকলের বর্ণনাতেই দেখা যায় বঙ্গের প্রাচুর্য ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত ধনরত্নাকর গ্রন্থে উল্লেখ আছে বাঙালি মহিলারা ফেসারি পাটের শাড়ি পরিধান করত তা ধাপানী বস্ত্র নামে পরিচিত ছিল। আইনি-আকবরী গ্রন্থে পাটবস্ত্র বয়ন করার কথা বলা হয়েছে। এ গ্রন্থে মধ্যযুগে বঙ্গের মাটিতে পিঁয়াজ, রসুন, পান, সুপারী, খয়ের উৎপাদনের কথা বলা হয়েছে। বারবোসা বলেছেন বঙ্গে প্রচুর আখ ও চিনি উৎপাদন হত। বারবোসার মতে বঙ্গে সাদা চিনি উৎপন্ন হত। রাজবাড়ি সেকাল থেকেই পাট, আখ, পান, খয়ের, পিঁয়াজ, রসুন, তিল উৎপাদনে বিখ্যাত। রামদিয়াতে এক প্রকার চিনি উৎপাদনের সংবাদ পাওয়া যায় যা বাটা চিনি বলে খ্যাত ছিল। আজও এতদ্বাঞ্চলে রামদিয়ার রামের মটকা অতি বিখ্যাত। সোনাপুরে প্রচুর খয়ের উৎপাদন হত এবং আজও উৎপাদিত হচ্ছে। সোনাপুর অঞ্চলে প্রচুর খয়ের গাছ দেখা যায়। পাংশায় কাগজ উৎপাদন হত। আড়কান্দিতে বৃহৎ নৌকা নির্মাণ হত। এই অঞ্চলে প্রচুর তন্তুবায় শ্রেণী রয়েছে যারা প্রাচীনকাল থেকেই পেশা হিসাবে কাপড় উৎপাদন করত। তৎকালীন সময়ে এ অঞ্চলে ভূষণা ছিল বৃহৎ বন্দর। বগুড়া থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে পুন্ড্রনগর বা মহাস্থানগড় এর সভ্যতা খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সভ্যতার শেষের দিকে চাঁদ সওদাগরের কাহিনী 'মঙ্গলকাব্যে' বর্ণিত হয়েছে। মহাস্থানগড়ের (বগুড়া) চাঁদ সওদাগর করতোয়া বেয়ে হড়াইতে পাড়ি জমাতেন তার

সপ্তডিঙ্গা মধুকর বাণিজ্য তরী নিয়ে। পদ্মার প্রবাহ তখন প্রবল না থাকায় বর্তমান রাজবাড়ি থেকে উত্তরে অনেক দুরত্ব দিয়ে হড়াই দিয়ে গঙ্গার বিপুল জলরাশির প্রবাহের ফলে হড়াই খরস্রোতা বেগবান নদী ছিল। এই কারনে চাঁদ সওদাগরের ডিঙ্গাডুবি অস্বাভাবিক কিছু নয়।

## পাংশা থানার যশাইতে সুলতানি আমল থেকে কাগজ উৎপাদনের সংবাদ

প্রাচীনকালে মিশরীয়রা পেপিরাস বৃক্ষের ছাল থেকে কাগজ উৎপাদন করত। মিশর প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র। বঙ্গে সভ্যতার শুরু অনেক পরে প্রাচীন যুগ থেকেই বাংলায় পুন্ড্র (মহাস্থানগড়), ময়নামতিতে সভ্যতার বিকাশ ঘটে কিন্তু দক্ষিণবঙ্গে এ সভ্যতার শুরু ৬ষ্ঠ শতকে কোটালিপাড়ায়। তবে সমস্ত বাংলা সুলতানি আমল থেকেই সার্বিক সভ্যতার সংস্পর্শে আসে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মাহুয়ান বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন। তার বর্ণনা থেকে পাওয়া যায় এ দেশের লোকেরা গাছের বাকল থেকে উৎকৃষ্ট মানের কাগজ উৎপাদন করত। এ কাগজ হরিণের চামড়ার মতো মসৃণ ও উজ্জ্বল ছিল। বর্তমান রাজবাড়ি জেলার পাংশা থানার মেঘনা যশাই ইউনিয়নে উদয়পুর, পাটকিয়াবাড়ি গ্রামে এবং পাংশা থানার বিভিন্ন অংশে ছড়ানো ২০০/৩০০ পরিবার রয়েছে যাদের উপাধি কাগজী। সাধারণ্যে তারা কাগজী বলে পরিচিত এদের কয়েকটি পরিবারের সাথে আলাপ করে জানা গেছে তাদের পূর্বপুরুষেরা বংশ পরম্পরায় কাগজ উৎপাদন করত। তাদের এই পেশা বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত চলে। দু'একটি পরিবারে সে আমলের কাগজ তৈরির যন্ত্রপাতিও রয়েছে। কাগজীদের পূর্বপুরুষ মুসলিম শাসনামলে তৎকালীন এই উন্নত পেশায় সংশ্লিষ্ট হয়ে এলাকার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। জাতি হিসেবে তার অভিবাসিত সম্ভ্রান্ত মুসলিম।

## আড়কান্দি বৃহৎ নৌযান নির্মাণ কেন্দ্র

পর্যটক টাভার্নিয়ারের বর্ণনা এবং 'যুক্তি কল্পতরু' নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে জানা যায় চতুর্দশ পঞ্চদশ শতকে বাংলায় বৃহৎ বৃহৎ জাহাজাকার নৌকা তৈরি হত। ইবনে বতুতার 'রেহেলা' গ্রন্থে বঙ্গে জাহাজ শিল্পের ব্যাপক উন্নতির কথা বলা হয়েছে। বার্থেমা বিভিন্ন প্রকার নৌযান ও জাহাজের কথা বলেছেন। 'History of Indian Shipping' গ্রন্থে রাধাকুমার মুখার্জি লিখেছেন, ধনপতি নামক গৌড় শহরের এক হিন্দু বণিক ও তার পুত্র জাহাজে করে সমুদ্রযাত্রা করত। 'মনসামঙ্গল কাব্যে' বঙ্গে জাহাজ নির্মাণ সম্বন্ধে লিখিত আছে যে চাঁদ সওদাগর কুশাই নামক একজন কারিগরকে চৌদ্দখানা জাহাজ নির্মাণের আদেশ দেন। চাঁদ সওদাগব পুণ্ড্রের (পুণ্ড্রনগরের) সওদাগর ছিলেন। রাজবাড়ি তৎকালীন গঙ্গার মুখে হড়াই, চন্দনা, গড়াই, বাত নদী সমুহের কেন্দ্রস্থল বিধায় এ অঞ্চলে নৌ যোগাযোগের কারণে শিল্প গড়ে ওঠা স্বাভাবিক। উল্লেখ্য রাজবাড়ি নাওয়ারা মহল বলে পরিচিত। নাওয়ারা মহলের কর্তা বানিয়াবহের নাওয়ারা চৌধুরীদের নৌকা নির্মাণের কেন্দ্র ছিল আড়কান্দি। আড়কান্দি তখন বেগবান নদী চন্দনার তীরবর্তী বাণিজ্য কেন্দ্র (বঙ্গে রেল ভ্রমণ-১০৯)। বর্তমানে আড়কান্দির পাশে শীবরাট গ্রামের নৌকা বানানোর মিস্ত্রীরা রাজবাড়ি জেলায় বিখ্যাত। নদ-নদী-খাল-বিল, জলা ভরাট হওয়ার কারণে এ অঞ্চলের নৌশিল্প নেই বললেই চলে। তবে ষাটের দশকের গোড়াতেও তুলশী বরাটের মিস্ত্রীরা নৌকা বানানোব ক্ষেত্রে বিখ্যাত ছিল।

এখানে যে কয়েক ঘর মিস্ত্রী আছে তাদের কাছ থেকে জানা যায় এ পেশা তাদের আদি পূর্বপুরুষের। তাই সুলতানি আমলে আড়কান্দিতে বৃহৎ আকার নৌযান বা চাঁদ সওদাগরের সপ্তডিঙ্গা বা জাহাজ বানানো বিচিত্র নয়। হতে পারে এখানে বানানো কয়েকটি ডিঙ্গা পুণ্ড্রে (বগুড়ার) স্রোতা হড়াই বেয়ে ফিরে যাবার সময় বেলগাছিতে ডুবে গিয়েছিল যা আজও হড়াইতে চাঁদ সওদাগরের ঢিবি বলে সওদাগরের চিহ্ন বহন করে চলেছে।

**শেরশাহ-গ্রান্ড ট্রাংক রোড প্রসঙ্গ খলিফাতাবাদ-ফতেহবাদ**

১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে হুসেনশাহী বংশের শেষ সুলতান মাহমুদ শাহকে পরাজিত করে শের খান শেরশাহ নাম ধারন করে এবং বাংলায় সুরবংশীয় আফগান শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এ বংশের শাসন আমল ১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত জয়ী হয়। শেরশাহ বঙ্গে চট্টগ্রামের বিরুদ্ধে অভিযান চালান এবং ক্ষুদিবক্সকে পরাজিত করেন। সোনারগাও, গৌড়, সাতগা, খলিফাতাবাদ, শরিফাতাবাদ, ফাতেহাবাদ তার করতলগত হয়। শেরশাহ রাজ্যকে ১৯টি সরকারে ভাগ করেন। তার অন্যতম কীর্তি সিন্ধু হতে সোনারগা পর্যন্ত তৈরি পথ। ইংরেজরা এটিকে পরবর্তীতে গ্রান্ড ট্রাংকরোড নামে অভিহিত করে। এ রোডটি তৎকালীন সময়ে সাতগা, খলিফাতাবাদ, ফতেহবাদ এতটা নিকটে ছিল না বা প্রবলও ছিল না। এ রাস্তাটির কিছু কিছু চিহ্ন ষাটের দশকেও হাওড়া, শাহের, ফরিদপুরে দৃষ্ট হত।

**রাজবাড়ি অঞ্চলে সনাতন, ব্রাহ্মন্য, ইসলাম ধর্মের প্রবাহের ধারা**

আর্যপূর্ব বাংলায় আদি কৌম জাতি প্রাকৃতিক বা সনাতন ধর্মাশ্রয়ী। প্রকৃতি পূজাই ছিল তাদের ধর্ম। অন্যদিকে আর্যরা ছিল বেদ নির্ভর বৈদিক তা জাতিভেদের আওতায় আর্য বৈদিক ব্রাহ্মণ, বেদের বাণী আশ্রয়ী হইত। আদি সনাতন ধর্মাশ্রয়ী মানুস আর্যদের উন্নত সংস্কৃতি এবং বেদের বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে নিজেদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের স্থান করে দেয়। গুপ্ত, পাল ও সেন পর্বে একটির পর একটি তাম্রপট্টলীতে দেখা যায় বাংলাদেশের নানা জায়গায় ব্রাহ্মণরা এসে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যাচ্ছে। এদের মধ্যে কেহ ঋক বেদীয়, কেহ সমবেদীয়, কেহ কাহ্নব, কেহ ভারগব, কেহ শাণ্ডিল্য, কেহ ভরদ্বাজ। ভূমিদান যা হচ্ছে তা অধিকাংশই ব্রাহ্মণকে এবং দানপুণ্যের অধিকারী হচ্ছে দাতা এবং দাতা তার পিতামাতার পূণ্যের উদ্দেশ্যে পিতামাতার নামে দেব মন্দির নির্মাণ, মন্দির সংস্কার পূজার বিচিত্র ব্যয় সংস্থান করছেন। পদ্মাসমতট কুমার তালক মণ্ডলে শ্রীচন্দ্র কর্তৃক ভূমিদান সংস্কার বিষয় ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। ৭ম ৮ম শতক থেকেই এ অঞ্চলে ব্রাহ্মণ ধর্মের প্রবাহ চলতে থাকে যা দ্বাদশ পর্যন্ত বিস্তৃত। সনাতন কৌম জাতভুক্ত এ অঞ্চলের মানুষ ব্রাহ্মণ্য ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণ পৌরহিত্যে সনাতন ও বেদাশ্রিত ধর্মাশ্রয়ী হিন্দু হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। সাধারণভাবে তারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পালন করলেও জাতিভেদে সনাতন ধর্মাশ্রয়ী হিন্দু। সনাতন ধর্মাশ্রয়ী শূদ্র হিন্দু হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। রাজবাড়ি জেলার কৌমভুক্ত শূদ্র পর্যায়ে মানুষ আড়কান্দি, বালিয়াকান্দি, জঙ্গল, সোনাপুর, সোনাইকুরি, পাংশা এবং রাজবাড়ির বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে।

অন্যদিকে ব্রাহ্মণ, সাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজদের সংখ্যা তুলনামূলক কম। তৎকালীন সময়ে রাজবাড়ি জেলার ক্রোকদির সান্ডিল্য পরিবার এ অঞ্চলে বিখ্যাত ছিল। এ ছাড়া নলিয়া

জামালপুরে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের প্রাধান্য কম ছিল না। ত্রয়োদশ শতক হতে আরব, তুর্কি, আফগানি, ইরানি, হাবসি, সুলতানি, মোগল ও নবাবি আমলে ধর্মপ্রচারক, শিক্ষক, শাসক, সৈনিক, বণিক, ভাগ্যান্বেষী হিসেবে বাংলায় আগমন করতে থাকে। সুলতানি আমলের মুসলিম প্রবাহের শুরু থেকে নবাবি আমলের শেষ পর্যন্ত তা চলে। ব্রিটিশ আমলের শেষে ১৯৪৭ এর কিছু আগে ও পরে অভিবাসনে মুসলিম প্রবাহের শেষ বলা যায়। যদিও ১৯৭১ এর পরেও কম বেশি এ প্রবাহ চলে। স্বাধীন বাংলার ১২০৪ থেকে ১৭৫৭ পর্যন্ত মুসলমান রাজত্বের স্থায়িত্বের সাথে সাথে ইসলাম ধর্ম ধীরে ধীরে বিস্তৃত হতে থাকে। একদিকে মুসলিম সেনাপতি ও সেনারা রাজ্যের পর রাজ্য জয় করছে, অন্যদিকে সুফী সাধক ও পীর দরবেশ মিলে দলে দলে ইসলাম জয় করেছেন। এসব সুফী মধ্যপ্রাচ্যের বসরা, বাগদাদ, কুফা থেকে আসতেন এবং সুফী আন্দোলনের বিস্ত ারকল্পে ভারত তথা বাংলার দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তেন। এ সময় ব্রাহ্মন্য ধর্মের অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার অনুন্নত জাতি ও সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের মনে ইসলামের প্রভাব বিস্তার ঘটে। আল্লাহর প্রতি সুফীদের ভালবাসা, তাদের সহজ সরল জীবন ধারণ, ভোগবাদী ব্রাহ্মণ্য, অস্পৃশ্য সমাজের নর-নারী, মানসপটে মহিমারূপে দেখা দেয়। জাতিভেদ জর্জর হিন্দু সমাজের নর-নারী ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়।

ড. আব্দুর রহিমের বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ১৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত পরিসংখ্যান থেকে মুসলমান প্রবাহের ধারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

| সাল | মুসলমান | হিন্দু | আদিবাসি | মোট |
|---|---|---|---|---|
| ১৫৭০ | ২৫ লাখ | ৬২.৫ লাখ | ২ লাখ | ৮৯.৬ লাখ |
| ১৬৭০ | ৫২ " | ৯৪ " | ২৬" | ১৪৪.৬ " |
| ১৭৭০ | ১০৩ " | ১৪১ " | ৪ " | ২৫৪৬ " |

উল্লেখিত পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে, হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার থেকে মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার বেশি। অবশ্য বাংলার সব অঞ্চলেই মুসলিম প্রবাহের হার একরকম নয়। এ সম্বন্ধে রাজবাড়ি জেলায় সুলতানি মোগল যুগে সামান্য হলেও ইংরেজ শাসন আমলের শুরু থেকে ১৯৬০ এর মধ্যে এখানে ব্যাপক জনবসতি গড়ে ওঠে। ১৮৬৯ সালে মাদারীপুরের লোনসিংহ থেকে অবলাবান্ধব নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের হত। উক্ত পত্রিকায় দেখা যায় তৎকালীন ফরিদপুর, রাজবাড়ি, পালং, মাদারীপুর, ত্রিপুরা, নোয়াখালীর লোকসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে প্রায় ৮০০/৯০০ ছিল।

**তাঁতশিল্পী**

রাজবাড়ি জেলার প্রাচীন জনবসতির বিশেষ একটি অংশ এ অঞ্চলের তাঁতশিল্পী। রাজবাড়ি, পাংশা, গোয়ালন্দ থানার বিভিন্ন গ্রামে এদের জনাধিক্য দেখা যায়। এই শ্রেণী মুসলমান এবং ব্যবসায়ী ও বস্ত্র উৎপাদক হিসেবে সুলতানি যুগ থেকে অভিবাসী তাদের এ অঞ্চলে আগমন ঘটে। বিজয় গুপ্তের উদ্ধৃতি থেকে জানা যায় মুসলমান তাঁতীরা অত্যন্ত মিহি বস্ত্র তৈরি করত। কৃষ্ণবাজে কবিরাজের মতে শ্রীচৈতন্যের শিষ্য শ্রীনিবাস জনৈক মুসলমান দর্জিকে দিয়ে কাপড় সেলাই করে নেন। রাজবাড়ি অঞ্চলে প্রাচীনকাল থেকেই

কার্পাস, কাপড় ও পাট বস্ত্র উৎপাদনের উল্লেখ রয়েছে। রাজবাড়ি ষোড়শ শতকে ভূষণা চাকলার অন্তর্গত ছিল। এককালে ভূষণার বস্ত্র, কাগজ, গালা, মোম, তামা, পিতল, কাঁসার খ্যাতি বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। রামপ্রসাদের বিদ্যা সুন্দরের-

'বনাত মখমর পট্ট ভূসনাই খাশা
বুটিদার ঢাকাইয়া দেখিতে তামাশা'।

এ সময় রাজবাড়ির জীবনধারা ছিল ভূষণাকেন্দ্রিক। রাজবাড়ি অঞ্চলে তখন কার্পাস উৎপাদন হত। পাট, কার্পাস, কাঁচামালের প্রাচুর্যে এ অঞ্চলে তাঁত শিল্প গড়ে ওঠে। সুলতানি ও মোগল যুগে তাঁত বকাশ্রয়ী মুসলমান ব্যবসায়ী, শিল্পজাত পণ্য উৎপাদনকারী খলিফা (দর্জি), শিক্ষক, ধর্মপ্রচারক উন্নত পেশাভুক্ত থাকায় তাঁতশিল্পী ও কাগজ উৎপাদনকারী শ্রেণীর ব্যাপক আগমন ঘটে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কার্পাস বস্ত্রের কারিগরগণ বঙ্গদেশে অর্থনীতিতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। বঙ্গদেশে বিভিন্ন স্থানে মসলিন বস্ত্রের কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। এর মধ্যে নিম্নোক্ত কেন্দ্র গুলি ছিল বিশেষ প্রসিদ্ধ : (১) ঢাকা (২) মারদাহ (৩) লক্ষিপুর (৪) খিরপাই (৫) মেদিনীপুর (৬) চট্টগ্রাম (৭) কুমারখালী (৮) কাশিমবাজার- (তথ্যসূত্র : ভারতের কৃষক বিদ্রোহ, গণতান্ত্রিক সংগ্রাম-সুপ্রকাশ রায়)। কুমারখালী প্রাচীন মসলিন ব্যবসা কেন্দ্র। কুমারখালীকে কেন্দ্র করে এতদ্বাঞ্চলে বস্ত্রশিল্পের প্রসার ঘটে। এ সব তাঁতশিল্পীরা ছিল মুসলমান। এভাবে তাঁতশিল্পীদের দ্বারা মুসলিম বসতি বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে কুমারখালী কেন্দ্রের তাঁতশিল্পীরা বিভিন্ন দাবি নিয়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে। তাদের প্রধান নায়ক ছিলেন বলাই ভিখিরী, দুনি ও ফকীর চাঁদ (ভারতের কৃষক বিদ্রোহ, পৃষ্ঠা—৬২)। কুমারখালীর তাঁতশিল্পীদের বর্তমান সম্প্রদায়ভুক্ত সবাই মুসলমান এবং তারা বংশ পরম্পরায় এ পেশায় অভ্যস্ত। তাঁতশিল্পীগণ এ অঞ্চলে ইসলাম প্রসারের অন্যতম শ্রেণী।

**যে সমস্ত পীর আউলিয়ার দ্বারা অত্র অঞ্চলে ইসলাম প্রসার লাভ করে**

দ্বাদশ শতাব্দীর পর বাবা আদম শহীদ, শাহ সুলতান রুমি, মাহিসওয়ার, মখদুম শাহদ্দৌলা, শায়ক জালালুদ্দির তাবরেজী, শাহ ফরীদ, হযরত শাহ জালাল সহ অনেক পীর আউলিয়ার প্রভাবে বাংলায় ইসলাম প্রসার লাভ করে। রাজবাড়ি জেলায় যে সমস্ত পীর আউলিয়ার মাজার রয়েছে তারমধ্যে শেখআরায় সাহ পাহলোয়ান ও পদমদিতে সাহ সাদুল্লার মাজার, দক্ষিণবাড়ি (পদমদি) মনুমিয়া ও ছনু মিয়ার মাজার, রাজবাড়ির আলাদীপুরে পীরজঙ্গী মাজার, দ্বাদসী হুজুরের খোদাই দরগা, কসবা মাঝাইল সাহ সাহেবের মাজার, বেলগাছি বাড়াইজুরীর সাহ সাহেবের মাজার, পাংশার শাহ জুইয়ের মাজার, বালিয়াকান্দি হুজুরের মাজার সেই সমস্ত ধর্ম প্রচারক আউলিয়াদের স্মৃতি চিহ্ন বহন করে।

রাজবাড়ি জেলায় পীর খানজাহান আলীর ইসলাম ধর্ম প্রচার ও মুসলিম প্রসারে তার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। রাজা গনেশের শাসনের পর দক্ষিণবঙ্গ অনেক দিন মুসলমান শাসনাধীন ছিল না। এ সময় পান্ডুয়া থেকে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ পর্যন্ত রাজা দনুজমর্দনদেবের অধিকারে ছিল, দনুজমর্দনদেবের মৃত্যু হলে মহেন্দ্র দেব সিংহাসন আরোহন করেন। মহেন্দ্র দেবের (১৪১৮-১৪৩২) অংকিত মুদ্রা দক্ষিণবঙ্গে পাওয়া

গেছে। এরপর মাহমুদ শাহ দক্ষিণবঙ্গ জন্ম করে একান্ত আধিপত্য বিস্তার করেন এবং ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে অন্যতম সৈনিক খানজাহান আলীকে এ অঞ্চলে শাসনভার অর্পণ করেন। খানজাহান আলী তৎকালীন এ অঞ্চলের স্থানীয় রাজাদের সম্পূর্ণ পরাজিত করে খলিফাতাবাদ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

তৎকালীন খলিফাতাবাদ, ফতেহবাদ হতে মাহমুদ শাহের নামে উৎকীর্ণ মুদ্রা পাওয়া গেছে। পীর খানজাহান আলী খলিফাতাবাদ, ফতেহবাদ রাজ্যে ইসলাম প্রচারে ব্রতী হন এবং সৈনিক খানজাহান আলী পীর খানজাহান আলীতে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে শিষ্য ও সহচর প্রেরণ করেন। এদের মধ্যে গরিব শাহ দেওয়ান, এই বনি শাহ, ফতেহ খান, পীর জয়ন্তী, মজনুশাহ, পীর আলী, ইসলাম প্রচারে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। তাদের অনেকে খানজাহান আলীর ইসলাম প্রচারের সৈনিকরূপে দায়িত্ব পালন করেন। তারা ইসলাম প্রচার ও জনকল্যাণে রাস্তাঘাট, মসজিদ, দীঘি, পুকুর খনন করেন।

## গায়েবি মসজিদ (তৎকালীন সময়ে ইসলাম প্রচারের নিদর্শন)

কালুখালীর অনতিদূরে একটি মসজিদ রয়েছে যা গায়েবি মসজিদ বলে পরিচিত। এ মসজিদটির অর্ধেক মাটির নিচে বসে গেছে এবং পাশের পুকুরটিও ভরাট হয়ে গেছে। উক্ত মসজিদের ইটের আকৃতি দেখে বোঝা যায় তা ৫০০/৬০০ বছর পূর্বের। এ মসজিদের ইতিহাসের সাথে পরিচিত নয় বলেই সাধারণ মানুষ মনে করে গায়েবি বা অলৌকিকভাবে মসজিদটি তৈরি হয়েছিল। এ গায়েবি মসজিদ এ অঞ্চলে প্রাচীনকালের ইসলাম প্রচারের নিদর্শন। হয়ত পীর খানজাহান আলীর শিষ্যবর্গ এ মসজিদ তৈরি করে থাকবে। এর অনতিদূরে বাড়াইজুরীতে রয়েছে সাহ সাহেবের মাজার। খানজাহান আলীর অন্যতম এক শিষ্য গরিব শাহ দেওয়ানের অনেক কাহিনী এ অঞ্চলে বিবৃত আছে। ড. গোলাম সাকলায়েনের বর্ণনা মতে শাহ গরিবুল্লা শাহ আজমত উল্লার জৈষ্ঠ্য পুত্র। তিনি হুগলী জেলার কানাদামোদর নদীর তীরের আস্তানায় থাকতেন। এ গরিবুল্লাহ জঙ্গনামা, সোনাভান, ইউসুফ জোলায়খার পুঁথিপ্রণেতা। প্রকৃতপক্ষে যে গরিব সাহ দেওয়ানের কাহিনী এ অঞ্চলে প্রচলিত ইনি তিনি নন। এ গরিব সাহ দেওয়ান মাগুরা অঞ্চলের বলে জানা যায় এবং তিনিও খানজাহান আলীর শিষ্য। খানজাহান আলীর আর এক শিষ্য পাড়ালী বা পেড়লীর কথাও এ অঞ্চলের লোকমুখে শুনা যায়। শেখআড়া গ্রামে সুদুর বাগদাদ থেকে আসেন জবরদস্ত পীর সাহ পাহলোয়ান। তার পরপরই আসেন সাহ সাদুল্লা। তৎকালীন শেখআড়া, খালকুলা, পদমদি, রাজধরপুর, কালুখালী অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা যায়। উল্লেখ্য, সাহ পাহলোয়ান বাংলা সাহিত্যের প্রবাদপুরুষ মীর মশাররফ হোসেনের পূর্ব পুরুষ।

## সাহ পাহলোয়ান

(১৪৮০-১৫১০ এর মধ্যে আগমন ঘটে)
সাহ সাদুল্লা- (জামাই)
পুত্র-কুতুবুল্লা (সাদুল্লার প্রোপুত্র)
পুত্র-ওমর দারাজ

পুত্র-মীর এবরাহিম
পুত্র-মীর মোয়াজ্জেম
পুত্র-মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭)
তথ্য সূত্র : (মীর মশাররফ রচনা সম্ভার ৫ম খন্ড পৃষ্ঠা-৫৯)।

মীর মশাররফ হোসেন আমার জীবনী গ্রন্থে লিখেছেন তার পূর্ব পুরুষ সাহ সাদুল্লার এ অঞ্চলে আগমন ঘটে। তার জন্মেরও প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে। মীর মশাররফ হোসেনের জন্ম ১৮৪৭ সালে। সে হিসেবে ১৮৪৭-২৫০ = ১৫৯০ এরও অনেক পূর্বে সাহ পাহলোয়ানের আগমন।

মীর মশাররফ হোসেনের বর্ণনামতে ১৪৮০ থেকে ১৫১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সাহ পাহলোয়ান বোগদাদ শরীফ পরিত্যাগ করে ফরিদপুর অঞ্চলে এসে চন্দনা নদীর তীরে বাসস্থান নির্মাণ করে আল্লাহর উপাসনা করেছিলেন। এ সমস্ত তাপস প্রবরের তপস্যার উপযুক্ত স্থান নির্জ্জনতার প্রয়োজন। মীর মশাররফ হোসেনের কথায় "বঙ্গে সে সময় জনমানবের বসবাস অত্যন্ত কম ছিল। তপস্যা ও সে সাথে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি এ স্থানে আগমন করেন"। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে তৎকালীন সময়ে সেকাড়া, খালকুলা, রাজধারপুর অঞ্চলে মুসলিম বসতি স্থাপিত হয়েছে। এ তাপস প্রবরের প্রভাবে ইসলাম প্রচার বৃদ্ধি পায়। পীর খানজাহান আলীর তিনি ছিলেন উত্তরসূরী। চন্দনা নদীর উত্তর দিকে সেকাড়া গ্রামে এ তাপস প্রবরের কবর বিদ্যমান। কথিত আছে তার মৃত্যুর সময় তিনি শিষ্যদের তার কবর পূর্ব পশ্চিম লম্বালম্বি দিতে বলেছিলেন। তার শিষ্যবর্গ তার মৃত্যুর পর প্রচলিত বিধান মতে যথানিয়মে তাকে কবরস্থ করেন। কিন্তু সকালে দেখা গেল তার কবর ঘুরে পূর্ব-পশ্চিম লম্বালম্বি হয়েছে। সাহ পালোয়ানই রাজবাড়ি অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের ভিত রচনা করে গেছেন। আজও এ অঞ্চলের মানুষ সাহ পালোয়ানের নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

**সাহ সাদুল্লাহ**

সাহ সাদুল্লাহ মীর মশাররফ হোসেনের পূর্বপুরুষ। মীরের বর্ণনায় "জগত বিখ্যাত বোগদাদ নগর হতে তাপস প্রবর সাহ সাদুল্লা ভ্রমণ করতে করতে ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ ভ্রমণ করতে করতে বঙ্গদেশ, বঙ্গদেশ ভ্রমণ করতে করতে অধুনায়তন ফরিদপুরের অন্তর্গত সেকাড়া গ্রামে উপস্থিত"। তার সময়কাল ১৫০০ শতকের মাঝামাঝি। তিনি লিখেছেন সৈয়দ সাদুল্লাহ একা আসেন নাই। তার সাথে বিস্তর লোক ছিল। তার বর্ণনায় শুধু শিষ্য সেবকের কথাই নাই, রজক, নরসুন্দর পর্যন্ত ছিল। সাদুল্লাহর পূর্ববঙ্গে আসার দুটি কারণ ছিল– এক সাদুল্লার ইচ্ছা ধর্ম প্রচার, দুই তার পিতার সন্ধান করা। সাদুল্লাহর পিতা ছিলেন সাহ পাহলোয়ানের গুরু। সেকাড়ায় সাহ পালোয়ানের অবস্থানের কথা জানতে পেরে তার পিতার খোঁজ করা যাবে এবং ইসলামের প্রচারও সম্ভব হবে এসব উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি সেকাড়ায় আগমন করেন। সাহ সাদুল্লাহ আর ফিরে যান নাই। সাহ পাহলোয়ানের মেয়ের সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং সেকাড়াতেই থেকে যান। সাদুল্লারই বংশীয় মীর মশাররফ হোসেন এবং এ কাহিনী তার রচিত, 'আমি কে?' নিবন্ধে উল্লেখ আছে। সাহ পাহলোয়ান, সাহ সাদুল্লাহ ও তাদের শিষ্যবর্গের প্রভাবে এ অঞ্চলে ইসলামের প্রসার ঘটে।

### মনুমিয়া ও ছনুমিয়া

রাজবাড়ি জেলার দক্ষিণবাড়ি গ্রামে মনুমিয়া ও ছনুমিয়া তাপস প্রবরের কবর। এই তাপস প্রবরের দুই ভাই সাহ পাহলোয়ানের শিষ্য ছিলেন এবং ইসলাম ধর্ম প্রচারে ব্রতী এই দুই সাধকের অনেক মাজেযার কাহিনী এ অঞ্চলে প্রচলিত আছে। মনুমিয়া ছনুমিয়া পদ্মায় ডুবন্ত এক নৌকা বদনার মধ্যে হাত দিয়ে উদ্ধার করেন এমন কাহিনী এ অঞ্চলে প্রচলিত।

### দ্বাদশি খোদাই দরগা কামাল সাহ হুজুর পাক

রাজবাড়ি শহর থেকে রেল লাইন ধরে পূর্বদিকে এক কিলোমিটার দূরে দ্বাদশি খোদাই দরগা। কথিত আছে রাজবাড়ি রেল লাইন ১৮৯০ সালে গোয়ালন্দ ঘাট পর্যন্ত স্থাপনের সময় জঙ্গলের মধ্যে দরগাটির সন্ধান মিলে। সেই হতে দরগাটি এ অঞ্চলের ধর্মপ্রাণ মানুষ খোদাই দরগা নামে কামাল সাহ আউলিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আসছে। ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ষোড়শ শতকে এতদাঞ্চলে তিনি আগমন করেন।

### কোমরপুর পীরজঙ্গী মাজার

রাজবাড়ি হতে ৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে রাজবাড়ি ফরিদপুর রাস্তার মোড়ে আহ্লাদীপুর। নাম শুনেই মনে হয় আনন্দে বিভোর প্রাচীন পুরের সমন্বয়ে এ গ্রামের নাম। এর পাশেই কোমরপুর আর কোমরপুরের পাশেই সুতানদী। ধারণা করা যায়, এ সুতানদী এক সময়ে হড়াইয়ের শাখা প্রবাহ। কথিত আছে, জনৈক পীর এ সুতানদী হেঁটে পার হয়ে আসার সময় গভীর নদীটির পানি পীরের কোমর সমান হয় আর তা থেকে কোমরপুর। এই পীরই পীরজঙ্গী। গল্পটির সত্যতা যাই হোক পীরজঙ্গী সত্য পীর। শত শত মানুষ এ পীরের কাছে জীবন্ত। তার নামের শেষে জঙ্গী হওয়ার ইতিহাস রয়েছে। তৎকালীন সময়ে ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে পীর আউলিয়াদের অনেক বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হত। ক্ষেত্র বিশেষে ধর্মপ্রচারের জন্য লড়াই করত। ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি প্রতিকূল পরিবেশের সাথে লড়াই করেছেন, লড়াই করেছেন মন্দ সকলের বিরুদ্ধে। তাই তিনি পীরজঙ্গী। তিনি ঠিক কখন, কোন সময়ে এসেছিলেন তার ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে স্থানটির প্রাচীনত্ব বিশেষ করে আহ্লাদীপুর, কোমরপুর এই পুরের নির্দেশ মনে হয় জায়গাটি তুলনামূলকভাবে অনেক পুরাতন। সুতানদীটিও এখন মৃত। শুধু নদীর রেখাটি বর্তমান রয়েছে। তিনি ও সাহ পাহলোয়ান ও সাহ সাদুল্লাহর সমসাময়িক। ১৫০০ শত খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি বা শেষে বাগদাদ থেকে ধর্ম প্রচারে এসেছিলেন। কালের এ প্রান্তে এসে ধর্মপ্রচারকদের সমাধি দরগা ক্ষেত্র বিশেষে আখড়ায় পরিণত হয়েছে। এ সমস্ত দরগা বা আখড়ার ভক্তকুল ধর্মীয় সাধারণ আচরণ থেকে কিছুটা ভিন্নাচারে অভ্যস্ত। ধর্মান্তরিত অনেকে স্বধর্মাচরণের সাকার আরাধনায় মাজারের মাধ্যমে অতিন্দ্রীয় অনুভব খুঁজতে থাকে। যে কারণে মাজার সকল এক প্রকার ধর্মাচারণের ক্ষেত্র হয়েছে। অথচ যার মাজার তিনি অদ্বৈতবাদের ইসলাম প্রচারের এক মধ্যমণি। তবে সকল মাজার এ পরিগ্রহ গ্রহণ করে নাই। রাজবাড়ি জেলার বিখ্যাত মাজার সাহ পাহলোয়ান, সাহ সাদুল্লাহ, মনুমিয়া, ছনুমিয়ার মাজারে এরূপ পরিগ্রহ নাই। পীর জঙ্গী মাজার, দ্বাদসী মাজারে এরূপ পরিগ্রহ রয়েছে। ড. রহিমের মতে মাজারে ধর্মাচারণের এ পরিগ্রহ ব্রিটিশকাল হতে শুরু করেছে।

**শাহ্ জামাল রহমতউল্লা**

বেলগাছি রেল স্টেশন থেকে আধা কিলোমিটার উত্তরে ভেড়ীবাঁধ রাস্তার পার্শ্বে বাজার। এই বাজার থেকে আধা কিলোমিটার দূরে শাহ্ জামাল রহমতউল্লা খোশবাড়ি দরগা শরীফ। এই আউলিয়ার সপ্তদশ শতকে আগমন করেন বলে জানা যায়। তার আগমনে এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ঘটে। পদ্মা নদী ভাঙতে ভাঙতে কয়েকবার মাজার পর্যন্ত এসে আবার দূরে সরে যায়।

**নিয়ামতউল্লা সাহ্**

বেলগাছির পুরাতন বাজারের সন্নিকটে নিয়ামতউল্লা সাহ সাহেবের মাজার। এই আউলিয়ার দ্বারা অত্র অঞ্চলে ইসলাম প্রসার লাভ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই আউলিয়ার আগমন ঘটে বলে জানা যায়।

**শাহ জুঁই**

পাংশা থানার পাংশা পৌরসভায় পুরাতন বাজারে শায়িত আছেন সাধক প্রবর শাহ জুঁই। শাহ জুঁই ষোড়শ শতকে সুদূর আফগান থেকে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এ এলাকায় আগমন করেন। পাংশা তখন পাংশা ছিল না, পাংশা নারায়ণপুর বলে পরিচিত ছিল। চন্দনা নদী তখন গঙ্গার প্রবাহ বুকে নিয়ে খরস্রোতা ও বেগবান। কথিত আছে পাংশা এলাকার এই চন্দনা নদীতে প্রচুর পাঙ্গাশ মাছ পাওয়া যেত। এ পাঙ্গাশের কারণেই নারায়ণপুর পাঙ্গাশী রূপান্তরে পাংশা বলে পরিচিত হয়। ১৮৭২ সালে রেল স্থাপিত হওয়ার সময়ে পাংশা স্টেশন নাম দেখা যায়। তাতে বোঝা যায় পাংশা নাম তারও পূর্ব থেকে প্রচলিত। এই পাঙ্গাশ এলাকার নাম শুনে কথিত জনপদে দরবেশ শাহ্ জুঁই এর আগমন ঘটতে পারে। তার সাহচর্যে পাংশা এলাকায় ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটে। তার মাজারটি বর্তমানে স্থানীয়ভাবে সংরক্ষিত। পাংশার দেড় কিলোমিটার দূরে আরো একটি মাজার রয়েছে। ধারণা করা যায় এ মাজারটিও কোন তাপস প্রবরের যিনি ধর্ম প্রচারের স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

**অন্যান্য পীর আউলিয়া**

নলিয়া মাজার: নলিয়া মাজার গাজী সাহেবের মাজার বলে পরিচিত। মাগুরা জামালপুর থেকে উত্তরে নটাপাড়া বাজারের পূর্বে এ মাজারটি অবস্থিত।

**কসবা মাঝাইল সাহ্ সাহেবের মাজারঃ** কসবা মাঝাইল থেকে দেড় কিলোমিটার পশ্চিমে সাহ্ সাহেবের মাজার অবস্থিত। মাঠের মধ্যে অবস্থিত এ মাজারটিতে প্রতিনিয়ত ভক্তপ্রাণ মানুষের আগমন ঘটে।

**শিকজান সাহ্ মোহাম্মদ পালোয়ান আনসারী** : মৃগী অঞ্চলে অবস্থিত শিকজান অতি পুরাতন গ্রাম। এ গ্রামের ঐতিহ্য প্রাচীনকাল থেকেই জানা যায়। এ গ্রামের জবরদস্ত আউলিয়ার সাহ মোহাম্মদ পালোয়ান আনসারী পলাশীর যুদ্ধের কিছুকাল পরে পশ্চিম দেশ থেকে এ দেশে আগমন করেন এবং শিকজান গ্রামে বসবাস শুরু করেন। সাহ আতিকুল্লাহ ওরফে শিতল সাহ উক্ত দরবেশের পুত্র এবং এতদাঞ্চলে ইসলাম প্রচারে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

এতদ্ব্যতীত খানকানাপুরের কবুল সাহ্, সোনাকান্দরের সাহ্ আব্দুল লতিফ, উজানচর গোয়ালন্দের সাহ্ এলেম মুন্সি, পাঁচুরিয়ার আরব সাহ সাম্প্রতিক কালে এতদ্বাঞ্চলে ইসলামের খেদমত করেছেন।

এ জেলার পার্শ্ববর্তী এলাকার আউলিয়াবৃন্দ যাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে এ অঞ্চলে ইসলামের প্রসার ঘটেছে

**পীর জয়ন্তী** : রাজবাড়ি জেলার দক্ষিণে গড়াই নদী পার হলেই মাগুরা জেলা। রাজবাড়ির দক্ষিণে নাড়ুয়া থেকে ৮/৯ মাইল দূরে মাগুরাতে পীর জয়ন্তী নামে এক নব দীক্ষিত মুসলমান অনেককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। তার দরগা এখনও আম্মাবাড়ির দরগা বলে পরিচিত। পীর জয়ন্তীর নাম রাজবাড়ি জেলার দক্ষিণাঞ্চলে অনেকের মুখে শোনা যায়। ধারণা করা যায়, এ পীরের প্রভাবে মাগুরা জেলা সংলগ্ন এলাকায় ইসলাম প্রসার ঘটে।

**শাহ্ ফরীদ** : শাহ ফরীদ (রাঃ) যার নামে ফরিদপুর জেলার নাম হয়েছে ফরিদপুর। শাহ ফরীদ মতান্তরে শেখ ফরিদ। এই মহাতাপসের আগমন সম্বন্ধে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। জেমস টেলর (Topography of Dhaka) পদ্মা নদী সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে দেখা যায় ২০০ বৎসর পূর্বে পদ্মা নদী তার দরগার নিকট দিয়ে প্রবাহিত হত। পদ্মার তখন ভাঙা-গড়া চলছিল। পদ্মা ভাঙতে ভাঙতে দরগা পর্যন্ত এসে আবার ফিরে যায়। এ হিসেবে তার আগমন ৪০০ বৎসর পূর্বে যা ষোড়শ শতকে হবে। রাজবাড়ি জেলার ফরিদপুর সংলগ্ন এবং এককালের ফরিদপুরের মহকুমা। রাজবাড়ির পূর্বাঞ্চলে এ মহাতাপসের প্রভাবে ইসলাম ধর্মের প্রচার ঘটে।

**মখদুম শাহ দৌলাহ শহীদ** : পাবনা জেলার শাহজাদপুরে মখদুম শাহ দৌলার মাজার দৃষ্ট হয়। এই সুফীর কাল নির্ণয় করা দূরহ্। ড. করিমের মতে তুর্কী আক্রমনের পরে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তার আগমন ঘটে। রাজবাড়ির উত্তরাঞ্চল বিশেষ করে পাংশার উত্তরাঞ্চলে এ সুফীর প্রভাব এসেছিল।

# রাজবাড়ি জেলার মানস সম্পদ

## বাবু মল্লিক

৬ষ্ঠ শতকে এই ভূখণ্ডে বৌদ্ধ ধর্মীয় নরপতিদের শাসনামলে রাজা শশাঙ্কের রাজত্বকালে চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ান চুয়াং বাংলাদেশ ভ্রমণ করে যে বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে জানা যায়, তৎকালে বঙ্গরাজ্য কামরূপ, পুণ্ড্র বর্ধন, কর্ণ সুবর্ণ, সমতট ও তাম্রলিপি এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল। যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চল ছিল এই পঞ্চরাজ্যের সমতট রাজ্যভুক্ত। বর্তমান বৃহত্তর ফরিদপুরের কেদারপুর গ্রামে আবিস্কৃত ইদিলপুর পট্টলিতে বিক্রমপুর, হরিকেলের চন্দ্রবংশীয় রাজা শ্রীচন্দ্রের 'কুমার তালব মন্ডল' এবং 'সতট পদ্মাবতীর বিষয়ে' এক খণ্ড ভূমিদানের কথা জানা যায়। ঐতিহাসিক ড. নীহার-রঞ্জন রায় এই 'কুমার তালব মন্ডলকে কুমার মধুমতি বা গড়াই নদী এবং 'পদ্মাবতী'কে পদ্মানদী বুঝিয়েছেন। এই দু'নদীর মধ্যবর্তী ভূমি বা ভূখণ্ডই প্রাক্তন গোয়ালন্দ মহকুমা অঞ্চল বা রাজবাড়ি বলে পরিচিত।

পদ্মা, গড়াই, মধুমতি, চন্দনা বিধৌত নবসৃষ্ট রাজবাড়ি জেলা। বৃহত্তর ফরিদপুরের সাবেক গোয়ালন্দ মহকুমার সদর দফতর রাজবাড়ি ১৯৮৩ সালের ১ মার্চ থানা থেকে মহকুমায় উন্নীত হয়। দশম ও একাদশ শতকে রাজবাড়ি এলাকা ছিল পাল বংশ শাসিত। ১২০৩ সালে লক্ষ্মণ সেনের পতনের অনেক পরে এই এলাকা মুসলিম শাসনে আসে। ১৪শ শতকে ফতেহাবাদ পরগণার অধীন এই এলাকা মুহম্মদ তুঘলকের শাস-নাধীন হয়। তৎপরবর্তীকালে জেলার পাংশা ও বালিয়াকান্দি থানা কখনও কখনও নাটোরের মহারাজা, নড়াইলের জমিদার এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিলাইদহের কুঠিবাড়ি জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় (১৭৮৬-১৭৯৩ সাল) থেকে গোয়ালন্দ মহকুমা তথা রাজবাড়ি জেলার অংশ বিশেষ পাবনা ও যশোরের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং অবশিষ্ট অংশ ঢাকা ও জামালপুরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। লর্ড ডালহৌসির সময়ে ১৮৫০ সালে গঠিত হয় ফরিদপুর জেলা। ১৮৭১ সালে ফরিদপুর থেকে আলাদা হয়ে গোয়ালন্দ, রাজবাড়ি, পাংশা, বালিয়াকান্দি থানা নিয়ে গঠিত হয় গোয়ালন্দ মহকুমা। পরবর্তীকালে এর কোন কোন অংশ ঢাকা ও কুষ্টিয়ার (সাবেক নদীয়া) সঙ্গে বিযুক্ত হয়ে গোয়ালন্দ মহকুমা যে ভৌগোলিক সীমারেখায় অবতীর্ণ হয় তাই নিয়ে আজকের রাজবাড়ি জেলা।

**ভৌগোলিক অবস্থান :** উত্তর-পূর্ব দিকে পদ্মানদী, পশ্চিমে কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও গড়াই নদী এবং দক্ষিণে ফরিদপুর জেলার সদর ও মধুখালী থানা।

৫টি উপজেলা (সদ্য ঘোষিত কালুখালীসহ), ৩টি পৌরসভা, ৪টি থানা ও ৪২টি

---

* বাবু মল্লিক জেলার প্রথম সংবাদপত্র 'সাপ্তাহিক অনুসন্ধান' ও প্রথম দৈনিক 'সহজ কথা'র সম্পাদক ও প্রকাশক। তিনি রাজবাড়ি জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি। লেখাটি এই গ্রন্থের সম্পাদকের অনুরোধে এই গ্রন্থের জন্য বিশেষভাবে রচিত।

ইউনিয়ন নিয়ে বাংলাদেশের মানচিত্রের ঠিক মাঝখানে রাজবাড়ি জেলার অবস্থান।

**অতীত ঐতিহ্য ও গুরুত্ব :** রাজবাড়ি মূলত পদ্মাবিধৌত এলাকা। হাজার বছর পূর্ব থেকে এখানে পদ্মানদীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। পদ্মার ভাঙ্গা গড়ার সাথে সাথে এখানকার অর্থনীতি ও জীবন জীবিকার অবলম্বন পরিবর্তিত হয়েছে যুগ যুগ ধরে। পদ্মানদী যেমন এখানকার সভ্যতা ও জনপদ গড়েছে তেমনি ভেঙেছে বারবার। গোয়ালন্দ ঘাট ছিল একটি বিখ্যাত নদীবন্দর। দেশের শ্রেষ্ঠ মাছ রফতানির সুখ্যাতি ছিল বহুকাল ধরে। জেলেদের বড় বড় জালে ধরা পড়ত হাজার হাজার ইলিশ মাছ। পদ্মার ইলিশের লোভ-নীয় স্বাদ ভারতবর্ষব্যাপী ভোজনপ্রিয়দের মুখে মুখে ফিরত। এই ইলিশের রুপালি ঝিলিক দেখে কবি বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'ইলিশ' কবিতাটি রচনা করেছিলেন। প্রতিদিন বহু লঞ্চ, বড় বড় জাহাজ নৌযান এসে ভিড়ত এখানে। প্রতিদিন ট্রেনের হুইসেল, যাত্রীর ওঠানামা, কুলিদের হাঁকডাক আর দেশি-বিদেশি পর্যটকদের ভীড়ে মুখর হয়ে থাকত এই জনপদ।

১৮৫৭ সালে ইংল্যান্ডে গঠিত হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল রেলওয়ে। ১৮৬২ সালে কোম্পানি চালু করেছিল কলকাতা থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত রেল লাইন এবং ১৮৭১ সালে তা বিস্তৃত করা হয়েছিল গোয়ালন্দ ঘাট পর্যন্ত। রাজধানী ঢাকা থেকে সে সময় নদীপথে গোয়ালন্দ এবং গোয়ালন্দ থেকে ট্রেনে চেপে সরাসরি কলকাতা যাতায়াতেই সবচাইতে ভাল যোগাযোগ ছিল। গোয়ালন্দ তথা রাজবাড়িকে বলা হত কলকাতার দ্বারপথ। প্রতিদিন আসাম বেঙ্গল রেলসড়ক ধরে ৩টি মেইল ট্রেন যাতায়াত করতো গোয়ালন্দ-কলকাতা পথে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জীবদ্দশায় মাত্র দুবার ঢাকায় এসেছিলেন। তাঁর জবানিতে ঢাকায় তাঁর অভ্যর্থনাকারীদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন—কলিকাতা হইতে রেলপথে গোয়ালন্দ ঘাট এবং গোয়ালন্দ ঘাট হইতে স্টীমারযোগে ঢাকা পৌঁছাইব। সেই রেললাইন আর স্টেশন ঠিকই আছে নেই শুধু ট্রেন চলাচল। তবে এখনও প্রতি বছর ফাল্গুন মাসে হজরত বড় পীর সাহেবের বংশধরের আবাসস্থল ভারতের মেদিনিপুরে অনুষ্ঠিত ওরশ শরিফে রাজবাড়ি থেকে ১টি স্পেশাল ট্রেন সরাসরি ছেড়ে যায় প্রায় হাজার দেড়েক যাত্রী নিয়ে। এই স্পেশাল ট্রেনটি যাতায়াতের মাধ্যমে উভয় বাংলার বাঙালীদের মধ্যকার যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে যা তার ধারাবাহিকতা রক্ষায় এখনও রাজবাড়ি রেলস্টেশনটি তাঁর ঐতিহ্য বজায় রেখে চলেছে।

মূলত রেল যোগাযোগেব কেন্দ্র হিসেবেই গোয়ালন্দ তথা রাজবাড়ি জেলা শহরের বিস্তৃতি। রাজবাড়ি-ফরিদপুর রেল লাইনটি একসময় পুকুরিয়া পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। রেল লাইনটি বরিশাল পর্যন্ত যাওয়ার কথা ছিল। অন্যদিকে গোপালগঞ্জের ভাটিয়াপাড়া পর্যন্ত এবং খুলনা দর্শনা ও পার্বতীপুর পর্যন্ত অসংখ্য ট্রেন যাতায়াত করতো। কিন্তু ফরিদপুর রেলপথ বরিশাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়ইনি বরং সঙ্কুচিত হয়েছে। রাজবাড়ি-ফরিদপুর এবং রাজবাড়ি-ভাটিয়াপাড়া রেললাইনে ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়েছে। দর্শনা পর্যন্তও এখন আর সরাসরি ট্রেন চলে না। অন্যান্য লাইনেও ট্রেন সঙ্কুচিত করে মাত্র কয়েকটি ট্রেন চলাচলের মধ্যে সীমিত করা হয়েছে এখানকার রেলব্যবস্থা।

এখনও গোয়ালন্দ তথা রাজবাড়িকে বলা হয় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের দ্বারপথ। দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলে সড়কপথে অন্তত ২২টি জেলার যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম

দৌলতদিয়া ঘাট। তাই রেল সঙ্কোচনের পর দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌপথে পদ্মা সেতু নির্মাণ করার জন্য এ অঞ্চলের মানুষের প্রাণের দাবি ওঠে বারবার। স্বাধীনতার পর সরকারগুলো এই দাবির প্রতি নানাভাবে সমর্থন দিয়েছিল। ২০০১ সালের নির্বাচনের আগে রাজবাড়ির রেলওয়ের মাঠে নির্বাচনী জনসভায় দাঁড়িয়ে বেগম খালেদা জিয়া ভাটিয়াপাড়া ও ফরিদপুর রেল লাইন পুনরায় চালু এবং দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া পদ্মা সেতু স্থাপনের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার করেছিলেন এবং সেবার রাজবাড়ির দুটি আসনেই তার প্রার্থী জয়ী হয়। তিনিও প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু পদ্মা সেতু সরে যায় ভাঙ্গা-মাওয়ায়। কথা হয়েছিল দ্বিতীয় পদ্মা সেতু করার। কিন্তু তার সম্ভাবনা কতটুকু এলাকার মানুষ তা জানে না। তবে প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা আর মন্ত্রীবিহীন এ অঞ্চলের মানুষ এখনও পদ্মা সেতু আর ভাটিয়াপাড়া-ফরিদপুর রেল লাইন চালু হওয়ার অপেক্ষায় দিন গোনে।

**নামকরণ :** রাজবাড়ি নামে আসলে কোন নির্দিষ্ট জায়গার নাম পাওয়া যায়না এবং এর নামকরণ নিয়েও ঐতিহাসিক কোন চূড়ান্ত তথ্য পাওয়া যায়না। পুরনো মানচিত্র অথবা নকশাতে রাজবাড়ি নামে কোন মৌজা খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে বর্তমানে রাজবাড়ি স্থানটি মূলত সজ্জনকান্দা, কাজীকান্দা, বেড়াডাঙ্গা, ভবানীপুর, বিনোদপুর, ধুঞ্চি, লক্ষীকোল গ্রাম নিয়ে গঠিত। লক্ষীকোল গ্রামে রাজা সূর্যকুমার রায় বাহাদুর নামে এক জমিদার ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষ বিশ্ব দিগম্বর প্রসাদ রায় ছিলেন আলীবর্দী খাঁর (মতান্তরে মুর্শিদ কুলী খাঁ) খাজাঞ্চীখানার কর্তা। তার পুত্র প্রভুরাম গুহরায় গোয়ালন্দের এই অঞ্চলে (রাজবাড়ি) জমিদার হিসাবে কর আদায়ের জন্য আসেন। নিঃসন্তান প্রভুরামের দত্তক পুত্র দীনেন্দ্র গুহরায় তাঁর উত্তরাধিকার হন। পরবর্তীকালে নিঃসন্তান বিশ্ব দিনেন্দ্র গুহরায়ের দত্তক পুত্র সূর্যকুমার গুহরায় বাহাদুর উত্তরাধিকার হন এবং নবাব রাজা উপাধি পান। রাজা সূর্যকুমারের বাসভবনটি 'রাজার বাড়ি' নামে পরিচিত হয়। কেউ কেউ মনে করেন রাজা সূর্যকুমারের নাম অনুসারেই এই এলাকার নাম হয়েছে রাজবাড়ি।

দ্বিমত পোষণকারীদের মতে, রাজবাড়ির পার্শ্ববর্তী বাণীবহ জমিদার পরিবারের প্রজা হিতৈষী ছিলেন 'রাজাবাবু'। তিনি রাজনীতিবিদও ছিলেন। ১৮৯১ সালে রাজবাড়ি রেলওয়ে সাব ডিভিশন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজবাড়ি রেলওয়ে স্টেশনটি নির্মিত হয় বানিবহ জমিদার পরিবারের সদস্য রাজাবাবুর সম্পত্তির উপর বিনোদপুর মৌজায়। বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এ্যাডভোকেট চিত্তরঞ্জন গুহ'র মতে রাজবাবুর নামানুসারেই রেলওয়ে স্টেশন তৈরি হয় 'রাজবাড়ি' নামে। যা পরবর্তীকালে রেলকেন্দ্রিক গড়ে ওঠা ক্ষুদ্র শহরে পরিণত হয় এবং রাজবাড়ি নামেই এ এলাকা পরিচিত হয়।

**শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি :** ব্রিটিশ উপনিবেশে শিক্ষা সাহিত্য ও জ্ঞান চর্চায় পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের উজ্জীবিত করার জন্য রাজবাড়ির কৃতি সন্তান নবাব আবদুল লতিফ তৎকালে 'মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি' এবং 'সেন্টাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' গঠন করেন। এছাড়া ১৮০১ সালে কলকাতা 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ' প্রতিষ্ঠার পরপরই এ জেলার পদমদীর জমিদার মীর মোহাম্মদ আলী স্যার সৈয়দ আহমেদের অনুসরণে কুষ্টিয়াতে একটি ইংলিশ হাইস্কুল তথা বাংলাদেশের প্রথম এবং উপমহাদেশের দ্বিতীয় ইংলিশ হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। দেশের আরেকটি প্রাচীন হাইস্কুল 'রাজা সূর্যকুমার ইনস্টিটিউশন' প্রতিষ্ঠিত হয় এখানে ১৮৮৮ সালে। সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতিতে এ জেলায়

কৃতি সন্তান আরও আছেন যারা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অবদান রেখেছেন। সংক্ষেপে এঁদের পরিচিতি দেয়া হল :

**মীর মশাররফ হোসেন :** বালিয়াকান্দি উপজেলার নবাবপুর ইউনিয়নের পদমদী গ্রামে বাংলার প্রথম আধুনিক মুসলিম গদ্যশিল্পী বিষাদসিন্ধু খ্যাত মীর মশাররফ হোসেনের পিতৃভূমি। ১৮৪৭ সালের ১৩ নভেম্বর পার্শ্ববর্তী জেলা কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়া মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করলেও বাল্যশিক্ষা এবং শেষজীবনে সাহিত্য সাধনা এখানেই। ১৯-সালের ১৩ নভেম্বর পদমতীতেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। সরকারি সহায়তায় বাংলা একাডেমীর তত্ত্বাবধানে এখানেই তাঁর বাস্তুভিটায় বিশাল এলাকা জুড়ে গড়ে উঠেছে মীর মশাররফ হোসেন স্মৃতি কমপ্লেক্স।

**মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী :** ১৮শ শতকের শেষভাগে অবিভক্ত ভারতবর্ষে বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশনার ঊষালগ্নে পাংশার কমলা প্রেস থেকে বিখ্যাত 'কোহিনুর' পত্রিকা প্রকাশিত হয় মীর মশাররফ হোসেনের সান্নিধ্য ধন্য মাগুড়াডাঙ্গী গ্রামের চিরকুমার মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরীর সম্পাদনায়। এক সময়ে কলকাতার লারমিনী স্ট্রিট থেকে মুদ্রিত হয়ে ভারতবর্ষব্যাপী প্রচারিত এ পত্রিকাটি বার্মা পর্যন্তও বিস্তৃত ছিল। মহাকবি কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান' কবিতাটি এবং মীর মশাররফ হোসেনের 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' এই পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯০৪ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত 'কোহিনুরের' সম্পাদক ধর্মীয় গোড়ামীর বিরুদ্ধে তৎকালে হিন্দু মুসলিম ঐক্য তথা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে জনমত তৈরিতে ভূমিকা রাখেন।

**এয়াকুব আলী চৌধুরী :** মোহাম্মদ রওশন আলীর মৃত্যুর পর তাঁর অনুজ এয়াকুব আলী চৌধুরী 'কোহিনুর' সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। 'ধর্মের কাহিনী', 'শান্তি ধারা', 'মানব মুকুট', 'নুরনবী' এবং 'দাদুর কাছে ব্যাকরণ শিখি' ইত্যাদি তাঁর সাহিত্য সাধনার উৎকৃষ্ট ফসল। শিক্ষকতার পাশাপাশি রাজনীতি করতে গিয়ে কারারুদ্ধ হন। ১৯৪০ সালের ১৪ ডিসেম্বর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর স্মরণে পাংশার মাগুড়াডাঙ্গী গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এয়াকুব আলী চৌধুরী বিদ্যাপীঠ।

**কাজী আবদুল ওদুদ :** বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে মুক্তচিন্তার অগ্রদূত কাজী আবদুল ওদুদ ১৮৯৪ সালের ২৬ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন পাংশার বাহাদুরপুরের বাগমারা গ্রামে। তাঁকে বলা হতো বাংলার শ্রেষ্ঠ মুসলিম চিন্তাবিদ। তৎকালীন অনগ্রসর বাঙালি মুসলমানদেরকে উজ্জীবিত করতে মুক্তবুদ্ধি চর্চা আন্দোলন শুরু করেন এবং প্রগতিশীল মুসলিম বাঙালিদের সমন্বয়ে ঢাকায় 'শিখা' গোষ্ঠী গড়ে তোলেন। 'মীর পরিবার', 'নদী বক্ষে', কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কবিগুরু গ্যাটে', 'শাশ্বত বঙ্গ', হিন্দু মুসলমানের বিরোধ ইত্যাদি গ্রন্থ তাঁর মুক্তচিন্তার ফসল।

**ড. কাজী মোতাহার হোসেন :** বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের আর এক সহযাত্রী, বিজ্ঞানী ও দাবাড়ু ড. কাজী মোতাহার হোসেনের জন্ম ১৮৯৭ সালে কাজী আবদুল ওদুদের একই গ্রাম বাহাদুরপুর ইউনিয়নের বাগমারায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও জাতীয় অধ্যাপক ড. কাজী মোতাহার হোসেন ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের মুখপত্র 'শিখা'র সম্পাদক ছিলেন। 'সঞ্চয়ন', নজরুলকাব্য পরিচিতি, 'আলোক বিজ্ঞান', তাঁর উল্লেখ যোগ্য রচনা। সেবা প্রকাশনীর প্রতিষ্ঠাতা গোয়েন্দা কাহিনীর লেখক কাজী আনোয়ার হোসেন ও কাজী মাহবুব হোসেন, বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ও সাংস্কৃতিক

ব্যক্তিত্ব অধ্যাপিকা সানজীদা খাতুন, রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী ফাহমিদা খাতুন তাঁর গর্বিত সন্তান। তাঁর স্মরণে পাংশার হাবাসপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কাজী মোতাহার হোসেন মহাবিদ্যালয়।

**কাজী আবুল কাশেম :** অবিভক্ত ভারতে প্রথম মুসলিম চিত্রশিল্পী কার্টুনিস্ট 'দোপেঁয়াজা' পৈতৃক নিবাস পাংশার মৃগী ইউনিয়নের পারকুলা গ্রামে। ১৯১৩ সালের ৭ মে যশোর জেলার উমেদপুরে মাতুলালয়ে তিনি জন্মগ্রহন করেন। ১৯২৬ সালে ফরিদপুরের খ্রিস্টান পাদ্রী রেভারেন্ট বার্বার-এর সহায়তায় কলকাতায় গিয়ে আর্ট স্কুলে ভর্তির সুযোগ পেয়েও বয়স কম বলে ভর্তি হতে পারেননি। ১৯২৮ সালে ২য় বারের মত ভর্তির সুযোগ হলেও অর্থের অভাবে পড়তে পারেননি। কলকাতার মিত্র এন্ড কোং নামে কমার্শিয়াল স্টুডিওতে চাকরি নিয়ে শিল্পীজীবন শুরু। ত্রিশ ও চল্লিশ এর দশক থেকে মাসিক ভারতবর্ষ, বিচিত্র, মোহাম্মদী, বঙ্গলক্ষী, সওগাত, আজাদ ইত্যাদি বহু পত্রিকায় কার্টুন এঁকে ভারতবর্ষব্যাপী পরিচিতি পান। সত্তর এর দশক পর্যন্ত কলকাতা ও ঢাকায় প্রকাশিত বহু গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই উপমহাদেশে মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম ছবি আঁকার কাজ করেন। ঔপন্যাসিক কাজী আবুল হোসেন এবং অনুবাদক ও ছড়াকার কাজী মাসুম তাঁর অনুজ।

**শিল্পী রশিদ চৌধুরী :** চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা এবং বিখ্যাত 'ট্রাপেস্টি' শিল্পের জনক, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের যোগ্য শিষ্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী রশিদ চৌধুরী জন্মস্থান নবগঠিত কালুখালী উপজেলার রতনদিয়ায়। বিশ্বের বহু দেশে তাঁর শিল্পকর্মের নিদর্শন রয়েছে এবং বিশ্বখ্যাত পুরস্কার অর্জন করেছেন। ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৮৬ সালের ১২ ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করলে ঢাকা মীরপুরের শহীদ বুদ্ধিজীবী গোরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

এছাড়া জলতরঙ্গ বাদ্যযন্ত্রের স্রষ্টা ও ফরিদপুর আর্ট কাউন্সিলের অধ্যাপক বামন দাস গুহরায়, সাহিত্যিক পরিমল গোস্বামী, অবন্তী সান্যাল, ঔপন্যাসিক সন্তোষকুমার ঘোষ, নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, রোকনুজ্জামান খান দাদা ভাই, কমল কৃষ্ণ গুহ প্রমুখ এই জেলার কৃতী সংস্কৃতিবান ব্যক্তিত্ব তাঁদের কর্ম ও সাধন-ার মাধ্যমে জেলার ইতিহাস ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে। জীবিতদের মধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের প্রধান আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন চিত্রশিল্পী অধ্যাপক মনসুরুল করিম, কার্টুনিস্ট তোফাজ্জল (তোফা), ড. ফকির আব্দুর রশিদ, কবি হাজেরা নজরুল, অধ্যক্ষ মুহাম্মদ সামসুর রহমান, গীতিকার আলিমুজ্জামান চৌধুরী, ড. মাসুদুজ্জামান, কার্টুনিস্ট কুদ্দুস, কবি মোস্তফা মীর, সাঈদা জামান, জামাল হাবিব, স. ম. শামসুল আলম, ওবায়দুল ইসলাম, কালী কৃষ্ণ গুহ, নাট্যশিল্পী খন্দকার সাইদুল হক খোকন, শহীদুল ইসলাম সাচ্চু, মাহমুদুল ইসলাম মিঠু, শহিদুল ইসলাম মিন্টু, গীতিকার মিল্টন খন্দকার, কাঙালিনী সুফিয়া এবং চিত্রাভিনেত্রী রোজিনা এখনও দেশে-বিদেশে শিল্পসংস্কৃতিচর্চায় অবদান রেখে চলেছে।

**রাজনীতি এবং সংগ্রামে রাজবাড়ি :** রাজবাড়ি ছোট শহর হলেও এর গৌরবোজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে। মূলত বামপন্থী রাজনীতির ক্ষেত্রে এবং প্রতিবাদী দৃষ্টান্ত হিসেবে রাজনীতির মার্কসবাদী আন্দোলন ও বিপ্লবীদের ভূমিকা রয়েছে। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন সংগ্রাম, ভাষা-আন্দোলন, '৭১এর স্বাধীনতা সংগ্রামে এ জেলার অগ্নি

পুরুষদের রয়েছে কালজয়ী অবদান। অনুশীলন পার্টি এবং বামধারার রাজনীতিবিদের মধ্যে যারা উজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিত তুলে ধরা হলো।

**শ্যামেন ভট্টাচার্য :** অবিভক্ত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা কমিটির সম্পাদক (৪৬-৪৭) কমরেড শ্যামেন ভট্টাচার্যের জন্মস্থান বালিয়াকান্দির কোরকদিতে। কোরকদি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে বহুবার কারাবরণ করেছেন। এ অঞ্চলের কমিউনিস্ট নেতা বিপ্লবী সমর সিংয়ের দীক্ষা গুরু ছিলেন।

**খাপড়া ওয়ার্ড আন্দোলনের নেতা আশু ভরদ্বাজ :** গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় জমিদার পরিবারের সন্তান আশু ভরদ্বাজ কমিউনিস্ট আন্দোলনে ব্রতী হয়ে রাজবাড়িতে স্মৃতিশ চক্রবর্তী (খোকন বাবু)র বাড়িতে দীর্ঘকাল অবস্থান নিয়ে এখানেই প্রয়াত হন। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে সন্ত্রাসবাদী অনুশীলন পার্টি থেকে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতি ও আন্দোলন সংগ্রাম করতে গিয়ে তিনবার মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান। প্রথমে ব্রিটিশের চর মারতে গিয়ে ফরিদপুর জজ কোর্টে অপ্রাপ্ত বয়সে ফাঁসির আদেশ, পরে আন্দামানে দ্বীপান্তরী এবং রাজশাহীর জেলখানার খাপড়া ওয়ার্ডের গুলি বর্ষণের হাত থেকে রেহাই পান। ব্রিটিশ সরকার, পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে চিরকুমার এই বিপ্লবীর জীবনের ৩৩ বছর জেলে কাটাতে হয়েছিল।

**সমরেন্দ্রনাথ সিংহ** (মাস্টার মশাই) : পাংশা উপজেলার শহরের পুরান পাংশা গ্রামে জমিদার কর্মচারী ও রাজবাড়ি উকিল ব্যাংকের সর্বশেষ কর্মকর্তা উপেন সিংহের পুত্র সমরেন্দ্র নাথ সিংহ ১৯২১ সালে গোয়ালন্দ মডেল হাই স্কুল (জেলা স্কুল) থেকে এন্ট্রান্স পাশের পর রাজেন্দ্র কলেজের ছাত্রাবস্থায় অল ইন্ডিয়া ছাত্র ফেডারেশনের তৎকালীন ফরিদপুর জেলার অন্যতম নেতা দর্শনশাস্ত্রে অনার্সের ছাত্র থাকাকালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে ব্রিটিশের কারাগারে বন্দী হন। একনাগাড়ে জেল কেটে '৪৭এ মুক্তি পেয়ে '৪৯ এ পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে '৫২এর পরে মুক্তি পান। '৫৮ তে আইয়ুবের সামরিক শাসন জারির প্রথম দিনেই রাজবাড়ির জাহ্নবী কুণ্ডুর বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার হয়ে '৬৩তে মুক্তি পান। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন দ্বিধাবিভক্তির শুরুতেই তিনি বিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি (হক-তোহা) র কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে অংশ নেন। '৬৫ সালে রেল ধর্মঘটে গ্রেপ্তার হয়ে '৬৭তে মুক্তি পান। ৭/৮ মাস পরে আবার গ্রেপ্তার হয়ে '৬৯ এ মুক্তি পাওয়ার ঢাকায় পল্টন ময়দানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এই বিপ্লবীসহ অন্যান্য কারামুক্ত কমিউনিস্টদের গণসংবর্ধনা প্রদান করে। '৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের ক'দিন আগে আত্মগোপনে চলে যান। আত্মগোপন অবস্থায় ৭৫ সালের ৭ নভেম্বর রাজবাড়ির উড়াকান্দা গ্রামে মৃত্যুবরণ করেন। আফ্রিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর লিখিত তাঁর 'তিনটি আগুনের ফুল' সাপ্তাহিক জনতায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত রচনা একটি ঐতিহাসিক দলিল। মাস্টার মশাই নামে তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন।

**প্রফুল্ল কর্মকার :** রাজবাড়ি কাপড় বাজারের সাবেক প্রসিদ্ধ রাধেশ্যাম জুয়েলার্সের মালিক রাধেশ্যাম কর্মকারের কনিষ্ঠ পুত্র প্রফুল্ল কর্মকার প্রথম জীবনে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে টেররিস্ট গ্রুপে যোগ দেন। পরে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ফরিদপুর

জেলা সম্পাদক হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ব্রিটিশ সরকার তাকে কারারুদ্ধ করে। '৪৭ এর ১৪ আগস্ট দেশভাগের পর কারামুক্ত হয়ে আত্মগোপনে যান। '৫০ সালের আগে ধুঞ্চির রুস্তম আলী খানের বাড়ি থেকে আত্মগোপণরত অবস্থায় গ্রেপ্তার হয়ে '৫৪ এর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের পর মুক্তি পান। '৫৭ সালে অসুস্থ অবস্থায় দেশত্যাগ করেন।

**সত্য মৈত্র** : বালিয়াকান্দির কোরকদীর প্রখ্যাত সান্যাল পরিবারের সন্তান। সাহিত্যিক অজিত সান্যাল, আকাশবাণীর সংবাদ পাঠিকা নীলিমা সান্যাল ও কলকাতা মোহনবাগানের ফুটবলার মিহিব সান্যালের বোন পো। ব্রিটিশের শাসনামল থেকে কমিউনিস্ট আন্দোলনে এ অঞ্চলের নেতৃত্ব দেন। ষাটের দশকে কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙনে তিনি পিকিংপন্থী আন্দোলনে যোগ দেন। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন করতে গিয়ে বহুবার কারাভোগ করেন। '৬৩ সালে রেল ধর্মঘট করতে গিয়ে আইয়ুবের সামরিক শাসনামলে সাজা প্রাপ্ত হন। '৬৯ সালের পর মুক্ত হয়ে '৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর আত্মগোপনে চলে যান। এখনও আত্মগোপনে থেকে জাতীয় গণফ্রন্টের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে রাজনীতি পরিচালনা করে আসছেন।

**মনমোহন ভাদুড়ি** : 'নেতাজী সুবাস বলছি' গ্রন্থের ক্যাপ্টেন ভাদুড়ি চরিত্রটি মনমোহন ভাদুড়ির অনুকরণে লিখিত। বোয়ালমারীর ভাদুড়ি পরিবারের সদস্য, আজাদ হিন্দ ফৌজের বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলে সদস্য সংগ্রহের দায়িত্বে রাজবাড়িতে দীর্ঘকাল অবস্থান করেন। ১৯৪৬ সালে কলিংপঙ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন হিসেবে নেতৃত্ব দেন। যুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের পর আত্মগোপনে রাশিয়া যান। '৪৭ এর যুদ্ধের পর রাজবাড়িতে এসে বেড়াডাঙ্গা গ্রামে জাহ্নবী কুন্ডুর বাড়িতে অবস্থান নিয়ে কমরেড সমর সিংহের সাথে বাম রাজনীতিতে অংশ নেন। '৬১ সালে কলকাতায় প্রখ্যাত 'মোহন প্রকাশনালয়' বসে প্রগতিশীল সাহিত্যচর্চা করেন। সেখানেই ১৯৬৪ সালে ৯৪ বছর বয়সে তিনি মারা যান।

**শান্তি রঞ্জন সেন** : কমিউনিস্ট নেতা শান্তিরঞ্জন সেন শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ থেকে তৎকালীন রেলওয়ে সাব ডিভিশন রাজবাড়িতে এসে শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেন।'৬৫ সালের শ্রমিক ধর্মঘটে অংশ নিয়ে পাঁচুরিয়া রেলস্টেশন থেকে গ্রেপ্তার হন। '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের পর কারামুক্তি পেলে এ অঞ্চলের অন্যান্য কমিউনিস্ট নেতা সমর সিংহ, সন্তোষ ব্যানার্জি প্রমুখের সঙ্গে তৎকালীন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ পল্টন ময়দানে তাদের সংবর্ধনা প্রদান করে।

**মোখলেছুর রহমান** : বাবার পুলিশি চাকরির সুবাদে গোপালগঞ্জ থেকে এসে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মোখলেছুর রহমান রাজবাড়িতে অবস্থানকালে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়ে '৪৭-এর আগে গ্রেপ্তার হন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কমরেড মোখলেছুর রহমান রাজবাড়িতে কমিউনিস্ট পার্টি, রেলশ্রমিক ইউনিয়ন, ছাত্র ইউনিয়ন ও ন্যাপ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সিপিবির জেলা সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির কন্ট্রোল কমিশনের সদস্য ছিলেন। ব্রিটিশ শাসনামল, পাকিস্তানের স্বৈরশাসন ও স্বাধীন বাংলাদেশ আমলে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন করতে গিয়ে বহুবার কারাবরণ করেন।

**কমল কৃষ্ণ গুহ** : '৬২ সালে তৎকালীন গোয়ালন্দ মডেল হাইস্কুল থেকে এসএসসি পাশ করার পর ফরিদপুর সরকারি রাজেন্দ্র কলেজে ছাত্রাবস্থায় ছাত্র ইউনিয়নে যোগ

দেন। '৬৯ সালে ডাকসুর সদস্য নির্বাচিত হন। পাংশা কলেজে অংকশাস্ত্রের অধ্যাপনাকালে কমিউনিস্ট পার্টি করতে গিয়ে তৎকালীন কলেজ কর্তৃপক্ষের রোষানলে পরে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে আইন পেশায় যোগ দেন। গরিবের উকিল নামে কমল কৃষ্ণ গুহ সমধিক পরিচিত ছিলেন। রাজনীতির পাশাপাশি প্রগতিশীল সাহিত্য রচনা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তার ভূমিকা অপরিসীম। ভুসুকু ছদ্মনামে "সহজ কথা" কলাম লিখে স্বৈরাচার এরশাদের শাসনামলে তিনি ব্যাপক সাড়া তোলেন। স্থানীয় প্রগতিশীল সংবাদপত্র সাপ্তাহিক অনুসন্ধানের তিনিই ছিলেন প্রেরণাদাতা।

**আল্লাহ নেওয়াজ খায়রু :** পূর্ব পুরুষের বাস্তভিটা মাগুড়া জেলার শ্রীপুর উপজেলায়। হোমিওপ্যাথি চ্যারিটিবল ডিসপেনসারির চাকরির সুবাদে বাবা আব্দুল ওয়াহেদের পাংশা উপজেলার মদাপুরে স্থায়ী বসবাস। রাজবাড়ি কলেজের ছাত্রাবস্থায় '৬৬ সালে ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতিতে যোগ দেন। '৬৭ সালে বিভক্ত ছাত্র ইউনিয়নের মেনন গ্রুপের অন্যতম নেতা। পরবর্তীকালে পিকিংপন্থী কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্বে প্রথম সারিতে অবস্থান করেন। প্রগতিশীল রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে আল্লাহ নেওয়াজ খায়রুর ভূমিকা যথেষ্ট। অকালপ্রয়াত এই নেতার অনুজ আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে জাতীয় ছাত্রদল, বিপ্লবীছাত্র মৈত্রী এবং পরবর্তীকালে ওয়ার্কার্স পার্টির রাজনীতিতে অংশ নিয়ে রাজবাড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

**শহিদ মতিউল ইসলাম :** '৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সম্মুখ সময়ে অংশ নেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতিতে যোগ দেন। ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বোমা হামলার প্রতিবাদে ১৯৭৩ সালে ১ জানুয়ারী ঢাকায় ছাত্র ইউনিয়নের বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে মার্কিন দূতাবাস ঘেরাও করতে গিয়ে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের পুলিশবাহিনীর গুলিতে শহীদ হন পাংশা উপজেলার হাবাস-পুর গ্রামের মতিউল ইসলাম।

এছাড়া নজিবর রহমান, ধুঞ্চির মফিজউদ্দিন খান ও তার ছেলে শ্রমিক নেতা রুস্তম আলী খান, আকবর বিশ্বাস, সুকুমার গোস্বামী, নিরোদ দাস. নিরোদ সেন, সুরেশ ঘোষ, অমূল্য অধিকারী, গোপাল নাথ, কমরেড তারু ও রাজা, দুলাল মোল্লা, এমএ মোমেন বাচ্চু মাস্টার এখানে বাম প্রগতিশীল রাজনীতি প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

এ অঞ্চলে কংগ্রেস পন্থী স্বদেশী আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে ছিলেন জমিদার রাজাবাবু, তারাপদ লাহিড়ী, সুকুমার দেব রায়, শৈলেশ বাবু, বৃন্দাবনচন্দ্র দাস, কালীশংকর মৈত্র, সত্যনারায়ণ গুহ, দেবব্রত ভট্টাচার্য, গোবিন্দ লাহিড়ী, উকিল নরেশ বোস, জাহ্নবীচরণ কুণ্ডু প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন।

ডানপন্থী রাজনীতি তথা মুসলিম লীগের প্রয়াত নেতাদের মধ্যে ইউসুফ হোসেন চৌধুরী, আহম্মেদ আলী মৃধা, আলীমুজ্জামান চৌধুরী, কাজী আহম্মদ আলী, এ্যাড: আব্দুল মাজেদ, এ্যাড. আব্দুল জলিল মিয়া, হাবিবুর রহমান প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

আওয়ামী মুসলিম লীগ উত্তরকালে কাজী হেদায়েত হোসেন, আব্দুল ওয়াজেদ চৌধুরী, অমলকৃষ্ণ চক্রবর্তী, মোসলেম মৃধা, খন্দকার নুরুল ইসলাম, এম এ জামান মুন্নু মিয়া, গওহর মণ্ডল, ডা. শেখ ইয়াহিয়া ইসলাম রাজবাড়িতে আওয়ামী লীগের রাজনীতির

গোড়া পত্তন করেন। বর্তমান গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগ্রাম ও রাজনৈতিক চর্চায় এ্যাডঃ চিত্তরঞ্জন গুহ, এ্যাড: সৈয়দ রফিকুস সালেহীন, মকসুদ আহমেদ রাজা, এটিএম আব্দুর রাজ্জাক উজির এখনও সক্রিয় ভূমিকায় রয়েছেন। বর্তমানে আওয়ামী লীগের জেলা সভাপতি জিল্লুল হাকিম ও সাধারণ সম্পাদক কাজী কেরামত আলী এবং বিএনপির সভাপতি নাসিরুল হক সাবু ও সাধারণ সম্পাদক আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম। বাম প্রগতিশীল রাজনীতিতে বর্তমানে কমরেড আনছার আলী, কমরেড জ্যোতি শংকর ঝন্টু, আহমেদ নিজাম মন্টু, দাউদ খান, ছলেমান মোল্লা দলু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সক্রিয় ভূমিকা রাখছেন।

**গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব :** ইউনিভার্সিটি অফ অক্সফোর্ডের নিউরো সার্জারি বিভাগের গবেষক ড. টিপু আজিজ এ জেলারই কৃতী সন্তান। সম্প্রতি তিনি বানর ও শিম্পাঞ্জীর হরমোন সংগ্রহ করে মানবকল্যাণে ঔষধ আবিষ্কার করে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি লাভ করেছেন। এছাড়া সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আবু হেনা, ইতিহাসবিদ ড. কেএম মহসীন, ইরানে অনুষ্ঠিত ইসলামিক গেমসে সাঁতারে রৌপ্যপদক বিজয়ী এবং ৯২-৯৩ সালে বয়স ভিত্তিক জাতীয় সাঁতারে ৩টি জাতীয় রেকর্ডকারী নিবেদিতা দাস, ৮৩ সালে বয়স ভিত্তিক জাতীয় সাঁতারে ১২টি স্বর্ণপদক জয়ী লায়লা নুর মিলু, ডাঃ আবুল হোসেন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা লন্ডনপ্রবাসী ডাঃ আবুল হোসেন প্রমুখ এ জেলার কৃতী সন্তানেরা দেশ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন।

**সংবাদপত্র সাংবাদিকতা :** সংবাদ ও সাংবাদিকতায় রাজবাড়ির দীর্ঘকালের ঐতিহ্য রয়েছে। পাক-ভারত উপমহাদেশে বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র প্রকাশনার উষা লগ্নে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ১৮৬৩ সালে কুষ্টিয়ার কুমারখালী কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত গ্রামবার্তায় প্রকাশিকার সাথে যুক্ত ছিলেন এ জেলার কৃতী সন্তান মীর মশাররফ হোসেন। গ্রামবার্তা প্রকাশিকা প্রকাশের একযুগ পরে ১৮৭৪ সালের এপ্রিল মাসে বালিয়াকান্দির মীর মশাররফ হোসেন চুঁচড়া থেকে 'আজীজন নেহার' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এরও দেড় দশক পরে এবং ১৮৮১ সালে গ্রামবার্তা প্রকাশিকা বন্ধ হওয়ার পর কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়া থেকে ১৮৯০ সালে তিনি প্রকাশ করেন পাক্ষিক হিতকরী। রাজবাড়ি জেলার পাংশা থেকে মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরীর সম্পাদনায় বাংলা ১৩১১ সালের আষাঢ় মাসে বিখ্যাত মাসিক পত্র 'কোহিনুর' প্রকাশিত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত প্রকাশিত হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে তৎকালীন প্রগতিশীল মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের এক অপূর্ব সম্মিলন ঘটিয়ে 'কোহিনুর' পত্রিকাটি ইতিহাসে স্থান করে রয়েছে। কবি কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান' কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় এই 'কোহিনুর' পত্রিকায়। ত্রিশের দশকে খন্দকার নাজির উদ্দিনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় খাতক। ত্রিশের দশকেই প্রকাশিত মুক্তবুদ্ধি আন্দোলনের মুখপত্র 'শিখা' পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন পাংশার কৃতী সন্তান ড. কাজী মোতাহার হোসেন ও কাজী আবদুল ওদুদ। '৪৭ এর দেশভাগের পূর্বে এখান থেকে আর কোন পত্র পত্রিকা প্রকাশিত না হলেও পরবর্তীকালে ষাটের দশকে এ্যাড. মাজেদ আলী খান ও পরে ফকীর আব্দুর রশিদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় চন্দনা। এছাড়া 'গুর্খা' ও 'পাগলা মিছিল' নামে উল্লেখযোগ্য দুটি সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এখান থেকে কোন নিয়মিত

সংবাদপত্র প্রকাশিত না হলেও অনিয়মিতভাবে কিছু সাময়িকপত্র পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। সামরিক শাসনের শীর্ষ পর্যায়ে কমরেড কমল গুপ্তের সাহসী সময় নামে ব্যাঙ্গ পত্রিকা আলোড়ন তোলে। আবুল কালাম আজাদ, দুলাল বাবু মল্লিক, আবুল কালাম, আনোয়ার হোসেন মন্টু যুক্ত ছিলেন। নব্বই-এর দশকের গোড়া থেকে মূলত রাজবাড়িতে নিয়মিত সংবাদপত্রে প্রকাশনা শুরু হয়। ১৯৮২ সালে কবি বাবু হকের সম্পাদনায় পাক্ষিক 'প্রতিবেদন', মোমিনুর ইসলাম মানুর সম্পাদনায় 'রাজবাড়ি প্রতিবেদন', কেএম মারুফ সেজানের সম্পাদনায় পদ্মা, আমিনুর রহমান দিপু ও পরে বাবু মল্লিকের সম্পাদনায় 'রাজবাড়ি পদ্মা' প্রকাশিত হলেও সরকারি অনুমোদন না থাকায় এগুলি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। সরকারি অনুমোদন লাভ করে নবগঠিত রাজবাড়ি জেলার প্রথম সংবাদ পত্র সাপ্তাহিক 'অনুসন্ধান' ১৯৮৫ সালের ১৪ এপ্রিল (১ বৈশাখ) আত্মপ্রকাশ করে। বাবু মল্লিকের সম্পাদনায় প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রকাশিত সাপ্তাহিক অনুসন্ধান এরশাদের সামরিক শাসন, জাতীয় পার্টি, বিএনপি, আওয়ামী লীগ ও বিএনপি জামাত জোট-প্রত্যেক সরকারের শাসনামলে বারবার ক্ষমতাসীনদের রোষানলে পরে। সাপ্তাহিক অনুসন্ধানের বিরুদ্ধে তৎকালীন জাতীয় পার্টির এমপি ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মুন্সি আব্দুল লতিফের দায়ের করা ১০ কোটি টাকার মানহানি মামলা এদেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সাপ্তাহিক অনুসন্ধানের পরে জেলার দ্বিতীয় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র আবু মুসা বিশ্বাসের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'রাজবাড়ি সংবাদ' প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালে এবং পরবর্তীকালে সাপ্তাহিক 'রাজবাড়ি বার্তা' ও সাপ্তাহিক 'পাংশা বার্তা' প্রকাশিত হয়। জেলার প্রথম দৈনিক পত্রিকা বাবু মল্লিকের সম্পাদনায় সহজ কথা প্রকাশিত হয় ১৯৯৪ সালের ১ নভেম্বর। '৯৬ সালের পরে পাংশা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'পদ্মা বার্তা', সাপ্তাহিক রাজবাড়ি খবর 'গোয়ালন্দ), সাপ্তাহিক রাজবাড়ি কণ্ঠ। একুশ শতকের গোড়াতেই প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সাহসী সময়', দৈনিক 'গতকাল' ও সাপ্তাহিক 'তদন্ত প্রতিবেদন'।

দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিক হিসাবে পাকিস্তান আমল থেকে বিভিন্ন দৈনিকে কর্মরত ছিলেন এ এলাকার অনেক কৃতী সন্তান। '৫২র ভাষা আন্দোলনের পর সাংবাদিকতায় আসেন আনিসুর রহমান (সংবাদ)। 'ষাটের দশকে সাংবাদিকতায় আসেন কাজী ইকবাল ফারুক (অবজারভার), শিবেন্দ্রনাথ কুণ্ডু (সংবাদ), নাজিবুর রহমান (ইত্তেফাক), ব্রজকিশোর সিংহ সুভাষ (আওয়াজ), মকসুদ আহমেদ রাজা (অবজারভার), মোহাম্মদ সানাউল্লাহ, (দৈনিক পাকিস্তান), শ্যামল কুমার মজুমদার (ইত্তেফাক), মোঃ সামসুল হক সামছু (আজাদ/গোয়ালন্দ), এম ইকরামুল হক (দি পিপলস/বালিয়াকান্দি) ও সন্তোষ কুমার সাহা (সংবাদ/পাংশা) প্রমুখ। স্বাধীনতার পরে সাংবাদিকতায় আসেন এমন দেলোয়ার হোসেন (সংবাদ), শেখ সামসুজ্জামান নয়ন (বাংলার বাণী/গোয়ালন্দ), হিমাংশু কুমার সাহা (প্রথম আলো), গণেশ নারায়ণ চৌধুরী (বাংলার বাণী), একেএম সিরাজুল আলম ভূঁইয়া (গণজাগরণ), এটিএম রফিক উদ্দিন (রেডিও বাংলাদেশ), আকবর আলী মিয়া (অবজারভার), মোশাররফ হোসেন (সংগ্রাম), মো. রফিকুল ইসলাম (বাংলাবাজার পত্রিকা), এম মনিরুজ্জামান (নয়া দিগন্ত), আহসান হাবীব (জনকণ্ঠ), লিটন চক্রবর্তী (ভোরের কাগজ), করিম ইসহাক (ভোরের ডাক), জহুরুল হক (আমার দেশ), মতিউর রহমান (আজকের কাগজ), কাজী আঃ কুদ্দুস বাবু (দিনকাল) জাহাঙ্গীর

হোসেন (যায় যায় দিন), সুদাম রায় (দেশবাংলা), সাহিদ হোসেন খাজা (খবরপত্র), সৌমিত্র শীল চন্দন (আমাদের সময়) প্রমুখ।

গোয়ালন্দ উপজেলায় কর্মরত রয়েছেন একেএম আনোয়ারউদ্দিন (সমাচার) আওয়াল আনোয়ার (ইত্তেফাক), অমল সাহা (ভোরের কাগজ), শামীম আহমেদ (যুগান্তর), সিরাজুল হোসেন (আমার দেশ), গণেশ পাল (ফ্রিল্যান্স), আমীরুল ইসলাম লিন্টু (মানবজমিন) প্রমুখ।

পাংশায় কর্মরত সাংবাদিকদের মধ্যে মোক্তার হোসেন কবীর (আজকের কাগজ) উল্লেখযোগ্য। বালিয়াকান্দির কর্মরত সাংবাদিকদের মধ্যে সনজিৎ দাস (সংবাদ), দুর্লভ কর (ভোরের রানার), গোলাম মোস্তফা (মানব জমিন), রঘু সিকদার (ভোরের ডাক), জাকির হোসেন (খবরপত্র) উল্লেখযোগ্য।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমসমূহে রাজবাড়ি জেলার অনেক কৃতী সন্তান গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এদের মধ্যে গোলাম তাহাবুর (এএফপি র সাবেক বাংলাদেশ ব্যুরো প্রধান বর্তমান ম্যানেজিং এডিটর দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট), মোঃ সহিদুজ্জামান (ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস), ফকীর আব্দুর রাজ্জাক (বাংলার বাণীর সাবেক সহ সম্পাদক), বেনজীর আহমেদ (সাবেক সম্পাদক, ভোরের কাগজ), রওশনুজ্জামান দুলু (ইউএনবি), মুহম্মদ জালাল (আবাস), মোঃ আঃ গফুর (ইনকিলাব), মিনার মাহমুদ (সাপ্তাহিক বিচিন্তার সম্পাদক), শামীমা চৌধুরী এলিস (পিআইবি), মহিতুল ইসলাম (জনতা), অশোক সিনহা (ইত্তেফাক), রেজোয়ানুল হক (এনটিভি), গোলাম মর্তুজা (সাপ্তাহিক ২০০০), আব্দুর রাজ্জাক (সংগ্রাম), মোঃ সিরাজুল ইসলাম (পথযাত্রা), কায়সুল মোমেন কাকন (চ্যানেল আই), মীর আফরোজ জামান (এনডিটিভি), জুলফিকার আলী (খবর), বোরহানুল হক সম্রাট (সিএসবি), রাগীব হাসান (দিনের শেষে), শামীম খান (আমাদের সময়), ফরিদুর রহমান পান্থ (চ্যানেল আই), রিমন রহমান (মানবজমিন) প্রমুখ।

**মুক্তিযুদ্ধ :** ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে রাজবাড়ি জেলার রয়েছে সংগ্রামী ইতিহাস। পাক হানাদার বাহিনীর কবল থেকে রাজবাড়িসহ সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলকে মুক্ত করার জন্য এখানকার সংগ্রামী জনতা ও আনসার ইপিআর বাহিনী প্রাণপণ চেষ্টা চালায়। এখানকার অবাঙালী ও বিহারী অধ্যুষিত রাজবাড়ি শহরে পশ্চিম পাকিস্তানিদের এতই শক্ত ঘাঁটি ছিল যে, সারা দেশ ১৬ ডিসেম্বর মুক্ত হলেও রাজবাড়ি মুক্ত হয় এর দু'দিন পর ১৯ ডিসেম্বর।

কুষ্টিয়া প্রথমবারের মতো শত্রুমুক্ত হয় ১ এপ্রিল। ২৫ মার্চ রাতে যশোর সেনানিবাসের পাক সৈন্যরা কুষ্টিয়া শহর দখল করে নেয়। ২৭ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ রাত পর্যন্ত কুষ্টিয়ায় যে তুমুল লড়াই চলে সে যুদ্ধে রাজবাড়ির মুক্তিযোদ্ধা সংগঠক কাজী হেদায়েত হোসেনের নেতৃত্বে একদল প্রশিক্ষিত আনসার বাহিনী সদস্যসহ শত শত মানুষ অংশ গ্রহণ করে কুষ্টিয়া শহরকে মুক্ত করতে সহায়তা করে। সে যুদ্ধে রাজবাড়ির আনসার সদস্য হাসমত আলী, পাংশার কুদ্দুস সহ ৪ বীর যোদ্ধা শাহাদৎ বরণ করেন।

পাকবাহিনীর বোমারু বিমানগুলো ৯ এপ্রিল থেকে গোয়ালন্দ ঘাটে অবতরণের চেষ্টা চালায় এবং আরিচাঘাটে অপেক্ষমাণ যুদ্ধ জাহাজ নদী পার হয়ে গোয়ালন্দের দিকে আসতে চায়। কিন্তু হাজার হাজার মানুষের বিনিদ্র রজনী প্রহরা আর সামান্য ক'জন

ইপিআর আনসার বাহিনীর মনোবল তাদের ২০ এপ্রিল পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখে। কামানের গোলা আর বিমান হতে নিক্ষিপ্ত বোমার আক্রমণের ১১ দিন পর বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ মহিউদ্দিন (আনসার কমান্ডার) ও পল্লীকবি তোফাজ্জেল হোসেনসহ শত শহীদ মুক্তিযোদ্ধার বুকের ওপর দিয়ে পাকবাহিনী ২১ এপ্রিল রাতের অন্ধকারে গোয়ালন্দ ঘাট অবতরণ করে। অতঃপর শহীদ খুশি, শহীদ দিয়ানত, শহীদ রফিক, সফিক ও সাদীসহ অসংখ্য বীর যোদ্ধার প্রাণের বিনিময়ে ১৯ ডিসেম্বর রাজবাড়ি স্বাধীন হয়।

**অন্যান্য :** গোয়ালন্দের ইলিশ ও তরমুজ খানখানাপুরের সন্দেশ, রামদিয়ার, মটকা, রাজবাড়ির চমচম, খলিলপুরের পুঁটি মাছ, বেলগাছির গুড় সারা দেশেই সুস্বাদু খাবার হিসেবে পরিচিত।

**তথ্য-সূত্র :**


১। জেলা পরিচিতি : রাজবাড়ি, বাবু মল্লিক, দৈনিক জনকণ্ঠ ২২ মার্চ ১৯৯৫।

২। মুসলিম মানস : সংঘাত প্রতিক্রিয়া, রশিদ আল ফারুকী

৩। উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র, ড. মুনতাসীর মামুন।

৪। তৃণমূল সাংবাদিকতার উন্মেষ ও বিকাশ, ড. তপন বাগচী, ঢাকা, ১৯৯৯

৫। দৈনিক সহজ কথা, (বাবু মল্লিক সম্পাদিত) রাজবাড়ি'র প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন।

৬। সাপ্তাহিক অনুসন্ধান (বাবু মল্লিক সম্পাদিত) রাজবাড়ি'র প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন।

৭। গোয়ালন্দ মহকুমা স্মরণিকায় প্রকাশিত ফকীর আবদুর রশীদের প্রতিবেদন।

৮। রাজবাড়ি জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, মতিয়র রহমান, ঢাকা, ২০০০।

৯। রাজবাড়ি জেলা সমিতির মুখপত্র 'রাজবাড়ি দর্পণ'-এ প্রকাশিত জেলা পরিচিতি: রাজবাড়ি। বাবু মল্লিক।

# ফতেহাবাদ থেকে ফরিদপুর

## মো. আবুল হোসেন

ব্রিটিশ শাসন আমলে সৃষ্ট একটি অন্যতম প্রাচীন জেলার নাম ফরিদপুর। অনেক আউলিয়া-দরবেশ এবং পুণ্যাত্মার আবাসভূমি হিসেবে এ অঞ্চল অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ। এর রয়েছে শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। এ জেলার পূর্বনাম ছিল ফতেহাবাদ। জালালউদ্দিন ফতেহ্ শাহ্ এ অঞ্চলকে মানব বসতির উপযোগী করে তোলেন। এজন্য তাঁকে অবর্ণনীয় কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। তাঁর নামে এ অঞ্চলের নামকরণ করা হয় ফতেহাবাদ। গৌড়ের একটি প্রধান অঞ্চল ছিল ফতেহাবাদ। মধ্যযুগের কবি সৈয়দ আলাওল এ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন বলে জানা যায়। সৈয়দ আলাওল সপ্তদশ শতকের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে বিবেচিত। তিনি আনুমানিক ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পদ্মাবতী কাব্যে কবি আলাওল তাঁর জন্ম পরিচয় দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন :

মুলক ফতেহাবাদ গৌড়েত প্রধান।
তথাত জালালপুর পুণ্যবন্ত স্থান ॥
বহু গুণবন্ত বৈসে খলিফা ওলমা।
কতেক কহিনু সেই দেশের মহিমা ॥
মজলিস কুতুব তাহাতে অধিপতি।
মুই হীন দনি তান অমাত্য সন্ততি ॥

বঙ্গ দেশের অধিবাসীদিগকে প্রাচীনকালে 'গৌড়' বলা হতো। আবার 'গৌড়' শব্দ জনপদ অর্থেও ব্যবহৃত হতো। অনেক প্রাচীন গ্রন্থে যথা: মৎস, লিঙ্গ, কর্ম, বায়ু, আদিপুরাণে, কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' ও বাৎসায়নের 'কামসূত্রে' 'গৌড়' নামটি পাওয়া যায়। ষষ্ঠ শতাব্দীতে 'গৌড়' নামের দ্বারা ভাগলপুরের পূর্বে অবস্থিত রাজমহল পর্বতমালার অপর পারের দেশকে বুঝাত। এই দেশটি অনেকগুলো অংশে বিভক্ত ছিল—যথা; পুণ্ড্রবর্ধন বা উত্তর বংগ, কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ জেলা), সমতট (আধুনিক ঢাকা, ফরিদপুর ও কুমিল্লা জেলা)। জালালপুর পরগণাটি ফরিদপুর জেলায় অবস্থিত। উক্ত প্রমাণাদি হতে এটা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, কবি সৈয়দ আলাওলের জন্মস্থান 'গৌড়' তথা সমতট রাজ্যের ফতেহাবাদের (ফরিদপুর) জালালপুরে।

কবি আলাওলের পিতা ছিলেন ফতেহাবাদের শাসনকর্তার মজলিশ কুতুবের অমাত্য। মহাকবি আলাওলের জন্মস্থান নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। আলাওল

---

ফরিদপুরস্থ নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (প্রশাসন) পদে কর্মরত মো. আবুল হোসেন সরকারি প্রশাসনে যুক্ত থাকার সুবাদে জমির দলিল খুঁজে মহাকবি আলাওলের জন্মস্থান যে চট্টগ্রামে নয়, অধুনা মাদারীপুরে– তা প্রমাণ করেছেন। তথ্য পরিবেশনে অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও এটি গ্রন্থে স্থান পেয়েছে জালালপুর পরগণার বিবরণ থাকার কারণে। -- সম্পাদক

চট্টগ্রাম জেলার ফতেহাবাদের অন্তর্গত জোবরা গ্রামে মতান্তরে বর্তমান ফরিদপুর জেলার (প্রাক্তন ফতেহাবাদ) জালালপুর পরগনায় জন্মগ্রহণ করেন। আলাওলের কাব্য পর্যালোচনায়ও প্রতীয়মান হয়, দ্বিতীয় মতটি ঐতিহাসিকভাবে বেশি প্রতিষ্ঠিত। কারণ বর্তমান ফরিদপুর জেলা গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। জলপথে চট্টগ্রাম যাওয়ার সময় আলাওল ও তাঁর পিতা জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হন। যুদ্ধে পিতা নিহত হলে আলাওল পর্তুগীজ জলদস্যুদের হাতে পড়ে আরাকান রাজসভায় নীত হন। তখন ফরিদপুর অঞ্চলেও জলদস্যুদের ব্যাপক উপদ্রব ছিল। বাংলাদেশ গেজেটিয়ারের বর্ণনা হতে জানা যায় ১৮৫৪ সনে নৌ-ডাকাতির প্রাদুর্ভাবের কারণে মাদারীপুর মহকুমাটির সৃষ্টি হয়েছিল। যা তখন বাকেরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সুতরাং এ অঞ্চল হতে নৌপথে চট্টগ্রামে রওনা হয়ে জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা অস্বাভাবিক ছিল না।

জালালপুর পরগণা সম্পর্কে ঐতিহাসিক এইচ বেভারিজ তাঁর History and statistics of Bakergonj গ্রন্থে নিম্নোক্ত বর্ণনা দিয়েছেন :

> This Pargona Chiefly belongs to Faridpur, but there are portions of it in the north of Bakergonj and in Dacca. It is remarkable for number of its Taluqs. Mr. Thomson (5th February 1794) wrote that there were about 2000 in the pargona that many of the Taluqders were in extreme distress, and that upwards of 100 of them had fled from inability to pay their revenue dues. The Pargona suffered much in the inundations of 1787.

উপযুক্ত বর্ণনা হতে বোঝা যায় জালালপুর পরগনার মুখ্যত অবস্থান ছিল ফরিদপুর জেলায়। বাকেরগঞ্জ জেলার উত্তরভাগে কিছু অংশ এবং কিছু অংশ ঢাকা জেলায়। বেভারিজ সাহেব উল্লেখিত গ্রন্থটি লিখেছিলেন ১৮৭৬ সনে। তার তিন বছর পূর্বেই মাদারীপুর মহকুমাটি ফরিদপুর জেলায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সুতরাং তদানীন্তন বাকেরগঞ্জ জেলার উত্তরে অবস্থিত বর্তমান মাদারীপুর জেলার অধিকাংশ স্থানই যে জালালপুর পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। ১৭৮৭ সনের প্লাবনে পরগণাটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফরিদপুর কালেক্টরেটের রেকর্ডরুম তল্লাসী করে সি,এস ও আর, এস রেকর্ডে জালালপুর পরগণার যে সমস্ত মৌজার নাম উদ্ধার করা হয়েছে তার বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

> মাদারীপুর মহকুমার (বর্তমানে জেলা) শিরখাড়া ইউনিয়নের ছোট গোসাইদিয়া, বড় গোসাইদিয়া, শ্রীনদী, শিরখাড়া, কুচিয়ামোড়া, কলিমা ও বল্লভদী মৌজাসমূহ; ধুরাইল ইউনিয়নের উত্তর বিরাংগল, ধুরাইল, চাছার ও দক্ষিণ বাজিতপুর মৌজাসমূহ: বাহাদুরপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ বিরাংগল, ধুরাইল, চাছার ও দক্ষিন বাজিতপুর মৌজাসমূহ; বাহাদুরপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ বিরাংগল, মিরিকদিয়া, বাহাদুরপুর, তিথিরপাড়া, কালাপুর ও আলগী মৌজাসমূহ; কুনিয়া ইউনিয়নের কেন্দুয়া, খাটপাড়া, দিঘলপাড়া, দৌলতপুর, কুনিয়া ভরুয়াপাড়া, খাদনসী, আদিত্যপুর, আশাপাট, দিয়াপাড়াও ত্রিভাগদী মৌজাসমূহ; দুধখালী ইউনিয়নের মিঠাপুর, চণ্ডিবর্দী, রাজধরদী ও বলশা মৌজাসমূহ জালালপুর পরগণার অন্তর্ভূক্ত ছিল।

জিলা ফরিদপুর    মৌজা চাহার    জে এল নং ১১    খতিয়ান নং ১০০

107

থানা মাদারীপুর    পরগণা কাসিমপুর    রেঃ সাঃ নং ১৯৯১    তৌঃ নং ২৭৯৬,২৭৯৭

| ঊর্দ্ধতন স্বত্বের |  | স্বত্বের জমা |  | মন্তব্য | সাধারণ ও স্থানীয় |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বিবরণ ও দখলকার (সংক্ষিপ্ত) | অংশ | খাজানা | সেস |  | খাজানা | সেস |
| ১ক খারিজা তালুক | ।/০ |  |  |  |  |  |
| ২ক এবং খারিজা তালুক গোলাম হুজুর চৌধুরী গং পক্ষে কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ | ।/০ |  |  |  |  |  |
| ১খ খারিজা তালুক | ৶১৪৪//১৩ |  |  |  |  |  |
| ২খ এবং খারিজা তালুক গোপালকৃষ্ণ রায় চৌধুরী গং | ৶১৪৪//১৬ |  |  |  |  |  |
| ৩ আশুতোষ রায় গং | ৫১০॥১১ |  |  |  |  |  |
|  | ১৲ |  |  | সামিল খাজানা ৯ নং উপর বিবরণ মৌজার ৫০৯ বা খতিয়ান মোট খাজানা ৩২৷৷১০ |  |  |

| নিম্ন স্বত্বের বিবরণ ও দখলকার | অংশ | নিম্ন স্বত্বের বিবরণ ও দখলকার | অংশ | স্বত্বের শ্রেণী এবং বিশেষ বিবরণ ও অনুচ্ছেদ |
|---|---|---|---|---|
| রায়তি |  |  |  | স্থায়ী নিরিখদার |
| রাজেন্দ্রচন্দ্র মণ্ডল | /৬৪// |  |  |  |
| মহেন্দ্র মণ্ডল | /৪৪// |  |  |  |
| পিং শ্রীনাথ মণ্ডল |  |  |  |  |
| জয়দেব মণ্ডল | /৩৪// |  |  |  |
| দুঃখীরাম মণ্ডল | /৯৪// |  |  |  |
| পিং দুর্গাচরণ মণ্ডল |  |  |  |  |
| সুখদেব মণ্ডল | ৶১৩৩/ |  |  |  |
| পিং গিরিশচন্দ্র মণ্ডল |  |  |  |  |
| কেশব মণ্ডল | ৶১৩৩/ |  |  |  |
| পিং মদনমোহন মণ্ডল |  |  |  |  |
| মহানন্দ মণ্ডল | ৶১৩৩/ |  |  |  |
| পিং রামমোহন মণ্ডল |  |  |  |  |
| মাধবের মণ্ডল | ৶১৩৩/ |  |  |  |
| পিং বাণীনাথ মণ্ডল সাং উত্তরবিরাজন | ১৲ |  |  |  |

১০৫।১০৬।১০৮
১৩৯।১১৫৭ ধারা
মতে মোট বা পরিবর্তন
(যা মোকদ্দমা নম্বর
ও সন

জিলা ফরিদপুর    মৌজা দক্ষিণ [illegible]    জে এল নং ১২    খতিয়ান নং ৪

থানা [illegible]    পরগণা [illegible]    রে: সা: নং [illegible]    তৌজি নং [illegible]

| উপরিস্থ স্বত্ব: বিবরণ ও দখলকারের নাম ও ঠিকানা | অংশের পরিমাণ | খাজনা | সেস্ | মন্তব্য | খাজনা | সেস্ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ক খাদিজা খাতুন | ।/০ | | | ১ক ২ ক [illegible] | | |
| ২ক এবং [illegible] খাতুন | ।/০ | | | [illegible] ১৩৪৪ সাল | | |
| [illegible] চৌধুরী [illegible] | | ।/০ | [illegible] | ও [illegible] | | |
| [illegible] | | | | [illegible] | | |
| ১খ [illegible] খাতুন | [illegible] | | | [illegible] | | |
| ২খ এবং [illegible] খাতুন | [illegible] | | | [illegible] | | |
| [illegible] চৌধুরী [illegible] | | | | [illegible] ১৸৵৪ | | |
| গ [illegible] | [illegible] | | | | | |
| | | ৶০ | [illegible] | | | |
| | [illegible] | [illegible] | | | | |

| অধঃস্থ স্বত্বের বিবরণ ও দখলকার | অংশ | অধঃ স্বত্বের বিবরণ ও দখলকার | অংশ | অধঃ স্বত্বের শ্রেণী এবং বিশেষ বিবরণ ও অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| রায়তি | | | | রায়ত |
| [illegible] | [illegible] | | | [illegible] |
| পিং [illegible] | | | | |
| [illegible] | ।।০ | | | |
| পিং [illegible] | [illegible] | | | |
| [illegible] | | | | |
| [illegible] | | | | |

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

উপরোক্ত তথ্য প্রমাণ হতে প্রতীয়মান হয়, জালালপুর পরগণার উল্লেখিত যে কোন স্থানে মহাকবি আলাওলের জন্ম হয়েছিল। আলাওল পরে আরাকান রাজ সভায় সভাকবি হিসেবে নিয়োজিত হন। আলাওলের গ্রন্থসমূহ হলো: পদ্মাবতী; সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল, সপ্ত পয়কর, সেকান্দর নামা, তোহ্ফা, সঙ্গীত শাস্ত্র (রাগতালনামা) ও রাধাকৃষ্ণ রূপকে রচিত পদাবলি। এছাড়া তিনি কবি দৌলত কাজীর অসমাপ্ত কাব্য সতী ময়না ও লোরচন্দ্রানীর শেষাংশ রচনা করেন। এ মহান কবি ১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ারের বর্ণনা থেকে জানা যায় পবিত্র ভূমি আজমিরের প্রখ্যাত সাধক এবং দরবেশ খাজা মাইনউদ্দিন চিশ্‌তী (রহ.) এর শিষ্য শাহ ফরিদ (রহ.) এর নাম অনুসারে এ জেলার নামকরণ করা হয় ফরিদপুর। শাহ ফরিদ (রহঃ) এর প্রকৃত নাম ছিল হযরত খাজা ফরিদউদ্দিন মাসউদ গঞ্জেশকর (রহঃ)। হিজরী ৫৮২ সনে তিনি লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন। মওলানা খন্দকার মোঃ বশির উদ্দিন তাযকেরাতুল আউলিয়া কিতাবের ১ম খণ্ডে হযরত শাহ ফরিদকে হযরত খাজা মাইনউদ্দিন চিশতী (রহঃ) এর প্রধান খলিফা খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী (বহঃ) এর শিষ্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে তিনি যে খাজানা মাইনউদ্দিন চিশতী (রহঃ) এর সিলসিয়ার দরবেশ ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ফরিদপুর কালেক্টরেট এলাকা সংলগ্ন যশোর রোডের পাশে শতাব্দীর পুরনো বটগাছের নিচে ফরিদশাহের দরগা বা চিল্লা ছিল। চিল্লাটির গায়ে উৎকীর্ণ লেখা থেকে জানা যায়, ১৩০০ বঙ্গাব্দে শাকরগঞ্জের জনৈক পনির উদ্দিন চিল্লাটি তৈরি করে দিয়েছিলেন। স্থানটি ছিল উন্মুক্ত এবং বটগাছের ছায়া ঢাকা। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ এখানে আসতো বলে জানা যায়। এখানে মিলাদ মাহফিল, জিকির আযগর, গজল, নাত, হামদ অনুষ্ঠিত হতো। জনশ্রুতি আছে—একবার পদ্মা নদী তীর ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে দরগাটির নিকট চলে আসে। পদ্মার ভাঙ্গন দেখে সকলের মনে বিষাদের ছায়া নেমে আসে। হাজার মানুষ মোনাজাত করল আল্লাহ্‌র দরবারে, ফরিয়াদ জানালো দরগাটিকে রক্ষা করতে। তাদের ফরিয়াদ মঞ্জুর হয়েছিল। পদ্মার খরস্রোতে স্তিমিত হয়ে গেল, নদী চলে গেল দরগা থেকে ৭-৮ কিলোমিটার দূরে। এ দরগার পাদপ্রান্তে গড়ে উঠে ফরিদপুর শহর। কিন্তু ফরিদ শাহের সেই চিল্লা এবং বুড়ো বটগাছটির অস্তিত্ব আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। জেলার ইতিহাসের, ইসলাম ধর্ম প্রসারের এক নীরব সাক্ষীকে ধ্বংস করা হয়েছে। জনশ্রুতি আছে বটগাছটি কেটে ফেলার সময় গাছটির মাথায় আগুন জ্বলে উঠেছিল। ভয়ে কাঠুরেরা কুড়াল নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। অগ্নি নির্বাপক বাহিনী সে আগুন নিভিয়ে ফেললেও যে খ্রিস্টান কন্ট্রাক্টর গাছটি কাটার দায়িত্ব নিয়েছিল বেশ কিছুদিন দূরারোগ্য রোগে ভুগে সে মারা যায়। মৃত্যুর পূর্বে নরেন সাহা বলেছিল তার এ দুঃসাহস করা ঠিক হয়নি। যদিও বিষয়টি কাকতালীয়, গাছটি কাটার ঊনিশ দিনের মধ্যে ফরিদপুরে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনা ঘটেছিল। বিজ্ঞান মনস্ক কুসংস্কারমুক্ত বাস্তববাদী মন এ সকল বিষয়কে গুরুত্ব না দিলেও ভাববাদী মন তার মনের মাধুরী মিশিয়ে বিষয়গুলোকে উপস্থাপন করে। মানুষ সব ক্ষেত্রে ভাব প্রবণতা দূর করতে পারে না। শাহ ফরিদ গঞ্জেশকর (রহ.) পাকিস্তানের পাঞ্জাবের পাক পত্তনে সমাহিত হয়েছেন; সেখানে তাঁর মাজার আছে।

১৭৯৩ খ্রি. গবর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিশের আমলে গোয়ালন্দ ও গোপালগঞ্জের অংশবিশেষ যশোর জেলার অধীনে ছিল। ফরিদপুরের অবশিষ্টাংশ ঢাকা জালালপুর জেলার অংশ হিসাবে পরিগণিত হয় যার হেড কোয়ার্টার ছিল ঢাকা। ঢাকা, ফরিদপুর ও বাকেরগঞ্জ সমন্বয়ে ঢাকা জালালপুর জেলার সৃষ্টি। ১৭৯৭ খ্রি. বাকেরগঞ্জ জেলার সৃষ্টি হয় যার হেড কোয়ার্টার স্থাপন করা হয় বাকেরগঞ্জ।

১৮০৭ খ্রি. ঢাকা জালালপুর জেলা হতে ফরিদপুর বিভক্ত হয়ে ফরিদপুর জেলা নামে অভিহিত হয় এবং হেড কোয়ার্টার স্থাপন করা হয় ফরিদপুর শহরে। ঢাকা জালালপুর জেলার অবশিষ্টাংশ ঢাকা জেলা নামে পরিচিত লাভ করে যার হেড কোয়ার্টার পূর্ববত ঢাকায় রয়ে যায়।

১৮১২ সনে চন্দনা নদীকে (অন্য নাম মধুমতি) ঢাকা জালালপুর ও যশোর জেলার সীমানা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৮৫৪ সনে মাদারীপুর মহকুমা সৃষ্টি হয় এবং প্রখ্যাত সাধক বদরুদ্দিন শাহ মাদার (রহ.) এর নামে এ মহকুমার নামকরণ করা হয়। ১৮৭১ সনে গোয়ালন্দ মহকুমা সৃষ্টি হয়। ১৮৭৩ সনে মাদারীপুর মহকুমাকে বাকেরগঞ্জ জেলা হতে ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১৯০৯ সনে সৃষ্টি হয় গোপালগঞ্জ মহকুমা। এই মহকুমাটি মাদারীপুর মহকুমার গোপালগঞ্জ, কোটালীপাড়া এবং ফরিদপুর সদর মহকুমার বিচ্ছিন্ন থানা মুকসুদপুর সমন্বয়ে গঠিত হয়। শতাব্দীব্যাপী পদ্মানদীর উত্তর তীর ভাঙ্গনের ফলে পয়স্থি ভূমির সমন্বয়ে প্রাচীন এ জেলাটির আয়তন আস্তে আস্তে প্রসারিত হয়। মাগুরা মহকুমার অন্তর্গত মোহাম্মদপুর থানার বানা, পাচুড়িয়া, গুনবহা ও ময়না ইউনিয়নসমূহ এবং আলফাডাংগা থানা মধুমতি নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত হওয়ায় বর্ণিত আলফাডাংগা থানা এবং উল্লেখিত ইউনিয়নসমূহ পরে যশোর জেলা হতে ফরিদপুর সদর মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হয়।

গোয়ালন্দ, ফরিদপুর সদর, মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জ এই চারটি মহকুমা সমন্বয়ে ফরিদপুর জেলা পূর্ণাঙ্গতা পায়। প্রাথমিক পর্যায়ে এ জেলায় ২৪টি থানা ছিল। গোয়ালন্দে ৪টি, ফরিদপুর সদরে ৭টি, মাদারীপুরে ৯টি এবং গোপালগঞ্জে ৪টি থানার অবস্থান ছিল। বৃহত্তর ফরিদপুর জেলা বর্তমানে পাঁচটি জেলায় রূপান্তরিত হয়েছে। জেলাগুলো হলো– ফরিদপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী ও শরীয়তপুর। জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আলোচনার সুবিধার্থে আমরা বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার বিষয়েই বর্ণনা করবো। মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত পালং একটি থানা ছিল। পরবর্তীতে পালংকে হেডকোয়ার্টার করে ৬টি থানার সমন্বয়ে এ অঞ্চলের সূফী সাধক হাজী শরীয়তুল্লাহর নাম অনুসারে শরীয়তপুর মহকুমা সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে প্রশাসনিক আদেশে ১৯৮৪ সনে মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী ও শরীয়তপুর মহকুমাকে জেলায় রূপান্তর করা হয়। বর্তমানে ফরিদপুর জেলায় ৮টি উপজেলা, মাদারীপুরে ৪টি, শরীয়তপুরে ৬টি, রাজবাড়ীতে ৪টি এবং গোপালগঞ্জে ৫টি উপজেলা আছে।

ফরিদপুর জেলা ১৮১৫ খ্রি. একজন সহকারী কালেক্টরের অধীনে একটি কালেক্টরেটের মর্যাদা লাভ করে। ১৮৩৩ খ্রি. যুগ্ম-ম্যাজিস্ট্রেসি ও ডেপুটি কালেক্টরের সমন্বয়ে অত্র জেলায় একটি স্বাধীন ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা ও রাজস্ব প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৫৯ খ্রি. এ ব্যবস্থার বিলোপ ঘটে। একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের অধীনে এ জেলা পূর্ণাঙ্গ জেলায় রূপ নেয়। ১৮৭৫ খ্রি. ঢাকা জজশীপ হতে ফরিদপুর জেলা আলাদা হয়ে যায় এবং এ জেলার অন্য নতুন জজ শীপের সৃষ্টি করা হয়।

এ জেলার উত্তরে ও পূর্বে জেলার সীমানা নির্ধারিত হয়েছে পদ্মা নদীর মূলস্রোত ধারা। এ নদী ফরিদপুর জেলাকে পাবনা, মানিকগঞ্জ, ঢাকা ও মুন্সীগঞ্জ জেলা হতে বিচ্ছিন্ন করেছে। দক্ষিণ পূর্বের সীমানা মেঘনা নদীর মূলস্রোতধারা—যা পদ্মা এবং ব্রহ্মপুত্রের মিলিত মোহনা চাঁদপুরের কাছে এ জেলাকে বিভক্ত করেছে। দক্ষিণে সীমানা বরিশাল, বাগেরহাট ও পিরোজপুর জেলা। পশ্চিমের সীমানা মাগুরা ও নড়াইল জেলা। গড়াই, মধুমতি এবং এর শাখা নদী বারাশিয়া উল্লেখিত জেলাদ্বয়কে এ জেলা হতে বিভক্ত করেছে। সর্ব পশ্চিমের সীমানা কুষ্টিয়া জেলা। নদীর মূলস্রোতকে জোর সীমানা হিসেবে ধরা হয়। প্রচণ্ড নদী ভাঙ্গন এবং নদীর গতিপথ ঘন ঘন পরিবর্তনের ফলে জেলার আয়তন এবং সীমানা প্রায়শই পরিবর্তিত হচ্ছে।

এ অঞ্চলের বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ সারা বছরই খুব বেশি থাকে, যার গড় পরিমাণ প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ। সর্বনিম্ন আর্দ্রতা সাধারণত শতকরা ৬০ ভাগ। জলবায়ু মৃদু, আর্দ্র ও সহনশীল। প্রতি বছর এ এলাকার বহু জায়গা কাল বৈশাখীর ছোবলে আক্রান্ত হয়। কাঁচা ঘরবাড়ী ধ্বংস হয়। দরিদ্র মানুষের জীবন জীবিকা বিপর্যস্ত হয়। ১৮৬৬, ১৮৯৬, ১৯০৬, ১৯৪৩ ও ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে এখানকার সাধারণ মানুষ দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি হয়েছে এবং এর ফলে প্রচুর প্রাণহানি ঘটে।

অনির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বিভিন্ন বছর এ জেলার জনগণ বন্যার করালগ্রাসে আক্রান্ত হওয়ার ফলে তাদের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা দুর্বিষহ হয়ে উঠে। জীবন জীবিকা হয় বিপর্যস্ত এবং অনিশ্চিত। ১৭৮৭, ১৮২৪, ১৮৩৮, ১০৯৭, ১৯৫৪, ১৯৫৮, ১৯৬৮, ১৯৭৮, ১৯৮৮, ১৯৯৮ ও ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে এ জেলা ভয়াবহ বন্যায় আক্রান্ত হয়। অনেক ফসল ও জানমালের ক্ষতিসাধন হয়। বাসিন্দাদের দীর্ঘ মেয়াদে পানিবন্দি থাকতে হয়। বন্যা সবসময় দুর্ভোগের কারণ হয় না। কখনও কখনও মানুষের জীবনে আনন্দের বার্তা বয়ে নিয়ে আসে। বন্যায় নদীর দু'তীরের জমিতে প্রচুর পলি পড়ে। বন্যা পরবর্তী সময়ে বাম্পার ফসল উৎপাদিত হয়। সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফুটে উঠে।

১৯১৮, ১৯১৯, ১৯৬১, ১৯৬৬, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে এ জেলার বিভিন্ন এলাকায় প্রচণ্ড সাইক্লোন সংঘটিত হয়। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল খুব সামান্যই। ১৯৬৮ ও ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ভয়াবহ টর্নেডোতে অসংখ্য ঘরবাড়ি এবং মানুষের জীবন বিনষ্ট হয়।

ব্রিটিশ শাসন আমলে ফরিদপুর জেলার সৃষ্টি হলেও তার বহু পূর্ব হতেই বিভিন্ন রাজন্যবর্গ কর্তৃক বহু বছর এ অঞ্চল শাসিত হয়েছে। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ এ অঞ্চল বঙ্গ রাজত্বের অংশ ছিল। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলের মহাকবি কালীদাসের 'রঘুবংশ' গ্রন্থে 'বঙ্গ' রাজত্বের উল্লেখ আছে। বঙ্গ রাজত্ব ছিল গঙ্গার শাখা প্রশাখার সমন্বয়ে সৃষ্ট গাঙ্গেয় অববাহিকা ও কিছু সংখ্যক দ্বীপাঞ্চল সমন্বয়ে গঠিত।

এ অঞ্চলের বাসিন্দাগণ তাদের জীবন জীবিকার সর্বক্ষেত্রে নৌযান ব্যবহার করত এবং নৌ-সংক্রান্ত বিষয়ে তারা অত্যন্ত পারদর্শী ছিল। চন্দ্রগুপ্ত শাসনামলের পূর্বের বঙ্গের ইতিহাস দুর্বোধ্য এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন।

চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্ত বংশ এ অঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ করেন বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। গুপ্তদের শাসনকাল ছিল ৩৪০-৫৪৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। সমুদ্রগুপ্ত আমলের (৩৪০-৩৮০ খ্রী.) গোপালগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত এলাহাবাদ পিলারে উৎকীর্ণ লেখা এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এবং কর্ন্দপগুপ্তের আমলের কোটালীপাড়া দুর্গের নিকটবর্তী গুয়াখোলা গ্রামে আবিস্কৃত স্বর্ণমুদ্রার উপরে লেখা থেকে গুপ্ত আমলের সাক্ষ্য প্রমাণ মেলে।

ব্রোঞ্চপদকে উৎকীর্ণ স্মারকে প্রমাণ পাওয়া যায়, ষষ্ঠ শতকে ধর্মাদিত্য নামে একজন রাজা এ অঞ্চল শাসন করতেন। তিনি ধার্মিক এবং ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। ৬১৫-৬২০ খ্রিস্টাব্দে সমাচার দেব নামে একজন স্বাধীন রাজা এ অঞ্চলের শাসক ছিলেন।

সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ভাগে সম্ভবত 'বঙ্গ' হর্ষবর্ধনের রাজত্বের অঙ্গীভূত হয়। ঐ সময়ের চাইনিজ পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ এর বর্ণনা হতে এ বিষয়টি জানা যায়। হিউয়েন সাঙ ৬৩০-৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। তখন হর্ষবর্ধন ক্ষমতার উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর তার রাজত্ব খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যায়। বঙ্গ অঞ্চলে স্বাধীন রাজন্যবর্গের উদ্ভব ঘটে। ঐ সময়ের পরে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত বঙ্গের তথা পূর্ববঙ্গের এ জেলার ইতিহাস তেমন জানা যায় না। তবে ব্রোঞ্চপদকে উৎকীর্ণ লেখা থেকে উদ্ধার করা যায় যে, ৬৫০-৭০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত 'খাদগাস' নামে একজন বৌদ্ধ রাজা এ অঞ্চল শাসন করতেন। তার রাজধানী ছিল 'করমান্তা' মতান্তরে কুমিল্লার উত্তরে বড় কামতা।

দশম এবং একাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী 'চন্দ্র' বংশের একদল শাসক এ অঞ্চল শাসন করতেন। তাদের রাজধানী ছিল ঢাকার বিক্রমপুর। ফরিদপুর জেলার ইদিলপুর ও কেদারপুর এবং ঢাকা জেলার রামপালে আবিস্কৃত ব্রোঞ্চপদকে উৎকীর্ণ লেখা হতে এ বিবরণ পাওয়া যায়। ১০৮০-১১৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হিন্দু শাসকগণ এ অঞ্চল শাসন করতেন। তাদের রাজধানী ছিল বিক্রমপুর। তারা বর্মন নামে পরিচিত ছিলেন। শাসকদের মধ্যে বজ্রবর্মন, যতুবর্মন, হরিবর্মন, সমলাবর্মন অন্যতম। রামপালের সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত 'বাম চবিত' গ্রন্থের বর্ণনা হতে এ বিবরণ পাওয়া যায়। এ রাজাগণ প্রায় স্বাধীন রাজার মতো এ অঞ্চল শাসন করতেন।

বিজয় সেনের শাসন আমল (১০৯৭-১১৬০ খ্রি.) হতে ফরিদপুর জেলায় সেন বংশের রাজত্ব কায়েম হয়। বিজয় সেন ছিল সেন বংশের তৃতীয় শাসক। তিনি বর্মনদেবকে বাংলার শাসন ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত করেন। তাঁর উত্তরসূরী ছিলেন বল্লাল সেন। বল্লাল সেন ও বিজয় সেন উভয়ই শিব পূজা করতেন। বল্লাল সেন ১৮ বছর রাজত্ব করেন এবং পরে তাঁর পুত্র লক্ষণ সেন (১১৭৮-১২০৪ খ্রি.) এ অঞ্চলের শাসন পরিচালনা করেন এবং সেন রাজাদের রাজধানী নদীয়া দখল করেন। বৃদ্ধ লক্ষণ সেন নদীয়া থেকে পালিয়ে এসে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁর উত্তরসূরীগণ কয়েক প্রজন্ম বাংলার এ অঞ্চল শাসন করেন। তাদের মধ্যে বিশ্বরূপ সেন (১২০৬-১২২০ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত এ অঞ্চল শাসন করেন। ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সেন বংশের রাজাগণ প্রায় নিরূপদ্রবভাবে এ অঞ্চলে শাসন কার্য পরিচালনা করেন। ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে দেব বংশের শাসক দশরথ দেব কর্তৃক সেন বংশ ক্ষমতাচ্যুত হয়। দশরথ দেব

ছিল দেব বংশের প্রতিষ্ঠাতা শাসক দামোদর দেবের উত্তরসূরী। বিক্রমপুর হতে ইস্যুকৃত ধাতব পদকে উৎকীর্ণ লেখা হতে এর সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়।

১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী সেন রাজাদের রাজধানী নদীয়া দখলে নিলেও পূর্ববঙ্গের এ অঞ্চল মুসলমান শাসকদের করতলগত হয়নি। বল্লাল সেনের উত্তরসূরীগণ ত্রয়োদশ শতকের শেষ সময় পর্যন্ত এ অঞ্চল শাসন করেন। ১৩৩০ খ্রিস্টাব্দে মুহম্মদ তুঘলক বঙ্গ জয় করেন। পূর্ব বঙ্গকে লক্ষণাবতী, সাতগাঁও ও সোনারগাঁও নামে তিনটি প্রদেশে বিভক্ত করেন। সোনারগাঁও এর গভর্নর ছিল তাতার বাহরাম খান। ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে বাহরাম খানের মৃত্যুর পর তার অস্ত্র বাহক ফকরউদ্দিন ক্ষমতা দখল করেন এবং মুবারকশাহ নাম ধারণ করে দশ বছরেরও অধিক সময় এ অঞ্চল শাসন করেন। ১৩৫১ খ্রি. মোবারকশাহের পুত্র শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ এবং পৌত্র সিকান্দার শাহ বঙ্গের পূর্বাংশের জেলাগুলোর ক্ষমতা দখলের ব্যর্থ চেষ্টা চালান। সোনারগাঁও রাজধানী ছিল বিধায় এখানেই রাজন্যবর্গ এবং তাদের যুবরাজদের আবাসস্থল ছিল। মাঝে মাঝে ক্ষমতা দখলের নেশায় এখানে বিদ্রোহ সংঘটিত হতো। এ ভাবেই সিকান্দার শাহের পুত্র গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ সোনারগাঁও অঞ্চলের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। আজমশাহের উত্তরসূরীর আমলে অন্যায় ভাবে এ অঞ্চলের ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে বঙ্গের পূর্বাংশের জেলাগুলো প্রায়ই আসাম, ত্রিপুরা এবং আরাকানের রাজাগণের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল ছিল। ১৪১৪ খ্রিস্টাব্দে রাজা গনেশ ইলিয়াস শাহী বংশের উচ্ছেদ করে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৩০ বছর তিনি ও তাঁর বংশধরগণ বাংলা শাসন করেন। ১৪৪৫ খ্রি. ইলিয়াস শাহের উত্তরসূরী মাহমুদ শাহ (১) এর নেতৃত্বে বঙ্গ পুনরায় মুসলমান শাসক কর্তৃক অধিকৃত এবং একত্রিত হয়। শাহ বংশ ১৪৮৭ খ্রি. পর্যন্ত এ অঞ্চল শাসন করেন। এই সময়ে বঙ্গের পূর্বাংশের জেলাগুলো নিয়ে মুজামাবাদ প্রদেশ গঠিত হয় যার বিস্তৃতি ছিল মেঘনা নদীর উত্তর পাড় হতে সিলেট পর্যন্ত এবং দেশের অপরাংশ ঢাকা, ফরিদপুর এবং বাকেরগঞ্জ অঞ্চলকে অভিহিত করা হয় জালালবাদ এবং ফতেহাবাদ নামে।

মহান শাসক আলাউদ্দিন হুসাইন শাহ বঙ্গের পূর্বাংশের জেলাগুলো হতে সমগ্র বঙ্গে তার শাসন বিস্তৃত করেন। আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি. পর্যন্ত বাংলার শাসন কার্য পরিচালনা করেন। আরব বংশোদ্ভূত এ শাসন কর্তাকে মিঃ ভিনসেন্ট স্মিথ মুসলমান শাসকদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট এবং সবচেয়ে বিখ্যাত শাসক হিসাবে অভিহিত করেছেন। আলাউদ্দিন হুসেনশাহ অত্যন্ত ন্যায় পরায়ন মুসলমান শাসক হিসেবে ইতিহাস প্রসিদ্ধ। তিনি প্রজা সাধারণের মঙ্গলের জন্য অনেক জনকল্যাণমুলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন। এ প্রসিদ্ধ শাসকের আমলে 'মনসামঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা বাকেরগঞ্জ জেলার ফুল্লশ্রী গ্রামের বাসিন্দা মধ্যযুগের প্রখ্যাত কবি 'বিজয়গুপ্ত' তার সভাকবি ছিলেন বলে জানা যায়। যশোর, খুলনা, পাবনা এবং ফরিদপুর জেলার নসরতশাহী, মাহমুদশাহী, ইউসুফশাহী, মাহমুদাবাদ পরগণা সমূহের নাম আলাউদ্দিন হুসেনশাহ এর ভ্রাতা ইউসুফশাহ এবং তাঁর পুত্র নসরতশাহ এবং মাহমুদ শাহ এর নামে নামকরণ করা হয়েছে বলে জানা যায়।

হুসেন শাহের আমলের একটি প্রধান শহরের নাম ছিল ফতেহাবাদ যা পরবর্তীতে

ফরিদপুর শহর নামে পরিচিত হয়। লক্ষণাবতীর শাসনকর্তা জালালউদ্দিন ফতেহ শাহ এর নামে (১৪৮১-১৪৮৭ খ্রি.) ফতেহাবাদ পরগণার উৎপত্তি বলে ধারণা করা হয়। ১৫৭৪ খ্রি. বঙ্গদেশ বিজয়ের জন্য যখন মোগল সম্রাট আকবরের সৈন্যবাহিনী নিয়োজিত করা হয় তখন মুরাদ খানের নেতৃত্বে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা বিজয়ের জন্য অন্য একদল সৈন্য নিয়োজিত হয়। 'আকবরনামার' বর্ণনা হতে জানা যায় মুরাদ খান এ অঞ্চল আক্রমন করেন এবং ফতেহাবাদ (ফরিদপুর), বাকলা (বাকেরগঞ্জ) দখল করেন। মুরাদ খান ফতেহাবাদে বসতি স্থাপন করেন এবং ছয় বছর পরে মৃত্যুবরণ করেন। তার নামানুসারে রাজবাড়ী জেলার খানখানাপুরের নামকরণ করা হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। খানখানাপুর গ্রামে তার বসতবাড়ী ছিল বলে জানা যায়।

অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং দুর্গমতার কারণে সম্রাট আকবরের সময় (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি.) বাংলার এ অঞ্চলে মোঘল সাম্রাজ্যের ভিত গড়ে উঠতে পারেনি। এ সময় স্থানীয় কিছু সংখ্যক হিন্দু প্রধান এবং অধিকাংশ মুসলমানদের দ্বারা প্রায় স্বাধীনভাবে এ অঞ্চল শাসিত হতো। অসংখ্য নদী-নালা-খাল-বিল এবং দুর্গম দ্বীপাঞ্চলে আকবরের সৈন্যদের প্রবেশ ছিল অসাধ্য।

ঢাকা জেলার রাজাবাড়ী বার ভূঁইয়াদের অন্যতম চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের রাজধানী ছিল। রাজাবাড়ী বহুপূর্বেই পদ্মা নদীতে বিলীন হয়ে যায়। চাঁদ রায় এবং কেদার রায়ের শাসিত অঞ্চল ঢাকা জেলার রাজাবাড়ী হতে ফরিদপুর জেলার কেদার বাড়ী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পালং থানায় এই দুই বার ভুঁইয়ার দুর্গের চিহ্ন এখনও বর্তমান আছে। আরেকজন বার ভূঁইয়া ছিলেন সিতারাম রায়। তিনি মোঘল শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং বশ্যতা অস্বীকার করেন। ফলে তাকে ধৃত করে হত্যা করা হয়। বার ভূঁইয়াদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং ক্ষমতাবান ছিলেন ঈশা খান। ঈশা খানের রাজধানী ছিল ঢাকা জেলার খিদিরপুর (সোনারগাঁও)। ঐতিহাসিক রালফ্ ফিচ ঈশা খান কে সকল রাজার প্রধান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ভাটি অঞ্চলের শাসক ছিলেন ঈশা খান। এ অঞ্চল ছিল ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা পাড়ের বিস্তৃত অংশ।

সম্রাট আকবরের সময় বাংলাদেশের নাম ছিল সুব-ই-বাংলা। সম্রাট আকবর একের পর এক সেনাপতি পাঠিয়েও এ অঞ্চলকে করায়ত্ব করতে পারেননি। ইসলাম খান যখন বাংলার সুবেদার হন (১৬০৮-১৬১৩ খ্রি.) এই সময় সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে (১৬০৬-১৬২৭ খ্রি.) পূর্ববঙ্গ মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পূর্ব পর্যন্ত ফরিদপুর জেলাও মোগল শাসনের আওতাধীন ছিল। সুবেদার ইসলাম খানের পর ১৬১৩ খ্রি. হতে ১৭৫৭ খ্রি. পর্যন্ত মোট ২১ জন সুবেদার বাংলার এ অঞ্চল শাসন করেন। এ সময় কালকে বাংলার সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ এবং প্রগতির বছর হিসেবে অভিহিত করা হয়।

সুবেদার ইসলাম খানের সময় হতেই বাংলার এ অংশ মাঝে মাঝেই মগ এবং আরাকান দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হতো। পর্তুগীজ জলদস্যুরা তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা দিতো। এ বিষয়টিও ইসলাম খান কর্তৃক ঢাকাকে বাংলার রাজধানী হিসেবে নির্বাচিত করার একটি অন্যতম কারণ। তিনি দেশ রক্ষা এবং জলদস্যুদের আক্রমণ [illegible] করার মানসে ঢাকাকে রাজধানী হিসেবে বেছে নেন। কিন্তু এ পদক্ষেপও

জলদস্যুদের সম্পূর্ণ প্রতিহত করতে পারেনি। ১৬৬৬ খ্রি. নবাব শায়েস্তা খান মগ, আরাকানীজ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের বাংলার সমগ্র অঞ্চল হতে বিতাড়িত করেন। শায়েস্তা খানের আমলে মোগলদের শাসন ফরিদপুরসহ এ অঞ্চলে দৃঢ় ভিত্তিলাভ করে। শায়েস্তা খানের শাসন আমল ছিল ঐতিহ্য মণ্ডিত এক স্বর্ণযুগ। তখন ১৬৮৮ খ্রি. টাকায় ৮ মন চাল পাওয়া যেত বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও যোগ্যতার সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করে এ অঞ্চলকে শান্তির আবাসভূমি হিসেবে গড়ে তোলেন। সম্মানিত পরিবারগুলোর মধ্যে বিনা রাজস্বে ভূমি বরাদ্দ প্রদান করেন যা তাঁকে অসম্ভব জনপ্রিয় করে তুলে।

শায়েস্তা খানের পর বাংলার সুবেদার নিয়োজিত হন নবাব মুরশিদ কুলী খান (১৭০৩-১৭২৬ খ্রি.)। বাংলার ইতিহাসে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ এবং কুশলী মোগল শাসক। তিনি এ জেলাকে রাজস্ব প্রশাসনিক একক হিসাবে সংগঠিত করেন। রাজস্ব আদায়ের উন্নয়ন ঘটান। মালিকানা স্বত্ব সংশোধন এবং নতুন জরিপের মাধ্যমে তিনি ভূমি রাজস্ব সংশোধন করেন।

১৭৫৭ খ্রি. বাংলায় মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার শাসনভার অন্যায়ভাবে দখল করে। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হয়। বাংলার ইতিহাসে অমানিশার ঘোর অন্ধকার নেমে আসে। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত করে লর্ড ক্লাইভ বাংলার মসনদ দখল করেন। ১৭৬৫ খ্রি. মাত্র ৬৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ইংরেজগণ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে। বাংলার অংশ হিসেবে ফরিদপুর অঞ্চল ও ইংরেজদের অধীনে চলে আসে।

ভাইসরয় লর্ড কার্জনের আমলে (১৮৯৯-১৯০৫ খ্রি.) ১৯০৫ সালে দুই বাংলা বিভক্ত হয়ে যায়। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এ বিভক্তি সুদূর প্রসারী ফলাফলের সৃষ্টি করে। পূর্ববঙ্গে এবং আসামে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ট থাকায় এ অঞ্চলে তারা বঙ্গভঙ্গ কে স্বাগত জানায়। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায় এর বিরোধিতা করে। ১৯০৬ সালে এ জেলার হিন্দু সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। তারা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ববাংলা নতুন প্রদেশ সৃষ্টির বিরোধিতা করে এবং সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী বাঙালি সম্প্রদায়কে একটি জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানায়। পূর্ববঙ্গ ও আসামের তৎকালীন গভর্ণর স্যার ফুলার এ আন্দোলনকে দমন করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু আন্দোলন স্তিমিত না হয়ে আরো জঙ্গিরূপ ধারণ করে। ফলে ১৯১১ সালে ইংরেজ শাসক বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হয়। স্বরাজ আন্দোলন এ জেলার জন মানসে ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮ খ্রি.) পর হতেই এ অঞ্চলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চাঙ্গা হতে থাকে। সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগ এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৯১৬ সালের পরে ছয় বছর একই সাথে আন্দোলন সংগ্রাম করে। ১৯২০ খ্রি. মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলীর নেতৃত্বে এতদঞ্চলের মুসলমানগণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে খেলাফত আন্দোলনে অংশ নেয়। এর এক বছর পর মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ এ আন্দোলনে

সমর্থন জানায়। এ জেলার হিন্দু মুসলমান যৌথভাবে আন্দোলনে অংশ নেয়। এ জেলার কৃতি সন্তান মৌলভী তমিজউদ্দিন খান এ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে নতুন মাত্রা যোগ করেন। তিনি এ জেলায় খেলাফত আন্দোলন কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং জাতীয় কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং তিনি কারাবরণ করেন। পরে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেন। এ জেলার কংগ্রেসের দুই বিখ্যাত নেতা ছিলেন বাবু আম্বিকাচরণ মজুমদার।

মুসলিম লীগের প্রখ্যাত নেতা মৌলভী তমিজউদ্দিন খান, শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুসলমানদের জন্য একটি আলাদা আবাসভূমি তথা পাকিস্তান আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। ফলশ্রুতিতে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারত বিভক্ত হয়ে ইন্ডিয়া ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমানে বাংলাদেশ) ফরিদপুর জেলা অন্তর্ভুক্ত হয়।

দেশ বিভাগের পর হতেই পশ্চিম পাকিস্তানীরা এ অঞ্চলের জনসাধারণের প্রতি অবিচার ও বৈষম্যমূলক আচরণ করতে থাকে। শিক্ষা, কর্মসংস্থান, ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করতে থাকে। তাঁদের এ অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে এতদ্অঞ্চলের মানুষের ক্ষোভ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ২১ শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই আন্দোলনে সম্পৃক্ত ছাত্রদের পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারির স্মরণে এখন সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হচ্ছে। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করার অল্প কিছুদিন পরেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক এ মন্ত্রিসভা বাতিল করা হয়। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জাকে বন্দুকের নলের জোরে অপসারণ করে আরেক জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করেন। তাঁর অত্যাচারে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ অতিষ্ট হয়ে উঠে। স্বায়ত্ব শাসন দাবী করে, ছয় দফা পেশ করে। ছয় দফাকে স্বাধিকারের 'ম্যাগনাকার্টা' হিসাবে অভিহিত করা হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ছাত্রদের এগার দফা। আন্দোলন নতুন মাত্রা পায়। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ সংগঠিত হতে থাকে। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে গণ অভ্যুত্থান সৃষ্টি হয়। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে বাঙ্গালীরা পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা লাভের রায় পেলেও পশ্চিম পাকিস্তানীরা ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ তারা পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর হামলা চালিয়ে ইতিহাসের নজীর বিহীন হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত করে। হাজার হাজার বাড়িঘরে অগ্নি সংযোগ করে। লক্ষ লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রম কেড়ে নেয়। নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর একটি অসম জনযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে বিশ্ব মানচিত্রে অভ্যুদয় হয় একটি নতুন দেশের। নাম তার বাংলাদেশ। ফরিদপুর জেলাটি বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রাচীন জেলা।

পাকিস্তানের প্রথমদিকে পূর্ব পাকিস্তান জেলার সংখ্যা ছিল ১৭টি। পাকিস্তানের শেষ আমলে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে পটুয়াখালী ও টাংগাইল নামে আরো দু'টি জেলা সৃষ্টির পর জেলার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯টিতে। বর্তমানে বাংলাদেশে জেলার সংখ্যা ৬৪টি।

অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও আর্য জাতির প্রবাহমান রক্তের সংমিশ্রণে বাঙ্গালি একটি সংকর জাতি হিসেবে পরিচিত। তবে বাঙ্গালির রক্তে কোল, ভীল, সাঁওতাল ও মুণ্ডা উপজাতির রক্তের প্রভাব বেশি। ফরিদপুর জেলাটি গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলে অবস্থিত বিধায় বাঙ্গালির মূল বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতি এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

উপর্যুপরি বন্যার ফলে নদীগুলোর দু'পাশের জমিতে প্রচুর পলি পড়ে। যার ফলে এখানকার মৃত্তিকা খুব উর্বর। জেলার দক্ষিণাংশে অসংখ্য বিলের আধিক্য পরিলক্ষিত হয় এবং এ নিম্নাঞ্চলসমূহ বছরের অধিকাংশ সময় পানিতে নিমজ্জিত থাকে। ফরিদপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর এবং গোপালগঞ্জ এ অঞ্চলগুলোর আওতাভূক্ত। এ অঞ্চলের বর্ণনা দিতে গিয়ে ১৯১৬ সনে মিঃ জে.সি. জ্যাক, আই.সি.এস তাঁর The Economic Life of Bengal District বইতে লিখেছেন :

"In the south-east, the land is still below flood level and broad rivers and countless streams are still building up their banks; In the south-west, the rivers are flanked by wide strips of land which has emerged but marsh (beel) is still prodominant ; in the north, the land is generally above flood level, broad rivers have given place to narrow streams, which are usually dry, hollows are already small and are slowly disappearing. In the south-western part of the district, the whole land is a vast marsh, yet able to sustain a large and growing population. In the normal course, this land would have been raised any centuries ago by silt from the great rivers, but owing to adrupt and unexplained change in their courses, those rivers abadnoned it and went further eastward, leaving a few smaller distributaries to fill up the vast basin."

ইতিহাসের পথ বেয়ে বেয়ে কালের বিবর্তনে এ অঞ্চলের মানুষের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য হয়েছে সমৃদ্ধ। পূর্ব বঙ্গের মধ্যভাগে অবস্থান এবং ঢাকা জালালপুর জেলার অংশ হিসাবে দীর্ঘদিন থাকার ফলে প্রাকৃতজন তথা বাঙ্গালির প্রকৃত বৈশিষ্ট্য এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে পুরোপুরি বিদ্যমান।

প্রকৃত অর্থে বঙ্গের প্রতিনিধিত্ব বিভিন্ন সময়ে এ জেলার মানুষই সফলভাবে সম্পাদন করেছে। গঙ্গার অববাহিকায় অবস্থান বিধায় নদীর ভাঙ্গা গড়ার খেলা গণমানুষের চরিত্রে এবং আচার আচরণে পরিলক্ষিত হয়।

নদীবিধৌত এ অঞ্চলের মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর নদীর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। এক সময় যোগাযোগের এবং পণ্য পরিবহণের একমাত্র মাধ্যম ছিল নদী-নালা-খালবিল। কালের বিবর্তনে এবং সভ্যতা বিকাশের সংগে সংগে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। তবুও নদীর ভাংগা গড়ার খেলা এ অঞ্চলের মানুষের মন ও মননকে এখনও আচ্ছন্ন করে রাখে।

নদীর এ কুল ভাঙ্গে ও কুল গড়ে
এইতো নদীর খেলা,
সকাল বেলা আমির যে ভাই
ফকির সন্ধ্যা বেলা।

বাউল কবির গানের এ চরণগুলো এখনও এ অঞ্চলের মানুষের জীবনে অমোঘ সত্য। প্রতিবছর নদী ভাঙ্গনে সর্বশান্ত হয় অসংখ্য মানুষ। বাপ দাদার পুরনো ভিটা, চাষের জমি এক নিমিষে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে মানুষ এক অঞ্চল হতে অন্য অঞ্চলে গমন করে। আবার নদীতে চর জাগে, পলি মাটিতে নতুন করে ঘর বাঁধার, বাঁচার স্বপ্ন দেখে সর্বহারা মানুষ। পলল মৃত্তিকায় চালাঘর তৈরী করে, লাউ এবং শীমের মাচান তুলে দেয় ঘরের বারান্দায়। আর এভাবেই তারা নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। সতত নদীর ভাঙ্গা গড়ার খেলা মানুষের মনকে আলোড়িত করে। পদ্মা পাড়ের এই মানুষগুলোর জীবন ভাবনার সাথে নদী তাই একান্তভাবে জড়িয়ে আছে। নদীর সাথে তাদের জীবন জীবিকা ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। ক্ষ্যাপানদী আর ক্ষ্যাপা জীবন তাদের কাছে দুটোই সমান সত্য। একসময় এ অঞ্চলের মানুষের প্রধান জীবিকা ছিল নদী নালা-খাল-বিল হতে মৎস আহরণ এবং পলি-গঠিত উর্বর মৃত্তিকায় বিভিন্ন রকম শস্য উৎপাদন।

এ জেলার প্রধান নদ নদীগুলো হলো, পদ্মা, মরাপদ্মা, গড়াই, আড়িয়াল খাঁ, বারাশিয়া, মধুমতি, চন্দনা, কুমার, বিলপদ্মা ইত্যাদি। এ নদীগুলোর মধ্যে পদ্মা সর্ব বৃহৎ এবং এ অঞ্চলের মানুষের জীবন জীবিকার উপর এর প্রভাব ব্যাপক এবং সুদূরপ্রসারী।

এ অঞ্চলগুলোতে এক সময় মিঠা পানির সুস্বাদু মৎস সমূহ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। এর মধ্যে বোয়াল, পাবদা, রুই, কাতল, মৃগেল, চিতল, কই, মাগুর, শিং, শোল, টেংরা, পুটি, ভ্যাদা (রয়না বা মেনি), আইড়, পাংগাশ, বাইন, সরপুঁটি, খলিশা, টাকি, গজার, চান্দা, বৈচা, ফাইসা, চেলা ইত্যাদি অন্যতম। এ অঞ্চলের পদ্মার রূপালী ইলিশ জগত বিখ্যাত। যার সুনাম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। একমাত্র সামুদ্রিক মাছ ভেটকী যা স্থানীয়ভাবে 'কোরাল' নামে পরিচিত তাও এখানে পাওয়া যেত। এখন অবশ্য কিছু কিছু সামুদ্রিক মাছ যেমন; রূপচাঁদা, ছুড়ি, লইট্যা, ফাইসা, মেধ, দাতিনা কখনও কখনও খুব স্বল্পাকারে স্থানীয় বাজারে পাওয়া যায়।

এ অঞ্চলের উৎপাদিত প্রধান খাদ্য শস্য এবং অর্থকরী ফসলগুলো হলো : ধান, গম, মসুর, খেসারী, মাস কলাই, ছোলা, সরিষা, তিল, তিসি, মেথি, ধনিয়া, কাঁচা মরিচ, পিঁয়াজ, রসুন, আখ এবং পাট ইত্যাদি। এখানকার উৎপাদিত উন্নতমানের পাট 'সোনালী আঁশ' নামে পরিচিত এবং সমগ্র পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিল। মাদারীপুরে উৎপাদিত খেজুরের পাটালী গুড় এতদ্অঞ্চলে অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং প্রসিদ্ধ। প্রচুর পরিমাণে আখ উৎপাদনের কারণে এখানে একটি চিনি কল গড়ে উঠেছে।

এ জেলার মানুষের কিছু কিছু সংস্কার ও আচরণ দেশের অন্যান্য অঞ্চল হতে আলাদা বৈশিষ্ট্যের ছিল। বার মাসে তের পার্বণ, জামাই ষষ্ঠী, আত্মীয় স্বজন নিমন্ত্রণ করে বিভিন্ন রকম পিঠা যেমন, ভাপা, পুলি, পাটিসাপটা, দুধ পিঠা, রসের পিটা, কাটা পিঠা, চিতই পিঠা, ঝুড়ি পিঠা, তেলের পিঠা, বড়া পিঠা, পাকন পিঠা, নারকেলী পিঠা, করলা ফরাস পিঠা ইত্যাদি খাওয়ার ধুম পড়ে যেত। এ জেলার মানুষের অতিথি পরায়ণতা সর্বজন বিদিত। পৌষ সংক্রান্তিতে গাঁয়ের মানুষ স্থানীয় বিলে পলো দিয়ে মাছ ধরার উৎসবে মেতে উঠতো। জেলার কোনো কোনো অঞ্চলে এ উৎসবকে "হাকরাইন" উৎসব বলা হতো।

আশ্বিন মাসের শেষ দিনে গ্রামের ছেলে মেয়েরা আরেক ধরনের উৎসবে মেতে

উঠতো। যাকে স্থানীয় ভাষায় বলা হতো 'গাশ্‌শি'। আম, জাম, পেয়ারা, ইত্যাদি গাছের মুকুল সংগ্রহ করে, কাঁচা হলুদ বেটে, আশ্বিন মাসের শেষ দিন দিবাগত ভোর রাতে তারা স্থানীয় নদী, খাল, বিলে দল বেঁধে গোসল করতো, নিজেদের মঙ্গল কামনা করতো, সবাই মিলে কুলা পিটিয়ে গ্রাম থেকে মশা তাড়াতো। কলার বাকল দিয়ে নৌকা বানিয়ে তার মধ্যে মাটির প্রদীপ জ্বেলে নদীতে ভাসিয়ে দিতো। আশ্বিন মাসের শেষ দিনে বিকালে রান্না করা নতুন চালের ভাত, ডাল এবং কচুর লতির তরকারী কার্তিক মাসে প্রথম দিন খেতো। তালের ফোঁপড়া তুলে খেতো।*

মুরুব্বীদের মুখে শোনা যেত নিম্নরূপ খনার বচন

আশ্বিনে রাঁধে কার্তিকে খায়,
যেই বর মাগে সেই বর পায়।

চৈত্র সংক্রান্তিতে গাঁয়ের হাটের বটতলায় কয়েকদিনব্যাপী মেলা বসত। গায়ের ছেলে মেয়েরা মেলা থেকে খেলনা, বাঁশি এবং মিষ্টি কিনে মাটির হাড়িতে ভরে নিয়ে আসতো। এ উৎসবকে কোনো কোনো অঞ্চলে স্থানীয় ভাষায় 'গলুইয়া' বলা হতো।

সাধারণ বাঙ্গালি মুসলমানগণের পরিধেয় পোশাক লুঙ্গি, গামছা, গেঞ্জি, শার্ট, পাজামা-পাঞ্জাবি ইত্যাদি। হিন্দুদের পরিধেয় পোশাক ধুতি, লুঙ্গি, গামছা, শার্ট পায়জামা ইত্যাদি। বিয়ের সময় মুসলমান যুবকেরা শেরওয়ানি পাজামা পড়ে, পাগড়ি মাথায় দেয়। হিন্দু বরেরা পাজামা-পাঞ্জাবির অথবা ধুতির সাথে মুকুট মাথায় দেয়। মহিলাদের সাধারণ পোশাক শাড়ি ব্লাউজ। শীতের সময় পুরুষ মহিলা উভয়ই চাদর পরিধান করে।

গ্রাম্য কুলবধুরা অধিকাংশই তাদের গৃহস্থালী কাজে মাটির তৈরি তৈজস পত্র যেমন মটকা, হাড়ি, কলস, বাসন-কোসন, কড়াই পাতিল, সরা ইত্যাদি ব্যবহার করত। এগুলো তারা বিভিন্ন শস্যের বিনিময়ে ফেরীওয়ালা কুমারদের নিকট হতে ক্রয় করত। অবসর সময়ে তাদের প্রিয় শখ ছিল নকশী কাঁথা বুনন এবং পাশের বাড়ির সহচরীর সঙ্গে পান খাওয়ার আনন্দ উপভোগ করা।

এ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিবাহ অনুষ্ঠানে গ্রাম্য বালিকা ও কুলবধূগণ একত্রে গলা মিলিয়ে সুর করে বিভিন্ন ধরনের গীত গাইতো। এ গ্রাম্য গীতের অধিকাংশগুলোতে থাকতো বর বধু, তাদের আত্মীয়স্বজন, ঘটক এবং বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিন্দা বা প্রশস্তিসূচক বর্ণনা। নিম্নে একটি গ্রাম্য গীতের নমুনা প্রদর্শন করা হলো ঃ—

বরতে আইছে বরণী কন্যা বরতে নালো জানে,
হাউলকা মাঞ্জা ডুলাইয়া ডালাইয়া গেরামী পাগল করে নালো,
গেরামী বেডারা বড়ই ঠ্যাডা তুইল্যা নিলো কোলে,
দুই গালে দুই চুমা না দিয়া লইয়া গেল ঘরে নারে।**

নবান্ন উৎসব, পহেলা বৈশাখ, হালখাতা ইত্যাদি অনুষ্ঠান এ অঞ্চলের মানুষ পালন করতো। এ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের গরিব কৃষি শ্রমিকগণ ধান কাটার জন্য প্রতি বছর উত্তরের সিলেট এবং ময়মনসিংহ অঞ্চল এবং দক্ষিণের খুলনা, বাগেরহাট (সুন্দরবন

* এটি খনার বচন নয়, গাশশি উৎসবে পরিবেশিত লোকছড়া। – সম্পাদক।

** টীকা : বরতে (বরণ করতে), হাউলকা (হাল্কা বা পাতলা), মাঞ্জা (কোমর), ডুলাইয়া ডালাইয়া (দুলিয়ে দুলিয়ে), গেরামী (গ্রাম্য), বেডারা (গ্রাম্য পুরুষ), ঠ্যাডা (খারাপ)।

অঞ্চল) অঞ্চলে গমন করতো। তাদের বিদায় মুহূর্তে আত্মীয় স্বজন কান্নায় ভেঙ্গে পড়তো। মনে হতো তারা আর কোনোদিন ফিরে আসবে না। শেষ বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে। উত্তর অঞ্চল থেকে ধান কেটে আসার সময় (সাধারণত) বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে তাদের অনেকের নৌকা কালবৈশাখীর কবলে পড়তো। প্রচুর জানমাল হজরত খোয়জ খিজির (আ.) এবং বদর পীরের নামে মানত করতো। দক্ষিণ অঞ্চলের সুন্দর বনের বাঘের কবল হতে বাঁচার জন্য তারা গাজী, কালু ও বনের দেবতা দক্ষিণারায়ের নামে মানত করতো। কোথাও রওয়ানা দিয়ে বাঁধা পেলে, পেঁচা ডাকলে, গরু হাম্বা ডাকলে, টিকটিকি ডেকে উঠলে অমঙ্গল আশংকায় যাত্রা বাতিল করতো অথবা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করতো। কেউ ভয় পেলে লবণ পানি খাইয়ে দিতো। শিশুদের স্বাস্থ্য ভালো থাকার জন্য গলায় কড়ি বেঁধে রাখতো। কুটুমপাখি ডাকলে মনে করা হতো বাড়িতে অতিথি আসবে। রাতে কুকুর ডাকলে অমংগলের আশঙ্কা করতো এ অঞ্চলের মানুষ।

দুর্গা পূজায় দশোহরার সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা খুব আনন্দ ফূর্তি করতো। এ সময় যাত্রা, নৌকাবাইচ, পুতুলনাচ, সার্কাস ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হতো। বহুদূর হতে ঢাক-ঢোলের আওয়াজ শোনা যেত।

যে কোনো শুভ কাজ শুরু করার আগে এবং নানা উছিলায় মুসলমানদের ঘরে ঘরে মিলাদ শরীফ (স্থানীয় ভাষায় মৌলুদ শরীফ) অনুষ্ঠিত হতো এবং এখনও হয়। মিষ্টি অথবা পায়েশ মিলাদে তবারক হিসেবে বিতরণ করা হয়।

এ জেলার গ্রামাঞ্চলে জনপ্রিয় খেলা ছিল হা-ডু-ডু, দাঁড়িয়াবাঁধা, গোল্লাছুট, বউচি ইত্যাদি। শহরের এবং গ্রামের কিছু সীমিত অঞ্চলে ফুটবল জনপ্রিয় খেলা ছিল। ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস আধুনিক ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের খেলা হিসেবে খুবই অল্প সংখ্যক মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে। ব্যাপক সংখ্যক মানুষের প্রিয় খেলা ছিল হা-ডু-ডু। বাজি ধরে হা-ডু-ডু খেলা হতো। বিজয়ীদের মধ্যে রেডিও-সাইকেল ইত্যাদি পুরস্কার হিসেবে বিতরণ করা হতো। এ ছাড়া তাস, কেরাম, লুডু, বাঘগুটি, বাগডুলি ইত্যাদি খেলাও গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত আছে। আবহমান বাংলার ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত খেলাগুলো আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। তার জায়গায় একবিংশ শতাব্দীতে জায়গা করে নিচ্ছে ক্রিকেট। ক্রিকেট এখন গ্রাম ও শহরাঞ্চলে সমান জনপ্রিয়।

সংস্কার হোক, কুসংস্কার হোক আবহমান বাংলার এ অঞ্চলের বাত্যজনের হাজার বছরের প্রাত্যহিক আচরণের কিছু বৈশিষ্ট মাত্র উপরে তুলে ধরা হলো।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব আবিষ্কার, সভ্যতার বিকাশ এবং কালের করাল থাবায় বাঙালির সংস্কৃতির হাজার বছরের পুরনো বৈশিষ্ট্য সমূহের অধিকাংশই বর্তমানে বিলুপ্ত প্রায় এবং অস্তিত্বমান কিছু বৈশিষ্ট্য দ্রুত বিলীয়মান।

এ অঞ্চলের মুসলমানগণ অত্যন্ত ধর্মভীরু। ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী, শবে বরাত, শবে কদর, মহররম এ সমস্ত ধর্মীয় উৎসবগুলো এ জেলার মানুষ অত্যন্ত ভাব-গাম্ভীর্যের সঙ্গে পালন করে।

আউলিয়া, দরবেশ, পীর, মাশায়েখগণের প্রতি এ অঞ্চলের মানুষ অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। এ অঞ্চলের মুসলিমদের সাধারণ বিশ্বাস পীর সাহেব পানিতে ফুঁ দিলে সে পানি খেলে যে কোনো রোগ ভাল হয়ে যাবে।

এ জেলার অধিকাংশ সাধারণ মুসলমান এক সময় এ অঞ্চলের প্রখ্যাত অলীয়ে কামেল হাজী শরিয়তউল্লাহ (রহঃ) এবং তাঁর পুত্র দুদু মিয়ার অনুসারী ছিল। হাজী শরিয়ত উল্লাহ শিবচর উপজেলার শামাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র আঠারো বছর বয়সে তিনি মক্কা গমন করেন। এক প্রতিবেদনে জানা যায় তিনি হযরত আল শেখ তাহিরের (যিনি সম্বল আল মক্কী নামে পরিচিত) সঙ্গে থেকে পড়াশোনা করেন এবং বিশ বছর মক্কায় অবস্থানের পর উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে দেশে ফিরে আসেন। তাঁর জন্ম সম্পর্কে Dr. James wise তার প্রবন্ধে লিখেন :

"The first person, The Mohammedans of Eastern Bengal, who stirred his countrymen, by resuscitating the dormant spirit of their faith, was Haji Shariatullah, born of obscure parents, probably Jolhas or weavers, who resided in a village of pargana Bandarkhola, Zilla Faridpur."

হাজী শরিয়তউল্লাহ মুসলিম সমাজ সংস্কারক ছিলেন। তিনি বঞ্চিত, নিপীড়িত মুসলিম জনগোষ্ঠীর পক্ষে তাঁর আন্দোলন শুরু করেন। ইংরেজ এবং হিন্দু জমিদারদের দ্বারা শোষিত জনগণ তাঁর এ আন্দোলনে ব্যাপকভাবে সাড়া দেয়। ইসলামের ইতিহাসে তাঁর এ আন্দোলন ফরায়েজী আন্দোলন নামে পরিচিত। ফরায়েজ অর্থ কর্তব্য বা করণীয়সমূহ। কোরআন এবং সুন্নাহর আলোকে কি করণীয় এবং কি বর্জনীয় তাই ফরায়েজী আন্দোলনের মূল বিষয়বস্তু। তাঁর অনুসারীগণ ফরায়েজী নামে অভিহিত।

হাজী শরিয়তউল্লাহ বাঙালি মুসলমান সমাজ জীবন হতে সকল প্রকার কুসংস্কার, বিদআত দূরীভূত করার জন্য ফরায়েজী আন্দোলন শুরু করেন। প্রথমে ধর্মীয় আন্দোলন হিসেবে পরিচালিত হলেও পরে এটি সমাজ সংস্কারের প্রধান হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়। কবর পূজা, পীর পুজা, দরগা পূজা, গাজীর শিরনী, ফাতেমার শিরনী, পাঁচ পীরের পূজা, বদর পীরের পূজা, খোয়াজ খিজিরের নামে ভেলা ভাসানো ইত্যাদি অনৈসলামিক এবং বেশরা কাজ নিবৃত্ত করার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন। হাজী শরীয়তউল্লাহ মহররম উৎসব-পালন, শিশু জন্মের চৌদ্দ দিনের মধ্যে পট্টি, চাট্টি এবং চিল্লা প্রথা, আকিকা প্রথা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করেন। এ অঞ্চল তখন ইংরেজ শাসিত ছিল বিধায় তিনি এ অঞ্চলকে 'দারুল হরব' ঘোষণা করে পরাধীন দেশে জুম্মার নামাজ এবং ঈদের নামাজ পড়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। James Taylor এর মতে,

"They (The Farazis) Profess to adhere to the strict letter of koran and reject all ceremonies those are not Sanctioned by it ... the Commemoration of the martyrdom of Hassan and Hussain ... is not only forbidden but even witnessing the ceremonies connected with it is a avoided by them. They reject the rites of puttee, chuttee and chiilla which are performed between the first and fourteenth day after the birth of a child and observe the rite of 'Aqiqa'. In the same way they have divested the marriage ceremony of its formalities. The funeral obsequies are conducted with a corresponding degree of simplicity. offerings of fruits and flowers at the grave and the various fatiha ceremonies being prohibited; their graves are not raised above the surface of the ground nor marked by any building or brick of stone. To impress upon the mind of his followers that the English were-the rulers of the country and that

they were living in a 'Darul Harab' Shariatullah declared that no Ed or Friday Congregational prayer could be said in Bengal."

শিশুদের ব্যয় বহুল জন্ম উৎসব এখন পালন করা না হলেও স্বচ্ছল মুসলিম ব্যক্তিবর্গ তাদের সাধ্যমতো আকিকা উৎসব পালন করেন। মৃত মুসলিম নর-নারীকে কবর দেয়া হয়, অন্যদিকে মৃত হিন্দু নর-নারীকে চিতায় পোড়ানো হয়। মৃত্যুর ৪০ দিন পরে মুসলমান সমাজে বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া-মুনাজাত করা হয় এবং ভুরিভোজের আয়োজন করা হয়। মৃত ব্যক্তির নামে ভুরিভোজের অনুষ্ঠানকে মুসলিম সমাজে 'জিয়াফত' এবং কোনো কোনো স্থানে ফয়তা বলে। হিন্দু সমাজে মৃত্যুর পর ভোজ অনুষ্ঠানকে বলে 'শ্রাদ্ধ'।

হাজী শরীয়তউল্লাহ এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র অলীয়ে কামেল হযরত মাওলানা মোহসেন উদ্দিন আহমেদ দুদু মিয়া নীলকর সাহেবদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। দুদু মিয়ার অনুসারীগণ ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ ডিসেম্বর শিবচরের পাঁচচরে ইংরেজ সাহেব ডানলপ এর কুঠিবাড়ীতে আক্রমণ করেন এবং আগুন দিয়ে পুঁড়িয়ে দেন। ডানলপের ব্রাহ্মণ গোমস্তাকে বাকেরগঞ্জে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়। ডানলপ এর অভিযোগের ভিত্তিতে এ ঘটনায় দুদু মিয়া এবং তাঁর অনুসারীদের সাজা হয়। কিন্তু আপীলে তিনি বেকসুর খালাস পান। এ জেলার মুসলিম জাগরণে এবং মুসলিম সমাজ সংস্কারে হাজী শরীয়তউল্লাহ ও মোহসেন উদ্দিন আহমেদ দুদু মিয়ার অবদান চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁরা তাঁদের অনন্য কীর্তিতে মহিমান্বিত।

ফরিদপুর অঞ্চলের সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে যার নামটি শ্রদ্ধার সঙ্গে সর্বাগ্রে স্মরণ করতে হয় তিনি হলেন পল্লী কবি জসীম উদ্‌দীন। রবীন্দ্র-নজরুল যুগে জন্ম গ্রহণ করেও তাঁদের অসাধারণ প্রভাব কাটিয়ে স্বকীয় অনন্য মহিমায় বাংলা সাহিত্য জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি গ্রাম বাংলার প্রতি সাধারণ মানুষের জীবন কাহিনীকে তাঁর কলমের আঁচড়ে অপূর্ব মহিমায় ফুটিয়ে তুলে নিজে হয়েছেন অনন্য সাধারণ। তাঁর রচিত গল্পগাথা, কবিতা, গান নাটক ইত্যাদি হয়েছে শিল্পোত্তীর্ণ এবং কালোত্তীর্ণ। পল্লীর মানুষের আনন্দ- বেদনা, সুখ-দুঃখ, প্রেম-ভালোবাসা, মিলন-বিরহ ইত্যাদি বিষয়কে তাঁর রচনার উপজীব্য করে তিনি ভূষিত হয়েছেন 'পল্লীকবি' নামে। তিনি ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পৈত্রিক নিবাস একই জেলার অম্বিকাপুর গ্রামে। ড. দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক তিনি পল্লীসংগীত সংগ্রহে নিয়োজিত হন। বাংলার বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে ঘুরে তিনি প্রচুর গ্রাম্য গাথা, গীত সংগ্রহ করেন।

ভাটিয়ালী সংগীতে অসাধারণ সংগ্রহ তাঁর 'রঙ্গীলা নায়ের মাঝি'। গ্রাম্য নৌকার মাঝিদের সুখ-দুঃখ এ গানগুলোতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। জসীম উদদীন তাঁর অসংখ্য অমূল্য সৃষ্টি সম্ভারে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। তিনি শিশুদের জন্য লিখেছেন হাসু, এক পয়সার বাঁশি, ডালিম কুমার, বাংগালীর হাসির গল্প। কাব্যগ্রন্থ লিখেছেন, নকশী কাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট, মা যে জননী কান্দে, রাখালী, বালুচর, ধানক্ষেত, রূপবতী, মাটির কান্না, সুচয়নী ইত্যাদি। কবিতার পাশাপাশি তিনি গদ্যও লিখেছেন প্রচুর। সে সব সুধী সমাজে আদৃত হয়েছে ব্যাপকভাবে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে, যাঁদের দেখেছি, ঠাকুরবাড়ীর আঙিনায়, জীবন কথা ইত্যাদি। অনেক

সুখপাঠ্য ভ্রমণ কাহিনীও লিখেছেন তিনি চলে মুসাফির, হলদে পরীর দেশ, যে দেশে মানুষ বড় তাঁর সুপরিচিত ভ্রমণ কাহিনী। তাঁর বেশ কিছু নাটক বাংলা সাহিত্যের অনন্য সংযোজন। পদ্মা পাড়, বেদের মেয়ে, মধুমালা, পল্লীবধু, গ্রামের মায়া এগুলোর মধ্যে অন্যতম। উপন্যাস লিখেছেন, বোবা কাহিনী নামে। সংগীত গ্রন্থ লিখেছেন, রঙ্গিলা নায়ের মাঝি, গাঙ্গের পাড় এবং জারীগান নামে। তাঁর সুবিখ্যাত নক্শী কাঁথার মাঠ কাব্যটি "ফিল্ড অব দি এমব্রয়ডারী কুইল্ট" নামে ইংরেজিতে অনুদিত হয়েছে। আজীবন মাটি ও মানুষের কাছাকাছি থেকে এ অসাধারণ কবি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চির দিনের মতো বিদায় গ্রহণ করেন এবং তাঁর অন্তিম ইচ্ছানুসারে 'কবর' কবিতায় উল্লেখিত ফরিদপুরের অম্বিকাপুর গ্রামে ডালিম গাছের নিচে তাঁর পিতার কবরের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

কবি সাহিত্যিক এবং শিক্ষাবিদদের মধ্যে এ জেলায় আরো যাঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁদের কয়েক জনের নাম* উল্লেখ করা হলো:—

সুকান্ত ভট্টাচার্য (কবি)
এয়াকুব আলী চৌধুরী (প্রাবন্ধিক)
আবদুল ওদুদ (প্রাবন্ধিক)
কাজী মোতাহার হোসেন (প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ)
সুফী মোতাহার হোসেন (লেখক ও কবি)
অধ্যাপক নুরুল মোমেন (বিশিষ্ট নাট্যকার)
আবু ইসহাক (উপন্যাসিক)
আবুল হোসেন মিয়া (কবি ও ছড়াকার)
অসীম সাহা (কবি)

বিখ্যাত 'বিষাদ সিন্ধুর' রচয়িতা মীর মশাররফ হোসেন এ জেলার পদমদীতে তাঁর জীবনের একটি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছেন। এজেলার কয়েকজন কৃতি সন্তান ভারতের পশ্চিমবঙ্গেও অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় দীপ্যমান। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক, উপন্যাসিক ও গল্পকার। মৃণাল সেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক। অনুপ ঘোষাল বিখ্যাত সংগীত শিল্পী। তাঁদের অবদান অতুলনীয় এবং অসাধারণ।

এ জেলার গ্রাম অঞ্চলের অধিকাংশ জনগণের বিনোদনের একটি জনপ্রিয় মাধ্যম ছিল পুঁথি সাহিত্য। পুঁথি সাহিত্যে আউলিয়া দরবেশগণের অলৌকিক কীর্তি এবং মুসলিম বীরযোদ্ধাদের বীরত্বের কাহিনীর বর্ণনা থাকতো। কিছু পুঁথি সাহিত্যের বর্ণনা ছিল রূপক বিষয়বস্তু ভিত্তিক। গ্রামের বাড়ির আঙিনায় মাদুর বিছিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত সুর করে পুঁথি পাঠ করা হতো। পুঁথি পাঠ গ্রামের সাধারণ মানুষ অত্যন্ত পছন্দ করত। গভীর মনোযোগের সাথে শ্রবণ করে তাদের বিনোদন তৃষ্ণা প্রশমিত করত। উল্লেখযোগ্য পুঁথি সমূহ ছিল, জঙ্গে কারবালা, সোনাভানের পুঁথি, ছয়ফুল মুল্লুক বদিউজ্জামাল, গফুর বাদশা

* পালসম্রাট এই তালিকায় ব্রজেন্দ্রকুমার দে, নরেন বিশ্বাস, ড. সনজীদা খাতুন, রথীন্দ্রকান্ত ঘটকচৌধুরী, হাবীবুল্লাহ সিরাজী, আ.ন.ম আবদুস সোবহান, কাজলেন্দু দে, ড. দুলাল ভৌমিক, বাবু ফরিদী, মাসুদ রেজা, অঞ্জনা সাহা, আবু জাফর দিলু, রবীন্দ্রনাথ অধিকারী, কবি দুলাল সরকারের নাম উল্লেখ করা যায়। –সম্পাদক

বানেছা পরী, হাতেম তাই, হাশেম কাজীর পুঁথি ইত্যাদি। গ্রাম্য লোক কবিগণ বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে তাদের নিজস্ব রচিত চটি কবিতা গ্রাম্য হাটে সুর করে পাঠ করত এবং ফেরী করে বিক্রয় করত। এভাবে জনসাধারণের বিনোদন তৃষ্ণা মিটাতো।

এ জেলার পল্লী অঞ্চলে মরমী গান বা বাউল সঙ্গীত অত্যন্ত জনপ্রিয়। অনেক বাউল ও মরমী সাধকের জন্ম এ জেলায় যাদের গান মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে। জীবনকে নাড়া দেয়। তাদের সংগীতের বিষয়বস্তু হলো মানুষের জন্ম-মৃত্যু রহস্য, ভাববাদ, দেহতত্ত্ব, মারফতী, মুর্শিদী, স্রষ্টা এবং সৃষ্টির সম্পর্ক, জীবাত্মা ও পরমাত্মা, হিন্দু ও মুসলিম, প্রেমতত্ত্ব ও কামতত্ত্ব, নারী ও পুরুষ, মানুষ ও শয়তান, শরিয়ত ও মারফত, ইহকাল ও পরকাল, বেহশত ও দোযখ, গুরু ও শিষ্য ইত্যাদি। এ গানের ভাষা এবং সুরের আলাদা মাধুর্য আছে—যা মানুষের অনুভূতিকে একটি ভিন্ন জগতে নিয়ে যায় এবং অবর্ণনীয় আনন্দ দেয়। কোনো নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর দুই জন পালা কবি গানের মাধ্যমে প্রশ্নবাণ ছুঁড়ে দেন একে অপরের উদ্দেশ্যে। এভাবে তাঁরা তাঁদের জ্ঞানের গভীরতা পরিমাপ করেন এবং পরস্পরকে পরাজিত করার নেশায় মেতে উঠেন। এ গানকে পালা গান/বিচার গান বা স্থানীয় ভাষায় করচাও বলা হয়। পালা কবিদের প্রিয় বাদ্য যন্ত্র হলো সারিন্দা, দোতারা ও বেহালা ইত্যাদি। এ জেলার কয়েকজন বাউল ও মরমী সাধক হলেন : আরফিন শাহ, মেছের শাহ, মুন্সী বাছের, সানাল চাঁদ, গনি বয়াতী, আব্দুল হালিম বয়াতি, আব্দুর রহমান চিশতী, হাজেরা বিবি, দলিলউদ্দিন, আলেয়া বিবি, কাঙ্গালিনী সুফিয়া প্রমুখ। আরো অনেক বাউল ও মরমী সাধকের নাম পরিসর বৃদ্ধির আশংকায় উল্লেখ করা হলো না। জারী-সারি, পল্লীগীতি, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, লালনগীতি এবং হাছনরাজার গানও এ অঞ্চলেব মানুষের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। নৌকার মাঝি পাল তুলে ভাটিয়ালী গান গেয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যাচ্ছে এ ছিল এ অঞ্চলের প্রাত্যহিক দৃশ্য। যান্ত্রিক সভ্যতা বিকাশের ফলে এখন আর সেদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না।

লোককাহিনী অবলম্বনে যাত্রাপালা এবং নাটকও গ্রাম অঞ্চলে অত্যন্ত জনপ্রিয় বিনোদন মাধ্যম ছিল। রহিম বাদশা রূপবান কন্যা, গুনাই বিবির পালা, সাগর ভাসা, মধুমালা এর মধ্যে অন্যতম।

এ জেলায় বহু কীর্তি, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, আধ্যাত্মিক সাধক এবং সমাজসেবক জন্ম গ্রহণ করেছেন। যাঁরা তাঁদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বমহিমায় উজ্জল হয়ে আছেন। নিম্নে তাঁদের কয়েক জনের নাম উল্লেখ করা হলো :

বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান (রাজনীতিবিদ, বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি)

শেখ হাসিনা (রাজনীতিবিদ, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী)

হাজী শরীয়তউল্লাহ (রাজনীতিবিদ, আধ্যাত্মিক সাধক ও সমাজ সংস্কারক)

পীর মোহসেন উদ্দিন আহমদে দুদু মিয়া (রাজনীতিবিদ, আধ্যাত্মিক সাধক ও সমাজ সংস্কারক)

মৌলভী তমিজউদ্দিন খান (রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক)

অম্বিকাচরণ মজুমদার (রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক)

অধ্যাপক ড. হুমায়ুন কবির (কবি ভারতের প্রাক্তন মন্ত্রী ও শিক্ষাবিদ)

আলীমুজ্জামান চৌধুরী (জেলার প্রথম মুসলমান স্নাতক, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, জেলার

বোর্ড/পৌরসভা ও সমাজসেবক)।

পীর বাদশা মিয়া (রাজনীতিবিদ, আধ্যাত্মিক সাধক ও সমাজ সংস্কারক)

ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া) (রাজনীতিবিদ ও সমাজ সেবক)

ড. জি. ডব্লিউ চৌধুরী (পাকিস্তানের প্রাক্তন মন্ত্রী ও শিক্ষাবিদ)

চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ (রাজনীতিবিদ এবং প্রাক্তন মন্ত্রী)

আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ (রাজনীতিবিদ এবং প্রাক্তন মন্ত্রী)

কে. এম. ওবায়দুর রহমান (রাজনীতিবিদ ও প্রাক্তন মন্ত্রী)

ফণিভূষণ মজুমদার (রাজনীতিবিদ ও প্রাক্তন মন্ত্রী)

গৌরচন্দ্র বালা (রাজনীতিবিদ ও প্রাক্তন মন্ত্রী)

এ জেলায় আরো অনেক রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, গবেষক, বিচারক ও পদস্থ কর্মকর্তা জন্মগ্রহণ করেছেন। যাঁরা তাঁদের নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।* পৃথিবীখ্যাত স্থাপত্যবিদ এফ. আর. খানের জন্ম এ জেলার শিবচর উপজেলার ভাণ্ডারীকান্দি গ্রামে। তাঁর প্রণীত নকশায় আমেরিকার শিকাগো শহরে একশত দশ তলা সুউচ্চ সিয়ার্স টাওয়ার নির্মিত হয়েছে। প্রখ্যাত উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পী আভা আলমও এ জেলায় জন্মগ্রহণ করেছেন।

এ জেলায় কিছু প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান দৃশ্যমান হয় যা তার ইতিহাস ও ঐতিহ্যেকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কয়েকটি দর্শনীয় স্থানের নাম উল্লেখ করা হলো :

হযরত শাহ ফরিদ মসজিদ — ফরিদপুর সদর।

জগবন্ধু সুন্দরের আশ্রম — ফরিদপুর সদর।

গেরদা ঐতিহাসিক মস্‌জিদ — ফরিদপুর সদর।

আলী আফজাল মসজিদ—মধুখালী, ফরিদপুর।

কান্দি মসজিদ— মধুখালী, ফরিদপুর।

রায়নগর মসজিদ—ভাংগা, ফরিদপুর।

ভূষণার ধ্বংসাবশেষ—মধুখালী, ফরিদপুর।

মনসা বাড়ী—শরিয়তপুর।

অম্বিকা হল ও ময়দান— ফরিদপুর সদর।

পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীনের মাজার— ফরিদপুর সদর।

মজলিশ আউলিয়া মস্‌জিদ—পাতরাইল, ভাংগা, ফরিদপুর।

সাতৈরের ঐতিহাসিক মসজিদ— বোয়ালমারী, ফরিদপুর।

বিশ্ব জাকের মঞ্জিল—আটরশি, সদরপুর, ফরিদপুর।

ডানলপের কুঠিবাড়ী—আউলিয়াপুর, মাদারীপুর।

পর্বতের বাগান— মোস্তফাপুর, মাদারীপুর।

মাদারীপুর লেক— মাদারীপুর সদর।

---

* এই তালিকায় আদেল উদ্দিন আহমেদ, আবদুর রাজ্জাক, কর্ণেল শওকত আলী, দ্বারিকানাথ বারুরী, মোল্লা জালালউদ্দিন, ভবানী শংকর বিশ্বাস, আছমত আলী খান, ওয়ালিউর রহমান লেবু মিয়া, কমলেশ বেদজ্ঞ, সন্তোষ ব্যানার্জী, আশু ভরদ্বাজ, মোখলেছুর রহমান, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, আতিয়ার রহমান, শাজাহান খান, সৈয়দ আবুল হোসেন, শেখ ফজলুল করিম সেলিম, শেখ শহীদুল ইসলাম, কাজী ফিরোজ রশীদ প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়।

–সম্পাদক

রাজারাম মন্দির— খালিয়া, রাজৈর, মাদারীপুর।

সেনাপতির দীঘি— আমড়াতলা ও খাতিয়ালের মধ্যবর্তী স্থান, কালকিনি, মাদারীপুর।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর মাজার—টুংগীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

এ জেলার মানুষের রয়েছে দীর্ঘ সংগ্রাম এবং আন্দোলনের উজ্জ্বল ইতিহাস। শৌর্য-বীর্যের ইতিহাস, ভয়কে জয় করার ইতিহাস-হার না মানার ইতিহাস—সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ইতিহাস। স্বাধীনতা সংগ্রামসহ সকল আন্দোলন সংগ্রামে এ জেলার মানুষ লড়াকু মনোভাব নিয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। সকল বাঁধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে তাদের অভীষ্ট লক্ষ অর্জন করেছে। তাঁদের বীরত্ব গাঁথা সর্বজন বিদিত এবং ইতিহাসে তাঁদের অবদান স্বর্ণাক্ষবে লেখা থাকবে।

প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলা করে এ অঞ্চলের মানুষকে বেঁচে থাকতে হয় বলে স্বভাবতই তারা সংগ্রামী, প্রতিবাদকারী এবং লড়াকু স্বভাবের। বাংলার মধ্যস্থলে মূল ভূখণ্ডে এ জেলার অবস্থান বলে বাঙ্গালির মূল বৈশিষ্ট্য এ জেলার মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান। এ জেলার মানুষ গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অতীতের ন্যায় সকল বাধা বিপত্তি এবং বিপদ সংকুল বন্ধুর পথ অতিক্রম করে বাঙ্গালির স্বপ্নের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রয়াসে এ জেলার মানুষ তাঁদের সর্বোৎকৃষ্ট অবদান রাখবে—এ প্রত্যাশাই তাঁদের কাছে।

**তথ্য-সূত্র**


1. Md.Nurul Islam: Bangladesh District Gazetteers: CSP. BG Press, 1977.
2. H Beveridge: The District of Bakergonj-its History and Statistics: (1876)
3. Dr Enamul Huq: Sufism in Bengal (1st Edition -1975, p-258-259)
4. Encyclopaedia of Islam, 11, 47

৫। ড. গোলাম সাকলায়েন: বাংলাদেশের সূফী সাধক।

৬। আবদুল জব্বার মিয়া: মাদারীপুর জেলা পরিচিতি।

৭। অম্বিকাচবণ ঘোষ, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, হিমাংশু মোহন চট্টোপাধ্যায়: বিক্রমপুর - রামপালের ইতিহাস।

৮। বিজিয়া রহমান: বং থেকে বাংলা।

৯। ড. মাসুদ রেজা: ফরিদপুরের লোককবি লোকগান।

১০। মোঃ রুহুল আমিন, এম. এ. জাফর: সাধারণ জ্ঞান, আমার বিশ্ব।

১১। মাধ্যমিক বাংলা সংকলন (৯ম ও ১০ম শ্রেণী): বাংলাদেশ টেক্সট বুক বোর্ড।

১২। সৈয়দ আলাওল: পদ্মাবতী কাব্য।

১৩। দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা, ঈদ-উল-আযহা বিশেষ সংখ্যা - ২০০৫।

১৪। দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ২৮ জানুয়ারি/ ২০০৫ সংখ্যা।


*উৎস: ড. মাসুদ রেজা সম্পাদিত সাময়িকপত্র 'চাষ' ফরিদপুর, বর্ষ ২ সংখ্যা ১, এপ্রিল ২০০৫।*

# ফরিদপুরের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি

ড. মাসুদ রেজা

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মৃতপ্রায় গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলের (Moribund Delta Region) ২০৭২.৭২ বর্গকিলোমিটার এলাকা বিশিষ্ট জেলা ফরিদপুর। পদ্মা, আড়িয়ালখাঁ, কুমার, গড়াই, মধুমতি, চন্দনা, বারাশিয়া ও ভুবনেশ্বরের স্রোতধারা ফরিদপুর জেলার আবহমান লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যকে লালন করেছে। এই জেলার মধুমালা, বেদের মেয়ে, গুনাইবিবি, আলোমতি অথবা গাজির গানের উচ্চারিত কণ্ঠস্বরে ভাষা,ধ্বনি, কাহিনী ও বিষয় বৈচিত্র্যে আঞ্চলিক মানস সংগঠনের (Regional Mental selling) পরিচয় বহন করলেও প্রসারণের ফলে (Spatial diffusion) তা মানবিক আবেদনে সার্বজনীন, সার্বত্রিক এবং অন্তর্লীন আবেদনে তা সর্বকালীন ও সর্বাঞ্চলের। তবে উৎপত্তি, প্রসারণ, পরিপ্রেক্ষিত অনুসন্ধান ঐশ্বর্যকে নির্দেশ করা যায়। ভাষাগত বৈশিষ্ট্য, জৈবনিক উচ্চারণ; মানসক্রিয়াকাণ্ডে সহজ-সরল প্রাণময়ী গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দমালায় ফরিদপুরের শাশ্বতরূপ পরিলক্ষিত।

ভৌগোলিক কারণে এ জেলার কোনো কোনো অঞ্চলের লোকজীবন অত্যন্ত আরামপ্রিয় আবার কোন কোন অঞ্চলের মানুষ প্রতিনিয়ত নদীভাঙন ও বন্যার বৈরীস-ংহারের সম্মুখীন। বেশকিছু নদ-নদী, বিল-বাওড়, কোল এবং ছোটবড় অসংখ্য চর, ধু ধু কাশবন, কিছু উর্বর অনুর্বর কিছু মাঠাম জমি নিয়ে ফরিদপুর। একসময় গান, বাজনা, আসর-মজলিসে এবং বিভিন্ন পূজা-পার্বণ, উৎসবে এ জেলার বহমান জনপদ মুখরিত ছিল। বর্তমান জটিল জীবনপ্রবাহে যদিও সাধারণ জীবনযাত্রা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে তবুও প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখনো কিছু গানের সুর পরিলক্ষিত হয়। জীবনপ্রবাহে লোকসংস্কৃতির ছাপ দৃশ্যমান।

ফরিদপুর জেলায় কোনো উপজাতি বা আদিবাসীর বসবাস নেই। কোনো কোনো অঞ্চলে নমঃশূদ্র, বিন্দু ও বেদে সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে। এদের সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও লোকাচারে ভিন্নতর সংস্কৃতির ছাপ সুস্পষ্ট। অপরদিকে ফরিদপুরের সাধারণ মানুষ কী খায়, কী পরে, কী ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানাদি পালন করে, কী তাদের বিশ্বাস; এ জেলা থেকে সংগৃহীত লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় তার প্রমাণ মিলবে। লোকতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, সমাজবিজ্ঞানী এবং ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে এগুলির মধ্যে একটি স্বাদ দৃশ্যমান হবে। এ পর্যন্ত ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে যে সকল লোকঐতিহ্য সংগৃহীত হয়েছে, বিষয়ভিত্তিক বিন্যাসের মাধ্যমে তার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরা হলো।

---

* ড. মাসুদ রেজা সত্তর দশকের কবি ও ফোকলোরবিদ। ফরিদপুরের লোকসংস্কৃতি বিষয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেছেন। প্রবন্ধটি তাঁর গবেষণার সারাৎসার। সম্পাদকের অনুরোধে এটি গ্রন্থের জন্য পুনর্বিন্যস্ত।

**ছড়া.**

বাংলার সর্বত্র 'ছড়া' 'শব্দটি 'ছড়া' নামে ব্যবহৃত হয় না। আঞ্চলিক পর্যায়ে সিলেটে 'শিলল বা শিলুক' অন্যকোথাও সককোল বা শিগ্‌কলি; ময়মনসিংহে 'সিগুললি'; পাবন-ায় 'শিকোলি' এবং ফরিদপুরসহ অধিকাংশ অঞ্চলে 'শোলক' বা 'শল্‌লক' নামে পরিচিত। অষ্টাদশ শতক, বস্তুত উনিশ শতকের প্রথম পাদ্যে বর্তমান অর্থে 'ছড়া' নামেই চলন। ফরিদপুরে লোকসাহিত্য ছড়ার সংগ্রহ ব্যাপক।

এই সকল ছড়ায় এই অঞ্চলে লোকের মানসিকতা, আশা-হতাশা, আনন্দ- বেদনা, আচার-সংস্কার প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই জেলার ছড়াকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন শিশুবিষয়ক ছড়া, খেলার ছড়া ও বিবিধ ছড়া। এর উপবিভাগ হল : ছেলেভুলানো ছড়া, ঘুমপাড়ানি ছড়া, দুধ খাওয়ানোর ছড়া, সান্তনার ছড়া, বিবাহবিষয়ক ছড়া, ব্যবহারিক ছড়া, জীবনবিষয়ক ছড়া, উৎসববিষয়ক ছড়া, বিদ্রূপাত্মক ছড়া, ভৎর্সনাসূচক ছড়া ও শাস্তিবিধানমূলক ছড়া, করুণারসাশ্রিত ছড়া, বৃষ্টির ছড়া, ক্ষেপানোর ছড়া, আবোল-তাবোল ছড়া, হৃদয়বেদনা প্রকাশক ছড়া, প্রার্থনামূলক ছড়া ও কৌতুকপ্রদ ছড়া; বিভিন্ন প্রকার খেলার ছড়া ও বিবিধ ছড়ার মধ্যে– ব্রতের ছড়া, মাছ ধরার ছড়া, গাশশির ছড়া, কৃষিবিষয়ক ছড়া, কবিওয়ালের ছড়া, নীতিমূলক ছড়া, গোয়ালের ডাক ও গায়েনের গীত। এই সকল ছড়ায় জীবনচর্চা ও পারিপার্শ্বিক সমাজ পরিবেশের অনেক উপাদানের পরিচয় পাওয়া যায়। ফরিদপুর থেকে সংগৃহীত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছড়ার নমুনা তুলে ধরা হলো :

ঘুমপাড়ানি ও ছেলেভুলানো ছড়া

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি আমাগো বাড়ি আইসো
খাট নাই, পালঙ্ক নাই খুকুর চোখে বইসো,
বাটা ভইরা পান দিবো, গাল ভইরা খাইয়ো
খির্কি দুয়ার খুইলা দিবো ফুরুৎ কইরা যাইয়ো।

এই ছড়ায় ঘুমের অধিষ্ঠাত্রীদেবী মাসিপিসিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

**সান্ত্বনার ছড়া**

শিশুর কান্না থামাতে আকাশের চাঁদ দেখিয়ে আহ্বান জানানো হয়। চাঁদের আগমনের প্রশান্তিতে দুরন্ত শিশু শান্ত হয় ; কান্না থামে। অথবা আকাশের চাঁদের সঙ্গে কোলের চাঁদের তুলনায় রয়েছে একটি আনন্দ।

আয়রে চাঁদ নাইড়া চাইড়া/ কেলা গাছের ঘাড়ে চইড়া
গাই দুয়াইলি দুধ দিব / বাড়া ভানলে খুদ দিব
চইড়া আইলে ঘোড়া দিব/ আইরে চাঁদ আয়
খুকুর কপালে টিপ দিয়ে যা।

**জামাই মস্করার ছড়া**

লোকছড়ার একটি বিরাট অংশ জুড়ে আছে জামাই নিয়ে হাসি-ঠাট্টা এবং মস্করা করা। এই সকল ছড়াগুলিতে লক্ষণীয় যে, জামাইয়ের সঙ্গে সম্পর্কটি খুব হৃদ্যতাপূর্ণ নয়। এতে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষের ভাব প্রকাশ পেয়েছে।

ইটিং বিটিং জামাই তিটিং/ তাতে পরে মাখন বিটিং
জামাই বেটা নড়ে চড়ে/ সাত গণ্ডা ডিম পাড়ে
ডিম নিয়া নগা-ডগা/ ফুল ফুটে থোকা থোকা
ফুলের নাম কুঁড়ি/ বাগুন-তাগুন ভুইল্যা গেলি
নাক কাটা ছুড়ি।

**খেলার ছড়া**

খেলার ছড়াকে ছেলেভুলানো ছড়ারই অপভ্রংশ ছেলেখেলার ছড়া বলা হয়। এই সকল ছড়াগুলির সহজ সরল গীতি সুর খুবই আনন্দদায়ক। কিছু কিছু ছড়ার খেলা আছে ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা সম্পন্ন। এরমধ্যে লোকবিশ্বাস ও মন্ত্র শক্তির প্রভাব খুঁজে পাওয়া যায়।

ফরিদপুর জেলার বহুধরনের লোকজ খেলা রয়েছে যার প্রধান বিষয় হলো ছড়া। এ জাতীয় খেলাগুলি হলো : ডেংগুটি, হা-ডু-ডু, ছি-বুড়ি, রসকস, ওপেনটি বাইস্কোপ, আগডুম-বাগডুম, ইকির মিকির, ঘুঘু সই, হাতটা বুটি, ছুঁয়া (জলকেলি), পুতুল খেলা, ঢেঁকি ভানা, হাতিসূরী, চিল ও হাঁস-হাস, ঝুল্লু খেলা, রুমাল চুরি, ছাগলগিরি, বিয়ে বিয়ে খেলা উল্লেখযোগ্য।

**ব্রতের ছড়া**

বাঙালির একান্ত নিজস্ব ঐহিক ধর্মবোধ থেকে ব্রতের জন্ম। লৌকিক দেব-দেবীর কাছে পারিবারিক কল্যাণ কামনায় নারীরা ব্রত পালন করে। তাই বারো মাসে তের পার্বণের মূল উদ্দেশ্য হলো ইহজাগতিক চাওয়া-পাওয়া এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন। প্রসঙ্গত ব্রতগুলি হচ্ছে : লক্ষ্মী ব্রত, সুবচনী ব্রত, পৃথিবী ব্রত, তারা ব্রত, সাঁজ-পূজনী বা সেঁজুতি ব্রত, হরিচরণ ব্রত, ভাদুলী ব্রত, মাঘমঙ্গল ব্রত, রণেব্রয়ো ব্রত, বসুধারা ব্রত, যমপুকুর ব্রত, থুয়া ব্রত, ত্রিভুবন চতুর্থী ব্রত, ফাল্গুন কোণা ব্রত, শংকর ব্রত, মনসা ব্রত, ভাঁজো ব্রত, মুট পূজা ব্রত, সত্যনারায়ণ পূজা ব্রত, ভাই ফোঁটা ব্র**,** ও সতীন ব্রত।

**মন্ত্র-তন্ত্র**

মন্ত্র-তন্ত্রের সাহায্যে শিলাবৃষ্টি, ঝড়তুফান থেকে রক্ষা; অনাবৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য বৃষ্টি নামানো, ভূত-প্রেত তাড়ানো; জ্বিন হাজির; চোরের উপদ্রব থেকে গৃহবন্দি; সাপের বিষ নামানো; বশীকরণ; জটিল রোগের চিকিৎসা এবং কলেরা-বসন্ত রোগের দেবী ওলাবিবি ও শীতলা দেবীকে হাজির করানো হয়। ওঝাগণ যখন এ সকল কাজে তন্ত্র-মন্ত্রের ব্যবহার করেন তখন গ্রামবাসীদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে সাগরেদরা বিচিত্র ও অদ্ভুত ধ্বনির সাহায্যে একটি অলৌকিক পরিবেশ বানিয়ে তোলে। অমাবস্যার রাত, দিন ও সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণে, শনি-মঙ্গলবার কোনো নির্দিষ্ট তিথিতে ওঝা তার মন্ত্র বলে নানা প্রকার অশুভশক্তি, ভূত-প্রেত ইত্যাদি আত্মাকে হাজির করেন। তাদের মন্ত্রের সঙ্গে চণ্ডী, কামাখ্যাদেবী মহাদেব, কালী, আল্লা-রসুল, রাম-লক্ষ্মণ-সীতা, নরসিংহ, কংসাসুর, গুরু-মুর্শিদ প্রমুখের সশ্রদ্ধ উল্লেখ দেখা যায়। অনেকে মনে করেন কামরূপ-কামাখ্যাদেবীর মন্দির এর উৎস। অনেক মন্ত্রের ভনিতায় কামাখ্যাদেবীর উল্লেখ দেখা যায়।

**প্রবাদ-প্রবচন**

| | | |
|---|---|---|
| কুকুর | : | যেমন কুকুর তেমন মুগুর। |
| কাজী | : | কাজের বেলায় কাজি, কাজ ফুরালে পাজি। |
| কিল | : | ভাত দেবার মুরদ নেই, কিল মারার গোঁসাই। |
| চালুন | : | চালুন বলে ছুচ তোর গুদ ছেঁদা। |
| চোর | : | চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। |
| ঝি | : | ঝিকে মেরে বউকে শিখান। |
| ঝোপ | : | ঝোপ বুঝে কোপ মারা। |
| ঢেঁকি | : | ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। |
| নাপিত | : | নাপিত দেখলে কেনি আঙ্গুল বাড়ে। |
| পাগল | : | এক পাগলে ভাত পায়না, অন্য পাগলের আনাগোনা। |
| ফোঁড়ে | : | আড়ে নাই ফোঁড়ে আছে। |
| ফকির | : | ঝড়ে বক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে। |
| বাটপার | : | নেংটার আবার বাটারের ভয়। |
| বাপ | : | নিজে বাঁচলে বাপের নাম। |
| ভাত | : | পেটে ভাত নেই নাঙের উৎপাত। |
| মা | : | মায়ের কাছে মাসীর খবর। |
| লাভ | : | লাভে লোহা বয় বিনা লাভে সোনা বয়না। |
| শকুন | : | শকুনের দোয়ায় (শাপে) গরু মরে না। |
| খাজনা | : | খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি। |
| গঙ্গা | : | ভাগের মা গঙ্গা পায় না। |

**প্রবচন**

'প্রবচন' আভিধানিক অর্থে প্রবাদেরই নামান্তর। প্রবাদের পরিপূরক শব্দ হচ্ছে প্রবচন। প্রবচন মূলত বাচ্যার্থ নির্ভর; এতে রূপক, প্রতীক, সংকেত চিত্রকল্পের স্থান নেই। সাধারণ পদ্যে অথবা অন্ত্যমিলযুক্ত ছন্দোবদ্ধ পদ্যে প্রবচন রচিত হয়।

| | |
|---|---|
| আকাল | কাল অইলে অকাল/ছাগল চাটে বাঘের গাল। |
| ঘুম | মজামারে ফজা ভাই/মধ্যি হান্তা ঘুম কামাই। |
| ঘোড়া | ঘোড়া আলার ঘোড়া না/ সেকেন্দারের ঘোড়া। |
| জামাই | আসপি জামাই নিবি ঝি/জামাইর গোস্বায় হবে কি। |
| ঝি | বাপের বাড়ি ঝি নষ্ট/পান্তা ভাতে ঘি নষ্ট। |
| ধন | দিয়া ধন বুঝে মন/কাইরা নিতে যতক্ষণ |
| পানি | সাত ঘাটের পানি খেয়ে/বিড়াল বইসে তপস্যায়। |
| পাখি | খায়দায় পাখিটি/বনের দিকে আঁখিটি |
| ফল | মাকাল ফল দেখিতে ভালো/উপরে লাল ভিতরে কালো। |
| বর | আশ্বিনে রান্দে কার্তিকে খায়/যে বর মাঙ্গে সেই বর পায় |
| ভাত | উনা ভাতে দুনা বল/অতি ভাতে রসাতল। |
| ভাত | মেয়ে দিবে ভাত দেখে/ বউ আনবে হাড় দেখে। |

ভাত : যার ঘরে ভাত নাই/ তার কোন জাত নেই।
মা : মুড়ি বল চিড়া বল ভাতের মত নাই/ খালা বল, ফুপু বল মার মত নাই।
শ্বশুর : শ্বশুর বাড়ি মধুর হাড়ি/ নিত্য গেলে ঝাঁটার বাড়ি।
সতীন : দুই সতীনের ঘর/ আল্লায় রক্ষা কর।

**মিশ্র :**

১। দাতার নারকেল, কৃপণের বাঁশ/ কাটো না কাটো বাড়ে বার মাস।
২। যম জামাই ভাগিনা/ তিন নয় আপনা।
৩। অভাবে স্বভাব নষ্ট মুখ নষ্ট বচনে/ ঝরায় ক্ষেত নষ্ট, স্ত্রী নষ্ট মারণে।
৪। হেগে খায় খেয়ে মুতে/ তার না ছোঁয় যমদূতে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ধাঁধা শব্দটি বিভিন্ন নামে প্রচলিত। বরিশালে 'ভাঙ্গানি' ময়মনসিংহে 'কথা', চট্টগ্রামে 'কিচ্ছা', রংপুরে 'ছিলকা', সিলেটে 'শিমাসা', নোয়াখালীতে 'পিলিকা', রাজশাহীতে 'মান' ও ফরিদপুরে 'শ্লোক'। ফরিদপুরের ধাঁধাগুলি মূলত আখ, ইট, উনুন, কলসি, কলার মাতী, কলাগাছ, কচুরিপানা, কাগজের টাকা, কাছিম, খেঁজুরগাছ, ক্ষুর, গেঞ্জি, মশারি, ঘূর্ণি, চক্ষু, চশমা, চিঠি, ছাতা, জাল, তরমুজ, ঢেঁকি, ডাব, ডিম, ডুমুর, নারকেল, নৌকা, পালকি, পিঁপড়া, পেঁপে, বড়শি, বাঁশ, বিচ্ছা, বিজলী, মরিচ, রৌদ্র, শামুক, হুক্কা বিষয়ক।

১. সি মাঠে জনম তার, মকরেতে কাটা
তারে কাটি পারে গেলে কত লক্ষ হয়
তার রুধির সর্বলোকে খায়।

---আখ (ইক্ষু)

২. ইট ঘুঘুর পিঠটান
কোন ঘুঘুর তিন কান।

- -উনুন

৩. যুবতী ধরিয়া কণ্ঠে করে আলিঙ্গন
নিতম্বে রাখিয়া দেয় করিয়া যতন;
গুরুজন থাকিলেও চক্ষের উপরে
লাজ-লজ্জা পরিহারি কত শব্দ করে।

---কলসি

৪. আশায় বাঁধলাম ঘর, দুয়ার রাখলাম না
গরম জলে পুড়ে মরলাম টের পেলাম না।

---গর্ভবতী নারী

৫. কুটি কুটি পানের বিড়া
তার মধ্যে কালিজিরা
সেই পান শহরে যায়
মরা মাইনষে কথা কয়।

---চিঠি

৬. জন্ম ধলা কর্ম কালা
গলায় গজমতির হার
উইড়া গিয়া ধইরা আনে মুনিষ্যির

----জাল

৭. মাটির উপর কাঠ, কাঠের উপরে পাতা
পাতার নিচে ফুল, ফলের ভিতর মাথা।

---নারিকেল

৮. চার পায়ের জিনিস আমি, আট পায়ে হাঁটি
রাক্ষস না খাককোস না আনাম মানুষ গিলি।

---পালকি

৯. অহুর মহুর কহুর বুড়ি বুকে একটা দাঁত
হাত পাঁচ ছয় লেজ তার, পাছায় একটি বাঁশ।

---বঁড়শি

১০. আট কুটুরী উনিশ ঠ্যাং
আছে কাপড়ের তলে,
ঠেলা দিলি খুইলা পড়ে।

----ছাতা

১১. ওলো শ্যামের মা
ভাত দেও কারে?
আমার বাজান বিয়া করছে
ওর বাজানের মাবে।

---ফুফু ও ভাতিজা।

জীবন, সমাজও সংস্কৃতির নানান উৎসে বাংলার লোকবিজ্ঞানীগন এদেশের লোকসংগীতকে প্রধানত ধর্মীয়, ধর্মনিরপেক্ষ এনং সাময়িক এই তিনিটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছেন। এ পর্যন্ত ফরিদপুর জেলা থেকে ৪২ প্রকাব লোকসংগ্রীত সংগৃহীত হয়েছে। এব মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : বাউল, মরমি, বিচার গান, মুর্শিদী-মারুফতি, ভাটিয়ালী সুরেশ্বরী গান, খাজাবাবার গান, ফকিরালী গান, কবিগান, জারিগান, ধুয়াগান, কীতন, ধামালী, রয়ানী বা ভাসান, বিচ্ছেদ গান, অন্নপ্রাশন, ভাইফোঁটার গান, হ্যাঁচড়া পূজার গান, সূর্যপূজার গান, মাঘমণ্ডল, তারাব্রত, কার্তিক পূজায় ভুলপুড়ানো, সতীনব্রত, ক্ষেত্রব্রত, গোক্ষুর নাড়ু, ত্রিনাথের মেলা, ভাংড়া বা অষ্টক, হুলোই বা অড়ণ, নইলা, সারিগান, বারমাসি, গাশশি, পালাকর গান, গোয়ালের গান, বৃষ্টির গান, বোল, মেয়েলীগীত, ছয়হাটুরে বা নামকরণ, তালপান গুয়ার গান, খাতনাব গীত, সাইরগান এবং বেদেবেদীয় গান প্রভৃতি। এর মধ্যে এ জেলার প্রতিনিধিত্বশীল কয়েকটি লোকসংগীত উল্লেখ করা হলো : বাউল, মরমী, মুর্শিদী, ফরিদপুর জেলার অগ্রগণ্য সংগীত। এ সকল ধারা থেকে সৃষ্ট 'বিচার গান ফরিদপুর জেলার শ্রেষ্ঠ গীত। বাংলাদেশের প্রায় অঞ্চলে এই সংগীত পরিদৃষ্ট হলেও দক্ষিণ-পশ্চিম ব-দ্বীপ অঞ্চলের (Moribund Delta Region) কুষ্টিয়া, যশোর,

ফরিদপুর অঞ্চলের পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে এবং পরে বিভিন্ন সাধকের প্রচেষ্টায় এক একটি ঘরণার (School) মাধ্যমে খুলনা, ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ও পশ্চিম সিলেটে স্পর্শক প্রসারণ ঘটে। এর মূলে ছিল তৎকালীন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট। বাউল মতবাদে বিশ্বাসীদের লোকায়ত ধর্ম, সখ্য, যোগ-সাধনা, বৌদ্ধ সহজিয়া মত, তন্ত্র, বৈষ্ণব রসবাদ, শাহ সুলতান রুমীর (১০৫৩ খ্রি.) মরমীবাদ, সংস্কার, লোকাচার ও বিশ্বাস প্রভৃতি। ইরানের সুফি সাধকদের 'সামা' গজলের উত্তরসূরী হিসাবে মুর্শিদী, মারফতি ও সুরেশ্বরী গানের প্রচলন হয়।

ফরিদপুর জেলার উল্লেখযোগ্য বাউল ও মরমী সাধকদের একটি তালিকা প্রণীত হলো। তিনুশাহ (চণ্ডিপুর), খোশাল চাঁদ (রামনগর), মেছের শাহ (মাসাউজান), আরফিন শাহ (দত্তপাড়া), পাঁচু ফকির (সাকপাইলদ্যা), নৈমদ্দিন ফকির (ধোপাডাঙ্গা), গহেরশাহ (ঘাগর), কিতাবদ্দি শাহ (কৃষ্ণনগর), করিমদ্দিন (খলিলপুর), ছৈজদ্দিন ফকির (বিলমামুদপুর), মুন্সী বাসের (কোশগাঁও), যোগেশ সরকার (কৃষ্ণ নগর), সানাল চাঁদ (পদ্মাপাড়), সমীর চাঁদ (মথুরাপুর), নবাব চাঁদ (ব্রাহ্মণকান্দা), কালাচাঁদ (প্রেমতারা), কুন্ডুদাস (গোয়াইলপোতা), ক্ষ্যাপা-ক্ষেপী (ধোপাডাঙ্গা), পাইলন ফকির (সাতৈর), ফটিক গোঁসাই (মাইচ কান্দি), আহাম্মদ শাহ (বিনিকর্দিয়া), ডা. হানিফা (বাখুণ্ডা), আনেচ আলী (মানিকদা), সতীশ গুহ (খামারপাড়া), কমলাবালা (লংকার চর), জসীমউদ্দিন (ঝাউখালী), ছাদেক (রূপদিয়া), গনি বয়াতি (চরভদ্রাসন), সাধু শিকদার (ভাজনডাঙ্গা), মঙ্গল সাধু (অম্বিকাপুর), মঙ্গল বয়াতি (ভীমপুর), ফেলাশাহ (কানাইপুর), হাসমত চাঁন (ভাটি লক্ষীপুর), মোন্তাজ ফকির (ভাজনডাঙ্গা), মেছের ফকির (আলিযাবাদ), ওয়াজেদ মোল্লা (ভাটপাড়া), আজিম শাহ (গোয়ালেরটিলা), আমিনুদ্দিন মোড়ল (মৃজারচর), মেঘু বয়াতি (গোয়ালের টিলা), মহিন সাঁই (কমলাপুর), খোরশেদ (কাজির সুরা), ইয়াছিন ফকির (প্রেমতারা), সেক দবিরউদ্দিন (গজারিয়া), দেওয়ান মোহন (সদরদি), নাসিরশাহ (কুমার কান্দি), কোরবান খাঁ (ডিক্রিরচর), আইনুদ্দিন (কানাইপুর), জলুবশাহ (শুকতলী), কুটি শিকদার (বাখুণ্ডা), খোরশেদ (চাঁনপুর), করিম বয়াতি (ভাজনডাঙ্গা), আঃরহমান চিশতি (ঘনশ্যাম), আব্দুর রহমান (টেপাখোলা), ফরমান সাধু (ভাবুকর্দিয়া), মজিদ (সদরদি), মোকসেদ (বিনিকদিয়া), ছৈজদ্দিন (খয়েরদিয়া), আকমত বয়াতি (রামনগর), জমির আলী (সদরপুর), আসাদ বয়াতি (ধুলদী), হাজেবা বিবি (অম্বিকাপুর), আয়নাল মিয়া (মাহিশালা), পূর্ণসরকার (পুয়াইল), চাঁদ মিয়া (সোনাখোলা), কানাইলাল শীল (নগরকান্দা), কুটি মুন্সুর (লোহারটেক), দাইজদ্দিন (রামনগর), মাখন (বসুলহাট), মোতালেব শরীফ (রামচন্দ্রপুর), আব্দুর রহমান (বায়তুলআমান), আলাউদ্দিন সাঁই (ভাজনডাঙ্গা), মান্নান খাঁ (বাখুন্ডা), মঈনুদ্দিন ফকির (সাদিপুর), আলেয়া বিবি (সন্ন্যাসীর চর), তাইজদ্দিন শাহ (সদরদি), কাসিম ফকির ওরফে কোছে কাওড়া (ধোপাডাঙ্গা চাঁদপুর), পাগলা বাবলু (ওয়ারলেস পাড়া), সিকান্দার আলী খান মনা (আলীপুর), জব্বার ফকির, ওয়াজেদ চাদ, রশিদ বয়াতি, আব্দুস সামাদ, আমজেদ, ইসমাইল আলী, ইয়ার আলী, গোলামহায়দার, দেওয়ানমোহন, ফকির মজিদ, জালান বয়াতি (ধুলদী বাজার) প্রমুখ।

ফরিদপুর জেলার শ্রেষ্ঠতম মরমী সাধক হিসেবে মেছের শাহকে গণ্যকরা হয়। যিনি ১২৪৭ মতান্তরে ১২৫৭ বঙ্গাব্দের ৮ ফাল্গুন সদরপুর থানার কোনো এক চরে জন্মগ্রহণ

করেন। এবং নদীভাঙনে সেই স্থান পরিত্যাগ করে নগরকান্দা থানার মাসাউজা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। মৃত্যু ১৩২৪ বঙ্গাব্দে। খোসাল চাঁদ দরবেশ ছিলেন তাঁর সাধক গুরু। 'সত্যধর্ম মারুফাতে এছলাম' নামক কেতাবসহ দেহতত্ত্ব, মারুফতি, মুর্শিদী, প্রেমতত্ত্ব ও নবীতত্ত্বমূলক বিচিত্রধর্মী পাঁচ শতাধিক গানের সন্ধান পাওয়া যায়। কুমারনদ সংলগ্ন রসুলপুর বাজারের পশ্চিমপাশে এই সাধকের মাজার রয়েছে। এখানে বর্তমানে প্রতি বছর ১৯ চৈত্র ওরস হয় এবং অসংখ্য ভক্তকুল ও অনুরাগীদের সমাবেশ ঘটে। মেছের শাহের একটি গান :

সে যে চিন্ময় চৈতন্য স্বরূপ/ চারগুণে এক দেহ তার
আইদ্য মানুষ সাধ্য কাব যার।
ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ুর জোরে/ নিত্য লীলা ঘরে ঘরে
চার দিয়া চার পূরণ করে/ চার গুণে হয় এক আকার।
ঠিক যেন সে সর্বশক্তি/ জীবের জীবন ভক্তের মুক্তি,
যত দেখ প্রতিমূর্তি,/ একজনার এইসব্ আকার।
অধীন মেছের চান্দের কথা/ ওহিকে তা জানবে কোথা,
এক মানুষ জগতের দাতা/ শরিক নাই সে একেশ্বর।

## মুর্শিদীগান

ফরিদপুরের কিছু কিছু মুর্শিদী গানের ভনিতায় মরমী সাধক মেছের শাহের নাম পাওয়া যায়। এই জেলায় মুর্শিদী গানের সমৃদ্ধ ভান্ডার রয়েছে।

তুমি দাও দেখা দয়াল চাঁনরে আমার
তোরে না দেখিলে প্রাণ আমার বাঁচে নারে॥
দয়াল আমারে দিয়া ফাঁকি
তুমি হইলা বনের পাখিরে
তোরে পঞ্জিরায় ভরিয়া রাখবো ।[....]

## বিচার গান

মুর্শিদী বা ভাবগানের আসরে বিচার গানের উত্তরণ ঘটেছে। গুরু-শিষ্য, মারুফত-শরীয়ত, নিরাকার-আকার, নারী-পুরুষ, সৃষ্টিতত্ত্ব, আহাদিয়াত নবুয়তি, রূপ-স্বরূপ, কাম-প্রেম ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় নিয়েই বিচার গানের আলোচনা। বিচারগানে মূলত মঞ্চে উপস্থিত দুই বয়াতির মাঝে প্রতিযোগিতামূলক গান। কেউ কেউ মনে করেন বিচারগানের আদিভূমি ফরিদপুর।

এই গানের জন্ম অর্ধশতাব্দী আগে। মেছের শাহ (১২৪৭-১৩২৪ বঙ্গাব্দ) এই গানের গোড়াপত্তন করেন। লোকগবেষক খলিলুল্লাহ-দিল-দরাজ ফরিদপুরের বিচার গানের সময়কালকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন : ১২৮০ থেকে ১৩৩০ বঙ্গাব্দ প্রথমভাগ। এই ভাগের বিখ্যাত সাধকগণ হলেন, মেছের শাহ, তাহেরশাহ, কিতাবদী শাহ, নৈমদ্দি ফকির, পাঁচু ফকির, পাইলন ফকির, আজিম শাহ, যোগেশ সরকার, লক্ষীকান্ত সেন, কুঞ্জুদাস, মুন্সি বাছের, কসিমদ্দিন (কোচে কাওড়া); গহের শাহ, ক্ষ্যাপা-ক্ষেপী। দ্বিতীয় ভাগ ১৩৩০ থেকে ১৩৬০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত। এই ভাগে রয়েছেন আহম্মদ

ফকির; জসিমদ্দিন, তাজদ্দিন ফকির, আইনদ্দিন, ইয়াছিন, ইসমাইল সরকার, ছৈজদ্দিন, ফকির চাঁদ, মজিদ মিয়া, দেওয়ান মোহন, তমিজদ্দিন, ছাদেক, কমলাবালা বৈষ্ণবী, মোসলেম ও ছাদেক ফকির। তৃতীয় ভাগের সময়কাল ১৩৬০ থেকে ১৩৯০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত। এই সময়ের বিখ্যাত সাধক আব্দুল হালিম বয়াতি। তাঁর প্রতিভা ছিল আকাশ ছোঁয়া। এরপর অ.নাল মিয়া, দলিলউদ্দিন, জমির আলী বয়াতি, আকমত, চাঁনমিয়া, জলিল, জালাল, হাজেরা বিবি, মাখন, আলাউদ্দিন, সুফিয়া, অনিতা, কুটি মনসুর, ইয়াদআলী, খোরশেদ ও আলেয়া বিবি। একটি বিচার গানের উদ্ধৃতি :

জ্ঞানের আয়না ভক্তির পায়রা/ মুর্শিদ রূপের সুরাত দেখ
স্বরূপে রূপ দেখতে চাইলে ধ্যানের ঘরে কর লক্ষ।
নিরব নিটল ভাবে/ নির্জনেতে বসে তবে
গোপন দরজা যে খুলিবে/ সেই মানুষের করণ শিখ॥
আপন দেল কর সাদা/ কেন ভাব জুদাজুদা
যথা মুর্শিদ তথা খোদা/ সেই রূপেতে ডুবে থাকো।
পরমের নাই আকার সাকার/ জীব হইতে হইলেন প্রচার
হালিমের নাই তত্ত্ববিচাব/ মন তুমি কেন উল্টা ডাকো॥

**গাজির গান**

'গাজির গান' ফরিদপুর জেলার প্রতিনিধিত্বমুলক লোকসংগীত হিসেবে চিহ্নিত। গাজিপীর এতদঞ্চলের অন্যতম লৌকিকদেবতা। এঁকে জিন্দাপীর বা গাজিসাহেব বলেও অভিহিত করা হয়। বাঙালি হিন্দুসমাজে দক্ষিণা রায় এবং বাঙালি মুসলমান সমাজে গাজিপীর মূলত অভিন্ন। চাষী, জেলে বিশেষ করে বনজীবীরা এঁকে মান্য করেন।

অতীতে গাজিপীর সকল রোগ ও বিপদের উদ্ধারকর্তা রূপে পূজ্য ছিল। বাঘের হাত থেকে রক্ষা, উঁইপোকার বংশ ধ্বংস গৃহপালিত বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য গাজির গানের 'পালা' ও 'মানসিক' দেয়া হতো এবং ঘরে ঘরে রক্ষিত হতো 'গাজির পট'।

**গাজির বন্দনা গানের নমুনা**

এসো এসো দয়াল গাজি, এসো এসো এই আসরে গো
একবার চাও ফিরে।
প্রথমে বন্দনা করি প্রভূনিরঞ্জন রে দয়াল গাজি,
দ্বিতীয় বন্দনা করি নবীজীর চরণ রে দয়াল গাজি,
উত্তরে বন্দনা করি হিমালয় পর্বত রে দয়াল গাজি
যার হাওয়ায় গলে ওই দেশের পাথর রে দয়াল গাজি। [...]

**কবিগান**

যশোর, খুলনা, বরিশাল, ও ফরিদপুর অঞ্চলের যে কয়জন উল্লেখযোগ্য কবিয়ালের নাম পাওয়া যায় তাঁরা অধিকাংশই তারক সরকারের শিষ্য পরম্পরারূপে নিজেদের পরিচয় দেন। তারক সরকারের দুই শিষ্য নড়াইলের বিজয় সরকার এবং ফরিদপুরের নিশি সরকার। এঁরা বিশ শতকের প্রথমার্ধে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। ফরিদপুর জেলার কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কবিয়াল হলেন : রাসমোহন সরকার

(জানদি), বসন্ত সরকার (গজারিয়া), নিতাই সরকার (গজারিয়া), মধু ভূঁইয়া (জোয়ার)। বিভিন্ন প্রজাসাধন, বারণী স্নান, বৈশাখী ও চৈত্রের মেলায় কবিগনের আসর বসে।

## জারিগান

মুসলমান সম্প্রদায়ের মহররম পর্ব উপলক্ষে যে সঙ্গীত গীত হয়, তাকে জারিগান বলা হয়। জারি গানের অর্থ ক্রন্দন বিলাপ। এক সময় ফরিদপুর জেলায় ব্যাপকভাবে জারি গানের প্রচলন ছিল। এই অঞ্চলের বিখ্যাত কয়েকজন জারিগানের বয়াতি হলেন; মেঘু বয়াতি (গোয়ালের টিলা), ডা. হানিফা (বাখুণ্ডা), হাকিম চান্দ (কালিশঙ্করপুর), মেহের চান্দ (কালিশঙ্করপুর), তমিজদ্দিন (ভাংগা), হানিফ বয়াতি (উজানচর), এনাতুল্লা (সদরপুর), গনি বয়াতি (সদরপুর), মঙ্গল বয়াতি ( টেপাখোলা), জমীর আলী (সদরপুর), নিশিকান্ত (বাঁশতলা), ওয়াহেদ আলী (গোয়ালের টিলা), ছবেদ আলী (গোয়ালের টিলা), বদরুদ্দিন (গোয়ালের টিলা), ইয়াছিন বিশ্বাস, আমজেদ, নাসির শাহ।

দুল দুল ঘোড়ারে তুমি কি জবাব দাও আমারে
চতুর্দিকে ঘিরারে কাফের কি হালে রাখলা মোরে
বুকের উপর বইসা সীমাররে তুমি হলকমে না দাও ভর
তোর সমান আর গুনাগার নাইরে এই দুনিয়ার পর। [...]

## রয়ানী বা ভাসান গান

সর্পদেবী-মনসার জন্ম থেকে লক্ষীন্দরের পুনর্জীবন প্রাপ্তির মধ্যে দিয়ে তার দেবত্ব প্রচলিত লোককাহিনীই 'রয়ানী' নামে পরিচিত। রয়ানী মূলত চাঁদ সওদাগর, লক্ষীন্দর ও বেহুলার প্রচলিত লোককাহিনীভিত্তিক মনসাদেবীর মাহাত্ম্যসূচক লোকসংগীত। সাপের উপদ্রুপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য ফরিদপুরসহ দক্ষিণ বাংলার সমগ্র জেলার ঘরে ঘরে এ সংগীত গীত হয়।* হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলেই এ গানের শ্রোতা। বর্ষা মৌসুমে গ্রামে গ্রামে মনসা পূজা কিংবা মাহাত্ম্য পরিবেশিত হয়।

ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকা, সিন্ধু সভ্যতার হরপ্পা-মহেনজোদারো থেকে উদ্ভব হয়ে ক্রমান্বয়ে সর্পপূজা ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

রয়ানী গান ফরিদপুর অঞ্চলে 'ভাসান গান' নামে পরিচিত।

জ্যৈষ্ঠ না আষাঢ় মাসে গগনে গর্জন
রে বিধির কী অইলো
লোহার আটন লোহার ছাটন
লোহার বাসর ঘর
সেই ঘরেতে বসত করে বেহুলা-লক্ষীন্দর। [...]

## সূর্য পূজার গান

ফরিদপুর জেলায় হিন্দু-কুমারী মেয়েরা সূর্যবন্দনা করে 'মাঘমঙ্গল ব্রত' পালন

* বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার ফল্লশী গ্রামের কবি বাড়ি থেকে রয়ানী বা ভাসান গানের উদ্ভব হয়েছে বলে ধারণা নেয়া হয়। --সম্পাদক

করে। সূর্যরশ্মিতে বৃক্ষ যেমন ফলবান হয়ে ওঠে তেমনি কুমারীদের বিবাহের বসনা যথাশীঘ্র ফলপ্রসূ হয়। সূর্য দেবতার মতো সুন্দর, বলবান ও শৌর্যবীর্যের অধিকারী বর পাবার জন্য মাটিতে কল্পিত সূর্যদেবতা অঙ্কন করে।

উঠো উঠো সূর্যঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া
তোমার জন্য বসে আছি ধূপ প্রদীপ নিয়া
উঠো উঠো সূর্যঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া
তোমার জন্য বসে আছি ধান দুব্বা নিয়া;
উঠো উঠো সূর্যঠাকুর আবির মাইখা গায়
সাজি ভইরা রক্তজবা দিবো তোমার পায়।
আইসো আইসো সূর্যঠাকুর সোনার রথে চইরা
সপ্তবর্ণ সপ্তঘোড়া চালাও আকাশ জুইড়া
সূর্য উঠলো ঝিকিমিকি আঁধার গেলো দূরে
সূর্যঠাকুর দিলো দেখা সোনার রথে চড়ে।

**গোক্ষুর নাড়ু**

গৃহপালিত গাভী প্রসবান্তে একুশদিন পরে বাইশ দিনে দোহন করে সেই দুধ দিয়ে ক্ষীরের নাড়ু তৈরি করে সন্ধ্যায় উঠানের মধ্যখানে ঘট পেতে তার উপর আম্রপল্লব, বিভিন্ন রকমের ফুল, কলার আগপাতায় নাড়ুগুলি রেখে একজন ছড়া আবৃত্তি করে সহযোগিরা ধুয়া ধরে।

গৃহপালিত গাভীর রোগবালাই থেকে মুক্তি লাভ করার জন্য গোরক্ষকের উদ্দেশ্যে গোক্ষুর নাড়ু অনুষ্ঠিত হয়। এটি একটি যাদুবিদ্যাগত ক্রিয়া (Ritual)।

১. ওরে পাইকেরি/উপরে যাবো/কত পানি?
আটু পানি।
ওরে পাইকেরি/উপরে যাবো/কত পানি?
গলা পানি।
(ক্রমান্বয়ে অথৈপানি পর্যন্ত ছড়া কাটা হয়)

২. মামা দোয়ালে আসে না আসে
ভাগনে দোয়ালে সাগর ভাসে।

**ত্রিনাথের মেলা**

ত্রিনাথের পূজার আঞ্চলিক নাম ত্রিনাথের মেলা।* ত্রিনাথপন্থীরা তিন দেবতার একই অখণ্ড ব্যক্তিকে পূজা করে। এই তিন দেবতা হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ত্রিনাথ হলেন নাথ সম্প্রদায়ের গুরু, গোরক্ষনাথ, মীননাথ ও জালন্ধরী-পা। ত্রিনাথের পুজাকে 'সেবা' বা 'মেলা' বলা হয়। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এই তিন জগতের অধীশ্বর হলেন ত্রিনাথ। তার উদ্দেশ্যে যে পূজা করা হয় তাতে উপকরণ হিসেবে এক পয়সার পান-সুপারী, এক পয়সার তিনটি মাটির প্রদীপ, একপয়সার তিনটি গাঁজার কলকে একদামে

* বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত, বর্তমান শরীয়তপুর জেলায় ত্রিনাথের মেলার গানগুলোর উৎসভূমি রয়েছে বলে ধারনা করা যায়। -সম্পাদক

ক্রয় করতে হয়। তবে প্রধান উপকরণ হলো গাঁজা। দেবতাকে নিবেদন করার পর ভক্তগণ তা গ্রহণ করে থাকে। সর্বমঙ্গলের জন্য হিন্দু বাউল একত্রিত হয়ে তিনটি গাঁজার কলকে সাজিয়ে 'বোম ভোলানাথ' বলে সম্মিলিতভাবে গাঁজায় টান দেয়।

আমার ঠাকুর ত্রিনাথ/যে করিবে হেলা
তার হাত পা খসিয়া যাবে/চোখ দিয়া বের হবে ঢেলা।
দিয়া গাঁজায় দম/ বলছে বোম
বোবায় বলে বোম ভোলা/কলিতে ত্রিনাথের মেলা।

**ভাংড়া বা অষ্টকগান**

ভাংড়াগান বা ভাংড়া নাচের গান কোথাও অষ্টকগান; নীলপূজা বা দেলপূজার গাজন নামে পরিচিত। চৈত্রমাসের শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু করে চৈত্র সংক্রান্তি পর্যন্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি দল শালকাঠের মতান্তরে নিম, তমাল, বেলকাঠের নির্মিত চৈতাঠাকুরের প্রতিকৃতি মাথায় করে বাড়িবাড়ি ঘুরে মাঙ্গন করার সময় যে গান গায় তা ভাংড়া গান বা অষ্টক গান নামে পরিচিত। কাঠের নির্মিত চৈতাঠাকুরের প্রতিকৃতিতে মৎস্য, ক্রম, বরাহ, মিন নামের দশ অবতার অঙ্কিত থাকে। এ ছাড়া চৈতাঠাকুরের মাথায় শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম অঙ্কন করে সরিষার তৈল মেখে প্রতিকৃতিটি কালো করা হয়। মস্তকঅংশে দেয়া হয় সিঁদুরের ফোঁটা।

বন্দী ভগবতী লক্ষ্মী-সরস্বতী গনেশের জননী মা
মাগো যে বাণী সরবাণী-ঈশাণীয় ইন্দ্রানী
নিশুম্ভ নিশানী শ্যাম মা,
আমি পড়েছি আজ কুল্য পাথার
দিয়েছি সাঁতার তোমার নাম ভরসা করি।
কোথায় দীনবন্ধু তরি, তরাও মোরে।
এসো ভোলা মহেশ্বর আমারি ঈশ্বর
কার্তিক গনেশ লয়ে সঙ্গে আমি যদি ডুবে মরি।
ওহে, ষোলপানি কলঙ্ক হবে যে তোমারি। [...]

**নইলা গান**

ফরিদপুর জেলার লোকসংগীতের মধ্যে বৃষ্টি কামনায় কৃষিনির্ভর জীবনযাত্রায় মেঘবাজার গান, বদনা বিয়ে, সত্যপীরের গান, সোনারায়ের গান, মাদারের গান, মানিকপীরের গান এবং নইলা গান প্রচলিত ছিল। একসময় শিরালী, হিরালী বা হিড়াল নামক বৃষ্টির ওঝা বলে কথিত একশ্রেণীর পেশাদার লোক নিয়োজিত ছিল। বৃষ্টি আহ্বানে তারা মন্ত্র-তন্ত্র প্রয়োগ করত। কোথাও কিশোরী মেয়েরা গৃহস্থের বাড়িতে গিয়ে মেঘ রাজার গান গেয়ে মাঙ্গন করত। ঐ সময় তাদের লোকাচারে 'বদনা বিয়ে' এবং 'ব্যাঙ' বিয়ের প্রচলন ছিল।

**নইলা গানের উদ্ধৃতি**

রক্তজবা জলে ভাসাইছে ভাইরে
মা বুঝি আজ আসরে আইসাছে,

আমাগো উপরে আছে দয়াল আল্লা সখা
কোথায় রইলি হাইড়া ম্যাঘারে
আইসা করো দেখা।
ওনুর ঝনুর বাজে সোনার নূপুর পায়
ঐ আসতেছে দয়াল নবী এই আসরে আয়।
ওনুর ঝনুর বাজে সোনার নূপুর পায়
ঐ ফুলের নাগররে
হারে ফুলের ডালা নামাইয়া দে
আমার দয়াল চাঁন চাইছে ফুল ঝাঁপি ভইরা দে।

## হুলোই গান

ফরিদপুর জেলার লোকায়ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে 'হুলোই গান' নামে একশ্রেণীর প্রার্থনামূলক মাঙ্গনগীতি প্রচলিত আছে। 'হুলোই' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত দিক হচ্ছে হুল্লোড়>হুল্লোই>হুলাই। হুলাই আনন্দসূচক ধ্বনি। কোনো কোনো অঞ্চলে এ গান 'অড়া' বা 'অড়ণ' নামে পরিচিত। বছরের নির্দিষ্ট সময়ে এই গান আনুষ্ঠানিকভাবে গীত হয়। নির্দিষ্টকাল অতিক্রান্ত হলে গানগুলি বছরের অন্যকোন সময়ে শুনতে পাওয়া যায় না। সাধারণত 'নবান্নের' জন্য রাখাল ছেলেরা শীতের আগমনে শিরণি উৎসবে আয়োজন করে। ঐ সময় সন্ধ্যায় এরা দলবেঁধে গৃহস্থের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে চাল-ডাল, ভোজ্যদ্রব্য, টাকা-পয়সা ইত্যাদি সংগ্রহ করে। পৌষমাসের শুরু থেকে পৌষসংক্রান্তি পর্যন্ত এদের মাঙ্গন চলে। সংক্রান্তির দিন প্রভাতে মাঙ্গনকৃত চাল-ডাল ও ভোজ্যসামগ্রী দিয়ে খিচুড়ী রান্না করে হৈ-হুল্লোড় করে নিজেরা খায় এবং পড়শীদের মধ্যে তা বিতরণ করে।

'হুলোই গান' ছড়াধর্মী হলেও এর কথায় ধর্মাশ্রিত বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। মাঙ্গন গান বলে এর পিছনে একটি লৌকিক পটভূমি আছে।

কোন লৌকিক দেবতার উদ্দেশ্যে গান গাওয়া হয় বলে স্বভাবতই বাড়ির মালিক অথবা গৃহিণী তুষ্টি সাধনের জন্য মাঙ্গন দেন। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় এতে যুক্ত থাকে। বিশেষ করে শিবঠাকুরের দোহাই, লক্ষ্মীর নাম উচ্চারিত হতে দেখা যায়। উদ্ধৃতি—

ও গিরি ও গিরি/(ধুয়া)হুলোই হুলোই।
বার কইরা দাও সোনার ফিড়ি।/(ধুয়া)হুলোই হুলোই।
সোনার ফিরিতে বসবে কে? /(ধুয়া)হুলোই হুলোই।
বাস্তঠাকুর এইসাছে/(ধুয়া)হুলোই হুলোই।
ব্যস্ত ঠাকুর দিলেন বর, /(ধুয়া)হুলোই হুলোই।
ধান-চালে গোলা ভর।/(ধুয়া)হুলোই হুলোই। [...]

## সারিগান

লোকসাহিত্যে সমবেত সংগীত (Group Song)-এর মধ্যে সারিগান একটি জনপ্রিয় শাখা। এ গানে শ্রম লাঘব হয় বলে একে শ্রমসংগীত (Work Song) বলা হয়।

নদীকেন্দ্রিক অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনে এ গান বড়ই ঐতিহ্যময়। বিশেষ করে নৌকা বাইচের জয়লাভের নিমিত্তে আনন্দ, উৎসাহ, উদ্দীপনা ও শক্তিসাহস বর্ধনে এ গান পরিবেশিত হয়। এ ছাড়া দালানের জলছাদ করার সময় সুরকি পেটার তালে তালে, গাড়ি ঠেলা, ক্ষেতে ধান-পাট নিড়ানো ও কাটা, ফসল গৃহস্থের ঘরে তোলা ইত্যাদি পরিশ্রমের কাজেও এ গান গীত হয়। এ গান তাল প্রধান বলে একে Rhythmied সংগীত। প্রধানত পূর্ববঙ্গকে সারিগানের সংগীতাঞ্চল বলা হলেও সিলেট, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, যশোর ও রাজশাহী তথা চলনবিল অঞ্চলে এ গান ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ফরিদপুর অঞ্চলের একটি সারিগানের উদ্ধৃতি :

ওমা, জয়ের ধ্বনি দে,
তোর গোপাল সাজিল গোষ্ঠে, জয়ের ধ্বনি দে।।
ওমা, ধান দুব্বা বরণ কুলা মাগো লইয়া আইস ঘাটে।
আশীর্বাদ কর মা তোমার গোপাল যাবে গোষ্ঠে।।
ওরে সাজাইয়া নন্দরাণী নূপুর দিয়া পায়,
পূর্ণিমারো চন্দ্র যেন হইয়াছে উদয়।।
ওমা, ডান কুলে বাজে শঙ্খ বামে বাজে বাঁশী।
গোষ্ঠে যাবার জন্যি মাগো হইলো উদাসী।।
তোর গোপাল সাজিল গোষ্ঠে, জয়ের ধ্বনি দে।।

ফরিদপুরে শান্তির বারোমাসি, ফুল্লোরার বারোমাসি, বেহুলার বারোমাসি, মইফুলের বারোমাসি প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। মধ্যযুগের বাংলা ধ্রুপদী সাহিত্যে 'ময়মনসিংহ গীতিকায়' মলুয়ার বারোমাসি, নীলার বারোমাসি, কমলার বারোমাসি ষোল শতকের কবি মুকুন্দ দাসের 'কালকেতু উপাখ্যানে' ফুল্লরার বারোমাসি অনন্য সৃষ্টি। লৌকিক সাহিত্যে এমন কিছু রাধার বারোমাসি আছে যে গুলি রাধা-কৃষ্ণের সাক্ষাৎ লীলাব বর্ণনায় মুখর।

ফরিদপুরের একটি বারোমাসির উদ্ধৃতি :

ওরে আমি তোর পিরীতে হইলাম দেশান্তরি।
জ্যৈষ্ঠ গেল আষাঢ় এলো/ বন্ধুর দেখা না হইল রে
শ্রাবণ মাসে বর্ষা হইল ভারী॥
ভাদ্র গেল আশ্বিন আসে/ আশ্বিনেতে রয় বিদেশে
কার্তিক মাসে শুকনায় গড়াগড়ি॥
দেখিতে দেখিতে মাস আগুন/জ্বালাইয়া যায় মনের আগুন রে

ওরে পৌষ মাসে শীত করলো আড়ি।।
মনে হইল মাঘের শেষে/জীবন গেল হায় হুতাশে
ফাল্গুনে দক্ষিণা বাতাস ছাড়ি।।
শীত গেলো বসন্ত এলো/বন্ধুর দেখা না হইল রে
চৈত্র মাসে গরম পইল ভারী।।
বৈশাখ করে আনচান/বাতাসে জুরায় না প্রাণ

আমি গ্রীষ্মকালে কারে বাতাস করি।।
জালালের আষাঢ় মাসে/ জোয়ারে নদী গেল ভরে
মাঝিবিনে ঘাটে নাই তরী।। [...]

**গাশ্‌শি**

আশ্বিন সংক্রান্তির রাতে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে 'গাশ্‌শি' উদযাপিত হয়। 'গাশ্‌শি' অনুষ্ঠানে মশা-মাছি এবং রোগ বালাই থেকে মুক্তি পাবার আশায় বিভিন্ন প্রকার ছড়া আবৃত্তি করা হয়। এ ছাড়া সন্ধ্যা গাছে ফলের প্রত্যাশায় ছড়া কেটে সম্মিলিতভাবে কিছু অভিনয় করা হয়। গাছের গায়ে কুঠারের কোপ দিয়ে মাদুলি হিসেবে খড় বেঁধে দেয়। গাছের আত্মা আছে, এই ধারণা থেকে গাছকে ভয় দেখানো হয়। এ হল Animism-এর দৃষ্টান্ত। অভিনয়ের পিছনে আছে সদৃশ্য যাদুবিদ্যায় বিশ্বাস। ফরিদপুর অঞ্চলে প্রচলিত গাশ্‌শির ছড়া–

১. গাশ্‌শি জাগো জাগো/ভালো কইরা জাগো
আশ্বিনে রান্ধে কার্তিকে খায়/ যে বর মাঙ্গে সেই বর পায়।
২. গাশ্‌শি জাগো জাগো/ ভালো কইরা জাগো
অলদি জাগো, তুলসী জাগো, কুলা জাগো, চালুন জাগো
ভালো কইরা জাগো
৩. গাশ্‌শি জাগো জাগো/ ভালো কইরা জাগো
মশা বুনবুন মা বুনবুন/মশার গায় দড়ি।
সকল মশা খেদায় দিলাম/ কেষ্টর মার বাড়ি।

**গোয়ালের ডাক**

গোয়ালের ডাক-আশ্বিন মাস থেকে শুরু করে চৈত্র মাস পর্যন্ত ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে গোয়ালের ডাক শুনতে পাওয়া যায়। এরা গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি ঘুরে গরুদাগিয়ে অর্থ উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করে। গরু দাগানোর সময় কর্মের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা হিসেবে এক ধরনের ছড়া আবৃত্তি করে যা 'গোয়ালের ডাক' নামে পরিচিত। ফোকলোরবিদ আবদুল হাফিজ বলেন, 'গোয়ালীর ছড়া' বা গানে গরু ও গোয়াল সম্পর্কে বিচিত্র সংস্কার স্থান পেয়েছে। এগুলিকে 'গোরক্ষনাথর ছড়া' বলেও অভিহিত করা হয়েছে।... গ্রীয়ার্সন সাহেব 'ময়নামতির গান' সংগ্রহ করেছিলেন এই গোয়ালী ভিক্ষুকদের নিকট থেকে। রংপুরের কোন কোন অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা 'যোগী' যুগী নামে পরিচিত। ফরিদপুর অঞ্চল থেকে সংগৃহীত গোয়ালের ডাক :

আষাইঢ়া বেঙ্গা/করে চেঙ্গা বেঙ্গা/অলদি মইখ্যা গায়/বেঙ্গা শ্বশুর বাড়ি যায়।
বেঙ্গা কুত কুইতে চায়/ বেঙ্গা ঠুক্ ঠুকুর কাশে/মুখ দেয় না ঘাসে/
পোলাপান হাসে [...]
তোর গেরস্ত দেয় না কড়ি। র-র-র
করিস না নড়া চড়া/দাগাইয়া দিব গুদির মুড়া/ঘাস খাবি যাইয়া মোল্লার পাড়া
মোল্লারা যদি করে রাগ/ধইরা আনবি বনের বাঘ/সাপ দেইখা লক্ষ দিবি
বাঘ দেইখা দাবার দিবি/বছর বছর বিয়ান দিবি/দুনা ভইরা দুধ দিবি

নাতিন নিয়া চকে যাবি/তারাচান ঘোষের গুণ গাবি।

### মেয়েলী গীত

লোকাচারভিত্তিক মেয়েলী গীত ফরিদপুর জেলার একটি প্রধান লোকসংগীত। বিবাহের প্রারম্ভ থেকে বিবাহের সমাপ্তির সকল ঘটনা, লোকাচার নিয়েই মেয়েলী গীত রচিত। বিবাহ ছাড়াও এই গীত গর্ভধান, সীমান্তোন্নয়ন, সাধভক্ষন, জাতকর্ম, অন্নপ্রাশন, পঞ্চামৃত, সপ্তামৃত, উপনয়ন, চূড়াকরণ ইত্যাদি সামাজিক পারিবারিক অনুষ্ঠানের মন্ত্র স্বরূপ। লোকসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য Functional Song হিসেবে এই গান উল্লেখযোগ্য। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য যে, নির্দিষ্ট ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ব্যতীত অন্যত্র কদাচিৎ গীত হয় না এবং একমাত্র নারী সমাজই এব প্রধান প্রচারক এবং পৃষ্ঠপোষক।

ফরিদপুরে বিবাহের অধিবাসের স্নানের সময় পরিবেশিত একটি মেয়েলী গীতঃ

রাজপথে বাজার মোহন বাঁশি/ঐ না বাঁশির সুরে জাগে রামরে
পূবের মাইয়ারে কত নিদ্রা যাচ্ছ শুইয়ারে/ তোমরা দিবা নাকি রামের বিয়ার হলুদরে
কাটায় হলুদ বাইটারে রাণী/রাণী সাজায় যাদুমণিরে
রাণী সাজায় নীলমণিরে/ তোমরা শোনো বলিরে ও পাড়া-পড়শী রে
আমার কি সাধন আছ ঘরেরে/মায়ে শুনে বলেও পুত্র দুল্লাপ রে
কিজন্যে বোলাইছ আমারে/আমিতো যাবো নতুন শ্বশুর বাড়ি
কি কি ধন দিবা আমার সাথেরে।

### ছয়হ্যাটুরে বা নামকরণ

নবজাতকের জন্মের ছয়দিনে, কখনো নয় দিনে ছয়হাটুরে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।* অনুষ্ঠানটি মূলত একটি নামকরণ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের পূর্বের রাত্রে সন্তানকে বিদ্বান করার ইচ্ছা পোষণ করে নবজাতকের শিয়রে দোয়াত কলম, খাতা-পত্র রাখা হয়। আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী মেয়েরা সারারাতব্যাপী প্রসূতির ঘরে হাসিঠাট্টা আমোদ প্রমোদ সহকারে গীত পরিবেশন করে। পরদিন নবজাতকের মাথার চুল কামানো হয় এবং প্রসূতি ও নবজাতককে গোসল করিয়ে নতুন জামাকাপড় পরিধান করিয়ে প্রথম ঘর থেকে বাইরে বের করা হয়।

জ্যৈষ্ঠ না আষাঢ় মাসে পন্থে কাদাপানি
সেইনা পানিতে ভাইসে আইলোরে কোলে জয়ধন মণি।
মায়তো উঠিয়া কয় আমি কিসের কাম করি রে
ছাউয়াল ওলিরে ছাউয়াল ওলি।
মায়ের কোলে থুইয়া ছাউয়াল দাদির কোলে যায়
দাদিতে উঠিয়া কয় আমি কিসের সংসার করি
এক পয়সার বিস্কুট অইলে আমি নাতি ভুলাইতে পারি রে
ছাউয়াল ওলিরে ছাউয়াল ওলি। [...]

ফরিদপুর জেলার লোকসংগীত অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বলিষ্ঠ, বিচিত্রমুখী এবং ভাষা ও বাণীতে উজ্জ্বল। প্রাকৃতিক পরিবেশ, বিশাল সমতলভূমি,

নদীকেন্দ্রিক চরোৎপাদী (Bralded) চরিত্র এ জেলার লোকসংগীতকে প্রভাবিত করেছে। এ জেলার লোকসংগীতের মধ্যে বৃষ্টি কামনায় কৃষিনির্ভর জীবনযাত্রার মেঘরাজার গান, বদনা বিয়ে, মাদারের গান, মানিকপীরের গান, নইল্যা গান ব্যাকভাবে প্রচলিত। বিভিন্ন রোগ-বালাই থেকে আরোগ্য লাভের জন্য গাজির গান, শীতলার গান; সাপের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রয়ানীগান, ব্রতনারীদের মধ্যে সূর্যপূজার গান, মাঘমঙ্গলব্রত, তারাব্রত, সতীনব্রত প্রচলিত আছে। এ জেলায় এমন কিছু লোকসংগীত আছে যেখানে প্রেমই তার প্রধান উপজীব্য। এই গানগুলির মধ্যে মেয়েলী গীত আধ্যাত্মিক সংগীত উল্লেখযোগ্য। লোকাচারভিত্তিক মেয়েলী গান। এ জেলার একটি প্রধান লোকসংগীত। নারীমনের স্রোতধারা এ গানে ফুটে উঠেছে। মুর্শিদী, মারফতি, মরমী, বিচার, কীর্তন, সুরেশ্বরী গান, খাজাবাবার গান, মাদারের গীত ও ফকিরি গান এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠতম লোকসংগীত। কর্মসংগীতের মধ্যে সারিগান গোয়ালের ডাক, পালকিরগান, ছাদপেটার গান, উল্লেখযোগ্য।

বিরহী সংগীতের মধ্যে বারোমাসী, রাখালী, বৈঠকী গানের মধ্যে কবিগান, জারিগান, বিচারগান, এর ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। পূজা-পার্বণ উপলক্ষে অষ্টকগান, গাশ্‌শির ছড়া, গাজনের গান, মনসাপূজার গান, দুর্গাপূজার গান, গাজির গানের সংগ্রহ দেখা যায়। হোলি উৎসব, চড়ক পূজা এবং ত্রিনাথের পূজায় বেশকিছু গান শোনা যায়। শোকসংগীতের মধ্যে কৃষ্ণলীলা, নিমাই সন্ন্যাস পালা, গৌরাঙ্গলীলা, কীর্তন ছড়াও ব্যবহারিক সংগীত হিসেবে বিবাহের গান, সাধভক্ষণ, জাতিধর্ম ও অন্নপ্রাশনের গানের প্রচলন রয়েছে।

**ফরিদপুরের লোকসংস্কৃতি**

একটি জনপদের অধিবাসীদের ভাষা, খাদ্যাভাস, পোষাক-পরিচ্ছেদ ধর্মবিশ্বাস, লৌকিক আচার, লৌকিক খেলাধূলা, লোকচিকিৎসা লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত বিষয়। লোকশিল্প চারুশিল্পী ও চিত্রশিল্প লোকসংস্কৃতির আলোকিত বিষয়।

লোকসংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য একটি দিক হচ্ছে লৌকিক আচার। লোকাচার হলো প্রচলিত প্রথা। ধর্মবিশ্বাস, লোকসংস্কার, লোকবিশ্বাস ও কুসংস্কার হতে এর উদ্ভব। লোকাচারে মানসিক বিশ্বাস, ধারণা ও প্রবণতা প্রকাশ পায়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজে লোকাচার প্রচলিত এবং উভয় সম্প্রদায়ে এটাকে বিশ্বাস করে বলেই কার্যত তা পালন করে। সামাজিক, পারিবারিক এবং মানসিক উভয়বিধ মঙ্গল লোকাচারে নিহিত থাকে। ফরিদপুর জেলায় কতিপয় লোকাচারের শ্রেণী বিভাগ : ১. লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার ও কুসংস্কার, ২. বিবাহে লোকাচার, ৩. বিবাহোত্তর লোকাচার, ৪. কৃষিবিষয়ক লোকাচার ৫. লৌকিকদেবতা এবং ৬. লৌকিক খেলাধুলা।

**লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার ও কুসংস্কার**

লোকবিশ্বাস : পরলোক নয়, মৃত্যুরপরে নয়, এ জীবনে কীসে বিঘ্ন দূর হবে, কোন বস্তু ও ঘটনা শুভদায়ক, কোন বস্তু ও ঘটনা অমঙ্গলজনক, এই সব জ্ঞানাত্মক ও ক্রিয়াত্মক বিষয় লোকবিশ্বাসের বিষয়বস্তু।

* ফরিদপুরের দক্ষিণাঞ্চলে এই অনুষ্ঠানকে ছয়হইলটা বলা হয়। -সম্পাদক।

**ফরিদপুর জেলায় প্রচলিত লোকবিশ্বাস**

১. ভাত-তরকারি রান্নাকরা পাত্র, উনুন থেকে তৎক্ষণাৎ মাটিতে নামাতে নেই। এতে অমঙ্গল হয়।
২. হাত থেকে চিরুণি পড়ে গেলে বা কুটুম পাখি ডাকলে বাড়িতে আত্মীয় স্বজনের আগমন ঘটে।
৩. রাতের বেলায় আয়না দেখতে নেই। মৃত্য এগিয়ে আসে অর্থাৎ আয়ু কাটা যায়।
৪. হুতুম পেঁচার ডাক অমঙ্গলের লক্ষণ। সুতরাং ডাক শোনা মাত্রই লৌহখণ্ড আগুনে ফেলতে হয় অমঙ্গল হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য। বিশ্বাস যে, লৌহখণ্ড, উত্তপ্ত হওয়া মাত্রই এর তাপ পেঁচার গায়ে লাগবে এবং তৎক্ষণাৎ পেঁচাটি উড়ে যাবে, ফলে অমঙ্গল থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
৫. খেতে বসে বিষম খেলে দূরের আত্মীয়-স্বজন কেউ স্মরণ করছে।
৬. গামছা, গেঞ্জি সেলাই করে পরিধান করতে নেই।
৭. জুতা সেন্ডেল অথবা ঝাড়ু পেতে বসতে নেই, এতে অমঙ্গল।
৮. হাত চুলকালে টাকা আসে, ডান চোখ ফরকিলে অসুখ হয়।
৯. বাড়িতে কুকুর বিড়াল কাঁদলে অথবা কাক ডাকলে অমঙ্গল হয়। মৃত্যু প্রবেশ করে।
১০. আতুড় ঘরে প্রবেশ করতে হলে আগুনে হাত-পা সেঁকে তবে ঢুকতে হয়। নইলে বাইরে থেকে ভূত-প্রেত ঘরে ঢুকতে পারে।

**লোকসংস্কার**

মানুষের প্রতিদিনের বিশ্বাস বিভিন্ন আচরণের বা ক্রিয়ার মাধ্যমে সংস্কার রূপে সুগ্রোথিত হয়। অর্থাৎ একজন মানুষের মনের বিশ্বাস সামাজিকভাবে স্বীকৃত হলে বা অপর কর্তৃক অনুকরণীয় হলে সেটাকে সংস্কার বলে। এর মূলে রয়েছে Animism অর্থাৎ সর্বপ্রাণীকে বিশ্বাস। পশুপাখি, বৃক্ষলতা, মাটি, পাথর, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি সবকিছুরই মধ্যে আত্মার বিদ্যমানতায় বিশ্বাসই সর্বপ্রাণীবাদের মূলকথা। এর উল্লেখযোগ্য আরেকটি দিক হচ্ছে যাদুবিশ্বাস। পেঁচা ডাকলে আজও অশুভ বলে মনে করা হয়। এই সংস্কারটি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত হয়ে আজও আছে। ঋগ্বেদে দেখতে পাই ঋষি পেঁচার ডাককে মৃত্যুর লক্ষণ বলে মনে করছেন। অন্তত তিন হাজার বছর আগেও মানুষ পেঁচাকে যমের দূত বলে মনে করত। তাই আমাদের সমাজে হুতুম পেঁচার ডাক একটি সংস্কার। এটি ঋগ্বেদের যুগে যেমন অমঙ্গল, অশুভ হিসেবে ক্রিয়াশীল ছিল; আজও তেমন। ফরিদপুর জেলার প্রচলিত কয়েকটি সংস্কার–

১. ঘর থেকে বের হবার সময় চৌকাঠে মাথা ঠোকা (আঘাত) খাওয়া অমঙ্গল, যাত্রা শুভ নয়। তাই ক্ষণিক অপেক্ষা করে যাত্রা আরম্ভ করতে হয়।
২. নববধূ স্বামীর বাড়িতে প্রবেশের সাথে সাথেই তাকে ধান-দূর্বা, স্বর্ণ- রৌপ্য দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়। অন্যথা সংসারে অমঙ্গল হয়।
৩. আঁতুড় ঘরে একটুকরো লৌহখন্ড, মরাগরুর হাঁড় রাখা হয়– কোন অপদেবতা, ভূত-প্রেতের কুদৃষ্টি এবং অনিষ্টের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য।
৪. আঁতুড় ঘরের দরজার সামনে জ্বলন্ত আগুন রাখতে হয়—অপদেবতা, ভূত-

প্রেতের কুদৃষ্টি হতে রক্ষা পাবার জন্য।

৫. নতুন কাপড় পরিধান করার আগে ঐ কাপড় থেকে একটুকরো সূতা ছিঁড়ে আগুনে পোড়ানো হয়। অথবা ঐ কাপড়ে পানির ছিটা দিতে হয়। নইলে নতুন কাপড়ের সঙ্গে ভূত-প্রেত প্রবেশ করে অমঙ্গল করে।

**কুসংস্কার**

কুসংস্কারের অর্থ হলো সমুচিত বিবেচনা ব্যতীত কৃতসিদ্ধান্ত; চিরাচরিত ভ্রান্তধারণা; যুক্তিহীনভাবে উৎপন্ন ধর্মাদি বিষয়ে বিশ্বাস। কোন একটি লোকসংস্কার যখন সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের দরুন অপ্রচলিত হয়ে যায়, কিংবা লোকজীবনে যখন তার কোন কার্যকর জীবন ভূমিকা থাকে না, তখন তা কুসংস্কার নামে অভিহিত হয়। উদাহরণ ঃ বাংলাদের হিন্দু কৃষকেরা অম্বুবাচীর দিনে জমিতে লাঙ্গল দেন না, কারণ তাদের বিশ্বাস দিনে ধরিত্রী রজঃস্বলা হয়। হিন্দু মেয়েরাও সে দিন উপবাস ও অন্যান্য আচার পালন করে। পাশাপাশি বসবাসকারী মুসলমানরা একে কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেয়। অপর দিকে মুসলমান কৃষকেরা জমিতে প্রথম রোয়া লাগানোর সময় এক ধরনের ক্রিয়া (Ritual) পালন করেন। অন্যত্র তা পালনীয় নাও হতে পারে। এটাই কুসংস্কার।

ফরিদপুর জেলার প্রচলিত কয়েকটি কুসংস্কারে উদাহরণ–

১. বালিশের উপর বসলে পায়ুপথে হালিশ বের হয়।
২. হাসলে যে মেয়ের গালে টোল পড়ে তার স্বামী মারা যায়।
৩. চুলবাঁধা অবস্থায় চুল আঁচড়ালে ঘরে সতীন আসে।
৪. ভাঙা আয়নায় মুখ দেখতে নেই, এতে হায়াত কাটা যায়।
৫. রাত্রিকালে আয়নায় মুখ দেখতে নেই, এতে অমঙ্গল হয়।
৬. যমজ কলা খেতে নেই, এতে যমজ সন্তান জন্মে।
৭. রোববার বাঁশ ঝাড় থেকে বাঁশ কাটতে নেই।
৮. পাটকাঠি দিয়ে কাউকে মারতে নেই, সে পাটকাঠির মতো শুকিয়ে যাবে।
৯. ভাতের চাউল খেতে নেই, খেলে আঁচিল হয়।
১০. হলুদ ধার দিতে নেই, অমঙ্গল।

**বিবাহে লোকাচার**

বাঙ্গালি সমাজে হিন্দু, মুসলমান বিবাহের দুইটি ভাগ। একটি ভাগ পুরোপুরি শাস্ত্রীয় আর একটি লৌকিক বা লোকাচার ভিত্তিক। হিন্দু বিবাহে মনুসংহিতার বিধান, মুসলমান বিবাহে হাদিস মোতাবেক বিবাহ সুসম্পন্ন করতে হয়। ধর্মীয় অংশে হিন্দুমতে সংস্কৃত মন্ত্র, হোমজ্ঞ, সম্প্রদান, সপ্তপদী ইত্যাদি; যার কর্তা হচ্ছেন পুরোহিত। মুসলমান মতে বর-কনের সম্মতি জ্ঞাপন, উকিল প্রেরণ এবং দোয়া প্রার্থনায় মূলত ধর্মীয়নীতি অনুসরণ করা হয়। এর বাইরে দেশী বা লৌকিক অংশে হাজার বছর ধরে প্রচলিত আচার-আচরণ, রীতিনীতি সম্পাদিত হয়। যার দায়দায়িত্ব পরিবার ও সমাজের নারীদের হাতে, পুরুষের ভূমিকা থাকে নেপথ্যে। বিবাহ একটি অনিশ্চিত ব্যাপার বলে বাঙালি সমাজে বিবাহ আচার সর্বস্ব। অধিকাংশ আচারই অশুভ শক্তি প্রতিরোধক। বর যে পথে বিবাহ

করতে যায়, সেই পথে নববধূ নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে না; অন্য পথ দিয়ে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে। এর তাৎপর্য হলো, অপদেবতা বা জ্বীনের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটানো। এই ধরনের অসংখ্য লোকাচার বয়স্ক মা-খুড়িমাদের মুখে মুখে যুগ যুগ ধরে প্রবাহমান।

**ফরিদপুর জেলায় প্রচলিত বিবাহ সম্পর্কিত কতিপয় লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার**

১. বিব্যাহের বরণডালা, চন্দন, হলুদ, শঙ্খ, সিঁদুর, মাটির ঢাকুন প্রভৃতি একদামে কিনতে হয়, নচেৎ পাত্র-পাত্রীর অমঙ্গল হবার সম্ভাবনা থাকে।

২. নববধূর হলুদের কাপড় খুব সাবধানে রেখে দিতে হয়। কেননা অপয়া মেয়ের বিবাহের জন্য শাড়ির আঁচল কেটে তাবিজ করার সম্ভাবনা থাকে।

৩. ভাদ্র, আশ্বিন মাসে বিবাহ নিষিদ্ধ। ঐ সময় বাড়ি থেকে বিড়াল, কুকুর পর্যন্ত তাড়াতে নেই।

৪. বিবাহে কালো রঙ নিষিদ্ধ। কালো রঙের কোন কিছু বর-কনেকে উহার দেয়া হয় না। কালো রং অমঙ্গল অথবা শোকের প্রতিক। এ ক্ষেত্রে লাল রঙের পর্যাপ্ত ব্যবহার লক্ষণীয়। আলতা, সিঁদুর এবং লাল রঙের শাড়ির ব্যবহার দেখা যায়। লাল রং আবেগের প্রতীক।

৫ বিবাহের দিন কনের মাকে উপবাস বা রোজা রাখতে হয়। বিশ্বাস, কনের মা যত শুকাবে কনে তত সুখী হবে।

৬. বরকনের শুভদৃষ্টির সময় কোন ঋতুমতী নারী সেখানে থাকতে নেই; এতে বর কনের জীবনে নানাবিধ অশান্তি দেখা দেয়।

৭. জন্মবারে বিবাহ নিষিদ্ধ।

৮. অবিবাহিত সময় বর-কনে কলতলায় খুঁটি ভাঙ্গে। বিশ্বাস খুঁটি যত টুকরো হবে অতগুলি সন্তান জন্মাবে।

৯. অবিবাহিত ছেলে বা মেয়ের কাছে প্রজাপতি উড়ে এলে সেই ছেলে বা মেয়ের বিবাহ আসন্ন বলে বিশ্বাস করা হয়।

১০. পথের তেমাথায় হলুদ গুলে অবিবাহিতরা স্নান করলে তাদের যথাশ্রীঘ্র বিবাহ হয়।

**ফরিদপুর জেলার বিবাহ আনুষ্ঠানিক লোকাচার**

অভিভাবক কর্তৃক পাত্র-পাত্রী নির্বাচন 'ঘটক'-এর মধ্যস্থতায় বিবাহের প্রস্তাব পাঠানোর রীতি দীর্ঘকাল থেকে চলে আসছে। ছেলের অভিভাবক যখন পেশাদার ঘটককে সঙ্গে নিয়ে পাত্রী দেখতে যান, তখন ছেলের মা সুন্দরী পুত্রবধূ প্রাপ্তির কামনায় ঘটকের পরিধেয় বস্ত্রে একটি লাল কুঁচফল কিংবা একটি লাল জবাফুল বেঁধে দেন। হিন্দু সমাজে পাত্র-পাত্রীর কোষ্টি বিচারে গুরুত্ব দেয়া হয়। পূর্বে মুসলমান সমাজেও কোষ্ঠী বিচার করে বিবাহ দেয়া হতো। বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক হবার পর একে পাকা রূপ দেয়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন লোকাচার বা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। স্থান ও সমাজ ভেদে তা পান-চিনি, আশীর্বাদ, মঙ্গলাচরণ, লগ্নপত্র, পত্রকরণ, পাটিপত্র প্রভৃতি নামে অভিহিত। ফরিদপুর অঞ্চলে একে 'সোনাকাপড়' বলা হয়। কন্যাব পিত্রালয়ে কন্যাদর্শন বা পানচিনি

অনুষ্ঠান হয়। তখন কন্যার হাতে টাকা পয়সা অথবা কন্যার হাতে আংটি, অথবা গলায় হার পরিয়ে দেয়। ফরিদপুরে এই অনুষ্ঠানকে 'জাননী খাওয়া' বলে। হিন্দু বিবাহে পাটিপত্র বা লগ্নপত্র করার প্রথা রয়েছে। বিবাহের কেনাকাটাকে 'সোহাগপুরা' বলা হয়। হিন্দু-বিবাহে ক্রয়যোগ্য যাবতীয় জিনিসপত্রের একটি জায়পত্র প্রস্তুত করা হয়। জায়পত্রে সর্বপ্রথম কাঁচাহলুদ সিঁদুর এবং কুলায় নাম লিপিবদ্ধ করে থাকে।

### ঢেঁকিবরণ (হলুদকোটা)

বিবাহের সাত, নয় কিংবা এগারো দিন পূর্বে ফরিদপুরের বিভিন্ন এলাকায় হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজে 'ঢেঁকিবরণ' বা ঢেঁকিপূজা প্রচলিত আছে। বিবাহ উপলক্ষে ধান, হলুদ, মেহেদি ইত্যাদি ঢেঁকিতে প্রস্তুত করা হয়। ঢেঁকিবরণের পূর্বে একটি ঝিনুকে তেল, সিঁদুর মিশ্রিত করে ঢেঁকির মাথায় পাঁচটি বড় বড় ফোঁটা দেয়া হয়। গায়ে হলুদের কিছু আগে একটি বরণ ডালায় হলুদ, ধান-দূর্বা, সিঁদুরকাটা, তেল, সাবান মাখা হয়। পাঁচ সাতজন এয়োস্ত্রী সারিবদ্ধভাবে একটি করে কুলা আঁচলে ঢেকে মাথায় করে ঢেঁকি সালে আসে। সেখানে ঢেঁকিবরণ করে হলুদকোটা হয়।

### ক্ষৌরকর্মের অনুষ্ঠান

বিবাহের পূর্বে পাত্র-পাত্রীকে ক্ষৌরকর্ম করানো হয়। ফরিদপুর জেলায় বরের ক্ষৌরকর্মের জন্য একসময় কন্যাপক্ষ নাপিত প্রেরণ করতো। মুসলমান বিবাহে নাপিতকে 'সিদে' দেওয়ার প্রচলন ছিল। উঠোনে আলপনাকৃত পিঁড়ি বা জলচৌকিতে বসিয়ে পাত্র-পাত্রীকে ক্ষৌরকর্ম করানো হতো। ক্ষৌরকর্ম অনুষ্ঠানে নাপিতকে লক্ষ্য করে বিদ্রূপাত্মক, হাস্যরসিকতামূলক মেয়েলিগীত পরিবেশন করা হতো। এই গানগুলি সাধারণত বাৎসল্য রসসিক্ত ছিল। নাপিত পেতো অর্থ ও খাদ্য সামগ্রী।

### গায়েহলুদ

গায়েহলুদ বিবাহের একটি প্রধান স্ত্রী-আচার। অঞ্চলভেদে এর বিভিন্ন নাম-তেলাই, তেলহলুদ, তৈলকাপড়, হলুদ-গোসল, গিলা-গোসল, কুলোই ভাঙ্গা, উঠনা দেওয়া, কুড় দেওয়া, হলুদকুটন, হলুদভাঙ্গা, খায়তাগা নামে পরিচিত। ফরিদপুরে অঞ্চলভেদে একে 'হলুদকোটা' বা গায়েহলুদ বলা হয়। মূলত এটি একটি দেহশুদ্ধি অনুষ্ঠান। বিবাহের দুই তিন দিন পূর্বে পাত্র-পাত্রী উভয়ের বাড়িতে ঘটা করে এর আয়োজন করা হয়। নতুন কুলা বা ডালায় হলুদ, ধান-দূর্বা, মেহেদি, মেথি, গিলা, আফসানা, আমলা বা দুধের সর থাকে। পাত্র-পাত্রী উভয় পক্ষ পরস্পরের বাড়িতে হলুদের ডালা পাঠায়। এর সঙ্গে পান-সুপারি ও মিষ্টি থাকে। সর্বপ্রথম পাত্র-পাত্রীর মা দুধের সর মিশ্রিত হলুদবাটা, গিলা কপালস্পর্শ করান এরপর অন্যরা তা অনসুরণ করে। মা মেয়ের মুখে হলুদ দিয়ে আঁচলদ্বারা মুছে ফেলেন, উপস্থিত সকলে মেয়ের মাকে জিজ্ঞাসা করে 'কী মুছো? মা বলেন, সোহাগ মুছি।' এই ভাবে মা সাতবার হলুদ মাখেন এবং তা মুছে ফেলেন। এরপর মা মেয়ের মাথায় এক ঘটি পানি ঢেলে দিয়ে চলে যান। তারপর সবাই মিলে তার গায়ে হলুদ দিয়ে গোসল করায়।

### অধিবাস

হিন্দুসমাজে বিবাহের পূর্বদিন অধিবাস। অধিবাসের স্থান ও আসন আলপনায় সজ্জিত করা হয়। এই দিন পাত্র-পাত্রি নিরামিষ আহার করে। বরণকুলা মাথায় স্পর্শ করিয়া গায়ে হলুদ মাখিয়ে স্নান করান। বরের দক্ষিণ ও কন্যার বাম হাতে মঙ্গলসূত্রে বেঁধে দেওয়া হয়। বরের মা বরের কপালে চন্দন ফোঁটা দেন, একে অধিবাসীর ফোঁটা বলে। অন্যরা একই নিয়মে কপালে চন্দনের ফোঁটা দেন।

### চোরপানি জলতোলা

হিন্দু সমাজে চোরপানি বা জলতোলা একটি স্ত্রী-আচার। কন্যার বাড়িতে বিবাহের দিন প্রত্যূষে এয়োরা গান গেয়ে কলসী, ঘটি নিয়ে নিকটস্থ জলাশয়ে জল তুলতে যান। বাদ্যকারেরা ঢোল ও বাঁশি বাজায়। একটি মাটির কলসীতে জলভর্তি করা হয়। তখন শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি করা হয়। বাড়িতে গিয়ে মাটির কলসীতে পাঁচটি ফল ও একছড়া মালা রেখে নতুন কাপড়ে এর মুখ বেঁধে দেওয়া হয়। বিবাহের পর স্ত্রী আচারের সময় বর অতি সন্তর্পণে কলসীর মুখ খুলেন।

### আইবুড়ো ভাত

হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আইবুড়ো ভাত প্রচলিত। কোথাও একে ক্ষীর খাওয়া, থুবড়ো খাওয়ানো বলে। কুমারীমেয়েরা মূলত এতে অংশগ্রহণ করে। গায়েহলুদের পরের দিন আইবুড়ো ভাত খাওয়ানো হয়। হিন্দু বিবাহে পঞ্চব্যঞ্জন, পরমান্ন; মুসলমান বিবাহে, ক্ষীর, নিরামিষ ভোজনের প্রচলন আছে। বর-কনের জ্ঞাতি-গোষ্ঠী এবং প্রতিবেশীরা পালাক্রমে বরকনেকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায়।

### সোহাগমাখা

সোহাগমাখা একটি মনোজ্ঞ স্ত্রী আচার। কন্যার মা, চাচী কিংবা মাতৃস্থানীয় জা, কিংবা ননদ প্রতিবেশীর বাড়িতে সোহাগ মাখতে যান। তাদের মাথায় কুলা, কুলায় চাল, ডাল, তৈল, লবণ থাকে। জা বা ননদ কলসী বহন করে। বাদ্যকারেরা ঢোল ও বাঁশী বাজাতে বাজাতে আগমন করেন। প্রতিবেশীরা আগমনের সাথে সাথে উলুধ্বনি দেয়। কুলাতে যে সকল দ্রব্যাদি থাকে অল্প অল্প করে তা দেয়া হয়।

### পানিভরণ বা জলসাহা

পানিভরণ, কোথাও জলসাহা একটি স্ত্রী আচার। সাধাবণত বর-কনের বোন, ভাবী অথবা অন্যান্য এয়োস্ত্রীরা বিবাহের দিন বর-কনেকে গোসল করান। একটি আলপনাকৃত জলচৌকি বা পিঁড়ির উপর বর-কনেকে বসানো হয়। নদী বা পুকুর থেকে সংগৃহীত পিতল বা মাটির কলসী ভর্তি পানি দিয়ে তাদের গোসল করানো হয়। তখন সম্মিলিত নারীকণ্ঠে গীত হয়।

কাঁঠালের পিঁড়িতে আরে জ্বিলিক মারে
তার উপর নওশা গোসল করে,
আমিতো যাবো দূরে শ্বশুরবাড়িতে

কী কী নিবো মোর সাথেরে।
ঘরে তো আছে কৌটাভরা সিঁন্দুর রে
তাতে তো বিবি তোমার শোভা হবে কি না রে। [...]

**বরসজ্জা**

বরকে গোসলের পর স্ত্রী-পুরুষ মিলিতভাবে পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করান। পাত্রের মা নতুন পোষাক-পরিচ্ছদ এনে পাত্রের বন্ধু-বান্ধবদের হাতে তুলে দেন। পাত্রের চাচী, খালা বা ফুফু গলায় মালা ও মাথায় পাগড়ী পরিয়ে দেয়। হিন্দু সম্প্রদায় বরের মাথায় শোলার তৈরি টোপর বা মুকুট, ললাটে চন্দনের ফোঁটা, গলায় ফুলের মালা, হাতে মঙ্গল সূত্র, এবং জাঁতি বা মাজদর্পণ দেখা যায়। একটি বর সাজানো গানের নমুনা:

ওরে সুন্দর রাম রে, রাম সীতার হবে বিয়া
তাইরির জয় জয় শুনিরে, ওরে সুন্দর রাম রে
কী দিয়া সাজাবো তোরে।
বাণিকারো চন্দন আইন্যা রামরে সাজাব
দীপের শিষের কাজল আইন্যা রামরে সাজাব
মালিকারো মালা আইন্যা রামরে সাজাব।

**দধিমঙ্গল বা ক্ষীরভুজনী**

বর সাজানোর পর একটি বড় থালা ভর্তি করে দুধ-ভাত দেওয়া হয়। প্রথমে বরের মা তাকে তিন লোকমা ভাত খাওয়ান। অন্যরাও তাতে অংশগ্রহণ করেন। থালা ভর্তি দুধ-ভাত একটি নতুন পার্টির উপরে রুমাল দিয়ে ঢাকা থাকে। বরের আত্মীয়-স্বজন এবং বরযাত্রীরা যাত্রা আরম্ভের পূর্বক্ষণ বিশেষ এই আচারঅনুষ্ঠানের মাধ্যমে দুধ মাখাভাত কোথাও দইমাখাভাত খায়।

**বরযাত্রা**

বরযাত্রার প্রাক্কালে পাত্র তার মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে মা তাকে দুধের ধার শোধ করার কথা বলেন। ছেলে বিবাহ, করে ফিরে এসে মাতৃদুগ্ধের ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দেন। এবং বলেন তার জন্য দাসী আনতে যাচ্ছে। মা তখন দাসী নয় দোসর বা গৃহের লক্ষ্মী আনার কথা বলেন। মা ছেলেকে কোলের উপর বসিয়ে একগ্লাস চিনি মিশ্রিত দুধ খাওয়ান এবং কপালে চুম্বন করেন। হিন্দু পরিবারে মাথায় ধান দুর্বা দিয়ে বরণকুলা তার মাথায় স্পর্শ করে এবং মাথায় শোলার টোপর দিয়ে দেয়। বরযাত্রী বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় উলুধ্বনি দেয়া হয়। পাত্রের মা-বাবা উপোস থাকেন।

**বর আগমন**

বরের পালকির আগমনবার্তা শোনা মাত্রই হিন্দু মতে শঙ্খধ্বনি এবং উলুধ্বনি দেওয়া হয়। সুদৃশ্য তোরণ নির্মাণের ব্যয়সহ অন্যান্য দাবি মিটানোর পর বরযাত্রীদের কাছারী ঘরে বসানো হয় এবং বরকে হিন্দু মতে ছাদনাতলায় নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে মেয়েলী আচার মতে বর আগমনের পূর্বক্ষণ থেকে কনে দুগ্ধপূর্ণ গামলায় হাত ডুবিয়ে

বসে থাকে। বরের নির্দিষ্ট স্থানে বসার খবর পাওয়া মাত্রই গামলা থেকে হাত তোলা হয়। বর শান্তশিষ্ট হবে এই কামনায় উক্ত আচার পালন করা হয়। কন্যার মাতা, এয়োগন পঞ্চপ্রদীপ ও বরণকুলা দিয়ে জামাতা বরণ করেন। বিবাহ, পিঁড়িতে পূর্বমূখী আসীন জামাতার মুখে পঞ্চপ্রদীপ ঘুরিয়ে তার মুখদর্শন করেন কন্যার মাতা। এরপর ধান-দুর্বা তার মাথায় দিয়ে বরণকুলা তার কপালে ছুঁইয়ে আশীর্বাদ করেন : বা তাকে প্রণাম করেন।

**ছাদনাতলা**

হিন্দু সম্প্রদায়ের বিবাহে যেখানে কন্যা সম্প্রদানের বিভিন্ন কার্যবিধি সম্পাদিত হয় সেটি ছাদনাতলা। কোথাও একে 'কলাতলা'ও বলে। ছাদনাতলার জন্য নির্দিষ্ট যায়গা লেপে মুছে আলপনা করা হয়। এর চারধারে চারটি কলাগাছ পোঁতা হয়। এই স্থান সম্প্রদানের অব্যবহিতপূর্বে কন্যা বরকে দক্ষিণাবর্তে রেখে সাতবার প্রদক্ষিণ করে এবং তাদের শুভদৃষ্টি বিনিময় পাঠিয়ে দেন। এই ডালাকে 'সোহাগপুরা' বলা হয়।

**বরার্চনা, বিবাহের মূল কার্যাদি**

মুসলিম মতে বিবাহের কাজি একটি রেজিস্ট্রারে বর-কনের নাম, ঠিকানা, বিবাহের শর্তাদি, দেনমোহর, মাসিক খোরপোষের পরিমান লিপিবদ্ধ করেন। এটাই কাবিননামা। এর পূর্বে মেয়ের সম্মতির জন্য একজন উকিল ও দুইজন সাক্ষী অন্দর মহলে পাঠানো হয়। মেয়ের স্পষ্ট সম্মতি বাক্য উচ্চরণ করার পর বিবাহ সংঘটিত হয়।

কাজী সাহেব কোরআন শরীফের আয়াত পাঠ করে সবার জন্য দোয়া করেন। হিন্দুমতে বিবাহ লগ্নের পূর্বে সম্প্রদান স্থানের পশ্চিমাংশে পূর্বমূখ করে বরের এবং দক্ষিণাংশে উত্তর মুখ করে সম্প্রদাতার আসন থাকে। দাতা বরের সামনে পশ্চিম দিকে মুখ করে বসেন। নিকটেই বরসজ্জা ও শালগ্রাম এবং মধ্যস্থলে অধিবাসের ঘট থাকে : শুভলগ্নে বর এসে সম্প্রদানস্থানে উপবেশন করলে সম্প্রদাতা তাকে পুণ্যাহবাচন উচ্চারণ করে গন্ধ পুস্পক ও বস্ত্রাদি দিয়ে অর্চনা করেন। বরকে নববস্ত্র ও আঙ্গুরীয় পরানো হয়। অতঃপর ছাঁদনাতলায় বিবিধ স্ত্রী আচার সম্পন্ন করা হয। পরে ছাঁদনাতলায় কন্যা আনয়ন, বরকে সাতবার প্রদক্ষিণ ও মুখচন্দ্রিকা বা শুভদৃষ্টি করানো হয়।

**কন্যা সম্প্রদান**

ধর্মীয় মতে বিবাহকার্য সম্পন্ন হলে বরকে অন্দর মহলে আনার কাজে স্ত্রী লোকাচারে বিভিন্ন কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়। মুসলমান লোকাচারে শাহ-নজর, হিন্দু লোকাচারে মুখচন্দ্রিকা বা শুভদৃষ্টি একটি গুরুত্বপূর্ন লোকাচার। শাহ নজরের সময় পাত্র-পাত্রীকে সামনা-সামনি বসিয়ে উভয়ের সামনে একটি পর্দা টানায়ে দেওয়া হয়। অথবা পাশাপাশি বসিয়ে একটি বড় আয়না উভয়ের সামনে ধরা হলে ঐ সময় শুভদৃষ্টি বিনিময় হয়। এরপর উভয়ের মধ্যে আংটি বদল হয়। এবং আংটি দিয়ে পাত্র-পাত্রী পরস্পরকে ক্ষীর খাওয়ায়। একে 'ক্ষীরপূজানী' বলা হয়। এই পর্বে পাত্রীর মা-চাচী-খালা বরকে টাকা অথবা আংটি উপহার দেন। একে 'সিহারা বাঁধা' বলে।

হিন্দু বিবাহে কন্যার মাতা পঞ্চএয়োস্ত্রীসহ বরের মুখদর্শন করতে আসেন। তিনি প্রদীপ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বরের মুখ দর্শন করেন। বরের আনীত শাঁখা-সিঁদুর, বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হয়ে কনে কোন আত্মীয়ের কোলে উঠে বরের সামনে এসে দাঁড়ায়। তার হাতে জলের ঝারি দেওয়া হয়। বরকে প্রণাম করে সে তার পায়ে জল ঢেলে সাতবার প্রদক্ষিণ করে। তারপর আঁচল দিয়ে তার পা মুছিয়ে দেয়। বর-কনে সামনা সামনি পিঁড়িতে বসে। নাপিত তাদের মাথার উপর চাদর তুলে ধরে তার নিচে প্রদীপ রেখে তাদের পরাপর শুভদৃষ্টি করায়। এর পর কন্যাকে বৈদিক শাস্ত্রাদি পাঠ করে বরের হাতে কন্যা সম্প্রদান করেন।

**পাশাখেলা**

ফরিদপুর জেলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজে পাশাখেলার প্রচলন রয়েছে। বর-বধূ পাশাখেলার সময় একটি পাটিতে বসে। মাটির পাত্রে ধান কিংবা পানের উপর কতগুলি কড়ি রেখে একটি সরায়ে তা ঢেকে দেওয়া হয়। পালাক্রমে একবার বর ও একবার বধু সেগুলি পাটির উপর ঢেলে দেয় এবং তুলে নেয়। বধূর বান্ধবী এবং এয়োস্ত্রীরা গণনা করেন এবং হারজিতের হিসাব রাখেন। পাশা খেলার পর হিন্দু মতে 'সাবরজাগা' বাসর জাগা রাত অতিবাহিত হয়।

**কন্যা বিদায়**

কন্যা বিদায়ের ক্ষণ অত্যন্ত বেদনাময় এবং মর্মস্পর্শী। স্ত্রীআচার পালনের মধ্যদিয়ে কন্যা বিদায় সম্পন্ন হয়। কন্যা বিদায়ের প্রাক্কালে তার আঁচলে সুপারী বেঁধে দেয়া হয় এবং যাত্রা কালে তার সঙ্গে ডাব ও এক বদনা জল দেওয়ার লোকাচার চালু আছে। নববধূর সঙ্গে দুই তিন জন মেয়ে পাঠানো হয়। হিন্দু বিবাহে যাত্রাকালে বর-কনে গৃহদ্বারে দুইটি আল্পনাযুক্ত পিঁড়িতে বসে। তাদের সামনে মঙ্গল ঘট, মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি ও ধান দূর্ব্বা থাকে। অনুরূপভাবে মুষ্টিধান পিছনে ফেলে দেওয়া হয়।

**বধুবরণ**

বর যখন নববধূকে নিয়ে নিজ গৃহে আগমন করে তখন এক পিঁড়িতে দুই জনকে দাঁড় করিয়ে প্রথমে পুত্রের ও পরে বধূর মাথায় তিন মুষ্টি ধান দিয়ে মাতা এবং পরে চাচী, নানী, দাদী ও অন্যান্যরাও বরণ করে। হিন্দু সমাজে শাঁখ বাজে, উলুধ্বনিতে চারদিক মুখরিত হয়। বরণকুলায় সজ্জিত বিবিধ মঙ্গলদ্রব্যের দ্বারা বর ও বধূকে বরণ করে ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। যাবার পথে ঘরের মেঝে হতে দরজা পর্যন্ত কাপড় বিছানো থাকে, বর-বধূ তা মাড়িয়ে যায়। বধূ আগে থাকে, বর পিছনে, হাতের জাঁতি দিয়ে সে বধূর মাথায় হাতে দুই চারটি করে ধান সেই কাপড়ে ফেলে দেয়। এয়োস্ত্রীরা নববধূর মুখে চিনি-সন্দেশ দেন।

**বাসি গোসল ও বাসি বিবাহ**

বাসি বিবাহের দিনে নববধূকে হলুদ শাড়ি পরানো হয়। বরের ভাবী বোন বর-বধূকে গোসল করিয়ে থাকে। বধূকে লুকিয়ে রেখে কেউ দারোগা-পুলিশ ও চৌকিদার

সেজে বধূ খুঁজে বের করে। কাদামাটি, রঙ খেলা হয়। পরে অন্দর মহলে একটি পিঁড়িতে বর-বধূকে পাশাপাশি বসানো হয়। কাঁসার থালায় দুধ, পানি, কাঁচা হলুদ, দুর্বা রাখা হয়। ফরিদপুরের কোন কোন অঞ্চলে গোসলের পর কড়ি খেলা হয়। তারপর তাদের বরণ করে ঘরে তোলা হয়। ঘরে যাওয়ার পথে বর-বধূকে কোলে করে সরা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে। তাদের বিশ্বাস সরা যে কয় খণ্ড হবে সেই কয়টি সন্তান তাদের হবে। হিন্দু মতে স্নানের স্থানে ছোট একটি পুকুর কেটে বর-বধূ কড়ি খেলে। এহেন স্নানপর্বে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর সিঁদুর পরিয়ে দেওয়া হয়।

### বৌ ভাত ও মেলানী

বিবাহের তৃতীয় দিবসে বরের বাড়িতে বউভাতের আয়োজন করা হয়। নববধূকে 'পাক' স্পর্শ করানোর রেওয়াজ লক্ষ্য করা যায়। বধূকে অন্দর মহলে সুন্দর করে সাজিয়ে একটি চেয়ারে বসানো হয়। তার সামনে পানভর্তি পানদানি থাকে।

বৌ-ভাত সমাপ্তির পর নববধূকে কন্যার বাপের বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়। একে মেলানী বা ফিরানী বলে। হিন্দু পরিবারে বর এসে আটদিন কন্যার পিত্রালয়ে অবস্থান করে। এই অবস্থানকে 'অষ্টমঙ্গলা' বলে। মুসলমান সমাজে চার থেকে পাঁচদিন কন্যার বাড়িতে অবস্থানের লৌকিক আচার লক্ষ্য করা যায়।

### বিবাহত্তোর লোকাচার

সুসন্তান সকল দম্পত্তিরই কাম্য। স্বভাবতই গর্ভরক্ষার্থে নারী প্রজননও উর্বরতামূলক পরিবারকেন্দ্রিক বেশ কিছু নিয়ম-কানুন, আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কারাদি পালন করে। যেমন কনে কিংবা নববধূ ক্রোড়ে ফলসহ শিশু অথবা পুতুল বসিয়ে দেওয়া, বধূর ক্রোড়ে কলার ছড়া দেওয়া, বর-বধূর পরস্পরের পিঠে পুতুল আঁকা, বধুর আঁচলে পাঁচফল বাঁধা, গাঁটছড়ায় ফল বেঁধে দেওয়া ইত্যাদি গর্ভের উর্বরতামূলক কয়েকটি অনুষ্ঠান। ধান-দূর্বা দিয়ে বর-বধূকে বরণ করা, তাদের উপর খই, চাল, কিংবা পানি ছিটানো ইত্যাদি একই উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

হিন্দুসমাজে, সূর্যোদয়ের সময় কোমর পানিতে নেমে সন্তান কামনা করে সূর্যদেবকে প্রণাম করে। দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের জন্য দূর্বার এবং প্রজ্জ্বলিত মাটির প্রদীপ রাখা হয়।

সন্তান-সম্ভাবা রমণী সাতমাসে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে তাকে পিত্রালয়ে নিয়ে আসা হয়; সন্তান প্রসবের পূর্বে তাকে আর কোন অবস্থাতেই স্বামীগৃহে প্রত্যাবর্তন করতে দেয়া হয় না। হিন্দুসমাজে 'পঞ্চামৃতে' এবং 'সপ্তামৃত' বা 'সাধভক্ষণ' এবং মুসলমান সমাজে ছয়মাস 'দান' সাতমাসে 'সাদিয়ানা' বা 'সার্বভক্ষণ' ঘটা করে পালন করা হয়।

গর্ভরক্ষায় সন্তান প্রসবে কোন অশুভশক্তি, যাদুটোনা বা অন্যকোন দৈবশক্তি সম্পন্ন ব্যকিত, দেবদেবী, বাও-বাতাস, ভূত-প্রেত জ্বীন, পরীর অশুভ তৎপরতা, প্রভাব এবং কুদৃষ্টি ফেলতে না পারে তার জন্য বহুবিধ বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। যেমন :

১. নির্জন কোনো স্থান, পতিত বাড়ি-ঘর, শ্মশান, কবরস্থান, ত্রিমোহনা, তেমাথা প্রভৃতি এড়িয়ে চলতে হয়।
২. রাত্রিকালে কোথাও যাত্রা করলে সঙ্গে করে আগুন বয়ে নিতে হয়।
৩. চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণকালে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। কোনো কিছু কাটা-ছেঁড়া নিষিদ্ধ। এতে সন্তানের অঙ্গহানির সম্ভাবনা থাকে।

৪. পোয়াতী যে ঘরে অবস্থান করে সেই ঘরে তাবিজ কবজ দিয়ে ঘরবন্ধ করা হয়। পীর ফকিরের মাজারে মানত করার রীতিও প্রচলিত আছে। আঁতুড়ঘরের চৌকাঠের সামনে তুষের আগুনের পাত্র, লোহা, বেতের কাঁটা, মরাগরুর মাথা, একজোড়া ছেঁড়াজুতা ও পিছা রাখা হয়। প্রসবের পর নবজাতকের মুখে মধু অথবা চিনিমিশ্রিত পানি দেওয়া হয়। লোকবিশ্বাস এতে, জাতকের স্বভাব চরিত্র, আচার-আচরণ, কথাবার্তা মধুর মতো হয়। এ সময় তার হাতে লোহার কাস্তে এবং গলায় কালো সূতা ও কপালে কালির ফোটা দেওয়া হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার মতো ফরিদপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে সন্তানের জন্মের পাঁচ, সাত নয়, অথবা একুক দিবসে 'অশুচিমুক্ত দিবস' পালন করে। নবজাতকের ছয় দিবসে 'ছয় সাটুরে' পালন করা হয়। হিন্দু সমাজে পূজার আয়োজন করা হয়। ষষ্ঠিপূজা শেষে নিশি জাগরণের রেওয়াজ আছে। এই দিবসের পূর্বে নবজাতকের চুল, নখ কর্তন কর মাটিতে পুঁতে রাখা হয়। নবজাতকের নামকরণে 'মাতুল'-এর বিশেষ ভূমিকা রাখে। লোকবিশ্বাস, সন্তান মাতুলের আদর পেলে সৌভাগ্যবান হয়।

### অন্নপ্রাসন

হিন্দু সমাজে জন্মের ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে পুত্রের এবং পঞ্চম বা সপ্তম মাসে কন্যার অন্নপ্রাসন করার নিয়ম। মুসলিম সমাজে পঞ্চম বা ষষ্ঠ মাসে মুখে দুধ ভাত দেওয়া হয়। এই দিন শিশুর মস্তক মুণ্ডন করে তাকে একখানি পিঁড়ির উপর বসিয়ে তেল হলুদে স্নান করিয়ে লালগামছা, নতুনজামা, চন্দন ও কাজল পরানো হয়। বিভিন্ন উপকরণে সজ্জিত দুটি থালার একটি থালা দাইকে দেওয়া হয় এবং অপর থালা থেকে কিছু 'সিন্নি' শিশুর মুখে দেওয়া হয়। এর আগে হিন্দুমতে পুরোহিত পুজোর কাম সম্পন্ন করেন। বেলাশেষে একটি থালায় একটি মাটি, একটি টাকা, বই-খাতা, পেন্সিল, দোয়াত-কলম রাখা হয়। তারপর বাজনা বাজিয়ে শিশুকে বাড়ির চারিদিকে কিংবা বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়ে এনে থালার সামনে বসায়। পর্যায়ক্রমে মুসলিম সম্প্রদায় 'আকিকা' পুত্রসন্তানের ক্ষেত্রে সুন্নতেখাতনা দেয়। ইত্যাদি সকল অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকে সন্তানের কল্যাণ কামনা, দীর্ঘায়ু এবং সামাজিক বিধিবিধান রক্ষা করা।

### জামাই ষষ্ঠী

হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় জামাই ষষ্ঠী পালন করে। বৈশাখ মাসে আম পাকলে জামাইকে নিমন্ত্রণ করে দুধ-আমসহ পিঠাপায়েস খাওয়ানো হয়। তখন জামাইকে নতুন জামাকাপড় উপহার দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে জামাই পাকা মিষ্টি, পান-সুপারি এবং বড় মাছ নিয়ে শ্বশুরালয়ে গমন করে। সেও শাশুড়িকে নতুন কাপড় উপহার দেয়। জামাই ষষ্ঠীর সময় হিন্দুসমাজে পুতুলের প্রয়োজন হয়।

### লৌকিক দেবতা

আমাদের সংস্কৃতিতে লৌকিক দেবতা ও শাস্ত্রীয় দেবতা নামে দুই শ্রেণীর দেবতার পূজার্চনা অনুষ্ঠিত হয়। লৌকিক দেবতার ক্ষেত্রে লোকায়ত বিধান অনুসৃত হয়; বর্ণ

ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য, সংস্কৃতি মন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয় না। নিম্নবর্ণের ব্যক্তিদের মধ্যে লৌকিক দেবতার প্রতি আগ্রহ ও বিশ্বাস প্রবল। এরা মূলত অনুন্নত পল্লী অঞ্চলে বসবাস করে। উচ্চ বর্ণের ব্যক্তিরা লৌকিক দেবতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়, তারা মনে করেন লৌকিক দেবতা অশাস্ত্রীয় এবং নিম্নবর্ণের দ্বারা পূজ্য, এরা চাষাভুষাদের দেবতা মাত্র। লোকবিশ্বাস, লৌকিক দেবতা মঙ্গলের দেবতা। তিনি তুষ্ট থাকলে রোগ-মহামারী থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। গ্রামরক্ষী, শস্যদাত্রী, দয়াবতী, সন্তান-সন্ততি অপদেবতার হাত থেকে রক্ষা পায়। বন্ধ্যানারীর গর্ভে তিনি সন্তান দেন। বনযাত্রা, নৌকাযাত্রা শুভ হয়। মৎস্যজীবীরা অধিক মৎস্য পাবার প্রত্যাশায় লৌকিক দেবতাকে পূজা দেয়।

**হিন্দু মুসলমান উভয়**

সম্প্রদায়ের লোক এই সকল লৌকিক দেবতাকে স্মরণ করেন, সংস্কার মান্য করেন এবং পূজার্চনা দেন। কোথাও কোথাও লৌকিক দেবতার নামে, হিন্দুমতে 'থান' মুসলমান মতে 'দরগা' বা 'আস্তানা' চোখে পড়ে। লৌকিক দেবতার পূজার্থে ফসলাদি, ফলমূল, অর্থকড়ি মাঙ্গন করা হয়। লৌকিকদেবতার স্মরণে অর্থকড়ি, জীব, খাদ্যসামগ্রী 'মানত' করে। মনোবাসনা পুরণার্থে বাতাসা, আগরবাতি, মোমবাতি, পাঠাবলি, মোরগ-মুরগী প্রদান করা হয়। কেউ কেউ লৌকিকদেবতার স্মরণে ক্ষুদ্রাকৃতির মূর্তি উৎকলন করেন। যাকে 'ছলন' ইংরেজিতে Votive offering বলে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় লৌকিক দেবতাদের পূজাচার, লোকাচারে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও নামকরণে, নৈবেদ্যে পার্থক্য চোখে পড়ে। ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে, ভক্তিভরে লৌকিক দেবতার পূজাচার, স্মরণাচার প্রচলিত রয়েছে। তন্মধ্যে চেলাই চণ্ডী, সাতবোন, মাকাল ঠাকুর, ওলাবিবি, সত্যপীর, ক্ষেত্রপাল, মানিকপীর, বাবাঠাকুর, জিন্দাপীর, বাসলী, নারায়ণী, বসন্তরায়, রংকিনী, দক্ষিণারায়, ভাদু, ধর্মঠাকুর প্রমুখ লৌকিক দেবতা উল্লেখযোগ্য।

**লৌকিক খেলাধুলা**

বাঙালির নিজস্ব খেলাধুলা বলতে লৌকিক খেলাধুলাকেই বুঝায়। গ্রামীণ অধিবাসীদের সংস্কৃতির একটি বলিষ্ঠধারা এই লোকায়ত খেলাধুলা। কবে কোথায় এ সকল খেলার উদ্ভব হয়েছিল তা বলা দুষ্কর। তবে কিছুকিছু খেলার প্রকৃতি, উপকরণ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় অনেক খেলাই প্রাগ-ঐতিহাসিক কালের স্মৃতিবহ। 'গাচ্ছুয়া মাওচ্যা' খেলাটি অনার্য বা দ্রাবিড় যুগের।

'মাইটাভূত তেলেঙ্গা' দ্রাবিড়, 'ষোলঘুটি বাঘবন্দী' মৌর্যপূর্ব যুগের বলে ধারণা করা হয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের অন্যান্য খেলাঃ কড়িখেলা, পাশাখেলা, ছুটকিখেলা, লাঠিখেলা, পাইকখেলা, নৌকাবাইচ, একহৈল্লা, হাঁড়াইয়া, সিক্কুখেলা, ঘোড়াদৌড় প্রভৃতি। মেঘা মাগা, অনেক খেলা রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রথা ও জাদু বিশ্বাসের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। অনেক খেলা রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস, রীতিনীতি, বিধিবিধান, বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের স্মৃতিবহ যেমন : পলাপলি, ভিক্ষাখেলা, চোর- চোর, কাঁঠাল চুরি, চোর-পুলিশ সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছায়ায় সাপ, হাতি-ঘোড়া, বাঘ-ভাল্লুক, গরু-ভেড়া, বানর মোষ, বেজি ইত্যাদি খেলা জীবজন্তুর প্রতি মানুষের অপরিমেয় কৌতূহল ও

সাহসিকতার পরিচায়ক।

ফরিদপুরের লৌকিক খেলাধুলাকে দুইভাগে ভাগ করে এ সম্পর্কে একটি তালিকা প্রণীত হলো :

**ঘরের খেলা :** পুতুল খেলা, রসকস খেলা, আদা কেনা, ঘুঘুসই, পাশাখেলা, আগডুম বাগডুম, হাতটাবুটি, বাঘবন্দি, ছয়গুটি, ষোলগুটি, বত্রিশগুটি, জোলাভাতি, ইকড়ি মিকড়ি, ঢেঁকিভানা, ঘোড়া খেলা, আবুর টাবুর, পলাপলি (লুকোচুরি), চোর চোর, বাগুন ভাজা, জোড় বেজোড়, লাটিম, গুটি খেলা প্রভৃতি।

**বাহিরের খেলা :** গাচ্ছুয়া-মাচ্ছুয়া, ওপেনটি বাইস্কোপ, লাঠিখেলা, এলাডিং-বেলাডিং, ডেংগুটি, কানামাছি, চোর-পুলিশ, ছি-বুড়ি, কাছি টানাটানি, ডুগডুগ, দাড়িয়া-বান্দা, নৌকাবাইচ, ঘোড়দৌড়, ষাঁড়ের দৌড়, মোরগ লড়াই, পালকি খেলা, ঢেঁকি খেলা, গোল্লাছুট, কুতকুত, চিক্কাখেলা, কাঠিছোঁয়া, পাতাচেনা খেলা, ছাগলধরা, চিল ও হাঁস খেলা, হৈলডুবি, পানিঝুপ্পা খেলা, ছুটাবাড়ি, ছোঁয়াছুঁয়ি প্রভৃতি খেলা।

ফরিদপুরের উল্লেখযোগ্য লাঠিখেলার বিচিত্রধরণ হলো : বত্রিশ আনির খেলা, বাগান খেলা, রং পশরি, কাউন্সিল খেলা, তুড়মি ও আড়খেলা। এর কসরত হলো : বেনটা, পাট্টা, আলী প্যাঁচ, রংভাজ, উস্তাদি, পায়তারা, গরম, ও সেলামি। এর বিচিত্র নৃত্য হলো : সখা নৃত্য, হাজরা নৃত্য, পেট্টা নৃত্য, আলী আলী নৃত্য, রায়বেঁশে নৃত্য, নৌকা বাইচের নৃত্য, মানুষ পোঁতা নৃত্য, ঢেঁকি নৃত্য, জেকের নৃত্য ও ময়ূর নৃত্য প্রভৃতি।

## লোককাহিনী ও কিংবদন্তী

লোকসাহিত্যের প্রাচীন ধারা হচ্ছে লোককাহিনী, লোককথা, পশুরকথা, রূপকথা, পরীকথা, ব্রতকথা, লোকপুরাণ ও কিংবদন্তী। যার মধ্যে লৌকিক ও অলৌকিক ঘটনা পাশাপাশি বিদ্যমান। আকাশ, মাটি, চন্দ্র, সূর্য স্বর্গনরক, জলস্থল ও মহাশূন্য, পাতাল এক সহজ নৈকট্যে আবদ্ধ। এখানে কাহিনী বাস্তব থেকে কল্পনা, কল্পনা থেকে বাস্তবে অনায়াসে যাতায়াত করে। এখানে বর্বরতা, হিংসা, শঠতা, পাশবিক আচরণ, কূটিলতা, ষড়যন্ত্র, নৃশংসতা, খলত্ব ইত্যাদির পাশাপাশি নানাবিধ মহানুভবতা বিদ্যমান। ভীরুতার সঙ্গে বীরত্ব, শৌর্যবীর্য, ধূর্ততার সঙ্গে ক্ষমতার আদর্শ, প্রেমের মহিমা, কাহিনীর গতিকে দুর্বার করে তোলে।

ফরিদপুর জেলায় প্রচুর এবং চমৎকার লোককাহিনী সম্পদ আছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি লোককাহিনী হলো : মধুমালা, বেদের মেয়ে, জামাল-কামাল, গৌতচাঁদমাঝি, চন্দ্রবানুর কিচ্ছা, হারমন ডাকাতের কিচ্ছা, মৃগপরীর কিচ্ছা, দুর্লভ বাদশা, বক-বগির কিচ্ছা, বামন ছাপার কিচ্ছা, কাহা-কুহু পাখির কিচ্ছা, শ্রী আংটি ও ইঁদুর, হীরামনপাখি, ব্যঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, ডালিম কুমার, কাঞ্চনমালা, স্বর্ণকমল, তিনচোরের গল্প, সুয়োরাণী-দুয়োরাণী প্রভৃতি। অতীতকালের জনপ্রিয় ব্যক্তি, রাজা-বাদশা, পীর-ফকির অথবা কোনো বীরপুরুষের কাহিনী নিয়ে লোকমুখে রচিত হয় কিংবদন্তি। কিংবদন্তি ইতিহাস নয়, যদিও তা অনেক ক্ষেত্রে ইতিহাসের উৎস হিসাবে কাজ করে। কিংবদন্তির কাহিনী সত্য কোন ঘটনাকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে। তবে সেই ঘটনার সংগে জনশ্রুতি, লোককল্যান ইত্যাদি যুক্ত হয়। আবার অনেক সময় সেই সত্য ঘটনা সম্পূর্ন বিলুপ্ত হয়ে কেবল জনশ্রুতিই কিংবদন্তিতে বেঁচে থাকতে পারে। একসময় জীবিত ছিলেন এমন

কোনো বিখ্যাত ব্যক্তিই যে কিংবদন্তির নায়ক, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ঐতিহাসিক ব্যক্তি চরিত্র, ভয়ঙ্কর প্রাণী, পুরাতত্ত্ববিষয়ক, জলাশয়ভিত্তিক, স্থানিক ও তীর্থাশ্রয়ীমূলক বিচিত্র জনশ্রুতি নিয়ে কিংবদন্তি গড়ে উঠে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঐ জাতীয় অসংখ্য কিংবদন্তির সন্ধান পাওয়া যায়।

ফরিদপুরের জনশ্রুতিমূলক কয়েকটি কিংবদন্তি হলো : মরিয়ম বিবির দীঘি, নইদ্যারচাঁদ, মজিদ গইড়ার বিল, বিসমিল্লাহশাহ, শেখ-ফরিদ, দুগ্ধশাহ, শ্রী শ্রী জগদ্বন্ধু, শাহ পাহলোয়ান, গেরদার ঐতিহাসিক মসজিদ, সাতের মসজিদ, মথুরাপুরের-দেউল, চাররশির কাঠের গুড়ি, কাইঠার কালিবাড়ি, ঢোলসমুদ্রের বাঁওড়, নলীদবাবু এবং দরবেশের কোল প্রভৃতি।

## উপসংহার

লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি সব দেশে সব কালে সমাজের অক্ষয় দর্পণ। সমাজের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, দুঃখ-দুর্দশা, দোষ-ত্রুটি, ভালো-মন্দ, কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা. পরিবেশ-পরিবেষ্টনী, বিকাশ- চেতনা, সংস্কার-ঐতিহ্য, কৃষ্টি সেই আয়নায় প্রতিবিম্বিত হয়। এ সম্পর্কে বর্তমান কালের গবেষকদের অভিমত, লোকসংস্কৃতি রসসাহিত্যে বিভাগ নয়; গত শতাধিক বছরের পরীক্ষিত একটি জটিল শাস্ত্ররূপে তা নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, শিল্পতত্ত্ব, ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞান প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্টরূপে সংশ্লিষ্ট বলে একে Science of Folklore বলা হয়। বর্তমান বিশ্বে লোকসংস্কৃতি গবেষণার মূল লক্ষ্য হচ্ছে নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে Folklore চর্চা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। দুঃখের বিষয় আমাদের গৌরবোজ্জ্বল লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির উপাদান-উপকরণ থাকা সত্ত্বেও তেমন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এর অনুসন্ধান, চর্চা হয়নি। এ ব্যর্থতা কোনো ব্যক্তির নয় সমগ্র জাতির। এ থেকে উত্তোরণ পেতে হলে নতুন প্রজন্মকে Folklore গবেষণায় অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করতে হবে। জাতীয় পর্যায় গড়ে তুলতে হবে Folklore চর্চাকেন্দ্র।

## সহায়ক গ্রন্থ


১. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর: বাংলা ব্রত: বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৯৭৬
২. আবদুল হাফিজ: লৌকিক সংস্কার ও মানব সমাজ; বাংলাদেশ শিল্পকলা, একাডেমী. ঢাকা, ১৯৯৪
৩. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য: বাংলার লোকসাহিত্য; ক্যালকাটা বুক হাউজ, কলিকাতা, ১৯৫৭
৪. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য: বাংলার বাউল ও বাউল গান; ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি, কলিকাতা, ১৩৬৪
৫. ড. ওয়াকিল আহমদ: বাংলার লোকসংস্কৃতি; বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৭৪
৬. ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক: বাংলা ধাঁধার ভূমিকা; বর্ণালী, কলিকাতা, ১৯৮৮
৭. দীনেন্দ্রকুমার সরকার (সম্পা.): বিবাহের লোকাচার; পুস্তক বিপণি, কলিকাতা, ১৯৮২
৮. ড. মাসুদ রেজা: ফরিদপুরের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির রূপরেখা (পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ২০০১
৯. ড. তপন বাগচী : বাংলাদেশের যাত্রা · গণমাধ্যম হিসেবে এর সামাজিক প্রভাব (পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ২০০৪।

# ফরিদপুর জেলা : ছেড়ে আসা গ্রাম

দক্ষিণারঞ্জন বসু

## কোটালিপাড়া

বিশাল বনস্পতিও ধরাশায়ী হয় প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ায়, বুনো হাতির পায়ের চাপে সাজানো ফুলের বাগান যায় বিপর্যস্ত হয়ে। ঠিক তেমনি ত হয়েছে আমার পুর্ববাংলার হাজার হাজার সোনার পল্লী-প্রতিমার অবস্থা– জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে গ্রামের পর গ্রাম ভুল রাজনীতির আকস্মিক অশনিপাতে। বহু পুরুষের যত্নে গড়া কত বাড়িঘর আজ পড়ে আছে শ্রীহীন হয়ে, খাঁ খাঁ করছে কত বিদ্যায়তন, কত দেউল! শিবশূন্য শিবালয়গুলোতে হয়ত চলেছে অশিবের হানাহানি, হয়ত বা অনেক মঠ-মন্দির লুপ্তও হয়ে গেছে এত দিনে। আর ভারতবর্ষের ইতিহাসে এত নতুন কিছু নয়— দেবালয় ধ্বংসের অভিযান অনেক বারই প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে ভারতবাসীকে।

একটা ক্রুদ্ধ রুদ্র নিঃশ্বাসে সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রবহমান ধারা যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেছে পূর্ববাংলায়। অতীত ইতিহাসের কত গৌরবময় স্মৃতি জড়িয়ে আছে বাংলার এক একটি গ্রামকে কেন্দ্র করে ; কিন্তু আজ যেন এক একটা ছেড়ে আসা গ্রামের অধিবাসীদের সঙ্গে সঙ্গে পল্লীমায়ের সেই সব স্মৃতির আভরণ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে দিগ্ বিদিকে। এমনি এক গ্রাম-মায়ের কোল থেকেই প্রথম সূর্য-প্রণাম করেছিলাম আমি প্রায় বছর চল্লিশ আগে। আজন্ম-আত্মীয় সে মাটি আজ আমার পর- এ সত্য, না স্বপ্ন! সত্য হলেও গ্রামকে নিয়ে গর্বের যে অন্ত নেই।

আমার জন্মভূমি কোটালিপাড়া শুধু গ্রাম নয়, গ্রামও বটে, আবার পরগণাও। বাংলার এককালীন বিদ্যাপীঠ নবদ্বীপ সম্বন্ধে যেমন বলা হত—'নবদ্বীপে নবদ্বীপ গ্রাম, পৃথক পৃথক কিন্তু হয় এক নাম', এও অনেকটা তাই। পাশাপাশি কাজোলিয়া, মাজবাড়ি, পশ্চিমপাড়া, ডহরপাড়া, পিঞ্জরি, ঊনশিয়া, মদনপাড়, দীঘির পাড়, রতাল এবং এমনি আরও বহু জনপদের সমষ্টিগত গ্রাম নাম কোটালিপাড়া। এসব জনপদের লোকেরা বাইরে গিয়ে চিরকালই নিজেদের পরিচয় দিয়ে আসছে কোটালিপাড়ার অধিবাসী বলে। গোপালগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত এই পরগণা গ্রামের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে পূণ্যতোয়

* ১৯৪৭-এর দেশভাগের ফলে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে আশ্রিত তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের উদ্বাস্তু মানুষের স্বগ্রামের স্মৃতিকথা প্রকাশ করে কলকাতার পত্রিকা দৈনিক 'যুগান্তর'। সাংবাদিক-সাহিত্যিক দক্ষিণারঞ্জন বসু সংকলিত ও সম্পাদিত আলেখ্যগুলি ১৯৫৩ ও ১৯৫৪ সালে গ্রন্থিত হয় 'ছেড়ে আসা গ্রাম' নামে দুইখণ্ডে। পূর্বপাকিস্তান সরকার গ্রন্থদুটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালে একখণ্ডে লেখাগুলি প্রকাশ করে 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশনা সংস্থা। গ্রন্থপ্রণেতা বলেছেন, 'এই গ্রন্থের কথাচিত্রগুলি ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রচিত নয়।... ইতিহাস এখানে অপ্রত্যক্ষ হলেও ভবিষ্যতের মানুষকে কোনো কোনো ঐতিহাসিক সূত্রের সন্ধান দানে এই গ্রন্থে গ্রথিত গ্রামচিত্রগুলি হয়তো সাহায্য করবে।' একই বিবেচনায় 'ফরিদপুরের ইতিহাস' গ্রন্থে ফরিদপুরের গ্রামচিত্রগুলি সংযুক্ত হলো। –সম্পাদক

ঘাগর নদ। ছোটবেলা থেকেই দেখে এসেছি প্রতি বছর চৈত্র সংক্রান্তির দিনে লক্ষ লক্ষ লোককে এর শীতল জলে স্নান করে গঙ্গা স্নানের পূণ্যার্জন করতে। সে উপলক্ষে এর তীর জুড়ে বসত বিরাট মেলা। আজও কি বসে সেই মেলা? মেলার উল্লাসে মেতে ওঠার মতো মানুষের মন কি আজও আছে কোটালিপাড়ায়? আমার মন যে তা বিশ্বাসই করতে চায় না। ঘাগরেরই কোলে গড়ে উঠেছিল ঘাগর বন্দর। সে বন্দরের নাম ছড়িয়ে পড়েছিল চারিদিকে দেশের মাটিকে বিদায় দিয়ে আসার আগেও দেখে এসেছি কত দূরদূরান্তরের কত পণ্যবাহী নৌকার ছড়াছড়ি সে বন্দরে! সেদিন এক বন্ধু এসে জানাল, ঘাগর বন্দরের যৌবনোচ্ছ্বাস আর নেই, বার্ধক্যের ঝিমুনি লক্ষ্য করে এসেছে সে তার চোখে।

মনে পড়ে ঝনঝনিয়া, দেওপুরা, বরুয়া এবং বাগিয়া বিলের কথা। বিশাল জলরাশি বুকে ধরে এসব বিল এ অঞ্চলের মাটিকেই শুধু রসসিক্ত করে নি, এ পরগণার মানুষের মনেও বইয়ে দিয়েছে রসের বন্যা। কত গায়ক, বাদক, কথক এবং আরও কত জ্ঞানী-গুণী জন্ম গ্রহণ করেছেন এ মাটিকে ধন্য করে। এই কোটালিপাড়ায় ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের কথা প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হয়েছিল। 'বারশ বামুনের তের শ আড়া, তার নাম কাশ্যপপাড়া'– একটি অংশের এই পরিচয় থেকেই বাকি কোটালিপাড়া সম্বন্ধেও মোটামুটি একটি ধারণা মিলবে। কারণ প্রায় সব কোটালিপাড়া জুড়েই রয়েছে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের বাস। লক্ষাধিক লোকের বাসভূমি এ পরগণায় লক্ষ শিবের পূজো হতো বলে কাশীতুল্য স্থান হিসেবে এর ছিল ব্যাপক প্রসিদ্ধি। নবদ্বীপ, বিক্রমপুর, ভাটপাড়া-বাংলার ব্রাহ্মণ্য বিদ্যার এই মুকুটমণিদের মধ্যে কারও চেয়ে ন্যূন নয় আমাদের কোটালিপাড়ার স্থান।

এ অঞ্চলে এক একটি দেবস্থান গড়ে উঠেছে এক একটি গ্রামের কেন্দ্র-পীঠ রূপে। সিদ্ধান্তের খোলার বহুবিশ্রুত চড়ক পূজোর কাহিনী যে কত পুরনো তা জানা নেই। অনেক অলৌকিক স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই চড়কপূজোর সঙ্গে। ভয়ে ও শ্রদ্ধায় এ এলাকার মুসলমানেরাও চড়ক ঠাকুরকে প্রণামী দিয়ে আর্শীবাদ ভিক্ষা করে আসছে চিরকাল। হরিণাহাটি ও পশ্চিমপাড়ার কালীবাড়ির সঙ্গেও জড়িয়ে আছে অনেক পুরনো কথা। মদনপাড়ার গোবিন্দদেব, সিদ্ধান্তবাড়ির বুড়ো ঠাকুর, রতালের মনসাদেবী, সিদ্ধেশ্বরী মাতা ও লক্ষ্মী-নারায়ণের বিগ্রহও সমধিক প্রসিদ্ধ।

একেবারে ছোটবেলা থেকেই রতালের মনসাদেবী সম্বন্ধে কত গল্প শুনে আসছি। জনপ্রিয় দেবদেবীর মধ্যে বাংলাদেশে মনসাদেবী নাকি একেবারে জাগ্রত। রঘু গাইনের নাম আজও কোটালিপাড়ার লোকের মুখে মুখে। এক সময় ফরিদপুর জেলার সর্বত্র মনসার গান গেয়ে বেড়াতেন ইনি সদলবলে। সে প্রায় শ দুই বছর আগেকার কথা। প্রত্যাদেশে মনসা পেয়ে যে দেবীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রঘু গাইন তাই আজ রতালের মনসাসেবী নামে খ্যাত। আদিষ্ট গীতাবলি অবলম্বনেই মনসার গান গাইতেন রঘু গাইন। অনেক অভূতপূর্ব ঘটনার কথা প্রচলিত আছে এই দেবী ও তাঁর ভক্ত রঘু গাইন সম্বন্ধে। ১৩২৬ সালের আশ্বিনের ঝড়ে রতালেব গাইন বাড়ির সব ঘর ধুলিসাৎ হলেও যে ঘরে মনসার চামর ছিল সে ঘরখানি ঠিক দাঁড়িয়েই ছিল। আশ্চর্য ঘটনা বৈকি। কিন্তু আজ যে

সেই মনসাদেবীর চামর নিয়েই রঘু গাইনের বংশধরগণকে গ্রাম ছেড়ে কলকাতা প্রবাসী হতে হল, অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া তাকে আর কি বলব? রঘু গাইনের প্রপৌত্র রমাকান্ত গাইনের সময়ে এক রাত্রিতে নাকি ডাকাত পড়েছিল তাঁদের বাড়িতে। কিন্তু মনসাদেবী যে বাড়ীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী ডাকাতের ক্ষমতা কি যে সে বাড়ির কোন ক্ষতি করবে? নাগকুল নাকি এমনি ভাবে ঘিরে রেখেছিল বাড়ির চারদিকের সীমানা যে, দস্যুদল সাপের ফোঁস ফোঁস শব্দে বাড়ির ভেতর ঢুকতেই আর সাহস পায়নি। এ অনেককাল আগেকার কথা। রঘু গাইনের মনসাভক্তি সম্বন্ধে ছোটবেলায় একটি অদ্ভুত কাহিনী শুনেছিলাম। সেই অলৌকিক ঘটনার কথা আজও মনে পড়ছে। ফরিদপুর জেলার বাইটামারি গ্রামে কোনো এক ধণাঢ্য ব্যক্তির বাড়িতে এক নবজাতকের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে হয়েছে মনসা-পুজো। মনসা ভাসানের গান গাইবার জন্যে আমন্ত্রণ হয়েছে দুটি বিখ্যাত দলের। তার মধ্যে একটি হল রঘু গাইনের দল। গাইনের দল আসতে একটু দেরী করে ফেলায় ধণী গৃহস্বামী এতটা উত্তেজিত হয়ে গেলেন যে, তাঁদের গানের আর প্রয়োজন নেই বলেই জানিয়ে দিলেন তিনি। আর কোনো উপায় না দেখে, ফিরে যাবার আগে মনসাদেবীকে একবার প্রণাম জানিয়ে যেতে চাইলেন রঘু গাইন। প্রার্থনা মঞ্জুর হল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ নির্দেশও দেওয়া হল যে, কৃত অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাঁকে পশ্চাদ্দিক থেকে দেবীকে প্রণাম করতে হবে -আসরে ঢুকে সম্মুখ থেকে তাঁকে প্রণামের অধিকার দেওয়া হবে না। তাতেই রাজী হলেন রঘু। মণ্ডপের পিছনে গিয়ে গানের সুরে প্রণাম জানালেন তিনি দেবীকে ; অপূর্বতন্ময়তা সে গানে। সমবেত জনতা যখন সে সুরের মুর্ছনায় বিভোর সেই অবকাশে কখন যে দেবী প্রতিমা ঘুরে গেছেন পিছন দিকে কেউ তা লক্ষ্যই করে নি। যখন চোখে পড়ল, তখন সে কি সোরগোল। শেষ পর্যন্ত উল্টো দিকেই দেবীর সামনে নতুন করে আসর বসিয়ে রঘু গাইনের মনসা ভাসানের গান শুনতে হল সবাইকে। কঠোর বাস্তবের আঘাতে বিপর্যস্ত আজকের বাঙালী দেবদেবীর এসব অলৌকিক কাহিনী কী করে বিশ্বাস করবে?

তালতলা ভজন কুটিরের হরিসভার কথা মনে পড়ে। প্রতি পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাশুভ্র সন্ধ্যায় বসত সেখানে ভাগবতপাঠের আসর। ভক্তিযুক্ত মন নিয়ে কত পল্লীবাসী নরন-ারী আসত সেখানে কৃষ্ণ কথা শুনতে, আমিও যেতাম। সিদ্ধেশ্বরী মাতার মন্দিরেও দেখেছি অজস্র লোক সমাগম হত বার্ষিক উৎসবে, শিব চতুর্দশী ও কালীপুজো উপলক্ষে। রতালের মহাশক্তি আশ্রমে লোকের ভিড় লেগেই থাকত। আশ্রমাধ্যক্ষ আচার্য শ্রীবরদাকান্ত বাচস্পতি জ্যোতিষ ও তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। এর জ্যোতিবিদ্যায় মুগ্ধ হয়ে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সবাই এসে আপদে বিপদে জড়ো হত সেখানে। বাস্তবিক পক্ষে মহাশক্তি আশ্রম কোটালিপাড়ায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল হিন্দু-মুসলমানের মিলন ক্ষেত্র। শুধু বাংলাদেশের নয়, ভারতের দুরান্তবর্তী অঞ্চল থেকেও অনেক লোককে আসতে দেখেছি এ আশ্রমে জ্যেতিষী মাহাত্ম্যের ফললাভের জন্যে। বাচস্পতি মশায়ের গণনা সম্বন্ধে কত যে অদ্ভুত গল্প রয়েছে তারও শেষ নেই। শুধু গণনাকর্মের জন্যেই নয়, ভজনকীর্তনে, কাঙালী ভোজনে, অতিথিসেবায় সর্বদাই থাকত এ আশ্রম মুখরিত। রতালের মনসাবাড়ি নামেও খ্যাত ছিলেন অন্নপূর্ণারূপিণী। পঞ্চাশের মন্বন্তরে কত হিন্দু-মুসলমানের যে

প্রাণরক্ষা হয়েছে এই আশ্রমমাতার কৃপায় গ্রামবাসীরা কি সে কথা ভুলতে পারে? কিন্তু তবু এঁদের সবাইকে চলে আসতে হয়েছে প্রিয় গ্রাম ছেড়ে। শুনেছি সেই মহাশক্তি আশ্রম উঠে এসেছে কলকাতা পাইকপাড়ায়। সেখানে নাকি লোকের ভিড়ের অন্ত নেই, শ্রীশ্রীনারায়ণ ঠাকুরের দর্শনার্থী সেখানে আসে দলে দলে। কিন্তু কোটালিপাড়ার সেই পরিবেশ পাওয়া কি সম্ভব কলকাতায়? আমার গাঁয়ের হরিসভায় আর ভগবত পাঠের আসর বসে না, সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে আর হয় না উৎসব আয়োজন।

কত মহাজ্ঞানী ও গুণীজনের আবির্ভাবে ধন্য আমার কোটালিপাড়া। আবার কি আমরা ফিরে যেতে পারব না সেখানে? পথহারা হয়েও পথ চলতে চলতে তার আকুল আহবান সব সময়ই ত শুনতে পাই, কিন্তু তার ডাক শুনেও পা এগুতে চায়না কেন সে দিকে? আজও কি পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হয় নি আমাদের পাপের? আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই কোটালিপাড়ার অতীতকে স্মরণ করে। বেদান্তশাস্ত্রে আচার্য শঙ্করতুল্য মহাপণ্ডিত স্বর্গীয় মধুসূদন সরস্বতী জন্মপূত উনশিয়া কোটালিপাড়ারই অন্তর্গত। মধুসূদনের পাণ্ডিত্যের তুলনা বিরল। তাইত কাশীর পণ্ডিতসমাজে আজও প্রচলিত প্রশস্তিবচনে বলা হয়েছে তাঁর সম্বন্ধে–

'মধুসূদন সরস্বত্যা পারং বেত্তি সরস্বতী।
পারং বেত্তি সরস্বত্যা মধুসূদন সরস্বতী।'

মধুসূদন সরস্বতীর বিদ্যার পরিমাণ স্থির করা একমাত্র দেবী সরস্বতীর পক্ষেই সম্ভব এবং একমাত্র মধুসূদন সরস্বতীই দেবী সরস্বতীর জ্ঞানপরিধির পারঙ্গম। বিদ্যাদায়িনী সরস্বতীর সঙ্গে যার তুলনা করেছেন কাশীর পণ্ডিত-সমাজ তাঁর জন্মস্থানের লোক আমরা আজ গ্রামমায়ের কোলছাড়া হয়ে অজ্ঞান অবোধের মতো ঘুরে বেড়াই চরম অসহায়তায়। মধুসূদন রচিত 'অদ্বৈতসিদ্ধি' অদ্বৈত বেদান্তের প্রামাণিক গ্রন্থরূপে ভারতের সর্বত্র প্রসিদ্ধিলাভ করেছে এবং ভারতের বাইরেও রয়েছেন মধুসূদনের গুণমুগ্ধ বহু দার্শনিক পণ্ডিত। নবদ্বীপ পাকা টোলের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক ও পরে কাশীরাজের বৃত্তিভোগী কাশীবাসী প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক ও নৈয়ায়িক স্বর্গীয় জয়নারায়ণ তর্করত্ন, জয়পুর রাজ কলেজের প্রাক্তন ন্যায়াধ্যাপক স্বর্গত কালীকুমার তর্কতীর্থ প্রমুখ পণ্ডিতেরাও ছিলেন উনশিয়ারই অধিবাসী। বাস্তবিক পক্ষে কোটালিপাড়ার প্রধান গৌরব পণ্ডিতস্থান হিসেবেই। এ অঞ্চলের পণ্ডিতদের মধ্যে আজও যারা জীবিত রয়েছেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে ব্যাসকল্প মহাপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ভারতাচার্য শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশের কথা। ইনি আজ স্থানান্তরে একক সাধনায় মহাকায় মহাভারত রচনায় নিমগ্ন। পশ্চিমপাড়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কোটালিপাড়ার প্রথম মহামহোপাধ্যায় পরলোকগত রামনাথ সিদ্ধান্ত পঞ্চানন ও প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক স্বর্গীয় শশীকুমার শিরোরত্ন। প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ স্বর্গত রাধারমণ রায় এবং বর্তমান যুগের ভারতখ্যাত অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুরশিল্পী শ্রীতারাপদ চক্রবর্তীও (নাকুবাবু) এ গ্রামেরই ছেলে। আধুনিক শিক্ষায় সুপণ্ডিত রাজনীতিবিদ ডা. ধীরেন্দ্রনাথ সেনের বাড়ি ছিল দীঘির পাড়ে এবং প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্যের গ্রামও কোটালিপাড়ারই মদনপাড়। বাঙালী শিল্পপতিদের অন্যতম স্বর্গত কর্মবীর সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য জন্মেছিলেন হরিণাহাটিতে।

কোটালিপাড়াকে বড় করার, সমৃদ্ধ করার কত পরিকল্পনা ছিল তাঁর! রতালে জন্মেছিলেন সুপণ্ডিত ও সুগায়ক-কথক রঘুমণি বিদ্যাভূষণ এবং জ্যোতির্বিদ গোপাল মিশ্র। তাঁরা উভয়েই দেহরক্ষা করেছেন দীর্ঘকাল আগেই, কিন্তু তাঁদের দেহই শুধু নয়, তাঁদের কীর্তিধন্য নামও যে জড়িয়ে আছে আমার গাঁয়ের সোনার মাটির সঙ্গে!

সমগ্রভাবে ব্রাহ্মণপ্রধান হলেও কোটালিপাড়ার কাসাতলী, গোয়ালক্ষ, পিঞ্জরী প্রভৃতি কয়েকটি জনপদ বৈদ্যপ্রধান এবং আধুনিক শিক্ষায় ও প্রগতির ক্ষেত্রে এরা অগ্রণী।

সাত সাতটি হাট, দুটো দৈনিক বাজার, চারটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়, দুটো সংস্কৃত কলেজ, দশ-বারটি টোল, এবং তার উপর থানা, ডাকঘর, সাবরেজেস্টারি অফিসে সবসময় জমজমাট থাকত আমার সাধের কোটালিপাড়া। আর আজ? এখন নাকি সরকারী অফিস ছাড়া একটি বাজার, দুটি হাট ও একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় কোনরকমে অতীত গৌরবের সাক্ষ্য বহন করছে বিশীর্ণ কঙ্কালের মতো। সংস্কৃত শিক্ষার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে ছিল যার আসল পরিচয় সেখানে আজ একটিও টোল নেই, একজনও অধ্যাপক নেই— কোটালিপাড়ার মানুষ আমরা ভাবতেও যে পারি না সে কথা!

আজ কত স্মৃতি জাগে মনে। বড় বড় পুজোপার্বণের কথা নাই বা বললাম! আমার গাঁয়ের মেয়েরা-মায়েরা মিলে বছরের পর বছর মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করেছে সারা বৈশাখ মাস ধরে—প্রতি মঙ্গলবারে। তাঁদের সমস্ত মঙ্গলকামনার প্রতিদানে ঘোর অমঙ্গলের অন্ধকারে কেন আমাদের ঠেলে দিলেন মা মঙ্গলচণ্ডী? তবে এই চরম অমঙ্গলকে অতিক্রম করেই পরম মঙ্গলের সন্ধান পাব আমরা? ছোটবেলায় আমার দু বোনকে দেখেছি তারাব্রত করতে। তাদের মতো তাদের সমবয়সী মেয়েরাও করত এ ব্রত পালন গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে। কত আকাঙ্ক্ষা কত আকুতিই না প্রকাশ পেত ব্রতচারিণীদের উচ্চারিত ছড়া-মন্ত্রের কলিতে কলিতে। পৌষ সংক্রান্তি থেকে মাঘ মাসের সংক্রান্তি দিন পর্যন্ত চলত এই ব্রতাচার। পরিষ্কার উঠোনে আঁকা হত কত সুন্দর আলপনা। সে আলপনার ঘরে দাঁড়িয়ে তারা-বন্দনার গান গাইত আমার দুবোন ছড়া কেটে কেটে। কী মিষ্টিই না লাগত তা শুনতে আর কী অপূর্ব পরিবেশই না সৃষ্টি হত শীতের সন্ধ্যায়! আজও মনে পড়ে গভীর মনোযোগ দিয়েই আমি শুনতাম তারা-ব্রতের মাহাত্ম্য-কথা আমার বোনদের মুখে! তারা সুর করে বলত—

'তারা পূজলে কি বর পায়?
ভীম অর্জুন ভাই পায়,
শিবের মতো স্বামী পায়,
কার্তিক গণেশ পুত্র পায়,
লক্ষ্মী সরস্বতী কন্যা পায়,
নন্দী ভৃঙ্গী নফর পায়,
জয়া বিজয়া দাসী পায়।
তারা পুজি সাঁজ রাতে,
সোনার শাখা পরি হাতে।'

হায়, এত বর লাভের প্রত্যাশা সত্ত্বেও আমার পূর্ববাংলার মা বোনদের আজ কী

হল? তাদের ব্রত, তাদের সমস্ত শুভ কামনা কবে সার্থক হবে? কবে আমরা আবার সগৌরবে গিয়ে ঘর বাঁধব আমাদের পূর্ববাংলায়?

**রামভদ্রপুর**

যে দেশের জন্যে আমি হা-হুতাশ করছি সে দেশ আজ আর আমার নয়! স্বভুমি, স্বদেশ আজ আমার পরভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে দেশে জন্মেছি, যে দেশের ধূলিকণা আমার শরীর গড়েছে, যে দেশের নদীর জল, গাছের ফল আমাকে এত বড়টি করেছে সে দেশের ওপর আমার আজ কোন দাবিই নেই ভেবে মনটা হু হু করে উঠছে। ফুল না ফুটতেই ফুল ঝরবার খেপামি এল কি করে বুঝতে পারি না হাজার চেষ্টা করেও। হয়ত এই অবস্থাটিকেই রূপ দেবার জন্যেই কবিগুরু লিখেছেন—

‘কোন্ সে ঝড়ের ভুল,
ঝরিয়ে দিল ফুল,
প্রথম যেদিন তরুণ মাধুরী মেলেছিল এ মুকুল॥ হায় রে!
নবপ্রভাতের তারা
সন্ধ্যা বেলা হয়েছে পথহারা।...
...হায় গো দরদী কেহ থাক যদি শিরে করো পরশন।
এ কি স্রোতে যাবে ভেসে দূর দয়াহীন দেশে
কোন্‌খানে পাবে কূল॥ হায় রে!’

সত্যি, প্রথম যেদিন এই মুকুল মাধুরী মেলেছিল সেইদিনই উঠল জীবন সমুদ্রে ঝড়! সারাবেলা বীণার সুর বাঁধতে গিয়ে কঠিন টানে কেঁদে উঠে ছিন্ন তার যেন রাগিণী দিল থামিয়ে। জীবনের ছন্দে প্রস্তুত হতে গিয়ে ভাগ্যে ঘটল নির্বাসন আজ মাঝে মাঝে মনে হয়, আমাদের এই নির্বাসন দণ্ড হল কোন্ দোষে? নবপ্রভাতের তারা সন্ধ্যেবেলায় পথহারা হল কেন? বিধাতার নিষ্ঠুর বিদ্রূপে আজ আমরা সর্বহারা নামে পবিচিত। সর্বত্র নাসিকাকুঞ্চন ছাড়া অন্য পুরস্কার ত কপালে জুটল না! অবাঞ্ছিত হয়ে আর কতকাল আত্মার অবমাননা করব? স্রোতে কি বৃথাই যাব ভেসে, কূলে তরী কি কোনদিনই লাগবে না? এই পথের ধার থেকে তুলে কোন্ দরদী মানুষ গৃহে দেবে স্থান তা জানি না!

নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমার গ্রাম রামভদ্রপুরের কথা। মরুভূমির মাঝখানে নামটি যেন মরুদ্যানের শান্তির প্রলেপ এনে দেয় মনে। মাদারীপুর মহকুমার অধীনে, মেঘনার এক অখ্যাত শাখা নদীর পশ্চিমে নতমুখে সহস্র লাঞ্ছনা মুখ বুঁজে সহ্য করে যাচ্ছে আমার জন্মভূমি রামভদ্রপুর। আজ মাঝে মাঝে স্বপ্নের মধ্যে আমার গ্রামের ডাক শুনি ; আমাদেব ফিরে যাবার জন্যে যেন আকুল মিনতি করবে সে। শুনেছি ভোরের স্বপ্ন মিথ্যে হয় না,—আমার দেশজননী আমাদের কোলে টেনে নেবেন ভেবে মন নেচে উঠছে পেখম তুলে। যাব, নিশ্চয়ই যাব আমরা ফিরে মায়ের কোলে। আমরাও ত দিন গুনছি আশাপথ চেয়ে। আবার আমরা ভাইয়ে ভাইয়ে গলা জড়িয়ে সুখ-দুঃখের গল্প করব আগের দিনের মতো।

মনে পড়ছে আমাদের গ্রামের বাজারের কথা। নদীর ধারে বসত বাজার। এই

বাজারে হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে কেনাকাটা করত জিনিসপত্র। দোকানপাটগুলো ছিল মানুষের যেন মিলনতীর্থ, সবাইকে বেঁধে রেখেছিল বন্ধুত্বের সূতোয় একত্রে। কেরামতের মসলার দোকানের খরিদ্দার ছিলাম আমরা, আবার বিখ্যাত হরলালবাবুর দোকানে রিয়াজদ্দী, দিনালী, মোবারক মুন্সী আড্ডা দিত দিনরাত। সম্প্রদায় হিসেবে দোকান নির্বাচনের জঘন্য মনোভাব কোনকালেই আমাদের ছিল না। মনে পড়ছে মাছ কেনার সময় ঠোঙার প্রয়োজন হলে অকুতোভয়ে চলে যেতাম কেরামতের দোকানে। একদিনের জন্যেও তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে দেখি নি। আবার অন্যদিকে, রিয়াজদ্দীর কোনদিন তরকারি বিক্রি না হলে সোজা সে নিতাই কুড়ির দোকানে বা হরলালবাবুর মুদিখানায় গিয়ে ডালাভর্তি তরকারি রেখে দিত পরের দিন বিক্রি করার আশায়। বেতের ডালাখানি চৌকির নীচে রাখবার সময় সে হয়ত মুচকি হেসে কোন কোন দিন বলত—'কর্তা, থুয়ে গেলাম ডালাটা। আপনার তরকারির দরকার নাই? লাগে ত কন্ থুইয়ে আসি বাড়িতে। পয়সা হেইটা কাইল দিবেন কর্তা।' গ্রামবাসীর ওপর গ্রামবাসীর এই যে সহজ বিশ্বাস, সে বিশ্বাসের গলা টিপল কে?

বর্ষাকালে বাজারে যাবার পথে জল উঠত জমে। গ্রামের লোকজন তখন ভাসিয়ে দিত নৌকার শোভাযাত্রা। যারা কষ্ট করে হেঁটে যাবার দুঃসাধ্য চেষ্টা করত তাদের ডেকে মুসলমান ভাইরাই আত্মীয়তার সুরে বলত,—'কর্তাগ যাইতে কষ্ট হইবো— নৌকা যোওন লাগে।' মনে পড়ে ছোটবেলায় দুষ্টুমি করে দলবেঁধে তাদের নৌকা চেপে পাড়ি দিতাম অন্য গ্রামের দিকে সকলের অজ্ঞাতে। কখনও বা নৌকা দিতাম ভাসিয়ে স্রোতের মুখে। নৌকার মালিক ঘাটে নৌকা না দেখে আঁতি পাঁতি করে খুঁজে বেড়াত এদিক-ওদিক। কিন্তু এজন্যে তাদের মুখ মলিন হতে কোনদিন দেখি নি, নৌকা খোঁজার পরিশ্রম কোনদিন তাদের অসহিষ্ণু করে তোলে নি।

পিচ্ছিল কর্দমাক্ত পথে মুসলমানেরা যখন মাথায় তরকারির বোঝা আর হাতে দুধের হাঁড়ি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠত তখন আমি, কুমুদ, মাখন, সতীশ প্রভৃতি ছেলেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই তাদের মোট নিজেদের মাথায় তুলে নিয়ে সাহায্য করেছি। বাবুদের সাহায্য করতে দেখে তারা সভয়ে কত সময় দ্বিধাজড়িত গলায় বলেছে—'এটা করেন কি কর্তা, আমিই নিতে পারুম।' এই ভাবেই চলে এসেছে আমার গ্রামের দৈনন্দিন জীবন। সেদিনের সরল সহজ জীবন কি আমরা চেষ্টা করলে আবার ফিরে পেতে পারি না?

বাজারের পাশেই ছিল মধ্য ইংরেজি স্কুল। সামনে ছোট মাঠ, তার পরেই মেঘনা নদীর শাখার উত্তালতরঙ্গমালা যেন সমস্ত বাধা বিপত্তিকে চূর্ণ করে কূলে এসে আছড়ে পড়ার সাধনায় ব্যস্ত। লাল-নীল-বাদামী-হলুদ পাল তুলে চলে নৌকার ঝাঁক,—দূর থেকে ময়ূরপঙ্খী বলে ভূল হয়। হয়ত এপার দিয়ে পাট বোঝাই নৌকা তিন হাজার মণ মাল নিয়ে চলেছে গুণ টেনে। মাঝিদের পেশীবহুল কালো কালো শরীর বেয়ে ঝরছে স্বেতধারা। গুণ টানার পরিশ্রমে পিঠের শিরগুলো উঠছে ফুলে। পরিশ্রমও যে মানুষকে সময় সময় কত মনোরম করে তোলে তার পরিচয় আমরা সেদিন পেয়েছি। মাঝিদের লোভনীয় স্বাস্থ্যের সঙ্গে নিজেদের ক্ষীণ শরীর মিলিয়ে কত সময় লজ্জিত হয়েছি মনে মনে।

গ্রামের ধনী ঈশানচন্দ্র দে মশায়ের ছেলে ললিতমোহনদের অর্থে তৈরি হয়েছিল আমাদের গ্রামের মধ্য ইংরেজি স্কুলটি। টিনের ছাউনি দেওয়া লম্বা বাড়ি, সমস্ত গ্রামের বিদ্যাবিতরণ কেন্দ্র। নীচের ক্লাসে আমার সঙ্গে পড়ত আকুবালী আর ফজলুল বলে দুজন সহপাঠি। তিনজনের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা থাকার দরুনই হয়ত আমরা তিনজনে বন্ধুত্বের ত্রিভুজ গড়ে ছিলাম সেদিন। ওদের ফুলকাটা সাদা টুপি, আর রঙীন ভেলভেটের ফেজ দেখে কত সময় মন খারাপ করে ঘরের এক কোণায় বসে থেকেছি— আমাকে মনমরা হয়ে থাকতে দেখে ওরা কত সাধ্যসাধনা করেছে কারণ নির্ণয়ের জন্যে। পরে কারণ জানতে পেয়ে হেসে নিঃস্বার্থভাবে নিজেদের টুপি দিয়েছে আমার মাথায় চড়িয়ে। মুহূর্তে মনের মেঘ কেটে গিয়ে দেখা দিত হাসির সূর্য। তাদের টুপি মাথায় দিয়ে তাদেরই সঙ্গে খেলা করেছি কতদিন। কিন্তু আজ? জাতিভেদের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আর পারবে কেউ এমনভাবে অন্যের মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে নিঃস্বার্থ ত্যাগ করতে?

মনে পড়ে আকুবালী আমাদের বাড়ি এলে মা ওকে আম, কলা, দুধ দিতেন বাটি ভরে। আকুবালী আকণ্ঠ ভোজন করে স্বহস্তে বাটিটি ধুয়ে রাখত বারান্দায়। বারণ করলেও শুনত না। জানি না কোথা থেকে আকুবালী শিখেছিল এ ধরনের সামাজিক শৃঙ্খলা! আমাদের খাওয়ার সময়েই হয়ত কোনো কোনোদিন এসে পড়েছে করিমচাচা কিংবা জয়নাল। থপ করে চাটাইয়ের ওপর বসে পড়ে আকুবালীর দিকে রাগত দৃষ্টি হেনে বলেছে— 'তুইতো খাইয়া লইলি পেটটা ভইরা, আমরা পেটটা ভরুম না? দেননা মাঠাইন দুইটা আম খাইয়া লই। কর্তাগ সিন্দুইরা গাছের আমগুলা বড় মিষ্টি!' কত আনন্দ করেই না মা খাওয়াতেন তাদের। আজও হাসি পায় তাদের ভোজনপর্বের দৃশ্যটা মনে পড়লে। আগ্রহ ভরে চেটে চেটে আম খাওয়ার ঢঙ দেখলে মনে হত যেন বহুদিন থেকে ওরা উপবাসী! খাওয়ার পরেই কল্কেতে ভরে নিত তামাক।

এই যে সামাজিক হৃদ্যতা সেদিন দেখেছি তার মৃত্যু হল কোন্ চক্রান্তকারী ডাইনীর মন্ত্রে? মানুষ মানুষকে কেন আজ এড়িয়ে চলছে পশুর মতো? আমরা কি স্বার্থপরতা, নীচতা, শঠতা ভুলে গিয়ে আবার আত্মীয় হয়ে উঠতে পারি না? সাধারণ মানুষ কেন হিংস্র হবে, কেন মানবীয়-গুণগুলোকে বিসর্জন দিয়ে পরেব ক্রীড়নক হয়ে উঠবে? কাকে ছেড়ে কার চলে সংসারে? আবার কি আমরা মানুষ হতে পারব না, একত্রে মিলেমিশে থাকতে পারব না?

প্রতি বৎসর বাসন্তীপূজো হত আমাদের বাড়িতে। এ পূজা উপলক্ষে গ্রামের ধনী-মানী-জ্ঞানী-গুণীর নিমন্ত্রণ ত হতই, সেই সঙ্গে নিমন্ত্রণ হত সমস্ত গ্রামবাসীর। এ উৎসবে দেখেছি আমাদের চেয়ে বেশি উৎসাহী ছিল মুসলমান ভাইরা। এই দিনটির জন্যে তারা উদগ্রভাবে প্রতীক্ষা করে থাকত বছরের প্রথম দিন থেকে। তাদের আগ্রহে পুজো যেন আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠত। তারাই সংগ্রহ করে আনত বলির মোষ। নিয়ে আসত চাঁদপুর থেকে মারপত্র সুশৃঙ্খলভাবে। পুজোর ঢাকের আওয়াজে সমস্ত গ্রামখানি হয়ে উঠত জীবন্ত, বহুদূর থেকে ঢাকের শব্দ শুনে লোক আসত ছুটে। এ পুজোকে প্রত্যেকে নিজের বলে গ্রহণ করায় সেদিন কোনরকম গোলযোগই দেখা দিত না গ্রামে। গ্রামবাসীদের মধ্যে আত্মীয়তাপূর্ণ ব্যবহারই সমস্ত জিনিসটিকে করে তুলত মধুময়।

আমাদের বাড়িতে থাকতো জংগু ঢালী আর এলাহীবক্স। তারা বাগান তদারক করত, কাঠ চিরত, নৌকা বাইত—এক কথায় কঠোর পরিশ্রমের সব কাজগুলোই তারা সমাধা করত বিনা বাক্য ব্যয়ে। সকালবেলা এক গামলা পান্তাভাত খেয়ে লেগে যেত কাজে। ভাত খাওয়ার ব্যঞ্জনও ছিল তাদের কত অনাড়ম্বর—একটি পেঁয়াজ আর এক গণ্ডা কাঁচা লংকা দিয়ে এত নির্বিবাদে এত ভাত খাওয়া যেতে পারে তা এলাহীবক্সদের খাওয়া না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না! জীবনযাত্রা এত সরল ছিল বলেই তাদের পক্ষে সবই সেদিন ছিল সম্ভব, কিন্তু আজ আর সেদিন নেই। বিলাসের ফাঁসে পড়ে সকলেই হয়ে উঠেছে বিলাসী, এখন সারল্য তাই হয়েছে বিতাড়িত। আগে যারা কর্তাবাড়ির প্রসাদ পেয়েই নিজেদের করেছে ধন্য, আজ তাদের মনোভাব অন্য ধরনের। এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ছে আম কুড়ুনোর ছবি। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বাগানে আম কুড়ুতে গেলে জংগু আর এলাহীবক্স কত সমাদর করে আমাদের হাতে আম দিত তুলে। বাগান জমা দেওয়া সত্ত্বেও তারা আপনা থেকে কোনদিনও একটি আম নেয়নি, সমস্ত আম পৌঁছে দিয়েছে আমাদের বাড়িতে। কর্তামা বা বাড়ির অন্য কেউ ডালায় ভরে যেকটা আম তাদের দিতেন তাই বাড়ি নিয়ে যেত তারা হাসিমুখে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে। ডালা কাঁধে তুলতে তুলতে বরঞ্চ কৃতার্থ হয়ে বলত, 'পোলাপানের থুইয়া আমি এখলা খামু কেমন কইরা, আপনাগ দয়াইত তবু পোলাপানরা আম জাম খাইতে পায়।' একথা কি বঞ্চিতের কথা? আজ ভারাক্রান্ত মনে ভাবি সময় সময় মানুষের সৌহার্দ্যবোধ কেন নষ্ট হল? আমাদের আত্মীয়তাবোধ কি তাহলে চোরাবালির ওপর ছিল প্রতিষ্ঠিত, না হলে, তা এমন অতলতলে তলিয়ে গেল কি করে হঠাৎ?

মনে পড়ে আমাদের বাড়ির সর্বজনীন তামাক খাওয়ার দৃশ্যের কথা। ঘরের বারান্দায় থাকত তামাকের সাজসরঞ্জাম। বাজারের পথে বাড়ি হওয়ায় চব্বিশ ঘণ্টা ভিড় থাকত লেগে। যে কেউ তামাক খেত তার সাকরেদ হত জংগু আর এলাহী। বিনামূল্যে এই সামান্য তামাকের আকর্ষণ ছিল অদ্ভুত, যতক্ষণ ধোঁয়া না পেটে পড়ত ততক্ষণ সবাই যেন স্থবির হয়ে বসে থাকত গোলাকার হয়ে! বিদেশী পথিকরাও শ্রমলাঘবের জন্যে এখানে ক্ষণিকের জন্যে না বসে যেতে পারত না। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করেছি সেদিন, নেশার কাছে সমস্ত জাতিভেদ হয়েছিল পরাজিত। সেটা ছিল মানুষের বিশ্রামাগার, ঘর্মক্লেদাক্ত দেহে রৌদ্রের খর তাপ থেকে বিশ্রাম নেবার জন্যেই আত্মীয়তার সুর উঠত নিবিড় হয়ে বেজে। ধোঁয়ার অক্ষরে অক্ষরে সেদিন লেখা হত—'সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই!'

শৈশবের কোমল মনে যে ছাপ একবার পড়ে তা হয়ে থাকে অক্ষয়। এখন হুবহু মনের মানচিত্রে সমগ্র গ্রামখানি জ্বল্জ্বল্ করছে। মনে পড়ে বাজার থেকে পশ্চিম দিকে চলে গেছে প্রশস্ত রাস্তাটি—তার দুপাশে কুমোর, নাপিত, কামার ইত্যাদি নানা শ্রেণীর বাস। আধ মাইল যাবার পর ডাইনে বাঁয়ে বেঁকে গিয়ে গাঁয়ের দুপাড়া এসে মিশেছে চৌমাথায়। এই মোড়টিই গ্রামের কেন্দ্রস্থল। ডাইনের রাস্তাটি মুসলমান পাড়ার বুক চিরে চলে গেছে কার্তিকপুর পর্যন্ত, বাঁয়ের রাস্তা গেছে গ্রামের উচ্চ শ্রেণীর বাবুমশায়দের পাড়া ছুঁয়ে। এই রাস্তার উপরেই পড়ে মুন্সেফ সাহেবের বাড়ি, নাম 'বাবুবাড়ি'। ঝাউগাছ সমন্বিত প্রশস্ত খোয়া বাঁধানো চওড়া রাস্তাটি বাবুবাড়ির আভিজাত্যের পরিচায়ক। সেদিন

ঝাউগাছের বুক থেকে সোঁ সোঁ শব্দ করে যে হাওয়া যেত ছুটে আজ সে শব্দ শুনলে মানুষের আর্তনাদ বলেই ভুল হবে! মনে হবে সহস্র দুঃখ-দুর্দশায় বুক ফাটানো আর্তনাদ ফেটে পড়ছে ঝাউগাছের ফাঁকে ফাঁকে। জানি না মুন্সেফ সাহেব সে দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেয়েছেন কিনা! রাবণের চিতাগ্নির মতো এই যে মনের আগুনের আর্তস্বর অহর্নিশি শব্দায়িত হচ্ছে এর শেষ কোথায়?

এখানেই পুজোর সময় হত থিয়েটার। থিয়েটারের জন্যে সমস্ত গ্রামবাসীরাই উদগ্রীব হয়ে দিন গুনত, চাঁদা তুলত, হাতে লিখে প্রোগ্রাম তৈরি করত। পূজোর ছমাস আগে থেকেই সিন্‌গুলো নতুন হয়ে ঝলমলিয়ে উঠত। গ্রামের চিত্রকর মল্লিক মশায় ছিলেন এই দৃশ্যপট সজ্জার পাণ্ডা। তিনি দৃশ্যপটে আঁকতেন রামভদ্রপুরেরই গ্রাম্য ছবি। আমার গ্রামের ছবি ড্রপসিনের গায়ে কী চমৎকার লাগত তা আজ ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না।

পুজোর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছে মহীসারের বৈশাখী মেলার কথা। বৈশাখের প্রথম দিন থেকে সাত দিন সে মেলা হত স্থায়ী। আমরা গুরুজনদের কাছ থেকে পৃথক পৃথক ভাবে পয়সা জমিয়ে মেলা দেখতে যেতাম হৈ-হুল্লোড় করে। চৈত্র সংক্রান্তিতে সদূর হাটখোলার একমাইল উত্তরে সারাদিন মেলায় কাটিয়ে বাড়ি ফিরতাম ক্লান্ত চরণে। হাতের পুঁটলিতে বাঁধা থাকত পুতুল, বাতাসা, কদমা, জিলিপি, বাদামভাজা ইত্যাদি লোভনীয় বস্তুসম্ভার। মহীসারের মেলাতে রবারের বল, মাটির গণেশ আনতেই হবে সেই ছিল আমাদের নিয়ম। সে সব দিন কি আমাদের জীবনে আর ফিরে আসবে না? এই মেলা উপলক্ষে আমাদের গ্রামে বাইচ খেলা ছিল প্রধান আকর্ষণ। শান্ত মেঘনার শাখানদীতে বাইচ খেলা সেদিন সমস্ত গ্রামবাসীকে যে উদ্দীপনা দিয়েছে তার তুলনা পাওয়া ভার। নদীর তীরে একটা দীর্ঘ বাঁশে পিতলের একটি কলসী থাকত ঝুলানো। বাইচ আরম্ভ হলে দ্রুত নৌকা চালিয়ে যে প্রতিযোগিতায় জিতে ঐ কলসী নিতে পারবে তারই শ্রেষ্ঠত্ব সকলে নিত স্বীকার করে। চক্ষের পলকে তীব্র গতিতে নৌকাগুলো সব হয়ে যেত অদৃশ্য নদীর বুকে কালো কালো বিন্দু যেন ছুটে চলেছে, সহস্র চোখে তারই দিকে তাকিয়ে থাকত অজস্র মানুষ। উৎসাহের বাষ্পে ফেটে পড়া সে মানুষের আজ এ কি অবস্থা? যারা একদিন আনন্দকেই জেনেছিল জীবন বলে, আজ তারা উল্টো পথের পথিক হল কেন? উপনিষদ বলেছেন যে আনন্দ থেকেই মানুষের জন্ম, আনন্দের মধ্যেই তার লয়। কিন্তু আমবা ত তার প্রমাণ পেলাম না! আনন্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করলেও আনন্দের মধ্যে ত বিদায় নিতে পারলাম না। তবে কি স্বর্গ থেকে এ বিদায় ক্ষণস্থায়ী? আবার আমরা আনন্দের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হব? মহাজন বাক্য ত নিষ্ফল হয় না, অবিশ্বাসী আমরা সব সময় স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করতে পারি না বলেই অযথা দুঃখ পাই। উপনিষদ সত্য, উপনিষদ অভ্রান্ত, উপনিষদের কথা নিষ্ফল হতে পারে না। আবার আমরা মানুষ হব, আবার আমরা সুখী স্বচ্ছল হব। একাগ্রমনে কান পেতে শুনুন, আকাশে বাতাসে উঠছে আনন্দের সুর আনন্দের মধ্য দিয়ে আনন্দকে চিনে নেওয়াই কর্তব্য আমাদের।

**কাইচাল**

পূজোর ছুটি। 'ঢাকা মেল' ধরবার জন্যে ছুটে চলেছি। স্টেশন একেবারে জনারণ্য। তবু এ ভিড় অগ্রাহ্য করেই প্রতিবার বাড়ি যাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে রওনা হয়েছি।

একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে শেয়ালদা থেকে ট্রেন বেরিয়ে গেল। কলকাতার আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে চলেছি। চেনা চেনা গ্রাম ও শহরের পাশ দিয়ে হু হু করে এগিয়ে চলেছে ট্রেন। গ্রামের কাছাকাছি এসে পড়েছি। আমার গ্রাম আমাকে ডাকছে। ফরিদপুর জেলায় কাইচাল আমার গ্রাম।

ট্রেন থেকে নেমে নৌকাঘাটায় গিয়েছি, অমনি শত কণ্ঠে চিৎকার হয়েছে—'কোহানে যাবেন কত্তা, এদিকে আসেন।' যে নৌকাখানি দেখতে একটু ভাল, গেলাম তার নিকট। মাঝির নাম মৈনুদ্দিন, এই তার আসল পেশা আর এমন বিশ্বাসী সে যে, নৌকায় কিছু ফেলে গেলেও ফিরিয়ে দিয়ে যায়, সুতরাং ভাড়ার প্রশ্নই উঠল না।

নৌকা চলেছে। নৌকার বাইরে বসে আছি, সব দেখছি। মাঝি বললে,—'কর্তা, ছইর মধ্যে যান রৈদ নাগবে।' অবসন্ন দেহ, তবু ঝিম ধরে বসে আছি, কি যে এক অনাবিল আনন্দ অনুভব করছি। ফরিদপুরে 'মাইজা মিঞার খাল' বিখ্যাত, তার মধ্যে নৌকা পড়েছে। মৈনুদ্দিন মাথাল নামিয়ে রেখে মাজায় গামছা কষে নিল। চইরটাকে একটানে বের করে নিয়ে এক চিৎকার দিয়ে বললে, 'যার যার হাতের বায়ে।' তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলাম, দেখি কিছু সাহায্য করতে পারি কিনা। মৈনুদ্দিন দিলে না, বললে—'আপনার নাগবেনা, আপনি বসেন।'

নৌকা ছেড়ে দিলে, জিজ্ঞাসা করি কখন পৌঁছতে পারব। সে বললে, সন্ধ্যাসন্ধ্যি। পাট ভর্তি, মুসুর ভর্তি, আরও কত রকম পশরা ভর্তি কত নৌকা ঝুপঝাপ শব্দে চলেছে নিকটবর্তী কোন এক বন্দরের হাটে।

ঢাকের শব্দ শোনা যাচ্ছে। বুঝলাম এসে পড়েছি, তবে আশপাশে ছোট ছোট আরও গ্রাম রয়েছে, তাই আমার গ্রাম কতদূর তা বুঝতে পারছিনা। মৈনুদ্দিন বললে,—'এই ত কাইচালের বিল, এটা পার হলেই আপনাগো গ্রাম দেহা যাবেনে।'

কাইচাল গ্রাম বাবুদের ছিল। এর অনেক ইতিহাস আছে। আশপাশে ভূত-পেত্নী ঘোরে আর বিলের মধ্যে সিন্দুকের ঘড় ঘড় শব্দও নাকি অনেকে শুনেছে। ফইটকার খালের মুখে একটা ভ্যাসালের কাছে গেলাম। সনাতন মাঝির ভ্যাসাল, ওপরে সে আছে, একটা ছোট হ্যারিকেন লণ্ঠন বাঁধা। 'মাছটাছ আছে নাকি সনাতন?' বলতেই একখানা চার-পাঁচ সের ওজনের নলা এবং সের আড়াই পরিমাণ টাটকানি দিলে সে। বললে, 'লইয়া যান, দাম এখন দেওয়া নাগবে না।' খালের ভেত্তর দিয়ে একখানা মুসলমান গ্রাম পার হতেই কানে ভেসে এল দোতারার ক্ষীণ শব্দ, বুঝলাম আমাদের গ্রামের নাপিতপাড়ার প্রসন্ন শীল। এ তল্লাটে ও ছাড়া আর কেউ এ যন্ত্র বাজায় না। আর জানতাম কর্মক্লান্ত দিনের শেষে রোজই ও দোতারা বাজায়। হঠাৎ 'কাহার' বাড়ির আলো দেখলাম, প্রশ্ন এল, 'যায় কেডা?' নৌকা গিয়ে ঘাটে লাগল।

গল্প শুনেছি যাতে বাইরের কোন শত্রু কোন হিন্দু গ্রাম আক্রমণ করতে না পারে এইজন্যে এ তল্লাটের প্রায় প্রত্যেকখানি গ্রামই চতুর্দিকে মুসলমানদের দিয়ে ঘেরা। আমাদের গ্রামখানিও তেমনি। বহু পুরাতন গ্রাম, জমিদার প্রধান স্থান। কালীমন্দির, শিবমন্দির, পুরনো দীঘি, রামসাগর, শানবাঁধানো ঘাট ইত্যাদিতে তার সাক্ষ্য দেয়। বসু মজুমদারেরা পুরাতন বাসিন্দা। ছেলেগুলো উচ্চশিক্ষা পাওয়ায় সবাই প্রবাসী। তাই

নাটমন্দিরের ওপরে উঠেছে বট-পাঁকুড় গাছ, ভেতরে বাসা করেছে কবুতর আর পেঁচা, তবু কিন্তু কোনো পূজো-অর্চনা বাদ যায় না।

প্রায় সমস্ত রকমের জাতের বাস আছে এ গ্রামে। ভদ্র এবং শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বেশি থাকায় আশপাশের সমস্ত লোকের আচার-ব্যবহার ভদ্র। উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত গৃহস্থের প্রায় সকলেরই ধানের গোলা, গাইগরু এবং পুকুর আছে। তারপর প্রত্যেকখানি বাড়িই আম, নারিকেল, কলা, কাঁঠাল ইত্যাদি গাছে ঘেরা ; প্রত্যেকের সাথেই যেন নিবিড় আত্মীয়তার বন্ধন। প্রত্যেকটি ঋতু উপভোগ করেছি পরিপূর্ণভাবে, কোকিলের কুহু কুহু রব, দোয়েলের শিস্, পাপিয়ার তান।' প্রকৃতিদেবী যেন আপন হাতেই সাজিয়েছেন গ্রামকে। উত্তর এবং দক্ষিণে প্রশস্ত মাঠ। শীতের দিনে দেখেছি পরিপূর্ণা যুবতীর ন্যায় মাঠখানি নানারকম রবিশষ্যে ভরা—আবার বর্ষাকালে দ্বীপের ন্যায় মনে হয়েছে গ্রামটিকে। শীতের দিনে কাদের গাছি এসেছে খেজুর গাছে হাঁড়ি পাততে ছেলেদের দল ছুটেছে তার পেছনে পেছনে, —'ও গাছি একটা চুমরি দেবে?' গাছি বলেছে, 'পান নইয়া আইস।' তার সাজ দেখলে মনে হত যেন সে কোন যুদ্ধে যাচ্ছে।

নির্মল ঘোষ, বিমল ঘোষ মহাশয়রা বাড়ি আসছেন শুনলে সারা তল্লাটে সাড়া পড়ে যেত। আশপাশের গ্রামের লোকজন উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠত দেখা করবার জন্যে। গ্রামের ছেলেমেয়েরা হয়ে উঠত চঞ্চল। খেলাধূলোর বন্দোবস্ত হত সকালে, দুপুরে, বিকালে—যাতে কেউ বাদ না যায়। সে কী আনন্দ! প্রত্যেকেই কিছু না কিছু পুরস্কার পেত। গ্রামের পূর্বদিকে সাত-আট মাইল দূর থেকে নির্মলবাবুর প্রতিষ্ঠিত স্কুল ঘর দেখে লোকে 'ঐ কাইচাল' বলে এ গ্রাম ঠিক করে। কয়েক বৎসর হল একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ ছাড়া দেশের ও দশের অনেক উপকার এবং কাজ এঁরা করেছেন। এঁদের কাজকর্ম দেখে সকলেই বলাবলি করত, লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্যে এঁরা দু ভাই দৃঢ়সংকল্প।

এঁরা যখন চলে এসেছেন তখনও নির্জীব হয় নি গ্রাম। ছোট হিস্যার খোকাদার কাছারীঘরের দোতলায় প্রায় সব সময় চলেছে নাচের মহড়া—এক, দুই, তিন। বড় হিস্যার কাছারীতে চলেছে নামকরা অভিনেতাদের পার্টি, কত অঙ্গভঙ্গি সহকারে মাস্টার তাদের শেখাচ্ছেন। তারপর মণীন্দ্রমোহন বসু মজুমদারের কাছারীতে চলেছে গান-বাজনার তোড়জোড়।

গ্রামে ছিল পোস্ট-অফিস। দূর গ্রাম থেকে কোন লোক এসেছে দরকারে, যত শীঘ্র সম্ভব ফিরে যাবে ; কিন্তু ভুলে গেছে সে তার জরুরী কাজ। এ কাছারী ও কাছারী ঘুরে দেখেশুনে ডাকঘরে যেতে যেতে ডাকঘর হয়ে গেছে বন্ধ!

গ্রামের মোহন শীল বিকট কালো পোষাক পরে কপালে বড় একটা সিন্দুরের ফোঁটা দিয়ে খাড়াহাতে জল্লাদের ভূমিকায় যখন থিয়েটারের আসরে অবতীর্ণ হয়েছে তখন অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ভয়ে চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। খোকাদার প্রকাণ্ড আটচালা ঘরে হচ্ছে যাত্রাগান—গ্রামের রাসভারী প্রকৃতির লোক সুরেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় দলের সেক্রেটারী, দক্ষিণারঞ্জন বসু মহাশয় ম্যানেজার, শ্রোতার সংখ্যা অধিকাংশই মুসলমান, কিন্তু টুঁ শব্দটি নেই। কারণ জমিদার বাড়িতে গান, তারপর স্বয়ং জমিদাররা

উপস্থিত। জায়গায় জায়গায় পেয়াদা এবং বরকন্দাজরা বাঁশের এবং বেতের লাঠি হাতে দণ্ডায়মান হয়ে খবরদারি করছে। যখন চড়কপূজো এসেছে, তখন কী মাতামাতিই না শুরু হয়েছে! 'বালা সন্ন্যাসী'রা নানারূপ কৃচ্ছ্রসাধন করে এই জাগ্রত এবং ক্রুদ্ধ দেবতার পূজোর জন্যে তৈরি হয়েছে। খোকাদার বেলতলা পুকুরের মধ্যে প্রকাণ্ড একটি আস্ত গাছ ডুবে আছে— যে সে গাছ নয়, ওর ভেতর রয়েছে দেবতা! প্রবাদ আছে চড়কপূজোর ঢাকের বাজনা শুনলে ঐ গাছ ভেসে ওঠে। এই পূজোর দিন যত সব ভূত, পেত্নী, দানব, দৈত্যি নেমে আসে এবং অবাধে যাতায়াত করে ; তাই ঐদিন আগে থেকেই সাবধান হয় ছেলে- মেয়েরা।

গাজন গান হবে। গ্রামের অক্ষয় পাল এবং নগরবাসী মণ্ডল পুরাণ আলোচনার জন্যে তৈরি হয়ে এসেছে, কতলোক জমেছে। জ্ঞাণীজন সব বসেছে সম্মুখে, পাশে দুটো ঢাক তৈরি হয়ে রয়েছে। হচ্ছে গাজন গান, কী সে আনন্দ! একবার শ্যাওড়া গাছের ডাল কাটায় গ্রামের একটা ছেলে ভীষণ অসুখে আক্রান্ত হয়। বাঁচবার আশা তার মোটেই ছিল না। পরে প্রকৃত ঘটনা জেনে মানত করে পূজো দেওয়া হয় গাছের গোড়ায়। তারপর সে রোগমুক্ত হয়। আমি নিজে দেখেছি। কাজেই অবিশ্বাস করতে পারি না। তবে হতে পারে কাকতালীয়।

বীজ বপনের সময় বৃষ্টির পাত্তা নেই। সারা মাঠ প্রখর রৌদ্রতাপে ফেটে খাঁ খাঁ করছে। কৃষককূল হায় হায় করছে। অহোরাত্র কীর্তন হচ্ছে। হঠাৎ কেউ বললে গ্রামের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত নিশাতলা—ওখানকার দেবতা স্বপ্নে বলেছে পূজো দিতে! অমনি সবাই মিলে সেখানে গিয়ে দেবতার পূজো দেয়, তিন-চার মণ দুধ দিয়ে যে যে গাছে দেবতা আছে তাদের স্নান করায়। আমরা দেখেছি সেই দিনই কি পরের দিন ভীষণ বৃষ্টি হয়ে মাঠ ভাসিয়ে দিয়েছে। বুদ্ধিতে এ সবের ব্যাখ্যা চলে না। কি হিন্দু কি মুসলমান সবাই ঐ জায়গাটিকে ভয় করে এবং ভক্তিও করে। হায়, আর কি কোনদিন ফিরে যাব না সে দেশে, আমার সোনার গাঁয়ে!

কালীবাড়িতে আছেন জাগ্রত কালী, পাশে সাতটি শিব। প্রত্যহই পূজো হয়। আমরা শুনেছি আমাদের কালীবাড়িতে নরবলি পর্যন্ত হয়েছে!

ফাল্গুন মাস। কলকাতা থেকে সুধাংশুবাবু এসেছেন। অনেক গুণী এনেছেন। বাড়িতে তাঁদের বন্দুক আছে। ছেলের দল সব তৈরি হয়েছে ঘোড়ামারার বিলে পাখি শিকারে যাবে। কত আনন্দ এতে পেয়েছে গ্রামের ছেলেরা। তিন-চারটে বাতাবী লেবুর গাছ ছিল, কেউ কোনো দিন পাকা লেবু দেখেনি—কারণ ওসব দিয়ে ফুটবলের কাজ চালাতে হয়েছে।

পশ্চিমপাড়ার ঠিক কোণায় ছিল নগেন-ক্ষিতীশদের বাড়ি। তাদের মার সঙ্গে আমার মায়ের ছিল খুব ভাব। দুজনেই বিধবা। নিজের তিনটি ছেলে থাকা সত্ত্বেও কি ভালই না বাসতেন তিনি আমাকে। প্রত্যেকদিনই গিয়েছি তাঁদের বাড়িতে আর কিছু মুখে না দিয়ে কোনদিনই ফিরতে পারি নি। অনেকে মনে করিয়ে দিত, আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, কিন্তু মাসীমার অপত্য স্নেহের কাছে কোন কথাই টিকত না। মনেপ্রাণে মাসীর মুখে হাসি দেখতে চেয়েছি। নগেন-ক্ষিতীশ থাকত বিদেশে। মাসীর দুঃখ, তারা ঠিকমতো চিঠি

দেয় না। নগেন বড় ভাই হয়েও ক্ষিতীশের বিয়ের জন্যে চেষ্টা করছে না, আরও কত কি মাসী নালিশ জানাত আমার কাছে। আজ নগেন, ক্ষিতীশ, মাখন তিনজনেই সংসারী হয়েছে, বেশ সুখে-শান্তিতেই আছে। কিন্তু মাসী তাঁর বৌ আর নাতি-নাতনীদের নিয়ে দেশে থাকতে পারলে তাঁর কত বেশি আনন্দ হত!

তারপর বিশ্বকর্মাপূজোয় ভাঙার গাঙে নৌকাবাইচ। রতন সর্দার সকালেই তার বাবরী চুলে সাবান দিয়ে ফুলিয়েছে, কপালে বড় সিন্দুরের ফোঁটা দিয়েছে, লাল গামছা একখানা পরেছে, আর একখানা মাজায় বেঁধে এক হাতে ঢাল এবং অপর হাতে লক্‌লকে ধারাল খড়গ নিয়ে নৌকার ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। আশি হাত লম্বা নৌকা, দশ-বার হাত হবে তার গলুই। দুপাশে পিতলের চক্ষু, আরও কত কি দিয়ে সাজানো। গলুই-এর ওপরে পিতলের দুটি সাপ ফণা তুলে রয়েছে এবং নৌকার দোলায় দোলায় উভয়ে উভয়কে আঘাত করছে। রতন সর্দার বোল বলছে—

'আমার নায়ে হোলক গাবি কে,
আরে হোলাবিলাই সাদী করবে
কাহই আইনা দে।'

গ্রামের প্রত্যেক বাড়ির প্রত্যেকটি আম গাছের কোনো-না-কোনো নাম রয়েছে। আমাদের পুকুরপাড়ে উত্তর-পূব কোণে ছিল একটা খুব উঁচু আমগাছ-নাম তার থোপাঝুড়ি। ঐ গাছের মাথায় ছিল বড়জিয়াল পাখির বাসা। তারা স্বামী-স্ত্রীতে প্রহরে প্রহরে ডাকত। পুকুরপাড়ের গাছে ছিল মাছরাঙার গর্ত। মাছরাঙা পুকুর থেকে মাছ ধরে পেয়ারা গাছের ডালে বসে খেত। আমি বাঁশ-গুলী দিয়ে অন্য অনেক পাখি মেরেছি, কিন্তু এদের কোনদিন মারি নি।

পূবপাড়ায় ত্রিনাথের মেলা। কে যেন গান ধরেছে,—'আমার ঠাকুর তেন্নাথের যে করিবে হেলা...', তারপর যেন কি ভুলে গেছি। গণশা গিয়েছে সেখানে, তাই কামিনীদি ডাকছে, 'ও গণশা, ঘরে সোমত্ত বউ, আর তুই গান শুনছিস?' কামিনীদি শুতে যেতে পারছেন না। আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে তাঁর সেসব বিলাপ শুনতাম।

এখানে আমার ঘুম ভাঙানোর কেউ নেই, কিন্তু গ্রামের বাড়িতে আমার ঘরের কোণে বেতের ঝোপে ডাহুক ডাহুকি, আরও কত রকম পাখির ঐকতান ভোরে আমার ঘুম ভাঙাত।

গ্রামের কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে বৃদ্ধ ঘোষাল মশায়কে। তিনি যখন মাথায় কলসী নিয়ে অপরূপ ভঙ্গিতে নাচতেন, তখন গ্রামের কত লোক এসেছে তা দেখবার জন্যে। এখনও লোকমুখে সে নাচের খবর শুনতে পাওয়া যায়।

অক্ষয় চক্রবর্তী মশাই চামর দুলিয়ে রামায়ণ গান করতেন। গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সব তন্ময় হয়ে বসে শুনত। রামের বীরত্বে কে না পুলকিত হয়েছে, লক্ষ্মণের কথায় কার না শরীরে রোমাঞ্চ দিয়েছে, সীতার দুঃখে কে না অভিভূত হয়েছে? কিন্তু আজ সে সব স্মৃতি!

আজকাল পঞ্চায়েত প্রথার কথা খুবই শুনছি। অথচ আমার গ্রামে এ সব সময়েই ছিল। আশপাশের কোনো গ্রামে বা কোনো লোকের সঙ্গে কারুর ঝগড়া-বিবাদ হলে

জমিদার বাড়ির পেয়াদা গিয়ে নিয়ে আসত তাদের খবর দিয়ে। গ্রামের প্রবীণ লোকদের ডাকা হত, জমিদার উপস্থিত থাকতেন, সূক্ষ্ম বিচার হত, উভয়েই খুশি মনে গল্প করতে করতে চলে যেত। এইভাবে কত লোক অযথা অর্থব্যয়ের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলত।

গ্রামের চতুষ্পার্শ্বে দু-তিন মাইলের মধ্যে ভাণ্ডার হাট, পোড়াদিয়ার হাট, নগরকান্দার হাট, ফলিখালির হাট আর আউরাকান্দির হাট—বর্ষাকালে দেখেছি কত লোক শত রকমের নৌকায় করে ছুটেছে লোক ছুটেছে কাতারে কাতারে হাটের দিকে। কারও মাথায় ধামার ভেতর কয়েকটি লাউ কিংবা কিছু বেগুন, না হয় ত অন্য কোন তরিতরকারি, কারও হাতে দুধের ভাঁড়। এরা সবাই আপন আপন ক্ষেত কিংবা বাড়ির জিনিস নিয়ে চলেছে হাটে। তারা ধানের দর, পাটের দর, ভাণ্ডার হাটে কয়খানা ধানের নৌকা এসেছে ইত্যাদি বলাবলি করতে করতে চলেছে।

জমিদার বাড়িতে পুণ্যা হবে। কাছারীঘর সাজানো হয়েছে। ভোর হতেই প্রজারা সব আসছে দুধ মিষ্টি আর টাকা নিয়ে। এদিকে আটটায় সর্দারী খেলা হবে, নামকরা সব সর্দাররা এসেছে। কে কত ভাল খেলা জানে আজ তার প্রমাণ হবে স্বয়ং জমিদারের সামনে। আফা সর্দার কলসীর উপর থালা উপুর করে বাজাতে আরম্ভ করেছে, আর আর সর্দাররা পা তুলে নেচে নেচে কত রকমের কায়দা দেখাচ্ছে। এসব দৃশ্য এখনও চোখে ভাসে।

**খালিয়া**

নদীর নাম কুমার, গাঁয়ের নাম খালিয়া। নামের মধ্যেই মূর্ত হয়ে রয়েছে নদীটির পরিচয়। কুমারের মতোই সংযত ও সাবলীল ছন্দে অবিরাম বয়ে চলেছে সে তার অনির্দেশ্য যাত্রায় মধুমতীর উদ্দেশে। তার যাত্রাপথের দু ধারে রেখে যায় সে তার অকৃপণ দাক্ষিণ্যের পরিচয়। তার অফুরান প্রাণ-বন্যার পরশে দু তীর ঘিরে সে গড়ে তুলেছে অপরূপ স্বপ্নদ্বীপ... ছোট ছোট গ্রাম। নদী আর খাল, শিমূল আর বকুল, বেত-বাতাবীর ঝোপ-ঝাড় আরও কত অজস্র নাম জানা না জানা গাছ-গাছালির সবুজে শ্যামলে ঘেরা আমার এই ছেড়ে আসা গ্রাম খালিয়া।

আজ থেকে প্রায় চার শ বছর পূর্বে এক অপরাহ্নবেলা প্রায় শেষ হয় হয়। গোধূলির অন্তিম রক্তরাগ ছড়িয়ে পড়েছে কুমার নদীর প্রশান্ত জলধারায়। এমনি সময়ে তার তীরে এক প্রাচীন অশ্বত্থমূলে গভীর চিন্তামগ্ন এক তরুণ বসে বসে ভাবছে তার অনাগত বিধিলিপি। তার প্রশস্ত ললাটে পড়েছে গভীর চিন্তার সুস্পষ্ট রেখা। অনির্দেশ্য পথের উদভ্রান্ত তরুণ যাত্রীর মনের একটি বন্ধ দুয়ার সহসা খুলে গেল। দূর প্রান্তরের পানে তাকিয়ে চেয়ে থেকে দুঃসাহসিক অভিযাত্রী স্বগতোক্তি করলে,—'ওই প্রান্তরই হবে আমার প্রাচীন অশ্বত্থের আশ্রয়।'

বাংলার ইতিহাসের পাদটিকায় এই তরুণ ব্রাহ্মণ রাজারাম রায় নামে পরিচিত। রাজারাম আপনার বাহুবলে কালক্রমে ফরিদপুর জেলার এই কুমার নদীর তীরবর্তী বিস্তৃত অঞ্চলে একাধিপত্য বিস্তার করে খালিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। ক্রমে ক্রমে

তাঁর পাতার কুটির রূপ নিল সাতমহলা প্রাসাদে। তাঁর সেই বিশালায়তন প্রাসাদের এক-চতুর্থাংশ মাত্র আজ বর্তমান।

রাজারাম শুধু নিজের প্রাসাদ তৈরি করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, যে সব কারিগর, মজুর ও শিল্পীর অক্লান্ত শ্রম ও মমতায় তাঁর প্রাসাদটি গড়ে উঠেছিল, রাজারাম তাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক, জমি, জায়গা প্রভৃতি দান করে নিজ গ্রামের পাশেই তাদের প্রতিষ্ঠিত করে দেন। এ ছাড়া রাজারাম তখনকার দিনে বিখ্যাত ব্রাহ্মণ বংশের সুসন্তানদের এনে নিজ গৃহের আশপাশে তাদের বাড়ি-ঘর নির্মাণ করে দেন। ধীরে ধীরে রাজারামের প্রাসাদটিকে ঘিরে গড়ে উঠল একখানি ঐশ্বর্যশালী ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম।

কালক্রমে রাজারামের জমিদারী ও প্রতাপ এত দূর বিস্তৃত হয়েছিল যে, তদানীন্তন মোগল সম্রাট রাজারামকে রায় চতুর্ধারী উপাধিতে অলংকৃত করেন। চতুর্ধারী শব্দের শব্দগত অর্থ হল যিনি চারিটি সেনাবাহিনীর অধিনায়ক। এই চতুর্ধারী শব্দই ক্রমে লোকমুখে রূপান্তরিত হয় চৌধুরীতে। কথিত আছে একবার বারভূঞাদের অন্যতম প্রধান সীতারাম রায় রাজারাম রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু দোর্দণ্ড প্রতাপ রাজারাম তাঁর অজেয় সেনাবাহিনীর সহায়তায় সীতারামকে পরাভূত করেন। এই অজেয় সেনাবাহিনীর অধিকাংশই ছিল নমঃশূদ্র প্রজাবৃন্দ। এরা একদিকে যেমন দুঃসাহসী ও দুর্দম, তেমনি সরল ও নম্র এদের প্রকৃতি। এরা প্রধানত জমির চাষ—আবাদ ও কুটির শিল্পের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত। অনেকে করত মাঝি-মজুরের কাজ। আবার এরাই ছিল তখনকার দিনে প্রতাপশালী ভূস্বামীদের মজুত জঙ্গীবাহিনী।

কালের আবর্তনে সেই রাজারামের আমল অতীত হয়ে গিয়েছে কবে। তবু অলিখিত ইতিবৃত্ত ভাস্বর আখরে লেখা রয়েছে গাঁয়ের মানুষের অন্তরের মণিকোঠায়। ছেলেবেলায় আমরা ঠাকুমা-দিদিমার মুখে রাজারাম রায়, জয়চন্দ্র রায়, তাঁদের পার্শ্বচর ভোলা বাগ্দী, রহিম শেখের রোমাঞ্চকর জীবন-কথা শুনে ভেবেছি—সত্যি কি তেমনি কাল কোনদিন ছিল, না এ সবই কাল্পনিক রূপকথার কোন অবাস্তব কাহিনী।

আড়াই শ বছরের বৃটিশ শাসন তার দুষ্টক্ষতের চিহ্ন যদিও রেখে গেছে পূর্ব বাংলার প্রতি পল্লীতে, তবু সে আমলেও গ্রামগুলো যে কিছুটা উন্নত ও আধুনিক হয়েছিল সেকথা অস্বীকার করব না। আমাদের খালিয়া গ্রামও কয়েকটি বিষয়ে আধুনিককালের সাথে তাল রেখে চলেছিল। আমাদেব বাড়ির পশ্চিমদিকে খালপাড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি ডাক ও টেলিগ্রাফ অফিস। আধুনিক সভ্যতার এক অমূল্য অবদান এই ডাক ও তার বিভাগ। সাত-সমুদ্র তের নদী পারের আপন মানুষের নিরালা মনের কথা তারা এনে পৌঁছে দিয়েছে গাঁয়ের মানুষের কাছে। রোজ সকালে দেখতাম আমাদের গাঁয়ে ডাক-পিওন জলধর তার সেই চিরপরিচিত জীর্ণ ছাতাটি মাথায় দিয়ে একটা হলদে ক্যাম্বিসের ব্যাগ কাঁধে করে যখন বাজার- খোলায় এসে হাজির হত তখন চারদিক থেকে গাঁয়ের লোকেরা তাকে অস্থির করে তুলত চিঠির তাগাদায়। যে বাষ্পীয় ইঞ্জিন একদিন সারা পাশ্চাত্ত্য জগতের অগ্রগমনে দিয়েছিল অবিস্মরণীয় গতিবেগ—যার ঢেউ-এর দোলায় টেমস্ নদীর উপকূল থেকে প্রশান্ত মহাসাগর অবধি চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তার ক্ষীণ রেশ আমাদের ওই আত্মভোলা কিশোর কুমাব নদীর প্রশান্ত বুকেও এসে লেগেছিল। তাই দেখে এক

সময় গাঁয়ের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বিস্ময়াম্বিত হত। সেই প্রথম বিস্ময়ের পর অনেক দিন অতীত হয়ে গেছে, এখন আর গাঁয়ের লোকেরা জাহাজ দেখে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে না।

কত তন্দ্রাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় আকাশে উড়ো জাহাজের ঝাঁক দেখে গাঁয়ের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মায়ের কোলে জড়সড় হয়ে ডাগর ডাগর চোখে দুটো তুলে বলত,—'মা! ওই বুঝি সেই পুরানকথার ব্যাঙমা পাখি?' গাঁয়ের শ্রীকণ্ঠ মুদী বলত, ও হল পুষ্পক রথ। কতদিন দেখেছি খালিয়া বাজারের পুলের কাছে শ্রীকণ্ঠ মুদীর সেই দোকানটা হয় ঠাকুরদার বক্তৃতায় সরগরম হয়ে উঠেছে। দেখেছি, হর ঠাকুরদা মাঝে মাঝে তাঁর হাত দুখানা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রাইচরণ, নিতাই, রসুল মিঞাদের বোঝাচ্ছে,—' বোঝলা কিনা রসুলভাই, সেই যে মহাভারতে ল্যাখছে পুষ্পক রথের কথা। হেই পুষ্পক রথই এহন উড়োহাঁস জাহাজ অইয়া আকাশে উইড়া বেড়ায়।' শ্রীকণ্ঠও ঠাকুরদার কাছ থেকেই শুনেছে পুষ্পক রথের কাহিনী। রসুল নিরক্ষর চাষি। সে মহাভারত পড়ে নি। তবু ঐ শ্রীকণ্ঠ মুদীর দোকানে বসেই সে মহাভারতের গল্প শুনেছে অনেকদিন। রসুল তার দাড়ির মধ্যে হাত বুলোতে বুলোতে বিজ্ঞের মতো কইত,—'তা কথাডা ঠাউরমশায় যা কইছ হেথা একালে মিথ্যা নয়।'

গ্রামের বাজারে প্রতি বৎসর মেলা বসত চার বার! একটি বারুণীর দিনে, একটি পয়লা বৈশাখে, রথের সময় দুর্দিন। পয়লা বৈশাখের মেলার নাম 'গলুয়ের মেলা'। এইদিন আগে কবিগান হত এবং অনেক দল পাল্লা দিয়ে গান করত। একবার একজন মেয়ে কবিওয়ালী প্রতিপক্ষকে বলেছিল—

'ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি কুনো,
মুখপোড়া গাবুর একটা বুনো
নচ্ছাব তোরে করবো তুলোধুনো।'
বলা বাহুল্য সকলের মতে তারই জিত হল।

আমাদের গাঁয়ের পূর্বপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত ছিল একটি প্রথম শ্রেণীর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়। রাজারামের নাম অনুসারেই গাঁয়ের লোকে তার নাম দিয়েছিল রাজারাম ইনস্টিটিউট। আশপাশের দু-দশখানা গাঁয়ের ছেলেরা এই শিক্ষায়তন থেকেই প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে দেশে-বিদেশে। তাদের মধ্যে অনেকে আজ সমগ্র দেশের বরেণ্য—সারা দেশের গৌরব। ভারতীয় জাতীয় মহাসভার সভাপতি দেশবরেণ্য অম্বিকা মজুমদার মশায়ও একদিন এই রাজারাম ইনস্টিটিউটের ছাত্র ছিলেন। বাংলার অন্যতম প্রসিদ্ধ সাধক কবি ও দার্শনিক কিরণচন্দ্র দরবেশও ছিলেন এই খালিয়া গ্রামেরই ছেলে। তিনিও ছিলেন একদিন এই রাজারাম ইনস্টিটিউটের ছাত্র। বর্ষাকালে যখন খালিয়ার পথঘাট নদীনালা একাকার হয়ে যেত তখন আমাদের বিদ্যালয় প্রাঙ্গণও জলে থই-থই করত। ছাত্ররা তখন দূরদূরান্ত থেকে নৌকা করে এসে স্কুলে পড়াশোনা করত। যাদের নৌকা থাকত না তাদের ডোঙায় অথবা কলাগাছের ভেলায় করে স্কুলে আসতে হত। গাঁয়ের ছেলেদের মধ্যে লেখাপড়া শেখার আগ্রহ যে কত প্রবল ছিল এ থেকেই তার কিছুটা বোঝা যায়। এই বিদ্যালয়টির পিছনে ছিল অনাড়ম্বর শিক্ষকদের অক্লান্ত পরিশ্রম

আর অকৃত্রিম অনুরাগ। কিন্তু আজ সে বিদ্যালয়টির চারদিক ঘিরে গুমরে উঠছে শুধু এক 'নাই নাই' রব। নাই সে সব নীরব দেশকর্মী শিক্ষকেরা—নাই সে সব দুষ্টুমি আর খুশিতে উজ্জ্বল কিশোর ছাত্রদের কলরব।

বিদ্যালয়টির পাশেই ছিল একটি সাধারণ গ্রন্থাগার। গাঁয়ের উৎসাহী তরুণ কর্মীরা এই গ্রন্থাগারটি গড়ে তুলেছিল।

স্বদেশী যুগে যেদিন বাংলার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি বেজে উঠেছিল পরাধীনতার শিকল ভাঙার ঝনঝনানি সেদিনও আমার এই ছেড়ে আসা গ্রামখানি সিংহের মতো অধীর হয়ে উঠেছিল শিকল ভাঙার উন্মাদনায়। বাবার কাছে শুনেছি কত নিস্তব্ধ অমারাত্রির অন্ধকারে খালিযার মুক্তিপাগল দুর্বিনীত তরুণদল তাদের স্বাধীনতার সাধনায় মগ্ন ছিল লোকচক্ষুর অগোচরে ঝোপ-জঙ্গল ঘেরা কালীমন্দিরের আঙিনায়! সেখানে চলত বিপ্লবীদের লাঠিখেলা, ছোরা-খেলা, বন্দুক চালনা, বোমা তৈরি আর চলত গভীর মন্ত্রণা কি করে বেনিয়া দস্যু শ্বেতাঙ্গদের হটিয়ে দেয়া যায় সাগরপারে। সারা ভারতের বিপ্লবী বীর বালেশ্বর সংগ্রামের প্রথম শহীদ কিশোর চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরীর সংগ্রামী জীবনের প্রথম অধ্যায় শুরু হয়েছিল এই খালিয়া গ্রামের ঝোপে-জঙ্গলে। যে স্বাধীনচেতা রাজারাম প্রাণের নিবিড় মমতায় গড়ে তুলেছিলেন এই খালিয়া গ্রাম— দেহের প্রতি রক্ত বিন্দু দিয়ে রক্ষা করেছিলেন তার স্বাধীনতা, বহু যুগান্তে তারই এক বংশধর তরুণ বিপ্লবী চিত্তপ্রিয় সারা ভারতের মুক্তির জন্যে বালেশ্বরের যজ্ঞভূমিতে নিজের অস্থিমজ্জা রক্তমাংস আহুতি দিয়ে পিতৃঋণ শোধ করে গেছে। জবাব দিয়েছে খালিয়া গ্রামের মুখপত্র সারা বাংলার হয়ে—সারা ভারতের পক্ষ থেকে উদ্ধত শ্বেতাঙ্গ শাসনের ও শোষণের প্রতিবাদে। সেই শহীদ-তীর্থ খালিয়া গ্রামের মানুষ আজ ভারত শাসকদের কাছে উদ্বাস্তু মাত্র—আর কিছু নয়। কী মর্মান্তিক পরিহাস!

আজ আমার ছেড়ে আসা গ্রামের কথা লিখতে বসে একটি দিনের কথা কেবলই মনে পড়ে। গ্রামে তখন শারদোৎসবের ধূমধাম। বহু দূরদেশ থেকে প্রবাসীরা সব গাঁয়ে ফিরে এসেছে মাটির মায়ের টানে। আমাদের গাঁয়ে প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই দুর্গোৎসব হয়ে থাকে। তাই পূজোর কটাদিন গাঁয়ের কারুরই থাকা-খাওয়ার কোন বিধিনিয়ম থাকে না। সব বাড়িতেই সকলের নিমন্ত্রণ। ফেরার দিন সকাল থেকেই সব জিনিসপত্র বাঁধাছাদা শুরু হয়ে যায়। বিকেলেই বাড়ি থেকে যাত্রা করতে হবে। দিনটা দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে গড়িয়ে গেল। বিকেলবেলায় দেখি রাজুদা বাইরের দাওয়ার বসে গুরুক্ গুরুক্ করে তামাক খাচ্ছে। মাথায় একটা লাল গামছা পাগড়ীর মতো করে বাঁধা। রাজুদা আমাদের নৌকার মাঝি। জাতে নমঃশূদ্র। আমাকে দেখেই রাজুদা বলে উঠল,—'কি ছোট-কর্তা, দেরি করতে আছো ক্যান্। হ্যাসে তো ইস্টিমার পাব না য়্যানে। হকাল হকাল বাইরাইয়া পড়।' বাড়ির দীঘির ঘাট থেকে নৌকা ছাড়ল যখন আমাদের তখন দিনের সূর্য ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যের কোলে ঢলে পড়েছে। নৌকা যখন খালের প্রান্তে সাধুর বটতলার পাশ দিয়ে কুমার নদীতে পড়ল তখন গোধূলির স্বর্ণরেণু ছড়িয়ে পড়েছে আমার ছেড়ে আসা গ্রামখানির ওপরে। আমার ভাইবোনেরা নৌকার ছইয়ের ওপর বসে দেখছে সেই অপরূপ বিলীয়মান ছবি। গাঁয়ের সীমানা ছেড়ে যতই দূরে চলে

আসছিলাম ততই আমার মন ব্যথাতুর হয়ে উঠছিল কী এক অনির্দেশ্য বেদনায়। চোখ দুটো হয়ে উঠছিল অশ্রু ছলছল। কী যেন নেই! কী যেন হারিয়েছি, কাকে যেন চাই, কাকে যেন আর পাব না—এমনি এক অসহায় মর্মরাঙা বেদনা আমার বুকের মধ্যে গুমরে উঠছিল। সেই অব্যক্ত বেদনার মূল আমি নিজেই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। শুধু অজ্ঞাতে অস্ফুটে কখন বলে চলেছিলাম—

'মাতৃভূমি স্বর্গ নহে সে যে মাতৃভূমি,
তাই তার চক্ষে বহে অশ্রুজলধারা
যদি দুদিনের পরে
কেহ তারে ছেড়ে যায় দু দণ্ডের তরে।'

গ্রাম ছেড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছে পল্লীকবির রচিত একটি গান। লক্ষ্মণের শক্তিশেলে শ্রীরামচন্দ্র ক্ষেদোক্তি করে বলছেন—

'সুমিত্রা মা বলবে যখন,
রাম এলি তুই কইরে লক্ষ্মণ—
(আমি) কোন্ প্রাণ ধরে বলব তখন :
মাগো, তোমার লক্ষ্মণ বেঁচে নাই।'

দেশজোড়া লক্ষ্মণের দল আজ শক্তিশেলে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কবে তাদের সবার মূর্ছা ভাঙবে সে আশায় দিন গুণছি।

**চৌদ্দরশি**

রবীন্দ্রনাথ মানুষের মধ্যে বাঁচতে চেয়েছিলেন এবং মানুষের মধ্যে বাঁচবার জন্যে প্রেরণার বাণীও দিয়ে গেছেন আমাদের। কিন্তু আমরা মানুষের কাছ থেকে নির্বাসিত হলাম, তাদের মধ্যে ঠাই ত পেলাম না! যেখানে আজীবন কাটালাম সেখানে আমাদের আর কোন স্থান নেই আজ। কীর্তিনাশাও যেখানে তার স্বভাবগুণে আমাদের বসবাসের জন্যে 'চৌদ্দরশি' জায়গাটি সৃষ্টি করল, সেখানে হিংস্র মানুষ আমাদের থাকতে না দিয়ে তার কুটিল অনুদার মনোভাবেরই পরিচয় দিয়েছে। কালবৈশাখীর হঠাৎ ঝড়ের তাণ্ডবে আমরা শীতের ঝরাপতার মতো উড়ে গেলাম নিজের দেশ থেকে। এ ঝড় কোথা থেকে এল? কার অদৃশ্য কারসাজিতে আমাদের 'বাস্তুভিটে' ছেড়ে আসতে হয়েছে? সমস্ত কিছু থাকা সত্ত্বেও কেন আজ আমরা 'উদ্বাস্তু' নামে চিহ্নিত হচ্ছি? একেই হয়ত অদৃষ্টের পরিহাস বলে! অঘটনপটন পাটোয়ারের দল যে তাণ্ডব সৃষ্টি করেছে তার 'বলি' আমরাই হলাম ভেবে মাঝে মাঝে চোখ জলে ঝাপসা হয়ে আসে।

আমাদের গ্রামের নাম চৌদ্দরশি। গ্রাম ছেড়ে এসেছি বটে, কিন্তু তার স্মৃতি ভুলতে পারছি কই? যেখানকার বাতাসে আমার সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না মিশে রয়েছে তাকে এক কথায় মনের মণিকোঠা থেকে ঝেড়ে ফেলি কেমন করে? দৈহিক অপসরণ সম্ভব হলেও কল্পনার অশ্বমেঘ ঘোড়াকে আটকাব কোন্ যাদু মন্ত্রে? এখনও অসতর্ক মুহূর্তে গ্রামের নদীর ধারের, বাবুদের ডাক্তারখানার, স্কুলের মাঠের, বাগানবাড়ির স্মৃতি রোমন্থনে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। চৌদ্দরশি কি আজও প্রাণমাতানো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সকলকে আকর্ষণ করছে?

ফরিদপুর শহর থেকে চৌদ্দরশির দূরত্ব মাত্র পনের মাইল। বর্ষাকালে টেপাখোলা হয়ে নৌকায় যেতে হয়, অন্য সময় মোটরে। ফরিদপুর জেলায় সকলেই আমাদের গ্রামের নাম জানেন। জিজ্ঞাসা করলে সকলেই রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারেন, যদিও মূল চৌদ্দরশি বলে কোনো নির্দিষ্ট গ্রামই নেই। পূর্বে স্থানটির বুকের উপর দিয়ে বয়ে যেত কীর্তিনাশা পদ্মানদী। অকস্মাৎ তার গতিপথ বিপরীতগামী হওয়ায় তার বুকে প্রকাণ্ড চর জেগে ওঠে। যেখানে যখন চর জাগত জমিদারের লোক এসে মাপামাপি করত রশির ক্রমিক সংখ্যায়। এই চরগুলোই গ্রামের ভূমিকা। গ্রাম গড়ে ওঠে কীর্তিনাশায় আনুকূল্যে, কিন্তু গ্রামের নাম থেকে যায় রশিমাপের সংখ্যাতত্ত্বের ওপরেই। এমনিভাবে পত্তন হয়েছে বাইশরশি, সাতরশি, নয়রশি ইত্যাদি নানা গ্রামের, আর এইসব গ্রামের সমষ্টিই শেষ পর্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেছে চৌদ্দরশি ডাকনামে।

চৌদ্দরশি গ্রামের সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছে গ্রামের জমিদারবাবুদের কথা। 'জমিদার' নামটির মধ্যে যে ভয়াবহতার চিহ্ন থাকে তা এঁদের মধ্যে ছিল না। এ জমিদারেরা অমায়িক। ফরিদপুর, বরিশাল, পাবনা জেলায় এঁদের বিরাট জমিদারি—এমন প্রতিপত্তিশীল জমিদার পূর্ববঙ্গে খুব কমই ছিল। তিন শরিকের জমিদারি, তিন ভাইয়ের তিন হিস্যে। তিনজনের বাড়ি, মন্দির, বাগান, দীঘি নিয়ে যেন তিনটি শহর। আমলা-কর্মচারী, পাইক- পেয়াদা, সেপাই, মোসায়েবের দল গিস্‌গিস্‌ করত। বাবুরা পায়ে হেঁটে কোথাও বেরুতেন না, তাঁদের প্রত্যেকের ছিল সুসজ্জিত পাল্কী। পাল্কী-বেহারাদের 'হেঁইও হো— হেঁইও হো'র একটানা শব্দ শুনেই বোঝা যেত কোনো জমিদারবাবু আসছেন। পাল্কীর সামনে পেছনে চলত বন্দুকধারী সেপাই। মনে পড়ছে বাবুদের দেখবার জন্যে গ্রামের ছেলে-বুড়ো এসে জুটত রাস্তার দু-পাশে। সে জনতায় হিন্দু-মুসলমান পৃথক হয়ে থাকত না,—গা ঘেঁষাঘেঁষি করে সবাই উঁকি দিত পাল্কীর দরজায়। দেড়মাইল দূরে গ্রাম্যনদী ভুবনেশ্বরী। নদী চলার পথে জমা থাকত বাবুদের বড় বড় বজরা। আয়তনে ছিল মোটরলঞ্চের চেয়েও বড়। ত্রিশ-চল্লিশ জন মাঝিমাল্লা ছাড়া এ বজরা চালানো সম্ভবপর হত না। মাঝিমাল্লারা ছিল প্রায় সকলেই মুসলমান। হিন্দু-জমিদারের সুখ-সুবিধের জন্যে তারা একদিন প্রাণ পর্যন্ত তুচ্ছ করতে পারত। গ্রাহ্যই করত না হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদের জিগীরকে। বাবুদের পেয়াদাও ছিল সকলেই মুসলমান—তাদের লাঠি সড়কির ওপরেই নির্ভর করত বাবুদের মানসম্ভ্রম, প্রতিপত্তি। সেখানে কোনদিন ত ভেদাভেদ দেখি নি। এক হিন্দু জমিদারের মুসলমান লাঠিয়ালরা বাবুর সম্মান রক্ষার জন্যে অন্য জমিদারদের মুসলমান লাঠিয়ালের মাথা চূর্ণ করে এসেছে দ্বিধাহীন চিত্তে! ঠিক এর উল্টোটাও হয়েছে। তখন মানুষ ছিল বড়। ধর্মের বিকৃতরূপ মানুষের মাথা খারাপ করতে পারে নি। মুসলমান পরিবারের সাহায্যার্থে কত হিন্দুকে নিঃস্বার্থভাবে দান করতে দেখেছি। বয়োজ্যেষ্ঠদের মুখে গরুর গাড়ি বোঝাই করে টাকা পয়সা আনার গল্প শুনেছি। জমিদাররা ছিলেন এমনি ধণী। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে বহাল করতেন কর্মচারী। তাঁদের কাছে ধর্ম বড় ছিল না, বড় ছিল কর্মঠ লোকের অকৃত্রিম পরিশ্রম মুসলমানরাও বুঝত সে কথা, তাই তাদের কাজে কোথাও

ফাঁকি থাকত না। বড় হিস্যের রায় বাহাদুর মহেন্দ্রনারায়ণ, মেজ হিস্যের রমেশচন্দ্র ও ছোট হিস্যের দক্ষিণারঞ্জন ছিলেন প্রসিদ্ধ। তাঁদের জমিদারি তদারকের জন্যে থাকত তিনজন অবসরপ্রাপ্ত জজ বা ম্যাজিস্ট্রেট।

হিন্দু হলেও তিন শরিকের মধ্যে কখনও কখনও বিবাদ বাধত, কিন্তু সে কলহের ফল সাধারণত হত শুভই। জনসাধারণ তাঁদের কলহমন্থন করে লাভ করত অমৃত। বড়বাবু নিজের সুনামবৃদ্ধির জন্যে যেই দুটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন, মেজবাবু তার পাল্টা জবাব দিলেন ফরিদপুরে রাজেন্দ্র কলেজ বসিয়ে। ছোটবাবু চুপ করে থাকতে পারেন না। তিনি ফরিদপুরে উদ্বোধন করলেন সিনেমা হাউসের। এমনিভাবে সুস্থ প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে জনগণ পেল হাই স্কুল, হাসপাতাল, কলেজ ইত্যাদি। এগুলো থেকে সুযোগ-সুবিধে পেত গ্রামবাসীরাই—হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃস্টানের গণ্ডি টেনে কোনদিন এসব প্রতিষ্ঠানকে খাট করা হয় নি। আজ আর সেদিন নেই।

গ্রামে দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করেই সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা হত। সবচেয়ে ধুম হত জমিদারবাড়িতে। গ্রামবাসীরা যে যেখানেই থাক, এসে জমায়েত হত এই সময়টিতে। কয়েকদিনের জন্যে গ্রামের বুকে অপূর্ব হিল্লোল জাগত যেন পূজোর তোড়জোড় চলত একমাস আগে থেকে। এই উপলক্ষে ময়দান ভরে যেত রকমারি দোকানপাতিতে, কার্নিভাল ও সার্কাসে। আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে ভরে যেত দেশ। এই আনন্দের পূর্ণাহুতি হত তখন যখন কলকাতা থেকে আসত নামকরা যাত্রার দল। আজ আর যাত্রাগানের আদর নেই তার এই উৎসভূমি কলকাতায় কিন্তু মনে পড়ে দেশে আমরা যাত্রা শোনবার জন্যে কত রাত্রি পর্যন্ত উৎসুক হয়ে কাটিয়েছি। কত রাত্রি অনিদ্রায় কেটে গেছে কোন দল আসছে তারই জল্পনা-কল্পনায়! কোন দলের কোন অভিনেতা অন্যদলের চেয়ে ভাল তা নিয়ে হাতাহাতি পর্যন্ত হয়ে গেছে ভেবে আজ এত দুঃখের মধ্যেও হাসি আসে! যাত্রাগান শোনার জন্যে শ্রোতারা আসত দূরান্তের গ্রাম থেকে। বিদেশ থেকে আসত আত্মীয় পরিজনবর্গ। অপূর্ব আনন্দ কোলাহলে দিনগুলো কোথা দিয়ে যে চলে যেত বোঝাই যেত না। টনক নড়ত গ্রাম ছাড়বার সময়। সাময়িকভাবে গ্রাম ছাড়তেও যাদের চোখে জল আসত সেদিন, আজ তারা চিরতরে কি করে গ্রাম ছেড়ে দিন কাটাচ্ছে?

মনে পড়ে বাড়ির বাঁধানো পুকুরঘাটে, বাগানের মধ্যে কত আশাময় ভবিষ্যৎ-সুখস্বপ্নের কথা হয়েছে। পূজোর এক সপ্তাহ আগে থেকে রাতের পর রাত জেগে হয়েছে গান শোনা এবং গান গাওয়ার তীব্র প্রতিযোগিতা। নবমীর মোষ বলি দেখে কত ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ভয় পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কোলে চোখ বুঁজে রয়েছে। পশু-রক্ত দেখে মুসলমানকে আতঙ্কিত হতে দেখেছি সেদিন। কিন্তু আজ কাদের প্ররোচনায় মানুষের রক্তও মানুষের মনে বিতৃষ্ণা আনতে পারছে না? অসভ্য পার্বত্য জাতির মধ্যে আজও নরবলি হয়ে থাকে শুনি। কিন্তু বাংলা তথা ভারতবর্ষের বুকের ওপর দিয়ে এই যে নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়ে গেল, তা যেন সেই সব বর্বর জাতিকেও লজ্জা দেয়!

আমাদের স্কুলটি ছিল বড় চমৎকার। সামনে খোলা মাঠ, পেছনে শ্রেণীবদ্ধ

আমবাগান। মাঝখানে বাঁধানো পুকুর। ছবির মতো পরিবেশ। আমাদের মাস্টারমশায় সুরেশবাবু ছিলেন সেই স্কুলের প্রাণ। পড়াশুনায়, খেলাধূলায় তিনি অনুপস্থিত থাকলে পণ্ড হয়ে যেত সব কিছুই। আজ বহু কর্মিপুরুষের সান্নিধ্যে এসেও তাঁর কর্মনিষ্ঠার মনোমুগ্ধকর ছবি বড় হয়ে চোখের সামনে ভাসছে দিনরাত। তাঁরই উৎসাহে আমাদের "Rashi's Eleven-Football Club"-এর জন্ম হয়েছিল! ফুটবল খেলার জন্যে আমরা তখন পাগল,—ফুটবলের জন্যে রাজ্যপাট বিলিয়ে দিতেও তখন আমরা পিছপা নই! রাম, মালী, লক্ষ্মণ, বিশু, ব্রজা, নৃপেন আর সুরেশবাবুকে নিয়ে আমরা পনের-বিশ মাইল পথ পাড়ি জমাতাম ম্যাচ খেলার জন্যে। কোন বাধাই আমাদের আটকে রাখতে পারত না।

ডাক্তারখানার পুকুরঘাটে ছিল আমাদের আড্ডাখানা। বিকেল হতে না হতেই এসে জমায়েত হতাম সেখানে। জার্মানীর ফ্যাসিবাদ নিয়ে, চার্চিলের ইম্পিরিয়ালিজম নিয়ে, আমেরিকার অ্যাটম বম নিয়ে, আজাদ হিন্দু ফৌজের সৈন্য নিয়ে আমাদের তর্কের শেষ থাকত না। এ আড্ডায় হিন্দু-মুসলমানেব অবাধ যাতায়াত ছিল। শান্তির সপক্ষে উভয় সম্প্রদায়ই ছিল সমান উৎসুক। কিন্তু শান্তির জন্যে যে সব যুক্তিজালের অবতারণা হত সেদিন, আজ আঘাত খেয়ে বুঝেছি তা ছিল ভুয়ো! মুখে শান্তির বুলি আউড়ে মনে সংগ্রামের বিষ জিইয়ে রেখে মানুষ আর যাই করুক দেশের দশের মঙ্গল সাধন করতে পারবে না কোনদিন। মানবতাবোধের অপমান সমগ্র মানবজাতিকেই হাড়ে হাড়ে পঙ্গু করে দেবে একদিন।

চৌদ্দরশির বাজার আমাদের তল্লাটের নাম করা বাজার। মঙ্গলবার ও শনিবারে হাট বসার জন্যে বহু দূর গ্রামাঞ্চল থেকেও লোক আসত বেচাকেনার জন্যে। ধান, চাল, পাট, দুধ, মাছ, তরিতরকারির রাশি রাশি অস্পষ্ট ছবি আজ মনে পড়লে স্বপ্ন বলে ভুল হয়। অল্প মূল্যে বেশি জিনিস এখানে কোথায় পাওয়া যাবে বলুন? দুধ বা মাছ কোনদিন আমাদের গ্রামে সের হিসেবে বিক্রি হয়নি! খুব মাগ্‌গি বাজারেও চার আনায় আড়াই সের খাঁটি দুধের হাঁড়ি কিনেছি। তরিতরকারি ত নাম মাত্র মূল্য।

বুধাই শীলকে মনে পড়ে। বুদ্ধিদা বলে আমরা ডাকতাম তাঁকে। সংগীতবিদ্যায় তাঁর কৃতিত্ব স্মরণযোগ্য। তবলা, হারমোনিয়াম. সেতার যন্ত্রে তাঁর হাত ছিল অসাধারণ। তাঁর আঙুলের স্পর্শ পেয়ে বাদ্যযন্ত্রগুলো যেন কথা বলে উঠেছে। আমরা ছিলাম তাঁর বাজনার নিয়মিত শ্রোতা। বাবুদের বাড়িতে গানবাজনার আসর বসলেই বুদ্ধিদার ডাক পড়ত সকলের আগে। ওঁদের বাড়িতে শিক্ষকতা করে তাঁর সংসার নির্বাহ হত। আজ বুদ্ধিদা কোথায়? সংহারের উন্মত্ত পরিবেশের মধ্যে সংগীতের সৃজনী প্রতিভা কোন নিরাপদ দূরত্বে তাঁকে নিয়ে যেতে পেরেছে কিনা জানিনা! দূরে গিয়েও তিনি বেঁচে আছেন কিনা তাই বা কে বলে দেবে?

ডাক্তারখানার পুকুরে আজ আর লোকসমাগম হয় না শুনেছি। স্কুলের মাঠের আর সে পরিবেশ নেই, সুরেশবাবুও অন্য কোথাও পলাতক, পূজাবকাশে জনতার ভিড় নেই, জমিদারবাড়িতেও পুজো বন্ধ। সব আনন্দ কে যেন একসঙ্গে অপহরণ করে নিয়ে এক অভিশপ্ত ভূমিতে রূপান্তরিত করে দিয়েছে সমস্ত দেশটিকে। আমরা আজ আপন ঘরেই তাই পরবাসী।

## খাসকান্দি

অনেকদিন আগেকার কথা।

চাকরি উপলক্ষে কিছুদিন ছিলাম আসামের এক মহকুমা-শহরে। আত্মীয়-স্বজনবিহীন প্রবাসজীবনে তখন আসন্ন ছুটির মধুর আমেজ।

সকালে সবে ঘুম থেকে উঠেছি। এমনসময় দেখা দিলেন এক নব-পরিচিত বন্ধু। তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুতে উঠলাম। দেয়ালে পেরেক ঠুকে সাজানো ছিল একগাদা টুকরা কাগজ। তাতে টুথ-পাউডার ঢেলে নেওয়া রোজকার অভ্যাস। সেদিনও ছিঁড়ে নিলাম এক টুকরো কাগজ। আপন মনেই বললামঃ আর একুশ দিন।

বন্ধু শুধালেনঃ কিসের একুশ দিন?

হেসে বললাম? ছুটির বাকি।

পেরেক ঠোকা কাগজগুলোর দিকে চেয়ে বন্ধু শুধোলেনঃ তাই কি ওতে লিখে রেখেছেন একুশ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। শুধু একুশ নয়, পর পর লেখা আছে এক পর্যন্ত।

বন্ধু বিস্মিত হলেনঃ কেন বলুন ত?

কারণ একটা দিন যায় আর ভেবে আনন্দ পাই যে, ছুটিটা আরও একটা দিন এগিয়ে এল।

ওঃ, ছুটিতে বাড়ি যাবার জন্যে আপনি ত একেবারে পাগল দেখছি!

সবিনয়ে জবাব দিলাম ঃ শুধু বাড়ি যাবার জন্যে নয়, পাগল হয়ে আছি গাঁয়ে যাবার জন্যে।

বলেন কী, এই বয়সেও গাঁয়ের জন্যে আপনার এত মমতা? গাঁয়ের মাটির জন্যে এত তীব্র আকর্ষণ!

নিশ্চয়ই! তাই ত কবি দেবেন সেন বলেছেন—

'সর্বতীর্থ সার
তাই মা তোমার কাছে এসেছি আবার।'

আরও অনেক কথাই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সেদিন বলেছিলাম। বন্ধু একটুখানি হেসেছিলেন মাত্র।

আমিও হেসেছিলাম সেদিন রাতে। জাগরণে নয়, স্বপ্নে।

ধূলো-ঢাকা যশোর রোডের বুকে নেমেছে বৈশাখী পূর্ণিমার উজ্জ্বল জ্যোস্না। পথের দুধারে অর্জুন গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে নিস্তব্ধ প্রহরীর মতো। আলো-ছায়ার আলপনা আঁকা পড়েছে ধূলোর রাস্তায়।

ওইত দেখা যায় বাঁশতলার পুল। বর্ষার খরস্রোত কুমারের উদ্ধত জলধারা যখন ওই সঙ্কীর্ণ পুলের সঙ্কীর্ণতর ছিদ্রপথে পথ খুঁজে মাথা আছড়াত অবিশ্রাম, পুলের মুখে তখন প্রতি বৎসর সৃষ্টি হত একটা তীব্র ঘূর্ণাবর্ত। ছেলেবেলায় আমরা ওকে বলতাম 'বাটি'। ক্ষুধার্ত কুমার-নন্দন যেন মুখর মুখব্যাদন করে আছে তীব্র আক্রোশে। ছেলেবেলায় আমরা পুলের উপর থেকে ওর ক্ষুধার্ত মুখে ফেলে দিতাম কচুর পাতা, বটের ছোট ডাল, ভাঁট ফুল, আরও কত কি। সেগুলো স্রোতের মুখে দু-তিনটে পাক

খেয়ে ঘূর্ণাবর্তের অতল গহ্বরে যেত তলিয়ে। আমরা উচ্ছ্বসিত আনন্দে হেসে উঠতাম করতালি দিয়ে। ঘটনার ক্ষুরধার ঘূর্ণাবর্তে আজও অতলে তলিয়ে যাচ্ছে জীবনের আশা, আনন্দ, করতালি। কিন্তু আজ আর হাসবার অবসর নেই। আজ শুধু ক্রন্দন। কুমার, পদ্মা, মেঘনার তীরে তীরে শুধুই মর্মভেদী হাহাকার।

কিন্তু যে কথা বলছিলাম।

ওই বাঁশতলার পুলের পাশ দিয়ে জেলা বোর্ডের ছোট রাস্তা। দুপাশ ধরে ছোট ছোট খেঁজুর গাছের সারি। ধানের ক্ষেত। দিগন্তবিস্তৃত গজারের বিলের রহস্যময় হাতছানি।

রাস্তা ধরে আরও খানিকটা এগিয়ে গেলেই ছোট কাঠের একটা পুল। মস্ত বড় একটা তেঁতুল গাছের ছায়া দিয়ে ঘেরা। পুলের দু পাশ দিয়ে কাঠের রেলিং। সকাল-সন্ধ্যায়, সময়ে-অসময়ে গ্রামের ছেলে-বুড়ো সকলের ওটা বেওয়ারিশ আড্ডার জায়গা। বর্ষায় ওর আশপাশে ছোট ছোট ছিপ দিয়ে মাছ ধরে ছোট ছোট ছেলেরা। বসন্ত সন্ধ্যায় ওই রেলিংয়ে ভর দিয়ে গলা ছেড়ে গান গায় কিশোর বালকের দল। যুবকদের আড্ডা-ইয়ার্কি চলে রাতের প্রথম প্রহর পর্যন্ত। ক্রমে রাত বাড়তে তাকে। ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা ডাকে মন্থর হয়ে আসে পল্লীর আকাশ। বৃদ্ধেরা তখন ওই পুলে জমায়েত হয় সমাজ পঞ্চায়েতের ভূমিকা নিয়ে। ন্যায় ও অন্যায় শাসনের রকমারি ফতোয়া জারি করে। পুলের নিচে খালের জলধারা কুলকুল রবে বয়ে চলে।

এই ত পৌঁছে গেলাম গাঁয়ে।

গ্রাম, কিন্তু ম্যালেরিয়া-বিধ্বস্ত, নিরানন্দ, কুঁড়েঘর সম্বল কতকগুলো জীর্ণ শীর্ণ স্বপ্নহীন মানুষের বাসভূমি নয়। ঝকঝকে টিনের দু-তিন মহলা বাড়ি, আম-জাম-নারকেল-সুপারি-কাঠালের বাগান, তাল-খেজুর গাছের গুঁড়ি দিয়ে ঘাট বাঁধানো কাকচক্ষু জলভরা পুকুর, ত্রিনাথ-বাউল-হরিকীর্তন-যাত্রাদলের আনন্দধ্বনি মুখরিত প্রাঙ্গণ, আর পর্যাপ্ত আহার-নিদ্রা-লালিত তৈলচিক্কণ মানুষ-এই নিয়ে গড়া একটি মানববসতি। এই বাংলার গ্রাম। তোমার আমার সকলের। হায়রে সেদিন।

গ্রামে ঢুকতেই বাঁদিকে আগাছায় ঢাকা একটি পড়ো ভিটে। গ্রামের ছেলে-বুড়ো যাকেই পরিচয় জিজ্ঞাসা কর, বলবে-হরিকাকার ভিটে।

ক্ষণেকের তরে সময়ের নদীতে লাগুক উজানের টান। ফিরে চল কুড়ি বছর আগেকার এক মধুর চৈত্র সন্ধ্যায়।

হরিকাকার বাড়ি। সামনে আমগাছে ঘেরা বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের এক পাশে চৈত্রপুজোর আসন পাতা।

দাওয়ায় বসে আছেন হরিকাকা। গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের সরকারী কাকা। একহারা কালো চেহারা, করিৎকর্মা লোক। গ্রামের যাত্রাদলে পার্ট করেন। অর্জুনের ভূমিকা থেকে ঘেসড়ার ঘুঙুর-নৃত্য অবধি সব অভিনয়ে তিনি সমান দক্ষ।

হরিকাকা এবার জুড়ে দিয়েছেন চৈত্রপুজোর মেলা।

বিকেল হতেই গাঁয়ের সৌখীন ছেলে-বুড়োর দল একে একে জমতে লাগল কাকার আঙিনায়। আমগাছের তলায় কলার পাতা পেতে সবাই এক সাথে পেল খিচুড়ি প্রসাদ। তারপর সন্ধ্যার পর থেকে শুরু হল সঙ নিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ। কেউ সাজল লোলজিহ্ব

খড়্গহস্ত মহাকালী, কেউ বা বাঁশরী-ভূষণ শ্রীনন্দ নন্দন, কেউ ত্রিশূলধারী শ্মশানচারী ভোলানাথ, আবার কেউ বা নৃত্যপরায়ণা সুন্দরী উর্বশী।

সারা রাত ধরে চলে গৃহ হতে গৃহান্তরে সঙ নিয়ে পল্লী পরিক্রমা। পল্লীবাসীরা পরম আগ্রহে সঙের দলকে বাড়িতে ডেকে নেয়। গান শোনে। নাচ দেখে। সাধ্যমতো 'বিদায়ী' দেয় চাল ডাল পয়সা। দেখতে দেখতে সঙের দলের ভাণ্ডারীর ঝুলি ভরে ওঠে। কালের কুটিল গতি। সেই পল্লীবাসীরা আজ কোথায়?

অতএব ওপথ ছেড়ে চল যাই গ্রামের 'তরুণ পাঠাগারে'। ও পাড়ার মুখুজ্জেদের কাছারী বাড়িতে গাঁয়ের ছেলেদের নিজের হাতে গড়া পাবলিক লাইব্রেরী। অনেক রকম বই ওখানে পাবে। গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা' থেকে পাঁচকড়ি দের 'নীলবসনা সুন্দরী' পর্যন্ত। পড়তে পড়তে সবুজ সঙ্ঘের মুখপত্র হাতে লেখা মাসিক পত্রিকা 'তরুণ'এর কয়েকটি পুরনো সংখ্যাও হয়ত পেয়ে যাবে। তাতে কত সম্ভব অসম্ভব ধরনের লেখার সন্ধান পাবে তা তুমি কল্পনাও করতে পার না। দেশ-উদ্ধারের এক বিষম জ্বালাময়ী পরিকল্পনার যে আভাস ওতে প্রকাশিত হয়েছিল তার সন্ধানে একদিন পরম পরাক্রমশালী বৃটিশ শক্তির পর্যন্ত টনক নড়ে উঠেছিল। হাসবার কথা নয়। সত্যি, ওই পাঠাগারে অনেকবার পুলিশ সার্চ করেছে। কিন্তু সার্চের দিন আজ গত হয়েছে। ওই পাঠাগারের পাশের রাস্তা দিয়ে এখন 'মার্চ' করে চলেছে নতুন কালের পুলিশ। জানি না সে মার্চ কোন 'ফার্স' হয়ে দাঁড়াবে কিনা। সেখানকার! একালের অধিবাসীরা আজ গৃহহারা বাস্তুত্যাগী। তাদের হাতে ভিক্ষার ঝুলি।

কিন্তু গ্রাম পরিক্রমার এখনও অনেক বাকি। হরিকাকার বাড়ি বাঁয়ে রেখে, ডাইনে ফেলে অশ্বত্থ-গজানো উঁচু দোল-মঞ্চ - চল আরও এগিয়ে!

উলুধ্বনি শুনতে পাচ্ছ? বেলা এখন দুপুর। গাঁয়ের কোন সম্ভ্রান্ত সীমন্তিনী বুঝি 'দুধ-চিনি' দিতে এসেছে পূজোমণ্ডপে। কবে হয়ত ছেলের জ্বর হয়েছিল গরম লেগে। স্নেহময়ী মাতা মানত করেছিল পুত্রের রোগমুক্তি হলে পূজো মণ্ডপে দেবীর আসনে দেবে 'দুধ-চিনি'। ও তারই কণ্ঠের উলুধ্বনি। তুমি যদি এখন সেখানে উপনীত হও, তাহলেও প্রসাদ পাবে একটু চিনি বা এক টুকরো বাতাসা। পল্লীর দেবসেবার সঙ্গে মানব-সেবার যোগ অঙ্গাঙ্গী।

ওই পূজোমণ্ডপে এ গাঁয়ের 'টাউন হল', আশপাশের পাঁচ গাঁয়ের ফৌজদারী-দেওয়ানী আদালত। বছরে একবার এখানে হয় মহিষমর্দিনী দুর্গাপুজো। গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো সকলের মন পূজোর তিনদিন বাঁধা থাকে এই মণ্ডপের চতুঃসীমানায়। গান বল, বাজনা বল, আনন্দ বল, উৎসব বল,—সারা গাঁয়ের উচ্ছ্বসিত আনন্দ-ধারা ওকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। ওই পূজোমণ্ডপ গ্রামের প্রাণকেন্দ্র। সন্ধ্যায় ওখানে গ্রামবৃদ্ধ সমাজপতিদের সভা বসে। কত আলাপ-আলোচনা, বিচারদণ্ড চলে। প্রতি রবিবারে বসে হরি-সংকীর্তনের আসর। কলিযুগের মুক্তিমন্ত্র হরিনাম আর মৃদঙ্গের বোলে নৈশ পল্লীর তারাভরা আকাশ মুখর হয়ে ওঠে। হায় রে! বাংলার সে-আকাশ জুড়ে আজ সর্বহারা আর্তনাদ, মৃত্যুর বীভৎস হাহাকার।

ওই পথ ধরে আরও খানিকটা এগিয়ে গেলেই দেখতে পাবে টিনের আটচালায় বসেছে পাঠশালা। কানাই মাস্টার আর রজব মৌলবীর শিক্ষাদান চলেছে অব্যাহত গতিতে। পাঠশালার সামনে দেখবে, ছেলেরা সার ধরে দাঁড়িয়ে নামতা পড়ছে সমবেত কণ্ঠে—দুই একে দুই, দুই দুগুণে চার ইত্যাদি।

তাই বলে এই ভরা দুপুর বেলা ও পথ ধরে আর যেও না কিন্তু। জান না ত আর কিছুটা এগিয়েই পথ শেষ হয়েছে পুরনো কালীখোলায়। বেতের ঝোপ আর ভাটির জঙ্গল দিয়ে ঘেরা সামান্য একটু জায়গা। দুটো প্রাচীন বট গাছ শাখা-প্রশাখা মেলে জায়গাটাকে একেবারে ঢেকে রেখেছে। তারি একপাশে খড়ের ভাঙা মন্দিরে বিকটদর্শন বিরাট কালীমূর্তি। উইয়ের ঢিপিতে ঢেকে গেছে পদতলে শায়িত মহাদেবের অর্ধেক দেহ। কাটা-কুমড়োর লতা এসে ঘিরে ধরেছে কালীমূর্তির রূপালী মুকুট। এক পাশে হয়ত আস্তানা গেড়েছে শেয়াল। ও নাকি মা কালীর জাগ্রত রক্ষী। তোমাকে দেখে যদি হঠাৎ ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ করে চেঁচিয়ে ওঠে, তবে আর রক্ষা নেই। মা কালীর তৃতীয় নয়ন নাকি তাহলে বিদ্যুৎ চমকের মতো একবার তোমার উপর দিয়ে খেলে যাবে। আর অমনি তুমি বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে—

আর কোথায় যাও? এই ত গ্রামের শেষ। ওই ত সামনে ধূ-ধূ করছে চম্পার বিল। তার থৈ-থৈ করা কালো জলে লাল পদ্মফুলের আলো করা শোভা। সেই পদ্মফুল একদিন দিয়েছিলাম কিশোর বেলায় বন্ধুর হাতে অনুরাগের লীলা-কমল করে। ফুল পেয়ে কিশোর বন্ধু উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রণাম করেছিল। তার ছেলেমানুষিতে আমি হেসে উঠেছিলাম অট্টহাসি।

সেই হাসি হেসেছিলাম আর একদিন আসামের এক মহকুমা শহরে। জাগরণে নয়, নীল-কমলের স্বপ্ন দেখে।

কিন্তু যে স্বপ্ন এতক্ষণ তোমায় দেখালাম, সেত শুধুই স্বপ্ন নয়। একদিন ত এই-ই সত্য ছিল। যে গ্রামটিকে কেন্দ্র করে একদিন স্বপ্নের জাল বুনেছিল অনেক কিশোর মানুষ, সে ত একটি গ্রাম মাত্র নয়, সে যে গ্রামকেন্দ্রিক বাঙালী সভ্যতার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ।

গ্রামের নাম খাসকান্দি। ফরিদপুরের জেলা শহর থেকে যশোর রোড ধরে মাত্র সাত মাইল দূরে একটি সম্পন্ন-গ্রাম। সকাল বেলাকার নগর-সংকীর্তনের দল দুপুরের পাঠশালা, অপরাহ্নের দুধের বাজার আর রাতের যাত্রাদলের আসরের জন্যে আশপাশের অনেক মানুষের মুখে মুখে একদিন ফিরত এই গ্রামের প্রশংসা-ধ্বনি। কিন্তু সে গ্রামের কথা আজ বুঝি অবাস্তব স্বপ্ন-কাহিনীতেই পর্যবসিত হয়। হায় রে ধূলিলুণ্ঠিত বিশুষ্ক পলাশ, লীলা-কমল! হায় রে আমার সোনার গ্রাম—আমার ছেড়ে আসা গ্রাম!

**কুলপদ্দি**

ছোটবেলায় দিদিমার কোলে বসে এক স্বপ্নপুরীর গল্প শুনতাম। সেখানে গাছে গাছে সোনা ফলত। হীরার মতো বৃষ্টিরা ঝাঁক বেঁধে নেমে আসত সেই দেশের বুকে। নদীর কলতানে শোনা যেত বীণার ঝঙ্কার। কত আগ্রহ নিয়ে সেই দিন সেই গল্প শুনেছি আর

প্রশ্নের পর প্রশ্নে বিরক্ত করে তুলেছি বৃদ্ধা দিদিমাকে। সেদিন কি একবারও ভেবেছি যে আমাকেও একদিন এমনি গল্প শোনাতে হবে সকলকে ; মাত্র ত্রিশ বছর বয়সেই পঙ্গু মন নিয়ে দিদিমার অভিনয় করতে হবে সারাটা দেশের সামনে?

দিদিমা মারা গিয়েছেন অনেককাল, কিন্তু অক্ষয় হয়ে আছে সেই স্বপ্নপুরী। সেদিনকার অবুঝ মনে সহানুভূতি জাগত বন্দিনী রাজকন্যার জন্যে, আজ নিজের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে নিজের উপরই অনুকম্পা হয়। তাই মনে মনে এখন স্বপ্নের জাল বুনি, স্মৃতির কুসুম নিয়ে রচনা করি তারই কাহিনী, কবিরা কল্পনায় যাকে গড়ে তোলে কাব্যে, আজন্ম শহরবাসীরা যার ছবি দেখে স্বপ্নে।

আড়িয়ালখাঁ নদী নয় নদ। স্ত্রী নয়, পুরুষ। কিন্তু তাকে পুরুষ কল্পনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। শুধু আমি কেন, তরঙ্গভঙ্গ উজ্জ্বল আড়িয়ালখাঁর তীরে দাঁড়িয়ে জগতের সবচেয়ে বেরসিক লোকও বোধ হয় বলতে পারে না—খাঁ সাহেব এমন নেচে নেচে কোথায় যাচ্ছ তুমি? তবু আড়িয়ালখাঁ নদী নয়, নদ। তার নাম গঙ্গা বা যমুনার মতো কিছুই হতে পারবে না, তার নাম থাকবে—আড়িয়ালখাঁ।

এই আড়িয়ালখাঁর তীরে আমার গ্রাম-কুলপদ্দি। দেশের কুলপঞ্জীতে এর জন্মতারিখের সন্ধান পাওয়া যায় নি, তাই নামকরণের ইতিহাসটিও জানানো গেল না ; তবে গাঁয়ের বহু পুরনো স্মৃতি পুরনো বন্ধুর মতো মনের পর্দায় জড়িয়ে জড়িয়ে রয়েছে।

প্রকাণ্ড গ্রাম। প্রায় পাঁচ হাজার অধিবাসীর সুখ-দুঃখের কাহিনী নিয়ে এর ইতিহাস গড়া আর ভৌগোলিক সীমারেখার সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় মাদারীপুর মিউনিসিপ্যালিটির বাঁধানো খাতায়। পৌর-প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীভূত গ্রাম। তাই আশপাশের গ্রামগুলোর কাছে সে ভোজসভায় নৈকষ্যকুলীনের মতো, দেবসভায় ইন্দ্রতুল্য। যদি ও বিদ্যাসাগরের মতো কেউ জন্মান নি আমাদের গ্রামে, কোন বাদশাহী আমলের ইমামবাড়াও নেই এর ত্রিসীমানায়, তবু সেজন্যে কোনো দুঃখ নেই আমাদের। সেখানে যা আছে তাই যথেষ্ট—শালুকভরা বিল, গাছে গাছে পোষ-না-মানা পাখি, ধূ-ধূ করা মাঠে সোনার ফসল।

কতদিন নির্জন মাঠে শুয়ে শুয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেছি। মনে হত এই গাঁয়ের একজন বলেই হয়ত চাঁদের আলো ঠিকরে পড়ত আমার ঘরে! শরতের বাতাস উতলা হয়ে উঠত শেফালী ফুলের গন্ধে। বৈশাখের অপরাহ্নে যেখানে গাঁয়ের ছেলেরা ফুটবল খেলত আনন্দের প্রস্রবণ বইয়ে দিয়ে, বর্ষার ভরা বাদলে সেখানেই ডিঙি নিয়ে আসত ভিন গাঁয়ের লোকেরা বাজারে সওদা করতে। জ্যোৎস্না রাতে বড় গাঙের মাঝি জোর গলায় গান ধরত— 'মরমিয়া রে, ও মরমিয়া! মোর মনের কথা কইমু আজি তোরে।' সেই পল্লীগীতির সুরটুকু এখনও আমার মনে লেগে রয়েছে, শহরের কোলাহলে আজও তা মুছে যায় নি।

নাগমশাই ছিলেন পাঠশালার শিক্ষক। ছোটখাট লোকটি, বয়সে নয়, আকৃতিতে। তাঁর বেতখানির কথা মনে পড়ে। সুদীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে স্ত্রী সুনন্দা এবং ঐ বেত্রদণ্ডখানা তাঁর সুখ-দুঃখের সঙ্গী। ঐ বেতখানা দেখিয়ে দেখিয়ে সেদিনও তিনি ছাত্র পড়াতেন। আজ সে স্কুল ভেঙে গিয়েছে, ঘটনার আকস্মিকতায় স্তব্ধ হয়ে যেন দাঁড়িয়ে

পড়েছে নাগমশায়ের গতানুগতিকতা।

কেশবদাকে ভুলিনি। কি দুর্দান্ত প্রতাপ ছিল তাঁর যুবামহলে! গাঁয়ের এমন একটি ছেলেও ছিল না যে কেশবদার কথার অবাধ্য হতে সাহস পেত। সময়টা ছিল অগ্নিযুগ। আমি স্কুলে পড়ি। একদিন দুপুরবেলা স্কুল হতে ফিরছি, হঠাৎ কেশবদার সঙ্গে দেখা,—'এই শোন্ ত।' একেবারে attention- এ দাঁড়িয়ে পড়লাম।

কেশবদাকে ভাল লাগত। আদর্শ যাঁর উজ্জ্বল তাঁকে ভক্তি করা স্বাভাবিক। তাঁর ডাকে একবার নিঃশব্দে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি চাপা গলায় বলেছিলেন, —'বন্দুক ছুঁড়তে জানিস?'

একটু অবাক হয়েছিলাম, মনে মনে ভেবেছিলাম—দু-দুটো বন্দুক আমাদের বাড়িতে, আর বন্দুক ছুঁড়তে জানি না? কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের বন্দুক দুটি ছিল অহিংস, আমাদের মতোই বৈষ্ণব। তাছাড়া কেশবদার নিকট মিথ্যে বলাটাও ঠিক হবে না'। বললাম,—'না কেশবদা। এখনও শিখি নি।'

—আয় শিখিয়ে দেব।

একটু ভয় হল, তবু কেশবদার পিছন পিছন জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে বললাম।

—এটাকে কি বলে জানিস? ছোট্ট একটা চকচকে বন্দুক বার করলেন কেশবদা। এবার রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলাম। শঙ্কিত নয়নে চারদিকে তাকাতেই হেসে বল্লেন কেশবদা,— 'ভয় নেই, তুই দেখ না ভাল করে।'

কেশবদা পিস্তলটা গুঁজে দিলেন আমার হাতে।

কয়েকটা দিন মাত্র কেশবদার শিষ্যত্ব করেছি। তারপর একদিন সকালবেলা শুনি, কেশবদার বাড়ি ঘেরাও করে তাঁকে ধরে নিয়ে গেছে ইংরেজ সরকার— দেশপ্রেমের অপরাধে।

আজও সেই কেশবদাকে দেখছি। বার্ধক্য এসেছে, তাঁর দেহে নয় শুধু, মনেও। ছোটদের কয়েকটা ইজের আর প্যান্ট নিয়ে মাণিকতলার মোড়ে দাঁড়িয়ে ফেরি করছেন। নিঃসম্বল দেশকামী সংসারের ঘানি টানবার আর কোনো উপায়ই খুঁজে পান নি। এমনি কত ব্যর্থতার ইতিহাস জমে আছে সংসারের স্তরে স্তরে। জীবনের মাশুল দিয়ে কত জনেই ত পেল শুধু লাঞ্ছনা আর অপমান কে তার হিসেব রাখে? তবু আজ গাঁয়ের পরিচয়ে কেশবদার পরিচয় না দিয়ে পারলাম না।

শুধু কেশবদার দেশপ্রেম নয়, কত ইন্দ্রনাথের মাছ চুরির কাহিনী বাতাসে বাতাসে ঘুরে বেড়ায় আমার গাঁয়ে, কত কবির কল্পনা অনাদৃত অবস্থায় ছড়িয়ে আছে এর ঘাটে-পথে, কিন্তু বাইরের জগতের সঙ্গে কে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেবে?

ভোরবেলা আমার ঘুম ভাঙত বৈতালিকের গীতে। রাত্রিশেষে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভৈরবীর সুর ছড়াত আমাদের হরেকৃষ্ণ বৈরাগী। তার গানের বিষয়বস্তু ছিল—রজনী প্রভাত হয়ে এল, পাখিরা শীষ দিতে আরম্ভ করেছে, একটু পরেই পূবের আকাশ লাল হয়ে উঠবে, হে রাধাকান্ত! রাধিকার হৃদয়বল্লভ! আর কত ঘুমোবে, এবার তুমি জাগ। হরেকৃষ্ণ আর কার ঘুম ভাঙায় জানি না। রাধিকার হৃদয়বল্লভ ত সর্বত্রই আছেন, কিন্তু হরেকৃষ্ণের সুর আজ আর সেখানে ঝঙ্কৃত হয় না কেন?

ষোলখানা পূজো হত আমাদের গ্রামে। সে এক রাজসিক ব্যাপার! প্রায় শখানেক ঢাকের বাজনায় সমস্ত গ্রামটি সারারাত্রি সজাগ হয়ে থাকত। নবমীর রাত্রিতে শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যেত অফুরন্ত আনন্দে। কুঞ্জদা হয়ত হঠাৎ বিচিত্রভঙ্গীতে একটু 'লোকনৃত্যম' দেখিয়ে দিতেন তাঁর পূজ্যপাদ খুড়োমশায়কে, অনন্ত হয়ত রাত এগারটায়ই এঁদো পুকুরটায় গা ডুবিয়ে জোর গলায় সূর্যস্তব শুরু করে দিত। অবশ্য এসব তাদের ইচ্ছাকৃত অপরাধ নয়, পরোক্ষে কোনো একটি তীব্র রসসুধা গ্রহণের প্রত্যক্ষ ফল।

কেষ্ট ডাক্তারের ঘরের আড্ডাটি ভেঙে গেছে। সেখানকার নড়বড়ে চেয়ারগুলো হয়ত এতদিনে নতুন সুরে কথা বলতে সুরু করেছে। কি জ্বালাতনটাই না করতাম ডাক্তারকে। সকলের সেরা ছিল অনাথ, ভগবান তাকে মোটেই সুস্থ থাকতে দেন নি। তার ছোঁয়াচ লাগলেই চেয়ারটেবিলগুলো চিৎকার জুড়ে দিত। আলমারিগুলো পর্যন্ত তটস্থ হয়ে থাকত অকাল-মৃত্যুর আশঙ্কায়। ডাক্তার ছিল আমাদেরই বয়সী, ডাক্তারীর চেয়ে আমাদের সে বেশি পছন্দ করত, আর সেজন্যেই আড্ডাটি জমত ভাল। আজ আর সেখানে আড্ডা জমে না। সেই অহেতুক উচ্ছ্বাস অসময়েই থেমে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, ডাক্তারের কাছে আমরা এখন পরদেশী।

মনে পড়ে সরলা পিসীর কথা। একটি লিচু কি আম তার গাছ থেকে নিয়েছ কি আর রক্ষা নেই। চিৎকার করে পাড়া মাথায় করে তুলবে। বার বার বলবে,—'আমার নাম সরলা পাঁচু চ্যাটাজ্জির নাতনী আমি। আমি কাউকে ভয় করি নে। বখাটে ছেলেদের তোয়াক্কা রাখি আমি?' কথাটা ইতিপূর্বে আরও শুনেছি, মেঘনাদবধকাব্যে প্রমীলা সুন্দরী বলেছিল,—'রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী; আমি কি ডরাই সখী ভিখারী রাঘবে?' সরলা পিসীর কথাটা এরই আর এক সংস্করণ বলে বখাটে ছেলেরা ধরে নিত।

গ্রামটি সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল ফুটবল খেলায়। মহকুমায় সে সর্বশ্রেষ্ঠ। মহকুমার সীমা ছাড়িয়েও তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। দূরের কোথা কোথাও খেলতে গেলে কুলপদ্দির নাম শুনেই অগণিত লোক হত মাঠে। শুনেছি গাঁয়ের দু-একজন খেলোয়াড় ইদানীং কলকাতা এসে কোন কোন দলে নাম লিখিয়েছে। আমাদের ফরওয়ার্ড প্রিয়লালই যে একদিন মেওয়ালাল হয়ে দাঁড়াবে না তাই বা কে বলতে পারে?

গাঁয়ে সর্বজনীন আনন্দের সাড়া জাগত বিজয়া-সম্মিলনী আর নববর্ষ উৎসবে। এর উদ্যোগ-পর্ব যা চলত তা মহাভারতেব উদ্যোগ-পর্বকেও হার মানায়। গাঁয়ের মাঝখানে কোন বিরাট নাটমন্দিরে দু-তিন দিন ধরে এর অনুষ্ঠান চলত। জলসা ও অভিনয় ত হতই, তা ছাড়া আবৃত্তি, রসরচনা, হাস্যকৌতুক ইত্যাদির প্রতিযোগিতায় শহরের এবং আশপাশের গাঁয়ের শিল্পীরাও এসে যোগ দিতেন।

খেজুরে গুড় ও ইলিশ মাছের জন্যে প্রসিদ্ধ এই অঞ্চল। আড়িয়ালখাঁর জলে হাজার হাজার জেলে-ডিঙি ইলিশ মাছের আশায় ঘুরে বেড়াত। লাইনের স্টিমারগুলো রাস্তা না পেয়ে ভোঁ ভোঁ করে চিৎকার করত। সে চিৎকার এখনও কানে বাজে।

আমার জীবনের স্মৃতি এ আড়িয়ালখাঁর সঙ্গে মিশে আছে। আড়িয়ালের জলে মুছে যেত আমার দেহের ধূলি, শান্ত হত মনেব আবেগ। শিশুকালে এর তীরে বসে কত খেলা

করেছি, চলতি স্টিমারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কত দৌড়েছি, কৈশোরে তার রুদ্রমূর্তি দেখে ভীতও হয়েছি; কতদিন এর তীরে বসে দিগন্তের মন-মাতানো ছবি দেখেছি। আজ কোথায় গেল সে সব, কত দূরে সেই আড়িয়ালখাঁকে ফেলে এসেছি। গাঁয়ের ঐ ঘন জঙ্গলের মধ্যে যে এত শান্তি আছে, ঐ নিরক্ষর গ্রামবাসীর অন্তরে যে এত ভালবাসা আছে, ঐ আড়িয়ালখাঁর ঘোলাটে জলে যে এত আকর্ষণী শক্তি আছে, তা এতদিন এমন করে অনুভব করি নি, আজ দেখি, আমার সমস্ত মন জুড়ে আছে সে সবেরই স্মৃতি!

আমার সেই সাধের গ্রাম আজ ধ্বংসের মুখে। আমার বাল্যের লীলাভূমি, কৈশোরের খেলাঘর, যৌবনের স্বর্গ আজ পরিত্যক্ত, শূন্য-লোকালয়। এক নিষ্ঠুর আঘাতে সে আজ মৃতপ্রায়। শুধু আমার গ্রামের নয়, এমনি কত শত শত গ্রামের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর বুকে আজ জ্বলছে অনির্বাণ চিতা, কণ্ঠে শুধু হা-হুতাশ, চোখে জল! কিন্তু সবই কি ভাগ্য? যদি তাই হয়, তবু এই নিষ্ঠুর আঘাত আমি মেনে নিতে পারব না। দেশের ভাগ্যনিয়ন্তাদের ওপর থাকবে আমার চিরন্তন অভিশাপ, ভাগ্যের বিরুদ্ধে থাকবে বিদ্রোহ! আর আমার হতভাগ্য দেশবাসীকে অনুরোধ করব স্মরণ করতে কবিগুরুর সেই বাণী—'ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে, ভিক্ষা না যেন যাচি।'

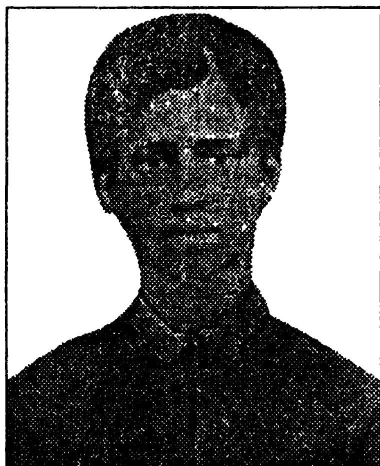
*[সূত্র : দক্ষিণারঞ্জন বসু (সংকলিত ও সম্পাদিত), 'ছেড়ে আসা গ্রাম', জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭৫]*

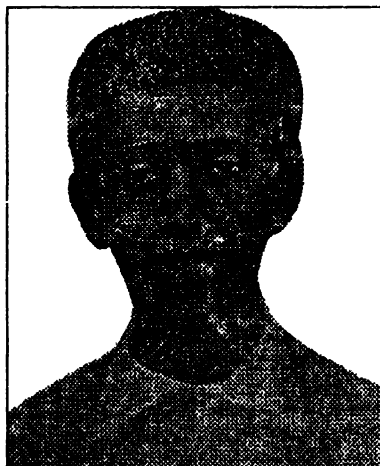


ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা হাজী শরীয়তউল্লাহ



পূর্ণচন্দ্র দাশ





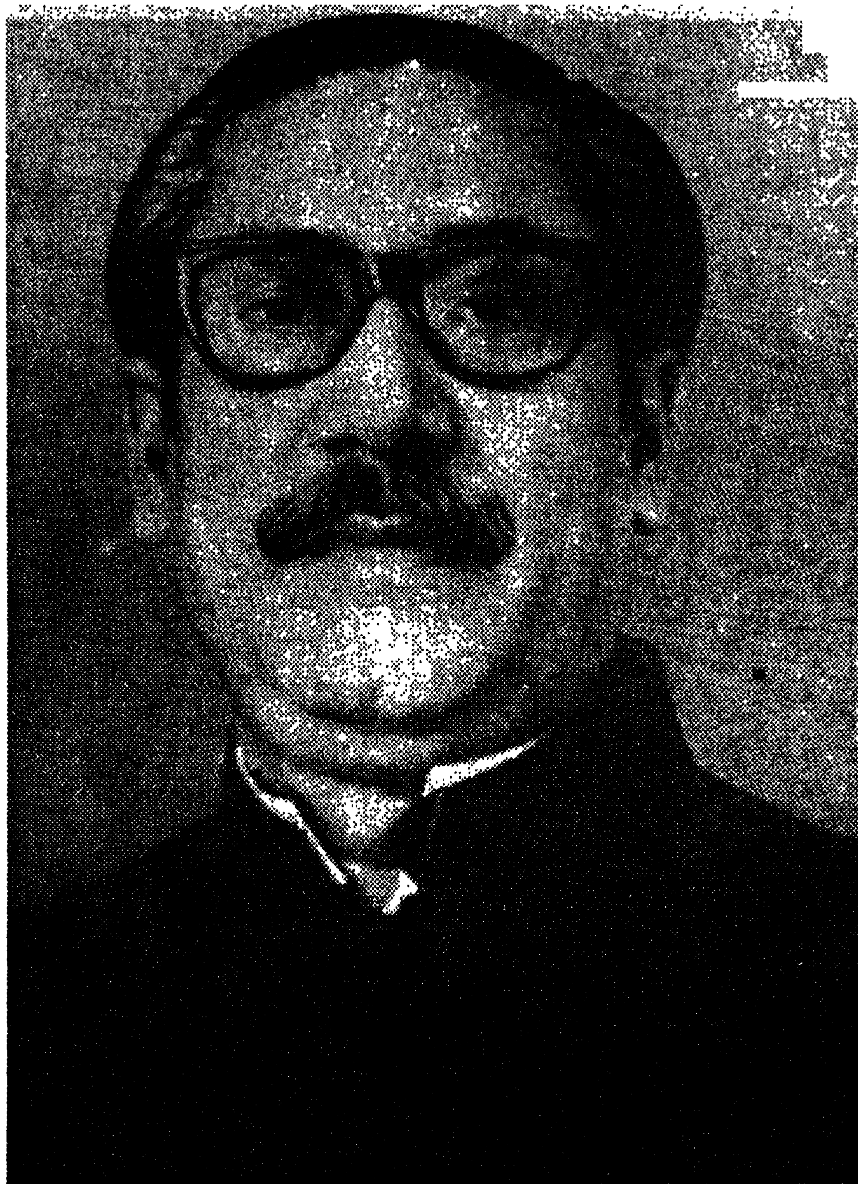
মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত

চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী

বাঘা যতীনের সহযোগী অগ্নিযুগের তিন বিপ্লবী, মাদারীপুর



আধুনিক ফরিদপুরের স্থপতি অম্বিকাচরণ মজুমদার



জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন ও বঙ্গবন্ধু



বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা



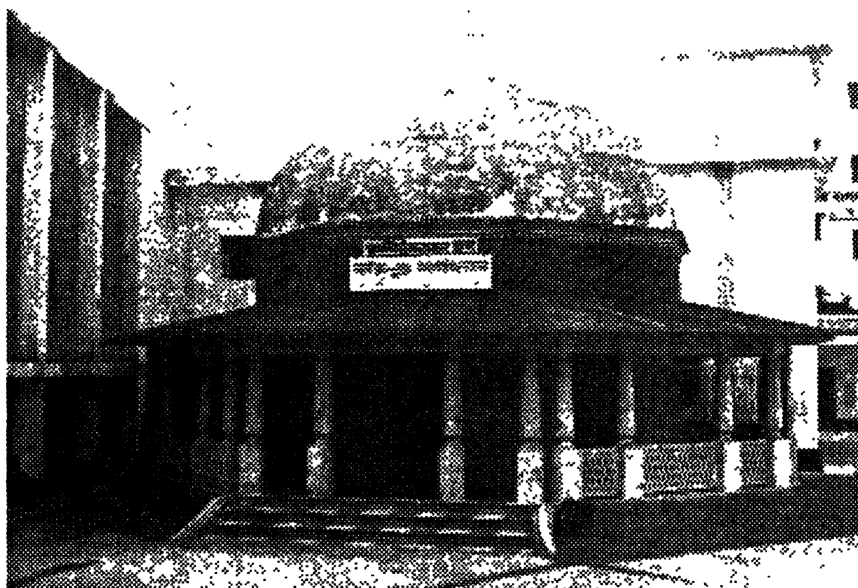
শাহ শেখ ফরিদউদ্দিনের মাজার, ফরিদপুর শহর



৫৫৮ হিজরি সনের মুদ্রা, ময়না গ্রাম, ফরিদপুর (গবেষক সমর চক্রবর্তীর সংগ্রহ)



প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি, উজানী, গোপালগঞ্জ

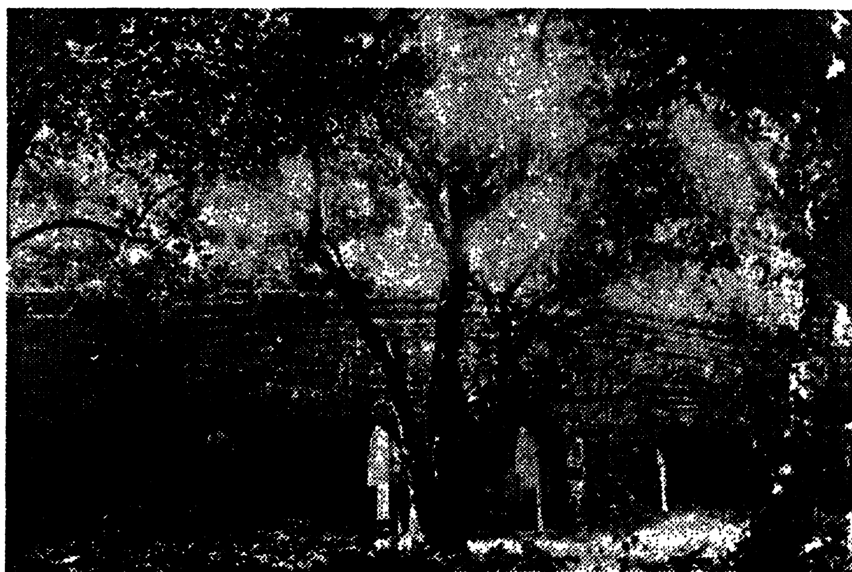


আলিমুজ্জামান হল, ফরিদপুর



দক্ষিণবঙ্গের প্রবেশপথ, দৌলতদিয়া ঘাট, রাজবাড়ি

গোপালপুর মন্দির, মধুখালী, ফরিদপুর



পাতরাইল মসজিদ, ভাঙ্গা, ফরিদপুর



ভূষণা নগরীর ধ্বংসাবশেষ, মধুখালী, ফরিদপুর



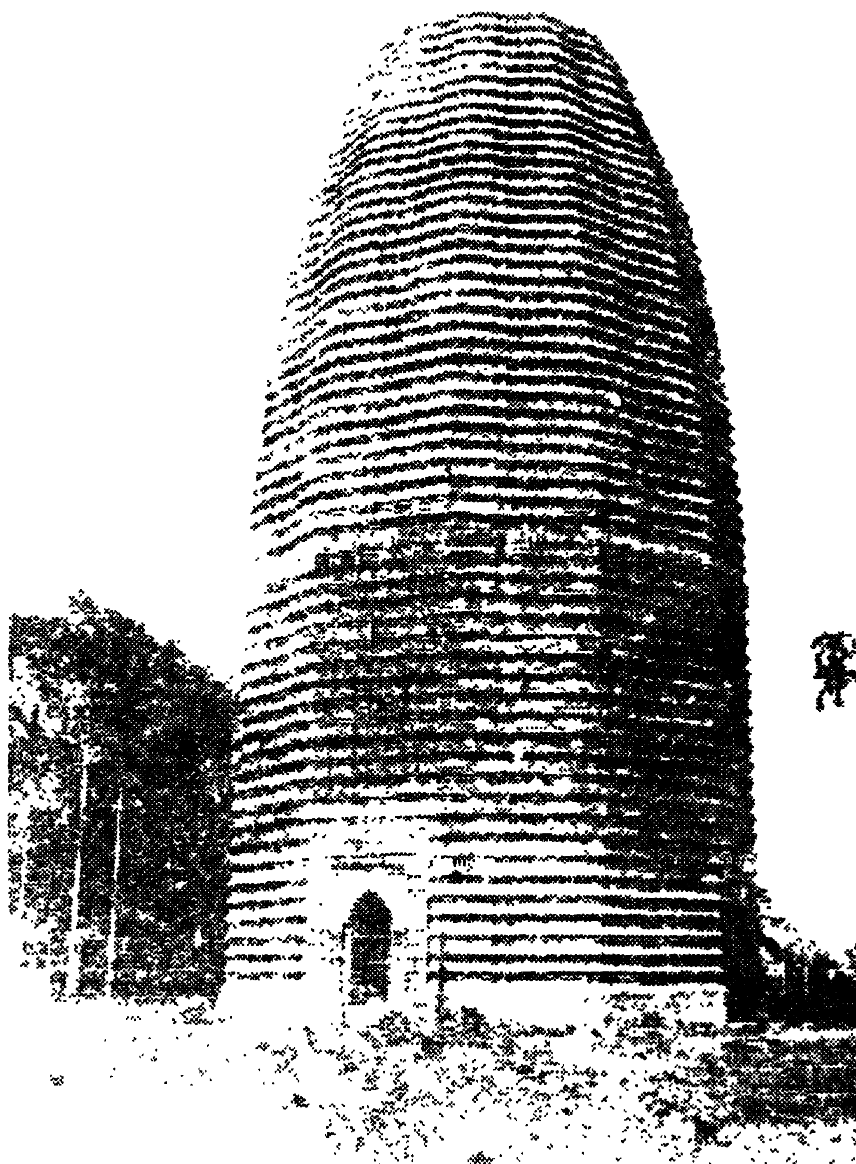
কবি জসীমউদ্‌দীন হল, ফবিদপুর



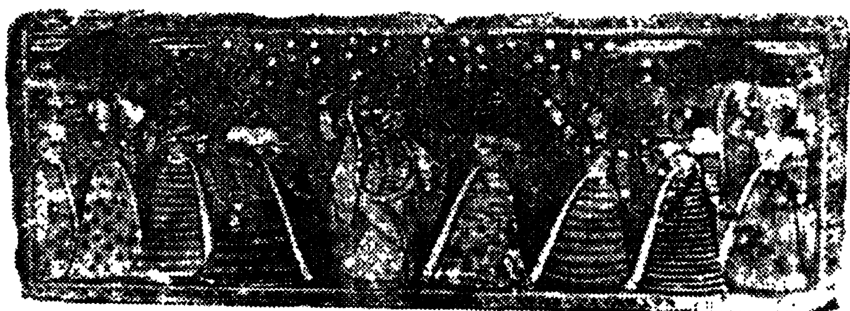
দেওয়ান সাগের সাঁই এর মাজার, কাটাগড়, বোয়ালমারী, ফরিদপুর



চন্দনা-বারাশিয়া খাল খননের দৃশ্য, বালিয়াকান্দি ফরিদপুব



মথুরাপুর দেউল বা ভূষণা বিজয়স্তম্ভ, মধুখালী, ফরিদপুর



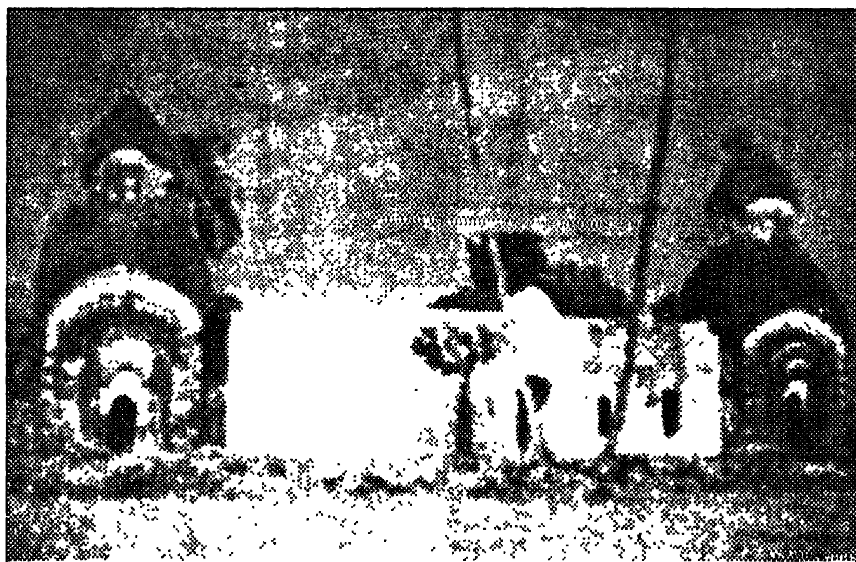
সপ্তম শতকের পুঁথির প্রচ্ছদপট, ফরিদপুর



উনিশ শতকের নকশীকাঁথা, ফরিদপুর



কোটালীপাড়া দুর্গের পূর্বপ্রান্তের দেয়াল, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ



বাজা সীতারাম রায়ের জোড়বাংলা কালি মন্দিব, বোয়ালমারী, ফরিদপুর

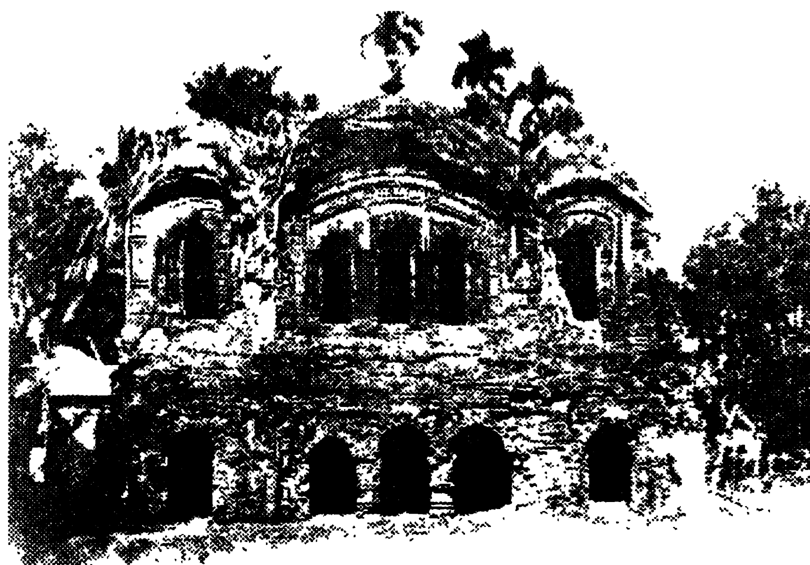


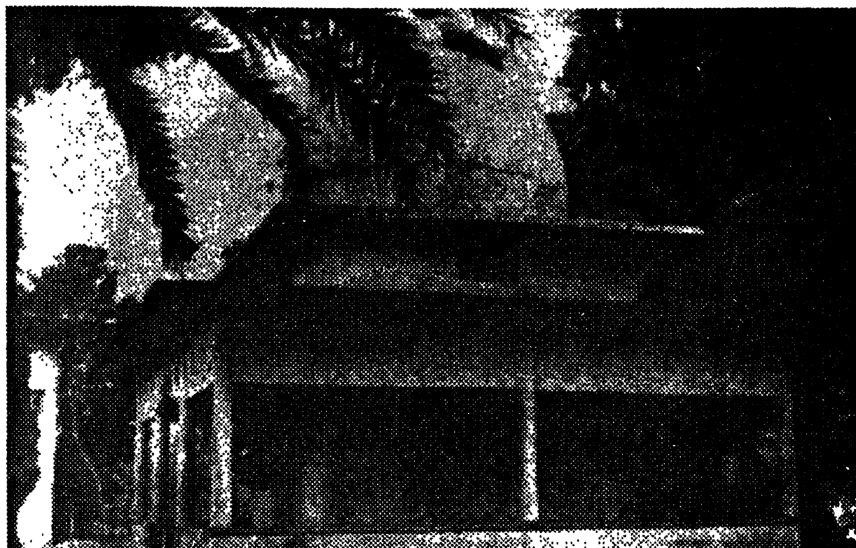
সাতৈর শাহী মসজিদ, ফরিদপুর



ঈশানচন্দ্র ঘোষ স্টেট ভবন (বর্তমানে খরসূতি চন্দ্রমুখী উচ্চবিদ্যালয়), ফরিদপুর


ঐতিহ্যবাহী পাট ক্রয়কেন্দ্র, চরমুগুরিয়া, মাদারীপুর


রাজারাম মন্দির, খালিয়া, মাদারীপুর



শাহ মাদারের দরগাহ, মাদারীপুর



শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন, ফরিদপুর



'ফরিদপুরের ইতিহাস'-প্রণেতা সাহিত্যশেখর আনন্দনাথ রায়